দীপান্বিতা

শারদীয়া ১৩৭৪

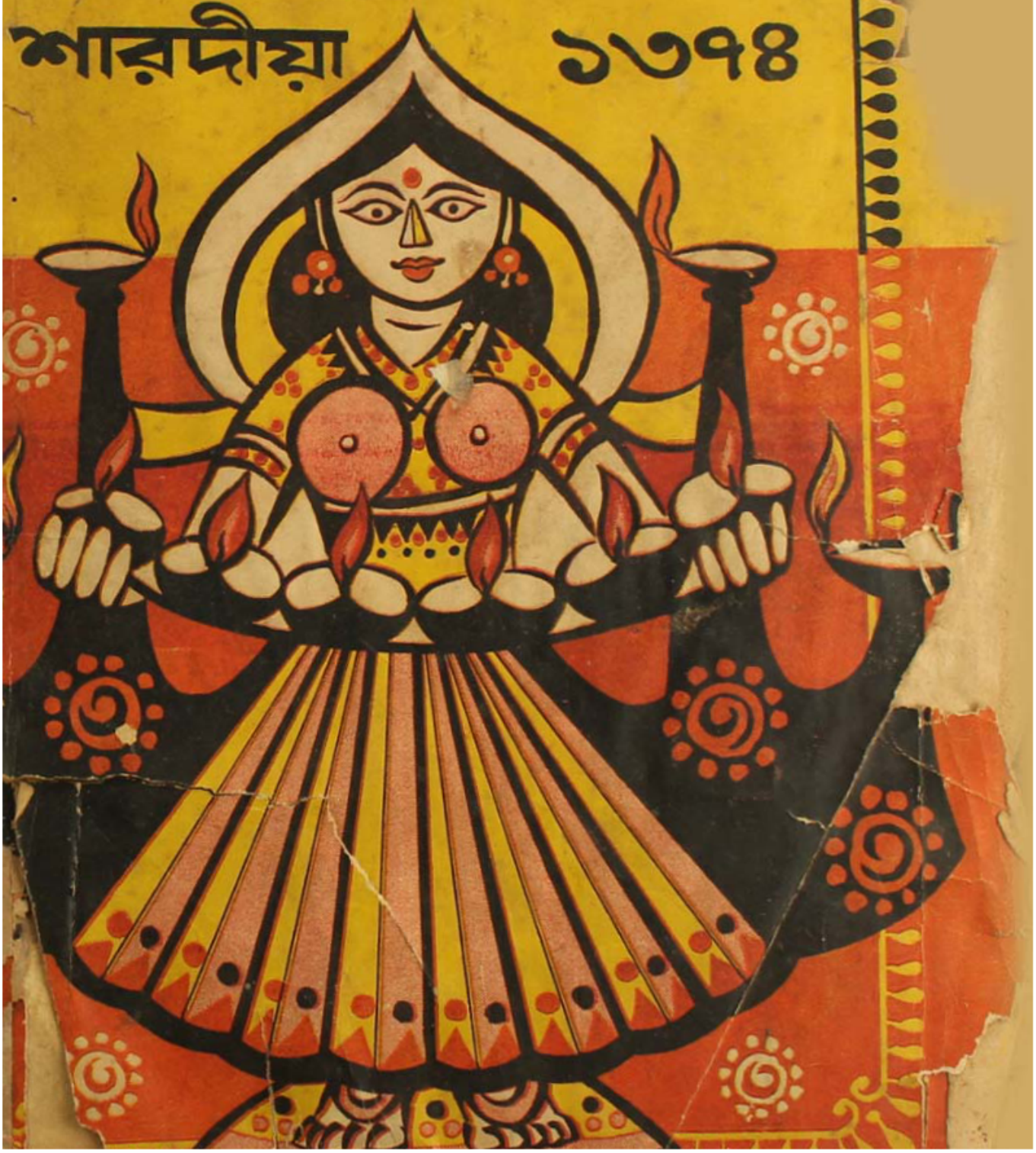

যুগলমূর্ত্তি

ত্রিগুণ তৈল

এজেন্ট - বটকৃষ্ণ পাল

শতাব্দীর
ঐতিহ্যমণ্ডিত
সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদোক্ত
কেশ তৈল

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

জাল নিবারণী সীলের উপর
এই ফটো দেখিয়া লইবেন

জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া পারফিউম কোঃ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা - ৩৪

পূজার অভিনন্দন গ্রহণ করুন

টাটা স্কপ ডিলারস

(কণ্ট্রোলড স্টক)

ক্যালকাটা লিমিটেড

২০, স্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-১

ফোন : ২২-১১০১

পূজা এসে গেল

এই আনন্দের দিনে ঘরে ঘরে চাই

তন্তুজ

বাংলার সকল সুখ্যাত তাঁতকেন্দ্রে প্রস্তুত

ধুতি **শাড়ী** বেডকভার

• সার্ভের কাপড় ইত্যাদি

দেখতে ভালো • প'রে আরাম • বেশিদিন টেকে

আপনার কাছাকাছি যে-কোন বিক্রয়কেন্দ্র থেকে

পছন্দমত কেনাকাটা করুন

কলিকাতা : ২৩, গড়িয়াহাট রোড, গোল পার্ক (শীততাপ নিয়ন্ত্রিত)

৪০, বাগবাজার স্ট্রীট • ২০৩/৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট (বিধান সরণী) • ১২৯/১এ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট (বিধান সরণী) • ১২২/১এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড • ৯১, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড • ৮০, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড • ১৬১, বেলেঘাটা মেন রোড • ২০৮, বহুবাজার স্ট্রীট • ১২৮, হাজরা রোড • পি-৫৪৯, ব্লক 'এন', নিউ আলিপুর।

ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আমাদের ১৩টি বিক্রয়কেন্দ্রে পাবেন।

সকলের রুচি অনুযায়ী 'তন্তুজ' পাবেন

সকলের সঙ্গতি অনুযায়ী 'তন্তুজ' পাবেন

সেণ্টাল সেল্ ডিপো :

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

৬৭, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

ফোন : ৩৫-৩৬৫৮

Progressive/SH-21

দৌড় ঝাঁপ,
লাথি লাফ, চিৎপটাং
ছেলেমেয়েদের
যে-কোনো দুরন্তপনায়
সমানে পাল্লা দেবে

দাম ১২.১০—১৩.৫০

দাম ৪.১০—৬.৯০

দাম ১০.১১—১৮.৯০

স্কুলে আর খেলার মাঠে, প্রতিদিনকার হাঁটা-চলায়
ঠিক যেমনটি চাই, সেইরকমই তৈরি বাটার
ছেলেমেয়েদের জুতো। ডিজাইনে, লোভন
স্টাইলে, নরম চামড়ার প্রলেপ দেবে,
আঙুল মেলার অবাধ পরিসর। মজবুত বাঁধন,
আর পোড়ালিও হেলবে না—লাগসই, আরামপ্রদ,
ঝরঝরে চৌকসই। বাটার ছোটোদের জুতোর
বৈশিষ্ট্যই এই। আপনার ছেলেমেয়েকে
সঙ্গে নিয়ে বাটার দোকানে আসুন,
মাপমতো ঠিক জোড়াটি আসবেই হেয়ে যাবে।
আজই আসুন, এই জুতোজোড়ার
চাহিদা খুব বেশি।

Bata

দাম ১২.৫০—১৪.৫০

দাম ১২.৫০—১৪.৫০

দাম ১০.১১—১১.১৩

পুজোর সময় বাইরে

বর্ষাতিটি চাইরে

বর্ষাতি, ডায়েরি প্রভৃতি প্লাষ্টিক-রাজত্বের আজব সমারোহ

ইন্দু প্লাষ্টিক ওয়ার্কস্

হেড অফিস। ১৬৮ ডি আপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা-৩

ওয়ার্কশপ। পি ১৭৬ অবিনাশ ব্যানার্জী লেন,
কলিকাতা ১০ ॥ ফোন ৩৫-৪৯১৪

ফেস্টিভ্যাল অ্যাকাউন্ট

আগামী বছরের পূজার খরচের জন্য
ফেস্টিভ্যাল অ্যাকাউন্ট খোলার
এখনই উপযুক্ত সময়।
প্রতিমাসে টা. ৫ জমা দিলে আগামী
পূজার সময় টা. ৬১.৫০ হবে। পাঁচ
টাকার গুণিতক অধিক পরিমাণ টাকাও
জমা লওয়া হয়।

আমরা সেবার সাথে নিয়ে আরও কিছু
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিঃ ও অফিস :
৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

চুলের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য ফিরে পেতে হলে

কেয়ো কার্পিন

ব্যবহার করুন

কেয়োকার্পিন তেলটী খোটেই চটচটে নয়—অথচ এতে চুল এমন ভাবে বসে যায় যে সারাদিনেও এলোমেলো হবেনা, এর গন্ধটীও মনোরম। কেয়োকার্পিনে চুলের গোড়া শক্ত হয় আর চুলও ভাল থাকে।

কেয়ো-কার্পিন

একটি হিমিটু হেয়ার তৈল

কে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড

উর্বশী ফ্যাশানের রাণী

দক্ষিণ কলকাতার মহিলারা উর্বশী ছেই কেনাকাটা পছন্দ করেন—

উর্বশী (গার্মেন্টস) প্রাইভেট লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস
২৪৯, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ফোন : ৩৪-০১৭৮

শোরুম : ১৮।২, ঝড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯
ফোন : ৪৬-২৮৩৩

ব্রাঞ্চ : ৫২এ, কালী টেম্পল রোড, কলিকাতা-২৬

রমাপতি বসু

দ্বিতীয় বিবর ৬·০০

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

বরণীয় মানুষের স্মরণীয় প্রেম ১০·০০

নিগূঢ়ানন্দ

বাবু আর বিবি ১০·০০

দক্ষল দরওয়াজার নগরী ১২·০০

সুকুমার রায়

নীল সবুজের নটী ৫·০০

——— ক্রীড়াজগতের সেরা বই ———

চিরঞ্জীব বিরচিত

ভারতীয় ফুটবল ৩·০০

বিশ্ব ফুটবল ৩·০০

ব্রেবোর্ণ থেকে ইডেনে ২·০০

মহাকালের স্বাক্ষর — রণজিৎকুমার সেন ॥ ৮·০০

অনন্যপূর্বা — শচীন্দ্রকুমার নাথ ॥ ৭·০০

চন্দ্রা — মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ ॥ ৫·০০

সরস গল্প — বিভূতি মুখোপাধ্যায় ॥ ৪·০০

নীল ক্রৌঞ্চের ডানা — অগ্নি মিত্র ॥ ৬·০০

——— ১লা আশ্বিন প্রকাশিত হচ্ছে ———

রমাপতি বসুর

উর্বশীর নরক

জ্ঞানতীর্থ ॥ ১নং বিধান সরণী, কলিকাতা-১২

মহাপূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য···

কিং কোং

আর্ণিকা হেয়ার অয়েল

একমাত্র পরিবেশক :
আর. ডি. এম্. এণ্ড কোং
২১৭, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬
ফোন : ৩৪-৩৮৩৬

প্রস্তুতকারক :
কিং এণ্ড কোং
কলিকাতা
(হোমিও কেমিষ্টস্,
স্থাপিত—১৮৯৪ সাল)

মুসৌরী

[illegible] হিমালয়ের কোলে ছড়িয়ে রয়েছে [illegible]। [illegible] [illegible]। [illegible]

চুনার

চুনার ইতিহাসের সাক্ষী। পাহাড় ঘেরা চুনার দুর্গের প্রাচীন ইতিহাস [illegible]

বেনারস

ভারত দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থান বেনারস। বেনারস না দেখলে ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিশ্বনাথের মন্দির দর্শনের পর প্রত্যহ যাবেন।

প্রাচ্য হোটেল

যোগাযোগ করুন

॥ ২৪৯ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ॥

[illegible]

শারদীয়
প্রীতি
সম্ভাষণ
উৎসবের দিনগুলি
গানে গন্ধে রূপে
রসে ভরে উঠুক্—
সার্থক হোক্ মাতৃপূজা।
এনামেলের বাসন
খাস জনতা
(ট্রেডমার্ক)
খাস জনতা
দীপ্তি লণ্ঠন
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৬৭, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৫৪১১-৩
KALPANA. OM.46

বসুশ্রী • বীণা • প্রাচী ও অন্যত্র

পাঠক-পাঠিকাদের এবার পূজায় শারদ সম্ভাষণ জানায়

গল্প - উপন্যাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সীমন্তিনী ৬·০০

দীপক চৌধুরী

খড়িমাটির স্বর্গ

৭·০০

অরণ্য-বহ্নি
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৫·৫০

মাণিক্য রাজ্যের প্রেমকথা
বেদুইন ৫·০০

মঞ্চকন্যা
ধনঞ্জয় বৈরাগী ৭·০০

সূর্যলিখা
মায়া বসু ৩·৫০

সমুদ্র নয় মন
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ৩·০০

মিস বোসের কাহিনী
বাণী রায় ৩·০০

রাঙামাটির পাহাড়ে
শৈলেশ দে ৩·৫০

বাক্স বদল (চলচ্চিত্রে রূপায়িত)
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২·৫০

তারাপীঠের একতারা
চিত্তরঞ্জন দেব ৩·৭৫

সেই কলকাতা
দেবেশ দাশ ৩·৫০

শ্রেষ্ঠ গল্প
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫·০০

অনির্বাচিত গল্প
সজনীকান্ত দাস ৫·০০

প্রিয়ভাষেষু
ডঃ নরগোপাল দাস ৩·৫০

বিচিত্র মানবী
প্রীপান্থ ৫·০০

ভালবাসার ইতিকথা
শিবরাম চক্রবর্তী ২·৫০

পরকীয়া
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩·৫০

তথ্য ও তথ্যের সুনিপুণ ব্যবহারে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় 'পৃথিবীর ইতিহাসের' কথা লিখেছেন প্রবীণ লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গল্পচ্ছলে। এমন বই বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি হয়নি। প্রকাশ আসন্ন।

পৃথিবীর ইতিহাস

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ভারতে জাতীয় আন্দোলন
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১১·০০

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (বৈষ্ণব জীবন)

১ম খণ্ড (২য় মুদ্রণ) ৮·৫০
২য় খণ্ড ৮·০০
৩য় খণ্ড ৭·৫০

ডেল কার্নেগীর দুটি অবিস্মরণীয় বই

প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ ৪·৫০

দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন ৫·৫০
অনুবাদ গ্রন্থ

মনীষীদের সঙ্গে
হেনরি ভ্যান লন ৫·০০

রিক্তাভরণী
এলেন গ্লাসগো ৩·৫০

চার্লস স্টেইনমেজ (জীবনী)
হেনরি টমাস ২·০০

২৬ জন লেখক-লেখিকার অলৌকিক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ একটি উপভোগ্য গ্রন্থ

বুঝিতে যার ব্যাথা চলে না ৪·০০

স্মৃতিচারণ (আত্মজীবনী)
পরিমল গোস্বামী ৭·০০

মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা
বাণী রায় ৭·০০

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা
(ড্রামাটিক পারফরম্যান্সেস অ্যাক্ট ১৮৭৬ সম্বলিত)
নমস্য রায় ৬·০০

ছোটদের ভালো ভালো বই

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
মণি গঙ্গোপাধ্যায় ২·৭৫

রোল নম্বর ২০৫
পরিমল গোস্বামী ২·৫০

বাঘের চোখ
লীলা মজুমদার ২·৫০

দাদু-নাতির দৌড়
শিবরাম চক্রবর্তী ২·২৫

নাটক ও একাঙ্কিকা

দুর্গেশনন্দিনীর জন্ম ও একাঙ্কগুচ্ছ
নমস্য রায় ৩·০৫

এক পেয়ালা কফি
ধনঞ্জয় বৈরাগী ২·৫০

আর হবে না দেরী
ধনঞ্জয় বৈরাগী ২·৫০

একমুঠো আকাশ
ধনঞ্জয় বৈরাগী ২·০০

ফেব্রুয়ারী ফোর
কল্লোল (নমস্য)
উৎপল দত্ত ২·৫০

নতুন তারা
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৩·২৫

গ্রন্থম্ ২২/১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

২৯শে সেপ্টেম্বর শুভারম্ভ

এক বিচিত্র নারী-হৃদয়ের, মমতাময়ী মায়ের চাওয়া-পাওয়া, বঞ্চনা-বেদনার হৃদয়গ্রাহী কাহিনী

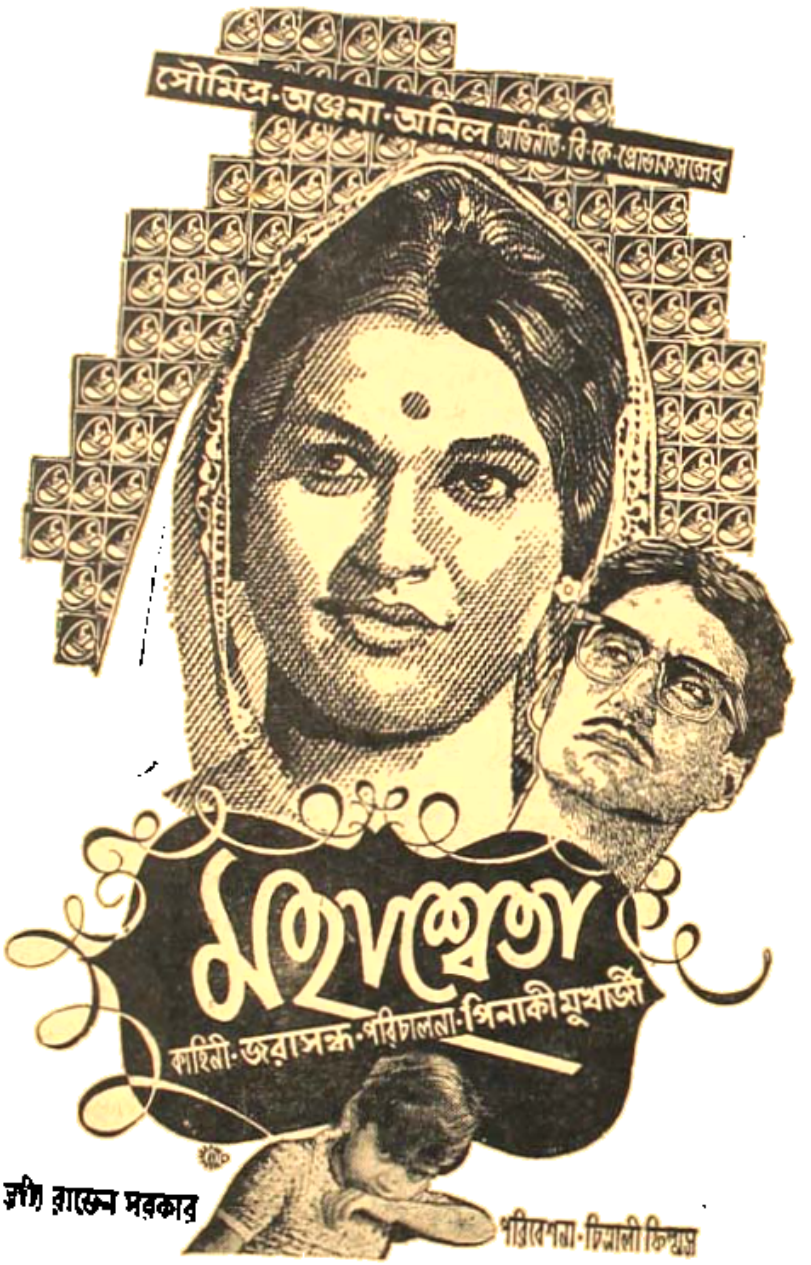

অন্যান্য ভূমিকায় : মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, রেণুকা রায়, শমিতা বিশ্বাস, গীতা দে, জহর গাঙ্গুলী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় জহর রায়, উৎপল দত্ত, অর্ধেন্দু মুখার্জি, সুখেন দাস, আনন্দ মুখার্জি, সমরকুমার, মাঃ সৌমিত্র, মাঃ মলয় প্রভৃতি

উত্তরা • পূরবী • উজ্জ্বলা

ও সহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে

DO YOU WANT

HIRE PURCHASE FACILITIES

Let's step in

MODI FINANCE CO.

FOR 2nd HAND VEHICLES, BUS, LORRY, CAR, TEMPO AND LAND.

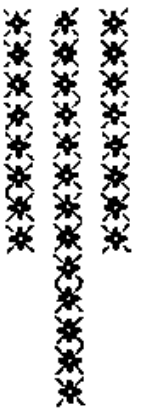

CONTACT :

Calcutta's Leading Centre

MODI FINANCE CO.

P-14, Sahitya Parishad Street, Calcutta-6.

Phone : 55-9856

DUNLOPILLO

খাট, চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল, ড্রেসিং আলমারী,

পূজোয় প্রিয়জনের মনের মত উপহার চাই!

আমাদের নিকট

ন্যায্যমূল্যে সর্বপ্রকার আধুনিকতম ফার্ণিচার পাওয়া যায়।

ELITE FURNISHERS

INTERIOR DECORATORS & FURNISHERS.

Stockists : **DUNLOPILLO**

240/4, BEPIN BEHARI GANGULI STREET. (Bowbazar) CALCUTTA-12.

ধীর সমীরে...

দার্জিলিঙে যখন ঝিরঝিরে হাওয়া বয়, তখন বোঝা যায় উচ্ছল উপভোগ্য দিন প্রত্যাসন্ন। বোঝা যায়, এবার নীল দিগন্তে তুষারমৌলি গিরিশ্রেণী দেখা দেবে, ফুটে উঠবে অগণ্য বনফুল।

ঋতুরঙ্গমঞ্চে এই পটপরিবর্তনের দিনে আপনিও দার্জিলিঙে আসুন।

'লাক্সারি ট্যুরিস্ট লজে'
(ফোন ৬৫৬) বা **'শৈলাবাসে'**
(ফোন ৬৮৪) ওঠাই সুবিধে।

রিজার্ভেশনের জন্যে ম্যানেজারের কাছে অথবা নিচের ঠিকানায় লিখুন।

ট্যুরিস্ট ব্যুরো
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অজিত ম্যানসন, নেহরু রোড, দার্জিলিঙ
ফোন : ৫০ গ্রাম : DARTOUR

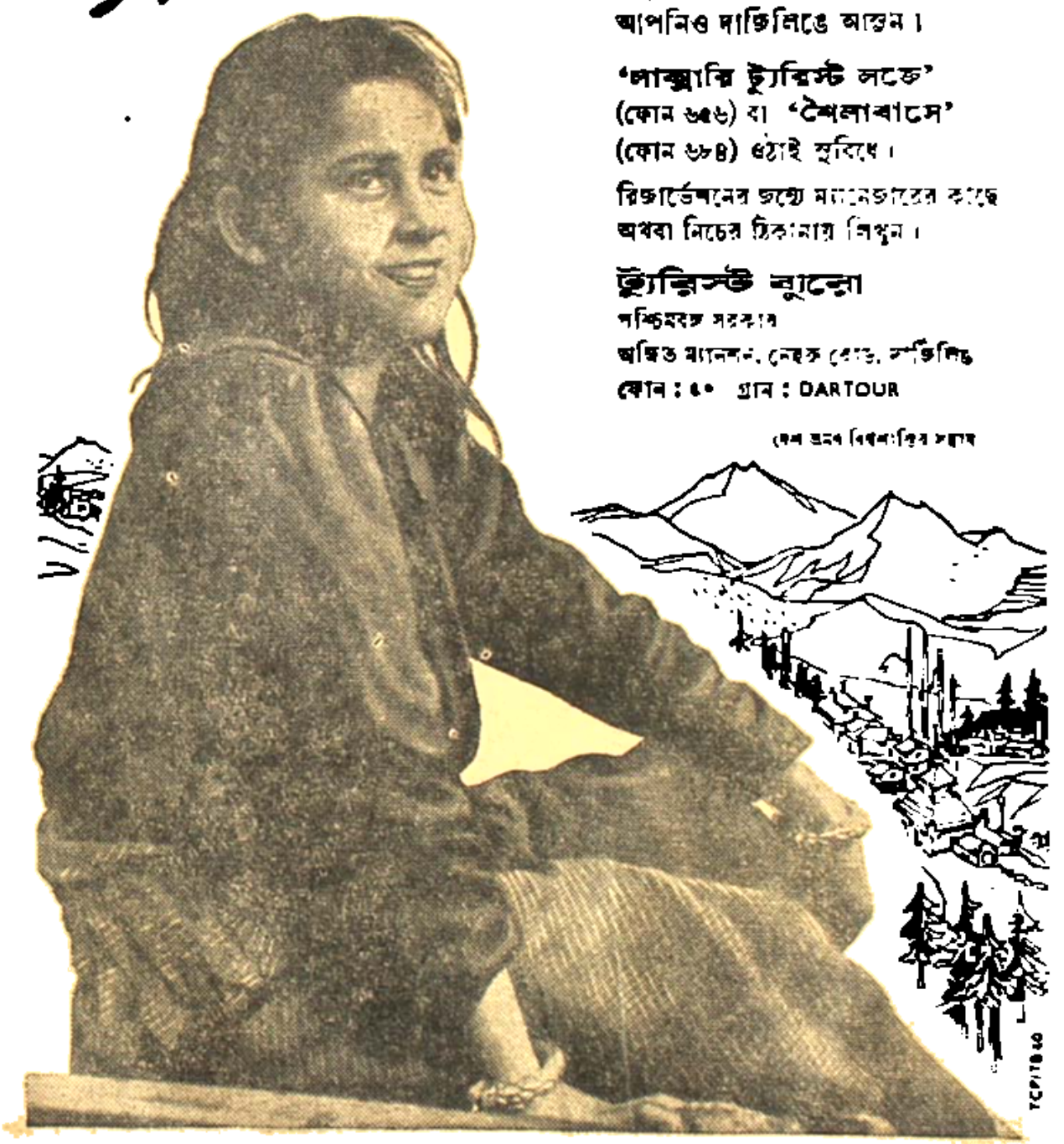

আপনার এবং আপনার
প্রিয়জনের জন্য

মদির—মনোহারিণী

প্রিয়া
সুরভি

প্রস্ফুটিত ফুলের মতই আপনাকে
সারাদিন সুরভিত রাখবে

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, দিল্লী

নব্য কলিকাতায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন প্রতিমার প্রতিচ্ছবি।

শারদীয়া দীপান্বিতা

১৩৭৪

সম্পাদক
শ্যামল চক্রবর্তী

ক্যালকাটা প্রসেস এণ্ড পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ
২৪৯, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ১২ ॥ ফোন —৩৪ - ০১০৮

বস্ত্রশিল্পে অগ্রগতি

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলসের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। গত ৫০ বছরেরও উপর বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতি শাড়ী আর নানারকম বস্ত্রসম্ভার লক্ষ লক্ষ গৃহের শুধু চাহিদা মেটাইনি সেইসঙ্গে আনন্দও বিতরণ করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি আর প্রয়োজনও বদলেছে আর সেইমত বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস ও নিজেকে সম্প্রসারিত করেছে। সম্প্রতি নানারকম নূতন বস্ত্রপাতি আমদানী করে দেশের ক্রমবর্দ্ধন চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেড

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

পূজার অভিনন্দন

আমাদের বন্ধু এবং পৃষ্ঠপোষকগণের প্রতি

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : কলিকাতা

756.3
1.048
007/81

সূচীপত্র

শারদীয়া দীপান্বিতা ১৩৭৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২২
হলুদ ফুল (উপন্যাস)	বিমল মিত্র	২৪
হরস্থান (বড় গল্প)	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	৪৭
বেহু শিল্পী (উপন্যাস)	জরাসন্ধ	৬৯
নারী ছলনাময়ী (রম্যরচনা)	শিবরাম চক্রবর্তী	১২৯
ফুল চাই (গল্প)	অসিত গুপ্ত	১৩৩
ধরাছোঁয়ার বাইরে (গল্প)	দিবেন্দু পালিত	১৪০
প্রেমের কবিতা (রম্যরচনা)	কিরণকুমার রায়	১৫০
মোতাহেরের নসীব (গল্প)	মহাশ্বেতা দেবী	১৫৬
লিভিয়া (রম্যরচনা)	কমল চৌধুরী	১৬৫
সমীরণের বিয়ে (গল্প)	শিশির লাহিড়ী	১৬৯
অধিকারী (উপন্যাস)	আশাপূর্ণা দেবী	১৭৭

জবাকুসুম

সুলেখার

তিনটি অনবদ্য অবদান

অ্যাডসল পেষ্ট

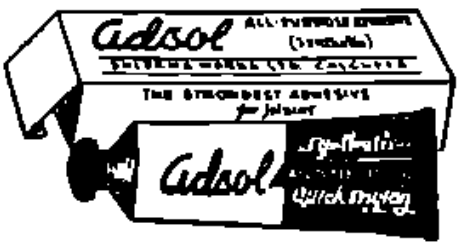

অলপারপাস অ্যাডেসিভ

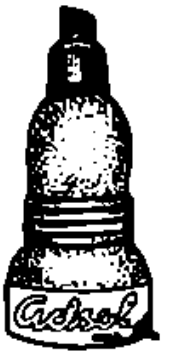

অ্যাডসল গাম

Sulekha

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিমিটেড

সুলেখা পার্ক • কলিকাতা-৩২

একটি নির্ভরযোগ্য কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

ক্যান্থারাইডিন মাথার অয়েল ব্যবহারে আপনার রেশম-কোমল ঘন কাল চুলের কোমলতা ও স্বাভাবিক সজীবতা রক্ষা করে ও চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করবে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই

কানপুর • দিল্লী

শারদীয়া

দীপান্বিতা

১৩৭৪

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বক্রেশ্বর : একটি নতুন সম্ভাবনা	অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়	২২২
নটির হাট (উপন্যাস)	সুরেশ বসু	২৩৯
চরিত্র (গল্প)	বিমল কর	২৭০
চিঠি (গল্প)	বরেন গঙ্গোপাধ্যায়	২৭৩
দর্পণ (গল্প)	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২৮১
হারানো প্রাপ্তি বিকল্পে (উপন্যাস)	নবীন্দ্র রায়	২৮৯
আমার নাই বা মনে রাখলে (রম্যরচনা)	সুনীল গুহ	৩১৯
সবাক চলচ্চিত্রের আদিপর্ব	অমিয় সান্যাল	৩২৩
রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা থিয়েটার	সোমনাথ চক্রবর্তী	৩২৯
পরিচালকের বিশেষ সাক্ষাৎকার	বিশেষ প্রতিনিধি	৩৩৪
চলচ্চিত্রে সাহিত্যের প্রভাব	আশীষতরু মুখোপাধ্যায়	৩৩২
চিত্রজগৎ	কৌশিক	৩৩৭
নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও ছায়াছবি	অর্ধেন্দুশেখর সেনগুপ্ত	৩৩৯
বিশেষ সাক্ষাৎকার খেলাধূলায়	বিশেষ প্রতিনিধি	৩৩৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ। চারু খান ও নিতাই ঘোষ

বিশেষ সুযোগ !!!

আপনি ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে
গ্রাহক হলে দিতে হবে

দীপান্বিতা এক বছরে ১০·০০ টাকা
রূপম এক বছরে ১২·০০ টাকা

দুটি পত্রিকার
একত্রে গ্রাহক হলে ২০·০০

আপনি আজই

নিচে নিজের নাম ও ঠিকানা লিখে
আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

ক্যালকাটা প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ
২৪৯, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নাম.....

ঠিকানা.....

.....

কোন মাস থেকে.....

সম্পাদকীয়

আকাশ যদিও নির্মেঘ নয় তথাপি শরৎকাল চলছে। শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাদ্র আশ্বিন মাস শরৎ ঋতুর সময়। এই সময় আকাশে তুলোর মতো মেঘেরা উড়ে বেড়ায় এবং প্রকৃতির মধ্যে সজীবতার স্পর্শ নিয়ে নরম মৃদু সমীরণের যে হিল্লোল চলে তাতে চিত্ত চাঞ্চল্য জাগে। গ্রীষ্মের প্রখরতা ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে আসে এবং বাঙালীর মনে এই পরিবেশ শরতের সুর মনে করিয়ে দেয়। শরৎকালে মা-দুর্গার আনন্দ আগমন ঘটে আমাদের বিশ্বলোকে। বাঙালীর চিরপ্রিয় এবং পরম আরাধ্যা মা আনন্দময়ীর এই শুভ আগমনকে উপলক্ষ করে সমগ্র বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা উৎসব-আনন্দে মেতে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে এই শাশ্বতীর প্রথা চলে আসছে এবং বর্তমানে দুর্গাপূজা বাঙালীর জাতীয় উৎসব ও একমাত্র বাৎসরিক শ্রেষ্ঠ আনন্দ অনুষ্ঠান। বাঙালী জাতি মা দুর্গাকে শক্তিরূপিণী, বিদ্যাদায়িনী রূপে আহ্বান জানিয়েছে বহুযুগ ধরে, কিন্তু ক্রমেই সমগ্র আনন্দের মধ্যেও আমাদের ক্রমবর্ধমান দুঃখ দৈন্য, অভাব অভিযোগ বেড়ে চলেছে, ফলস্বরূপ মা আনন্দময়ীকে আমরা সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে আহ্বান জানাতে পারছি কৈ।

এই বৎসরও মা আসছেন কিন্তু বাঙলার আকাশ আজ ঘন ঘটায় পূর্ণ। দারিদ্র, বেকারী, বন্যা এবং খাদ্যাভাব প্রকট হয়ে বাঙালী জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। আজ বাংলা দেশের শিশু দুবেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না। খাওয়ার জন্য মানুষ চরমতম অবস্থার সম্মুখীন। মা তার শিশুপুত্রকে হত্যা পর্যন্ত করতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না—, বন্যার চারিদিকে জল নয়, অগণিত নরনারী গৃহহারা। সাধারণ মানুষ এবং শহরের লোক জীবন সংগ্রামে হতাশায় নিমজ্জিত। এক কথায়—বাঙালী জীবনের সম্মুখে এক চরম অনিশ্চিতা এবং হতাশার অন্ধকার। জানি না এবার মা আনন্দময়ী আমাদের জন্য কোন্ সংবাদ নিয়ে আসছেন। তিনি এবার কি মানসিক আনন্দ নিয়ে এবং আমাদের কোন নিশ্চিন্ততার মধ্যে রেখে পতিগৃহে যাবেন?

সেই উত্তর এখনও আমরা পাই নি। তবু বাংলাদেশের লোক অনিশ্চিয়তার মধ্যেও আনন্দের সন্ধানে সুর মিলিয়েছে।

শরতের আনন্দবার্তায় বাঙলার পত্র-পত্রিকারও একটা অবদান রয়েছে। এই সময় পত্র-পত্রিকাগুলি নব নব সংখ্যায় শরতের আসর রাঙিয়ে তোলে। বাংলাদেশে সাহিত্যের প্রাণের জোয়ার আরম্ভ হয়। মনে হয়—বুঝি বা নতুন করে বিশ্বকে জানানো হচ্ছে—আমরা এখনও মরিনি। আমাদের দুঃখেও আমরা জীবন্ত। পত্র পত্রিকার এই যে একটা নব উদ্যম, চিন্তা, প্রকাশ এবং আড়ম্বর এরও একটা প্রতিশ্রুতি রয়েছে। জাতীয় জীবনে পত্র পত্রিকার মূল্য অসীম এ কথা অনস্বীকার্য। মানুষ সমগ্র ভাবে পীড়িত হয়ে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, দিশাহারা হয়, একটা অতৃপ্তিবোধ যখন মনকে আচ্ছন্ন করে, সেই সময় পত্র পত্রিকার বিচিত্র আলোচনায়, সৃষ্টিতে নতুন করে সুধা পান করে। জ্ঞান এইরূপেই মানব জীবনকে বাঁচার প্রতিজ্ঞা এনে দেয়। যাঁরা পত্র পত্রিকার নেপথ্যে থেকে এই বিশাল কর্মটি সম্পাদন করেন তাঁদের পরিশ্রমের মূল্য নিরূপণ কীভাবে হবে জানিনা। হয়তো ইতিহাস একদিন কথা বলবে। ধরে রাখবে সেই অবদানের পূর্ণাঙ্গ চিত্র। আমাদের পরিশ্রম হয়তো সেদিন সার্থকরূপে চিহ্নিত হবে।

পারদীয়া দীপান্বিতার আয়োজনে ত্রুটি করা হয়নি। সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিটি বাঙ্গালী পরিবারের প্রতি দৃষ্টি রেখেই আমাদের এই আয়োজন এবং দীর্ঘদিনের নিরলস চেষ্টা, চিন্তা ও পরিশ্রম। আপনাদের সমগ্র আনন্দের হাটে আমাদের এই সামান্য উপহার উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠুক, বাঙ্গালীর প্রতি ঘরে ঘরে আনন্দ উজ্জ্বল হোক, ঘুচে যাক নৈরাশ্য, দারিদ্র এবং অনিশ্চয়তা এই একমাত্র প্রার্থনা।

আমাদের এই পরিশ্রমে সঙ্গী হয়েছেন অনেকে। পাঠকপাঠিকার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা হেতু লেখকরা যে সহযোগিতা দেখিয়েছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ, তেমনি বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতিও আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। সবার মিলিত সহযোগিতায় এই বিরাট কর্ম সম্পূর্ণ করে আমরা আনন্দিত এবং আশা করি আপনারাও সবভাবে তৃপ্ত হবেন।

With the Best Compliments

from

Financiers & Distributors

Satyanaryan Kamal Kumar

4, Jagmohan Mullick Lane (Ist Floor)

CALCUTTA-7

হলুদ ফুল

বিমল মিত্র

সুশান্ত আমার বহুদিনের বন্ধু। সুশান্ত কুমার সান্যাল। এককালে সুশান্ত সান্যাল বললে লোকে চিনতে পারতো। তার নাম ডাক ছিলো। কাগজের পুজো সংখ্যাগুলোতে গল্প-উপন্যাস লেখবার জন্য তার কাছে তাগাদা আসতো। তার বই বিক্রী হতো। কেউ কেউ বলতো শরৎচন্দ্রের পর সুশান্ত সান্যালই আগামী কালের ভাবী লেখক। নানা জায়গা থেকে তার কাছে চিঠিপত্তর আসতো। সব চিঠি সে নিজে উত্তর দিতে পারতো না, তাই চিঠি লেখবার জন্যে তাকে লোকও রাখতে হয়েছিলো, কেউ কেউ অভিনন্দন জানাতো। কেউ স্তুতি জানাতো। কলেজের প্রফেসাররা তার সাহিত্যের ওপরে প্রবন্ধ লিখতো। তার গল্প-উপন্যাসের দার্শনিক ব্যাখ্যা করতো। কাগজে

কাগজে তার ছবি ছাপা হতো। দু' একবার জীবনীও তার বেরিয়ে গেছে। সমাজ সচেতন হিসাবে তার প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো।

একবার মহাড়ম্বরে তার পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের পূর্তি উপলক্ষে বয়ানগরের অধিবাসীরা মহাড়ম্বরে তাকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলো। তার চারিদিকে অসংখ্য ভক্ত শিষ্যদের ভীড় জমেছিলো।

মনে আছে সুশান্ত সেদিন লম্বা বক্তৃতা দিয়েছিলো। সে যে কতো বিনয়ী, সে যে কতো মহৎ, সে যে কতো জ্ঞানী, সে যে কতো মানুষের সুখ দুঃখ-কামনা-আনন্দ-বেদনার কতো বড় সরিক তা অন্য লোকের সঙ্গে আমিও বুঝতে পেরেছিলাম। জীবনে যে বড় হওয়া বড় কথা নয়, সকলের সঙ্গে সকলের সব অনুভূতি সমান ভাবে ভাগ করে ভোগ করাই চরম মনুষ্যত্ব, সেদিন সেই কথাই সে নানা ভাবে রসালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিলো।

সে আরো বলেছিলো—আপনারা যে ফুলের মালা দিলেন সে মালা আমি তাঁকেই গলায় পরিয়ে দিলাম, যিনি সর্বংসহা, যিনি পরম কারুনিক, যিনি মানুষের সব সুখ দুঃখ আত্মসাৎ করে অথচ মনোযোগোচর।

সুশান্তর বক্তৃতা শুনে, মনে আছে, আমার চোখে জল এসেছিলো। মনে হয়েছিলো একে তো আমি চিনিনা, এই সুশান্ত সান্যালতো প্রতিদিনের যে সংসারী মানুষটা আমার বন্ধু, লেখক মানুষটা যেন আমার নাগালের বাইরে। মনে হয়েছিলো আমি ধন্য, সুশান্ত আমার বন্ধু। আরো মনে হয়েছিলো যে সুশান্ত সম্বর্দ্ধিত হচ্ছে সে সুশান্ত শুধু আমার নয় সকলের। আমি তাকে যে ভালোবাসা শ্রদ্ধা সম্মান দিই সে ভালোবাসা সম্মান শ্রদ্ধা যেন ঠিক সবটা—সুশান্তর কাছে গিয়ে পৌঁছায় না, তার ভক্ত শিষ্যরা সবাই তা ভাগ করে ভোগ করে। আগে সুশান্ত ছিলো আমার একার বন্ধু, পরে সে সুশান্ত হয়ে গেলো সকলের প্রিয়। বিখ্যাত হবার পর থেকে সে আর আমার একলার রইলো না, হয়ে গেলো জন-সাধারণের।

আমি তখন মানুষ হিসেবে তার কাছে কিছুই নই। সে খ্যাতির শিখরে উঠলেও আমি এখনও অজ্ঞাত কুলশীল কিন্তু তার জন্য আমার কোন খেদ বা ক্ষোভ ছিলো না কারণ সুশান্তকে আমি ভালবাসতাম। তাকে যখন সবাই প্রশংসা করতো আমি যেন তার প্রশংসার ভাগ পেতাম। মনে হতো আমি বিখ্যাত নাইবা হলাম, সুশান্ত তো আমার বিখ্যাত বন্ধু। তার খ্যাতিতে আমার খ্যাতি, তার গৌরবে আমারও গৌরব।

সেই সুশান্ত সান্যাল হঠাৎ একদিন লেখা ছেড়ে দিলে।

বাংলাদেশে এরকম অনেক লেখক উঠেছে, পড়েছে। শরৎচন্দ্রের পর অন্তত পঞ্চাশ জন খ্যাতিমান লেখকের এই-ই পরিণতি। এক কালে তাদের বই লোকে পড়েছে তাদের সাহিত্য সভার সভাপতি করেছে। আর তারপর আস্তে আস্তে যখন নাম পড়ে গেছে, তখন সবাই তাদের ভুলে গেছে।

কিন্তু সুশান্তর কথা আলাদা। খ্যাতির শিখরে উঠেই সে হঠাৎ লেখা ছেড়ে দিলে। তারপর আজ কতো বছর কেটে গেলো, কোন লেখাও তার কোথাও ছাপা হয়নি, কোন বইও ছাপা হয়ে বেরয়নি, সেই সুশান্ত সান্যালকে বাংলার পাঠক-পাঠিকারা নিঃশব্দে ভুলে গেছে। আজকালকার পাঠক-পাঠিকাতো তার নামই শোনেনি, অথচ সে এখনও এই কলকাতা শহরে বেঁচে আছে, বেকার হয়ে বার্ধক্যের জ্বালায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এ কেন হলো? এ কেমন করে হলো?

* * *

সুশান্ত বলতো—জীবনে কেউ তোর কথা শুনবে না, কেউ তোকে সাধবে না, শুধু সকলকে তোর কথা শোনাতে হবে। সকলকে তোকে জানাতে হবে।

আমি বলতাম—কার এতো দায় পড়েছে আমার কথা শুনতে? আমি কে?

সুশান্ত বলতো—কেউই কিছু নয়। জন্মেই কেউ কিছু হয় না—বড় হয়ে সবাই কিছু হতে হয়। সুরুতে সবাই শূন্যই থাকে, পরে পূর্ণ হয়।

আমি জিজ্ঞেস করতাম—পূর্ণ হবো কী ক'রে?

সুশান্ত বলতো—আত্মপ্রকাশ করে।

—আত্মপ্রকাশ করবো কী করে?

সুশান্ত বলতো—মানুষ নানা ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। কেউ গান গেয়ে নিজেকে প্রকাশ করে, কেউ ছবি এঁকে, কেউ বা গল্প-কবিতা উপন্যাস লিখে, আবার কেউ বা ভাল জামা কাপড় পরে কিম্বা ঘরবাড়ি সাজিয়ে।

তারপর একটু থেমে বলতো—জানিস, নিজেকে প্রকাশ করবার সবচেয়ে ভালো পথ হলো সাহিত্য। যারা সাহিত্যিক তারা মারা যাবার পরও তাদের বই-এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশমান থাকে। সেই জন্যেই তো সাহিত্যিক হবার আমার এতো ইচ্ছে। আমি লোকের মনে চিরকাল বেঁচে থাকতে চাই, আমি অমর হতে চাই মানুষের ঘর জগতে।

এ-সব ছোট বেলাকার কথা।

ছোট বেলাকার কল্পনায় আমরা কতো স্বর্গে চড়েছি, কতো নরকে নেমেছি, কতো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করেছি তার ইয়ত্তা নেই। সে সব দিনের কথা সুশান্তর মনে আছে কী না জানি না, কিন্তু আমার মনে আছে প্রতিটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত আজোও মনে করতে পারি।

সুশান্তরা খুব গরীব ছিলো। আমাদের চেয়েও গরীব। এক একদিন ভাত খেতে পেতো না সুশান্ত। তখনকার সস্তা গণ্ডার দিনেও জামা কাপড় জুটতো না তার। অনেকদিন সে আমার বাড়িতে এসে আমার জল খাবারের ভাগটা খেয়েছে। আমার জামা কাপড় জুতো তাকে পরতে দিয়েছি, সে নির্বিকার মনে তা নিয়েছে। তার জন্যে কখনও তাকে আমার চোখে ছোট হতে হয়নি। বরং বরাবর সে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে আগেকার মতোই বড় বড় উপদেশ দিয়েছে, মহৎ লোকের জীবনী শুনিয়েছে আর আমাকে বড় হবার রাস্তা বাতলে দিয়েছে। ঠিক যেমন করে বড় ভাই ছোট ভাইকে নির্দেশ দেয়। অথচ সে আর আমি দু'জনেই ছিলাম সমবয়েসী।

এক একজন মানুষ থাকে যারা ছেলেবেলা থেকেই পরের ওপর গুরুমশাইগিরি করে। সুশান্ত ছিলো সেই জাতের।

আমি তাকে বড় বলেই সম্মান দিতাম, শ্রদ্ধা করতাম, ভালবাসতাম।

সেও বরাবর তার সুযোগ নিয়েছিলো। সে উঁচু থেকে আমাকে উপদেশ দিত, নির্দেশ দিত, আর আমি তার সামনে নিচু হয়েই তার নির্দেশ পালন করতাম।

সে বলতো—তোর কিচ্ছু হবে না—

তার কাছে নিরুৎসাহ পেয়ে আমি কিন্তু নিরুৎসাহ হতাম না। আমার শ্রদ্ধা এতোটুকু কমতো না তার ওপর। তাকে আরো বেশী করে শ্রদ্ধা করতাম।

আমাদের বাড়ির পাশে একটা পুকুর ছিলো। সেখানে আমরা মাছ ধরতে যেতাম। বঁড়শিতে মরদার টোপ দিয়ে ছিপ ফেলতাম জলের ধারে। আর চারা চারা মাছগুলো বঁড়শিতে এসে আটকে যেতো।

সুশান্ত বলতো—পাঠকরাও এই মাছের মতো, ভালো টোপ পেলেই তারা গেলে, আর ছেড়ে পালাতে পারে না।

সুশান্তর যে সাহিত্য সম্বন্ধে এতো জ্ঞান হয়েছিলো তার কারণ সেই অল্প বয়সেই সুশান্ত যতো পারতো নভেল নাটক গিলতো। তাদের বাড়িতে তার নভেল নাটক পড়ার জন্যে কেউ আপত্তি করতো না। আমিও পড়তাম, কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে। যে দু'একখানা বই তখন পড়েছিলাম তা ঐ সুশান্তরই কল্যাণে। পুরো বই পড়তে পারতাম না। একটু পড়তে না পড়তেই সুশান্ত কেড়ে নিতো, আর যাদের বই তাদের ফিরিয়ে দিয়ে আসতো। কিন্তু আমার বাড়িতে ছিলো আলাদা নিয়ম। আমার অভিভাবকদের মতে নাটক নভেল পড়লে ছেলেমেয়েদের চরিত্র খারাপ হয়ে যায়। মা বলতো—এখন ও সব পড়ো না, ষোল বছর বয়সের আগে ওসব পড়তে নেই।

কিন্তু সুশান্ত ততদিনে নাটক নভেলের পোকা হয়ে

উঠেছিলো। সে সেই অল্প বয়েসেই গল্প লিখতে সুরু করেছিলো। লিখতো আর আমাকে দেখাতো।

জিজ্ঞেস করতো—তোর কেমন লাগলো?

বলতাম—খুব ভালো।

সত্যিই তার লেখা আমার খুব ভালো লাগতো। আমি তার ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যেতাম। আমার কেবল মনে হতো সুশান্তর মতো করে আমি কবে গল্প লিখতে পারবো।

সুশান্ত বলতো—পারবি, পারবি, আমার লেখা ভালো করে শোন তাহলে তুই একদিন আমার মতন লিখতে পারবি।

সুশান্ত নিজের লেখাগুলো নকল রেখে কাগজের অফিসে পাঠাতো। কিন্তু পাঁচ-ছ'মাসের মধ্যেই সে গুলো তারা আবার ফেরত পাঠিয়ে দিতো। একটাও ছাপা হতো না।

সুশান্ত বলতো—জানা-শোনা না থাকলে সম্পাদকরা কারোর লেখা ছাপায় না।

সুশান্তর কথাতে আমার ধারণা হয়েছিলো যে পত্রিকায় যতো লেখা ছাপা হয়, তার লেখকদের সকলের সঙ্গে সম্পাদকদের পরিচয় থাকে।

জিজ্ঞেস করতাম—কিন্তু দূরের, দূরের লেখকদের সঙ্গে সম্পাদকদের কী করে পরিচয় থাকা সম্ভব!

সুশান্ত বলতো—চিঠিপত্তর লিখে সম্পাদকদের খোসামোদ করতে হয়, আর খোসামোদে কে না ভোলে?

আমি বলতাম—তুই খোসামোদ করিস না কেন তাহলে?

সুশান্ত বলতো—আমি কেন খোসামোদ করতে যাবো? আমার বয়ে গেছে খোসামোদ করতে। আমার লেখা ভালো, একদিন না একদিন ওদের ছাপতেই হবে। যে সব লেখা ছাপা হয় তার থেকে তো আমার লেখা অনেক ভালো।

এমনি করেই চলছিলো। সুশান্ত হতাশ হয়নি। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সে লেখা পাঠিয়ে যেতো, লেখাগুলোও ঠিক সময়ে বুক-পোষ্টে ফেরত আসতো।

আমি তার ধৈর্য, তার সহ্য ক্ষমতা, তার অমানুষিক পরিশ্রম দেখে অবাক হয়ে যেতাম। মনে মনে ভাবতাম সুশান্ত একদিন বড় হবেই। তখন সুশান্তই ছিলো আমার কাছে আদর্শ। ভাবতাম আমিও ষোল বছর বয়েস হবার পর গল্প উপন্যাস পড়ে কী করে সে সব লিখতে হয় তা শিখবো, আর মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাগজের অফিসে সেগুলো পাঠাবো।

* * *

মনে আছে একদিন হঠাৎ সুশান্তর একটা গল্প ছাপা হয়ে গেলো। কী একটা কাগজ, এখন নাম মনে নেই, তার ভেতরে দেখলাম সুশান্ত সান্যালের নাম ছাপা হয়েছে, তিন চার পাতার গল্প।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। গল্পটা আমার আগেই পড়া ছিলো। কিন্তু ছাপার অক্ষরে সেটা পড়তে আরো যেন হাজার গুণ ভালো লাগলো। মনে হলো সুশান্ত যেন আমার চেয়ে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। মনে হলো বাঙলা দেশের লোক তার নাম জেনে গেছে। সে যেন রাতারাতি পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে গেছে।

আমি তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—কী করে হলোরে?

সুশান্ত বললে—শুধু আমার লেখার গুণে। সম্পাদককে আমি একটুও খোসামোদ করিনি। যেমন পোষ্টে লেখা পাঠাতে হয় তেমনি পাঠিয়েছি, আর এই ছাপা হয়েছে। তুই বিশ্বাস কর, সম্পাদকের সঙ্গে একটুও জানা-শোনা ছিলো না—

বললাম—দেখিস, তোর একদিন আরো নাম হবে তাই তখন যেন তুই আমাকে ভুলে যাসনি—সুশান্ত বললে—ও সব বাজে কথা বলিস নি, জীবনে বড় হতে গেলে সকলকেই ভুলে যেতে হবে। পেছু টান থাকলে বড় হওয়া হবে না।

তা সত্যি, শেষের দিকে সুশান্তর কারুর জন্যেই মায়া দয়া ছিলো না। ছোট বেলা থেকে সে যেমন নিজের বড় হওয়ার স্বপ্নই দেখেছে, বড় হয়েও সে তেমনি অন্য

কারো কথা ভাবেনি।

আমরা দু'জনেই এক সঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম, কিন্তু সুশান্ত পাশ করতে পারলো না। খবর বেরোবার পরদিন ওদের বাড়িতে গেলাম। ভাবছিলাম কেমন করে তাকে মুখ দেখাবো। সে ফেল করেছে, সেটাও যেন আমার অপরাধ।

অথচ তার বিপদের দিনে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবো না, এটাও কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। দেখি সে তখন নিজের ঘরে গল্প লেখায় মশগুল। আমাকে দেখে আবার সে তার লেখাতে ডুবে গেলো।

বললে—তুই বোস, আমি এই পাতাটা শেষ করে নিই—

আমি চুপ করে বসে রইলাম। আমি অবাক হয়ে গেলাম। সুশান্তর নির্বিকার ভাব দেখে। জীবনে যারা সুখে দুঃখে নির্বিকার থাকতে পারে তারাই বোধ-হয় সংসার-সংগ্রামে জেতে। সুশান্তকে দেখে সেদিন আমার সেই কথাই মনে হয়েছিলো। আমি পাশ করে যেন ছোট হয়ে গেছি সুশান্তর সামনে, এমনি ভাব।

অনেকক্ষণ পরে সুশান্ত পাতাটা শেষ করে আমার দিকে মুখ তুলে চাইলো।

বললে—আমি ফেল করেছি শুনেছিস তো?

বললাম—হ্যাঁ, তাই তো দেখলাম। সে জন্যই তোর কাছে এলাম—

সুশান্ত বললে—পাশ করা ভালো, কিন্তু ফেল করাও খারাপ নয়—জীবনে শেষ-পরীক্ষায় পাশ করাটাই আসল। সেখানে যে পাশ করবে, তারই জিত্—তুই পাশ করেছিস বলে তোর উপর যেমন আমার হিংসে নেই, আমি ফেল করেছি বলে তেমনি আমার কোন ক্ষোভও নেই—

এর উত্তরে আমি কী বলবো বুঝতে পারলাম না।

বললাম—না, আমি সে জন্য তোর কাছে আসিনি, তুই কী মনে করবি, সে জন্যেই এসেছিলাম।

মনে আছে সেদিন তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তার কাছ থেকে উপদেশ নিয়েই ফিরে এসেছিলাম। সত্যিই তো, কে বড় কে ছোট তা তো মুখ দেখে বিচার করতে নেই, শেষ দেখে বিচার করতে হয়। সুশান্ত তো শেষ পরীক্ষাতে আমাকে হারিয়ে দেবে। কিন্তু তাতে আমার লজ্জা নেই, কারণ সে আমার চেয়ে সব বিষয়েই বড়।

* * *

আজ এতোদিন পরে সেদিনকার সুশান্তর কথা ভাবতে গিয়ে কেবল অবাক হয়ে যাচ্ছি। আজ কোথায়ই বা সে, আর কোথায়ই বা আমি। আজ দুজনের মধ্যে অনেক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের ব্যবধান। আজ সুশান্তকে কেউই চেনে না। আজ আমাকে সভা-সমিতিতে নিয়ে যাবার জন্যে কাড়াকাড়ি, আমাকে সম্বর্ধনা দেবার জন্যে হুড়োহুড়ি।

সুশান্তদের পৈতৃক বাড়ি ছিলো। পুরোন ভাঙা বাড়ি হলেও তাদের বাড়িভাড়া দিতে হতো না। একটা অংশে ভাড়াটে ছিলো, তার ভাড়া থেকেই তাদের সংসার চলে যেতো। সংসারে তারা কেবল দু'জন, সুশান্ত আর তার বুড়ি বিধবা মা। সেই মা জানতোও না ছেলে কতো বড় প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে, কতো বড় সম্ভাবনা নিয়ে সংসারে এসেছে।

এরপর থেকে সুশান্তর সঙ্গে আর আমার বেশি দেখা হতো না। আমি নতুন কলেজে ভর্তি হলাম। কলেজের নতুন বন্ধুবান্ধব নিয়ে মেতে উঠলাম। সুশান্তর কাছ থেকে আমি বলতে গেলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। কিন্তু প্রথম প্রথম আমার মন পড়ে থাকতো সুশান্তর দিকে। যখন একটু সময় পেতাম সুশান্তদের বাড়ি যেতাম। কিন্তু ও বাড়িতে থাকতো না। সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কোথায় থাকতো তা ওর মা জানতো না। সুশান্তর খবরা খবর সম্বন্ধে কেউই কিছু বলতে পারতো না।

অনেকদিন পরে একদিন কলেজ থেকে আসছি হঠাৎ দেখা হয়ে গেলো সুশান্তর সঙ্গে। দেখি মধু গুপ্ত লেনের ভেতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলেছে।

CALCUTTA

আমি পেছন থেকে চিৎকার করে ডাকলাম—সুশান্ত—সুশান্ত—সুশান্ত পেছন ফিরে আমাকে দেখতে পেয়ে বললে—তুই এখানে? বললাম—কলেজ থেকে ফিরছি, তুই এদিকে কোথায়?

সুশান্তর সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—আয়, আমার সঙ্গে আয়—বলে আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললো।

—তারপর আমাকে নিয়ে একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সেখানে গিয়ে ডাকলো—কাকীমা, ও কাকীমা—

ভেতর থেকে মেয়েলি গলার আওয়াজ এলো—কে? সুশান্ত?

সুশান্ত বললে—হ্যাঁ কাকীমা আমি—

দরজা খুলে যেতেই দেখলাম একজন মহিলা হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ ধবধবে ফর্সা শাড়ি, হাতে কানে সোনার গয়না। বললে—এ কে বাবা? একে তো চিনতে পারছি না?

সুশান্ত ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললে—এ আমার বন্ধু, এক সঙ্গে পড়েছি আমরা—

—এসো—এসো—

বলে মহিলাটি ভেতর দিকে চলতে লাগলো। আমরাও পেছন পেছন চলতে লাগলাম। ছোট এক তলার একখানি ভাড়াটে বাড়ি।

আমাদের দু'জনকে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বসালে। তারপর মহিলাটি কাকে ডাকতে লাগলো—পাখী ও পাখী—

ডাক শুনেই কোথা থেকে একটা মেয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে ঘরে ঢুকলো।

—ও মা সুশান্ত দা, তোমার এতো দেরি হলো? আমি তখন থেকে পা ধুয়ে বসে আছি।

তারপর আমার দিকে নজর পড়াতে বললে—এ কাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছো সুশান্ত দা?

পাখীর মা বললে—তোরা বোস, আমি আসছি—

আমার যেন কেমন অস্বস্তি লাগছিলো। সেকেলে পুরোনো বাড়ি, চারিদিকে মোটা দেওয়াল। জানালা দুটো তারের জাল দিয়ে আঁটা। বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে যাতে চুরি না করতে পারে। মনে হলো দিনের বেলাতেও আলো না জ্বাললে এ ঘরে কিছু দেখা যায় না। ঘরময় জিনিস-পত্র ভর্তি। বাক্স তোরঙ্গ একটার ওপর একটা বসানো। তার ওপর শাড়ির পাড় দিয়ে তৈরী মেয়া টোপ দিয়ে ঢাকা। একদিকে খোঁয়াই খাট। খাটের ওপর আধ হাত পুরু গদি তার ওপর সাদা চাদর পাতা। বিছানার ওপর দুটো মাথার বালিশ দু'টো পাশ-বালিশ। দেওয়ালের কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো কার্পেটের ছবি—শিবলিঙ্গ। ছবির নিচে কার্পেটের ওপর লাল সুতো দিয়ে লেখা—'ওঁ শিবায় নমঃ'।

পাখী খিল্‌খিল করে কী বলছিলো, তা আমার কানে যায়নি। আমি এমনিতেই লাজুক মানুষ, ঘটনাচক্রে আরো আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম কি বিরাট পাখার তলায় বসেও ঘামছিলাম। আমার মনে হচ্ছিলো আমি কেন এখানে এলাম? এরা সুশান্তর কে? এরা সুশান্তর কী-রকম কাকীমা? এদের কথা কই তো কখনও সুশান্তর মুখে শুনিনি? ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হলো বিধবা। মাথার সিঁথিতে সিঁদুর নেই। কিন্তু মুখে পান, হাতে-কানে সোনার গয়না, পোশাক-পরিচ্ছদ সবই সধবার মতো।

আর এ পাখীই বা এমন কোরে সুশান্তর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলো কী করে?

যখন খেয়াল হলো তখন দেখি সুশান্ত পকেট থেকে একটা টাকা বার করে পাখীকে দিলে।

বললে—তোমাদের ঝিকে দিয়ে এক টাকার মিষ্টি নিয়ে এসো, পাখী, নির্বিবাদে টাকাটা নিয়ে উঠলো।

সুশান্ত আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কী মিষ্টি খেতে তোর ভালো লাগে?

আমি বললাম—আমি এখন কিছু খাবো না, আমার জন্য কিছু আনতে হবে না—

সুশান্ত বললে—দূর, তা কি হয়! কিছু তোকে খেতেই হবে, নইলে কাকীমা রাগ করবে—

তারপর আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই পাখীকে বললে—তুমি যাও, চারটে রসগোল্লা আর চারটে সন্দেশ নিয়ে এসো—

তারপরে কী ভেবে নিয়ে আবার একটা এক টাকার নোট বার করলো। তারপর সে টাকাটা পাখীর হাতে দিয়ে বললে—তুমি এ টাকাটাও নাও, আটটা রসগোল্লা আটটা সন্দেশ নিয়ে এসো, তুমিও খাবে কাকীমাও খাবে—

আর কোন কথা না বলে ছুটো টাকা নিয়ে পাখী বাইরে চলে গেলো।

এতোক্ষণে যেন একটু স্বস্তি পেলাম। যেন আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

আমি সুশান্তকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম—এরা তোর কে?

সুশান্ত কিন্তু তার আগেই আমার দিকে ফিরে হেসে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কী রকম দেখলি?

সুশান্তর মুখের চেহারা দেখে আমার অবাক লাগলো। তার হাসিটার স্পষ্ট অর্থ বুঝতে পারলাম না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—এরা কে, তোর কে হয়?

সুশান্ত নির্বিকার ভাবে উত্তর দিলে—আমার কাকীমা, আমার কাকীমা—

আর এই মেয়েটা? পাখী?

সুশান্ত বললে—পাখী তো আমার বোন—

আমি অবাক হয়ে বললাম—কিন্তু তোর তো কাকা কাকীমা কখনও ছিলো না! তোর খুড়তুতো বোনের কথাও কই কখনও তোর মুখ থেকে শুনিনি।

সুশান্ত হাসলো।

বললে—আরে দূর একি আমার সাত কুলের কাকীমা? ঐ হলো পাড়াতুতো কাকীমা—

বললাম—এদের সঙ্গে আলাপ কী করে হলো?

সুশান্ত বললে—এমনি ঘুরতে ঘুরতে। গল্প লেখার জন্য সারা কলকাতাই ঘুরে বেড়াই, যেখানে যা মাল-মশলা পাই খাতায় নোট করে রাখি, পরে লেখার কাজে লাগবে।

বললাম—এর জন্যে তোর তো টাকাও খরচ করতে হয় দেখছি।

—তা' টাকা খরচ না করলে চলে? বিনা পয়সায় কী মাল পাওয়া যায়?

আমি বললাম—এদের সংসারে আর কে?

সুশান্ত বললে—আর কে থাকবে, এই মা আর মেয়ে।

—এই পাখীর বাবা নেই ?

সুশান্ত বললে—বাবা কাকা জ্যাঠা মেসো কেউই নেই।

আমি অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—তা এদের সংসার চলে কী করে ?

সুশান্ত বললে—এই আমিই চালাই। আর তা ছাড়া কলকাতার আরো অনেক ইয়াংম্যান আছে, তারা চালায়—

—বাড়ি ভাড়া কত ?

সুশান্ত বললে—ত্রিশ টাকা। তারমধ্যে আমি ওয়ান থার্ড দিই—

আমি বললাম—আর এই সংসার খরচ ধোপা, চাল, ডাল, তেল, লেখাপড়ার খরচ ?

সুশান্ত বললে—মোটমাট এদের জন্যে মাসে আমার ত্রিশ চল্লিশ টাকা খরচ পড়ে। কিন্তু তাতে আমার লোকসান নেই। আমি এই সমস্ত লোকসানটা বই লিখে উশুল করে নেবো।

বললাম—এই পাখীর বিয়েও দিতে হবে তোকে ?

সুশান্ত বললে—দূর, বিয়ে দিলে তো আমার গল্প গাছে উঠবে। বিয়ে যদ্দিন না হয় তদ্দিনই তো আমার খোরাক। বিয়ে হয়ে গেলে তো আমি এ বাড়িতে আসা বন্ধ করে দেবো, তখন আর গপ্পো হবে না।

আমি চুপ করে রইলাম। সুশান্তকে দেখে মনে মনে খুব শ্রদ্ধা হলো। গল্পের প্লটের জন্যে এই রকম পরিশ্রম না করলে কী আর শরৎ চাটুজ্যের মতন লেখক হওয়া যায় ?

হঠাৎ দু' কাপ চা দিয়ে কাকীমা ঘরে ঢুকলো।

বললে—চা খেয়ে নাও তোমরা, ওদিকে আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে—

সুশান্ত বললে—মাসে মিষ্টি খেয়ে চা খাবো কাকীমা, পাখীকে মিষ্টি আনতে বলেছি—

কাকীমা বললে—ওমা মিষ্টি, তা হলে আর সিনেমায় কখন এরা যাবে ?

সুশান্ত বললে—এ আজকে প্রথম এলো, সেজন্য একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে দিলাম।

এমন সময় হঠাৎ পাখী ঘরে ঢুকলো।

কাকীমা বললে—এতো ?

সুশান্ত রেকাবিটা পাখীর হাত থেকে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিলে। বললে—তোর ভাগে চারটে মিষ্টি তুলে নে, এটা নিজের বাড়ি মনে করবি, এই কাকীমা আমার নিজের কাকীমার মতো—

তারপর নিজের মিষ্টি ক'টা হাতে তুলে নিয়ে রেকাবিটা কাকীমার দিকে এগিয়ে দিলে।

বললে—এটা নাও কাকীমা।

কাকীমা রেকাবিটা হাতে নিয়ে বললে—আমাদের আবার মিষ্টি কেন আনালে বাবা, এর টাকাটা হাতে থাকলে কাজে লাগতো—

সুশান্ত রসগোল্লা চিবোতে চিবোতে বললে—কেন, পেটে খেলে কী নষ্ট করা হলো ?

কাকীমা বললে—কালকে রেশন তোলার তারিখ, তা জানো—

—কিন্তু, সেদিন যে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে গেলাম ?

কাকীমা বললে—ওমা সাড়ে সাত টাকা রেশন আনতে বেরিয়ে গেছে বাকী থাকে আড়াই টাকা, তার থেকে দেড় টাকা গেছে পাখীর সিল্কের শাড়ীটা কাচাতে বাকী থাকে এক টাকা, সেই এক টাকার মধ্যে আজকে পাঁচশো আলু এনেছি, বাকী রয়েছে আট আনা সেইটেই এখন পুঁজি—সুশান্ত আমার দিকে চেয়ে বললে—দেখেছিস্ কী রকম হিসেবী কাকীমা আমার—

ততোক্ষণে পাখী দু' গেলাস জল দিয়ে গেছে। সুশান্ত জলটা খেয়ে হাত ধুয়ে আবার পকেট থেকে ব্যাগ বার করলে। ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে কাকীমার হাতে দিয়ে বললে—এ মাসে আমার অনেক টাকা বেরিয়ে গেছে—

কাকীমা নোটটা ভাঁজ করে আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বললে—তুমি পুরো খরচে ছেলে-বাবা, একটু দেখে শুনে খরচ না করলে আজকালকার দিনে চলবে কী

করে? এই সেদিন মাসেই তো ওকে এক জোড়া জুতো কিনে দিয়েছো, আবার এ মাসে শাড়ী কেনার কী দরকার ছিলো? ও তোমার মতো অবুঝ হয়েছে, কোথেকে টাকা আসে তাতো ও জানে না, ভেবেছে তোমার বোধ হয় টাকার গাছ আছে—

কথাগুলো বলে কাকীমা খালি কাপ প্লেট নিয়ে ভেতরে চলে গেলো।

সুশান্ত পাখীকে বললে—কী হলো? কাকীমা কেন ক্ষেপে গেলো হঠাৎ।

পাখী বললে—মা তো বরাবর ক্ষেপেই থাকে তুমি ওদিকে মাথা ঘামিও না, চলো বেরুই—

আমিও সুশান্তর সঙ্গে রাস্তায় বেরোলাম।

পেছন থেকে কাকীমা ছুটে এলো—কী বাবা বেরোচ্ছ? আজ রাত্রিতে তোমরা খাবে নাকি এখানে?

সুশান্ত বললে—না—আজ বাইরেই খেয়ে নেবো—

বাইরে এসে সুশান্ত হঠাৎ আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—তোর কাছে এই টাকা ক'টা রাখতো—

বলে কয়েকটা টাকা আমার হাতে গুঁজে দিলে। গুনে দেখি পাঁচটা একটাকার নোট।

সুশান্ত বললে—তোর কাছে আর কিছু আছে?

বললাম—টাকা দুয়েকের মতো আছে—

সুশান্ত বললে—চল, ওতেই হয়ে যাবে—

ততোক্ষণে পাখী পেছন থেকে আমাদের সঙ্গে এসে মিললো। চারদিকে চেয়ে দেখলাম মধু গুপ্ত লেনের বাসিন্দারা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখছে। আমার লজ্জা করতে লাগলো। মনে হলো ওরা যেন আমাকেও এদের দলের একজন বলে ধরে নিয়েছে। ভেবেছে আর সকলের মতো আমিও এই মেয়েটার পেছনে টাকা খরচ করতে এ-বাড়িতে জুটেছি।

তাড়াতাড়ি সুশান্তদের এড়াবার জন্যে বললাম—আমি তাহলে চলি ভাই—

সুশান্ত আমার হাতটা খপ্ করে ধরে ফেলেছে। বললে—সে কীরে, কোথায় যাবি? তোর কোন কাজ আছে?

—না কাজ তেমন কিছু নেই—

—তবে? চল—

পাখী বললে—চলুন না, আপনার আপত্তি কিসে?

ওদের পীড়াপিড়িতে ওদের সঙ্গেই চলতে লাগলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় যাবি তোরা?

সুশান্ত বললে—এমনি বেড়াচ্ছি, যে দিকে দু'চোখ যায় দুজনে—

পাখী বললে—চলো না নিউ-মার্কেটে যাই—

সুশান্ত বললে—নিউ-মার্কেট আজ বন্ধ—

—বন্ধ? কেন?

সুশান্ত বললে—একে জিজ্ঞেস করো না, ওদের ষ্ট্রাইক্ চলছে।

তারপর আমার দিকে ফিরে চুপি চুপি আমার গা-টিপতে লাগলো। বললে—কীরে, তুই বল না, ওদের ষ্ট্রাইক্ চলছে না?

নিউ মার্কেটে ষ্ট্রাইক্ চলছে কী না তা আজ জানতুম না। নিউ-মার্কেটে আমার তেমন নিয়মিত গতিবিধিও নেই। আমি পহরতলীতে থাকি, কলেজে যাই, আর বাড়ি ফিরে এসে বই-খাতা নিয়ে পড়তে লিখতে বসি। আমি গরীবের ছেলে। নিউ মার্কেটের খবর রাখার দরকারও হয় না আমার। আমি পাড়ার বাজারেই বাজার করতে অভ্যস্ত। কিন্তু সুশান্তকে আমার গা-টিপতে দেখে কেমন যেন সন্দেহ হলো। মনে হলো আমি সুশান্তর কথায় সায় দিই এইটেই সুশান্ত চায়।

সুশান্ত বললে—কীরে, তুই তো জানিস নিউ-মার্কেটের ষ্ট্রাইক্ চলছে?

পাখী বললে—তার চেয়ে চলো সুশান্তদা, হাতিবাগানের বাজারে যাই, ভেতরে খুব ভালো ভালো দোকান আছে—

—ওরে বাবা—

যেন সাপ দেখে লাফিয়ে উঠেছে সুশান্ত? বললে—ওরে বাবা, হাতিবাগানের মার্কেটে গেলে দম আটকে মারা যাবো—

বাজারের সেরা খাটি সরিষার তৈল
আপনার কি চাই ?

তা হ লে

আজই অবিলম্বে যোগাযোগ করুন

বাংলাদেশের
অন্যতম শ্রেষ্ঠ খাঁটি সরিষার তৈল প্রতিষ্ঠান

ত্রিদ্বীপ অয়েল মিলস

১২, অরবিন্দ সরণী, কলিকাতা-৫

ফোন : ৫০-২০১

পাখী বললে—তা'হলে কোথায় যাবে?

সুশান্ত আমার দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁরে তুই বল্ এখন কোথায় যাওয়া যায়?

বলে আবার আমার গা-টিপতে লাগলো।

আমি ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়ে বললাম—তার চেয়ে চল না, ঐকা পার্কে গিয়ে ঘাসের ওপর বসে গল্প করি—

পাখী আমার দিকে চেয়ে বললে—ওমা, আপনিও সুশান্তদার মতো কবি নাকি?

সুশান্ত আমার হয়ে উত্তর দিলে—আরে হ্যাঁ, কবি না হলে আমার বন্ধু হয়, এককালে আমার মতো ওর লেখাও কাগজে ছাপা হবে।

আমি কিছু উত্তর দিলাম না। পাখীও আর কিছু বললে না। আমি লিখি বলে পাখী যে আমাকে বেশী শ্রদ্ধা করলে তাও মনে হলো না।

তাড়াতাড়ি সামনে একটা বাস আসতেই সুশান্ত তাতে টপ্ করে উঠে পড়লো। পাখী আর আমি তখন বাইরে দাঁড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি। কে আগে নামতে-উঠতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলছে। পাছে হারিয়ে যায় তাই পাখী একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আমার হাতটা জাপটে ধরলে। ঠেলাঠেলির বিরাম নেই। হঠাৎ ভেতর থেকে সুশান্তর গলার আওয়াজ এলো—কই রে, চলে আয়—

শেষকালে কোন উপায় না পেয়ে ঠেলে-ঠুলে পাখীকে বাসের পা-দানীর ওপর তুলে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমিও লাফিয়ে উঠে পড়লাম। ততোক্ষণে বাস ছেড়ে দিয়েছে।

সুশান্ত বললে—কীরে, বাসে ওঠবার টেকনিক্ জানিস না! এখুনি তো এ্যাক্সিডেণ্ড হয়ে যেতো।

পাখী সারা রাস্তা গজগজ করতে লাগলো। আমার দিকে চেয়ে বললে—দেখলেন তো আপনার বন্ধুর কাণ্ডটা? এ রকম করে হা ঘরেদের মতন ট্রামে-বাসে চড়া অভ্যেস নেই আমার—সবাই আমায় ট্যাক্সি করে চড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এই জন্যই তো আমি সুশান্তদার সঙ্গে বেরোতে চাই না—আমি আর এর উত্তরে কী বলবো! ভাবনাজারের মোড়ে এসে নামলুম সবাই। সেখান থেকে রেসবছু পার্ক। একটা নিরিবিলি কোণ দেখে তিনজনে বসলাম।

সুশান্ত বললে—দেখছো, কী রকম নিরিবিলি জায়গা কাম্ এ্যাণ্ড কোয়েএট্—এখানে এলে হেল্থ্ ভালো হয়ে যায়, এমন ফ্রেশ্ এয়ার—

পাখী বললে—ফ্রেশ্ এয়ার খেয়ে আর ছাই হবে, যারা বুড়ো তারা ফ্রেশ্ এয়ার খাবে, আমাদের নিউ-মার্কেটই ভালো—

সুশান্ত বললে—নিউমার্কেট ভালো হবেই তোমার কাছে, সেখানে যে রঙ দেখানো যায়, সেখানে যে শাড়ি গয়না খোঁপা দেখানো যায়—

পাখী আমার দিকে চেয়ে বললে, আচ্ছা বলুন তো কেউ যদি না-ই দেখলো তো শাড়ি গয়নার দরকারটা কী?

সুশান্ত বললে—কেন, আমরা তোমাকে দেখবো আর তুমি আমাদের দেখবে?

—আজকে সন্ধ্যেটাই মাটি!

সুশান্ত বললে—অমনদিন তো মাটি হয় না, আজকে একটা সন্ধ্যে মাটি হলোই বা—

পাখী বললে—তার চেয়ে চলো কোন রেষ্টুরেন্টে ঢুকি, তুমি তো মাকে বলেই এসে আজ বাইরে খেয়ে নেবে।

সুশান্ত বললে—এরই মধ্যে তোমার খিদে পেয়ে গেলো? এই তো সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়ালে। কীরে তোর খিদে পেয়েছে?

সুশান্ত আমার দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করলে—আমি বললাম, না—

—ঐ দেখো, ওর খিদে পায়নি, আমারও খিদে পায়নি! আমার আসবার দিনে তুমি কী সকাল থেকে উপোষ করে থাকো?

মনে আছে সেদিন বাধ্য হয়েই সুশান্ত আমাদের দু' জনকে নিয়ে একটা রেষ্টুরেন্টের ঘেরা ঘরের মধ্যে ঢুকেছিলো। আমি বুঝতে পারছিলাম সুশান্ত বেশী টাকা খরচ করতে চাইছিলো না, আর পাখীও সুশান্তর

টাকা খরচ করতে চাইছিলো।

সুশান্ত আমাকে জিজ্ঞেস করলে—তুই কী খাবিরে?

বললাম—আমার খিদে নেই।

সুশান্ত বললে—আমারও খিদে নেই—

তারপরে পাখীর দিকে চেয়ে বললে—তুমি কী খাবে—

ভেতরের বয়টা অর্ডার নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলো।

পাখী বললে—যা-হোক কিছু আনুক—একটা ফাউল কাটলেট, আর একটা ব্রেই কাটলেট হাও, সঙ্গে স্যালাড দেবে। তা তোমরা সবাই কিছু খেলে না আমার একলা খেতে বড় খারাপ লাগছে—

সুশান্ত বললে—তার সঙ্গে ফাউল কারি নাও না।

পাখী বললে—দুটো কাটলেট নিলাম তার ওপর আবার কারি?

সুশান্ত বললে—তাতে কী হয়েছে তোমার খিদে পেয়েছে খেয়ে নাও—একটা পুডিংও নাও--

তারপরে বয়টার দিকে চেয়ে বললে—যাও একটা ফাউল কাটলেট, একটা ব্রেস্ট কাটলেট, এক ডিস ফাউল-কারি—আর একটা পুডিং নিয়ে এসো।

তখনও জানি না সুশান্ত আমাকে বিপদে ফেলবার জন্যেই এতোকাণ্ড করছে। কিন্তু আমি তো জানিই আমি কেউই নই। সুশান্ত আমার বন্ধু, সে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে বলেই এসেছি। আমার কোন দায় নেই, দায়িত্বও নেই। বলতে গেলে সুশান্তই এই নাটের গুরু, আর পাখী হলো লক্ষ্য। আমি কিছুই নই, এমন কি উপলক্ষ মাত্রও নই। আমি একান্তরে অবান্তর, অবান্তর এবং অপ্রয়োজনীয়। আমি শুধু বাড়তির ভাগ হয়ে এদের মধ্যে উপস্থিত আছি। আর কিছুই নয়।

পাখী খাচ্ছে। আমরা দু'জন সাক্ষীগোপাল হয়ে গল্প করছি।

পাখী বললে—ফাউল কারিটা খুব ভালো করেছে সুশান্ত দা, বেশ টেষ্ট হয়েছে। তোমরা একটুও খেলে না কেন?

আমাদের সামনে বসে খেতে হয়তো পাখীর লজ্জা হচ্ছিলো। কিন্তু পেটে খিদে থাকলে লজ্জা করে কোন লাভ নেই তাই সে গোগ্রাসে খেয়ে চলছিলো।

কারির সঙ্গে দু'পিস পাউরুটি দিয়ে গিয়েছিলো বয়টা। সেটা শেষ করার পরই ফাউল কাটলেট দিয়ে গেলো।

পাখীর খাওয়া দেখে আমার মনে হচ্ছিলো সে যেন অনেকদিন ধরে ভালো করে পেটভরে খেতে পায়নি। ফাউলকারির প্লেটটা পাশে সরিয়ে দিয়ে ফাউল-কাটলেটের প্লেটটা সামনে টেনে নিলে। তারপর শিশি বোতল থেকে খানিকটা মাস্টার্ড পাউডার ছড়িয়ে দিয়ে দু'হাতে কাঁটাচামচে ধরলে।

সুশান্ত বললে—ওই যাঃ—একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম, বাগবাজারে একজনের সঙ্গে আমার দেখা করার কথা ছিলো, আমি এখনি একবার সেখান থেকে ঘুরে আসছি—

বলে উঠে দাঁড়ালো।

সুশান্তর কথা শুনে আমরা দু'জনেই অবাক হয়ে গেছি। পাখী আর আমি দু'জনেই একসঙ্গে বললাম—সে কী এখুনই না গেলে নয়?

সুশান্ত বললে—না, খুব জরুরী কাজ—

জিজ্ঞেস করলাম—কতো দেরী হবে?

সুশান্ত বললে—এই যাবো আর আসবো, আধ ঘন্টার বেশী লাগবে না—

অগত্যা সুশান্ত চলে গেলো। আমি আর কী করবো, বসে রইলাম।

পাখী খাচ্ছিলো তখনও। বললে—দেখলেন তো আপনার বন্ধুর কাণ্ড, এখন কখন আসে কে জানে!

আমি বললাম—হয়তো কোন কাজ পড়েছে—

পাখী বললে—হাজার কাজ থাকলেই বা, এটাও কী একটা কাজ নয়?

—লেখক মানুষ, কাজে ভুল হয়ে যায় বোধ হয়—

পাখী তখন ব্রেস্ট কাটলেট খাওয়া শেষ করে পুডিংটা নিয়ে খেতে আরম্ভ করেছে।

বললে—আপনিও বুঝি লেখেন?

আমি বললাম—না, আমি ওর সঙ্গে এক স্কুলে

পড়েছি, আমি ওর মতো লিখতে পারি না।

পাখী বললে—লিখে কী হয়? লেখা কেউ পড়ে?

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—আপনি রবিঠাকুরের বই পড়েন নি?

পাখী বললে—না লিখতে পড়তে আমার ভালো লাগে না।

আমি বললাম—আপনি কারোর বই-ই পড়েন নি? শরৎ চ্যাটুজ্জের বই?

—পড়তে চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু ভালো লাগেনি। আমার সিনেমা দেখতে ভালো লাগে, কেবল মনে হয় যদি সিনেমায় নামতে পারতুম তো ভালো হতো। আপনার সঙ্গে কোন সিনেমা ডাইরেক্টারের সঙ্গে আলাপ আছে?

বললাম—না!

—সুশান্তদার সঙ্গে অনেকের আলাপ আছে। সুশান্তদা একদিন আমায় স্টুডিওতে নিয়ে গিয়েছিলো। সুশান্তদা সিনেমার গল্প লিখবে বলেছে—

বললাম—জানেন, ও সবে না যাওয়াই ভালো। ও-লাইনে ছেলে-মেয়েদের চরিত্র ভালো থাকে না—

পাখী বললে—কিন্তু টাকা? সিনেমায় যারা নামে তারা কতো টাকা উপায় করে বলুন তো? কতো নাম হয়, চারদিকে কতো ছবি ছাপা হয়, গাড়ি বাড়ি সব হয় সিনেমায় নামলে—

বললাম—তোমার মা রাজী হবে?

পাখী বললে—টাকা পেলে কে না রাজী হয়! আমি বেশী টাকা উপায় করলে মা'রই তো লাভ। আমার টাকাতো মা'ও ভোগ করবে।

আমি বললাম—সুশান্তর কী এ ব্যাপারে মত আছে?

পাখী বললে—কেন থাকবে না? আজকাল কতো মেয়ে অফিসে, ব্যাঙ্কে, সোর্ট অফিসে চাকরী করছে, আর সিনেমাতেই কাজ করলে দোষ হয়ে গেলো?

আমি বললাম—তা সিনেমার চাকরী আর অফিসের চাকরী কী এক?

পাখী বললে—এক তো নয়ই। অফিসের চাকরীতে মাস গেলে একশো-দেড়শো টাকা মাইনে, আর সিনেমাতে হাজার হাজার টাকা। আর সিনেমা যদি খারাপ হবে তো সিনেমা-জগতের ছবি অত বড় বড় কোরে খবরের কাগজে ছাপা হয় কেন? তাদের পাবলিসিটিই বা দেওয়া হয় কেন?

এ কথার যার কী উত্তর দেবো তাই চুপ করে রইলাম। সত্যিই তো পাখীর কথার অকাট্য যুক্তি। আমি অনেক কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বলতে পারলাম না। সিনেমাতে যাদের নাম-ধাম হয়েছে তাদের কথাই পাখী জানে। কিন্তু কতো অসংখ্য ছেলে মেয়ে অতল তলে তলিয়ে গেছে তার হিসেব তো পাখী রাখে না। আর শুধু পাখী কেন, জীবন-যুদ্ধে যারা হেরে যায় তাদের কথা মনে রাখবার সময় কারই বা আছে।

হঠাৎ বয়টা ঢুকে খালি প্লেটগুলো তুলে নিয়ে চলে গেলো। যাবার সময় জিজ্ঞেস করলে—কফি দেবো?

পাখী বললে—হ্যাঁ—

আমি বললাম—শুধু এক কাপ দিও, আমি খাবো না—

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম সুশান্ত চলে যাবার পর দেড় ঘণ্টা কেটে গেছে অর্থাৎ তখন সাড়ে আটটা। অথচ পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবে বলেছিলো! শেষকালে সুশান্ত কী আমাকে বিপদে ফেলবে!

বয়টা এসে এক কাপ কফি পাখীর সামনে রেখে দিয়ে গেলো।

পাখী কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। আমি এক মনে তার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম। সুশান্তর এতো-গুলো টাকা মেয়েটা খেয়ে নষ্ট করলে দেখে আমার খুব রাগ হতে লাগলো। সুশান্ত এমন কিছু বড় লোক নয়। বাড়ি ভাড়ার আয়, আর লিখে যদি কিছু আয় করে থাকে তো তার ওপর ভরসা করে পাখীর মতো এমন হাতি পুষতে গেলো কেন। এ মেয়ে তো সুশান্তকে গ্রাস করে ফেলবে। একেবারে

গোগ্রাসে গিলে ফেলবে।

হঠাৎ বয়টা ঘরে ঢুকলো।

বললে—আর কিছু নেবেন আপনারা?

কথাটা সে আমাকে লক্ষ্য করেই বললে। আমি পাখীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আর কিছু নেবে নাকি।

পাখী বয়টার দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলে—আর কী কী আছে তোমাদের?

বয়টা লম্বা লিষ্ট বলে গেলো মুখে—আরো অনেক জিনিস আছে, ডেভিল, ডিমের কারি, মটন্ দো-পেয়াজি, স্টেকি মাছের ফ্রাই, মটন্ কারি.....

বয়টা যত খাবারের লম্বা তালিকা দিয়ে যাচ্ছে, আর ততোই আমার হৃৎকম্প হচ্ছে। ভাবলাম পাখী কী আরো খাবে নাকি! সব টাকাতো সুশান্তকেই শোধ করতে হবে সুশান্তর কাছে যদি এতো টাকা না থাকে?

পাখী বললে—সিনেমাতে নামলে দেখবেন আমি রাতারাতি নাম করে ফেলবো। আমি এতো সিনেমা দেখি তো, কিন্তু কারো এ্যাকটিং আমার ভাল লাগে না, আমার এক-একবার মনে হয় কাকে বলে এ্যাকটিং তা আমি ওদের দেখিয়ে দিই। বললাম—আমি ঠিক ওসব ব্যাপার জানি না, সিনেমা সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নেই—

পাখী অবাক হয়ে গেলো—সেকী? আপনি সিনেমা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না? আপনি দেখছি মানুষ খুন করতে পারেন।

বললাম—যা জানি না সেটা অকপটে আমি স্বীকার করলাম—

পাখী বললে—না-জানাটা আপনার অপরাধ এ যুগে এ পৃথিবীতে বেঁচে থেকে যে সিনেমা দেখে না, বা যে সিনেমা সম্বন্ধে জানে না তার আত্মহত্যা করা উচিত। সিনেমাতো একটা বড় আর্ট, এ যুগের সেই আর্টের খবর রাখবো না সেটা উচিত নয় গল্প উপন্যাস লিখে লেখকরা কটা টাকা পায় শুনি?

বললাম—টাকা দিয়ে বিচার করবেন না—

পাখী বললে—টাকা দিয়ে বিচার করবো না তো কী দিয়ে বিচার করবো? এই যে এখানে বসে খাচ্ছি, এও তো সেই টাকা! টাকা না হলে কী খাওয়া পরা বাড়ী গাড়ি কিছু চলে? টাকা ফেলুন, দেখবেন সব কিছু আপনার হাতের মুঠোয়! মা যে মেয়েকে ভালোবাসে তাও ঐ টাকার জন্যে। গরীব ছেলেমেয়েকে গরীব বাপ মা'রাও দেখতে পারে না। স্নেহ প্রেম ভালোবাসা মায়া দয়া মমতা, যে-সব জিনিসের কথা আপনাদের সব উপন্যাসে বড় করে আহির করেন সে-সবই তো টাকা বুঝি।

আমি বললাম—আমি তো এখনও লেখক হতে পারিনি—

পাখী বললে—আপনার কথা বলছি না আপনার ঐ সুশান্তদার কথা বলছি, আর যে সব বড় বড় লেখক জন্মেছেন বঙ্কিম চাটুর্জে, শরৎ চাটুর্জে, রবি ঠাকুর, সবাই ভাঁওতা দিয়ে গেছেন, আসল কথা কেউই লেখেন নি—

জিজ্ঞেস করলাম আসল কথাটা কী—

পাখী বললে—এক কথায় টাকা। টাকা কী করে কামাতে হয়, কী করে খরচ করতে হয়, টাকা না থাকলে যে সব মিথ্যে হয়ে যায়, এ কথাটা কেউই লিখলো না—

আবার জিজ্ঞেস করলাম—টাকা দিয়ে যে সব কেনা যায় না এ কথা কী আপনি বিশ্বাস করেন না—

পাখী বললে—এই যে এতো চপ কাটলেট এখানে খেলাম এর দাম না দিলে কী আমাদের ছাড়বে, সব টাকা গুণে গুণে আদায় করবে আমি মিষ্টি মুখে ওদের দিকে চেয়ে হাসলেও আমাদের রেহাই দেবে না।

বললাম—কিন্তু প্রেম!

পাখী বললে—আপনি আমাকে টাকা, বেশি টাকা দিন, আমি সুশান্তদাকে ছেড়ে দিয়ে আপনার সঙ্গে প্রেম করবো?

বললাম—কিন্তু ধরুণ, একজন কোটিপতি কুষ্ঠরোগী লোকার যদি আপনাকে বিয়ে করতে চায় আপনি রাজী হবেন বিয়ে করতে?

পাখী বললে—কুষ্ঠ রোগ তো দূরের কথা এক কোটি টাকা কেউ যদি ফেলে আমি যেখরকেও বিয়ে করতে রাজী আছি—

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার মুখ দিয়ে একটাও কথা বেরুলো না, আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। পাখীর তখন দো পেয়াজী খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিলো। আমার মনে হচ্ছিলো যেন একটা কেউটে সাপের সঙ্গে এক ঘরে বন্দী হয়ে আছি। আমার আরোও মনে হচ্ছিলো যদি কোনদিন বড় হয়ে উপন্যাস লিখতে পারি তো এই পাখীদের নিয়েই লিখবো। এই ধারা টাকার জন্যে সব রকম নীচতা, হীনতা আগ্রহ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। মনে আছে সেই ওই বয়সেই 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর বীজ পোতা হয়ে গিয়েছিলো আমার মনের ভেতরে। ভেবেছিলাম যদি ভবিষ্যতে কোন দিন গল্প-উপন্যাস লেখবার ক্ষমতা হয় তো সেদিন সেই সমাজের বিরুদ্ধেই লিখবো যে-সমাজের মানুষ ঐ পাখী।

পাখী বললে—সুশান্তদাকে তাই আমি বলি ওই সব ফালতু গল্প লিখে লাভ কী, তার চেয়ে সিনেমার গল্প লিখলে অনেক বেশী টাকা হয়। গল্প লিখলে যেখানে আপনারা পাবেন একশো টাকা, সেখানে সিনেমার গল্প লিখলে কম করেও পাবেন দশ হাজার টাকা—এখন কোনটা ভালো, আর কোনটা মন্দ সেটা আপনারা বিচার করুন—এতো সোজা হিসেব, এ-হিসেব জানতে গেলে লেখাপড়া জানার দরকার হয় না।

জিজ্ঞেস করলাম—তা সুশান্ত আপনার কথায় কী বলে?

পাখী বললে—সুশান্তদা আমার কথা শোনে না সুশান্তদা বলে সে সাহিত্যিক হবে। আমি আর কী বলবো, যে নিজের ভালো বুঝবে না তাকে আমি তার ভালো বোঝাবো কী করে? আমি তো বলি একটা এমন গল্প লিখতে যাতে সুশান্তদারও বাড়ি হবে আর আমি তাতে হিরোয়িনের পার্ট করে গাড়ি বাড়ি সমাজ সব কিছু পাবো। কিন্তু আমার কথা শুনলে তবে তো! সুশান্তদা যতো সব বাজে কথা লিখছে। সুশান্তদা বলে—একটা সাহিত্যিকের লাইফ তিনশো চারশো বছর, আর একটা ফিল্ম-স্টারের লাইফ দশ বছর, আমি শুনে হাসি—

হঠাৎ খেয়াল হলো, কই, সুশান্ত তো এখনও আসছে না! আধ ঘণ্টার মধ্যে আসবে বলে চলে গিয়েছিলো, এখন তিন ঘণ্টা কেটে গেলো এখনো তো তার আসবার নাম নেই। আমার হৃৎকম্প শুরু হলো। যদি সুশান্ত না আসে? সুশান্ত না এলে যে কী বিপদে পড়বো তা ভাবতেও আমার ভয় হলো।

বয়টা এসে বিল দিয়ে গেলো।

বিলটা হাতে নিয়ে দেখি দাম হয়েছে তের টাকা আট আনা!

আমার তো চক্ষু স্থির।

পাখীর দিকে চেয়ে দেখলাম, সে তখন খাওয়ার পরিতৃপ্তিতে অবসন্ন; আমি কী করবো বুঝতে পারলাম না। শরীরের সমস্ত রক্ত সোঁ সোঁ করে মাথা লক্ষ্য করে ওপরে উঠতে লাগলো। সুশান্তকে কাছে পেলে হয়তো তখন তাকে খুন করে ফেলতাম। মনের রাগ বাইরে প্রকাশ করতে পাচ্ছি না। একবার মনে হলো পাখীকে এই অবস্থায় এখানে একলা ফেলে রেখে আমি পালিয়ে যাই। তখন আর আমার দায়িত্ব থাকবে না। পাখী মুখকিলে পড়ুক, পাখীকে ওরা পুলিশে ধরিয়ে দিক, ওরা জেলে পুরুক, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কোথাকার কে পাখী, কোন্ এক মধুগুপ্ত লেনের অখ্যাত অজ্ঞাত মেয়ে, তার সম্মান অসম্মানের দায় আমি বইবার কে? সে তো আমার কেউ নয়। সুশান্তর সে যে-ই হোক, তার ভালো মন্দর দায় আমার হাতে যাবে কেন?

মনে আছে সেদিন আমার যে রকম মানসিক অবস্থা হয়েছিলো, সে-রকম আগে আর কখনও হয়নি। আমার কাছে ছিলো মাত্র ছ'টাকা, আর বিল হয়েছিলো সাড়ে তের টাকা। বাকি সাড়ে সাত টাকা আমি কোথা থেকে দেবো! হোটেলের মালিক আমাকেও চেনে না, পাখীকেও চেনে না, তারা বাকী রাখবেই বা কেন?

পাখী হঠাৎ বললে—সুশান্তদার কথা ভাবছেন ?

বললাম—না, তা ঠিক নয়, মানে·····

পাখী বললে—আমার মনে হয় সুশান্তদা বোধহয় কোথাও আটকে গেছে। আড্ডাবাজ মানুষ তো, হয়তো আড্ডার জমে আমাদের কথা ভুলেই গেছে—

বললাম—কিন্তু সে যে বলেছিলে' কুড়ি মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছে ?

পাখী বললে—ওইটেই তো মানুষটার দোষ। চোখের আড়ালে গেলেই সব ভুলে যায়। যেখানে বসবে সেখানে একেবারে শেকড় গজিয়ে যাবে—

আমি বললাম—কিন্তু তার একটা দায়িত্ব থাকা উচিত। আমাদের এখানে বসিয়ে রেখে সে চলে গেলো, অথচ আপনিও তো আমাকে ভালো করে চেনেন না—

পাখী বললে তাতে কী হয়েছে, এখন থেকে আপনার সঙ্গে চেনা হলো। এখন থেকে আপনি আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসবেন। এমনই করেই তো সুশান্তদার সঙ্গে একদিন হঠাৎ আলাপ হয়েছিলো—

বললাম—আপনার কাছে কিছু টাকা আছে ?

—টাকা ? কেন ?

বললাম—হ্যাঁ, এই দেখুন না সাড়ে তেরো টাকা বিল হয়েছে খাবারের অথচ···

পাখী বললে—আপনার কাছে টাকা নেই ?

আমি বললাম—আছে, কিন্তু মাত্র ছ'টাকা, বাকী সাড়ে সাত টাকা কম পড়ছে—

পাখী বললে—তা'হলে কী করবেন ? আমার কাছে তো কিছু নেই !

বললাম—এরা তো আমাদের চেনে না এরা কী বাকী রাখবে—

পাখী কী ভাবতে লাগলো কে জানে! মনে হলো সে যেন নির্বিকার, তার যেন কোন দায়িত্ব নেই।

আমি বললাম—এখন কী করি বলুন তো?

পাখী বললে—আর একটু বসুন না। দেখুন না, সুশান্তদা হয়তো আসতেও পারে—

আমি বললাম—এলে এতোক্ষণ এসে যেতো, এখন আর আসবে না—

পাখী বললে—তাহলে চলুন বাড়ি চলে যাই—

বললাম—কিন্তু এদের কী বলবো?

পাখী বললে—থাক থাক, টাকা সঙ্গে না থাকলে লোকে কী করবে—

আমি এখন নিজের মনেই মতলোব আঁটছি। আমি পুরুষ মানুষ, আমাকেই চেপে ধরবে। পাখী তো মেয়ে মানুষ, মেয়েরা তো আমাদের সমাজে নির্দোষ।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। বললাম—চলুন, যা হয় করা যাবে—

বলে পর্দা সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম—পাখীও আমার সঙ্গে পেছন পেছন বেরিয়ে এলো।

হোটেলের মালিক একটা ক্যাশবাক্সো নিয়ে দরজার পাশে বসেছিলো। তার কাছে গিয়ে সব বুঝিয়ে বললাম। ভদ্রলোককে সুশান্তর কথাও বললাম। সুশান্ত যে আমাদের বসিয়ে খেতে দিয়ে একটা জরুরী কাজে বেরিয়ে গেছে, আর তার কাছেই যে সব টাকা-কড়ি আছে, তাও সবিনয়ে পরিষ্কার করে বোঝালাম। এই অবস্থায় আমার কাছে যে মাত্র ছ'টাকা আছে তাও পকেট উপুড় করে দেখিয়ে দিলাম। তারপর যখন সব বলা শেষ হয়ে গেলো তখন তার করুণার ওপর আত্ম-সমর্পণ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ভদ্রলোক সব শুনলো। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—দেখুন, আমি দান-ছত্র করবার জন্যে এ হোটেল খুলিনি, আমি ব্যবসা করতে বসেছি। টাকা যখন নেই, তখন এতো খেতে গেলেন কেন? টাকা পকেটে না নিয়ে এ-বাজারে কেউ এতো খায়? আমার কিলো পাঁচসিকে, পেঁয়াজ ষাট, বেগুন একটাকা পঞ্চাশ, মানকচু, যে মানকচু খেলে মুখ কুটকুট করে, যে মানকচু ছোট বেলায় পুকুরে ফেলে দিয়েছি, সেই মানকচুর এখন কিলো এক টাকা। আপনি কি বলতে চান আমি আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলার টাকা দিয়ে আপনাদের খাওয়াবো? আপনি কি আমার পুষ্যি-পুত্তুর না আমার জামাই? টাকা থাকে তো দিন আর না থাকে তো আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি।

আমি বললাম—অত বাজে কথা শুনতে চাই না, আমরাও ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ে, বিপদে পড়ে আপনার কাছে সাহায্য চাইছি। ছ'টা টাকা এখন আপনি নিন, বাকী সাড়ে সাত টাকা আমি কাল ভোর বেলায় এসে দিয়ে যাবো—

ভদ্রলোক বললে—দেখুন, ভদ্দরলোকের ছেলেমেয়ে আমার অনেক দেখা আছে। আমি যেদিন থেকে এই রাস্তায় হোটেল খুলেছি, সেইদিন থেকেই ভদ্দরলোকের ছেলেমেয়েদের দেখে আসছি। ভদ্দরলোক কী কারোর গায়ে লেখা থাকে? ব্যবহারে ভদ্দরলোক প্রমাণ হয়—

তারপর একটু থেমে বললে—দেখুন, ঐ চেয়ে দেখুন—

আমি তার নির্দেশ মতো একটা দেওয়ালের দিকে চেয়ে দেখলাম। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখতে পেলাম না। রঙ-চটা দেওয়াল, একটা আলমারী রয়েছে। তার মাথার দিকে কয়েকটা ফ্রেমে বাঁধানো মেয়েমানুষের আধলাংকটা ছবি টাঙানো রয়েছে। আর তারই এক পাশে একটা ফ্রেমে বাঁধানো কাগজের ওপর বড় বড় করে লাল-নীল অক্ষরে লেখা রয়েছে—'আজ নগদ কাল ধার'।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলে—দেখেছেন?

আমি কিছু উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম।

ভদ্রলোক আবার বলতে লাগলেন—এই আপনাদের মতন ভদ্দরলোকের ছেলেমেয়েদের জ্বালায় অস্থির হয়েই নগদ সাড়ে চার টাকা দিয়ে ঐটে টাঙাতে হয়েছে—

ইতিমধ্যে ভদ্রলোকের চিৎকারে বেশ ভীড় জমে গিয়েছিলো। তারা দোকানে খেতে এসে একটা বাড়তি পোরাক যেন পেয়ে গেছে, এমনি তাদের মুখের চেহারা।

বিশেষ করে আমার সঙ্গে একজন মহিলা আছে বলে ঘটনার গুরুত্ব যেন তাদের কাছে দ্বিগুণ বেড়ে গেছে।

একজন খদ্দের মন্তব্য করলে—আপনারই দোষ মশাই, হোটেলওয়ালাতো ঠিকই বলছে। সঙ্গে মেয়েছেলে নিয়ে খেতে এসেছেন আর ট্যাক্স গড়ের মাঠ—বলিহারী আপনাদের সাহস মশাই, মেয়েছেলে একটু বেশী খায় তা জানেন না—

আর একজন আর এককোণ থেকে ফুট কাটলো—না মশাই, আপনি ছাড়বেন না ওদের, মেয়েছেলে নিয়ে ফূর্তি করলে হিসেবের বালাই থাকে না, চেপে ধরুন—

আর একজন বলে উঠলো—গায়ে তো ওনার গহনা রয়েছে, একগাছা চুড়ি খুলে দিলেই হয়—

এতোক্ষণে পাখীর মুখ দিয়ে কথা বেরুল—সে বলে উঠলো—না না এ সোনার চুড়ি নয়, এ সিল্টী সোনা, বিশ্বাস করুন, আমার গায়ে একটা গহনাও সোনার নয়।

বলতে বলতে পাখীর মুখখানা কান্নায় ভারী হয়ে উঠলো।

আমি তাকে থামিয়ে দিলাম। দোকানদার ভদ্রলোককে বললাম—ঠিক আছে,—আমার আঙুলের এই আংটীটা আপনার কাছে জমা রাখুন, আমি কালকে এসে সাড়ে তের টাকা দিয়ে এটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবো—

দোকানদার ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলো।

আমি বললাম—আপনি কিছু ভাববেন না এটা সোনার আংটী, সেকালের সোনা, আমার বাবার হাতের আংটী এটা, বাবা মারা যাবার পর থেকে আমি পরছি, আপনি নির্ভয়ে এটা নিতে পারেন। সন্দেহ হলে আপনি কাউকে দিয়ে যাচাই করে নিন, আমি ততোক্ষণ বসে আছি।

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ ভেবে বললেন—আমি তা বলছি না মশাই আমি ভাবছি আপনার কথা, আপনার যে সাড়ে তেরো টাকা গচ্ছা গেলো, আপনি তো কিছুই খেলেন না, আমি সব শুনেছি বয়টার কাছে—

বললাম—সে আপনি যা-ই শুনুন কোন ভয় নেই, এটা অন্তত পক্ষে ষাট টাকা দাম হবেই—

ভদ্রলোক আংটীটা নিয়ে ড্রয়ার খুলে তার ভেতরে রেখে দিয়ে আবার ড্রয়ারটা বন্ধ করে দিলে।

পাখীকে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে নেমেছি, হঠাৎ ভদ্রলোক পেছন থেকে ডাকলে—ও মশাই শুনুন—

আমি কাছে যেতেই ভদ্রলোক চুপি চুপি বললে—আপনি কার পাল্লায় পড়েছেন? আপনাকে দেখে তো মনে হয় লেখা পড়া জানেন—

আমি বললাম—কেন?

ভদ্রলোক বললে—কিছু মনে করবেন না, আপনার ভালোর জন্যেই বলছি, ওসব মেয়েছেলেকে নিয়ে কেন ঘুরছেন?

আমি বললাম—ওরা কী রকম মেয়েছেলে তা আপনি কী করে জানলেন?

ভদ্রলোক বললে—আমি চিনি না ওকে? ওতো আমার দোকানে হামেসা আসে, এক-একদিন এক-এক জনের সঙ্গে আসে আর তাদের ঘাড় মটকায়। আপনি অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে গেছেন সাড়ে তেরো টাকার ওপর দিয়ে রেহাই পেয়ে গেছেন আপনার ভাগ্য ভালো।

তারপর একটু থেমে বললে—এখন তো আবার ওকে ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে, তা সঙ্গে টাকা আছে তো?

বললাম—ছ'টা টাকা আছে—

ভদ্রলোক বললে—ও ছ'টাকায় কিছু হবে না, যে-মেয়ের পাল্লায় পড়েছেন, ওর কাছে ছ'টাকা নস্যি, এই আরো দশ টাকার একটা নোট দিচ্ছি এটা সঙ্গে রাখুন, নইলে আবার কোন বিপদে পড়বেন—

বলে ভদ্রলোক একটা দশ টাকার নোট ড্রয়ার থেকে বার করে আমার হাতে গুঁজে দিলে।

তারপর আবার বললে—যান, কালকে এসে সাড়ে তেইশ টাকা দিয়ে যাবেন, আর আংটীটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন—

আমি আর কি বলবো, সমস্ত অপমানটা মুখ বুঁজে

হজম করে আবার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। পাখীকে বললাম—চলো।

পাখী চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলে—দোকানদার কী বলছিলো?

আমি সে-প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললাম—ও কিছু না, চলো বাস-ষ্টপে গিয়ে দাঁড়াই।

পাখী বললে—এতো খেয়েছি, বাসে চড়তে আর ইচ্ছে করছে না, তার চেয়ে বরং একটা ট্যাক্সি নিন—

এ সব বহুদিন আগেকার কথা। তখনও সুশান্তর বেশী নাম হয়নি। সবে এখানে ওখানে লেখা ছাপা হচ্ছে। দু'এক জায়গা থেকে লেখার তাগাদা আসে বাড়িতে বসে বসে সে উপন্যাসটা সবে ধরেছিলো। নাম দিয়েছিলো 'হলুদ ফুল'। পরে 'হলুদ ফুল' বইখানা অনেকে পড়েছে। অনেকে প্রশংসা করেছে। বই বিক্রিও হয়েছে অনেক। কিন্তু যখন সে-বই প্রথম লেখা সুরু হয়েছে তখন থেকে আমি জানি। সুশান্ত কোথায় লিখতো, কখন লিখতো, কী লিখতো, তা কেউ জানতে পারতো না। বাড়িতে গিয়ে তার খোঁজ করতে গিয়ে অনেক সময়ে তাকে না পেয়ে ফিরে এসেছি।

সুশান্তর মা অনেক দুঃখু করতো।

বলতো—সুশান্ত তো আজ তিন দিন বাড়ি আসেনি বাবা আমি কেবল ভেবে ভেবে মরছি—

আমি বলতাম—আপনি কিছু ভাববেন না মাসিমা সে ঠিক বাড়ি আসবে। সে নিশ্চয়ই কোথাও কারো বাড়িতে বসে লিখতে লিখতে লেখার মধ্যে ডুবে গেছে, বাড়ির কথা আর মনে নেই—

মাসিমা বলতো—বাড়িতে বসে লিখলে তার কী হয়? নিজের বাড়ি রয়েছে, এখানেই বসে সে লিখতে পারে। যারা লেখে তারা কী সবাই পরের বাড়িতে বসে লেখে? আর যাদের বাড়িতে বসে লেখে তারাই বা কী রকম লোক? আমি যে এখানে ভেবে ভেবে মরছি তা তো তাদের বোঝা উচিত! আর তারাও তো একটা খবর দিয়ে যেতে পারে এখানে এসে।

মনে আছে সেই মেয়েটাকে মধুগুপ্ত লেনে ট্যাক্সি করে পৌঁছে দেবার পর আর সুশান্তর সঙ্গে দেখা হয়নি।

আমার এখন এ্যকজামিন চলছে। সে সময়ে একদিন বাড়ি ফিরছি, হঠাৎ দেখা সুশান্তর সঙ্গে।

অনেক দিন পরে দেখা। দেখলাম সুশান্তর চেহারাটা আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে। লম্বা ঝুল পাঞ্জাবী পরেছে একটা। পায়ে স্যাণ্ডেল।

আমাকে দেখেই এক মুখ হাসলো।

বললে—কী-রে তুই কোথায় থাকিস, তোর দেখাই পাওয়া যায় না।

আমি বললাম—কলেজের পড়া নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। এখন এ্যকজামিন চলছে—

সুশান্ত বললে—লিখছিস টিখছিস—?

বললাম—তোর বাড়িতে গিয়ে অনেকদিন ফিরে এসেছি, তুই কোথায় থাকিস আজকাল?

সুশান্ত বললে—থাকার কী কোন ঠিক আছে! যখন যেখানে থাকি সেখানটাই তখন ঘর বাড়ি করে ফেলি—

জিজ্ঞেস করলাম—মধুগুপ্ত লেনে আর গিয়েছিলি?

আমি তো ভেবেছিলাম এখন মধুগুপ্ত লেনে গিয়ে খোঁজ করবো।

সুশান্ত বললে—আরে দূর, সেই পাখীর কথা বলছিস তো? সেখানে আর যাবার সময় পাই না, লেখার কাজ বড্ড বেড়ে গেছে—

আমি বললাম—কিন্তু সেদিন তুই আমায় খুব বিপদে ফেলেছিলি ভাই, আমার কাছে টাকা ছিলো না, তুই আসবি বলে আর এলি না, শেষকালে আমাকে আমার এই সোনার আংটীটা জমা রেখে চলে আসতে হয়েছিলো।

সুশান্ত জিজ্ঞেস করলে কেন, কতো টাকার বিল হয়েছিলো?

আমি বললাম—সাড়ে তেরো টাকা—আমার কাছে তো মাত্র ছ'টাকা ছিলো, তোর চার টাকা, আমার দু' টাকা—

সুশান্ত বললে—ইস্, তুই একটা আস্তো বোকা, তুই কেটে পড়তে পারলি না?

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—কেটে

পড়বো? মেয়েটাকে একলা রেখে কেটে পড়বো কী করে?

সুশান্ত বললে—আমিতো ঐ জন্যেই কেটে পড়লুম—

আমি বললাম—কিন্তু ওরা কি মনে করলে?

সুশান্ত বললে—মনে করলে তো বয়ে গেলো। কলকাতায় এমন হাজার হাজার ফ্যামিলি আছে, আবার হাজার হাজার ছেলেও আছে আমাদের মতন। ওদের সংসার চলবার কোন অসুবিধে হবে না, ওদের পেছনে অনেক সুশান্তরা আছে, তারাই ওদের সংসার চালিয়ে নেবে—

আমি বললাম—তোর সঙ্গে ওদের পরে আর দেখা হয়েছিলো?

সুশান্ত বললে—দূর, ওদের সঙ্গে দেখা করে আর কী হবে? আমার তো উন্নতি হয়ে গেছে—

কী কাজ?

সুশান্ত বললে—ওই সব ফ্যামিলিদের নিয়ে একটা উপন্যাস লেখবার ইচ্ছে ছিলো, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেছে, ওদের নিয়েই একখানা উপন্যাস লিখছি, নাম দিয়েছি 'হলুদ ফুল'। 'হলুদ ফুল' দেখেছিস?

বললাম—না—

সুশান্ত বললে—'হলুদ ফুল' যখন ফোটে, তখন সেই ক্ষেতের দিকে চাওয়া যায় না, বড় মর্মান্তিক সে দৃশ্য—

বললাম—সব ফুলই তো তাই—

সুশান্ত বললে—'হলুদ ফুল' তো টবের ফুল নয় বন জঙ্গলের ফুল। ক্ষেতের ফুল। টবের ফুল একটা শুকালে আর একটা ফোটে, কিন্তু ক্ষেতের ফুল এক সঙ্গে সব শুকিয়ে যায় ওরা ঝাঁক বেঁধে ফোটে, ঝাঁক বেঁধে শুকোয়। পাখীরা কলকাতা সহরে ঝাঁক বেঁধে জন্মাচ্ছে আবার একদিন ঝাঁক বেঁধেই মরবে। তাই মরবার আগে দেখে নিলুম ভালো করে। যে কটা টাকা ওদের জন্যে খরচ করেছি তা হাজার গুণ উসুল করে ছেড়ে দেবো—

তা সত্যিই হলো শেষ পর্যন্ত। দু'এক বছর পরে যখন 'হলুদ ফুল' বই হয়ে বাজারে বেরোলো তখন সুশান্তর নাম হু হু করে বাজারে ছড়িয়ে পড়লো হাজার হাজার বিক্রি হতে লাগলো। চারদিকে সুশান্তর ডাক পড়তে লাগলো সভা সমিতিতে। লোকে বলতে লাগলো—শরৎচন্দ্রের পর এই প্রথম একজন প্রথম শ্রেণীর লেখক জন্মেছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে সুশান্তর নিন্দেও ছড়াতে লাগলো কাগজে কাগজে সমালোচনা বেরোতে লাগলো:—

ঠিক এই সময়ে সুশান্ত একদিন হঠাৎ আমার বাড়িতে এসে হাজির।

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম—কী-রে কী খবর?

সুশান্ত বললে—বিয়ে করছি, যাস্ কিন্তু—

বলে একখানা নেমন্তন্নর ছাপানো চিঠি দিলে, আমি চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগলাম। দেখলাম কোন এক ৺ অমুক চন্দ্র অমুকের সপ্তম কন্যা কুমারী অমুক বালা দেবীর সঙ্গে শুভ বিবাহের ব্যবস্থা হয়েছে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এ কে?

সুশান্ত বললে— এ একেবারে খাঁটী স্বদেশী সম্বন্ধের মেয়ে। লেখা-পড়া, শিক্ষা-দীক্ষা কোন কিছুর বালাই নেই। একেবারে পুরোপুরি গেরস্থ-পোষা মেয়ে, ও-সব সিনেমা-দেখা, হোটেলে খাওয়া মেয়ে নয়, এ শাশুড়িকে ভক্তি করবে, স্বামীকে সেবা করবে, এ সেই জাতের মেয়ে। ভেবে দেখলাম সবাই সত্যিকারের বৌ হতে পারে গৃহিণী হতে পারে, এরা প্রেম-ফ্রেম বোঝে না, মোটামুটি খেতে পরতে দিলেই এদের খুশী করা যায়—

বললাম—তুই লেখক মানুষ, তোর বই পড়তে পারবে?

সুশান্ত বললে—বললুম তো সে-বালাই নেই—ওসব পড়লেই যতো ঝঞ্ঝাট।

আমি চুপ করে রইলাম। আমার কী আর বলবার ছিলো! সুশান্তর যে এমন বিচিত্র মতিগতি হবে তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি বুঝতে পারলুম না এ রকম বিয়ে সে কেন করতে গেলো। ওই বৌকে নিয়ে সুশান্ত কী লোক-সমাজে বেরুতে পারবে? যে বৌ

লেখা পড়া জানে না, তার সঙ্গে বাইরের লোকদের পরিচয়ই বা করে দেবে কী করে? আর চেহারা। চেহারাও তো তেমন ভালো নয়। সেটাতো বিয়ের দিনই লক্ষ্য করলাম। কোন এক অজ পাড়াগাঁয়ের। সংসার দেখে মনে হলো সেই সংসারের বোঝাল কাঁধে নিয়ে মেয়েটা মানুষ হয়েছে। ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে সুরু করে কাপড় সেদ্ধ পর্যন্ত করতে হয়েছে ওই মেয়েকে। ওর চেহারা দেখে অন্ততঃ তাই-ই মনে হয়।

কিন্তু মনে হলো এ মেয়ের সঙ্গে সুশান্তর বিয়ের সম্বন্ধ কে করলে? সুশান্ত কী নিজেই পছন্দ করেছে এই মেয়েকে? কী জানি!

নিজের মনের প্রশ্ন মনেই রয়ে গেলো। ভাবলাম সুশান্ত যা ভালো বুঝেছে তাই করেছে আমার ও নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কী?

বৌভাতের দিন অনেক অতিথি অভ্যাগত এসেছিলো। সুশান্তর লেখক বন্ধুরা, বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকরা, সবাই সুশান্তর গুণগ্রাহী, সবাই-ই সুশান্তর কাছে উপকৃত। বিয়ের নেমন্তন্নে এসে সবাই কৃতার্থ। সুশান্তকে কৃতার্থ করে তারা নিজেরাও যেন কৃতার্থ হয়েছে।

আমি শেষ পর্যন্ত থেকে বাড়ি চলে এসেছিলাম। তারপরে নিজের কাজে অনেক দিন আর সুশান্তর কোন খবর রাখতে পারিনি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে বুঝতে পেরেছিলাম সুশান্তর একটা নতুন বই বেরুচ্ছে। 'হলুদ ফুল' বেরোবার পরেই পাঠক-পাঠিকারা তার পরের বই পড়বার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলো, তা আমি জানতাম। সুতরাং বুঝতে পেরেছিলাম সুশান্ত বিয়ের পর তার বৌ নিয়ে যতোটা না হোক, বই নিয়ে বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। সেই জন্যে আমিও আর ওর বাড়িতে গিয়ে ওকে বিরক্ত করতে চাইনি।

দু' একদিন বাড়ি ফেরার পথে সুশান্তর খবর নিতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তার দেখা পাইনি। অত রাত্তিরেও তাকে বাড়িতে না দেখে একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিলুম।

সুশান্তর বিধবা মা আমার কাছে দুঃখু করলেন।

বললেন—তার তো ফিরতে দেরী হবে বাবা—

আমি বললাম—এখন তো সুশান্ত বিয়ে করেছে, সংসার করেছে, এখনও দেরী করে বাড়ি ফেরে?

সুশান্তর মা বললেন—সে যে কোথায় যায়, কী করে, কী ভাবে, কিছুই বুঝতে পারি না। বৌমা নতুন মানুষ, সাহস করে বলতে পারে না ওকে—

আমি সান্ত্বনা দিলাম।

বললাম—আমার সঙ্গেও দেখা হয়নি অনেকদিন তার। সেই জন্যেই দেখা করতে এলাম। ভাবলাম রাত্তিরে তো বাড়ি আসবেই—সুশান্তর মা বললেন—রাত্তিরে বাড়ি আসে, কিন্তু এক একদিন তার বাড়ি ফিরতে মাঝরাতও হয়ে যায়—

আমি জিজ্ঞেস করলাম—আপনি জিজ্ঞেস করেননি সে কোথায় যায়? অত রাত পর্যন্ত কী করে?

সুশান্তর মা বললেন—জিজ্ঞেস করেছিলাম, ও বলে খুব কাজে ব্যস্ত, তার কিসের যে কাজ, কী রাজ-কার্য তা তো বুঝতে পারি না।

আমি বললাম—আপনার বৌমাকে বলে না? বৌমাকে দিয়ে না-হয় জিজ্ঞেস করাবেন—

সুশান্তর মা বললেন—বৌমা জিজ্ঞেস করবে?—তাহলেই হয়েছে! বৌমা বলে ওর সামনে ভয়েই কথা বলতে পারে না—

আমি বললাম—কেন কথা বলতে ভয় কিসের?

সুশান্তর মা বললেন—ভয় করবে না? ওর সঙ্গে কথা বলতে আমারই ভয় হয়। ও বাইরে তোমাদের কাছে এক রকম, আর বাড়ির ভেতরে অন্যরকম। ছোট বেলা থেকেই তো আমি ওকে ভয় করে এসেছি, এখন বড় হয়েছে, এখন তো সাহেব হয়ে গিয়েছে—

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—নিজের নানান্ কাজে ও ব্যস্ত থাকে, নানান ভাবনা মাথায় থাকে, তাই হয়তো আপনার সঙ্গে কথা বলবার সময় পায় না।

সুশান্তর মা বললেন—ভাবনা কার নেই বলতো বাবা? ওর যখন সাত বছর বয়েস, তখন কর্ত্তা মারা গেলেন। একলা বিধবা মানুষ তখন থেকে ওকে চোখে চোখে

রেখে মানুষ করেছি, ওতে কি সেসব জানে না—

বললাম—ও কথা বলবেননা আপনি, সুশান্ত সব বোঝে, সব জানে শুধু কথা বলে না, তাই। আর তাছাড়া জানেন তো লেখক মানুষ, সব সময়েই লেখার কথা মাথার মধ্যে ঘুর ঘুর করে—সুশান্তর মা বললে—লিখে কী হয়? লিখে কখনও কেউ টাকা পয়সা উপায় করতে পেরেছে? সে সব বড় লোকদের ছেলেদেরই শোভায়। ও একটা চাকরী জোগাড় করে নিলে পারে। যেমন আর সবাই করে। কেন, চাকরী করে কী কেউ লেখে না? চাকরী করলে একটু তবু নিয়ম-কানুন থাকে। সকাল দশটায় অফিস যাও, আর সন্ধ্যে ছ'টার সময় বাড়ি ফিরে এসো। বাড়ি ফিরে এসে মুখ হাত পা ধুয়ে জল-টল খেয়ে বিশ্রাম করো। বাড়ির ছেলে দু'দণ্ড বাড়িতে থাকো। মা'র সঙ্গে দুটো কথা বলো, বৌএর সঙ্গে দুটো কথা বলো, সংসার কেমন করে চলছে সেদিকে চেয়ে দেখো, তবে তো দশ জন ভালো বলবে! চিরকাল তো শ্বশুর বাড়িতে বাসের বাড়িতে তাইই দেখে এসেছি। তা নয়, দিনরাত বাড়ির বাইরে থাকা, এ কি ভালো লাগে?

এক নাগাড়ে সেদিন সুশান্তর মা অনেক দুঃখু করেছিলেন। আমিও যথারীতি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম। কিন্তু মনে মনে সুশান্তর বিরুদ্ধে কখনও উত্তেজিত হইনি। আমি জানতাম যারা লেখক হতে এ সংসারে জন্মেছে কিংবা যারা এ সংসারে জন্মে লেখক হয়েছে, তারা কখনও এ সংসারের বাঁধা পথে চলেনি।

কিন্তু অবাক হয়েছিলাম অন্য জিনিস ভেবে। সুশান্ত তো অনেক বিচক্ষণ ছেলে। সে তো অনেক ভেবে চিন্তেই এই বৌ ঘরে এনেছে তাকে তো ভুল বোঝার অবকাশ নেই সুশান্তর। তবে কেন এমন করছে সে!

কিন্তু সুশান্তকে নিয়ে অত ভাববার সময়ও তখন আমার ছিলো না। লেখা পড়ার পর্ব শেষ করে তখন আমি চাকরী-জীবনের জোয়াল কাঁধে নিয়েছি। আমারও ব্যক্তিগত দায় দায়িত্ব বেড়েছে। সুশান্তর ব্যাপারে মাথা ঘামানোর মত অবসর স্বভাবতোই আমার কমে গেছে।

কিন্তু তারই মধ্যে ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেলো সুশান্তর সঙ্গে।

বলতে গেলে আমি নিজে থেকেই তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম।

খবরের কাগজে এক কোণে একটা ছোট খবরে জানতে পারলাম যে খিদিরপুরে একটা সভায় সুশান্ত পরের দিন সভাপতিত্ব করবে।

পরের দিন ঠিকানা খুঁজে সভায় গিয়ে হাজির হলাম ঠিক সময়ে। দেখলাম সুশান্তর অনেক ভক্ত-মণ্ডলী তার বক্তৃতা শোনবার জন্যে সেখানে ভীড় করেছে।

আমাকে সুশান্ত দেখতে পায়নি। আসলে আমিই সুশান্তর সঙ্গে দেখা করিনি দূর থেকে তার বক্তৃতা শুনলাম। বড় বড় অনেক বাণী সে দিলে। অনেক চিন্তা অনেক জ্ঞান, অনেক অমূল্য অনুভূতির কথা সে সবিস্তারে বলে গেলো। তার ভক্ত-মণ্ডলী উদগ্রীব আগ্রহে তার বাণী শুনতে লাগলো, আর জীবনের অভিজ্ঞতা শুনতে লাগলো। তারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলো।

আমিও তার বক্তৃতা শুনে অভিভূত হয়ে গেলাম। ভাবলাম সুশান্ত অনেক শিখেছে, অনেক দেখেছে, অনেক ভুগেছে। অনেক দেখা শোনা আর সহ্য করার ফলেই সুশান্তর মনে সেই জীবন দর্শনের সাক্ষাৎ স্পর্শ লাভ হয়েছে।

যখন সভা শেষ হলো তখন আমার দেখা করার পালা।

অনেক ভক্তর ভীড় ঠেলে আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সুশান্ত আমাকে দেখেই বললে—তুই?

বললাম—তোর বক্তৃতা শুনতে এসেছি—তোর তো দেখাই পাওয়া যায় না।

সুশান্ত বললে—মোটেই সময় পাচ্ছি না ভাই—আর এক খানা বড় বইতে হাত দিয়েছি—

তারপর একটু থেমে বললে—এই দেখনা, এই সব ছেলেমেয়েরা কিছুতেই ছাড়ে না, কেবল আমাকে দিয়ে

মিটিং করায়—

আড়ালে নিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলাম—কী-রে, তোর খবর কী? তোর বাড়িতে অনেকবার গিয়েছিলাম, দেখা না পেয়ে ফিরে এসেছি। তুই কোথায় থাকিস?

সুশান্ত বললে—বড্ড ব্যস্ত আছি ভাই, মোটে সময় পাই না—

আমি বললাম—কীসে এতো ব্যস্ত?

সুশান্ত বললে—কাজের কী শেষ আছে তিনখানা বই বেরিয়েছে, আরো তিনখানার এ্যাডভান্স নিয়েছি পাবলিশারদের কাছ থেকে, কী যে করবো বুঝতে পারছি না। তার ওপর এই মিটিং আর সম্বর্ধনা নাগাড়ে চলেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু লিখিস্ কখন তুই? কোথায় বসে লিখিস? বাড়িতে তোর পাত্তাই পাওয়া যায় না—

সুশান্ত বললে—সেই কথাই তো বলছি, লেখবার মোটে সময় পাচ্ছি না। যখন যেখানে পারি বসে লিখেদিই। কখনও পাবলিশারদের দোকানে বসে, কখনও বা কারো বাড়িতে, এমনি করে চলছে—

আমি বললাম—কিন্তু ওরকম করে লিখলে তো তোর লেখা খারাপ হয়ে যাবে!

সুশান্ত বললে—খারাপ হয়ে যাবেই তো! এখন নামই আমার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতো নাম না হলে বোধহয় আরো ভালো লিখতে পারতুম—প্রথম বইটা নিরিবিলিতে বসে লিখেছিলাম বলে অতো ভালো হয়েছিলো।

বললাম—তা এখনও নিরিবিলিতে লিখলেই পারিস। এখন বিয়ে করেছিস, নিজের বাড়ি রয়েছে, বাড়ির একটা ঘরে খিল দিয়ে লিখলে কে আপত্তি করছে?

সুশান্ত বললে—সে আর হয় নারে, আর হয় না। ওই যে তোকে বললুম, নামই লেখকের সবচেয়ে বড় শত্রু। এখন একটা মাত্র উপায় আছে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কোন অজ পাড়াগাঁয়ের মধ্যে বাস করা—

বললাম—তা যাস না কেন—

সুশান্ত বললে—চলে গেলে জীবন দেখবো কী করে? জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে তো সাহিত্য করা যায় না। এই ভীড়ের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে, আবার ভীড়ের মধ্যে থেকেও ভীড় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে।

বললাম—তুই তো সব জানিস, তোকে আর কী শেখাবো—

সুশান্ত বললে—আমি নিজের কলেই নিজে ধরা পড়েছি। আমার গুণটাই আজকে আমার দোষ হয়ে গেলো।

কথার মধ্যেখানেই একটা মেয়ে আর একটা ছেলে এসে হাজির হলো।

বললে—চলুন সুশান্ত দা, চলুন অনেক দেরী হয়ে গেলো—

বলে—মেয়েটা সুশান্তর একটা হাত ধরে টানতে লাগলো।

—আমি তখনই বলেছিলুম এখানে এলে রাত আটটা বেজে যাবে। ওদিকে সমস্ত লোক আপনার জন্যে ওয়েট করছে। আটটায় টাইম দিয়েছিলুম খেতে খেতে প্রায় ন'টা বেজে যাবে।

আমি হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম ওদের দিকে। মেয়েটা ঝলমলে শাড়ি পরেছে। চুলবুলে কথাবার্তা। কথা বলতে বলতে দশবার সামনের শাড়িটা খসে পড়ে যাচ্ছে। যেন সুশান্তর সঙ্গে তাদের অনেক দিনের জানা শোনা। যেন আমার চেয়ে সুশান্তর ওপরে তাদেরই বেশী অধিকার।

মেয়েটা বললে—জান সুশান্ত দা আমি নিজের হাতে তোমার জন্যে কাটলেট রান্না করেছি—

ছেলেটা বললে—বুলি কী বলছিলো জানো সুশান্ত দা, তুমি তো শুধু হুইস্কির ব্যবস্থা করতে বলেছিলে, বুলি বলছিলো 'জীন'টা রাখা উচিত—

সুশান্ত বললে—তা রাখো যারা 'জিন' খেতে চায় তারা 'জিন' খাবে?

বুলি বললে—আমি ঠিক বলিনি সুশান্ত দা! আমি দেখেছি ককটেল পার্টিতে অনেকে 'হুইস্কি' খেতে চায় না—

ছেলেটা বললে—'জিন' যে কেন লোকে খায় আমি বুঝতে পারি না।

—তুমি খাও তো!

মেয়েটা চুলবুল করে উঠলো—বললে—দেখেছেন সুশান্ত দা, এ সেদিন সবে খেতে শিখলো এরমধ্যে ককটেল-এক্সপার্ট হয়ে গেছে! এর কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে। তুমি কটা ককটেল পার্টিতে গিয়েছো শুনি? আমি তোমার থেকে বেশী জানি। ছোটবেলা থেকে আমাদের বাড়িতে ককটেল পার্টির রেওয়াজ আছে।

আমি অবাক হয়ে এদের সবের কথাবার্তা শুনছিলাম। আর অবাক হয়ে ভাবছিলাম এরা কারা? সুশান্তর সঙ্গে এদের সম্পর্কটাই বা কী? সুশান্তর সঙ্গে এদের পরিচয় হলোই বা কি করে? এরাও কী সুশান্তর পাঠক-পাঠিকা? এই সব ককটেল পার্টিতে যাওয়া ছেলেমেয়েরাও কী বাংলা উপন্যাস পড়ে?

কে জানে!

আমি দাঁড়িয়ে আছি সে-কথা বোধহয় সুশান্ত ভুলেই গিয়েছিলো।

হঠাৎ আমাকে দেখেই যেন মনে পড়ে গেল তার!

আমার দিকে ফিরে বললে—আচ্ছা আসি রে—

বললাম—আবার কবে দেখা হচ্ছে তোর সঙ্গে?

সুশান্ত যেতে যেতে বললে—দেখছিস তো ব্যাপার, এর পর কখন দেখা হবে কথা দিতে পারছি না। যদি সম্ভব হয় তো যাবো তোর বাড়িতে একদিন—

সে দিন ওই পর্যন্তই।

মানুষের জীবনের এত রকম ফের দেখেছি যে আর কিছুতেই আজকাল অবাক হই না। অবাক হওয়া এখন প্রায় থেমে আসছে। আর বয়েসও তো হচ্ছে।

কিন্তু সেই প্রথম যৌবনে যা দেখতুম সমস্তই আমাকে অবাক করতো। সুশান্তর খ্যাতি আমার চোখের সামনেই হতো, আমার চোখের সামনেই···

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

সুশান্তর খ্যাতি তখন অগ্রতিদ্বন্দ্বী। যেখানেই যাই সেখানেই সুশান্তকে নিয়ে আলোচনা। সুশান্তর বই নিয়ে পাঠকদের মধ্যে তর্ক। সাহিত্য কী এবং কী নয়, সে-সম্বন্ধে সুশান্ত কী বলেছে তা নিয়ে হৈ-হৈ বেধে গেছে অনেকদিন অনেক বৈঠকখানায়।

একদল বলতো—সুশান্তবাবু সাহিত্যিক নয়—ও সব হচ্ছে সিজন্ ফ্লাওয়ার—

আর একদল বলতো—আমরাও বলে দিচ্ছি সুশান্ত বাবুর "হলুদ ফুল" এযুগের এপিক—

এ-সব কথা আমার কানে আসতো। আমি কিছু

উচ্চবাচ্য করতাম না। তার কারণ সুশান্ত আমার বন্ধু। বন্ধুর দোষ সম্বন্ধে আমার কিছু বলা শোভা পেত না। পক্ষে, বলাও শোভা পেত না, বিপক্ষে বলা শোভা পেত না। সবাই জানতো আমি যে-মতই না পোষণ করি সেটা হবে পক্ষপাত দুষ্ট।

কিন্তু আমার অবাক লাগতো সুশান্তর চাল-চলন দেখে।

প্রথমতঃ এত সময় পায় কোত্থেকে সে? এত মিটিং, এত ভক্ত, এত সম্বর্ধনা সবেও সে লিখছে কেমন করে?

সুশান্ত বলেছিল আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমি অবশ্য তার কথায় বিশ্বাস করিনি। কিন্তু সে যদি একবার আমাদের বাড়ি আসতো ভালো হোত। আমার একটু ভালো লাগতো।

তা হোক, মনে মনে ভাবতাম সে আরো বড় হোক, তার আরো অনেক নাম হোক, তার খ্যাতি আমারই আনন্দ, তার উন্নতিতে আমারই উন্নতি। তা ছাড়া আমার নিজেরও তখন অনেক সমস্যা ছিল। সেই সব সমস্যার ভিড় ঠেলে তার সঙ্গে দেখা করা আর সম্ভব হয়নি।

একদিন একটা কাণ্ড ঘটলো।

বাড়িতে এসে শুনলাম সুশান্তর মা নাকি আমাকে একবার তাঁর সাথে দেখা করতে বলেছেন। তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে।

তবু যেমন ভাবে ছিলাম, সেইভাবেই সুশান্তদের বাড়ি গেলাম।

বাড়ির সদর-দরজার কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। দরজা খুলে দিলেন একজন মহিলা। আমার অচেনা মুখ। সুশান্তর মা ছাড়া আর কে মহিলা হতে পারে?

—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

বললাম—আমি সুশান্তর বন্ধু, সুশান্তর মা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, সেই জন্যে এসেছি—

এতক্ষণে যেন একটু আভাসে চিনতে পারলাম।

বললাম—আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারছি না···

মহিলাটি বললে—আমি তাঁরই স্ত্রী—

—ও, নমস্কার।

আমি সসম্ভ্রমে তাকে নমস্কার করলাম।

সুশান্তর স্ত্রীও হাত দু'টো একটু উঠিয়ে বললে—নমস্কার—

বললাম—কী হয়েছে, বলুন তো?

সুশান্তর স্ত্রী বললে—আপনি বসুন, আমি মা'কে ডেকে দিচ্ছি—

বলে আমাকে বাইরের ঘরে বসতে বলে নিজে ভেতর দিকে চলে গেল।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম এ-চেহারা তো সে-চেহারা নয়। সেই বিয়ের সময় যাকে দেখেছিলাম। তখন সত্যিই বড় স্কুলিং মনে হয়েছিল সুশান্তর বউকে। বড় কালো মনে হয়েছিল। বিয়ের দিন বিয়ের কনেকে সাজিয়ে গুছিয়ে খুব সুন্দর করে পরিবেশন করা হয়। তা সবেও সেদিন নতুন-বৌয়ের মধ্যে সৌন্দর্যের এতটুকু আভাস পাইনি। কিন্তু এখন তো অন্যরকম দেখাচ্ছে। এখন যেন সুন্দর দেখাচ্ছে সুশান্তর বউকে।

খানিক পরেই সুশান্তর মা এসে হাজির হলেন।

আসতেই আমি প্রণাম করলাম।

বললাম—কেমন আছেন?

সুশান্তর মা বললেন—তোমাকে অনেকদিন ধরেই খুঁজছিলাম বাবা। ডাকবো-ডাকবো করেও ডাকা হয়নি। শেষে আর না-ডেকে পারলুম না। তোমাকে একটু কষ্ট দিলুম বাবা—

বললাম—না না, কষ্ট কীসের? বলুন না, আমার দ্বারা যদি আপনার কিছু উপকার হয়—

সুশান্তর মা বললেন—তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলি, আমার জানাশোনা আর কেউ তো নেই। তাই তোমাকে ডাকা—

বললাম—আপনি অকপটে আমাকে সব বলতে পারেন, আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি সব কিছু করবো। আপনি বলতে কোনও দ্বিধা করবেন না মা—

সুশান্তর মা বললেন—তবে শোন বাবা, সুশান্ত আজ এক মাস ধরে বাড়ি আসছে না—

বললাম—সে কী?

—হ্যাঁ বাবা, দুঃখের কথা আর কাকেই বা বলি। সে যে কোথায় আছে, কী করছে, তাও জানি না।

জিজ্ঞেস করলাম—তা'হলে আপনাদের চলছে কী করে?

সুশান্তর মা বললেন—ভগবান চালিয়ে দিচ্ছে। ওই বাড়িভাড়াটুকু আছে তাই দিয়েই কোনও রকমে কষ্টে-সৃষ্টে চলছে—

বললাম—কিন্তু সে আসছে না কেন?

—কে জানে বাবা, কেন আসছে না! ছেলের বিয়ে দিলুম তো ওই জন্যেই। ভাবলুম ছেলের বিয়ে দিলে হয়ত ছেলের বাড়িমুখো টান হবে। কিন্তু এ দেখছি উল্টো হোলো—। বিয়ের আগে বরং একটু-একটু বাড়িতে থাকতো, এখন একেবারে বাড়ি-ছাড়া হয়ে গেল।

—সুশান্ত তো নিজে মেয়ে পছন্দ করেই বিয়ে করেছিল?

সুশান্তর মা বললেন—আমি তো ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিইনি। ও নিজেই তো ওই মেয়েকে পছন্দ করেছে—

—আপনার বৌমা? আপনার বৌমা কী বলে?

সুশান্তর মা বললেন—বৌমার কথা থাক বাবা। সে-সব কথা না-বলাই ভালো—

বুঝলাম সংসারে কিছু গোলমাল আছে।

আমি আর সে-প্রসঙ্গ না তুলে অন্য কথা বললাম।

বললাম—সুশান্তর পাব্‌লিশারদের কাছে নিশ্চয়ই তার ঠিকানা আছে, সেখানে খোঁজ করেছেন?

সুশান্তর মা বললেন—আমি তাদের কাউকেই চিনি না বাবা, সে কী ছাই-ভস্ম লেখে, তাও জানি না। আমি তো লেখা-পড়া জানি না। শুনেছি শুধু সে কী সব বই লেখে—

বললাম—আচ্ছা, আমি তাদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানিয়ে যাবো—

সুশান্তর মা বললেন—তা'হলে আমার খুব উপকার হয় বাবা, আমি তা'হলে বেঁচে যাই—

আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম।

বললাম—আমি কালকেই তাদের কাছে যাবো, সেখান থেকে ঠিকানা জেনে এসে আপনাকে জানাবো—

সুশান্তর মা বললে—আমাকে ঠিকানা জানালে কী সুবিধে হবে বাবা, তার চেয়েই তুমিই বরং সেই ঠিকানায় গিয়ে দেখা কোরো। দেখা করে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো—

বললাম—তাই কথা রইল—

সুশান্তর মা বললেন—তাকে বোল বৌমা না-হয় দোষ করেছে, কিন্তু আমি কী দোষ করলাম? আমি তো ছোটবেলা থেকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি। আমি যদ্দিন আছি তদ্দিন এ-বাড়িতে থাকলে কী দোষ—

মায়ের প্রাণ! মা'র দুঃখ বুঝতে পারার মত বুদ্ধি সুশান্তর আছে। তাকে সে-কথা বোঝানো বাহুল্য!

কিন্তু সুশান্তর বউ-ই কী দোষ করেছে।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে চলে আসছিলাম।

সুশান্তর মা আমার সঙ্গে সদর দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

বললেন—আর একটা কথা শোন বাবা, বলি—

আমি ফিরে দাঁড়ালাম। বললাম—বলুন—

সুশান্তর মা গলা নিচু করলেন।

বললেন—ভেতরে বৌমা আছে আবার শুনতে পাবে, এখন বলিনি। তুমি বাবা ঘরের ছেলের মত। তোমাকে আর বলতে কী। কাউকে যেন বোল না বাবা, সুশান্ত এই বাড়িটা বিক্রী করে দিয়েছে—

—সে কী?

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

সুশান্তর মা ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন—চুপ চুপ, আর জোরে কথা বোল না বাবা, বৌমা আবার শুনতে পাবে। শুনলে আবার অনর্থ বাধাবে—

—আপনার বৌমা জানে না?

সুশান্তর মা বললেন—না বাবা, কেউই জানে না। কিন্তু আর বেশিদিন চাপা-রাখাও যাবে না খবরটা। বাড়িওয়ালার লোক এসে আমায় বলে গেছে—

আমি খবরটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। এ কী করলে সুশান্ত? এমন কেন করতে গেল? এ কি

টাকার অভাব, না ইচ্ছে করে কারো ওপর প্রতিশোধ নেওয়া ?

সত্যিই যদি টাকার অভাব হয় তো কেন হলো ? তার বই তো হাজার হাজার কপি বিক্রী হয়। টাকার অভাব কেন হতে যাবে ? এত টাকার তার কিসের দরকার ? আর প্রতিশোধ ? যদি নেবে তো কার ওপর প্রতিশোধ ?

কী জানি, আমি কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না।

আস্তে আস্তে বাইরের অন্ধকারে পা বাড়ালাম—

এমন করে যে আজ সুশান্তর কাহিনী আমাকেই লিখতে হবে তা ভাবিনি। অথচ যারা সেদিন সাহিত্যিক হিসেবে সুশান্তকে এ-যুগের শ্রেষ্ঠ এপিক-রাইটার বলে বড়-বড় ভারি-ভারি প্রবন্ধ লিখেছিল, তারা তো এখনও কলেজে পড়ায়, তারা তো এখনও সাহিত্য-সভায় গিয়ে সভাপতিত্ব করে ! তারা আজ সুশান্তর কথা একবারও বলে না কেন ? সুশান্তর নাম উল্লেখও করে না ?

সে কি লজ্জায় ?

কে জানে !

মনে আছে আমি পরের দিনই খুঁজে-খুঁজে সুশান্তর এক পাবলিশারের দোকানে গিয়েছিলাম।

পাবলিশার ভদ্রলোকের কী যেন সন্দেহ হলো।

জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কে ?

আমি আমার পরিচয় দিলাম।

তিনি বললেন—দেখুন, তাঁর নিষেধ আছে। তিনি আমাদের নিষেধ করে গেছেন, কাউকে ঠিকানা দিতে। আমাকে মাফ করবেন !

আমি চুপ করে রইলাম।

ভদ্রলোকের এবার বোধহয় দয়া হলো।

বললেন—দেখুন, উনি মীটিং-এ যান্ না আর—সবাই মীটিং-এ নিয়ে যায় বলে সুশান্তবাবু কাউকে ঠিকানা দিতে বারণ করেছেন—

বললাম—বিশ্বাস করুন, ওঁকে মীটিং-এ নিয়ে যাবার জন্যে আমি আসিনি—

—তাহলে ?

বললাম—আমি সুশান্তর বালাবন্ধু। আমার নিজের বিশেষ দরকারে ওর ঠিকানা চাইছি—

ভদ্রলোক—বাঙ্ক করবেন, ঠিকানা আমরা দিতে পারবো না, লোকে ওই সব বলে বড় বিরক্ত করে। ওঁর সত্যিই লেখার ক্ষতি হয়। এই সব মীটিং-এর চাপে আগের চেয়ে ওঁর লেখা অনেক কমে গেছে—তাতে ওঁরও ক্ষতি হয়, আমাদেরও ক্ষতি—

এর পর আর কোনও কথা বলা চলে না। হতাশ হয়ে চলে আসতে হলো। মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলাম এই ভেবে যে আমার ছোটবেলার বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও আমাকে ঠিকানা দিলে না ওর পাবলিশার।

সেদিন একটা কাজে জ্ঞানবাজারে গিয়েছিলাম। ফেরবার পথে মনে হলো মধুগুপ্ত লেনে নেমে গিয়ে সুশান্তর খবরটা নিলে হয়। তারা হয়ত সুশান্তর ঠিকানা দিলেও দিতে পারে !

বাস থেকে মেডিকেল কলেজের সামনে নেমে পড়লাম।

আমার চেনা রাস্তা। বহুদিন আগে একদিন সুশান্তর সঙ্গেই পার্বীদের বাড়িতে এসেছিলাম।

মনে মনে সুশান্তর কথাটা ভাবতে ভাবতেই যাচ্ছিলাম। সুশান্তটা এমন করলে কেন ? কীসের জন্যে পৈত্রিক বাড়িটা বিক্রী করে দিলে ? কেন সে নতুন বিয়ে করে নিজের বাড়িতে থাকে না ?

অনেক কথাই মনের মধ্যে ভিড় করে আসছিল। ভাবলাম সেই পার্বীই কি এত বছর পরে আমাকে চিনতে পারবে ? তার পরে তো কত বছর গড়িয়ে গেছে। কত নাম হয়েছে সুশান্তর। কত ভালো-ভালো বই বেরিয়েছে এই ক'বছরের মধ্যে !

সেই যেদিন পার্বীকে ট্যাক্সিতে করে তাদের মধু গুপ্ত লেনের বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলাম, তখন অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল।

তার বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে পার্বী বললে—ভেতরে আসুন না একবার—

আমি বলেছিলাম—রাত হয়ে গেছে। এখন আর যাবো না—

—কী আর এমন রাত হয়েছে, সুশান্তদা তো রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত এখানে থাকে—

আমি বললাম—আমি তো সুশান্ত নই—

—তা সুশান্তদা না-ই বা হলেন, আরো অনেকেই তো এখানে আসেন, আপনিও না-হয় এলেন—

বললাম—আমার বাড়িতে রাত হলে বকুনি খেতে হয়—

—সে কী এখনও আপনি ছেলেমানুষ আছেন নাকি?

বললাম—রাত্তিরে সকাল-সকাল বাড়ি ফেরা কি ছেলেমানুষের লক্ষণ?

হঠাৎ পাখীর মা শব্দ পেয়ে দরজা খুলে দিয়েছে।

বললে—কী রে, পাখী এলি?

পাখী মা'র দিকে চেয়ে বললে—এই দেখ মা, বাড়ির ভেতরে আসছেন না মোটে, এত করে বলছি—

মাসিমা বারান্দায় নেমে এল।

বললে—ওমা, সে কী, না না, বাড়ির দোর-গোড়ায় এসে ফিরে যেতে নেই, এসো, এসো। কই, সুশান্ত কোথায়?

পাখী বললে—সুশান্তদা, চলে গেছে—

—সে কীরে, আজ যে চলে গেল হঠাৎ? কোনও কাজ ছিল নাকি?

আমি বললাম—সুশান্ত পাখীর ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে একটা কাজে চলে গেছে—

মাসিমা বললে—তা ভালোই, তুমি এসো বাবা, তোমার লজ্জা কী? এসো—এসো—

শেষ পর্যন্ত বার বার পীড়াপীড়িতে আমাকে নামতেই হলো। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমি আবার পাখীদের বাড়ির ভেতরে ঢুকলুম।

সেই বসবার ঘরখানাতে গিয়ে আবার বসতে হলো।

মাসিমা বললে—তুমি পা তুলে বোস বাবা, আরাম করে বোস, অত পর পর মনে করেছো কেন আমাদের? সুশান্ত আমার ছেলের মত, তুমিও তাই—

মাসিমা পাখীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কীরে, তুই খেয়ে এসেছিস নাকি?

—হ্যাঁ মা খেয়ে এসেছি। তোমায় ভাবতে হবে না।

মাসিমা আমার দিকে চেয়ে বললে—তবে আর কী, তবে আর অত তাড়াতাড়ি করছো কেন?

তারপর একটু থেমে বললে—তোমরা তাহলে গল্প করো বাবা, আমি রান্নাঘরের পাট চুকোতে যাই—

বলে মাসিমা ভেতরে চলে গেল।

পাখী বললে—কী হলো, পা তুলে আরাম করে বসুন। মা যে আপনাকে পা তুলে আরাম করে বসতে বলে গেল—

বললাম—পায়ে ব্যথা আছে, বিছানা ময়লা হয়ে যাবে, আপনারা এই আবার বিছানায় শোবেন তো—

—আপনি আবার আমাকে 'আপনি-আপনি' করছেন কেন বলুন তো? আমি আপনার থেকে ছোট, তা জানেন না?

বললাম—আজই প্রথম পরিচয় হলো, তাই···

—তা প্রথম হলেই বা, সুশান্তদা'র সঙ্গেই বা আমাদের ক'দিনের আলাপ?

জিজ্ঞেস করলাম—কতদিনের?

—এই তো গেল মাসে!

—মাত্র একমাস?

পাখী বললে—হ্যাঁ। সুশান্তদাও ঠিক আপনার মত এক বন্ধুর সঙ্গে একদিন আমাদের বাড়িতে হঠাৎ এসে পড়েছিল—তার পর থেকে কত আপনার হয়ে গেছে। আমাদের বাড়িতে যে একবার আসে সে রোজ আসে। আমার মা সকলকে আপন করে নেয়—

তারপর বললে—আপনি আবার কবে আসবেন বলুন?

আমি বললাম—যে একদিন আসা যাবে খন্—

—না, বলুন, কবে আসবেন!

বললাম—বলছি তো আমার সুবিধে মত একদিন আসলেই হবে।

—না কালকে আসুন।

বললাম—এখন আমি কথা দিতে পারবো না—

পাখী এবার আমার কাছে ঘেঁষে এল। একেবারে মুখের বড় কাছাকাছি।

বললে—না, বলুন, কালকে আসবেন ?

আমি মুখটা পেছিয়ে নিলাম।

—বলুন, আসবেন কাল ?

বললাম—অত কাছে এসো না, তোমার মা এসে পড়বে—

পাখী বললে—মা এখন আসবে না। আপনি বলুন, কাল আসবেন ? কথা দিন, কথা না দিলে আপনাকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না—দিন কথা—

আমি মহা মুশকিলে পড়লাম। এমন যে হবে আমি ভাবতেই পারিনি। এ-রকম সংসার কলকাতা সহরে আছে তা আমি সুশান্তর কাছে শুনেছিলাম, কিন্তু সে যে এই রকম তা জানা ছিল না। বহু দিন পরে 'হলুদ ফুল' উপন্যাসটা পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল হয়ত এদের নিয়েই সুশান্ত বইখানা লিখেছে। এদের ভালো করে না জানলে "হলুদ ফুলে"র মত উপন্যাস কখনও কল্পনা করে লেখা যায় না।

মনে আছে সেদিন যে কী বিপদেই পড়েছিলাম তা শুধু আমিই জানি আর জানে আমার অন্তরাত্মা। আমার মনে হচ্ছিল আমি পালিয়ে যাই, আমি এক দৌড়ে এখান থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যাই।

কিন্তু পাখী অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়।

বললে—সত্যি, আপনার মত একগুঁয়ে মানুষ আমি দেখিনি—বাবা, বাবা, কী যে লোক আপনি। আমার কথাটা একটু রাখলেন না।

বললাম—আমি এলে তোমাদের কী সুবিধে হবে ?

পাখী বললে—ওমা, সুবিধের কথা ভেবে আমি বলছি নাকি ? আপনার সঙ্গে নতুন পরিচয় হলো, তাই বলছি—

বললাম—আমি তো বলছি আসতে চেষ্টা করবো—

হঠাৎ পাখী বললে—কেন, আমার ওপর রাগ করেছেন বুঝি ?

—কেন, তোমার ওপর রাগ করতে যাবো কেন ? তুমি কী করেছ ?

—আমাকে কি সত্যিই দেখতে খারাপ ?

হঠাৎ পাখীর এই কথাতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এ-পাড়ায় আমার কেউ জানা-শোনা নেই। এখানে এই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে যদি চিৎকার করে ওঠে, যদি বলে আমি পাখীর ওপর অত্যাচার করেছি, যদি পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেয় ?

চায়ের দোকানে আমি সোনার আঙটিটা বন্ধ দিয়ে এসেছি, তার বাথাটা এখনও শুকোয়নি ভাল করে।

হঠাৎ বললাম—আমি উঠি—

ভেতর থেকে হঠাৎ মাসিমার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

মাসিমা বলছে—ও রে পাখী, ছেলেকে এখন ছাড়লি নি, আমি আসছি—

পাখী বললে—ওই শুনুন, এখন মা না-আসা পর্যন্ত যেতে পারবেন না—

তারপর হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসলো।

বললে—এত ভয় পাচ্ছেন কীসের জন্য শুনি ? বাড়িতে কে আছে ? বাড়িতে গিয়ে তো সেই একলা বিছানায় শুতে হবে—

বললাম—ও সব আমাকে বোল না !

পাখী এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ একেবারে আমার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

সত্যিই, ভয় পাওয়ার মত অবস্থা তখন আমার। আমি তাকে ধরে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

বললাম—ওঠো, ওঠো, তোমার না কী ভাববেন বল দিকিনি ? ছি, ছি, ওঠো—পাখী তেমনি আমার কোলের ওপর মুখ গুঁজে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

বললাম—ওঠো—ওঠো—খোকো—

পাখী তেমনি মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতেই বললে—না, আমি কিছুতেই উঠবো না, কেন, আমি কী দোষ করেছি যে আমার দিকে আপনি একবার ফিরেও তাকাবেন না—

বললাম—তুমি ওঠো, কী বলতে চাও, বলো—উঠে বলো—

জোর করে ধরে তুলে দিলাম পাখীকে। তুলে ধরে

দিয়ে বললাম—থামো, তোমার কান্না থামাও, কী বলতে চাও বলো—তুমি কি আমাকে সুশান্তদা পেয়েছ?

পাখীর কান্না এক নিমেষে থেমে গেল।

বললে—তা তো বলবেনই, আপনারা বড়লোক, অমন কথা তো বলবেনই!—

বলে একটু থামলো।

তারপর আবার বলতে লাগলো—আমরা গরীব বলেই আজ আমাদের এই অপমানটা করতে পারলেন। আজ যদি আমাদের রেশন কেনবার টাকা থাকতো, আজ যদি আমাদের বাড়ি-গাড়ি করবার টাকা থাকতো তো আপনাদের আমরা দেখিয়ে দিতুম—তা জানেন? আজ পেট ভরে খেতে পাই না বলেই আপনাদের এই খোসা-মোদ! আপনাদের ভাবনা কী? আপনাদের বাবা-মা-ভাই-বোন-বউ সব আছে, আপনাদের পকেটে পয়সা আছে, আপনারা কী করে বুঝবেন কাকে বলে ক্ষিধে, কাকে বলে চরিত্র, কাকে বলে লজ্জা? আমরা কি মানুষ?—আমরা তো আপনাদের খেলার পুতুল!

বলতে বলতে আবার ভেঙে পড়লো পাখী।

তারপর এক মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলতে লাগলো—নিজের মা যার মেয়েকে পরপুরুষের হাতে তুলে দেয়, তার দুঃখটা আপনারা কেমন করে বুঝবেন? আপনাদের কাছে আমি কোন্ লজ্জায় নির্লজ্জ হয়েছি তা তো আপনাদের জানবার দরকার নেই! আপনারা নিজেরা খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারলেই হলো। আমাদের কথা ভেবে আপনাদের কী লাভ? আপনারা নিজেরা সুখে সংসার করতে পারলেই তো আপনারা নিশ্চিন্ত!

যান, এখন বাড়ি যান।

আমি তো অবাক। পাখীকে সন্ধ্যেবেলা থেকে দেখে আসছি। কিন্তু এ যেন অন্য মূর্তি, অন্য মানুষ।

বললাম—তুমি আমার ভুল বুঝো না পাখী, ভুল বুঝো না—

পাখী আর একটু দূরে সরে গেল এবার।

বললে—আর কথা নয়, এবার বাড়ি চলে যান, আপনার রাত হয়ে যাচ্ছে—বাড়ি যান—

তবু বললাম—শোন—রাগ কোর না—

—যান বলছি, চলে যান এখনি—

ভেতর থেকে মাসিমার গলার আওয়াজ শোনা গেল—ওরে, কাকে কী বলছিস? ছেলেকে একটু বসতে বল্, আমি যাচ্ছি—

কিন্তু পাখীর তখন অন্য চেহারা।

বললে—এখনও বসে আছেন? যান্—

আমি আস্তে আস্তে উঠলাম। তারপর নিঃশব্দে পায়ে জুতো-জোড়াটা গলিয়ে দিয়ে বাইরে অন্ধকার রাস্তায় এসে নামলাম।

এ-সব কথা সুশান্তকে আমি সেদিন কিছুই বলিনি। পরের দিন ভাষবাজারে মোড়ের হোটেলটাতে গিয়ে সাড়ে তের টাকা দিয়ে আবার সোনার আংটিটা অতি সহজেই ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলাম।

কিন্তু যতই দিন কেটে যাচ্ছিল ততই সেদিনকার সেই কথাটা মনে পড়ে কৌতুক অনুভব করেছিলাম। ভেবে-ছিলাম যদি কখনও উপন্যাস লিখি তো ওই পাখীদের নিয়ে উপন্যাস লিখবো।

তবে আমি না লিখলেও লিখেছিল সুশান্ত। ওই 'হলুদফুল' লিখেই বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল বাংলা-সাহিত্যে।

সেদিন মধুগুপ্ত লেন দিয়ে পাখীদের বাড়ি যাবার সময় অনেকদিন পরে আবার সেই সব কথাগুলো মনে পড়ছিল।

কিন্তু যখন সেই বাড়িটার সামনে গিয়ে পৌঁছলাম তখন অবাক হয়ে গেলাম দেখে। বাড়িটার সে-চেহারা তো আর নেই।

হঠাৎ কানে এল বাড়ির ভেতরে যেন ভীষণ গোলমাল হচ্ছে—

বাড়ির সদর দরজা দিয়ে উঁকি মারলুম।

উঁকি মেরে চমকে উঠেছি। সুশান্তর স্ত্রী না?

আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে পড়লুম। গোলমালের মধ্যে আমার অস্তিত্ব কেউ টের পেল না।

দেখলাম পাখীর সঙ্গে ঝগড়া করছে সুশান্তর বউ।

আমাকে দেখে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এল।

বললে—আপনি কে?

এতক্ষণে আমার দিকে পাখী চেয়ে দেখলে। সুশান্তর বউ আমার দিকে ফিরেই হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো।

বললে—আপনি? আপনি এসেছেন?

আমি বললাম—আপনি এসেছেন কেন? আমি তো সুশান্তর মা'কে কথা দিয়েছিলুম যে তার ঠিকানা যোগাড় করে জানাবো—

—কিন্তু অনেকদিন অপেক্ষা করবার পরও আপনি এলেন না তাই খুঁজে-খুঁজে এখানে এলুম—শুনলুম আমার শ্বশুরের বাড়ি বিক্রী করে দিয়ে এদের এই বাড়িটা কিনে দিয়েছেন—

ভদ্রলোক বললেন—খবরদার বলছি, মিথ্যে কথা বলবেন না—এ-বাড়ি আমি আমার টাকায় কিনেছি—

পাখীর মাথার সিঁথিতে সিঁদুর দেখে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পাখী বললে—আপনার স্বামীর টাকায় এ-বাড়ি কিনেছি সে-কথা কে বললে আপনাকে—

সুশান্তর স্ত্রী বললে—আমার স্বামীই বলেছে—

ভদ্রলোক বললে—তাহলে ডেকে নিয়ে আসুন তাকে, তিনি নিজের মুখে সে-কথা বলে যান, দেখি তাঁর কত সাহস—

—আমার স্বামী মিথ্যে কথা বলবেন না।

—কিন্তু তিনি নিজে এসে সে-কথা বলেন না কেন!

আমি বললাম—কী হয়েছে ব্যাপারটা বলুন তো?

পাখী আমার দিকে চেয়ে বললে—আপনি কেন আবার এর মধ্যে এসেছেন?

ভদ্রলোক বললেন—ইনি আবার কে পাখী? তুমি এঁকে চেনো?

আমি বললাম—আমি সুশান্তর বন্ধু, তার খোঁজ করতেই আমি এসেছি—কিন্তু আপনি কে? আপনাকে তো দেখিনি—

এতক্ষণে মাসিমা হঠাৎ এসে হাজির হলো বাইরের দিক থেকে।

বললে—ওমা, এখানে কী হচ্ছে গো তোমাদের?

ভদ্রলোক বললে—এই দেখুন না, এই মহিলাটি বলছেন এ বাড়ি নাকি ওঁর স্বামীর টাকায় কেনা—

—ওমা, কোথায় যাবো। আমার জামাই বলে নিজের গাঁটের টাকা খরচ করে এই বাড়ি চল্লিশ হাজার টাকায় কিনে সাজিয়ে নিয়েছে। আর তুমি বাছা কিনা বলছো সুশান্তর টাকায়? সুশান্ত এত টাকা কোথায় পাবে।

আমি বললাম—কিন্তু সুশান্ত যে তার নিজের বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছে—

মাসিমা বললে—সে বাবা বড় উড়োনচণ্ডী ছেলে, দু' হাতে টাকা খরচ করতো, হুমড়ি খেয়া-ভাঙ করে উড়িয়ে দিয়েছে—

তারপর আমার দিকে চেয়ে মাসিমা বললে—এই আমার জামাই মস্তবড় ব্যবসা করে। এই জামাই-ই কিনে নিলে বাড়িটা তাই তো মাথা গুঁজে আমরা আছি। নইলে কোথায় থাকতুম বলো তো বাবা। তোমরা তো কেউ বাবা দেখলে না আমাদের—

জামাই ভদ্রলোক বললে—আপনারা মিছিমিছি এখানে সময় নষ্ট করতে এসেছেন, সে এখানে নেই—

আমি চারদিকে তখন অবাক হয়ে সব দেখছি। কবে পাখীর সঙ্গে এ-ভদ্রলোকের বিয়ে হলো, কেমন করে এত জোগাড় করলে তা বুঝতে পারলাম না। শুধু ভাবছিলাম কলকাতা শহরে এও হয়!

সুশান্তর স্ত্রীকে বললাম—চলুন, বাড়ি ফিরে চলুন—

সুশান্তর স্ত্রী কাঁদতে লাগলো।

বলে—কোথায় যাবো? আমার যে আর যাবার জায়গাও নেই। দু'দিন বাদে যে পাণ্ডুড়ির হাত ধরে আমাদের রাস্তায় দাঁড়াতে হবে—

—কেন। সুশান্ত আছে, সে-ই দেখবে।

সুশান্তর স্ত্রী বলে—তিনি কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছেন, কেউ জানে না। তার কোন সন্ধান কেউ দিতে পারছে না—

তবু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সেদিন সুশান্তর স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি

পৌঁছে দিয়েছিলাম। মাস খানেক পরে সে-বাড়ি তাদের ছেড়ে দিতে হয়েছিল। বেচারা কিছু বাসন্তপুরে গিয়ে কোন্ দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের গলগ্রহ হয়ে শেষের দিকে দিন কাটাতে হয়েছিল।

যারা এতক্ষণ গল্প শুনছিলেন তারা জিজ্ঞেস করলেন—তারপর!

আমি বললাম—তারপর আর কী! তারপর অনেক দিন পরে সুধাংশু এসে হাজির হয়েছিল বাড়িতে। তখন তার মা মারা গেছে। এখন সুধাংশু সরকার বলে কোনও লেখককে নাম আপনারা জানেন না। ক'দিন আগে আমার কাছে হঠাৎ একদিন এসেছিল। এই ক'বছরেই একেবারে বুড়ো হয়ে গিয়েছে। সেই তার টাকার কেনা মধুগুপ্ত লেনের বাড়িতে সেই পাখী, তার মা, তার স্বামী বেশ সুখেই আছে!

অথচ সুধাংশুর অবস্থা দেখে মায়া হয়।

বললাম—কেমন আছিস তুই সুধাংশু?

সুধাংশু বললে—শুনছি গভর্মেণ্ট এখন বুড়ো সাহিত্যিকদের একটা পেন্‌শন্ দিচ্ছে, একশো-দুশো টাকা করে মাসে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, আমাকে পাইয়ে দিতে পারিস? আমিও তো এককালে লিখতাম। আমার 'হলুদ ফুল' বইটা তো এককালে খুব নাম করেছিল—

আপনারা নতুন লেখক! তাই আপনাদের কাছে গল্পটা বললাম। হয়ত সুধাংশুর জীবনের কাহিনী শুনে আপনাদের কিছু শিক্ষা হবে—

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

হে নিরুপমা ২·০০

রাহুল সাংকৃত্যায়ন		সিংহ সেনাপতি	৮·০০
নীহাররঞ্জন গুপ্ত		পোড়ামাটি ভাঙ্গা ঘর	৮·০০
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য		সোনা নয় রুপা নয়	২·৫০
নরেন্দ্রনাথ মিত্র		বিন্দু বিন্দু	২·৫০

আর, এন, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং

ক লি কা তা - ১২

মরুদ্যান

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বিকেল।

ইজি-চেয়ারটা জানালার ধারে টেনে এনে বসল ললিতা বসু। এ সময়টা রোজ ঠিক ওইখানটাতে দেখা যাবে তাকে। হাতে বোনার সরঞ্জাম। কিন্তু বোনা বড় একটা হয় না। বাইরের ওধারে ছোট চিলড্রেনস পার্ক। চোখ দুটো সেখানেই আটকে থাকে। হাত চলছে কি চলছে না নিজেরই খেয়াল থাকে না।

ললিতা বসু চেয়ে চেয়ে দেখে। বাচ্চা ছেলে-মেয়েগুলো আসে। তাদের দেখে। সঙ্গে কি নয়তো চাকর আসে, তাদের দেখে। লোহার রেলিং ঘেরা আঙিনার মধ্যে ওদের ছেড়ে দিতে পারলেই ওদের যেন দায়িত্ব ফুরালো। নিশ্চিন্ত মনে গল্পগুজবে বসে যায়। ওদিকে ছেলে-মেয়েগুলো দৌড় ঝাঁপ হুটোপুটি শুরু করে দেয়। ঝগড়া বাঁধে। মারামারিও লেগে যায় এক একসময়।

এদিকে দোতলা জানলার পাশে ইজি-চেয়ারে বসে ললিতা বসু শঙ্কিত হয়ে ওঠে। মারামারির ফলে যে ছেলেটা বা মেয়েটা দুর্বল, সে জোরে কেঁদে কেঁকিয়ে উঠলে তবে ওই কি-চাকরগুলোর হুঁশ ফেরে। তখন দৌড়ে এসে যে যার শিশুকে আগলায়। বাড়িতে বকুনি খাবার ভয়ে ভালো করে গা হাত পা ছেড়ে দেয়, কান্না সামলায়।

জানালার ধারে বসে ললিতা বসুর রাগ চড়তে থাকে। নিজের কি চাকর হলে রাখত না।

বাচ্চাগুলোর কাণ্ড দেখে হাসিও কম পায় না। ওদের ক্ষুদ্র জগতটাকে ওরা অন্তত ছোট ভাবে না। এই ভাব করছে, এই আড়ি করছে, এই রাগ আবার এই হাসি। একটু আগেই এক কাণ্ড দেখে হেসে উঠেছিল ললিতা বসু। ওদের মধ্যে বেশ একটা শক্ত-সমর্থ ছেলে তেমনি ছোট একটা মেয়েকে হাত মুখ নেড়ে কি বলছিল। মেয়েটা গম্ভীর মুখে চেয়ে ছিল তার দিকে। এদিক ওদিক চেয়ে মেয়েটার সঙ্গের চাকরটাকে খুঁজছিল ললিতা বসু। তবে ভয় ধরেছিল, ওই ঝগড়াটে দুষ্টু ছেলেটা মেয়েটাকে ধরে এক্ষুনি মারবে। কোন্ ছেলে মেয়ের সঙ্গে কোন্ কি-চাকর আসে, তাও প্রায় চেনা হয়ে গেছে ললিতা বসুর।

কিন্তু উল্টো কাণ্ড। মেয়েটা হঠাৎ ছোট ছোট দুই হাত বাড়িয়ে ছেলেটার বাঁকড়া চুলের মুঠি ধরে ঝুলে পড়ল।

এ-রকম আক্রমণের জন্য ছেলেটা একটুও প্রস্তুত ছিল না। টান সামলাতে না পেরে মাটিতে গড়াগড়ি। তার ওপর মেয়েটা, কারণ চুলের মুঠি সে তখনো ছাড়েনি।

আক্রমণের দাপটে ছেলেটা বিলক্ষণ হকচকিয়ে গেছে। কোন রকমে নিজের চুলের গোছা ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, তারপর প্যান্ট ঝাড়তে ঝাড়তে ভাগর চোখে আক্রমণ কারিনীকে দেখছে। কিন্তু মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে মেয়েটাই ভ্যা ভ্যা করে কান্না জুড়ে দিল। বে-গতিক দেখে ছেলেটা পায়ে পায়ে সরে পড়ল।

যতক্ষণ না দিনের আলো ডোবে, সামনের ওই সবুজ তৃণখণ্ড থেকে ললিতা বসু চোখ ফেরাতে পারে না। সমরেন্দ্র আগে বাড়ি না ফিরলে এই দেখার ছেদ পড়ে না। সন্ধ্যার আগে আজকাল বাড়ি ফেরেও না বড় একটা। তার পড়ার বাতিক। পড়ানো শেষ করে লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢোকে। কি একটা নতুন বই লিখতে শুরু করবে শুনেছে। তাই পড়াশুনার বাড়তি মনোযোগ। কিন্তু এক-একসময় সন্দেহ হয়, মানুষটা হয়ত ইচ্ছে করেই একটু দেরিতে ফেরে আজকাল। পাছে ললিতার এই বৈকালিক তন্ময়তায় ছেদ পড়ে, এই ভেবে।

আগে ফিরলে গাড়িটা দরজার কাছে দাঁড় করাবার আগেই সমরেন্দ্র দোতলার এই জানলার দিকে তাকাবে। আর ললিতাকে সেখানে বসে থাকতে দেখবেই। কয়েকদিন জোরে জোরে আচমকা হর্ন বাজিয়ে সচকিত করেছে তাকে। লজ্জা দিয়েছে। সে আগে বাড়ি ফিরলে এই দেখার নিবিষ্টতায় ছেদ পড়েই। সুহাসকে চা-জলখাবারের তাগিদ দিতে হয়, দু'চারটে কথা বলতে হয়। তা ছাড়া একজন মানুষ ঘরে থাকলে জানলার ধারে সে এমন চুপচাপ বসে থাকে কি করে। তখনই সব থেকে বেশি অন্যমনস্ক হয়ে পরে ললিতা বসু। বিমনা চোখ দুটো বার বার এই জানলা দিয়ে বাইরের ওই [illegible]রের দিকে ছোটে। ঘুরে ফিরে নিজের অগোচরেই বার বার ওই জানলাটার কাছে এসে দাঁড়ায়।

বুধোড় বুদ্ধিমান মানুষ। লক্ষ্য করেছে। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কি দেখো?

সেই একটা সাধারণ প্রশ্নে ললিতার সমস্ত মুখ লাল হয়ে ওঠার দাখিল। হেসেই জবাব দিয়েছে, কি কাণ্ড যে করে ওই বাচ্চাগুলো, হেসে বাঁচি না।

সমরেন্দ্র আর কখনো কিছু বলেনি। মনে মনে ঠিকই বুঝেছে কি দেখে, কোন্ তন্ময়তায় বিভোর হয়। সেও নিশ্চয় খুশি হয়, বর্তমানে স্ত্রীর মনের এই আকর্ষণ টুকুই কাম্য। কি মনে হতে ললিতার কানের কাছটা লাল হয়ে ওঠে আবার। বিকেল না-হতে তার এই জানলার পাশে বসার খবরটা ঠোঁট কাটা অনিমেষ গাঙ্গুলিকেও নিশ্চয় জানিয়েছে লোকটা। গাঙ্গুলি এ নিয়ে ঠাট্টা তামাসা কিছু করেনি। সে ডাক্তার, বিলেত ফেরত গাইনোকলজিস্ট। বইই হাসি মসকরা করুক, তার দায়িত্বজ্ঞান সজাগ সর্বদা, এ ব্যাপারে সে-ই হয়ত বন্ধুকে উল্টে সমঝে দিয়েছে, কলেজ থেকে ফেরিতে ফেরার পরামর্শটাও সে-ই দিয়ে থাকতে পারে।

অতএব বিকেলটা এখন এই জানলার ধারে বসে বসেই কাটে ললিতা বসুর। কি করে যে কেটে যায় টেরও পায় না। ওই পাকটার ওপরে অন্ধকারের পর্দা একটু একটু করে যখন ঘন হয়ে ওঠে, তখন হুঁশ ফেরে। বি চাকরেরা তখন নিজেদের কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে। ছেলে-মেয়েগুলোকে ঘরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। ছোট মাঠটা ফাঁকা হতে থাকে।

কেবল এক বাড়ির একটা অল্প-বয়সী চাকর আর, অন্য কোনো বাড়ির তেমনি একটা অল্প-বয়সী ঝিয়ের ফেরার তাগিদ কম। ছেলে মেয়ে নিয়ে ওরা আসেও প্রায় সকলের আগে। ফেরে সকলের পরে। এসেই নিরিবিলি একটা কোণ বেছে নিয়ে বসে দু'জনে। তাদের সঙ্গের ছেলে-মেয়ে দুটো পার্ক ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও টনক নড়বে না বোধহয়। এখানে এই জানলার ধারে বসে ললিতা নিজের মনেই হাসে কত সময়। আবার রাগও হয়। অন্ধকার হয়ে গেল, সামনে থেকে সামনেও আর চোখ চলে না, কিন্তু ওদের গুঁতার তাড়া

নেই। এদিকে হিমে ঠাণ্ডা লাগতে পারে কচি শিশু দুটোর সে-খেয়ালও নেই।

ওরা উঠলে তবে স্বস্তি। কিন্তু তখন আবার ললিতা বন্ধুর বুকের তলায় একটা কালো ছায়া গুটিসুটি এগিয়ে আসতে চায়। সেটা ঠেলে সরায় অবশ্য তক্ষুনি। নিজের হাতের দিকে চোখ পড়তে বিব্রত বোধ করে। বোনা যেমন ছিল তেমনি আছে। তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের আলোটা জ্বালে। তারপর তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে যতটুকু পারে তুলে রাখে। এই বোনার হিসেব নেবার লোক আছে—অনিমেষ গাঙ্গুলি। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনলেই কান খাড়া করে শোনে এক জোড়া পায়ের আওয়াজ, কি দু'জোড়া। যত জোড়াই হোক, পায়ের শব্দ শুনলেই হাতের বোনা চটপট সরিয়ে রেখে দরজার দিকে এগিয়ে আসে।

ললিতা বসু অবাক হয়ে ভাবে এক-এক সময়, তার জীবনে কিছুই বুঝি সহজ স্বাভাবিক ভাবে ঘটবার নয়। এক বিয়ের ব্যাপারেই কি কম বিভ্রাট হয়েছিল। বাবা মায়ের সঙ্গে থাকত ইউ. পি-তে। সেখানেই পড়াশুনা করেছে, সেখান থেকেই এম. এ. পাশ করেছে। যে বছর এম. এ. পরীক্ষা দিল সে-বছরই বিয়ে হবার কথা। দিল্লীর এক আই. এ. এস ছেলের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবও পাকা হয়ে এসেছিল। ছেলের গুণাগুণ শুনে ললিতার মোটামুটি ভালই লেগেছিল। ভিতরটা খুঁতখুঁত করছিল কেবল তাদের ঘাবি-খাওয়ার কিরিত্তি শুনে। কিন্তু তার বাবা ছিলেন দিল-খোলা বে-পরোয়া মানুষ। বলেছিলেন, দেব, সব দেব—যা চায়, তার থেকে বেশিই দেব, কেবল মুখ ফুটে না চাইলেই পারত বোকার মত।

ললিতার বাবার অবস্থা রীতিমত ভালো তখন। সে বছরেই ইন্ডিওরেন্স সংস্থার আঞ্চলিক সর্বেসর্বা হয়ে বসেছেন। তাই মন মেজাজ অতিমাত্রায় প্রসন্ন। কিন্তু পাত্রপক্ষের চাওয়ার বহর দেখে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন ললিতার মা। চার-চারটে মেয়ে তাঁর—এই প্রথম কাজ। তার ওপর ছেলেও আছে তিনটে। এক মেয়ের বিয়েতে এ-রকম খরচ হলে তাঁর চিন্তিত হবারই কথা। কিন্তু তিনি কিছু বললেই ললিতার বাবা তাঁকে সাবধান করেন, চুপচাপ, মেয়ে যেন না শোনে।

কিন্তু মেয়ের কানে আসতই।

সেই বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করার আগেই ললিতার বাবার দিন বড় আকস্মিক ভাবে ঘনিয়ে এলো। প্রথম বারের ধাক্কা অনেকেই সামলে ওঠে—তিনি পারলেন না সামলাতে।

অবশ্যই মেয়ে বিয়ের ব্যাপারে মহা অশৌচের বাধা নেই। কিন্তু অবস্থাপন্ন ঘরে অন্তত এই দিনে বেরিয়ে বিয়ে হলেও মেয়েকে অলক্ষুণে, গলার কাঁটা কেউ ভাবে না। দু'তরফের অনুমোদনে বিয়ে এক বছর স্থগিত থাকল।

কিন্তু আবার যখন অগ্রসর হবার সময় উপস্থিত, তখনই আঘাত। সমস্ত পাওনার ব্যাপারে এক কথায় রাজি হয়ে কাজে এগিয়েছিলেন যে মানুষ, তিনি নেই। অল্প ছেলেপুলের ব্যাপারে বড় নির্ভরতার আশ্রয়ও তেমন নেই আর। ললিতার দুই দাদা অবশ্য ইন্সিওরেন্সে মোটামুটি ভালো চাকরিই করে তখন, কিন্তু দিল-খোলা মেজাজের সংসারে তারা আর কতটা ঘাটতি পূরণ করতে পারবে। তিন-তিনটে বোন আর একটা ভাই স্কুল-কলেজে পড়ছে তখনো। ললিতার সব থেকে দুঃখ হয়েছিল, দাদারা যখন বাবার প্রিয় গাড়িটা বেচে দিল। বাবার কেন, তারও কম প্রিয় ছিল না ওই গাড়িটা। নিজেও ড্রাইভিং-এ হাত পাকিয়েছিল—ফাঁক পেলেই বাবার গাড়ি হাঁকাতো ললিতা। কোথায় কত দূরে চলে যেত ঠিক নেই। আর, মা বাবা দাদাদের নিষেধ না শুনে চালাতোও খুব জোরে। এ ব্যাপারে বাপের মেজাজের সঙ্গে তার অনেকটা মিল। জোরে গাড়ি হাঁকানোটা একটা নেশার মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার।

দাদাদের বলে মা-ই সেই গাড়ি বেচে দিয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে বিয়েতে দেওয়া-থোয়ার ব্যাপারটা নতুন করে ভাববার বিষয়ই বটে। কিন্তু মানুষ যে এমন স্বার্থপর হতে পারে, ললিতার ধারণা ছিল না। স্বল্প

পক্ষের সাফ কথা, প্রতিশ্রুতি যা দেওয়া হয়েছে তার আর হেরফের হতে পারে না। সে-রকম করাটা দান প্রত্যাহারের সামিল। তাছাড়া এই মেয়ের বিয়ের যাবতীয় খরচ-খরচা তো ভদ্রলোক রেখেই গেছেন।

ললিতার মা এ-রকম অদ্ভুত কথা শুনে সত্যিকারের বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছিলেন। দাদারা মা-কে বলেছিল বাবা যা ঠিক করে গেছেন তাই-ই দিয়ে দাও। নিরুপায় মা-ও রাজিই হতেন। কিন্তু বেঁকে বসল ললিতা। মা-কে আর দাদাদের সে সাফ জানিয়ে দিল ওখানে বিয়ে হবে না। বোকাতে এসে দাদারা বোনেরা কথা শুনে ফিরে গেল। ললিতা ঝাঁকিয়ে উঠেছিল, বুঝতে পারছ না কি-রকম সংসারে পাঠাতে যাচ্ছ তোমরা আমাকে। এ বিয়ে হলেই বরং বাবা উপর থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবেন।

বিয়ের প্রসঙ্গ সেখানেই শেষ তখনকার মত। একটা আপিসে চাকরিও নিয়ে ছিল ললিতা। মেয়ে কলেজে চাকরি অনায়াসেই পেতে পারত। কিন্তু এক সময়ের গাড়ি হাঁকানো মেয়ের কলেজের চাকরি পছন্দ নয়। যে বিয়ে হল না তার জন্য কোনো সময় তার এতটুকু দুঃখ হয়নি। বরং গাড়িটার জন্য প্রায়ই তার মন খারাপ হত। টাকার প্রতি টান তার বিশেষ ছিল না, কিন্তু একখানা গাড়ি কেনার মত টাকা তার থাকলে ভালই লাগত।

সমরেন্দ্র বসুর সঙ্গে বিয়েটাও সাধারণ যোগাযোগের বিয়ে। ইউ. পি-তে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। সেই আত্মীয়ের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ললিতাদের। মেয়ে বিয়ের জন্য ললিতার মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, ওই বাড়ির গৃহিণী সেটা জানতেন। ছেলের কাছে তিনি মেয়ের অজস্র প্রশংসা করেছিলেন, আর মেয়ের বাড়িতে এসেও ছেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন।

অতএব ললিতার বারের আগ্রহ হয়েছিল। এক রবিবারে সেই মহিলার বাড়ি গিয়ে ছেলেটিকে দেখেও এসেছিলেন তিনি। ভালই লেগেছিল। প্রস্তাবটা বাড়িতে এসে বলতে ললিতা মুখে কোনো আপত্তির কথা বলেনি বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল সত্যি কথা। একে কলেজের প্রোফেসার, তায় ডক্টরেট। অর্থ-নীতির ভারী কৃতী ছাত্র নাকি। কেমন জানি কাট-খোট্টা গোমরা-মুখো মানুষ হবে হয়ত।

সেই পরিচিতা মহিলাই পরিচয় করিয়ে দেবার ছলে আত্মীয়টিকে তাদের বাড়ি নিয়ে এসেছিলেন একদিন। দেখে আর তারপর আলাপ করে অবশ্য ললিতার খারাপ লাগেনি। মোটামুটি ভালো ভাবে এম. এ. পাশ করেছে শুনে সমরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করেছিল, কলেজে চাকরি না করে আপিসে চাকরি করছে কেন।

বিব্রত বোধ করলেও ললিতা হাসিমুখেই জবাব দিয়েছিল, মাষ্টারি করতে ভয় করে।

চেহারা-পত্র বেশ সুশ্রী ললিতার, স্বাস্থ্যও ভালো। বরাবর বাইরে থাকার ফলে কথাবার্তায় আচরণে সপ্রতিভ তাজা ভাব আছে একটা। অবিবাহিত পুরুষের অপছন্দ হবার কথা নয়। অপছন্দ হয়ওনি। সেই পরিচিতা মহিলাই বিয়েটা ঘটাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন তখন।

মা মতামত জিজ্ঞাসা করতে ললিতা বলেছিল, আগে বুঝে নাও এই সঙ্গে অর্ধেক রাজত্বের আশাও আছে কিনা আবার। সেই বিকেলেই ছোট বোন এসে জড়িয়ে ধরেছিল তাকে; ন য়ে দিদি, না য়ে দিদি, ভদ্রলোকের শুধু রাহুকন্যার আশা, রাজত্ব-টাজত্বের ধার ধারে না।

কিন্তু এই বিয়েও নির্বিঘ্নে হয়নি। বিয়ে হবে কি হবে না সেই সঙ্কটে পড়তে হয়েছিল পাত্রীপক্ষকে। বিয়ের দিন যে গাড়িতে কলকাতা থেকে সমরেন্দ্র বসুর এসে পৌঁছনোর কথা, সেই গাড়িতে তার দেখা নেই। পরের গাড়ি সন্ধ্যায় এসে পৌঁছয়, তাতেও বরের পাত্তা নেই।

সকলের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল সেই এক সন্ধ্যায়। আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের বেশির ভাগই এসে গেছে। তাদেরও বিমূঢ় অবস্থা।

রাত্রি আটটায় পরে সামনের এক নাম করা হোটেল থেকে খবর এলো, কলকাতার ডক্টর বসুর বাড়ি থেকে

একটা সংবাদ এখানে পৌঁছে দেবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ এসেছে। ···এক বিশেষ বিব্রাটের দরুণ ডক্টর বসু রওনা হতে পারেন নি, তিনি আগামী কাল সকালের প্লেনে এসে পৌঁছুবেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হতভম্ব সকলে। পরদিন এসে পৌঁছলেই বা বিয়েটা হবে কি করে কারো মাথায় এলো না। দুশ্চিন্তায় ললিতার মায়ের তো মাথাই খারাপ হবার দাখিল। ফাল্গুনে আর বিয়ের তারিখ নেই, সামনে চৈত্র মাস।

যাই হোক, বরের কোনো অঘটন হয়নি বা সে বিগড়ে যায়নি, এটুকুই যা সান্ত্বনা। বিয়ে বাড়ির খাওয়া দাওয়ার অনুষ্ঠান কিছু বাদ গেল না, বিয়েটাই শুধু হল না। এ-রকম বিয়ের নেমন্তন্ন কেউ কোনদিন খেয়েছে কিনা ললিতা জানে না।

পরদিন সকালে দশটা নাগাত একটি মাত্র বন্ধু নিয়ে বর এসে পৌঁছল। সেই বন্ধু অনিমেষ গাঙ্গুলি। কিন্তু বরের হাব-ভাব দেখে অবাক সকলে। বিয়ে পণ্ড হতে পারে এ-রকম কোন বিব্রাটের ছিটেফোঁটা পেল না কেউ। জেরার ফলে বিব্রত এবং বিপন্ন মুখভাব। শুধু বলল, একটা পুলিসের গণ্ডগোলে পড়ে গাড়ি ধরা গেল না।

ফলে মেয়ের পক্ষ ভিতরে ভিতরে আরো বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ললিতার দুই দাদাকে আলাদা ডেকে নিয়ে বন্ধু, ডাক্তার অনিমেষ গাঙ্গুলি জানালো গাড়ি ধরতে না পারার মত বিব্রাটটা কি।

প্রথমেই বন্ধুর এক প্রস্থ সুখ্যাতি করে নিল সে। সাদাসিধে ভালো মানুষ, কারো সাতে-পাঁচে নেই। যাকে বলে বেশ নিরীহ। কিন্তু এই লোকটাই রেগে গেলে কি-যে গণ্ডগোল বাঁধিয়ে বসে ঠিক নেই। যেদিন তাদের রওনা হবার কথা সেদিনই ছোট খাট একটা বিপাকে পড়েছিল তারা। দিনে দুপুরে রাস্তায় এক ভদ্রলোক একজন ভদ্রমহিলাকে অপমান করে বসেছিল। তখন দুপুর, রাস্তায় লোকজন বিশেষ নেই। মহিলার পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল লোকটি। দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে মহিলাটিকে বেশ বিপন্ন মনে হয়েছিল সমরেন্দ্রর। মুখ তুলে মহিলা তাকে দেখে তাড়াতাড়ি হাত তুলে ডেকেছিল। সে যেন এই লোকটার কবল থেকে উদ্ধার পেতে চায়।

সমরেন্দ্রর এমনিতেই নীতিজ্ঞান একটু বেশি। সে দৌড়ে নেমে এসেছিল। ততক্ষণে পাড়ার আরো দুই একজন এসে জুটেছে।

মহিলার অভিযোগ, লোকটা আজ ক'দিন ধরে তার পিছনে লেগে আছে। মিথ্যে অজুহাতে তার স্বামীকে থানায় টেনে নিয়ে তাকে আটকে রেখেছে।

লোকটার বক্তব্য তার স্বামী জুয়াড়ী, চোরা কারবারী। এই মহিলার যোগসাজস আছে তার সঙ্গে। বিশেষ প্রয়োজনেই সে এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে—অতএব এ নিয়ে কারো মাথা ঘামানো দরকার নেই।

রাগে ক্ষোভে মহিলার চোখ ফেটে জল এসেছিল, বলে উঠেছিল মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে, ওই দেখুন ওর পকেটে সোনার গয়না আছে, আমাকে দেবে বলে ঘুরছে—বাড়িতে একটা ছেলে আছে আমার, ছোট ননদ আছে, তাদের সামনেই নির্লজ্জ বেহায়ার মত লোকটা রাত দুপুরে এসে হাজির হয়, যা-তা বলে, বেশি গণ্ডগোল করলে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে বলে শাসায়। দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে দিনের পর দিন এইভাবে পিছনে লেগে আছে।

অতএব সমরেন্দ্র কৈফিয়ত চেয়ে ছিল তার কাছে। লোকটা তখন চোখ পাকিয়ে অপমান করেছিল তাকে। তর্ক-বিতর্কের শেষে হাতাহাতিতে পরিণত হয়েছিল। গাল বাড়িয়ে প্রথম চড়টা তাকে সমরেন্দ্রই মেরে বসেছিল। পাড়ার লোকেরাও ছেড়ে দেয়নি তারপর।

লোকটাকে ধরে থানায় নিয়ে যাবার কথা উঠতে দেখা গেল, গণ্ডগোলের ফাঁকে মহিলা কখন সরে পড়েছে। মার-খাওয়া লোকটা আহত সাপের মত গজরাচ্ছে তখন, সমরেন্দ্রকে বলেছে এর ফল কি হবে টের পাবে, ঘাড়ে মাথা থাকবে না।

লোকটাকে দেখে অবস্থাপন্ন ঘরের লোকার টোকার ভেবেছিল সমরেন্দ্র। তার পকেট থেকে এক ঝোড়া সরু বালাও বেরিয়েছে। অতএব এই কথার পর সমরেন্দ্র

সোজা আরো দু-ঘা বসিয়ে দিয়েছে তাকে। ধরে থানায় নিয়েই যেত, লোকটারও থানায় যাওয়ারই ইচ্ছে। কিন্তু কাল তার বিয়ে, আজ বিকেলের গাড়ি ধরবে, থানায় গেলে আবার কি ফ্যাসাদে আটকে যায় কে জানে। তাই থানায় না গিয়ে ভালো-রকম শাসিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল।

এক ঘণ্টার মধ্যে বিপত্তি।

ট্রেনে সঙ্গে যারা বরযাত্রী যাবে তারা এসে গেছে। অনিমেষ গাঙ্গুলিও এসেছে। কিন্তু রওনা দেবার তোড়-জোড়ের আগেই বাড়ির সামনে ট্রাক ভরতি পুলিস। সঙ্গে পুলিস অফিসার, আর পুলিসের ইউনিফর্ম পরা সেই মার-খাওয়া লোকটাও।

সমরেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ কর্তব্যরত পুলিসের কাজে বাধা দিয়েছে, তাকে মার-ধর করেছে। অতএব এই মুহূর্তে তাকে থানায় যেতে হবে।

অফিসারটিকে আড়ালে ডেকে অনিমেষ আর অন্য সকলে ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করল, বিয়ের কথা বলল। কিন্তু কোনো কথা অফিসারের কানে ঢুকল না। উল্টে অভদ্রের মত বাজ করল, এও তো শ্বশুর বাড়িরই ব্যাপার, সেখানেও আদর আপ্যায়ন ভালই হবে।

অনিমেষ গাঙ্গুলি বে-গতিক দেখে তাদের একটু বসতে বলল। প্রথমে যা মাথায় এলো তাই করল সে। সমরেন্দ্রের কলেজে টেলিফোন করে ব্যাপারটা প্রিন্সিপ্যালকে জানাতে বলল। কাছেই কলেজ। বিয়ে করতে যাবে বলে সমরেন্দ্র ছুটি নিয়েছে।

অফিসার অপেক্ষা করতে রাজি নয়। অতএব অনিমেষ আর বরযাত্রীদের অনেকে বরের সঙ্গে থানায় এলো। হাতে পেয়ে কি নির্যাতন করে সেই ভয় সকলের। তার শুধু সমরেন্দ্রই পায়নি, বরং রাগের চোটে পুলিস অফিসারকে যাচ্ছে তাই বলেছে, আর তাদের তৎ-কালীন সরকারকেও ছেড়ে কথা কয়নি।

থানায় আসার আধ-ঘণ্টার মধ্যে সমরেন্দ্রর কলেজের ছাত্রের দল থানা ছেয়ে ফেলেছে। কোন যাদের করা হয়েছিল, সে শুধু প্রিন্সিপ্যালকে খবর দেয়নি, তক্ষুনি ছাত্রদের কানেও গেছে কথাটা। ডক্টর বসু প্রিয় অধ্যাপক তাদের, অতএব কলেজের হাজার খানেক ছাত্র থানা চড়াও করেছে। প্রিন্সিপ্যাল আর মাষ্টাররাও অনেকেই এসেছেন।

একটা লোককে থানায় এনে এরকম বিপাকে থানা অফিসারটি বোধ হয় আর পড়েননি। এই মানুষটির কাছ থেকে অন্তত ভদ্র ব্যবহার পাওয়া গেল। অনিমেষ গাঙ্গুলিকে তিনি আশ্বাস দিলেন, ডক্টর বসুর সম্মানের হানি হতে পারে এমন কিছু তারা কখনোই করবেন না—কিন্তু বিয়ে থাক আর যা-ই থাক, ওপরওলার হুকুম ভিন্ন তিনি তাঁকে ছেড়ে দিতে পারেন না—কারণ তাঁর উপর সীরিয়স চার্জ। আর, সত্যি যদি তাঁর সংশ্লিষ্ট কর্মচারী অপরাধী হয়ে থাকে, তার শাস্তিও সে পাবে।

অতএব ওপরওয়ালার হুকুমের চেষ্টায় ছোটাছুটি করতে হল অনিমেষ গাঙ্গুলীকে। এক বড় কাগজের মুরুব্বি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেই মুরুব্বির সঙ্গে মিনিষ্টারদের অনেকের মহরম-মহরম। কিন্তু দিন বুঝে মিনিষ্টাররাও নি-পাত্তা সব। যাই হোক, সেই শাখা-প্রশাখা ধরে যখন খালাস করে আনা গেল সমরেন্দ্রকে, তখন রাত গিয়ে পরদিন প্রায় দুপুর গড়িয়েছে।

সমস্ত রাত ছেলেরা পালা করে থানা পাহারা দিয়েছে। আর অনেক রাত পর্যন্ত সমরেন্দ্রকে বেরিয়ে এসে এসে তাদের নিশ্চিন্ত করতে হয়েছে, তার ওপর কোনরকম অভদ্র ব্যবহার করা হয়নি। তাদের বাড়ি যেতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তারা শোনে নি।

শ্বশুর বাড়ির লোকের চোখে বরের এই গুরুবোচিত মেজাজ ওণাবলীর মধ্যেই পড়েছে। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে কি করে?

উৎকণ্ঠাশূন্য মুখে সমরেন্দ্র বলেছে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হোক। তার জন্যে তো আর দিনক্ষণের দরকার নেই। কলেজে টেলিগ্রাম করে সে ছুটি বাড়িয়ে নিচ্ছে।

অগত্যা সেই ব্যাপারই হয়েছে। পরে, অর্থাৎ পরের বৈশাখে মেয়ে জামাইকে ধরে এনে একটা আনুষ্ঠানিক বিয়েও দিয়ে ছেড়েছেন ললিতার মা।

প্রথমবার বউ নিয়ে ফেরার সময় ট্রেনে ললিতাকে, ললিতা সখী বলে সম্বোধন করেছিল অনিমেষ গাঙ্গুলি। পরে ললিতা অবশ্য অনেকদিন ছদ্ম-কোপে বলেছে, ললিতা সখী তো ব্যাটাছেলে শুনেছি!

একদিনের প্যাণ্টা জবাবে অনিমেষ মুখ বন্ধ করেছে তার। সমরেন্দ্রকে দেখিয়ে বলেছে, সে দুর্ভাবনা তো ওর, আমার কি!

নতুন ঘর, নতুন সংসার, সবই পছন্দ হয়েছিল ললিতার। মানুষটা ভদ্র, রুচিবান। সংসারেরও ঝামেলা নেই। একটি মাত্র দেওর আর একটি ননদ। ননদের বিয়ে আগেই হয়ে গেছে। দেওরটি পাকাপোক্ত লণ্ডন-বাসী। সেখানে চাকরি করে। পার্কের ধারে নিজেদের এই সৌখিক ছোট বাড়ি। বাড়িটা পুরনো বটে, কিন্তু বেশ ছিমছাম। এক-তলায় ভাড়াটে থাকে একঘর, তারাও বেশ ভদ্র।

সবই ভালো, কিন্তু ভদ্রলোকের মেজাজ চড়লে একটু মুশকিল। সর্বদা যে খিটখিট করে তা আদৌ নয়, মেজাজ ঠিক না থাকলে বরং আরো বেশি চুপ মেরে যায়। কিন্তু তার মেজাজ বুঝতে বেশ সময় লেগেছে ললিতার। সব ব্যাপারে গোছালো মানুষ। জায়গাটা জায়গায় না পেলে বিরক্ত হয়, সময়ের কাজ সময়ে হওয়াই চাই। স্ত্রীর একটা গাড়ির সখের কথা সে টের পেয়েছিল। বিয়ের দু' বছরের মধ্যে ছোট একটা ফোর্ড প্রিফেক্ট কেনা হয়েছে। পুরনো গাড়ি হলেও ভালো হাতে ছিল—ঝর ঝরে হয়ে যায়নি। তার লেখা অর্থ-নীতির বইয়ের চাহিদা হঠাৎ চার গুণ বেড়ে গেছল। ফলে হাতে মোটা টাকা এসেছিল। বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ চাইছিল তলায় তলায়, একদিন একেবারে গাড়ি নিয়ে এসে অবাক করেছে তাকে।

কিন্তু ললিতার গাড়ি চালানো নিয়েই ক্রমশঃ অশান্তি আর বিরক্তি বেড়েছে তার। ধীরে সুস্থে চালাতেই পারে না। রাস্তা একটু ফাঁকা পেল তো অমনি হুড়মুড় করে ছুটল। আর ভিড়ের রাস্তার মধ্যেও যে স্পীডে চালায়, সমরেন্দ্রর একটুও পছন্দ নয়। একটু পরে পরেই সতর্ক করা দরকার হয়। ললিতা হাসে, অনিমেষ হাসে।

সমরেন্দ্র রেগে গিয়ে বলে, তুমি আনন্দ করে গাড়ি চালাচ্ছ, চাকার নীচে দুই একটা মাথাই যদি না পড়ল তাহলে কি আর আনন্দ, কেমন?

রাগ করে ললিতা তখন গাড়ির গতি এত কমিয়ে দেয় যে অনিমেষের তাতেও রাগ হয়ে যায়।

ছোট কথা, অর্থনীতির এই মানুষটা জীবনের সবক্ষেত্রে এমন মিতাচার প্রশ্ন করেছে, যার হেরফের হলে অস্বস্তি ভোগ করে, আর বিরক্তও হয়।

তবু দিন বেশ আনন্দেই কেটে যাচ্ছিল ললিতার। ভাবত, বেশ সুখেই আছে। সেই আই. এ. এস'-এর পরের কথা মনে হলে নিজেকে ভাগ্যবতী ভাবত সে। এই নিলোভ নিরহঙ্কার মানুষটা সেই অ-দেখা আই. এ. এস-এর থেকে শতগুণ বেশি মর্যাদা পেয়েছে।

মেয়েদের সব সুখ আর সব আকাঙ্খার খবর তখনো জানা ছিল না ললিতার।

ললিতা প্রথম সন্তানসম্ভবা হয়েছে বিয়ের আড়াই বছর বাদে। সেই অনুভূতির স্বাদে ভেতরটা আরো কত যে ভরপুর হয়ে উঠেছিল, সে-ই জানে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের সূচনা যে সেটাই, তা সে জানত না।

মা তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ললিতা নিজেই যেতে চায়নি। তার কেমন ভয় ভয় করছে। এখানে অনিমেষ রয়েছে আপনার জন। বিলেত ফেরত নামী ডাক্তার সে। নিজের নার্সিং হোম রয়েছে। এতবড় সুযোগ আর কোথায় পাবে। মা যেতে লিখেছেন শুনেই অনিমেষ গাঙ্গুলি মাথা নেড়ে বলেছে, নির্ভাবনায় এখানে আমাদের হাতেই থেকে যাও ললিতা সখী।

বেশি বয়সের প্রথম সন্তানসম্ভাবনা বলেই সমরেন্দ্ররও দুশ্চিন্তা একটু। অনিমেষ তাকেও আশ্বাস দিয়েছে, আমার নার্সিং হোমে এসে দেখে যাও, শত্রুরা নয়ছয়-

ভাগই আজকাল বেশি বয়সের ব্যাপার, কে আর এখন ষোল বছরের মেয়ে ঘরে আনে।

তবু একটা অনিশ্চিত ভাবনা ললিতা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। অনিমেষ ঠাট্টা করেছে, কলকাতার শহরে পাকা হাতে গাড়ি চালানো মেয়ে এ রকম নার্ভাস হয়, কি কাণ্ড!

ছায়া পূর্বগামিনী। তাই বোধহয় সবদাই কি রকম অজানা আশঙ্কায় ভুগত ললিতা। ডাক্তার অনিমেষ গাঙ্গুলি চেষ্টার ত্রুটি করেননি। নিজের নার্সিং হোমেই আরো বড় বড় ডাক্তার এনেছিল সে। কিন্তু দুর্যোগ এড়াতে পারেনি।

বাচ্চা বেশী বড় হয়ে গেছিল, মাতৃ জঠরের অন্ধিসেন্ধি ঘাটতি পড়েছিল। ললিতার শারীরিক অবস্থা তখন শোচনীয়। তারই ওপর কাটা-ছেঁড়া করে মৃত শিশু বার করে আনতে হয়েছে।

ললিতার সমস্ত মানসিক ছিকটা বিপর্যস্ত হয়ে গেছে এরপর। অনিমেষ গাঙ্গুলির চিকিৎসায় আর সময়েরও বশে শরীর সেরেছে বটে, কিন্তু মনের ভিতরে একটা ক্ষত থেকেই গেছে। অনেক চেষ্টা করেও এই ক্ষতটা নির্মূল করতে পারেনি সে। হামেশা এ-রকম দুর্ঘটনা কত হয় তার নজির দেখিয়েছে অনিমেষ—পরে একাধিক সন্তানের মা হয়েছে সেই সব মেয়েরা। কিন্তু ললিতার কি যেন অজ্ঞাত ত্রাস একটা।

দেড় বছর ঘুরে যায়, আবার ছেলে-পুলে হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না বলে অনিমেষ গাঙ্গুলি আড়ালে বকেছে বন্ধুকে। ললিতাকেও কম ঠাট্টা ঠিসারা করেনি। তার মতে সুস্থ সবল একটা সন্তান অচিরে আসা দরকার। তাহলেই মনের দিক থেকে ললিতা মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় বারের এই সন্তান সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে প্রায় তিন বছর বাদে। আর তখন থেকেই ভিতরের অনুভূতিগুলো বড় বিচিত্র খাতে বইছে ললিতার। সময় যত এগিয়ে আসছে, দেহের অভ্যন্তরে ততো একটা অস্বস্তিকর গ্লানি। তার থেকেও বেশি, দুশ্চিন্তা। এ যেন এক রোগের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে তার। চিকিৎসক হিসেবে অনিমেষ গাঙ্গুলি এক এক সময় ধমক-ধামক পর্যন্ত করে তাকে। কিন্তু মনে মনে সে আর সময়েরও দু'জনেই চিন্তিত।

তখন থেকেই মানসিক প্রস্তুতির মহড়ার কথা মনে হয়েছে অনিমেষ গাঙ্গুলির। গোপনে বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করেই এই মহড়ার ব্যবস্থা করেছে অনিমেষ। একদিন ছোট একটা তারী শৌখিন প্যারামবুলেটর বাড়িতে এনে হাজির সে। দেখেই ললিতার মুখ লাল। অনিমেষ গাঙ্গুলি হেসে কৈফিয়ত দিয়েছে, কিনতে হয়নি, নতুন কোম্পানী পাবলিসিটি-স্টান্টস পাঠিয়েছে। জিনিসটা সুন্দর দেখে নিয়ে এলাম, লাগবেই তো।

বড় বড় এক-একটা ডল্ হাতে করেও উপস্থিত হয়েছে। বলেছে, আগন্তুকের অভ্যর্থনার জন্য সব প্রস্তুত রাখো ললিতা সখী—একটা নতুন জীবন আসছে ঘরে, এ কি চারটিখানি কথা নাকি!

সহজ হতে চেষ্টা করে ললিতা ঠাট্টা করেছে, এও কি স্টান্টস নাকি?

ঠাট্টা কানে তোলেনি অনিমেষ গাঙ্গুলি, একে একে জিনিসপত্র আমদানী করে সন্তান আবির্ভাবের আবহাওয়াটি পাকাপোক্ত করে তুলতে চেয়েছে। ললিতা বিব্রত বোধ করেছে, এক-একসময় বিরক্ত হয়েছে, আবার হেসেও ফেলেছে। বলেছে, তোমাদের এই বিলিতি আদব কায়দা ছাড়ো তো—লোকে দেখলে কি বলবে!

অনিমেষ গাঙ্গুলি তক্ষুনি ছদ্মকোপে চোখ পাকিয়েছে। কিছু বললে লোকের চোখ কানা করে দেব আমি।

ললিতা মুখে যাই বলুক, মনের তলায় আবহাওয়া রচনা হচ্ছে একটু একটু। খারাপ লাগে না, আবার ভয়ও যায় না। অনিমেষ গাঙ্গুলি দস্তুর মত শাসিয়েছে তাকে, বলেছে, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, কিন্তু একে আর বেশি প্রশ্রয় দেবে তো তোমার মত পেসেন্ট আমি বাতিল করে দেব।

(সেষাংশ—২২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

॥ এক ॥

কড়া নাড়তেই একটি রোগা, লম্বা, বিস্কালো ছোকরা চাকর এসে দরজা খুলে দিল। চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। সেটা ঘুরে গিয়ে, যে দু'জন 'বাবু' বাইরে দাঁড়িয়ে, তাদের একজনের মুখের উপর পড়তে সে ফিক করে হেসে ফেলল।

"এই যে দেখনহাসি", অন্তরঙ্গ সুরে বলল সুব্রত, "ভাল আছো তো ?"

সেই হাসিটি এবার আকর্ণ বিস্তৃত হল, ঘাড় সমেত মাথাটাও দুইয়ে পড়ল বাঁদিকে।

—"তোমার সাহেব কোথায় ?"

ও তরফ থেকে কোনো মৌখিক উত্তর নেই। তার

হয়ে। দেখা গেল, ডান হাতের তর্জনীটা কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বমুখী এবং সেই সঙ্গে চোখের দু'টি তারা।

—"কী করছেন?"

এবারেও বলনা রইল নীরব। শুধু প্রসারিত নিম্নোষ্ঠের একটি বিশেষ ভঙ্গিমা জানিয়ে দিল—কী জানি।

"বোবা নাকি?" বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল মোহিত। তার আগেই 'ঐ যাঃ' বলে এক ছুটে ভিতরে কোথায় মিলিয়ে গেল দেখনহাসি।

"'দেখনহাসি' নামটা বুঝি তোমার দেওয়া?"—মোহিত অন্য প্রশ্ন করল।

—"না, ওর মনিবের। ঐ হাসির জোরেই ওর চাকরি।"

—"শেষ দাঁত দেখিয়ে চাকরি বাগিয়ে ফেলল?"

—"এবং দাঁত দেখিয়েই সেটা বজায় রাখছে।"

—"কী রকম?"

—"মানে, ঐটিই ওর একমাত্র গুণ। হাসতে জানে। রবিঠাকুরের কেষ্টার সঙ্গে ঐখানে ওর তফাৎ। যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে হাসতি আছে সাথা। হ্যাঁ, আরেকটা গুণ আছে। চমৎকার কফি বানায়।"

বলতে না বলতেই কফির ট্রে হাতে দেখা দিল দেখন-হাসি। সদর দরজা পার হতেই বাঁ দিকে উপরে যাবার সিঁড়ি। তাড়াতাড়ি উঠতে উঠতে বলল, "আপনারা ভেতরে এসে একটু বসুন, বাবু। আমি এটা দিয়ে আসি।"

এক সেকেণ্ড থেমে ওদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে নীচু গলায় বলল, "দুটুও গরম না হলে খায় না সায়েব। এক চুমুক দিয়ে নামিয়ে রেখে দেয়। আবার আমাকে জল বসাতে হয়।"

সুব্রত বন্ধুকে ভরসা দিল, এখন যদি সে দুর্ঘটনা ঘটে, আমাদেরও কিঞ্চিৎ চান্স আছে। সব নির্ভর করছে 'সায়েব' কোন্ মুড-এ আছে, তার ওপর।

মুড্ অনুকূল ছিল বলা চলে। দেখনহাসি মনিবের মনোযোগ বাবুদের উপরে নিবদ্ধ দেখল। কৃষ্ণন সোফা হতে উঠে এসে সহাস্যে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রথম কথাই বলল, "একটু কফি হতে আপত্তি নেই নিশ্চয়ই।"

উত্তরের অপেক্ষা না করেই অর্ডার দিয়ে দিল এবং দেখনহাসি যথারীতি দন্ত প্রদর্শন পূর্বক প্রস্থান করতেই সুব্রত বলল, "পরিচয় করিয়ে দিই। আমার বন্ধু মোহিত বোস। কাছেই থাকে, যাওয়া আসার পথে হাতো মেরে থাকবেন।"

—"হ্যাঁ, চেনা মুখ বলে মনে হচ্ছে।"

"তাহলে বুঝলে তো?" মোহিতের দিকে ফিরে আশ্বাসের সুরে বলল সুব্রত, "কবিরা যাকে বলেন, একদিন রেখার বন্ধনে বাঁধা পড়ে যেতে পার।"

মোহিতের চেহারা ভালো এবং সে সম্বন্ধে সে সর্বদা সচেতন। বন্ধুর মন্তব্যে মনে মনে খুশী হল, কিন্তু বাইরে একটা হতাশার ভাব ফুটিয়ে বলল, "বাঁধা পড়বার মত মালমসলা থাকলে তো? বিধাতা যে সেদিক দিয়ে মেরে রেখে দিয়েছেন।"

কৃষ্ণন বলল, "সুব্রতবাবু ঠিকই ধরেছেন। বেশ শার্প্ পীচারস্ আপনার।"

সুব্রত বন্ধুর পিঠে একটি সশব্দ চাপড় বসিয়ে কলরব করে উঠল, "ব্যস, এবার আর পায় কে? একদম পাক্কা আর্টিস্টের সার্টিফিকেট। লিখিয়ে নিয়ে কাজে লাগাতে পার।"

কৃষ্ণনের দিকে ফিরে বলল, "আপনার সময় নষ্ট হচ্ছে। এবার কাজের কথায় আসা যাক্। এদের একটা ক্লাব আছে, অনেক দিনের পুরনো। তারা একটা চ্যারিটি শো-এর আয়োজন করছেন। আমরাও আছি তার মধ্যে। টাকাটা নর্থ বেঙ্গল ফ্লাড রিলিফ ফাণ্ডে জমা দেবার ইচ্ছে। টিকিটের খাতা নিয়ে বেরিয়েছি।

—"বেশ তো। শোটা হচ্ছে কোথায়?"

এবার উত্তর দিল মোহিত, "আজ্ঞে স্টারে। বোর্ডটা কিছু কমপ্লেসনে পাওয়া গেল। আগছে বুধবার সন্ধ্যা সাতটায়।"

টিকেট বইটা বের করে বলল, "ক'খানা দেবো?"

—"একখানা। তার বেশী নিয়ে গিয়ে কী করবো?"

বলে, সুব্রতর দিকে চেয়ে একটু হাসল কৃষ্ণন। সেও হাসি মুখে জবাব দিল, আপাতঃ। তবে এর পরের বারে যখন আসবো, তখন আশা করছি একখানায় চলবে না। আরও একখানার দরকার হবে।

দেখনহাসি কাজ নিয়ে এসেছিল। তার উপরে একবার সস্নেহে দৃষ্টি ফেলে কৃষ্ণন সুব্রতকে প্রশ্ন করল, "কার জন্যে? আমার এই দেখনহাসি? কিন্তু আপনাদের এই সব শোভে ওর রুচি নেই। ওর একমাত্র ইনটারেস্ট লায়রা বাহু। আপনাদের ফাংশানে তাকে নিশ্চয়ই নামাচ্ছেন না।"

সকলের সহাস্য দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দেখনহাসির মুখের উপর। লজ্জাভরে মাথাটা কিঞ্চিৎ নত, কিন্তু লজ্জারুচির শুভ্র রূপটি প্রকাশমান।

কৃষ্ণন টিকেট খানার চোখ বুলিয়ে, মোহিতের দিকে চেয়ে বলল, "নাটকে নাচছেন কারা?"

—সবই আমাদের ক্লাবের মেয়ের। শুধু ক্লিমেল পার্ট-গুলোর জন্যে ক'জন বাইরের আর্টিস্ট আনতে হয়েছে।

সুব্রত বলল, "ওরই-ডিরেকশন। সেই সঙ্গে হিরোর রোল।

—হিরো! আমাদের দেশে হিরো মানে তো নাদুস-নুদুস গোলগাল ভালো মানুষ, ছবির পরদায় যাদের দেখি। পুরুষ্টু গাল, ব্যাবড্যাবে চোখ, যাকে বলে বোভাইন আইজ। আপনার চেহারা তো সে রকম নয়।

সুব্রত হেসে উঠল। মোহিত বলল, "তা যা বলেছেন। আমাকে বোধহয় হিরোর চেয়ে ভিলেনের পার্টেই বেশী মানায়। কিন্তু তাতে আবার পলার নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে। দু'চারটা ফ্যান যা আছে, তাও ভেগে যাচ্ছে।··· যাক, এবার আমরা উঠি। আপনি যাবেন কিন্তু।"

ওরা চলে যাবার পর পাশের কামরায় গিয়ে ঢুকল কৃষ্ণন।

মাঝারি আকারের ঘর। আসোছালো। আসবাব-পত্র বেশী নয়, যা আছে সব অবিন্যস্ত। দেখেই মনে হবে সেদিকে রীতিমত নজরের অভাব। একপাশে একটা ইজিচেয়ার পড়ে আছে। তার বাঁ হাতলে খান দুই ম্যাগাজিন, ডান হাতলে একটা ছাড়া শার্ট, পায়ের কাছে পুরনো খবরের কাগজ। সবগুলোই বোধহয় বেশ কদিন ধরে যে যে স্থানে অর্থাৎ যেখানে অধিষ্ঠান করছে।

ওদিকের দেওয়ালের ধারে ইজেলের গায়ে একটি অসমাপ্ত ছবি। কিছুক্ষণ আগেও তার উপরে তুলির টান চলছিল, সে দিকটা এখনো বোধহয় পুরোপুরি শুকোয়নি, ঘাটা কিছু চাপা মনে হচ্ছে। কিংবা ও অংশটা হয়তো অমনি থেকে যাবে—অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল বা অপরিস্ফুট।

শিল্পীর মনে কী আছে, সেশুধু তারই জানবার কথা। অন্ততঃ, ছবিটা যতক্ষণ না শেষ হয়, শেষ টানটি না টানা হয়।

কোনটি যে শেষ টান, শিল্পীও অনেক সময়ে জানেন না। কাল সন্ধ্যাবেলা যে তুলিটি দিয়ে তিনি সমাপ্তির রেখা টেনে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাকে এক কোণে সরিয়ে রেখে দিয়েছিলেন, আজ সকালে এসে আবার তার প্রয়োজন দেখা দিল, কোণ থেকে খুঁজে আনতে হল। বালকের মন আর আজকের মন এক নয়। সন্ধ্যাবেলার চোখ সকাল বেলায় বদলে গেছে।

রাত্রে যখন শুতে চলে গেছেন শিল্পী, ঐ ছবি তাঁকে অনুসরণ করছে। ইজেলের ফ্রেম থেকে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর নিমীলিত দৃষ্টির সামনে, তন্দ্রার মধ্যেও আনা-গোনা করতে ছাড়ে নি। কখনো হঠাৎ ঘুম ভেঙে অন্ধকার যে তাকে দেখতে পেয়েছেন। তখনি ধরা পড়েছে, সে অসম্পূর্ণ। 'অসম্পূর্ণ' বললে ঠিক বলা হবেনা। সে চায়নি। মানসপটে যে ছিল ক্যানভাসে তাকে পাওয়া যায়নি। সে ধরা দেয়নি। শিল্পীর নিজের হাত এবং তুলিও তাঁকে প্রতারণা করেছে, কিংবা অপটু বা অক্ষম বলে তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে সা মিলিয়ে চলতে পারেনি, পিছিয়ে পড়ছে। শিল্পীর জীবনে এতো প্রায় দৈনন্দিন ঘটনা। তাঁর ভিতরে যে স্রষ্টা, তাঁর আর্ট তার নাগাল পায় না।

রাত্রির অন্ধকারে ইজেলের বন্ধন থেকে ছাড়া পেয়ে সে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াল, তার দিকে তাকিয়ে মনে হয় ঐ চোখের তারায় যে ভাষা তিনি দিতে চেয়েছিলেন, সেটা ঠিক ফোটেনি! সে যদি পুরুষের মূর্তি হয়, তার চিবুকে, গণ্ডে, বাহুযুগলে পৌরুষের ব্যঞ্জনার অভাব আছে। যদি নারীচিত্র হয়, কোলের উপর ফেলে রাখা বাঁ হাত খানিতে যে শ্লথ, অনায়াস নম্রতা আনবার চেষ্টা করেছিলেন, তার আড়ষ্টতায়

যেমন একটা বড় প্রগলভতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। স্বল্পবৃত্ত সুপুষ্ট বক্ষযুগলে যে অতৃপ্তির বেদনা ফোটাতে চেয়েছিলেন, সেখানে যেন দেখতে পাচ্ছেন উদ্ধত যৌবনের অহমিকা!

সুতরাং সকালে এসে রাত্রির ফেলে যাওয়া ছবিটিকে আবার নতুন চোখ দিয়ে দেখবেন চিত্রকর। বাঁ হাতে ধরা ট্রের গায়ে ছোট ছোট গর্তের মধ্যে গোলকয়ে সাজানো তুলিগুলোর ভিতর থেকে বেছে বেছে দু'একটি আবার তুলে নেবেন। এখানে ওখানে দু'চারটি সতর্ক সুস্থটান, আলগোছে এক-আধটু ঘষা মাজা। কোথাও কিরের উপর গাঢ় রং-এর মৃদু স্পর্শ, কোথাও বা গালকে হালকার স্তরে নামিয়ে আনা। শুধু রং নয়, বলা হবে রেখারও। যেখানটা অতি মাত্রায় কঠিন, তার উপরে একটি মোলায়েম বাঁক, যে অঙ্গটি অতিরিক্ত কোমলতায় দুর্বল তার মধ্যে একটু দৃঢ়তার সুষমা। এমনি ধারা ফেরফারের আর শেষ নেই!

এরই নাম শিল্পীর সাধনা। এই নিরন্তর ভাঙা-গড়া, ঘষা-মাজা, অদল-বদল। উৎকর্ষ থেকে পরোৎকর্ষে অক্লান্ত অভিযান। পারফেকশান বা 'চরম শ্রেষ্ঠতা' বলে কোনো শব্দ নেই তাঁর অভিধানে। তুষ্টি নেই, তৃপ্তি নেই। কেবলি মনে হবে, হ'লনা, কোথায় কী যেন বাকি হয়ে গেল। নিজের সৃষ্টির প্রতি এই অনির্বাণ অসন্তোষ থেকে তার মুক্তি নেই। এ যেদিন চলে যাবে, মনে হবে—আমি তৃপ্ত, আমি পূর্ণতায় পৌঁছে গেছি, সেই দিন তার মৃত্যু, তার শিল্পী সত্তার অবসান।

ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে ফেলে যাওয়া কাজটির দিকে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চেয়ে রইল কৃষ্ণন। তারপর গদি আঁটা ছোট মোল টুলটির উপর বসে বাঁ দিক থেকে তুলির আধারটা হাতে তুলে নিল।

মাসকয়েক আগে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিল। বেশী দিন থাকতে পারে নি। এদিকে কাজের তাড়া ছিল অর্থাৎ দু'তিনখানা কমার্শিয়াল ছবি শেষ করে দেতে পারেনি: বারবার তাগিদ দিচ্ছিলেন মালিকেরা। তার নিজের দিক থেকেও গরজ কম ছিল না। দিয়ে দিতে পারলেই কিছিৎ অং আসে। তার প্রয়োজন তো সর্বদাই লেগে আছে। মাঝে মাঝে সেটা তীব্র আকারে দেখা দেয়।

দিন তিনেক হল সে ঝঞ্ঝাট মিটে গেছে। পকেটের যা অবস্থা আপাততঃ কিছুদিন অর্ডার-সাপ্লাই-এর উঞ্ছবৃত্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। কোনো ফুলকপি [illegible] স্থূলাঙ্গিনী গৃহিনীর 'পোর্ট্রেট্ পেইন্টিং', ঝিয়ের বাজারের উপন্যাস-প্রকাশকের প্রচ্ছদপট অঙ্কন কিংবা আর্টের 'ক' অক্ষরজ্ঞান-হীন 'আর্ট লাভারের' ড্রইংরুম সজ্জা—এই সব দুরূহ কাজ না নিলেও সমূহ উপবাসের আশঙ্কা নেই। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে দু'একটা নিজের কাজ শুরু করা যেতে পারে।

এবারের দার্জিলিং ভ্রমণ কৃষ্ণন এবং তার মত আরো অনেকের বিশেষ সফল হয় নি। সমতলভূমির ধাবদাহ থেকে পালিয়ে দিন কয়েক পাহাড়ী শৈত্য উপভোগ করেই যারা খুশী তাদের কথা আলাদা। বড় বড় হোটেলের বিলাসবহুল উপকরণ, পান-ভোজনের মত্ততা, দলবেঁধে অকারণ ছুটোছুটি এবং স্থানে-অস্থানে হৈ-হল্লা করে ছবি তোলা—এ সবই যাদের মুখ্য আকর্ষণ, তাদের ও আপসোসের কারণ নেই। কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরে গেছে সেই সব হাজার হাজার নরনারী যারা দু'দিনের জন্যে ছুটে গিয়েছিল দু'চোখ ভরে দেখতে শুধু তাকে, দার্জিলিং-এর [illegible] সুরোচ্চ মহিমা, সুন্দরী শৈলনগরীর সব সুষমাকে ছাড়িয়ে [illegible] পরিব্যাপ্ত। কাঞ্চনজঙ্ঘা। তিনি মেঘের অবগুণ্ঠন [illegible]। বহু সাধ্য সাধনাতেও ভক্তদের দর্শন দেননি।

সেই বঞ্চিতদের মধ্যে কৃষ্ণনও একজন। দার্জিলিং তার কাছে নতুন নয়, কাঞ্চনজঙ্ঘা সে কয়েক[illegible] দেখেছে। কিন্তু প্রতিবারেই মনে হয়েছে, না, একে কখনো দেখিনি, এই প্রথম দেখলাম। হয়তো সকলের তা মনে হবে না। কারো কারো হয়। তাদের কাছে সূর্যোদয়ের মত নিত্য-কার বস্তুও চির নূতন। পরম আবির্ভাব।

কাঞ্চনজঙ্ঘার অভাব অপূরণীয়। তবু বস্তুটা সম্ভব, কৃষ্ণন সেটা অন্তত ভাবে মেটাবার চেষ্টা করেছিল। যে কদিন ছিল, সকালে উঠেই চলে যেত সহরের বাইরে, ভিড় থেকে দূরে, যেখানে দূরের মানুষ কচিৎ চোখে পড়ে, তার জায়গায় সব যেন মৌনী পাহাড়, তাকে ঘিরে উপরে নীচে শ্যামল বন

আর শুভ্র মেঘ। তারই মধ্যে কোথাও একটুকরা লাল ঘর —পাহপালার আড়ালে একখানা টিনের চাল।

কৃষ্ণনের হাতে ক্যামেরা নেই। তার বদলে আছে দু'টি চোখ। ক্যামেরার লেন্সের চেয়ে তার শক্তি কম নয়।

সেই চোখের রেটে করে কয়েকটা জিনিস সে সংগ্রহ করে এনেছিল। ইচ্ছা ছিল, ষ্টুডিওতে ফিরে এসে প্রথম সুযোগেই সেই ছাঁচ থেকে দু-একটি ছবি তুলে নেবে। এতদিনে সে সুযোগের দেখা মিলল।

যে ছবিটা সে শুরু করেছিল অর্থাৎ স্মৃতির পরদা থেকে টানান করবার চেষ্টা করছিল কাগজের পরদায়, তার সূচনাও ঐ দার্জিলিং-এর এক অচেনা পথের ধারে। রোমঞ্চের মত জোর নেশা যখন ধরেছে, প্রথম লক্ষ্য ছিল সেরূপ লোক। তার আগ পাশটা খুঁজতে খুঁজতে কি মনে হল! 'ঘুম'-এর পথে না এসে, উল্টো দিকের একটা কাঁচা রাস্তা দিয়ে নেমে পড়ল। সামনে বিস্তীর্ণ উপত্যকা। তার ধার ঘেঁষে চলে পথ। অনেকক্ষণ চলবার পর একটা ছোট কাঠের পুলে দিয়ে থামল। এতক্ষণে খেয়াল হল, এবার ফেরা দরকার। কিন্তু কোন দিকে গেলে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, জানা ছিল না। জোন নেবার মত কাউকে দেখাও গেলনা।

[illegible] বেরোয়নি। সূর্যদেব অদৃশ্য—কখনো মেঘ, কখনো [illegible] অন্তরালে। সুতরাং বেলার ও কোনো হদিস [illegible] গেলনা। পেটের ভেতর থেকে যে তাগিদ আসছিল, তা দিয়ে খানিকটা আন্দাজ পাওয়া গেল। সে তাগিদ মেটাবার জোটামুটি সংস্থান সঙ্গেই ছিল। কাঁধে ঝোলানো [illegible] মধ্যে খান কয়েক স্যাণ্ডউইচ, ছোট ফ্লাস্ক-ভর্তি কফি। পুলের রেলিং-এ হেলান দিয়ে বসে তার সদ্ব্যবহার করে নিল। তারপর আর করবার কিছুই রইল না। শুধু পথের সন্ধান দিতে পারে এমন একটি পথিক 'বন্ধুর' পথ চেয়ে বসে থাকা। যেমন তেমন একটা মানুষ।

ভাবতে গিয়ে হাসি পেল। এই মানুষের সঙ্গ এড়াবার জন্যেই না সে লোকালয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল?

কিন্তু কোথায় মানুষ? চারদিকে চেয়ে মনে হল, সে বোধহয় জীবজগতের বাইরে এসে পড়েছে। তাকে ঘিরে আছে শুধু প্রাণহীন পাহাড়ের প্রাচীর, আর তার উপরে পরিব্যাপ্ত শুভ্র নিবিড় ঘন। কোথাও নেই এতটুকু প্রাণের লক্ষণ। শুধু বলছে, পুলের অনেকখানি তলা দিয়ে যে জোরাটা ধরে চলেছে, তার একটা চাপা শোঁ শোঁ আওয়াজ।

সহসা কোন অলক্ষ্য অন্তরাল থেকে ভেসে এল একটি তরঙ্গায়িত হাসির ঝঙ্কার। মুহূর্ত মধ্যে চারিদিকের চেহারাটা একেবারে বদলে গেল। বোবা নিষ্প্রাণ প্রকৃতি বাঙ্ময়, প্রাণময় হয়ে উঠল। এতক্ষণ যে ছিল শুধু ভ্রান্তিকর পাহাড় আর গাছপালার জটলা, কৃষ্ণনের হঠাৎ মনে হল, সে যেন একটি অবিস্মৃত ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় রূপান্তরিত হল! হয়তো এমনি কোন জনমানব হীন পাহাড়ের কোলে, অরণ্যের ছায়ায় একটি দূরশ্রুত মধুর কণ্ঠকে আশ্রয় করেই জন্ম নিয়েছিল তাঁর 'লুসি গ্রে'।

পুলের বাঁ দিকে যে বিশাল পাহাড়টা খাড়া উপরে উঠে গেছে, তার কোন, এক বাঁকের আড়াল থেকে সরু পাকদণ্ডী বেয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল দু'টি নারী মূর্তি। আগে আগে যে আসছিল তার পিঠে ঝোলানো ঝোকা। সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে পড়ে তাকে নামতে হচ্ছিল। পিছনে যে ছিল, তার কাছে কোন বোঝা নেই। সুতরাং ঢালু পথ বেয়ে নামতে গেলে দেহের যে স্বাভাবিক হেলন, সে টুকু বাদ দিলে তার গতিটি ছিল অবাধ ও স্বচ্ছন্দ। আরো খানিকটা নেমে এসে বাঁকের মুখে একখণ্ড পাথরের উপর এসে যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল, স্পষ্ট অবয়বটি সম্পূর্ণ অবারিত হয়ে দেখা দিল কৃষ্ণনের চোখের উপর। তার মুখ থেকে অজান্তসারে বেরিয়ে গেল—বাঃ!

এরকম একটি নিখুঁত বাস্ট্, উদ্ভাসের এমন সুঠাম, সুষম বিন্যাস সে কোথাও দেখেনি। কৃষ্ণন মুগ্ধ। একাগ্র দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল। ভুলে গেল, মেয়েটি যুবতী, তার দিকে অমন করে চেয়ে থাকা অশোভন।

অনেকটা এই রকম একখানি বাস্ট্ সে দেখেছিল সেবার ঝাঁকুড়ায়। সে পরিবেশটি একেবারে আলাদা। বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। সারা মাঠময় রোয়ার মরশুম। উঁচু আইল-বাঁধা [illegible] কাদায় দাঁড়িয়ে-চাষটি দাঁওয়াল মেয়ে

নীচু ঘরে ধানের চারা রুইছিল। ক্ষীপ্র হাতের সেই বিশেষ ভঙ্গিটি দেখতে দেখতে চলেছিল কৃষ্ণন। হঠাৎ একটি মেয়ে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তারও গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। মুখের ভৌলটি সুন্দর, কিন্তু সেখানে সে তেমন কিছু পায়নি, 'কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখও তাকে টানেনি।

তার নীচে এসেই চোখ দুটো আটকা পড়ে গিয়েছিল। কণ্ঠা এবং তার দু'পাশের বাহুমূল থেকে কোমর পর্যন্ত অংশটি (এক টুকরো মলল আঁচলের সাধ্য কি যাকে আড়াল করে রাখে) যেনো কোন প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর একখণ্ড কালো গ্রানাইট পাথর থেকে একটু একটু করে কেটে কেটে গড়ে তুলেছেন। তখনকার প্রতিটি বাঁক ও রেখায় সেই সুনিপুন হাতের চিহ্ন।

তবু তার মধ্যে কিছু খুঁত ছিল। একটু খুঁটিয়ে দেখবার পর তার শিল্পীর চোখে সেটা ধরা পড়েছিল। কিন্তু আজ এই ধ্যানমগ্ন হিমা-লয়ের নিজস্ব নিভৃতির মধ্যে, মানুষের দৃষ্টির অগোচরে যে মানবীদেহ তার সামনে সহসা আবির্ভূত হল, সে বিধাতা নামক পরম ভাস্করের নিজের হাতে তৈরী। তার কোনোখানে কোনো ত্রুটি নেই। একেবারে অনবদ্য।

কৃষ্ণন লক্ষ্য করে এসেছে, একটি পাহাড়ী যুবতীর দেহে কান্তি, শ্রী, লাবণ্য ও দীপ্তি যতই থাক, গঠন-সুষমায়, ইংরেজিতে যাকে বলে ফিউটি অব্ ফর্ম, সে অনিন্দ্য নয়। দৈর্ঘ্যের অভাব এদিক দিয়ে তার প্রধান এবং সম্ভবতঃ অলঙ্ঘ্য অন্তরায়। উজ্জ্বল চোখ, মাতিপুষ্ট রক্তাভ কপোল, পদ্মকোরকের মত নিটোল দুটি হাত—এসব পথে-ঘাটে চোখে পড়ে, কিন্তু একখানি সুগঠিত ফাস্ট্ খুঁজে পাওয়া যায় না। সে সম্পদের অধিকার সৃষ্টিকর্তা যেন বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন কয়েকটি মাত্র এলাকায়—সাঁওতাল পল্লী, মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী-অঞ্চল, কাশ্মীর উপত্যকা এবং দক্ষিণ-ভারতের কোনো কোনো ভূখণ্ড। বিদেশের খবর সে রাখেনা, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার সুযোগ পায়নি।

আজকের এই ব্যতিক্রম যোগাযোগ তার একটা খেয়াল। মহাশিল্পী স্রষ্টি আর শিল্পী মাত্রেই খেয়ালী। ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন রূপ জাগে তার মনে, নতুন নতুন রং খেলে যায়। প্রকৃতির সারা অঙ্গে তার নিত্য প্রকাশ। মানুষও বিশ্বপ্রকৃতির। তার মধ্যেও বৈচিত্র্যের সীমা নেই।

মেয়েটি যদি সত্য দুনিয়ার মানুষ হত, কৃষ্ণনের প্রখর দৃষ্টির সামনে সে কুণ্ঠ হত, কিংবা সঙ্কুচিত হত। কিন্তু সে যোগাযোগ সহরের মানুষ দেখেনি, দেখলেও তাদের চোখের ভাষা পড়তে শেখেনি। তাই তার চোখে প্রথমে বিস্ময় এবং পরে কৌতুক ছাড়া আর কিছু ছিলনা। নিজেকে সে সরিয়ে নেবার বা আড়াল করবার চেষ্টা করে নি।

গাড়োয়ালের পাহাড়ী মেয়েরা শাড়ি পরে না ; অর্থাৎ কৃষ্ণনের মতে ধোপার উপর বোঝাবারি করে না। একটা ঘাগরা হাত কাপড়ের বাঁধনে বেঁধে দেহের যে প্রকৃতি-দত্ত গঠন বা আকৃতি তাকে বিকৃত করবার চেষ্টা করে না।

ওদের পোষাক শুধু আবরণ, ভূষণ নয়, অলংকরণ নয়। উপরাঙ্গে শুধু একটি 'চোলা', দেহের সঙ্গে এঁটে বসে থাকে, অন্ততঃ এই মেয়েটির বেলায় তাই ছিল। তাতে করে তার উদ্ভিন্ন যৌবন পুষ্ট তনুশ্রীর স্বচ্ছন্দ প্রকাশ কোথাও ব্যাহত হয়নি। ঐ আবরণটুকু যদি না থাকত তার দেহে, প্রতিটি উপাঙ্গ আরো পরিস্ফুট হত, তার পূর্ণ এবং প্রত্যক্ষ পরিচয় পেত শিল্পী। কিন্তু তা হয় না। সমাজ ও সভ্যতা শিল্পীর প্রয়োজন মেনে চলে না। তার নিজস্ব নিয়ম কানুন আছে। স্তর ভেদে তার তারতম্য ঘটে, কোথাও কড়া কোথাও শিথিল।

মেয়েটি যদি মুসিয়া হত, ঐ চোলার বাধাটা থাকত না! কিংবা জায়গাটা যদি লাডিলিং না হয়ে গঙ্গাম হত, গঙ্গামের দূর দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল, ঐ নারী তার সম্পূর্ণ নিরাবরণ আদিম রূপটি নিয়ে নিঃসঙ্কোচে দাঁড়াত তার সামনে। চকিত দৃষ্টিতে তাকাত, অরণ্যচারিণী হরিণী যেমন করে তাকায় পথচারী মানুষের পানে।

কিন্তু সব স্থানে সব কিছু পাওয়া যায় না। এক জায়গায় যা সহজলভ্য, আরেক জায়গায় তা অতি দুর্লভ। এককালের যেটা প্রচলিত রীতি, আরেক কালে তা নিষিদ্ধ। তাই শিল্পীকেও তার সীমিত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নড়া-চড়া করতে হয়, আর্টের চাহিদা গুলোকে দেশ ও কালের মাপে কেটে ছেঁটে বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়।

'শিল্পীর স্বাধীনতা' বলে একটা কথা আছে। আসলে সেটা কথার কথা। অনেকের ধারণা, কয়েকটা সমাজতান্ত্রিক দেশ বাদ দিলে—সেখানে তাকে রাষ্ট্রের নিয়ম মেনে চলতে হয়—অন্যত্র শিল্পীর নিজের পথে যথেচ্ছ বিচরণের কোনো বাধা নেই। তাকে যে প্রতি পদক্ষেপে ছোট-বড় কত ইচ্ছাকে দমন করে করে চলতে হয়, সে খবর তারা রাখে না।

এই যেমন এই মুহূর্তে কৃষ্ণন ভাবছিল, ঐ মেয়েটির মন সান্নিধ্যে এগিয়ে গিয়ে যদি বলতে পারত, "যাঁ দিকে একবার ফেরতো।"। "একটু খানি পিছন ফিরে দাঁড়াও দেখি" কিংবা "নেমে এসে এই পুলের উপর দিয়ে একটু হাঁটো, তোমার চলার ছন্দটি দেখতে চাই!"

বলবার প্রবল ইচ্ছা হলেও, কথাগুলো তার মনের মধ্যেই রেখে দিতে হল। পথের মাঝখানে হঠাৎ-দেখা অচেনা মেয়েকে এর কোনটাই বলা চলে না। হলই বা সে পাহাড়ী গাঁয়ের মেয়ে। কী জানি, কি মনে করবে সে, কিংবা কেমন ভাবে নেবে তার পৌঢ়া সঙ্গিনী? যতদূর মনে হচ্ছে, এই নির্জন পথে একটি যৌবনবতী একলা মেয়েকে আগলে নেবার জন্যেই ঐ রমিয়নী ওর সঙ্গ নিয়েছে। এখানেও সমাজ আছে, সুন্দরী নারীর নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে, ভব্যতা ও শোভনতার প্রশ্ন আছে।

কৃষ্ণনের সমস্ত মনোযোগ যে তার উপর গিয়ে পড়েছে, মেয়েটির নিশ্চয়ই অজানা ছিলনা। তার থেকে সে কি ভাবল, কি বুঝল সে-ই জানে। কয়েক মিনিট সেই পাথর খানার উপর দাঁড়িয়ে থেকে সঙ্গিনীর দিকে চেয়ে কলকণ্ঠে হেসে উঠল। হ্যাঁ, এই হাসিই কিছুক্ষণ আগে ভেসে এসেছিল ঐ খাড়া পাহাড়ের আড়াল থেকে। এবারেও তার ছড়িয়ে পড়া টুকরোগুলো ঢেউ খেলে খেলে মিলিয়ে গেল দূর থেকে দূরান্তরে।

পরক্ষণেই তার মুগ্ধ দর্শকের মুখের উপর শেষ দৃষ্টি রেখে সে উতরাই পথ বেয়ে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কৃষ্ণনের মনে মনে যে ইচ্ছা ছিল, সেটা অংশতঃ পূর্ণ হল। দেহের পিছন দিকটাও অনেকখানি দেখে নিতে পারা গেল। গ্রীবার বাঁকটি খুঁটিয়ে দেখল, গভীর দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করল কাঁধের গড়ন, বাহুর স্বচ্ছন্দ অবতরণ। পিঠখানা দেখে মনে হল, তার গতিটি সরল, কিন্তু কোমরে গিয়ে মিলবার আগে সে যেন যথেষ্ট সরু হবার মত জায়গা পায়নি, বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে। ক্ষীণ কটি নারীদেহকে যে মহিমা দান করে, এখানে তার কিঞ্চিৎ অভাব রয়ে গেছে। সে জন্যে আপসোসের অবকাশ নেই. কোমরের ঠিক নিম্নাঙ্গের সুঠাম বিস্তার সে অভাব পুরোমাত্রায় পূরণ করে দিয়েছে।

দু'চোখ ভরে যেটুকু যা করে এনেছিল, এবং তারপরে একটু একটু করে মনের মণিকোঠায় সযত্নে সংগ্রহ করে রেখেছিল, এতদিন পরে তাকে বাইরে আনতে গিয়ে কৃষ্ণন বুঝতে পারল সবটা ঠিক অটুট নেই। কিছু অংশ হারিয়ে

গেছে। তাই যায়। মন নামক বাক্তিটি বিশেষ আস্থা-ভাজন নয়। বরং বিশ্বাসভঙ্গই তার নিয়ম। পছিছ বস্তু পুরোপুরি ফিরিয়ে দেওয়া তার স্বভাব নয়।

দার্শনিকেরা গ্রন্থের সঙ্গে মনের তুলনা করে থাকেন, বলেন 'মনের পাতা'। কিন্তু সে পাতায় যে লেখা পড়ে সেটা ছাপাখানার মুদ্রিত অক্ষর নয়, অন্তত সবগুলো নয়, বেশির ভাগ হাতের লেখা, আলপনা কালির লিপি। যত দিন যায়, ঝাপসা হতে থাকে, কোনোটা আবার মিলিয়ে যায়।

বই-এর পাতার চেয়ে বরং শ্লেটের সঙ্গে মনের মিল বেশী। কোনো লেখাই সে ধরে রাখে না। পুরোনো লিপি মুছে যায়, নতুন এসে তার জায়গা দখল করে। দায় জীবন ধরে চলতে থাকে এই লেখা, মুছে ফেলা এবং নতুন লেখার পালা।

তুলি হাতে নিয়ে আরো কিছুক্ষণ মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়াল কৃষ্ণন। গলার সেই সুকোমল খাঁজটি ঠিক ধরা দিচ্ছে না, বুকের সেই ফুল, উন্নত, সুগোল রূপটি ফুটে উঠছেনা। মুখখানা অনেকটা এসেছে। কিন্তু চিবুকের নীচটাতে খুঁত থেকে যাচ্ছে।

বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। স্টুডিওর বাইরে খানিকটা খোলা ছাদ। সেখানে কিছুক্ষণ পায়চারি করল। বুঝতে পারল, শুধু স্মৃতিই যে তার সঙ্গে প্রতারণা করছে তাই নয়, মনের সেই বিশেষ মেজাজ, যা থাকে বলে মুড্, সেটাও অনুকূল নয়। এই সময়ে এক মেয়ের—

আইডিয়াটা মাথায় আসবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখনহাসির আবির্ভাব। সঙ্গে একগাল হাসি।

"ঠিক বুঝতে পেরেছিস, না? খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু।"

"এখুনি নিয়ে আসছি," সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নামতে নামতে বলল দেখনহাসি, "খেয়ে চান করতে যান। আমার হারা হয়ে গেছে।"

চান করতে! চমকে উঠে টাইমপিস ঘড়িটার দিকে চোখ বোলাল কৃষ্ণন। তাই তো, এত বেলা হয়ে গেছে! এদিকে কাজ কিছুই এগোয়নি।

পায়া ঘটা ফেলে ও নৈরাশ্যে ভরে উঠল। না, কিছুই হচ্ছে না।

॥ দুই ॥

পুরনো ভবানীপুর অঞ্চলে এই ছোট্ট বাড়িখানা কৃষ্ণনের পৈতৃক সম্পত্তি। কৃষ্ণস্বামী রঙ্গনাথন বি. এন. রেলওয়ের কোন একটা দক্ষিনী শাখা-অফিস থেকে নিজের চেষ্টায় কোলকাতার মূল অফিসে বদলি হয়ে এসেছিলেন। অনেকেই সেদিন অবাক হয়েছিল, বিশেষ করে তাঁর বাড়ির লোক এবং আত্মীয় স্বজন। দেশ ছেড়ে কেউ ইচ্ছা করে দূর দেশে ছোটে? তা ছাড়া, অনেক সুবিধা ছিল সেখানে। বাসা করবার দরকার হয়নি। কর্মস্থল থেকে বাড়ি কয়েক ঘণ্টার পথ। শনিবারে গিয়ে সোমবারে ফিরে আসা যেত। তাই করছিলেন রঙ্গনাথন। ঐ একটি মাত্র ছেলে, কৃষ্ণন। মেসের খুলেই পড়ছিল। সেখান থেকে মেয়োবার, পর কাছাকাছি কোন কলেজে কম খরচায় মোটামুটি ব্যবস্থা হতে পারত।

রঙ্গনাথন যোগবর কাছাকাছির চেয়ে দূর ভবিষ্যতের দিকে বেশী নজর দিয়েছিলেন। শুধু নিজের নয়, ছেলেরও।

প্রথম বারার অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে তার উদ্বেগ শুরু থেকেই সিদ্ধির পথ ধরতে পেরেছিল, ভদ্রলোকের কর্ম ক্ষমতা ছিল। তার উপরে আত্মাও কম ছিল না। কিন্তু ছোট ব্রাঞ্চ অফিসের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে তার পূর্ণ প্রয়োগের সুযোগ পাচ্ছিলেন না। তার প্রশস্ত ক্ষেত্র হেড-অফিস। সেই সুযোগ লাভের আশাতেই দেশ ছেড়ে, স্ত্রী পুত্র পরিজন ছেড়ে বড় সহরে এসে আশ্রয় নেবার যত রকমের কষ্ট ও অসুবিধা ভোগের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। সে দিক দিয়ে ভুল করেন নি রঙ্গনাথন। উপরে উঠতে হলে যে রজ্জুটির প্রথম প্রয়োজন—উপরওয়ালার সুনজরে সেটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গিয়েছিলেন। ভৈষজ্যে নয়, ঐ দুর্লভ বস্তুটি তাঁকে অর্জন করতে হয়েছিল। সে আর্টও তাঁর জানা ছিল।

কৃষ্ণস্বামীর আশেপাশের বাবুরা লক্ষ্য করেছিল, কিছু-দিনের মধ্যে এই কালো, চ্যাঙা, মুখময় বসন্তের দাগ-লাঞ্ছিত 'মদ্রতনয়' বিশাল হল্ জোড়া বিবর্ণ টেবিলের জঙ্গল থেকে কখন এক লাফে ফাঁকার দিকে উঠে গিয়ে একটি ঝকঝকে মোড়া মসৃণ্য টেবিল দখল করে বসেছে। বছর করেক যেতেই সেখান থেকে আবার একদিন বহু লোকের মাথার উপর দিয়ে লম্ফে গেল অগা-টাচে-বেজ একক আধিপত্যে

টেলিফোন-শোভিত সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পিছনে পড়ি ঔটা চেয়ার. বাইরে উর্দিপরা চাপরাশী।

পুরনো সহকর্মীরা বিশেষ আশ্চর্য হয় নি। একটু যারা সিনিয়র, কনিষ্ঠদের শোনাতেন, "কি করে চাকরি করতে হয়, দ্যাখো।"

"দেখে কী হবে? এ শুধু ওর পক্ষেই সম্ভব। কাজ নেই, কর্ম নেই, সারা অফিসে একটা লোক চুপ করে সাতটা পর্যন্ত বসে আছে! কিসের জন্যে? না, অফিসার ডাকেনি। পারবেন 'আপনারা?'

সকলেই মাথা নেড়ে জেনে নিয়েছিল, না অতটা কেউ পারবেনা।

ঐ কথার জের টেনে একদিন একজন একটু উল্টো সুর যোগ করল, "যাই বল, লোকটা জানে না, এমন জিনিস নেই। ছুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সব শিখে রেখে দিয়েছে। যখন যেটা কাজে লাগে। ধরাতে গুণে দেগেও গেল।"

"কি রকম?"

শেষের দিকে যে বিশেষ ঘটনার ইঙ্গিত ছিল, অনেকে জানতনা ঐ বক্তাই সেটা একটু বিস্তৃত ভাবে ব্যক্ত করল।

বেশী দিনের কথা নয়। সবে একটা সেকশনের ভার নিয়ে কোণের দিকে উঠে গেছে রঞ্জনাথন। সাড়ে ছটা বেজে গেছে। অফিস একেবারে ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। রবার্ট, সাহেবের ঘরে পাখা চলছে রোজ যেমন চলে। বাইরের কাজকর্ম সেরে অফিসে এসে বসতেই তার ডিনটে বেজে যায়। কিন্তু ভালও অসুখ আছে, ছুটির পরে কারো থাকবার দরকার নেই। যার যা কাগজ পত্র তার টেবিলে রেখে দিয়ে সবাই চলে যেতে পারে। শুধু একজন চাপরাশীকে থাকতে হয়। তার জন্যে ওভারটাইমের ব্যবস্থা আছে। তাতে খুশী হয়েই থাকে।

ফাইল দেখতে দেখতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ঘন্টা বাজাল সাহেব। চাপরাশী ঘিরে দাঁড়াতেই জিজ্ঞাসা করল, "আই চলা গিয়া?"

"সব চলা গিয়া হুজুর, খালি একঠো মাদ্রাজী বাবু বৈঠে হায়।"

"মাদ্রাজী বাবু! ও কৌন হ্যায়?"

চাপরাশী নাম জানতনা। অন্য সেকশনের লোক। কাছে এসে জানতে চাইল, আপকা নাম কী আছে বাবু?

"কেন?"

"সায়েব পুছতা হ্যায়"

রঞ্জনাথন নাম না বলে রবার্টের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সাহেব ওর মুখ চেনে, কোন্ সেক্শনের লোক তাও বোধ হয় জানে। বলল, 'নো-নো, আই ডোণ্ট্ ওয়াণ্ট ইউ। আই ওয়াজ লুকিং ফর দ্যাট, দাই টেনো। ডু ইউ নো হিজ অ্যাড্রেস?

রঞ্জনাথন বলল, টেনোর ঠিকানা সে জানে না, কিন্তু দরকার হলে তার কাজটা কোন রকমে চালিয়ে দিতে পারবে।

সাহেব অবাক—"তুমি শর্ট হ্যাণ্ড্ জানো?"

"কাজ চলার মত জানি। ডিক্টেশনটা একটু আস্তে আস্তে দিলে—"

আস্তে আস্তেই শুরু করেছিল সাহেব। মিনিট খানেক পরেই বুঝল, তার দরকার নেই। নিরঞ্জন সরের চেয়ে এর বিদ্যা কোন অংশে কম নয়।

অত্যন্ত জরুরী চিঠি। নিরঞ্জনের টাইপরাইটারে চড়িয়ে তখনি করে এনে দিল রঞ্জনাথন। নির্ভুল টাইপ। কনফিডেন্স সিগ্নাল রেজিষ্টারে এন্ট্রি করে গালা টালা যা লাগাবার সব কিছু সেরে চিঠি রওনা করে দিয়ে গেল।

ব্যাপারটা এবার সকলের কাছে অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে গেল। একজন বলল, "ও, তাই রবার্ট সাহেব মাঝে মাঝে ওকে ডাকিয়ে নিয়ে যেত? আর ও-ও দেখতাম লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটছে। একদিন জিজ্ঞেস করছিলাম, ব্যাপার কি বল দিকিন রঞ্জনাথন? ও হল সি. সি, এস্ আর তুমি অফিসের লোক ও তোমাকে ডাকে কেন?"

"কী বললে?" অনেকেই কৌতূহলী হল।

"হেসে বললে, এমনিই।"

"মোটেই এমনি নয়। কল—টুলের ব্যাপারে কোথাও কোনো গণ্ডগোল থাকলে সাহেব ওকে জিজ্ঞাসা করত।"

"এ কী!" কমার্স সেকশনের কাজ ও কী বোঝে?

"না বুঝলে কি আর খালি খালি ডাকে! হবার সাহেব শেষ পর্যন্ত নিজের ডিপার্টমেন্টে টেনে নিয়ে গেল। মাস কয়েক যেতেই অফিসার! আরো কোথায় ওঠে, তাখ।

তা সামান্য এল. ডি. ক্লার্ক থেকে অনেকখানি উঠেছিলেন রঙ্গনাথন। এ বাড়িটা প্রথমে ছিল আড়া। পরে মালিকের পতন বুঝে বেশ কমেতেই কিনে ফেলেছিলেন। তার আগেই দেশ থেকে স্ত্রী ছেলে মেয়েদের নিয়ে এসেছেন। কৃষ্ণণ পড়ত মাদ্রাজের কলেজে। ছেলে ঐ একটি। মেয়ে ছিল দুটি তিনটি। সবাই ওর চেয়ে বড়। দুটিকে [illegible] দিয়ে দিয়েছিলেন। একটি বাকী ছিল [illegible] পার করলেন কোলকাতায় আসবার পর। তখন সে উঠতে বসেছে। ভালো ঘর বর দেখেই দিয়েছিলেন। ছেলেটির বাড়ি সেলোরের কাছে, অবস্থা ভালো, মাদ্রাজে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে চাকরি পেয়েছিল, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

রঙ্গনাথন যে পরিকল্পনা নিয়ে কোলকাতায় এসেছিলেন এ পর্যন্ত সেটি নিখুঁত পথেই চলেছিল, কিন্তু আটকে গেল সামান্য কারণে। অর্থাৎ ছেলের বেলায়। ওঁর ইচ্ছা ছিল সে আই. এস্. সি. পাশ করে এনজিনিয়ারিং পড়বে এবং পাশ করে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে হেলে চুকে যাবে। সে জন্যে গোড়াপত্তন দরকার তা তাঁর করা ছিল। শুরুতেই উঁচু পদ, উন্নতির পথ অবারিত। কিন্তু কৃষ্ণণ আবার গোড়া থেকেই অঙ্কের উপর বিরূপ। বাপ বললেন, 'তাহলে কমার্স পড়।' অন্তত বি. কম পাশ করে বেরোলে ও একটি ভালো জায়গায় তাকে বসিয়ে দিতে পারবেন, এই ভরসা নিয়েই বলেছিলেন। সেখানেও সুবিধা হল না। ছেলে গেল বি.এ পড়তে এবং যথাসময়ে ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে এল।

চাকরির ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ল। তবু তারই মধ্যে একটি ভালো জায়গার সন্ধানে লাগলেন রঙ্গনাথন এবং ছেলেকে বললেন, এস, এ তে ভর্তি হয়ে যাও।

কৃষ্ণণ সাফ জবাব দিল, আমার সময় হবে না।

রঙ্গনাথন ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কথাটা বুঝতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পরে বললেন, সময় হবেনা মানে? বি. এ পড়া ছাড়া এখন আর কী কাজ থাকতে পারে তোমার?

"আমি ছবি আঁকা শিখছি।"

"ছবি আঁকা!" একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন রঙ্গনাথন। মিনিট দুই গেল দম নিতে। তারপর জানতে চাইলেন কোথায়?

"শ্যামবাজারে একজন আর্টিস্টের কাছে।"

রঙ্গনাথন আর কথা খুঁজে পেলেননা।

যখন স্কুলে পড়ে তখন থেকেই ছেলের ছবি আঁকার ঝোঁক, সেটা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। প্রথমে ছিল পেন্সিল

ইরেজার, ড্রইং বুক, ক্রমশঃ তার জায়গায় দেখা দিয়েছে পেইন্টিং বক্স, তুলি, এক ধরণের মোটা কাগজ আরো কি কি! পড়ার ঘরে কখনো কখনো তাই নিয়ে ডুবে আছে, এ সবও তাঁর নজরে পড়েছে। তবে ও গুলোর উপরে কোনো গুরুত্ব দেননি। কোন কোন দিন অফিসে বেরোবার মুখে কিংবা সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে ফিরে হঠাৎ ঢুকে পড়েছেন ছেলের ঘরে। উপদেশাচ্ছলে বলেছেন, পরীক্ষা এসে গেল। এবার একটু বেশী করে পড়। রেজাল্টটা ভালো হওয়া দরকার।

কখনো একটু আধটু বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, ওসব বাজে কাজে সময় নষ্ট না করে, যেটা আসল কাজ, তাতে মন দাও। আখেরটা দেখতে হবে তো। ছবি এঁকে হবেটা কী?

সেই 'বাজে কাজেই' ছেলের কাছে আসল হয়ে দাঁড়াবে কখনো ভাবতে পারেননি। আজ যখন সেটা স্পষ্ট করে দেখতে পেলেন, তার বক্তব্যও শুনলেন, তখন নিজের মধ্যে আর কোন জোর খুঁজে পেলেন না। না-পারার আর একটা কারণ ছিল। কিছুদিন আগে স্ত্রীকে হারিয়েছেন। সে অভাব ওঁর কাছে যতখানি ছেলের কাছে তার চেয়ে আরো বেশী। ওর জগতের সবটুকু জুড়ে ছিল মা, সেটা শূন্যই পড়ে আছে। বাপ সেখানে কোনদিন প্রবেশ করতে পারবেনা। তাঁর স্থান আগেও যেমন গৌণ ছিল, পরেও তাই থেকে যাবে। বরং তাঁকে আরো দূরে সরে যেতে হবে।

তাছাড়া রঞ্জনাথন তো জানেন এই ছবি আঁকাটাকে তিনি যতই তুচ্ছ করে দেখুন, এর উপরে তাঁর স্ত্রীর একটি সস্নেহ প্রশ্রয় ছিল। শুধু কি প্রশ্রয়? বোধহয় তার চেয়ে আরো কিছু গভীর। একটা প্রচ্ছন্ন গৌরববোধ। চাকরির ধাপে ধাপে উঠে গিয়ে জীবনে সাফল্য লাভের যে 'আর্ট' তিনি স্বামীর মধ্যে দেখেছিলেন তার প্রতি ছিল তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা আর ছেলের এই 'আর্ট' যার থেকে সাফল্যের আশা অতি ক্ষীণ, তার জন্যে ছিল একটি গোপন-লালিত আনন্দ। স্বামী যে নিজের দায় বলে তাঁদের সকলকে অতি সামান্য অবস্থা থেকে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে টেনে তুলেছেন, তার জন্যে অন্য মহিলা অবশ্যই গর্বিত ছিলেন, আবার ছেলে যে বাপের পথ ধরলনা, বাপের মত হল না, সেজন্যেও ভিতরে খুশী হয়েছিলেন।

নারী চরিত্রের এই সব সূক্ষ্ম জটিলতা নিয়ে রঞ্জনাথন কোন দিন মাথা ঘামান নি। তিনি কাজের লোক, কাজ বুঝতেন এবং সেন্টিমেন্ট নামক ঝোঁয়াটে বস্তুটিকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। তাঁর ধারণা ছিল কাজের পথে অবধা বাধা সৃষ্টি করা ছাড়া মানুষের জীবনে ওর আর কোনো স্থান নেই। তবে নিজের স্ত্রী সম্পর্কে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁর কাছে সেন্টিমেন্টের চেয়ে বড় ছিল পারিবারিক কর্তব্যবোধ। স্বামী যা বলছেন বা করেছেন, তাতে তার মনের সায় থাক বা থাক, সমর্থন ও সাহচর্যের অভাব হবেনা, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। তার থেকে সহজেই ধরে নিয়েছিলেন, যেহেতু ছেলের মনটি একেবারে মাতৃগত, সুতরাং তার বেলাতেও কোনো বিষয়ে সমস্যা দেখা দেবে না। দিলেও মায়ের হাত দিয়েই অনায়াসে তার সমাধান হয়ে যাবে।

নিজেকে বড় অসহায় বোধ করলেন রঞ্জনাথন। ছেলের উপরে তার আর কোন জোর নেই। যেখান থেকে সেটা আসত সেই উৎসটি রুদ্ধ হয়ে গেছে। স্ত্রী তাকে একদিক দিয়ে একেবারে নিঃস্ব করে রেখে গেছে।

তবু একবার শেষ চেষ্টা করলেন রঞ্জনাথন। ক্ষীণ-কণ্ঠে বললেন, ছবি আঁকতে চাস, বেশতো। অবসর সময়ে বসে বসে আঁকবি। ছবি হিসেবে মন্দ কী। কিন্তু ওটা তো আর কেরিয়ার হতে পারে না। চাকরি বাকরি একটা না করলে চলবে কি করে? আর তার জন্যে এখন থেকেই তৈরী হওয়া দরকার।

কৃষ্ণের প্রথমটা ইচ্ছা ছিল, ছবি আঁকাও যে ভালো কেরিয়ার হতে পারে, সেটা বাপকে বুঝিয়ে দেবে। তার কিছু নজিরও তার হাতে ছিল। কিন্তু সে দিক দিয়ে গেল না। বোধ হয় বুঝল, সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। তাই সংক্ষেপে জানিয়ে দিল, "চাকরি আমি করবো না।"

—"এতেই চলবে?"

—"দেখা যাক।"

চাকরি থেকে বিদায় নেবার আগেই দুনিয়া থেকে

বিদায় নিয়েছিলেন রঘুনাথন। ডাক্তারের মতে,—অন্য সকলের মতও তাই—কারণ অবিরাম এবং অতিরিক্ত কাজ। চাকরি জিনিসটা পেশা। লোকে তাই সেই হিসাবেই গ্রহণ করে। তার সঙ্গে নেশা যদি কিছু থাকে, (বেশির ভাগ লোকেরই থাকে) সেটা আলাদা জিনিস, তার পেশা এবং নেশা দুইই ছিল চাকরি। অথবা, বলা যেতে পারে তার মধ্যে প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয়টার পরিমাণ বেশী। শেষ দিকে সেটা যোগেশের পুরোপুরি নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারই ঘোরে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন থেমে গেলেন। হৃৎপিণ্ড বেঁকে বসল। সে বেচারার দোষ নেই। তারও চলবার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

লোকে জানল, ডাক্তার ও তাঁর শেষ সার্টিফিকেটে লিখলেন, অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায়—ইত্যাদি। একমাত্র কৃষ্ণ মনে মনে জানত, ওটা হার্টফেইলিওর নয়, হার্টব্রেক, এবং ভাঙন শুরু হয়েছে সেই দিন থেকে, যেদিন সে চাকরি বাকরির সনাতন পথ ত্যাগ করে রং-তুলির ক্যানভাসের অনিশ্চিত রাস্তায় পা দিয়েছিল।

কতটা অনিশ্চিত মনে মনে সেদিন তার একটা অস্পষ্ট ধারণা হয়তো ছিল, কিন্তু উপলব্ধি করতে পারে নি। সেটা এসেছে পরে এবং ক্রমশঃ কঠোর রূপ নিয়ে।

বাবার মৃত্যুর পর দেখা গেল, পৈতৃক সম্পত্তি বলতে ভবানীপুরের এই ছোট বাড়ীখানা ছাড়া কৃষ্ণের জন্যে আর ও আছে, অতি সামান্য। টাকা কড়ি বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেননি। যেটুকু ছিল, তার প্রায় সবটাই পড়েছে মেয়েদের ভাগে। বিশেষ করে বড় দুটির প্রথম জীবনে নিজের অসচ্ছল অবস্থার জন্যে বাবের মনোমত বর বর দিতে পারেন নি। সে ত্রুটি শেষ জীবনের সঞ্চয় থেকে কিছুটা পূরণ করবার চেষ্টা করেছেন।

কৃষ্ণের মনে সেজন্য কোনো ক্ষোভ দেখা দেয়নি। আইন যাই বলুক, বোনদের চেয়ে তার প্রাপ্য বেশী, এমন দাবি তার ছিলনা। তাছাড়া, অর্থ যে অর্জন করে তার অর্থেই ঘটনের অধিকারও তার, এই যুক্তি সে মনে মনে মেনে নিয়েছিল। বাবার বিচার বুদ্ধিতে সেটা ভালো মনে হয়েছে তাই তিনি করে গেছেন, এতে তার বা অন্য কারো কী বলবার আছে?

তখনো একজন চিত্রশিল্পীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার বিশ্বাস প্রবল। অনেক বছর পরে সেখানে যখন সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে উঠতে শুরু করছে, মনের কোনে বৈরাগ্যের মেঘ দেখা দিয়েছে একজনের সংসার হলেও, সেখানে অভাবের ছাপ বড় স্পষ্ট, তখন মাঝে মাঝে মনে হত, বাবা বোধহয় ইচ্ছা করেই যাবার আগে তাকে একটা ঘা দিয়ে গেছেন। এটা তার মূঢ়তার দণ্ড, তার 'অবাধ্যতার' শাস্তি। আমার কথা শুনলে না? বেশ তাহলে আমার কাছ থেকে কোনো প্রত্যাশা রেখোনা। নিজের খেয়ালই যখন বড় বল তোমার কাছে, তখন তার উপর নির্ভর করে চল।

অত্যন্ত গম্ভীর এবং রাশভারী লোক ছিলেন রঘুনাথন তাঁর মত 'কাজের লোক' দেখা যায়। ছেলের সঙ্গে কখন কচিৎ কথাবার্তা হত, তাও কাজের কথা। তবু তাঁর মধ্যে যে একটি নীরব, নিরুচ্ছ্বাস কিন্তু প্রেমগভীর পিতা আত্মগোপন করে আছেন, কৃষ্ণের চোখ তাঁকে সর্বদা দেখতে পেত। এও সে জানত, সেখানে কোনো ভুল নেই। একমাত্র পুত্রের কল্যাণের দিকে চেয়ে যে ব্যবস্থা তিনি করতে চেয়েছিলেন, সেটা যখন সে বানচাল করে দিল, একগুঁয়ের মত এমন একটা পথ ধরল, যার উপরে আর কোনো আস্থা নেই, তখন তিনি যে কঠোর আঘাত পেয়েছিলেন, তার সবখানি সে অনুভব করতে পেরেছিল। কিন্তু তার জন্যে এমন একটা প্রত্যাঘাত করে গেলেন? এটা কি তাঁর রিভেঞ্জ?

না, বাবার সম্বন্ধে আক্রোশ প্রতিহিংসার কথা কৃষ্ণ কল্পনাও করতে পারে না। যে ব্যবস্থা তিনি করে গেছেন, তার মধ্যে যদি কোনো 'দম্ভ' থাকে, তার মূলে রয়েছে তাঁর প্রচণ্ড অভিমান। যে 'নেগ্লিজেন্ট' কে তিনি আমল দিতেন না। সর্বদা যার দোষ ধরিয়ে চলতে চাইতেন, হয়তো শেষ জীবনের কোন দুর্বল ক্ষণে অজ্ঞাতসারে তারই ধারা চালিত হয়েছিলেন।

ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর মনে যে দুশ্চিন্তা ছিল, নানাভাবে তা প্রকাশ পেত। শেষের দিকে ডাক্তারের

পরামর্শে এবং কৃষ্ণের পীড়াপীড়িতে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হতেন। এমনি এক সকাল বেলা বিছানায় শুয়েই ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, মটার সময় একজন রাজমিস্ত্রী আসবে।

'রাজমিস্ত্রী!' একটু অবাক হল কৃষ্ণ। কদিন আগেই বাড়ি রং করা হয়েছে, সেই সঙ্গে মেরামতের কাজগুলোও হয়ে গেছে।

"হ্যাঁ, তাকে একটা কাজ দেখাতে হবে। পারবে? তার চেয়ে বরং আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমাকেও বুঝিয়ে দেবো, কি করতে হবে।"

"আজ থাকনা? আপনি সেরে উঠুন। তারপর একদিন—"

"না, তাকে আসতে বলেছি—। কাজ কামাই করে আসবে লোকটা। ফিরিয়ে দিলে ক্ষতি হবে।"

কৃষ্ণ বুঝল, আপত্তি করা বৃথা। মিস্ত্রীর সঙ্গে সেও উপস্থিত রইল বাবার ঘরে। কাজটা বিশেষ কিছু নয়। ওদের বাড়ির পা দিয়ে একটা সরু গলি খানিকটা ভিতরে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। একতলায় দুখানা ঘর পড়েছে তার উপর, যা থাকতে ব্যবহার হত। একটাতে দিদিমা কেউ এসে থাকত, আরেকটায় ছিল কিছু পুরনো, বর্তমানে-কাজে-না-লাগা জিনিস পত্র। এখন খালি পড়ে আছে। ঐ দুটো ঘরের মধ্যে যেটা ছোট, তার গায়ে একটা দরজা ফোটাবার ব্যবস্থা হল।

এতকাল পরে ওখানে একটা দরজার প্রয়োজন কেন হল, সেদিন বুঝতে পারেনি। বাবার মেজাজ। সদাব্যস্ত লোকের হঠাৎ হাতে কোনো কাজ না থাকলে যা হয়, এই ভেবে মনে মনে হেসেছিল। পরেও এ সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেননি। তারপর তার একার সংসারে যেদিন টানাটানি দেখা দিল, সে নিজেই বুঝল। সামনের রাস্তা থেকে ঢুকেই যেটা বসবার ঘর আর তার ওপাশে একটা চাকা বারান্দা, যার একদিকে বাথরুম ব্যবস্থা রেখে আরেক দিকে বাবার টেবিল ফেলতে কোনো অসুবিধা নেই—এই অংশটা রইল নিজের জন্যে, বাকীটা অর্থাৎ খান-তিনেক ঘর ভাড়া দিয়ে দিল। ভাড়াটের ঢুকবার পথ হল কারাগলির মধ্যে বাবার তৈরী সেই নতুন দরজা। এই বন্দোবস্তটা করে লাগাতে হলে যেটুকু ছোট খাটো অদল বদল দরকার তাও তিনি করে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণ জানত না, তাড়া দিতে গিয়ে দেখল।

ব্যাপারটা কিছু নয়। বাড়ির গায় একটা বাড়তি দরজা। কিন্তু তার মধ্যে বাবার মনের একটা অপ্রকাশিত দরজার সন্ধান পেল কৃষ্ণ। তিনি যে ওকে প্রাচুর্যের মধ্যে রেখে যাননি, শুধু সাওয়া পরা এবং মাথা গোঁজবার সামান্য প্রয়োজনটুকু মেটাবার মত ব্যবস্থা করে গেছেন তার বোধ হয় একটা তাৎপর্য আছে। নিজে যেমন স্বকীয় শক্তিকে আশ্রয় করে ধাপে ধাপে উঠে গিয়ে সাফল্যের স্বাদ পেয়েছিলেন, হয়তো শেষের দিকে তাঁর মনে ছেলের জন্যেও সেই কামনা ছিল। সেও তার নিজস্ব পথ ধরে উঠুক, তার বিধিদত্ত যে শক্তি তার স্ফুরণ হোক, পিতার ইচ্ছা কিংবা পিতৃদত্ত সৌলত যেখানে যেন বাধা সৃষ্টি না করে।

পিতার প্রচ্ছন্ন মনোভাব তার কাছে অপ্রকাশিত হয়ে গেছে। হয়তো এটা তার নিজের মনের আবিষ্কার। তবু সমস্ত জিনিসটাকে এই ভাবে দেখবার পর কৃষ্ণ নিজের মধ্যে অনেকটা বল ফিরে পেল। অনেকখানি প্রেরণা এল তার কাজে।

কৃষ্ণ যাঁর কাছে ছবি আঁকতে যেত, মন্মথ মজুমদার, প্রথমটা ওকে আমল দিতে চাননি। বলেছিলেন ছবি আঁকতে চাও কেন?

—ভালো লাগে বলে।

—ঘরে বাবার আছে?

—আছে।

—বরাবর থাকবে? করে খেতে হবে না?

কৃষ্ণ এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেয়নি। জিজ্ঞাসা করেছিল কেন, এ পথে কি করে খাওয়া যায় না?

মজুমদার বলেছিলেন, তা চলে সাচ্চা জিনিসের কারবার চলবেনা। তার কদর চলে গেছে। এটা নকলের যুগ চটকের যুগ। লোকের চোখে লাগা চাই। ভাসা ভাসা চোখ, তার পেছনে দৃষ্টি নেই, শুধু বাইরেটা দেখে, ভেতরে ঢুকতে পারে না। সে গভীর চোখ আছে কজনের? দেখতে জানে কটা লোক? যারা জানত তারা চলে গেছে।

বলতে বলতে চোখ বুজে তাদের কথাই বোধহয় ভেবে নিলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "তাদের তোমরা ভাখোনি। সব ঘরে ছেড়ে বেউলে গেছে। তাদের সেই বিরাট বিরাট বাড়িগুলোও ভেঙে পড়েছে। দুচারটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাদের দেয়াল জুড়ে যে-সব কীর্তি ছিল—হাজার হাজার টাকার অয়েল পেইন্টিং আরো কত রকমের ছবি, তার একটাও খুঁজে পাবেনা তাদের ফুলো-ফার ছেলেগুলো। সব বেচে খেয়েছে। কারা কিনেছে আগে? সাহেবরা। ফেলে নিয়ে গ্যাছে। ওরা ছবি চেনে। জলের মত টাকা ঢেলে ছবিগুলো যারা আঁকিয়ে-ছিল, তারাও চিনত। তখনকার দিনের ধনী অমিদার। অনেক দোষ ছিল তাদের। কিন্তু আর্টকে ভালবাসত, আর্টিস্টকে ভালবাসত, সম্মান করত। বিপদে আপদে টানত। তারা যেদিন নুয়ে হয়ে গেল, সেদিন থেকে বাংলা দেশের আর্টের খাতিরও চলে গেছে। আর্টিস্টকে কেউ পোছে না।"

একটানা এতক্ষণ বকবার পর একটু দম নিতে হল। তারপর আবার বললেন, এখন যাদের টাকা আছে তাদের চোখ নেই, এদিকে কোনো ঝোকও নেই। তারা ছবির পেছনে পয়সা খরচ করেনা। । কিছু কিছু লোক, নামে মাত্রবিত্ত, আসলে কোনো কিছুই নেই, তাদের কিছুটা শখ আছে, ইচ্ছা আছে, কিন্তু সত্যা জিনিস বোঝে। তার মানে ভেজাল। তোমাকে তাই চালাতে হবে। তা নৈলে পেট চলবেনা। আমার অবস্থা দেখছ না?"—বলে হাসতেন।

একটা পুরনো জীর্ণ বাড়ির অত্যন্ত অপরিসর অন্ধকার ছাদের মেঝের বিবর্ণ সতরঞ্চির আসনে বসে হালকা সুরে এই কথাগুলো যখন বলতেন শীর্ণকায় হাসানি রোগগ্রস্ত মরণ মজুমদার, কৃষ্ণ তাঁর হাসির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার সুর শুনতে পেত। কথা বলতনা, শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত দুটি কোটরগত উজ্জ্বল চোখ, ঠেলে-ওঠা কণ্ঠার হাড়, দারুণ কপাল জোড়া বলি রেখার জাল। প্রতিভা না শিল্পী, কিন্তু ভাগ্যের কাছে পরাজিত।

চোখের উপর এমন একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখেও কৃষ্ণ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, না, সে নকলের কারবার করবেনা, মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবে, অপেক্ষা করবে যতদিন স্বীকৃতি না আসে। তার সাধনায় যদি ফাঁকি না থাকে সাফল্য একদিন আসবেই। এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সে একমনে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল।

আরেকটা কথা তোমাকে বলছি, এটা থাক, ওটা থাক। কদিন পরে এই জন্মদাস আসবে তোমার নিজের কাছ থেকে। তখন তুমিই তোমার গুরু। তোমার আত্মার বিকাশ ঘটবে তোমার সৃষ্টির মধ্যে, তোমার মনের বিচিত্র লীলা, তোমার চিন্তা ভাবনা, কল্পনা এমন কি খেয়াল। হ্যাঁ খেয়াল। খেয়ালই তো সৃষ্টির মূল। আমার ইচ্ছা হল, এটা করি। ব্যাস। কেন হল? জানিনা। জানবার দরকারও নেই।"

বলতে বলতে ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেত। কিছুক্ষণ যেন কোন স্বপ্নের ঘোরে তন্ময় হয়ে থাকতেন। তারপর মাথা নেড়ে অস্পষ্ট স্বরে বলতেন, পারবে কি?··· ভাখো।

কৃষ্ণ মুখে কিছু না বললেও মনে মনে বলত, কেন পারবোনা?· নিশ্চই পারবো। আর্ট হবে শুধু আমারই ইচ্ছার বাহন। আমার বাসনাকে সে রূপ দেবে। তা ছাড়া তার আর কোন দাম নেই।

তারপর একদিন দেখা গেল ছাদ না থাকা প্রয়োজন আছে।'

'প্রয়োজন' কথাটা বড় স্থূল, বড় রূঢ়, তেমনি নিদারুণ ভাবে বাস্তব। তাকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই, অস্বীকার করা অসম্ভব। সে আছে এবং প্রতি মুহূর্তে জানিয়ে দিচ্ছে সে আছে। তারই তাড়নায় নিজের খেয়াল-খুশির জগৎ থেকে কৃষ্ণকে মাটির দুনিয়ায় নেমে আসতে হল। আপন মনোভূমিতে ইচ্ছামত ফসল ফলাবার ভার দিয়েছিল তার আর্টকে। তার উপরে তাকে অন্যের ইচ্ছার ভারও কিছু নিতে হল। এমন ফসল চাই যা অন্যেরও মনে লাগে ভোগে লাগে।

শিল্পীর জগতে এই 'অন্যের' স্থান যে ছোট নয়, একথাও গুরু তাকে বলে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমার ভালো লাগল, আমি তৃপ্ত হলাম এইটাই সব নয়। আমার

সেই ভালো লাগার অনোর মনে সঞ্চারিত হল কিনা সেটাও দেখতে হবে। ও যদি না হয় আমার আর্ট অনর্থক।"

সঙ্গে সঙ্গে যোগ করেছিলেন, "তাই বলে, লোকে কি চায়, তার দ্বারা আমি চালিত হবোনা। পয়ের চাহিদা মেটানো বা মনোরঞ্জন করা আমার কাজ নয়। আমার আর্ট কারো তল্পি-বাহক নয়। সে নিজের আদর্শকে বহন করে নিজের পথে চলবে। কিন্তু সে পথ এই জীবনেরই পথ। জীবনের মহৎ সত্যের সে রূপকার। তা যদি সে হতে পারে অন্যের মনকে সে আপনা থেকেই টেনে আনবে। সেইখানে তার শক্তির পরীক্ষা, তার সাফল্য এবং সার্থকতা।"

ইংরেজিতে বলতেন, ডোন্ট ট্রাই টু বি পপুলার মাই বয়। ইউ আর নট টু গিভ্ হোয়াট দি পীপল্ ওয়ান্ট্, বাট উইল দেম ওয়ান্ট্ হোয়াট ইউ গিভ্। তোমার ভিতরে জিনিস থাকলে, তোমাকে লোকের পিছনে ছুটতে হবেনা, তারাই তোমার দরজায় এসে ভিড় করবে।

'পপুলার' বা জনপ্রিয় হবার লোভ কৃষ্ণকে কখনো পেয়ে বসেনি। সে নিজের আদর্শ নিয়ে আপন খুশিমত চলেছিল। কিন্তু শুরু যা চেয়েছিলেন, নিজের শক্তি দিয়ে অন্যকে টেনে আনা, বছরের পর বছর অপেক্ষা করেও সে সাফল্য সুকৃতির সাক্ষাৎ মিলল না। দু চারটি বন্ধুর প্রশংসা অবশ্য জুটেছিল, তার মধ্যে কতটা বন্ধুপ্রীতি আর কতটা গুণ গ্রাহিতা, সে বিষয়ে সন্দেহে ছিল। সে প্রশংসার সবটুকুই তার আর্টের প্রাপ্য এবং মেনে নিলেও কোনো সুবিধা হত না। তার মানসিক মূল্য যত বড়ই হোক আর্থিক মূল্য শূন্য। অথচ ঐ 'অর্থ' নামক বস্তুটি তখন এমন কঠোর প্রয়োজনের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে যে তাকে আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

তাই কৃষ্ণকে তার স্টুডিওর নিভৃত লোক থেকে বেরিয়ে এসে এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে হল যার নাম দেওয়া যেতে পারে আর্টের 'বাজার'। শিল্পী সেখানে পণ্য। তার দাম নির্ভর করছে ক্রেতার চাহিদার উপর। ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে, কোন্ ধরণের 'মাল' চলে বেশী তার কি রকম কাটতি। তাই বুঝে 'অর্ডার' সংগ্রহ করতে হবে, খদ্দেরের পছন্দ মত 'তৈরী' করে সময় মত যোগান দিতে হবে। ওখানেও প্রতিযোগিতার অভাব নেই। তাদের ছিঁড়ে খাবার পেতে চলে তৈরী বস্তুর মান বজায় রাখা যেমন প্রয়োজন, তার চেয়ে ও বেশ দরকারী ক্রেতাকে খুশী রাখবার কৌশল। সেইটাই বোধহয় আসল 'আর্ট'!

প্রথমটা খুব ঘাবড়ে গেলেও, অল্পে আস্তে সব ব্যাপারটাকে অনেকখানি মার্শনিক দৃষ্টি নিয়ে দেখবার চেষ্টা করল কৃষ্ণ। নিজের মধ্যে ক্রমশঃ একটা আপসের মনোভাব গড়ে তুলল। জীবিকার সঙ্গে জীবনের বোঝাপড়া। বড় শক্ত তবু করে নিতে হয়। তা না হলে সংসারে টিকে থাকা যায়না। সংগ্রাম মানুষের নিত্য সঙ্গী। তার বেশির ভাগই নিজের সঙ্গে। বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের সঙ্গে আচরণের। সেখানে এক পক্ষকে মাথা নোয়াতে হয়। চিরদিন দেখা গেছে, আদর্শই নেমে এসে হাত মেলায় পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে, নিজেকে কেটে ছেঁটে নতুন নতুন কাঠামোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। জীবন যাত্রাকে অনুসরণ করে জীবন সে পথ সরল নয়, মসৃণও নয়, প্রতি পদক্ষেপে জটিল ও বন্ধুর।

এই 'সিদ্ধান্ত' গ্রহণকে মেনে নিয়ে কৃষ্ণ অনেক দ্বন্দ্বের হাত থেকে রক্ষা পেল। তার মনের গড়নটা ছিল মননশীল, ইংরেজিতে যাকে বলে plaible। সেটা গুণ বা দোষ যা-ই হোক, তার মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যকে নষ্ট হতে দিলনা। শিল্পীর বাস্তব বুদ্ধির কিছুটা অন্ততঃ জন্ম-সূত্রে তার শিল্পীসত্তার ভিতরেও সঞ্চারিত হয়ে থাকবে। তারই বলে যে অবস্থা-নিশ্চিত এবং প্রত্যক্ষ তার সামনে নিঃসঙ্কিত না হয়ে তাকে যতটা সম্ভব সহজভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিল এবং তার মুখোমুখি হবার জন্যে নিজেকে তৈরী করে ফেলল।

ললিতকলাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করলেই যে তার লালিত্যের হানি ঘটবে, কলা লক্ষ্মীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে, এমন কোনো কথা নেই। অনেক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। স্থূল রুচি ক্রেতা যেখানে শিল্পীকে বিশেষ কোনো ফরমাস করে বসে। কিন্তু অনেক আবার তাঁর রুচি এবং পছন্দকে অনুসরণ করার স্বাধীনতা দেয়, কিংবা গোড়াতে নিজেদের কোনো বিশেষ ঝোঁক থাকলেও শেষ পর্যন্ত শিল্পীর মতকেই মেনে নেয়। আর্ট বোঝে, এমন সমঝদার ব্যক্তির কাছ থেকে অর্ডার পাওয়া যায়।

'অর্ডার' কথাটার মধ্যে যত দীনতাই থাক, কখনো কখনো শিল্পী তার ভিতর দিয়েও কোনো নতুন পথের সন্ধান পেয়ে যান। একটা কোনো অজানা দিক, তিনি নিজে থেকে যার পানে তাকান নি, হয়তো কোনদিন তাকাতেন না, অন্যের তাগিদে বা প্রয়োজনে যখন তাঁর সামনে অকস্মাৎ খুলে গেল, তিনি দেখতে পেলেন তার মধ্যেই তাঁর সাফল্যের সম্ভাবনা রয়ে গেছে। ঐ বিশেষ পথ ধরেই তিনি একদিন প্রতিষ্ঠার স্তরে পৌঁছে গেছেন। ঐ 'অর্ডার'টি না এলে তিনি নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করে থাকা, পরখ করবারও সুযোগ পেতেন না।

কৃষ্ণের বেলায় ঠিক এত বড় সুযোগ না এলেও, একথা ঠিক যে অন্যের ফরমাস মত ছবি আঁকতে গিয়েই একটি বিশেষ দিকে তার নজর পড়েছিল এবং ফরমাসের বাইরে তার যে নিজস্ব জগৎ সেখানেও সে ঐ বস্তুটি নিয়ে ব্যাপৃত থাকত তার ভিতরকার রহস্যোদ্ঘাটনের চেষ্টা করত তার বৈচিত্র্য তার সূক্ষ্মতা তার ঐশ্বর্য এবং মহিমাকে তুলির রেখায় রূপ দেবার দুরূহ সাধনায় তন্ময় হয়ে যেত।

আপাতদৃষ্টিতে সেটি অতি সাধারণ জিনিস—মানুষের দেহ।

গুরুর কাছ থেকে এ পাঠ সে পায়নি। যন্ত্রম মজুমদার ছিলেন মুখ্যত প্রকৃতি শিল্পী। নেচার'এর যে অন্তহীন লীলা শুধু ক্ষণে ক্ষণে প্রতি মুহূর্তে প্রকাশমান আকাশ ও ধরণীর সর্বত্র যা পরিব্যাপ্ত, সূর্য চন্দ্র তারা মেঘমালা, নদী, গিরি, অরণ্য প্রান্তর বর্ষার শ্যামলিমা শ্রীষ্মের রুক্ষতা—প্রকৃতির এই বিপুল রূপসম্ভার তাঁর কল্পনার রঙে তুলি ডুবিয়ে বিচিত্র রেখায় প্রকাশ করে গেছেন। গৃহপালিত পশু, অরণ্যচারী প্রাণী—এদেরও তিনি প্রকৃতির অঙ্গ অংশ বলে দেখতেন এবং সেই ভাবেই তাদের স্থান দিয়েছেন তাঁর ছবির মধ্যে। মানুষের চিত্র যে একেবারে আঁকেন নি তা নয় কিন্তু তার সংখ্যা অতি অল্প এবং শুধু সেই সব মানুষ বেছে নিয়েছেন যারা নদী নালা খেত খামারের সঙ্গে একান্ত মিশে রয়েছে—নদীতে জাল ফেলছে জেলে মাঠে ফসল কাটছে চাষী, গ্রামের পথে খঞ্জনি বাজিয়ে গান গেয়ে [illegible] ঘোড়সি বেলার ঘোরের পাশ দিয়ে ঘরে ফিরছে রাখাল ছেলে। এর উপরে বড় একটা যাননি।

এনিয়ে কৃষ্ণনের সঙ্গে তাঁর কথা হত। বলতেন, "ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন 'লাল ফুল, ছোট পাখি' দিয়ে পড়াশুনা শুরু করে, আমরাও তেমনি প্রথম পাঠ এই লতা পাতা, পথ ঘাট, ফুল পাখি। তারা এগিয়ে যায়, কত কী দেখে, আমি ঐ নিয়ে পড়ে রইলাম। সারা জীবন আর প্রয়োজন হল না।"

বলে, হেসে উঠতেন। সরল সাদা হাসি। তারপর হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যেতেন। বসবার আসনের কাছে একটা ছোট জানালা ছিল। হাতের কাজ থামিয়ে তার ভিতর দিয়ে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকতেন। অনুচ্চ কণ্ঠে থেমে থেমে বলতেন, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, জল পড়ে, পাতা নড়ে—এইটিই তাঁর জীবনে আদিকবির প্রথম কবিতা। 'সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িল ও পাতা নড়িতে লাগিল।' প্রথম যেদিন পড়ি, মনে করেছিলাম এটা কবির উচ্ছ্বাস অত্যুক্তি। পরে নিজেই একদিন অনুভব করলাম, না, একটুও বাড়িয়ে বলেননি মহাকবি। গাছপালা, আকাশ জল—এদের আমরা শুধু চোখ দিয়ে দেখি না, চেতনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। এদেরও প্রাণ আছে, ভাষা আছে।

জানালা থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার কাজে ফিরে যেতাম। অসমাপ্ত ছবিটায় তুলি বুলোতে বুলোতে অনেকটা হালকা সুরে বলতেন। কিন্তু আমার কপালে ঐ পর্যন্তই। আর এগিয়ে যাওয়া হলনা।

'এগিয়ে যাওয়া আপনি কাকে বলছেন স্যার? প্রতিবাদ করত কৃষ্ণন, নেচার এর ওপরে আর কী আছে?"

"আছে বৈকি? বিধাতা পুরুষ তো শুধু গাছপালা নদী নালা পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি। এটা হল, বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন, জড়জগৎ। এর পরে রয়েছে প্রাণী জগৎ- মানুষ। তারও কি রূপের অন্ত আছে! বৈচিত্র্যের শেষ আছে। নরনারী শিশু প্রত্যেকেই এক একটি বৃহৎ বিশ্ব, এ গ্রেট ওয়ার্ক অব আর্ট।

কথাটা সেদিন অন্তরে গভীর ভাবে দাগ কেটে গিয়েছিল কৃষ্ণন। আর

মনকেও হয়তো স্পর্শ করে থাকবে। কিন্তু তার ভিতরকার গভীর তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি করতে পারেনি। সেটা করেছিল অনেক পরে। তখন মজুমদার নেই, তার বাবাও চলে গেছেন। নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার পর শেষ পর্যন্ত কিছু কিছু বাইরের অর্ডার নিতে আরম্ভ করেছে।

প্রথম কাজ—একটি কাপড় কলের বিজ্ঞাপন। মুঠাম তনু সুন্দরী যুবতী প্রিন্টেড শাড়ি পরে লীলায়িত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে হাসবে। খাটাখুটি উৎরে গেল, যদিও কলের ম্যানেজার খুঁত খুঁত করতে লাগলেন। বললেন, চুল বাঁধাটা আরেকটু ছালঙ্কারোনের হলে ভালো হত। কৃষ্ণন মনে করেছিল, শাড়িটাই এখানে আসল লক্ষ্য। সেটা পরবার ধরণ এবং যে পরেছে তার দেহের গড়ন—এই গুলোর উপর জোর দিতে হবে। পাই দিয়েছিল। সে দিক দিয়ে তার চুল বাঁধার কসরত কতখানি সাহায্য করবে বুঝে উঠতে পারলনা।

পরের কাজটি আরো শক্ত। এক দাঁতের মলমের কারখানা থেকে অর্ডার এল একটি কিশোরীর ছবি। তার এক হাতে থাকবে মলমের টিউব, আরেক হাতে থাকবে ব্রাশ। হাত দুটো দু দিকে ছাড়িয়ে মাড়িসমেত বত্রিশটি ঝকঝকে দাঁত বের করে সে হাসবে।

অর্ডার নিয়ে যে এসেছিল, রীতিমত রসিক ব্যক্তি। ছবিটা কি রকম হবে সে সম্বন্ধে একটা ছোটখাট বক্তৃতা দিল, যার সারমর্ম—ঐ হাসি দিয়েই যেন খদ্দেরকে ঘায়েল করা যায়।

সে আর এমন কঠিন কি?—মনে মনে বলল কৃষ্ণন, বত্রিশটা দাঁত রয়েছে তার হাতে।

ছবি দেখে কোম্পানীর কর্তা নিজেই ঘায়েল হয়ে গেল। তাইই সুপারিশে ক্রমে এল একটি পোর্ট্রেট আঁকার অর্ডার। কল্পনা থেকে নয়, জীবন্ত মানুষ সামনে বসিয়ে তার হুবহু প্রতিকৃতি গড়ে তুলতে হবে। ষ্টুডিওতে বসে কাজ করা চলবেনা। ছবির মালিক একজন প্রৌঢ় উকিল। দমদমে তাঁর বাগানবাড়ি। সেখানে সারাদিনের মত সব ব্যবস্থা থাকবে। সন্ধ্যা বেলায় বাড়ি ফিরে আসবে আর্টিষ্ট।

একটি পালকীগাড়ী এবং সুসজ্জিতা মহিলা এসে বসলেন ইজেলের ধারে। ভদ্রলোক স্ত্রী বলেই পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু মহিলাটির হাবভাব কথাবার্তার মধ্যে, বাড়ির আবহাওয়ায়, এবং অতিথি আপ্যায়ক যারা আনাগোনা করছিলেন তাদের আচরণে সম্পর্কটা একটু ঘোরালো বলে সন্দেহ হয়েছিল। প্রথমটা একটু কেমন কেমন লাগলেও কৃষ্ণন ও নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি। নিজেকে বুঝিয়েছিল, সে ছবি আঁকতে এসেছে, ছবি আঁকবে ঐ পর্যন্তই তার সীমানা। আর্টিষ্টের পক্ষে নীতি বাগীশ হওয়া চলে না।

পোর্ট্রেটের সেই তার প্রথম হাতেখড়ি। মানুষের দেহের, বিশেষ করে একটি নারী দেহের অন্তরঙ্গ নিকট এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান সংগ্রহের উপলক্ষ আগে কখনো ঘটেনি। তার প্রতিটি অঙ্গের যথার্থ রূপ ক্যানভাসের উপর ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তার উপরে বারবার যে গাঢ়, তীক্ষ্ণ, গভীর দৃষ্টি

করতে হচ্ছে, সে অভিজ্ঞতাও এই প্রথম। গোড়ার দিকে একটু সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। আস্তে আস্তে কাজের মধ্যে মনকে নিবিষ্ট করতে পারল, সঙ্গে সঙ্গে সে আড়ষ্টতাও কাটিয়ে উঠল। সেদিক দিয়ে, যার ছবি, তার আচরণও তাকে অনেকখানি সাহায্য করেছিল, বলা চলে। ভদ্রলোকটির চালচলন, কথাবার্তা সেকেলে। ইনিও যদি সেই ধরণের কেউ গুরুস্থ বধূ হতেন, কৃষ্ণনের কাজে অসুবিধা ঘটতে পারত। কিন্তু ইনি ঠিক উলটো, এ বেশ কিছুটা উচ্ছল এবং প্রগলভ, ইংরেজিতে যাকে বলে ফরওয়ার্ড।

সাজসজ্জা-বাহুল্য পোর্ট্রেটের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। চেয়ার সিট-এর পর তিনি যেন আপনা থেকেই সেটা বুঝতে পারলেন এবং নিজেকে প্রয়োজন মত উন্মুক্ত করতে কোন দ্বিধা দেখা গেলনা। আর্টিস্টের নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে যেখানে যেটুকু বসন সংক্ষেপ দরকার সহজেই করে ফেললেন। কৃষ্ণনের কাজও সহজ হয়ে গেল।

এ ছবিটার অর্থ তখন না বুঝলেও খানিকটা খ্যাতি এল। সূত্রে আরো কিছু 'অর্ডার' এর পথ উন্মুক্ত হল। বেশির ভাগই নারী-চিত্র। একটি এল সুদেহী পুরুষ। কিন্তু, কিন্তু বার্ধক্যের শিথিলতা সবল পেশীপুঞ্জও অল্পে ঔজ্জ্বল্য কখনো ম্লান করতে পারেনি। এক সময়ে ব্যায়ামচর্চা করতেন। যত্ন ও নিষ্ঠা দিয়ে শরীরটাকে একটু একটু করে গড়ে তুলেছিলেন। তার চিহ্ন এখনো অবশিষ্ট। সামনে এসে জামাটা খুলে ফেলে যখন দাঁড়ালেন, কৃষ্ণন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। বয়সের বিচারে অঙ্গের অসারতা সময় হয়ে গেছে, কিন্তু আসতে যেন সাহস পাচ্ছে না। চোখে মুখে, চিবুকে, গলায় তার ছায়া পড়ছে, কিন্তু স্কন্ধে, উরসে, বাহুতে এখনো পৌঁছতে পারেনি।

নাতি নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে। দেখে মনে হল সেও একজন দেহ সাধক। মুখখানা কিশোর, দেহ যৌবন-লাবণ্যে টলটল। তার কাঁধে হাত রেখে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে সামনে অর্ধনগ্ন কৃষ্ণনকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, আপনিই বুঝি আর্টিস্ট?

—আজ্ঞে হাঁ।

—বাঃ, এতো দিব্যি বাংলা বলে দেখছি। 'কৃষ্ণন' শুনে ধাবড়ে গিয়েছিলাম। ওদের ওসব ভড়মড় তো জানি না। ইংরেজি চালাবার মত বিদ্যেও নেই। আর তাতে কি তৃপ্তি হয়? মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকবো কেমন করে? বুড়ো হয়েছি, একমাত্র কাজ হল বকবক করা। বেঁচে গেলাম বাপু। তা ভাখ, আর্টিস্টবাবু, তুমি তো দেখছি নেহাৎ ছেলে মানুষ। আপনি আজ্ঞা করা কিন্তু আমার পোষাবে না।

—বেশ তো, আপনি আমাকে 'তুমি'ই বলবেন। ইচ্ছে হলে 'তুই'ও বলতে পারেন।

—বা বা।

এ না হলে আর্টিস্ট্ হয়? কথাগুলোতেও নরম তুলির টান। সময়টা কাটবে ভালো।

নাতিটি বলল, তাই বলে বেশী বকবক করোনা। ওঁর কাজের ব্যাঘাত হবে।

—ও, বাবা, তাহলেই তো মুস্কিল। তুমি কী বল? যতক্ষণ আঁকবে আমাকে চুপটি করে বসে থাকতে হবে?

—না, না; আপনি যত খুশি গল্প করবেন। শুধু আমি যখন বলবো, এবার থামুন, তখন একটু চুপ করে থাকবেন।

—বাস তাহলেই হল। তা, কতদিন থাকতে হবে তোমার কলেজে?

—কত আর!

—তার মানে তাড়তে চাওনা। রাখো যদ্দিন ইচ্ছে। নাতির যখন জিদ চেপেছে দাদুকে ঝুলিয়ে না দিলে তার ব্যায়াম চলবেনা, তখন আর উপায় কী? আমি বলেছিলাম বেশ তো, একটা ফটো-টটো তুলে টাঙিয়ে দেনা? আর খরচে হয়ে যেত। তা না; পোর্ট্রেটই চাই। বেশ, কর।

খর নামিয়ে ধীরে ধীরে বললেন টাকা কড়ি তো আর কিছু দিয়ে যেতে পারলাম না। নাতুর একটা ছবি নিয়ে যদি খুশী হতে চায়; দে।

কৃষ্ণনের ইচ্ছে হচ্ছিল, বলে, টাকা-কড়ির চেয়ে অনেক বড় সম্পদ দিয়ে যাচ্ছেন নাতিকে। দেহ-সম্পদ। নেহাৎ কবিত্বের মত শোনাবে বলে বলল না।

দেহ-সম্পদ। কথাটা মনে মনে আওড়াতে গিয়ে মনে পড়ল, তার গুরু বলেছিলেন, প্রতিটি দেহ একটি মহৎ শিল্প-

সৃষ্টি, এ গ্রেট ওয়ার্ক অব আর্ট'। কথাটার অর্থ লেখনি ঠিক বুঝতে পারেনি। ক্রমশঃ পেরেছে। সত্যিই তাই। মন্মথ মজুমদার কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেন নি।

কেবল চিত্রকলা নয় সব রকম ললিত শিল্পের প্রধান আশ্রয় এই মানব দেহ। বাঙালির ঘরে কঠিন পাথর কেটে কেটে এঁকে আশ্চর্য রূপ দিয়েছেন ভাস্কর। দুই হাত আর এক খণ্ড পাতলা কাঠের টুকরো মাত্র সম্বল করে তাদের তালের ভিতর থেকে একে বিচিত্র ভঙ্গিমার গড়ে তুলেছেন মূর্তিশিল্পী। কবি একে অপরূপ মহিমায় রূপায়িত করেছেন তাঁর লেখনীর ছন্দে ; বলেছেন,—

ওরে আজে যৌবনের তরঙ্গ উজ্জ্বল
লাবণ্যের মাঝামাঝে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে—তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র—ললাটে, অধরে
উরু'পরে কটিতটে, স্তনাগ্র চূড়ায়।
যার ঘুমে,—সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়।

চিত্র শিল্পীও তাঁর তুলিকার মুখে ব্যক্ত করেছেন সেই 'রেখায় রেখায়' পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে যে রূপ-রহস্য।

গোটা কয়েক পোর্ট্রেট, আর বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকতে গিয়ে কৃষ্ণন তার সন্ধান পেয়ে গেল। তারপর থেকে ঐ পথই সে বিশেষভাবে বেছে নিয়েছে—নতুন নতুন দেহ সম্পদের আবিষ্কারে।

অন্যের ফরমাস খাটতে হয় না, নিজের খোল খুশি মত তুলি বুলোবার অবকাশ আসে, তখনো সে বসে বসে দেহ-শিল্পের চর্চা করে আনন্দ পায়। দার্জিলিং থেকে ফিরবার পর হঠাৎ নিজের কাজে নজর দেবার সুযোগ এল তখনো তাই নিয়েই পড়েছিল। কিন্তু হিমালয়ের অরণ্য-পথে হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া যে জীবন্ত ছবিটিকে মনের মণি কোঠায় রেখে দিয়েছিল তুলির রেখায় তাকে যেন ঠিক পাওয়া যাচ্ছিল না।

॥ চার ॥

কার্ডে সময় দেওয়া ছিল সাতটা। মিনিট পনর আগেই কৃষ্ণন গিয়ে হাজির হল স্টার থিয়েটারের সামনে। গেটে যারা ছিল, তার মধ্যে সুব্রতকেও পাওয়া গেল। এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করল। হল-এর পাশে দক্ষিণের বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে বলল, ভাংশান শুরু হতে একটু দেরী হবে।

কৃষ্ণন বলল, আর্টিস্টরা তৈরী নয় বুঝি?

—আর্টিস্টরা তৈরী। ক্লাবের যিনি প্রেসিডেন্ট,—আজকের অনুষ্ঠানের প্রেসিডেন্টও তিনিই,—ফোন করে জানিয়েছেন, সাড়ে সাতটার আগে আসতে পারবেন না। চাটার্জির ফোন একটা ছুট মিলের তিনি অ্যাসিস্টাণ্ট-ম্যানেজার। লেবার ট্রাবলে আটকে গেছেন।

—তিনি না এলে বুঝি আরম্ভ হবে না?

—তা কি করে হবে? মোটা টাকা চাঁদা দেন ক্লাবে। বড় পেট্রন। বুঝতেই পারছেন।

অডিটোরিয়ামের দরজার সামনে এসে সুব্রত থেমে গেল। বলল, এত আগে আগে ঢুকে কী করবেন? বা গগোল! তার চেয়ে চলুন না গ্রীনরুমে?

—গ্রীনরুমে!

—হ্যাঁ: আপত্তি আছে?

—না, আমার আর আপত্তি কী? তবে ওটা তো নো অ্যাডমিশনের এলাকা।

—আজকের মত আমরাই মালিক। 'নো' টো বলবে কে?

—হল্ এর পাশে বারান্দার কোলে উঠোন। সেটা পার হয়ে স্টেজের পিছনে যে নিষিদ্ধ জগৎ তার সম্বন্ধে অন্যের মত কৃষ্ণনের মনেও একটা কৌতূহল ছিল। রঙ্গমঞ্চে পা প্রদীপের আলোয় নটরূপে যাদের দেখি তাদের একটা সাধারণ রূপ আছে। দর্শক সেটা দেখতে পায় না। এ দুয়ের মাঝখানে অন্তরাল রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে ঐ গ্রীনরুম। ওর মধ্যে কেমন একটা রহস্য জড়িয়ে আছে। ঐ খানকার চৌহদ্দি লেগে বিচিত্র রূপান্তর ঘটে অভিনেতার দেহে। শুধু দেহে নয়, কিছুটা হৃদয়েরও মনেও। অডিটোরিয়ামের আসনে বিশ শতাব্দির কোলাহল মুখর রাজপথ দিয়ে ট্রামে চড়ে যে লোকটি বাজারের থলে নিয়ে ফিরছিল ঐ গ্রীনরুমের দুজন কারিগর, যাদের নাম 'মেকআপ' এবং 'ড্রেসার' গোটা কয়েক তুলির টান এবং কিছু রঙ মাখিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল ষোড়শ কিংবা

অষ্টাদশ শতাব্দির মাঝখানে। ওখানে যখন সে ঢুকেছিল, একজন হেড়ে টাকা মাইনের ছা পোষা গৃহস্থ, বহুপতি সরকার, ওখান থেকে বেরিয়ে স্টেজে গিয়ে যখন দাঁড়াল, তখন সে ছত্রপতি শিবাজী, কিংবা যুবে বাংলার অধিপতি নবাব সিরাজউদ্দৌলা!

ভাবতে গেলে বিস্ময় লাগে বৈ কি?

ঢুকতেই বাঁ দিকে বসবার ঘর। সেখানে কেউ নেই। পেরিয়ে গেলে একটু অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত জায়গা। এখানে ওখানে অভিনেতারা মেক আপ নিচ্ছে। কেউ দুর্বাসা ঋষির আলখেল্লা চাপিয়ে একরাশ চুল দাড়ি লাগিয়ে মাটির ভাঁড়ে চা খাচ্ছে। এরা সাধারণ স্তরের অ্যাকটর, অল্প স্বল্প পার্ট। দু'চার সীনেই শেষ। এদের সঙ্গে দু'চারটা কথাবার্তা সেরে যুবক কৃষ্ণনকে নিয়ে বিশিষ্ট আর্টিস্টদের এলাকায় গিয়ে ঢুকল। ঘরগুলোর চেহারাও বিশিষ্ট। বড় বড় আলি এবং ভাল আসবাব দিয়ে সাজানো। মোহিতের সঙ্গে দেখা। সেই নায়ক। সাজ-সজ্জার পালা শেষ করে এসে গেছে। শুধু সমাপ্তির স্পর্শ টুকু বাকী, ওদের ভাষায় যাকে বলে ফিনিসিং টাচ্।

কৃষ্ণনকে দেখে সামনে এসে দাঁড়াল। খুশী হয়ে বলল, আপনি এসে পড়েছেন, ভালোই হল। দেখুন ঠিক হল কিনা।

—একদম ঠিক। চমৎকার মানিয়েছে আপনাকে। রোলটা কী?

—একজন বাঙালী যুবক। নতুন চাকরি পেয়েছে মাক্লিলিং-এ। ভালো চাকরি। এটা হল অফিসের পোষাক।

—সুন্দর হয়েছে। নাটকের নামটা যেন কী?

—দুরাশা কন্যা।

—প্রেমের ব্যাপার?

—খানিকটা। একটি পাহাড়ী মেয়ের সঙ্গে—

"আচ্ছা, দেখুন তো, এর ও পরে কি—"

হঠাৎ নারী কণ্ঠ শুনে দরজার বাইরে তাকিয়েই কৃষ্ণন স্তম্ভিত হয়ে গেল। আশ্চর্য মিল! মনে হল সেকল থেকে ঘুরে অনহীন গিরি পথের বাঁকে যাকে সে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিল, সে-ই যেন কোন্ যাদু মন্ত্র বলে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে এই হাল ফিয়েটারের মেক-আপ্ রুমের সামনে। না, মুখের মিল নেই। এ মুখ বাঙালী মেয়ের, কিন্তু সেখানা পর্বত দুহিতার। সেই কাঁধ ছুটি একেবারে বসানো, গলার খাঁজটি অবিকল এক। তার নীচে—

একটি অপরিচিত বিদেশী যুবকের তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টির সামনে, বিশেষ করে যুবকের উপর, মেয়েটি রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছিল।

একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। খানিকটা বিস্মিত হল মনে মনে।

হঠাৎ থেমে যেতে দেখে মোহিত জিজ্ঞাসা করল, আঁ! কী বলছিলেন?

—বলছিলাম, যে এর ওপরে কি শুভনার দরকার আছে?

—আসল চোকুরেই জিজ্ঞেস করা যাক। ইনি কে জানেন তো? মিস্ নাত আর্টিষ্ট্ এস্ কৃষ্ণন।

কৃষ্ণনের দিকে ফিরে বলল, দেখুন তো পাহাড়ী মেয়ের মেক আপটা কেমন হল? সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। গাঁ থেকে নতুন সহরে এসেছে।...ইনিই আমাদের আজকের হিরোয়িন, মলয়া দে।

কৃষ্ণন হাসিমুখে হাত তুলে নমস্কার করল। মলয়ার মুখ গম্ভীর। প্রতি নমস্কারটা কোন রকমে সেরে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকাল। কৃষ্ণন মিনিট দুয়েক তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরখ করে বলল, এক আধটু ত্রুটি আছে তবে কোলকাতার লোকে ধরতে পারবে বলে মনে হয় না। মাক্লিলিং-এ হলে ধরা পড়ত।

মোহিত পাকা পরিচালক। বলল, ধরতে পারুক আর না পারুক, তাই বলে ত্রুটি থাকবে কেন? কি বল চন্দ্রত?

—নিশ্চয়ই। ওঁকে যখন পাওয়া গেছে, তখন সে দিকটা শুধরে নেওয়া যাক।

শোবার ঘরে খানিকটা চেঞ্জের ছিল। ড্রেসিংরুমে ডাকানো হল। যেখানে যেখানে বদলানো দরকার তাকে যথারীতি নির্দেশ দিল কৃষ্ণন।

নাটকের প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে নায়িকা। তারে

অনেক বার আসতে যেতে হল। অভিনয় এখন কিছু উঁচু-ধরের নয়, নাটকও তৃতীয় শ্রেণীর। সে সব দিকে কৃষ্ণনের লক্ষ্য ছিল না। সে সারাক্ষণ ধরে অভিনেত্রীকে দেখল। তার দেহের নানা ভঙ্গি ও ব্যঞ্জনা। দেখতে দেখতে তার অসমাপ্ত ছবির যে সূক্ষ্ম অংশটুকু মন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, কিংবা মনে থাকলেও তুলির মুখে আসছিল না, তার কিছু কিছু সন্ধান পেল। তবু কিছু বাকী রয়ে গেল। সেটুকু পুরো করতে হলে ওকে আরো কাছে পাওয়া দরকার। ঈশ্বরের ফ্রেমে যে মূর্তিটি বন্ধ হয়ে আছে তার পাশে দাঁড় করিয়ে, মিলিয়ে নেওয়া দরকার। শুধু দাঁড় করানো নয়, বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের যে বিন্যাস, সে চাই ওকে দিয়ে ভাঙ্গিয়ে নেওয়া দরকার। অর্থাৎ শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গিতে মডেলের যে প্রয়োজন। চিত্রকর বা ভাস্করের ইচ্ছাকে সে নিজের দেহে রূপায়িত করে তোলে। সেই পরিস্ফুট রূপ ধরা দেয় তুলি কিংবা বাটালির মুখে। সেদিক দিয়ে ভাস্কর্যে অঙ্গসঞ্চালনের ঘৎসিত্রে—মানুষের দেহ যেখানে নানা ভাবে অভিব্যক্ত—মডেলের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়ে গেছে। অন্তরালে থাকলেও তার দান কম নয়।

পোর্ট্রেটারে মডেল অনাবশ্যক। যার ছবি, সেই সেখানে মডেল। কিন্তু বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকতে গিয়ে কৃষ্ণন দু-একবার মডেলের সাহায্য নিয়েছে। কোম্পানীর মালিকেরাই তাদের সংগ্রহ করে এনেছেন। একবার এক সিগারেট কোম্পানীর ম্যানেজার বসিয়ে দিয়ে গেলেন একটি রূপসী মেয়ের। যুবকের মুখে সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছেন যুবতী। পরিকল্পনাটা কৃষ্ণনের। ম্যানেজারের ইচ্ছা ছিল, দু'জনের মুখেই সিগারেট থাকবে, তৃপ্তির সঙ্গে টানবে দর্শকদের দিকে চেয়ে।

কৃষ্ণন বোঝাল, মেয়েদের সিগারেট টানাটা এ দেশে বেশির ভাগ কাস্টমারের চোখে আপত্তিকর বলে মনে হবে এবং সিগারেটের কাটতির ওপর সেই বিরূপ মনোভাবের প্রভাব পড়তে পারে। আসলে কাটতি বাড়ানোই তো উদ্দেশ্য।

তখন আর্টিস্টের উপর ডিজাইনের ভার ছেড়ে দিলেন কর্তৃপক্ষ।

কৃষ্ণন তার মডেল যুবতীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেনি। তাদের চেহারা, হাবভাব ও কথাবার্তায় বুঝেছিল, ওরা ঘরের ছেলে মেয়ে। বোধ হয় এক সঙ্গে কলেজে পড়ে কিংবা এক পাড়ায় থাকে। কিছু পকেট খরচ কামিয়ে নিয়ে গেল। গোটা কয়েক সিনেমা আর কদিনের বাড়তি সিগারেটের খরচটা উঠে যাবে।

ছেলেটি চুপি চুপি সঙ্গিনীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলছিল, ছবিটা যদি তোমাদের বাড়ীর কারো নজরে পড়ে যায়?

মেয়েটির চোখে মুখে হঠাৎ এক পোঁচ আশঙ্কার ছায়া। সেটাকে যেন জোর করে ঠেলে ফেলে দিয়ে বলল, আমাদের বাড়িতে ইলাস্ট্রেটেড্ উইকলী আসে না।

—যদি যদি তেমন কোনো কেউ গিয়ে লাগিয়ে দেয়?

কার এমন গরজ পড়েছে?

আমিও তো করতে পারি।

—তুমি! নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ।

বলে হেসে গড়িয়ে গেল মেয়েটি। তার সঙ্গীও যোগ দিল সেই সঙ্গে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে ছদ্ম গাম্ভীর্যের সুরে বলল মেয়েটি, সত্যি, একবার চেষ্টা করে দেখনা? অ্যাডভার্টাইজমেণ্টের মোটা পাঁঠিটা অনেক দিন কাজে লাগেনি।

আবার এক পশলা মিলিত হাসি।

এই তরুণীর মডেল হওয়াটা দুষ্প্রাপ্য নয়। সামান্য কাজ, এবং তার মধ্যে এমন কিছু নেই যাকে দূষণীয় বলা যায়। কিন্তু একজন অপরিচিত পুরুষ আর্টিস্টের নিভৃত দৃষ্টিভঙ্গির সামনে একা মেয়ে এসে দাঁড়াবে, তার নির্দেশমত নিজেকে অনাবৃত করবে, যখন যেটা প্রয়োজন, বিভিন্ন অঙ্গকে সঞ্চালিত করবে আর্টিস্ট যেমন চায়—শিল্পীর দৃষ্টিতে তার মধ্যে পবিত্র কিছু না থাকলেও এদের বর্তমান সামাজিক পরিবেশে সে আশা যে দুরাশা মাত্র, কৃষ্ণন সে বিষয়ে সজাগ। তার ওপর আলাদা এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছে, যারা ঠিক সম্ভ্রান্ত সমাজের একেবারে নীচে না। দু'একজন পরিচিত আর্টিস্টের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের সে দেখেছে। তারা যে বড় বেশী কৃত্রিম, দম দেওয়া পুতুলের মত। রক্তমাংসের মানুষের মত সজীব নয়। তার চেয়েও বড় কথা, তারা অভিমাত্রায় ব্যক্ত,

প্রথমত। নিজেকে এমন ভাবে মেলে দিয়ে বেখেছে যে, শিল্পীর নিজস্ব আবিষ্কারের কোনো পথ নেই। একটা বেশী ফুটে যাওয়া ফুলের মধ্যে যেমন ফুলের সুষম সঙ্গীত খুঁজে পাওয়া যায় না, তার ফুলত্ব চলে গেছে, এদের মেয়ের মধ্যেও তেমনি মেয়েত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন।

অবশ্য মনোজ বলতে তো এরাই।

মনোজকে যদি পাওয়া যেত ষ্টুডিওতে?—এমনি একটা তীব্র প্রত্যাশা কৃষ্ণনের চোখের মনে একবার দেখা দিয়েই মুছে হয়ে গিয়েছিল। সে অসম্ভব।

এই জাতীয় দৃশ্যের রিহার্সালের সময় দৃশ্য পরিবর্তন অনেকেই দেখে না, দেখা সম্ভব নয়। কৃষ্ণনও সে চেষ্টা নিয়ে আসেনি। কিন্তু থেকে গিয়েছিল। অভিনেতাদের দিকে এবং মঞ্চসজ্জার মাঝে মাঝে লাইটকে সে অনুসরণ করেনি। তাতেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কয়েকটি বিশেষ দৃশ্য ছাড়া অভিনয়ের দিকেও তার মন ছিল না।

যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে আবার যখন তার উত্তোলন ঘটল এবং নট-নটীরা একযোগে রঙ্গমঞ্চের উপর আবির্ভূত হলেন—(বাস্তবিক কালে অপেরাদলের নাট্যাভিনেতার যেটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে)—তখন সে নায়কের সন্ধানে পড়ে গেল। মোহিত চোখের ইঙ্গিতে অপেক্ষা করতে বলল এবং মিনিটখানেকের মধ্যেই একটি ছেলে এসে তাকে আবার গ্রীনরুমে ডেকে নিয়ে গেল।

দৃশ্যের রং ঘষে তুলতে তুলতে মোহিত বলল, কেমন দেখলেন, বলুন।

—বেশ।

—ঠিক বলছেন তো?

উত্তর না দিয়ে কৃষ্ণন একটু হাসল। মোহিত বলল, তাহলেই হল। আপনার মত একজন আর্টিস্টের চোখে যখন লেগেছে, তখন বুঝতে হবে উৎরে গেছে। এর বেশী আমাদের আর কিছু চাইবার নেই।

কৃষ্ণন বেরিয়ে আসছিল। দরজার মুখে মনোজের সঙ্গে দেখা। এখন তার অন্য বেশ। সাধারণ একখানা ছাপা শাড়ি, ব্লাউজ, পিঠের উপর একরাশ খোলা চুল। ঠোঁটে, গালে, কপালে রঙ নেই, চোখের কাজল তুলে ফেলা হয়েছে। শান্ত মুখখানা, একটু বিষণ্ণ ম্লান, তার উপরে ক্লান্তির ছায়া।

কৃষ্ণনকে দেখছিল। চোখে চোখ পড়তেই দৃষ্টি নামিয়ে নিল মনোজ। ভিতরের দিকে চেয়ে বলল, চলি, মোহিত দা।

—আসুন, এলো। খামটা পেয়েছ?

—পেয়েছি।

—কেউ পৌঁছে দিয়ে আসবে?

—না না: আমি নিজেই যেতে পারবো। যাই তো এখনো চলছে।

ক্রত পায়ে যখন বেরিয়ে গেল, কৃষ্ণনের চোখ দুটি তখনো তাকে অনুসরণ করছিল। সখা করে মোহিত বলল, কেমন দেখলেন ওর অভিনয়?

—মন্দ কী?

—দেখতে ও মন্দ নয় মেয়েটি। শুধু হাইট-এ একটু ছোট।

—তাহলেও মোটামুটি করেছেনটা ভালো।

—আপনাদের তো আবার ঐটাই আসল। আমাদের লাইনেও অনেকটা তাই। অন্য সব গুণ যতই থাক, ভালো ফিগার না থাকলে অভিনয় চলে না। সকলের আগে চাই ফ্রেজ, ফিটিং চেহারা।

সুব্রতর খোঁজ করল কৃষ্ণন। সে একটু আগেই চলে গেছে। কোথায় নাকি জরুরী কাজ আছে, শেষ অবধি থাকতে পারল না।

দিন-দিনেক পরে ষ্টুডিওতেই দেখা হয়ে গেল। দেখল-চালি ধরজা খুলে এধারে আর নীচে বসতে বলল না, সোজা উপরে উঠে যেতে ইঙ্গিত করল। বসবার ঘরে কৃষ্ণনকে পাওয়া গেল না। সাড়া আওয়াজ করতেই পাশের ঘর থেকে সাড়া এল, কে?

—আজ্ঞে, আমি সুব্রত।

—ও, আসুন না?

—ওখানে আসবো?

—দোষ কী?

ষ্টুডিওতে ঢুকে সুব্রতর প্রথম নজর পড়ল উত্তরের দিকে। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, চমৎকার! একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

—কী, বলুন

—ছবিটা কবে শুরু করেছেন, জানতে পারি?

—আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। শুরুটা আগেই হয়ে গেছে।

—আমি মনে করেছিলাম, আইডিয়াটা বোধহয় ওখান থেকে এসেছে।

না তা ঠিক নয়। তবে কিছুটা ইন্সপিরেশন যে আক্ষরিক সে কথা বললে মিথ্যে বলা হবে। অন্তত এটুকু স্বীকার করতে বাধা নেই যে আপনাদের বাড়ি দেখতে না গেলে, একে এখানে বসাতে পারতেন না। এর জন্যে ছুটি এসে যেত।

—সে কী! এটা তো এখনো শেষ হয়নি মনে হচ্ছে। তার আগেই সরিয়ে নিতেন।

—সে রকম কত হয়! আরম্ভটা আর্টিস্টের হাতে, কিন্তু পরিণতি নির্ভর করে ছবির নিজস্ব যে গতি আছে, তার ওপর। অর্থাৎ আমি শুধু তাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করতে পারি, দাঁড়াবে কিনা কিংবা কিরকম দাঁড়াবে, সেটা স্থির করবার মালিক সে নিজে। কথাগুলো হেঁয়ালির মত ঠেকছে, তাই না?

—ঠিক যে বুঝতে পারছি, তা নয়। মনে পড়ছে একজন নামকরা লেখকের মুখে অনেকটা এই ধরণের কথা শুনেছিলাম। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি যে এত চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে কোন্‌টি আপনার সব চেয়ে প্রিয়? তিনি হেসে বলেছিলেন, কোনো চরিত্রই আমি সৃষ্টি করিনি, ওরা সব আপন খুশি মত গড়ে উঠেছে। আমি শুধু ওকে তার নিজের পথে ছেড়ে দিয়েছি। তা যদি না দিতাম, তাহলে পুতুল তৈরী হত, রক্ত মাংসের মানুষ হত না।

—ঠিক কথাই বলেছেন তিনি। ছবিও তেমনি নিজের পথ ধরে চলে; আর্টিস্ট তার মোটামুটি গতিদেন মাত্র। আমার একে তাই দিতে পারছি না। তাই থেমে গেছে।

সুব্রত চুপ করে রইল। একজনের কথাগুলো বালকের সুরে বলা হলেও, তার মধ্যে যে একটা গভীরতার স্পর্শ রয়ে গেছে, সেটা সে বুঝল। কিন্তু কি বলবে সে? ওর প্রশ্নের পাড়া মাথা কি না বলে ভাবছে, কুমার বলল, আপনি বোধ করি ভাবছেন, কোথায় বসিয়ে এসেছিলাম। তাতেও বিশেষ কোনো...

এমন একটা সুন্দর শিল্পকর্ম অসমাপ্ত হয়ে পড়ে থাকবে? সুব্রতর ভেতো বড় খারাপ লাগল। যদিও তার কিছুই করার নেই, তবু এমনিই অনেকটা কথার পিঠে কথার মত বলল, কি হবে এগোয়?

কথাটা শেষ করে নিতে দিল না কুমার। সুব্রতর মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণ চোখ তুলে ছবির দিকে দৃষ্টি ফেরাল। কিছুক্ষণ

কি ভাবল। তারপর বলল, কথাটা আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না সুব্রতবাবু। আমার ওক বন্ধুর এ পৃথিবীতে শিল্পী আছেন শুধু একজন, তিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাঁর অনুকরণ করি মাত্র। খুব খাঁটি কথা। অনুকরণ বন্ধ থেকে করা যায়, কিন্তু এমন একটা স্টেজ আসে যখন ধাকে অনুকরণ করছি, তার জীবন্ত রূপটাকে চোখের ওপর না রাখলে চলে না। একখানা ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকতে গেলেও অনেক সময় হয় তুলি কাগজ নিয়ে মাঠের ধারে গিয়ে বসতে হয়। মনের দেখা আর চোখের দেখার অনেক তফাৎ।

ইঙ্গিতটা সুব্রতর কাছে অস্পষ্ট রইল না। উজ্জ্বল উপরকার ছবিখানাকে সে এতক্ষণ অনেকটা ভাসাভাসা ভাবে দেখছিল, এবার একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখল। সে ছবি আঁকে না। অঙ্কন বিদ্যায় তার কখন নেই, কিন্তু ছবি তুলত, কিছুটা ফটোগ্রাফির জ্ঞান ছিল। বয়সেও তার থেকেই মনে হল, সেদিন তাদের নাটকের পাহাড়ী নায়িকার দিকে কৃষ্ণন যে গভীর সাগ্রহ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিল, তার মধ্যে নিছক কৌতূহল ছাড়া আরো কিছু ছিল। এর সঙ্গে তার কোথায় যেন মিল আছে, এবং সেটা শুধু পোষাকের নয়।

"আপনার 'ইন্সপিরেশন' কথাটার তাৎপর্য ধরতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে" ছবির উপর চোখ রেখেই মাথা নেড়ে বলল সুব্রত, "এবং আমার যে প্রশ্ন ছিল—কি হলে এগোয়,—তার উত্তরও বোধ হয় পেয়ে গেছি। মুস্কিল হচ্ছে, আমার সঙ্গে ওদের ঠিক সরাসরি যোগ নেই। মোহিত,—আমাদের ড্রামাটিক ডিরেকটর, ও সব আনে-শোনে।...দেখি কি করা যায়।

সুব্রতর পিঠ ছিল দরজার দিকে। পিছনে কেমন একটা মৃদু বন বন আওয়াজ শুনে ফিরে তাকাতেই আর একটা ছবি! একখানি কালো মুখ এবং দুটি বলপয়েন্ট কালো চোখের ওপর প্রসারিত একটি চওড়া হাসি। কবি এবং চিত্রশিল্পীর চোখে এরই নাম বোধ হয় "কৃষ্ণ মেঘে উত্ত ডম্বিং শিখা।"

কৃষ্ণনের দৃষ্টিও ছিল ঐ দিকে। প্রথম, প্রসন্ন দৃষ্টি। হঠাৎ অনুযোগের সুরে বলল, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

হাসিটা একটুখানি সরল, কিন্তু স্পষ্ট নয়। একটা চাপা হি-হি-হোহোর আওয়াজ। আর কোনো জবাব না দিয়ে, ঘাটু ঘরে টিপয়ের উপর তুলোরাশি কফি সমেত ট্রেখানা নামিয়ে রাখল দেখলাম।

॥ পাঁচ ॥

মলয়া যখন বাসায় ফিরল, বেশ রাত হয়েছে। পাড়াটা (সহর-কলকাতার বাইরে, নারকেল ডাঙা অঞ্চলে) নটা বাজতেই নিঝুম হয়ে যায়। কিছুক্ষণ আগে খানিকটা ঘুরে নদীর দোতলার ঘর থেকে এগারটার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে প্রিয়নাথ। বাচ্চা ঝিটা ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকেও ডেকে তুলে বিদায় করে দিয়েছে।

এ রকম মাঝে মাঝে হয় মলয়ার। আজ যেন একটু বেশী হচ্ছে। প্রিয়নাথ ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হচ্ছিল, এবার দরজা খোলার সাড়া পেয়ে বলল, লক্ষ্মী এলি?

এটা মলয়ার আসল নাম। বাইরে বেরোবার সময় যেমন আট পৌরে কাপড়টা ছেড়ে একখানা পোষাকী শাড়ি পরে নেয়, তার সঙ্গে কখনো কখনো এক জোড়া নকল বালাও পরতে হয়, তেমনি ঐ নকল এবং পোষাকী নামটাও জড়িয়ে নেয় নিজের সঙ্গে। বাড়ি ফিরে আবার শাড়ি গয়নার মত খুলে রেখে দেয়।

এই মাত্র ঘরে ঢুকে সেই নিত্যকার কাজটাই করতে যাচ্ছিল। আধ ময়লা কাপড়টা হাতে নিয়ে আবার রেখে দিয়ে বলল, যাই দাদা। পরক্ষণেই এ ঘরে এসে বলল, তুমি এখনো ঘুমোওনি? খেয়ে নিয়েছ তো?

প্রিয়নাথ দুটো প্রশ্নের কোনোটারই জবাব না দিয়ে বলল, আজ এত দেরি হল যে তোর?

আর বেশ কোনো ছুটির পর আজ আবার কন্ডীঠাকুরুণের বাড়ি যোড়তে হয়েছিল।

—"কেন?" প্রিয়নাথের কণ্ঠে অনুযোগের রেশ।

—ওঁর শরীর খারাপ। এদিকে অনতিনেক যাত্রীর নেমন্তন্ন করে বসে আছেন। দিন বুঝে রান্নার লোকটিও উধাও।

—যদি তোকে নিয়ে অমনি টানাটানি করে?

হাসিটা একটুখানি সরল, কিন্তু স্পষ্ট নয়। একটা চাপা হি-হি-হোহোর আওয়াজ। আর কোনো জবাব না দিয়ে, ঘাটু ঘরে টিপয়ের উপর তুলোরাশি কফি সমেত ট্রেখানা নামিয়ে রাখল দেখলাম।

॥ পাঁচ ॥

মলয়া যখন বাসায় ফিরল, বেশ রাত হয়েছে। পাড়াটা (সহর-কলকাতার বাইরে, নারকেল ডাঙা অঞ্চলে) নটা বাজতেই নিঝুম হয়ে যায়। কিছুক্ষণ আগে খানিকটা ঘুরে নদীর দোতলার ঘর থেকে এগারটার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে প্রিয়নাথ। বাচ্চা ঝিটা ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকেও ডেকে তুলে বিদায় করে দিয়েছে।

এ রকম মাঝে মাঝে হয় মলয়ার। আজ যেন একটু বেশী হচ্ছে। প্রিয়নাথ ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হচ্ছিল, এবার দরজা খোলার সাড়া পেয়ে বলল, লক্ষ্মী এলি?

এটা মলয়ার আসল নাম। বাইরে বেরোবার সময় যেমন আট পৌরে কাপড়টা ছেড়ে একখানা পোষাকী শাড়ি পরে নেয়, তার সঙ্গে কখনো কখনো এক জোড়া নকল বালাও পরতে হয়, তেমনি ঐ নকল এবং পোষাকী নামটাও জড়িয়ে নেয় নিজের সঙ্গে। বাড়ি ফিরে আবার শাড়ি গয়নার মত খুলে রেখে দেয়।

এই মাত্র ঘরে ঢুকে সেই নিত্যকার কাজটাই করতে যাচ্ছিল। আধ ময়লা কাপড়টা হাতে নিয়ে আবার রেখে দিয়ে বলল, যাই দাদা। পরক্ষণেই এ ঘরে এসে বলল, তুমি এখনো ঘুমোওনি? খেয়ে নিয়েছ তো?

প্রিয়নাথ দুটো প্রশ্নের কোনোটারই জবাব না দিয়ে বলল, আজ এত দেরি হল যে তোর?

আর বেশ কোনো ছুটির পর আজ আবার কন্ডীঠাকুরুণের বাড়ি যোড়তে হয়েছিল।

—"কেন?" প্রিয়নাথের কণ্ঠে অনুযোগের রেশ।

—ওঁর শরীর খারাপ। এদিকে অনতিনেক যাত্রীর নেমন্তন্ন করে বসে আছেন। দিন বুঝে রান্নার লোকটিও উধাও।

—যদি তোকে নিয়ে অমনি টানাটানি করে?

—উনিও ছিলেন। দু'জনে মিলে হাতে হাতে করে ফেললাম।

—কাল আবার বাসন মাজতে যেতে হবে তো?

তীব্র শ্লেষের সুর। লক্ষ্মী মনে মনে হাসল, জবাব দিল না। প্রিয়নাথ রাগ দেখার মত দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে বলল, কাল থেকে তোমাকে আর ওখানে যেতে হবে না। ঐ আচার কারখানার সিঁড়ি না ঘাটলেও চলবে।

"আচ্ছা কালকের কথা কাল হবে।" শান্ত ধীর স্বরে দাদার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল লক্ষ্মী, "এখন মাথা গরম না করে ঘুমোও দিকিনি। অনেক রাত হয়েছে।"

কার্তিকের শেষ। একটু একটু ঠাণ্ডা পড়তে শুরু হয়েছে। গায়ের চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে দিয়ে, শুরু-পোষের পাশে রাখা এঁটো বাসন কখানা তুলে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল লক্ষ্মী।

এখানেও অভিনয়। ঠেলে রোজ নামতে হয় না, কিন্তু বাড়িতে তাকে প্রতিমুহূর্তে অভিনেত্রীর মুখোশ পরে থাকতে হয়, বানিয়ে বানিয়ে পার্ট বলে যেতে হয়। ভাবতে গেলে কখনো হাসি পায় কখনো সমস্ত মন ক্ষোভে দুঃখে নিরাশায় ভরে ওঠে। সারাদিন ধরেই কি তাকে এমনি মিথ্যাচার চালিয়ে যেতে হবে? পদে পদে ভয় প্রতি মুহূর্তে।

ধরা পড়বার আশঙ্কা, আত্মীয় পরিজন, পরিচিত মানুষের দৃষ্টির আড়ালে চোরের মত পালিয়ে বেড়ানো, কত রাতে লোকের মন বুঝিয়ে চলা। মাঝে মাঝে বড় অসহ্য হয়ে ওঠে। বাসন ক্লান্তিতে দেহ মন ভেঙে পড়ে। আবার উঠতে হয়। বহু ঘুরে বৃত্তি ফেলেও এর হাত থেকে মুক্তির কোনো সম্ভাবনা চোখে পড়ে না।

দেশ থেকে ঐ দাদার হাত ধরে একদিন তাকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। 'দেশ' আর বলে কেমন করে? নিতান্ত বিদেশের চেয়েও নিষ্পর। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে আফ্রিকা কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার প্রান্তে গিয়েও তুমি স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পার। যদিও তাদের ভাষা, পোষাক পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি, সভ্যতা সংস্কৃতি সবই আলাদা এবং তোমার একান্ত অপরিচিত। কিন্তু তিন হাত ঘুরে আজন্মের পরিচিত পথ-ঘাট, নদী-নালা মানুষ-জনের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে পার না। সেখানে তুমি অপরাধী, তোমার জীবনধারার সঙ্গে তোমার রক্তের যোগ। তবু পার না। সে দেশ তোমার কাছে সুদূরতম বিদেশ। সে দেশের যারা অধিবাসী, তারা তোমার পরম শত্রু! এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী আছে পৃথিবীতে? তেমনি এর চেয়ে চরম সত্যও কিছু নেই।

এ-সব চিন্তা যখনই আসে দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে দেয় লক্ষ্মী। কী হবে ভেবে? তার চেয়ে অনেক বেশী নিকট, অনেক বেশী স্পষ্ট এখানকার জীবন। এখানে এসে কি আপন জনের দেখা পেয়েছে? পায়নি। নিজের লোক বলতে যাদের বোঝায়—যাদের সঙ্গে কম-বেশী রক্তের সম্পর্ক রয়ে গেছে, তারাও বড় একটা ফিরে তাকায়নি। সবাই তাদের একান্ত অন্তরঙ্গ সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে কোন রকমে অস্তিত্বটুকু বজায় রাখতেই পরমব্যস্ত। তার বাইরে তাকাবার ফুরসৎ কোথায়? প্রিয়নাথকে তাই সম্পূর্ণ একক চেষ্টায় দাঁড়াতে হয়েছিল। জোর নয়, ক্যাপ নয়, জবর দখল কলোনী নয়, পুনর্বাসনের আশায় সরকারী দাক্ষিণ্যের দিকে হতাশ নয়নে চেয়ে থাকা নয়। তার লক্ষ্য ছিল মাত্র দুটি মানুষের প্রাথমিক সংস্থান—দু'মুঠো অন্ন আর একটি মাথা গুঁজবার স্থান।

তা সে পেয়েছিল। লেখাপড়া কিছু জানা ছিল বৈকি? কিন্তু কলেজে-পড়া বিদ্যা কোন কাজে লাগেনি। শহরের জোরে ঢুকতে পেরেছিল একটা লোহালক্কড়ের কারখানায়। ভারী ভারী হাতুড়ী নিয়ে কারবার। সেগুলো নিরাপদে নাড়াচাড়া করবার কৌশল আছে। সেটা অভ্যাস সাপেক্ষ। ধৈর্যধরে আয়ত্ত করতে হয়। তাতে সময় লাগে। কিন্তু সে সময় দিতে চায়নি প্রিয়নাথ। এই প্রাথমিক স্তরটা তাড়াতাড়ি পার হয়ে যেতে চেয়েছিল। নিছক পেশীর জোর থেকে কিঞ্চিৎ বুদ্ধির কৌঠায় উন্নয়ন। শুধু হাতের কাজ নয়, তার সঙ্গে একটু মস্তিষ্কের সংযোগ।

মালিক সেটা লক্ষ্য করে বলেছিল, অত তাড়াতাড়ি করোনা প্রিয়নাথ। প্রত্যেক কাজেরই একটা বাঁধাধরা পথ আছে। সেই ধরে চল, শর্ট-কাট করতে যেওনা।

যে কারিগরের কাছে সে কাজ শিখত, সেও তাকে

বারবার সাবধান করে দিয়েছিল—এ শালা বড়ই বদমাইস আছে, প্রিয়নাথ বাবু। ঠিকমে চালাবে তো ও তোমার নোকর, জরাসে বেঠিক দেখি হোবে, একদম ঘুষমে চোরে যাবে। আর শালাকে পারবেনা। বহুৎ হুঁসিয়ার।

কিন্তু প্রিয়নাথের যে আরো টাকা চাই। ছোটবোনটিকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। একটি বাচ্চা ঝি রাখতে হয়েছিল তাকে সাহায্য করবার জন্য। স্কুলে যায়, বড় হয়েছে; দশটি মেয়ের সঙ্গে মেশে, সুতরাং জামা কাপড়, ভেল সাবানের দিকেও একটু নজর দিতে হয়েছিল। সামান্য নড়চড়ে তুলোছিল না। আর একটু উপরে ওঠা দরকার, 'ইস্তা'টা কিছু বাড়বে। ধোবা'যা মাস্তার একটু একটু করে এগোতে গেলে তার চলে না। স্পীড্ বাড়াতে হবে।

কিন্তু সংসারে কিছুই তোমার ইচ্ছা বা প্রয়োজন মত ঘটে না। তোর ঘরে ঘটতে গেলে যা হয় তার নাম দুর্ঘটনা। প্রিয়নাথের বেলাতেও তাই হল। লছমানদরদারের ভাষায় 'হজুর' 'হাবানি' করে বসল। একটা ভারী লোহা কেমন করে যেন পড়ল গিয়ে পায়ের উপর। গোটা কয়েক হাড় গুড়িয়ে দিয়ে গেল।

বেশ কিছুদিন হাসপাতালে কাটিয়ে যখন বাড়ি ফিরল। সবই আছে, শুধু বাইরে থেকে দুটো পয়সা কুড়িয়ে আনতে হলে যার সাহায্য একান্ত দরকার, এক জোড়া পা, তার একটি নেই। লাঠি থাকতে কোন রকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তক্তপোষের উপর গিয়ে পড়ল।

আরেকটা যে নিশ্চিত 'ঘটনা'র জন্যে মনে মনে তৈরী হয়ে ছিলছিল প্রিয়নাথ, সেটা দেখল ঘটে নি। লক্ষ্মী তখনো বেঁচে আছে! পরে শুনেছিল, কারখানা থেকে যে একজন তার বাঁধা মাইনে (যার পরিমাণ অতি সামান্য) এবং তার সঙ্গে আরো কয়েকটা টাকা দিয়ে গিয়েছিল। সম্ভবতঃ তার কাটা পায়ের দাম, যদিও মালিকের সে আইন কিছু দেবার কথা নয়, তাদের তরফ থেকে কোনো ত্রুটি ছিল না।

বিদ্যাসাগর বসে বসেও রোজগার চলে। কিন্তু সে বিদ্যা, সম্প্রতি বা সে দিকে কোনো সম্ভাবনা—প্রিয়নাথের বেলায় সবটারই অভাব। লক্ষ্মী সেটা বুঝল, এবং তাকেই নামতে হল জীবিকার ধান্দায়। স্কুল ছাড়তে হয়েছিল আগেই। এবার ঘরকে আঙিনায় এবং না জানিয়ে ঘোরাঘুরি শুরু করল। সেই সূত্রেই সমাজ সেবিকা সুনীতি দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ। গুটিকয়েক উদ্বাস্তু মেয়ে নিয়ে তিনি একটি ছোট্ট সংস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করছিলেন—যার কাজ ছিল আচার, বড়ি, মোরব্বা, চাটনির ইত্যাদি স্থানীয় কিছু সস্তা খাদ্যোপকরণ তৈরী করা এবং তত্র গৃহস্থের অন্দরমহলে পৌঁছে দেওয়া।

দাদার সম্মতি নিয়ে সেখানে ঢুকে পড়ল। কিন্তু গোড় আটটী মেয়ে সারাদিন খেটে যে বস্তু তৈরি করতে লাগল, তার দ্বারা অন্নের খাদ্যের স্বাদ বাড়াতে পারলেও নিজেদের খাদ্য সংস্থান তেমন করে উঠতে পারছিল না। তবু টিকে রইল, থাকতে হল।

লক্ষ্মী দেখতে ভালো। গৌরাঙ্গী নয়, তবে রং ফর্সা। নাক, চোখ, মুখ মোটামুটি আকর্ষণীয়। তার উপরে চমৎকার দেহের গড়ন, নিখুঁত বললেই হয়। সুনীতি দত্ত তাকে জিনিস তৈরির কাজে অল্পক্ষণ রেখে যোগানের কাজেই বেশী লাগাতেন। মাঝে মাঝে উপদেশ দিতেন, বাইরে ঘুরতে গেলে মেয়েদের অত লজ্জা করলে চলে না, স্মার্ট হতে হবে, নানা বয়সী পুরুষদের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশতে হবে।

মাঝে মাঝে আরো খোলাখুলি ভাবে বলতেন, তোমাকে আগে চোখে লাগবে, তবে তো তোমার হাতের জিনিসে চোখ পড়বে। একটু লাজ লোজ করে বেরিও। আর খালি মেয়ে মহলে ঘুরলে হবে না। ওরা দরদস্তুর করবে, কিনবে না। মেয়েমানুষের যা স্বভাব। সুযোগ পেলেই ন্যাটা ছেলেদের সামনের গিয়ে দাঁড়াবে, তাদের সঙ্গে কথা বলবে? হাসবে। প্যাঁচার মত গম্ভীর মুখে থাকবে না। কেউ কেউ হয়তো বলবে, "ওসব আমরা কী বুঝি?" ওটা ভান। তুমি বলবে, তবু একবার দেখুন। সব আমরা মেয়েরা মিলে তৈরী করেছি। এই করে আমাদের খেতে হয়, মা বাপ ভাই বোনদের খাওয়াতে হয়, অনেকগুলি কম বয়সী ভদ্রঘরের মেয়ে এমনি করে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। আপনারা আমাদের সাহায্য করুন।

সুনীতি দত্তের উপদেশ পুরোপুরি অনুসরণ করবার মত

বিদ্যাবুদ্ধি, সাহস বা মনোভাব সম্বীয় ছিল না। তা সে করতেও যায় নি। কিন্তু কথাগুলো তার জড়তা কাটিয়ে উঠতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। খানিকটা চটপটে হতে শিখিয়েছিল, যার ফলে পরবর্তী জীবনে যখন ষ্টেজে নামতে হল, নেহাৎ জলে পড়েছে বলে মনে হয়নি। সেখানকার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছিল।

সে জীবনের সূত্রপাতও এই বড়ি-আচারের ভিতর দিয়ে।

কী একটা নতুন নাটকের আয়োজন চলছিল মোহিতের ক্লাবে। তারই উপর সব ভার। প্রথমেই অভিনেতৃ-নির্বাচন। সব চেয়ে কঠিন কাজ। পুরুষদের ভূমিকা তো নিজেদের। তাই নিয়ে কয়েকদিন ধরে আলোচনা চলবার পর মোটামুটি একটা দাঁড় করানো গেছে। মেয়েদের মধ্যে প্রধান রোল যার, সেও নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ঠিক পেশাদার অভিনেত্রী নয়, অর্থাৎ পাব্লিক ষ্টেজে মাস মাইনের চাকরী করেনা, কিন্তু অফিস ক্লাব বা পাড়ায় পাড়ায় যে-সব নাই সংস্থা আছে, তাদের হয়ে নামে, 'নাইট ফিগারে' একটা থোক পারিশ্রমিক নেয়, এমনি যে-সব অভাবগ্রস্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের মেয়েরা ক্রমশঃ বেশী সংখ্যায় এই পথে এগিয়ে আসছে, তাদেরই একজনকে বলে কয়ে বায়না দিয়ে রাখা হয়েছে। এবার সাইড্ অ্যাক্ট্রেস্ হিসাবে, অর্থাৎ একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রধান হলেও আকর্ষণী ভূমিকায় অভিনয় করবার মত একজন কমবয়সী সুন্দরী মেয়ে দরকার। এ লাইনে কয়া আগে থেকে রয়েছে তাদের ভিতরে অনেক বাছাবাছি করেও ঠিক যেমনটি চাই, তা পাওয়া যাচ্ছেনা। এমন সময় হঠাৎ লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা। সেটাও অনেকটা নাটকীয়।

অফিস থেকে ফিরছিল মোহিত। বাড়ির কাছে এসে দেখল, সদর দরজা খোলা। তার ভিতর থেকে হঠাৎ কানে এল, "আচ্ছা, আজ তাহলে আসি বৌদি?" গলাটা বেশ মিষ্টি। সরু, কিন্তু মলিউস্ আছে। তাছাড়া, আরেকটা জিনিস আছে, যাকে কণ্ঠ সম্পদ বলা যেতে পারে—শেষের দিকে একটুখানি মৃদু ঝঙ্কার।

অত সময় হলে হয়তো এদিকে বিশেষ কান দিত না। কে না কে, কোনো কাজে এসে থাকবে অন্যের কাছে। কিন্তু সাইড অ্যাক্ট্রেস-সংগ্রহের পালা তখন প্রায় বার্থতার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এদিকে নাটকের মহলা অনেকটা এগিয়ে গেছে, বন্ধ করে দেবার উপায় নেই। পথে ঘাটে তরুণী মেয়ে চোখে পড়লেই খুঁটিয়ে দেখে, তার কাজে লাগবে কিনা। সুতরাং এ সম্পর্কে কৌতূহলী না হয়ে পারল না। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুনল, তার স্ত্রী বলেছে, এসো। কাল গুলো নিয়ে আসছ তো? ঐ যা-যা বললাম?

—একেবারে কাল?

—তাহলে পরশু।

—"না, তরশু। মনে তো?

—আচ্ছা, মনে।

এবার দু'তরফেই কলহাস্যির পালা। কিন্তু স্ত্রীর স্বরকে ছাপিয়ে উঠল অপরিচিতার তরাট কণ্ঠ। পরক্ষণেই সে বেরিয়ে এল, এবং দরজা পেরিয়েই থমকে দাঁড়াল। প্রথমে একটা চকিত দৃষ্টি, এ অবস্থায় যা স্বাভাবিক, তারপরেই, বোধহয় পেশার খাতিরে কিংবা সুনীতি বক্তের উপদেশ স্মরণ করে, একটি অপ্রতিভ হাসি মিশ্রিত নমস্কার।

ঘর শুনে মোহিতের মনের মধ্যে যে অনুকূল ভাবটি ফুটে উঠেছিল তা চোখে দেখে সেটা বিস্তৃত হল। চৌকাঠে পা দিয়েও বাধিক দিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। চলনসই দেহখানা যতক্ষণ দেখা যায়। তারপর ঢুকে পড়ে সামনে দাঁড়ানো স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, কে মেয়েটা?

—চুরি গেল তো?

—"চুরি! কী চুরি? কোথায়?"—রীতিমত আশ্চর্য মুখ মোহিতের।

জয়া এগিয়ে এসে মুখ টিপে হেসে তালহাত খানা রাখল স্বামীর বুকের উপর—"এইখানে।"

"ও-ও!" বলে হেসে উঠল মোহিত, "হাম দিলকি রাণী! কী রকম ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে!"

ঘর নামিয়ে বলল, ওখানে হাত বাড়ানো অত সহজ নয়।

—থাক, অত বড়াই ক'রোনা।

—তাছাড়া চোরাই মাল কে চুরি করতে যাবে?

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল স্বামীর মুখে। জয়া খুশী হল। 'চোরাই মাল' কথাটার তাৎপর্য বুঝল। কিন্তু বাইরে ভাবছিল্য দেখিয়ে বলল, বকক না, যার খুশি। আমার ওতে কোনো লোভ নেই। পুরনো হয়ে গেছে।

—বেশ, জানা রইল।

স্বামীর সামনে জলখাবারের ডিসটা এগিয়ে দিয়ে চা ছাঁকতে ছাঁকতে আগেকার কথার সূত্রে ফিরে গেল জয়া —"যা ভাবছ ওকে দিয়ে তা হবেনা। ও তোমার ষ্টেজে নামার মেয়ে নয়।" স্বামীর হাসির সমস্যাটা জয়ার অজানা ছিল না, এবং তার চোখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারছিল, ঐ মেয়েটিকে আশ্রয় করে তার সমাধানের একটা ক্ষীণ আশা মোহিতের মনে দেখা দিয়েছে। মোহিত সেটা লুকোতে চেষ্টা করল না। আশাও ছাড়লো না। জিজ্ঞেস করলো, করে কী ও?

—করেনা কিছু বিশেষ কিছু।

—কি যেন বিক্রী করতে এসেছিল, মনে হল?

—হ্যাঁ, ঐ যা থাকে, ঐ জামদানীগুলো ওর কাছ থেকেই কিনলাম। খুব সুন্দর না? ওর নিজের হাতে তৈরী। ওর মত আরো ক'জন আছে। রোজগার যে কী বুঝতেই পারছ। তবু না করলে চলে না। খুব গরীব। কিন্তু হলে কী হবে? ওর একটি দাদা আছে, ভীষণ গোঁড়া আর ভয়ানক ভাল ছাত্র বোলকে। ও যে বাইরে বেরোয় এটা তার ইচ্ছে নয়। সে জানে একটি ভদ্র মহিলার বাড়িতে বসে ওগুলো ওরা শুধু তৈরী করে! বাড়ি বাড়ি ফেরি করতে হয় তা জানেনা। ও লুকিয়ে করে। তা না হলে কাজ থাকেনা।

—ওর সেই দাদাটি কী করে?

—কিছু না, বিছানায় পড়ে আছে।

শহরের মোটামুটি ইতিহাস, যা একটু একটু করে জেনে নিয়েছিল জয়া, স্বামীর কাছে খুলে বলল। শেষে যোগ করল, লেখাপড়া বেশী জানে না। তা না হলে তোমাকে বলতাম, ওর একটা চাকরী বাকরির চেষ্টা করতে। মেয়েটা বড় ভালো। লক্ষ্মী তো, সত্যিই লক্ষ্মী।

জয়া ভরসা না দিলেও, তার কথা শুনে মোহিতের আশা বরং বেড়ে গেল খানিকটা। বলল, দেখতো আমাদের ব্যাপারটা একটু বলেই দেখ না? এখন যা করছে তাও তো দাদাকে লুকিয়ে। এটাও তেমনি গোপন থাকবে।

"রাজী হবে কী?" সন্দেহের সুরে বলল জয়া। "তাছাড়া থিয়েটার সিনেমা করেওনি কোন দিন।"

—সে শিখিয়ে নেবা। আসল জিনিস হল চেহারা, গলা। সেটা যখন আছে, অভিনয় শেখাটা কোন সমস্যা নয়। কদিনের ব্যাপার।

"উঁ-উঁ, খুব সহজ দেখছি।" বাঁকা চোখে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে বলল জয়া, "কেন আমার স্বার্থটা কী? খালি কেষ্টে কুমীর আনতে যাবো বিশের জন্য?"

"না, না ঠাট্টা নয়," অনুনয়ের সুরে বলল মোহিত, "তুমি একবার চেষ্টা করে ভাখ। লক্ষ্মীটী, প্লীজ।"

পরের দিন যখন এল লক্ষ্মী, জয়া সপ্রতিভ ভঙ্গিতে কথাটা। সে সজোরে প্রতিবাদ জানাল, "না, না এ আপনি কী বলছেন। থিয়েটারে নামবো কী! ছিঃ।"

এই সব সভ্যের থিয়েটারে ভাড়া করা অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে জয়ার বিশেষ ভাল ধারণা ছিল না। গৃহস্থঘরের মেয়েরা এ-পথে নামতে বাধ্য হচ্ছে, কিন্তু পুরোপুরি মান সম্মান বাঁচিয়ে চলতে পারছে কী? এই মেয়েটির উপর মায়া পড়ে গিয়েছিল। এও এসে সেই দলে ভিড়ুক এটা তার মনোগত ইচ্ছা নয়। তবু স্বামীর খাতিরে তার ঘরে খানিকটা ওকালতী করতে হল। বলল, পেশাদার থিয়েটার নয়, ক্লাবের বাবুরা মিলে করছে। সবাই শিক্ষিত ভদ্র লোক। চাকরি বাকরির মত এও সৎ রোজগার। অনেক মেয়েই করছে আজকাল।

লক্ষ্মী চুপ করে রইল। তার মন সায় দিচ্ছিল না। "ভেবে দেখি" বলে উঠে পড়ল।

তারপর স্বামীর পীড়াপীড়িতে জয়া একদিন লক্ষ্মীর সঙ্গে তার সরাসরি যোগাযোগ ঘটিয়ে দিল। সেই সুযোগে মোহিত তার যুক্তিগুলো বেশ জোরের সঙ্গে পেশ করল—এতে লজ্জার বা নিন্দের কিছু নেই। এ লাইনে যারা আছে, সব ভদ্র ঘরের মেয়ে, বাপ মায়ের মত নিয়েই এসেছে। রিহার্সালে এবং শো'এর দিন গাড়ি করে আনা এবং

পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা আছে। দক্ষিণার অঙ্কটাও মন্দ নয়। একটু নাম করতে পারলে নিয়মিত কাজ পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। ইত্যাদি।

লক্ষ্মীর কাছে আসল আকর্ষণ ছিল ঐ শেষের দিকটায়। সুনীতি দত্তের 'আচার বড়ির কারখানা' তখন টলমল করছে। যে কোন দিন দরজায় তালা পড়তে পারে। দু'তিনটি মেয়ে চলে গেছে। বাকী কজন যে যায়নি, তার কারণ তারা বাবার মতো মায়না ছোটাতে পারেনি। তার মধ্যে একটি মেয়ের সঙ্গে লক্ষ্মীর সম্পর্কটা ছিল অন্য সকলের চেয়ে অন্তরঙ্গ, সব কথা বলত তার কাছে। মোতিতের কথা শুনে সে লাফিয়ে উঠল—তুই এখনি চলে যা লক্ষ্মী। আর দেরী করিসনে। আমার যদি তোর মত রূপ থাকত, আমি ছুটে গিয়ে লুফে নিতাম। কিন্তু আমাকে তো ওরা নেবে না।

—ওকালতী করবো নাকি একটু? মুখ টিপে হেসে বলল লক্ষ্মী।

—যাক, তুমি নিজের গরজটা তেল মাখা করিনি।

লক্ষ্মী রাজী হয়ে গেল। তার কদিন পরেই সুনীতি দত্তের আচারের ঘরে তালা পড়লো তাতে একটা সুবিধা হল লক্ষ্মীর। ওখানে যেতে হত না, কিন্তু ওখানকার নাম করেই বেরোত বাড়ি থেকে। তারপর সোজা চলে যেত বিহারীলাল। ঐ দলে আরেকটা মিথ্যা জড়তে হয়েছিল—নিকট বদল হয়েছে, সকালের বাচ থেকে তাকে সন্ধ্যার বাচে চালান করেছেন নরেশ দত্ত। যেদিন একটু বেশী রাত হত, বলত, কর্তী ঠাকরুণ আটকে দিলেন কী করবো?

এই সব মেয়েদের বিয়ে দিয়ে তিনি যে মাঝে মাঝে তাঁর সংসারের কাজ করিয়ে নেন সে খবর আগেই শুনেছিল প্রিয়নাথ। সেই পুরনো দোহাই দিয়েই তাকে ভুলিয়ে রাখা চলত। মাঝে মাঝে রাত বেশী হলে অবশ্য রুখে উঠতো, যে ছেড়ে দে, আর যেতে চাইনা। কিন্তু সে কথার মধ্যে তেমন জোর ছিল না।

দাদার কাছে রোজ একঝুড়ি করে মিথ্যা বলতে গিয়ে নিজেকে কত ছোট মনে হত বৈকী? মাঝে মাঝে একটা বিদ্রোহের ভাবও জেগে উঠত মনের মধ্যে—না, এমন করে আর চলেনা। বলে দিই সব কথা, তারপর যা হয় হোক। কিন্তু বলা হত না। দাদার সন্দেহকে কাটাবার জন্যে আবার কোনো একটা নতুন মিথ্যা আবিষ্কার করতে হত। দাদাকে তো সে চেনে। মেয়েদের মান সম্মান তার কাছে যেমন সব চেয়ে বড় জিনিস, তেমনি বড় বেশী আপনার। ঘরের বাইরে যে জগৎ, তার সামান্য একটু আঘাত সইতে পারে না।

সুনীতি দত্ত যে আচার ইত্যাদি যোগান দেবার কাজটাও মেয়েদের দিয়ে করান, এমনি একটা আভাস একবার সে কথায় কথায় দিয়ে ফেলেছিল। প্রিয়নাথ খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলেছিল, তোকেও কি ঐ রকম করতে হবে?

—না মানাকে বলেন নি। বললেই আমি যাবো কেন?

প্রিয়নাথ উঠে দুটিতে খানিকক্ষণ রোদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, অন্য মেয়েরা যখন যাচ্ছে, তখন তোকেও হয়তো একদিন বেরোতে হবে। তার আগে একটা কাজ করিস। কয়েক আনা পয়সা রেখে যাস আমার কাছে।

—"পয়সা!" দাদার কথার ধরণ দেখে ভয় পেয়েছিল লক্ষ্মী।

—হ্যাঁ কাউকে দিয়ে একটু বিষ আনিয়ে নেবো।

সেই মানুষের কাছে কোন ক্রমেই বলা যায় না, তার বোন খিদেপেটে মেরেছে। অথচ কী করবে লক্ষ্মী? এর চেয়ে ভালো, প্রিয়নাথের মনে সত্যিকার সম্মানজনক কোনো কাজ কে তাকে জুটিয়ে দেবে? কিন্তু তাকে সে কথা বোঝানো যাবে না। সে বুঝবে না।

সংসারে একদল লোক আছে, যারা কোনোদিন চোখ খোলে না, খুললেও চারদিকটা একবার চেয়ে দেখতে চায় না। কতগুলো বদ্ধমূল ধারণা এবং সংস্কার, যা কোন অবস্থাতেই বদলায় না, সংসারে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকে। সেইগুলোকে বলে আদর্শ।

প্রিয়নাথ সেই দলের মানুষ।

নিজের ঘরে ফিরে এসে জামাকাপড় না ছেড়েই লক্ষ্মী

তক্তপোষের উপর এলিয়ে পড়ল। খাবার কথাটি ছিল না, সেটা ওখান থেকেই চুকিয়ে এসেছে। সেই মুহূর্ত থেকে এতটা রাত কেটে গেছে একটানা ব্যস্ততা আর উত্তেজনায়। এবার তারই প্রতিক্রিয়া। সারা দেহে ক্লান্তি, সারা মনে অবসাদ।

কিছুক্ষণ পড়ে থেকে আবার উঠতে হল। কাপড়টা জামাটা বদলাতে হবে। বড় মশা, মশারিটা খাটাতে হবে। অনেকক্ষণ থেকে তেষ্টা পেয়েছে, ঢকঢক করে পুরো এক গেলাস জল খেয়ে নিল। ওঘর থেকে নিঃশ্বাসের নিয়মিত ওঠানামার শব্দ ভেসে আসছে। ঘুমিয়ে পড়েছে গিরিনাথ। অনেক আগেই পড়ত। শুধু তার জন্যেই জেগে বসে ছিল। কতগুলো নির্জলা মিথ্যার বড়ি বাইরে সে-ই বেচারাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। অতি দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল লক্ষ্মীর। কী জীবন!

দেয়ালে টাঙানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জামাটা ছাড়তে ছাড়তে বেশ কয়েক বছর আগেকার একটি দিন মনে পড়ে গেল। এক ঝলক রক্তের আভা ছুটে উঠল মুখের উপর।

ঘর শুদ্ধের ছুটো নয়, একটাই, মাঝখানে মাঝা-সমান উঁচু কেরোসিন কাঠের পার্টিশান। ঠিক মাঝখানে নয়, ওর দিকটা একটু বড়, দাদার দিকটা ছোট। সেদিন এই বেড়াটা ছিল না, ঘরের দুধারেরদুটো তক্তপোষে, ভাই বোনে ঘুমোত। হঠাৎ একদিন সকাল বেলা গিরিনাথ কাজে না বেরিয়ে কোত্থেকে কতগুলো তক্তা পেরেক আর সেই সঙ্গে একটা মিস্ত্রী ডেকে এনে হাতে হাতে পার্টিশানটা বানিয়ে ফেলল। ও পাশটা কেন ছোট হবে—তাই নিয়ে আপত্তি জানাতে চেয়েছিল লক্ষ্মী, কিন্তু কিছুতেই মুখ খুলতে পারেনি। আগের রাতের একটি ছোট্ট ঘটনার সঙ্গে জড়ানো একরাশ লজ্জা এসে বার বার তার ঠোঁট চেপে ধরছিল।

ঠিক রাত নয়, সবে সন্ধ্যা হয়েছে। ঘরের কাজ সেরে চুল বেঁধে কুয়োতলায় গা ধুতে গিয়েছিল লক্ষ্মী। কত বয়স তখন? ছেলেরা ছাড়িয়ে চৌদ্দয় পড়েছে বোধহয়। তার বয়সী মেয়েরা তখনো ফ্রক পরে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু দাদা তাকে কিছুদিন আগেই শাড়ি কিনে এনে দিয়েছে, ফ্রক পরা তার পছন্দ নয়।

গা ধুয়ে সায়ার উপর শাড়িটা কোনরকমে জড়িয়ে ঘরে এসে ঢুকল। দাদা নেই, রোজ সন্ধ্যাবেলা যেমন ছেলে পড়াতে বেরোয়, তেমনি বেরিয়েছে। দরজাটা ভেজানো। জামা কাপড় পরে বাইরের সিঁড়িতে গিয়ে একটু বসবে, এই কথা ভাবছিল।

আয়নাটা খুব ছোট নয়, মাথা থেকে প্রায় কোমর পর্যন্ত দেখা যায়। জামা পরতে গিয়ে নিজের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল লক্ষ্মী। ঘরে হারিকেন জ্বলছে, পলতেটা নামানো। সেই মৃদু, নরম আলোয় আয়নার ভিতরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল যে মেয়েটি, তাকে যেন কেমন অচেনা-অচেনা মনে হচ্ছিল। এ যেন সে নয়, কোন্ এক রহস্যময়ী কিশোরী তার বিকাশোন্মুখ তনুদেহের অনাবৃত সুষমা নিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে।

প্রকৃতির মত জীবদেহেরও একটা ঋতুচক্র আছে—কুঁড়ি ফুল হয়ে ফোটে, ফুল ফল হয়। সব চেয়ে বিস্ময়কর, রহস্যময় ঋতুর নাম বয়ঃসন্ধি, নবনারীর দেহকূলে যখন প্রথম জোয়ারের ঢেউ এসে লাগে, দিনে দিনে বিস্তৃত হয় তটরেখা, প্রতি অঙ্গে পুষ্টি ও পরিণতির সঞ্চার হয়। তখন বড় ভালো লাগে নিজেকে উন্মুক্ত করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে। দেখে দেখে আশ মেটে না।

লক্ষ্মীও তন্ময় হয়ে দেখছিল। হঠাৎ পিছনের কপাট দুটো জোরে খুলে যেতেই ভীষণ চমকে উঠল। দাঁতে জিভ কেটে লুটিয়ে পড়া আঁচলখানা কুড়োতে কুড়োতে ছুটে বেরিয়ে গেল ওপাশের দরজা দিয়ে। কী লজ্জা! কোথায় গিয়ে মুখ লুকোবে? কেমন করে শান্ত হবে দাদা বুক জোড়া কাঁপুনি?

গিরিনাথও লজ্জা পেল। একটা কি বই নিতে এসেছিল। নিয়ে তখনি বেরিয়ে গেল। নিজেকে তিরস্কার করতে করতে চলল। একটা সাড়া দিয়ে ঢোকা উচিত ছিল। খেয়াল হয়নি। জানত না, যে-লক্ষ্মী এই সেদিনও দাদার গলা জড়িয়ে ধরে ঘুমোত, কোথা দিয়ে কেমন করে হঠাৎ কখন সে বড় হয়ে গেছে। তার একটি নিজস্ব নিভৃত লোকের প্রয়োজন। একখানা আলাদা ঘর চাই।

হাতে পয়সা নেই। দু'দিন পরে 'হপ্তা'। তার জন্য

অপেক্ষা করা চলে না। এক বন্ধুর কাছ থেকে কটা টাকা ধার করে নিয়ে এল সেই রাত্রেই। পরদিন সকালে আলাদা ঘর তৈরি হল বোনের জন্যে। একখানা ঘরকেই দু'ভাগ করা হল। মাঝখানে কাঠের দেয়াল, তার একদিকে খানিকটা ফাঁক, মোটা কাপড়ের পরদা ঝুলছে সেখানে।

শুয়েই ঘুমিয়ে পড়বার কথা। কিন্তু ঘুম এলোনা। জীবনের কত টুকরো টুকরো দৃশ্য ছায়াছবির মত চোখের উপর ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যেতে লাগল। এক সময়ে সেখানে এসে দাঁড়াল আজই সন্ধ্যাবেলায় দেখা একজন দীর্ঘদেহ অপরিচিত মানুষ, বিশেষ করে তার চোখ দুটো, যার সামনে প্রথমটা সে অস্বস্তি বোধ করছিল। খানিকটা বিরক্তিও ছিল তার মধ্যে। অমন করে কেউ তাকায় নাকি? তারপর নিজেকে বোঝাল, সে একজন অভিনেত্রী, যেদিন থেকে এপথে নেমেছে, তার দিকে যে কোন লোকের যেমন খুশি তাকাবার অধিকার সেদিন থেকেই স্বীকার করে নিয়েছে। ওনিয়ে আর আপত্তি করা চলে না।

তাছাড়া, ঐ চোখ দুটিতে আর যাই থাক, অসম্মান ছিল না। আগ্রহ ছিল, ঔৎসুক্য ছিল, কিন্তু সুধা যা লালসার চিহ্নমাত্র ছিল না, রেজে দাঁড়িয়ে অনেক দর্শকের চোখ থেকে সেটা ঠিকরে এসে পড়তে দেখছে তার সারা দেহে। প্রথম প্রথম সমস্ত মন গ্লানিতে, অপমানে ভরে উঠত। ক্রমশঃ সয়ে গেছে।

তখনকার কথাবার্তা থেকেই সে জেনেছিল, ভদ্রলোক একজন আর্টিষ্ট। ছবি আঁকেন। আর্টিষ্ট লোকগুলো একটু অদ্ভুত ধরণের হয়ে থাকে। তা না হলে হয় তো অমন একাগ্রপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে একটি অপরিচিতা মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতেন না?

কী দেখছিলেন আপনি অমন করে? সে তো রূপসী নয়। মুগ্ধ হবার মত কী আছে তার মধ্যে? হয় তো আছে। যে জানে না। আর্টিষ্টের চোখ সেটা আবিষ্কার করেছে। কিংবা হয়তো এমনি ভালো লেগেছিল তাকে। ভালো লাগার তো কারণ থাকে না। সত্যিই কী ভালো লেগেছিল?

ভাবতে গিয়ে লজ্জায় সারা অঙ্গে রোমাঞ্চ খেলে গেল। পুরুষের চোখে ভালো লাগার নিদর্শন সে আগেও কিছু কিছু পেয়েছে। অনেক সময়েই তার নিজের সেটা ভালো লাগেনি। কিন্তু এ তার থেকে আলাদা। এর স্বাদ একেবারে নতুন।

গ্রীষ্মদিনের কড়া আলোয় লক্ষের সামনে অনেকের ভরে দেখা সেই চোখ দুটিকে নিভৃত রাত্রির অন্ধকারে সে আরেকবার দেখবার চেষ্টা করল। সত্যিই সুন্দর। মুখখানাও তেমনি সুন্দর, ভাবময়।

একটা সুখস্মৃতির মধুর আবেশ সারা মনে ছড়িয়ে পড়ল।

॥ ছয় ॥

'তুষার-কন্যা'—নাটকেই মলয়ার নায়িকা-বেশে প্রথম আবির্ভাব। তার আগে যে-কটি ভূমিকায় সে নেমেছে সেগুলো ছোট বড় পার্শ্ব চরিত্র। সবই মোহিতদের ক্লাবে নয়। ঐ ধরণের অন্য দু একটি প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু তারই চেষ্টায়। সেজন্যে মোহিতের কাছে সে সত্যিই কৃতজ্ঞ।

এই জাতীয় সখের থিয়েটারের কয়েকটি বিশেষ 'সীজন' আছে। সাধারণতঃ পুজোর মুখে কিংবা বড়দিনের সময়। তাছাড়া বৈশাখের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি কিছু কিছু রবীন্দ্র জয়োৎসবে নাটকাদির আয়োজন হয়ে থাকে। তাতেও কখনো বাইরের অভিনেত্রীর ডাক পড়ে। বর্ষাকালটা একেবারে ফাঁকা।

'তুষার কন্যার' আগে মলয়া অনেক দিন বসে ছিল। সংসার একেবারে অচল। তখন ঐ মোহিত-ই মাঝে মাঝে কিছু ধার দিয়ে কোন রকমে সেটা চালু রেখেছে। তাছাড়া দোকানেও ধারে মাল কিনতে হয়েছে। 'তুষার কন্যার' প্রাপ্তি থেকে সবটা শোধ দিয়ে হাতে বিশেষ কিছু রইল না। আবার কোনো জায়গা থেকে ডাক আসা দরকার। তাড়াতাড়ি না এলে মুশকিলে পড়তে হবে।

মোহিত বলে রেখেছে "যখন যা দরকার হবে আমাকে ব'লো। লজ্জা ক'রোনা। মাঝে মাঝে দেখা করো। আমি তো তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারি না।

কাজের খোঁজ পেলেও তোমার কাছে পৌঁছে দেবার উপায় নেই। তোমাকেই এসে দেখে যেতে হবে।"

কথাটা ঠিক। দাদার কাছে এখনো সে স্থনীতিবস্তের 'বাড়ি—কারখানার' কর্মী। তাদের যে দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, বড়ি-আচার চানাচুরের সঙ্গে নানারকম জলখাবার তৈরি করেছে মেয়েরা, একথাও শ্রীরনাথকে বলতে হয়েছে। তা না হলে তার নিজের শ্রীবৃদ্ধি অর্থাৎ কিকিং পোষাক-পরিচ্ছদের উন্নতি, সম্প্রতি যার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, তার কি কৈফিয়ৎ দেবে? দাদার দৃষ্টি সর্বদিকে সজাগ। বিছানাপত্র খাবারদাবারের হালও মাঝে মাঝে বদলায়। অর্থাৎ হাতে টাকা এলেই কিছু বাড়তি খরচ করে লক্ষ্মী। এবং দাদার কখনো সরব, কখনো নীরব প্রশ্নের উত্তরে বলে, কিছু বোনাস দিলেন কর্তীঠাকরুণ।

—"তাই নাকি?" খুশী হয় শ্রীরনাথ, "তাহলে জিনিসটা বেশ দাঁড়িয়ে গেছে বল। আমার যদি এ অবস্থা না হত, আমি তোদের হয়ে খাটতাম। আরো অর্ডার এনে দিতাম। তোদের মালিক অবিশ্যি খুব বাহাদুর মহিলা। তবু হাজার হলেও মেয়ে মানুষ। এ-সব ব্যাপারে পুরুষের সাহায্য দরকার। কিন্তু—"

বলে করুণ চোখে নিজের কাটা পাটার দিকে তাকাত। লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি সরে যেত সেখান থেকে। এ দৃশ্য সে সইতে পারে না।

মোহিতের কাছে আবার একবার যাওয়ার দরকার। মুশকিল এই, তাকে বাড়িতে গিয়ে পাওয়া যায় না। তার সেটা ইচ্ছাও নয়। বরং বলেছে, আমার সঙ্গে দেখা করবে আমার অফিসের সামনে, পাঁচটায় একটু পরে। ঠিক সামনে নয়, খানিকটা ছাড়িয়ে গিয়ে যে একটা বড় ব্যাঙ্ক আছে, তার পাশে। তাতে যদি অসুবিধা হয়, ইডেন গার্ডেনে এসো কিংবা কার্জন পার্কে। তার আগে অফিসের ঠিকানায় একখানা ইনল্যাণ্ড ছেড়ে দিও। যেখানে বলবে আমি থাকবো।"

নির্দেশ মত দু'দিন এইভাবেই দেখা করেছে মলয়া। ইডেনে বা কার্জন পার্কে নয়, অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচটার পর। দেখা হয়েছে। কিন্তু একটু বিরক্তি হয়েছে মোহিত। চোখের ইশারায় খানিকটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলেছে, এখানে কেন এলে? কী বলেছিলাম আমি? আচ্ছা, চল

ডালহৌসী স্কোয়ার থেকে হেঁটে হেঁটে দু'জনে চৌরঙ্গীতে গিয়ে পড়েছে, কখনো আরো এগিয়ে গেছে পার্ক ষ্ট্রীটের দিকে।

এমনি একদিনের কথা। একটু ফাঁকায় গিয়ে মোহিত জিজ্ঞাসা করল, কিছু খাবে?

'না,' মাথা নেড়ে মাটির দিকে তাকিয়ে বলল মলয়া।

—না, কেন?

—এই মাত্তর তো খেয়ে এলাম।

—তাহলেও সামান্য কিছু খেতে দোষ কি? চল—বলে পিঠে হাত দিয়ে রাস্তার ওপারে একটা নামী রেস্তোরাঁর দিকে নিয়ে গেল। মলয়া না গিয়ে পারল না। যে-উদ্দেশ্যে এসেছে, সেই আসল কথাটা এখনো বলা হয়নি। তাছাড়া, এরই হাতে তার এবং আর একটা অক্ষম খোঁড়া মানুষের অন্নের থালা।

পরদা-ঢাকা খোপের মধ্যে নিয়ে পাশের চেয়ারে বসিয়ে মোহিত ওর কাঁধ ঘষে অনেকটা কাছে টেনে এনে মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, তোমার মুখখানা বড় শুকনো দেখাচ্ছে, মলয়া।

মোহিতের হাতটা একটু শিথিল হতেই মলয়া খানিকটা সরে গেল। ভিতরটা বিরক্তি ও অস্বস্তিতে ভরে উঠলেও বাইরের আচরণে ঐ ঘন সান্নিধ্য এড়াবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু প্রকাশ পেল না। তাহলেও মোহিতের কাছ থেকে কড়া সুরের অনুযোগ শুনতে হল—"তোমার এই জবুথবু ভাবটা কবে কাটবে বলতে পার? তোমায় অনেক বার বলেছি, আবার বলতে হল, চিরদিন কলাবৌ হয়ে থাকলে অভিনয় করা চলে না। দু'নৌকোয় যাদের জাত যায়, তাদের এ লাইনে আসা বিড়ম্বনা। দ্বিধা ত্যাগ না করলে এখানে চাইন করা যায় না।"

মলয়া সব অভিযোগ নীরবে শুনে গেল। সে বলতে পারত, রেষ্টুরেন্টের এই খোপটা তো স্টেজ নয়, অভিনয়ের প্রয়োজনে যতটা পুরুষ-সংস্পর্শে আসা দরকার তার জন্য

সে প্রস্তুত, তার বেশী সে পছন্দ করেনা। কিন্তু কিছুই বলল না, বলতে পারল না। মাষ্টারের কাছে বকুনি খেয়ে ছাত্রী যেমন মুখ ভার করে থাকে, তেমনি করে বসে রইল।

এবার সুর নামিয়ে আনল মোহিত, "আমি বুঝতে পারি না, আমাকে তুমি এমন ভয় কর কেন? আমি কি একটা বাঘ ভালুক না কী? বল, একটা জবাব দাও।"

—"না, না, ভয় কিসের?" শুকনো গলায় বলল মলয়া।

—তবে?

এ প্রশ্নের আর উত্তর দিলনা। বলল, আর কোন কাজের খোঁজ নেবেন।

খাবার এসে গিয়েছে। মোহিত কাঁটা চামচে তুলে নিয়ে বলল, "খেয়ে নাও বলছি।"

এর পরেও খেতে হয়েছে। আশা দিয়ে রেখেছে মোহিত, আসছে মঙ্গলবার দেখা ক'রো। একটা পার্টির সঙ্গে কথা-বার্তা চলছে।

কাজের খোঁজে কখনো কখনো জয়ার কাছেও গেছে। এ-গল্পে সে-গল্পে বহুক্ষণ কেটে গেছে দু'জনের। আসল কাজটা ভুলতে পারেনি। জয়া বৌদির সঙ্গে তার সম্পর্কটা অনেক-খানি আপন জনের মত। গেলে আর ছাড়তে চাননা। রান্না-ঘরে বসিয়ে নিজে হাতে খাবার ক'রে খাওয়ান। উঠতে চাইলে বলেন, বলো না? এত তাড়া কিসের?

তার কাছে এই-সব বৈষয়িক ব্যাপার বলা যায় না। জয়া সেটা বুঝতে পেরে নিজেই এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করেছে, তোমার কাজ-কর্মের অবস্থা কী রকম?

কিছুদিন ধরে হাতে কিছু নেই জেনে জয়া দিয়েছে, আচ্ছা, ও এলে আমি বলবো! ওকে তো অনেক ক্লাব থেকে ডাকে। ডিরেকশন দেবার জন্যে। কোথায় একটা ঢুকিয়ে দিতে পারবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু একটা না জোটানো পর্যন্ত স্বামীকে সমানে তাগিদ দিয়ে গেছেন জয়া বৌদি। মোহিতও নিজের সরজে যতটা করত, তার চেয়ে একটু বেশী তৎপর না হয়ে পারেনি। স্ত্রীকে রীতিমতো ভয় করে চলে ভদ্রলোক।

এমনি করেই আবার একটা ছুটে গেছে।

'তুমার কন্যা'র জের মিটতে সময় লাগবে। এখনি ওরা নতুন নাটক নামাচ্ছে না। এ-সময়টা অন্তরও মন্দা। তবু সরজ বন্ড বানাই। একবার বেরোতেই হবে। কিন্তু সকালেই মোহিতের কাছে না গিয়ে লক্ষ্মী এবার জয়া বৌদির কাছে গেল। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ গিয়ে পৌঁছল। মোহিত ফিরবে আরো দেরী করে।

বাইরের ঘরে সুব্রত বসে আছে। রিহার্সালের সময় সামান্য আলাপ দু'জনের। সে-ই উঠে নমস্কার করল, "চিনতে পারছেন?"

মলয়া মাথা নেড়ে জানাল, পারছে। সুব্রতর কাছে একটু সংকোচ বোধ করছিল। শুনেছিল, ইনি একটা কোন কলেজে পড়ান। মোহিত বা ক্লাবের আরো অনেকের মত বিত্তক নন, সেটা ও লক্ষ্য করেছে।

সুব্রত বলল, বসুন।

—জয়া বৌদি আছেন

—আছেন। এইখানেই ছিলেন, টেলিফোন আসতে এইমাত্র উঠে গেলেন।

—আমি তাহলে ভিতরে যাই।

—বেশ তো।

জয়া ফোন রেখে এদিকে ফিরে বলল, এই যে লক্ষ্মী, তুমি অনেক দিন বাঁচবে।

—কি করে জানলেন? হাতও দেখলেন না কুষ্ঠী দেখেননি।

—সে সব তো সাধারণ জ্যোতিষীরা করে। আমি মুখ দেখেই বলতে পারি। আর, যা বলি সব ফলে।

—বাঁচতে কার না সাধ হয় বৌদি? কিন্তু এ-ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে—

কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল লক্ষ্মী। জয়া তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল, অত সহজে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? দুদিন কী মানুষের চিরদিন যায়? সে যাক। সুব্রত বাবুকে তো তুমি চেন। ওঁর সঙ্গে এই মাত্র তোমার কথাই হচ্ছিল।

"আমার কথা!" লক্ষ্মীর গলায় আশার সুর ফিরে এল।

—হুঁ, উনি তোমার জন্য একটা কাজের কথা বলছিলেন। রিহার্সাল নয়, একেবারে নতুন ধরণের ব্যাপার। প্রথমটা অবশ্যি মনে বেশ ধাক্কা লাগবে। আমারও লেগেছে, কিন্তু সব দিক ভালিয়ে না দেখে—আচ্ছা, ওঘরে চল, ওঁর কাছ থেকেই শুনবে।

সুব্রত যে উদ্দেশ্য নিয়ে জয়া বৌদির কাছে এসেছিল, তার উৎপত্তি কৃষ্ণনের স্টুডিওতে। উজলের গায়ে শেষ ধাপে খেয়ে যাওয়া সেই আশ্চর্য ছবিখানা তার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। সে খুব ভালবাসে। ঐ রকম একটা জিনিস অল্পের জন্য অসমাপ্ত থেকে যাবে, শিল্পীর এত দিনের আকাঙ্ক্ষা, যত্ন এবং পরিশ্রম নিষ্ফল হবে, এটা তাকে ক্রমাগতই পীড়া দিচ্ছিল। কৃষ্ণনের সেই কথাগুলোও ভুলতে পারছিল না। মনে মনে একটা সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে ছিল, এ বিষয়ে তার যতটা সাধ্য, তার কোথাও ত্রুটি রাখবে না।

যে কোন একটি মডেল হলে যদি চলত, এর মধ্যে দুঃসাধ্য কিছুই ছিল না। কিছু অর্থের ব্যাপার। কিন্তু এখানে একটি বিশেষ জনের প্রয়োজন। তার সম্বন্ধে যতটুকু জানে তার থেকে খুব একটা ভরসা পাচ্ছিল না।

মলয়ার সঙ্গে তার পরিচয় অতি সামান্য। মোহিত তাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানে, তার উপরে কিছুটা প্রভাবও রাখে। তার প্রস্তাবটা নিয়ে প্রথমে তার কাছেই গিয়েছিল। মোহিত শোনামাত্রই সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে। বলেছে, গিয়ে বলে একবার গ্রাহ্য না? মুখের উপর অপমান করে তাড়িয়ে দেবে। সাংঘাতিক মেয়ে। তাছাড়া, ব্যাপারটা আমারও ভাল লাগছে না। মলয়া মডেল হবে। একটা ভদ্র ঘরের মেয়ে খেতে না পেয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা তাকে এমন করে নষ্ট করবো?"

"নষ্ট কেন হতে যাবে?" বন্ধুকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল সুব্রত, "বরং আমার তো মনে হয়, ঐ ছেলে এবং তার পেছনে একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েকে যে-সব ঈনভিসিটি সহ্যে হচ্ছে, একজন আর্টিষ্টের স্টুডিওতে সে গুলো থেকে সে বেঁচে যাবে।"

"বেঁচে যাবে।" একেবারে আকাশ থেকে পড়েছিল মোহিত "তার মানে মডেলের কাজটা কী, আর্টিষ্টরা তাদের দিয়ে কী করায় তুমি কিছু জান না। ওখানে মেয়েদের আব্রু বলে কিছু নেই। সবটাই একস্‌পোজড্‌।"

—"এখানেও তাই। তফাৎ এই, এখানে বাজার লোকে তাকে দেখছে, কী চোখ দিয়ে দেখছে আর মাঝে মাঝে কী সব মন্তব্য ছুঁড়ে মারছে, সেটা আর বলে দিতে হবে না। আর ওখানে দেখছে মাত্র একজন। সে শিল্পী। তার চোখে—"

—"আরে রেখে দাও তোমার শিল্পী," মোহিত আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি, "ওদের কীর্তি-কলাপ আমার জানা আছে। শিল্পী!"

এরপরে আর আলোচনা চলেনা। কিন্তু সুব্রত ঐ খানেই হাল ছেড়ে দেয়নি। সে শুনেছিল মলয়াকে সংগ্রহ করার পিছনে আর একজনের হাত আছে। জয়া বৌদি। মেয়েটির ওপর সত্যিকার প্রভাব তারই। আকর্ষণটা পারস্পরিক। আরেকটা কথা শুনেছিল—জয়াই একদিন বলেছিল ওর প্রসঙ্গে—মলয়া এ কাজ মনে-প্রাণে পছন্দ করে না, এখানে সে সুখী নয়।

মোহিতের যারা বন্ধু, বিশেষ করে এক পাড়ায়, জয়া-বৌদির কাছে তাদের অবারিত দ্বার। তার মধ্যে সুব্রতর স্থানটা একটু বিশিষ্ট। এই তরুণ অধ্যাপকটিকে জয়া স্নেহের চোখে দেখে। মোহিতের কোনো ছোট ভাই বোন নেই। একটি দেওর-এর সাধ ছিল মনে মনে, বিয়ের পরে ঘর করতে এসে, সব মেয়েরই বোধহয় থাকে। সে স্থানটি অনেকখানি পূর্ণ করেছিল সুব্রত। তার কাছেও জয়া বৌদি নিজের বৌদির চেয়ে কম নয়, বরং বেশী। একই পরিবারে একের সঙ্গে অন্যের যে সম্পর্ক, তার মধ্যে স্বার্থের গন্ধ থাকতে পারে। এখানে তা নেই।

জয়া বৌদির কাছে আসল প্রস্তাবটা পেশ করবার আগে সুব্রতকে কৃষ্ণন এবং তার ছবি সংক্রান্ত ইতিহাসটুকুর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করতে হয়েছিল। কৃষ্ণনের সঙ্গে পরিচয় বা আলাপ না থাকলেও জয়া তার কথা অনেক শুনেছে এবং সেই সূত্রে সুব্রতর মনের সম্ভ্রম ভাবটুকু তার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে থাকবে। তাকে দেখেছে দু-একবার। 'ডুবার কন্যা'

নাট্যাঙ্গনে অনেকটা কাছ থেকেই দেখেছে। ভাল লেগেছিল ছেলেটিকে, বিশেষ করে তার চোখ দুটিতে একটা শিশুসুলভ উৎসুক্য। সব কিছু দেখছে, কিন্তু কারো উপরে আসক্তি নেই। সুন্দরী মেয়েদের দিকে যখন তাকাচ্ছে, তার মধ্যে কোনো চাকাচাকি নেই। একেবারে চোখ মেলে দেখা। তির্যক চাহনি নয়, বেশিরভাগ পুরুষ যা তাদের প্রতি নিক্ষেপ করে থাকে, লোভী এবং অশ্লীল দৃষ্টি। দেখলেই বোঝা যায় ভিতরে কোনো আবিলতা নেই। মনের কোণে কোনো অন্ধকার লুকিয়ে নেই। থাকলে তার চোখে ঐ দৃষ্টি ফোটে না।

ছিরেটার দেখতে গিয়ে জয়া যে সেদিন এই নিয়ে বসে বসে গবেষণা করছিল, তা নয়। পুরুষের চোখ সম্বন্ধে মেয়েদের একটা প্রকৃতিদত্ত সুক্ষ্ম অনুভূতি আছে। দেখলেই চিনতে পারে, বুঝতে পারে কী তার ভাষা।

একটি অবিবাহিত যুবক, যার বাড়িতে অন্য কোনো স্ত্রী-পরিজন নেই, তার নিভৃত স্টুডিওর একান্তে একটি একা মেয়েকে ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রাখবে, অঙ্কনের বেলায় সেই মেয়ের নিরাপত্তার প্রশ্নটাই প্রবল হয়ে দেখা দিত। কৃষ্ণন সম্পর্কে জয়ার মন সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। কোনো অসাধীন আচরণ সে করবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে সেইটাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়। আরেকটা বড় প্রশ্ন আছে। নারীদেহের আব্রু রক্ষা। সেটা নিয়েই দ্বন্দ্বে ছিল, কী ধরণের কাজ তাকে দিয়ে করাতে চাইছে কৃষ্ণন। পেশাদার মডেল যদি চাইত, সেটা সংগ্রহের জন্য আরো আছে। তার জন্যে সুব্রতকে বলতে যাবে কেন? আর সুব্রতই বা তার জন্যে এত আগ্রহ নিয়ে আসবে কেন-? ঠিক তা নয়। তবু জয়া ঠিক মন স্থির করতে পারছিল না। কোথায় যেন বাধছিল।

লক্ষ্মীকে নিয়ে সে আবার বাইরের ঘরে ফিরে এল। সুব্রতকে বলল, আমি ওকে এখনো কিছু বলিনি, ঠাকুরপো। তুমিই বরং বল। একজন জনমান্য অধ্যাপকের সামনে কি আমার মত মুখরা মেয়ে অন্যের মুখ খোলা উচিত?

সুব্রত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, অধ্যাপকই হই, আর যা-ই হই, বিশেষ আগোয় বিধাতা আমাদের অর্থাৎ পুরুষ জাতকে মুখ বন্ধ রাখবার নির্দেশ দিয়েছেন।

বলার সঙ্গে হাত দিয়ে ওদের দুজনকে দেখিয়ে দেখায় সেই বিশেষ জায়গাটি লক্ষ্যে ইঙ্গিত করল।

খুব বুঝেছি। তোমাদের মুখ তো আমার জানতে বাকী নেই।

কথা ক'টির সঙ্গে একটি মধুর ঝামটা নিক্ষেপ করে লক্ষ্মীর দিকে ফিরল জয়া—কৃষ্ণনকে তো তুমি দেখেছ। ওদের মাদ্রাজী-বন্ধু, ছবি আঁকেন, এই পাড়াতেই থাকেন?

লক্ষ্মী মাথা নেড়ে জানাল, দেখেছে।

—ঐ নামটা ছাড়া মাদ্রাজী বলতে ওঁর বোধহয় আর কিছুই নেই, তাই না ঠাকুরপো?

—আছে।

—কী?

—সায়েব। অন্ততঃ একজনের কাছে।

—সে আবার কে?

—ওর কথাটা ছাড়ো, হাসি, দেখনহাসি।

"ও, সেই চৌকাটা?" বলে জয়া হেসে গড়িয়ে গেল। বোঝা গেল দেখনহাসির পরিচয় সে আগেই পেয়েছে। হাসি থামিয়ে বলল, কৃষ্ণনের ইচ্ছে, তুমি তার ছবি আঁকায় খানিকটা সাহায্য কর।

—"ছবি আঁকায়! আমি!" বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল লক্ষ্মী।

—না, না; তোমাকে ছবি আঁকতে হবে না। কিছুই করতে হবে না। শুধু বসে থাকবে। তিনি তোমাকে দেখে দেখে আঁকবেন।

লক্ষ্মীর মুখময় কে যেন একমুঠো আবির ছিটিয়ে দিল। শুধু মুখ নয়, তার মনের মধ্যেও ছড়িয়ে গেল এই কদিন আগে দেখা একটি নিকৃষ্ণ রাত্রির রঙিন স্বপ্নের মুখগুলি। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ লজ্জা এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। ঘন ঘন মাথা নেড়ে মুখ নীচু করে অস্ফুট স্বরে বলল, না, না, ছিঃ।

এ স্বর জয়া চেনে। "না, না, ছিঃ"—এই তিনটি শব্দের আক্ষরিক অর্থ যাই হোক, তাদের ভিতর থেকে যে সম্মতি ধ্বনিত হল, তাও তার অচেনা নয়। শুধু বুঝতে পারে না, সেই মুহূর্তেই 'ছবিওয়ালা' কখন কোন ফাঁকে এসে এক-

জনের মনে এতখানি জায়গা দখল করে বসে গেছে। হয়তো এ নিজেও সে খবর জানে না।

জয়ার মন সব দ্বিধা কাটিয়ে আনন্দে ভরে গেল। সুব্রতও খুব খুশী। তার 'মিশন' সফল হয়েছে বলে শুধু নয়, কত সহজে এবং সুকৌশলে জয়া বৌদি তার সেই সাফল্যের পথ করে দিলেন। 'মডেল' কথাটা উচ্চারণ পর্যন্ত করতে হল না, তার সঙ্গে যে সব রূঢ় বাস্তব দাবীর সমস্যা জড়িয়ে আছে তারও উল্লেখের দরকার হল না। সে সব ঝোকাপড়া ষ্টুডিওতে বসে হওয়াই ভবে নিক। তার অংশ যেটুকু, সে নিষ্কণ্টকে সম্পন্ন করে গেলেছে।

পরে একদিন এই প্রসঙ্গে সুব্রত জয়াকে বলেছিল, আপনি তাহু জানেন বৌদি।

প্রশস্তিটুকু তৎক্ষণাৎ উড়িয়ে দিয়েছিল জয়া:—"দূর, আমি আবার কী করলাম! আসল ডাইরেক্টর তোমার ঐ ঝাটিই বন্ধু।"

॥ সাত ॥

প্রথম দিন শুধু আলাপ-সালাপ, গল্প-গল্প। সুব্রতই নিয়ে এসেছিল লক্ষ্মীকে। কৃষ্ণন ওদের দু'জনকে ষ্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল। লক্ষ্মী বড় বড় চোখ করে চারদিকটা দেখছিল। সবই তার কাছে নতুন এবং বিস্ময়কর। উনুনের উপরে ছবিটাও তার নজর এড়ায়নি। এই পাহাড়ী মেয়ের মাঝেই তাকে প্রথম দেখেছিলেন উনি। কি আছে কী ছিল তার মধ্যে? ওটা তো তার আসল চেহারা নয়। হয়তো ঐ রূপটাই ওঁর ভাল লেগেছে। ভাবতে গিয়ে ঐ ছবিখানার উপর একটি সুখ ঈষার ছায়া পড়ল তার মনে। তারপর নিজের ছেলেমানুষিতে মনে মনে হেসে ফেলল। অটিষ্টের খেয়াল! আঁকুন না ওঁর যা খুশি। পোজও যা-ই হোক, মানুষটা সে। তারই ছবি! এত বড় সৌধের মাঝে পর্যন্ত কে দিয়েছে তার মত একটি তুচ্ছ মেয়েকে?

দেখনহাসি ট্রেতে হাতে উপস্থিত। একটি পেয়ালা লক্ষ্মীর সামনে রাখতেই সে মৃদুকণ্ঠে বলল, "আমি চা খাই না।"

"চা নয়, কফি"—দেখনহাসির সগর্ব প্রতিবাদ। তার সঙ্গে একটি উচ্চাঙ্গের হাসি।

"কফিও খাইনা—"জানিয়ে দিল লক্ষ্মী।

এবার হাসি নয়, রীতিমত বিস্ময় ফুটে উঠল দেখনহাসির মুখে। তার কফি কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারে, এ তার স্বপ্নের অতীত।

কৃষ্ণন বলল, তাহলে ওঁর জন্যে বরং একটা কোনো—

মনিবের কথা শেষ না হতেই ছোঁ মেরে কাপটা তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল দেখনহাসি। যেতে যেতে বলল, "বুঝে গেছি। আচ্ছা পাঁচ মিনিট সবুর করুন।"

"তার মানে বুঝলেন তো?" সুব্রত বলল লক্ষ্মীর দিকে চেয়ে, "দেখনহাসির কফির হাত থেকে আপনার নিস্তার নেই। তবে জিনিষটা সত্যিই উপাদেয়। খেয়ে দেখুন; অভ্যাস না থাকলেও কোনো অসুবিধা হবে না। বোধ হয় ভালোই লাগবে।"

কৃষ্ণন যোগ করল, "ভালো না লাগলেও এ উৎপাতটা সয়ে নিতে হবে। ও বেচারার এইটাই হল ষ্ট্রং পয়েন্ট্। দু-এক চুমুক না খেলে একেবারে মুষড়ে পড়বে।"

লক্ষ্মী ব্যাপারটা বুঝে নিল। মিনিট কয়েক পরে নতুন পেয়ালা আসতেই সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিল এবং তাতে ঠোঁট ঠেকিয়ে তীব্র আগ্রহে অপেক্ষমান দু'টি প্রশ্নোজ্জ্বল চোখের দিকে চেয়ে বলল, "বেশ হয়েছে।"

এবার বিজয় গর্বে উদ্ভাসিত দেখনহাসির মুখ। তার উপরে প্রদায়িত দন্তঝলক।

কিছুক্ষণ গল্প-গুজবের পর সুব্রত চলে গেলে কৃষ্ণন বলল, "শুধু দেখনহাসির নয় তার মনিবেরও বেশ কিছু উৎপাত আপনাকে সইতে হবে। কখনো বলবো, আমার দিকে তাকান···আচ্ছা, এবার চোখ নামিয়ে নিন। কখনো বলবো, পাশ ফিরে বসুন···পেছন ফিরুন,···সামনে একটু ঝুঁকে, না অতটা নয়···আচ্ছা, এবার উঠে দাঁড়ান।···বলে, হেসে উঠল। উজ্জ্বলময় দাদা হাসি। তারপর বলল, "বিরক্ত হবেন না তো?"

লক্ষ্মী মাথা নাড়ল। কথাগুলো এমন গম্ভীর হুকুমের সুরে বলছিল কৃষ্ণন, সে অতিকষ্টে হাসি চেপে ছিল।

পোটা তিন চার সিটিং-এর পর একদিন লক্ষ্মী যখন চলে যাবে, কৃষ্ণ বলল, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। কিছু মনে করবেন না তো?"

—না, না ; মনে করবো কেন?

এ কদিনে অনেকখানি সংকোচ কাটিয়ে উঠেছে।

—অভিনয় করে আপনি কী রকম পান?

—কত আর? একটা বইতে পঞ্চাশ টাকা করে দেয়।

—মাসে কটা করে বই করেন?

—কিছু ঠিক নেই। কোনো মাসে ছুটো, কোন মাসে তিনটেও ছুটে যায়। আবার দু'তিন মাস একেবারে বাদ পড়ে।

—আচ্ছা, আমি আপনাকে মাস-মাস দেড়শো দেবো। হবে তো?

লক্ষ্মীর মাথাটা অনেক খানি নুয়ে পড়ল। সে বোকা নয়, সংসারের অভিজ্ঞতাও কম হয়নি। অভিনয়ের মত এও একটা বৃত্তি। আগে কোন স্পষ্ট কথাবার্তা না হলেও বুঝতে পেরেছিল, এই যে, জয়া বৌদি যাকে বলেছেন, 'ছবি আঁকায় সাহায্য করা, এরও একটা পারিশ্রমিক আছে। আর্টিষ্ট, তাকে বিনা পয়সায় নিযুক্ত করেন নি।

কিন্তু এ টাকা সে হাত পেতে নেবে কেমন করে? এ তো তারই ছবি। ঐ ক্যানভাসের উপর তাকেই রূপ দিচ্ছেন শিল্পী। কত যত্ন, কত নিষ্ঠা, কত আগ্রহ দিয়ে একটু একটু করে তাকে জীবন্ত করে তুলছেন। কেন? কী দায় ছিল তার? দুনিয়ায় এত মেয়ে থাকতে তাকেই বা বেছে নিলেন কেন? এ যে তার অভাবনীয় গরিমা! তার জন্যে সেই চিরকালের তরে ঋণী হয়ে রইল ওঁর কাছে। ঐ হাত থেকে টাকা নেবে কোন সুবাদে? কী দিয়েছে সে? বরং পেয়েছে, পাচ্ছে অনেক কিছু। মন ভরে আছে তার। ঐ কটা টাকার জন্যে নিজেকে সে ছোট হতে দেবেনা। না; টাকা সে নিতে পারবে না।

লক্ষ্মীকে চুপ করে থাকতে দেখে কৃষ্ণ বলল, অবিশ্যি টাকাটা বড়ই কম। কিন্তু বর্তমানে—

—না, না ; এতো অনেক টাকা। এ আমি কোনদিন আশাও করতে পারি না।—আমি সে কথা বলছি না—

—তবে?

—এর জন্যে আমাকে টাকা নিতে বলবেন না। ও আমি পারবোনা।

—"কেন?" রীতিমত বিস্মিত হল কৃষ্ণ।

লক্ষ্মী নিরুত্তর। কৃষ্ণ বলল, বোজ এতটা করে সময় দিতে হচ্ছে আপনাকে। আর, এই বিরক্তিকর কাজ! এর কি কোনো দাম নেই? বরং আপনার দাবী পাওয়া উচিত, আমি দিতে পারছি না। না, না, টাকা আপনাকে নিতেই

হবে, মিস্ দে। আজ কিছু অ্যাডভান্স নিয়ে যান। কদিন আগেই দেওয়া উচিত ছিল। আমার খেয়াল হয়নি।

কথা হচ্ছিল, স্টুডিও সংলগ্ন যে ছোট্ট বসবার ঘরটি রয়েছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে। এক কোণে দেয়ালের সঙ্গে লাগানো একটা টেবিল। কৃষ্ণন এগিয়ে দিতে তার টানায় হাত দিয়েছেই, লক্ষ্মী বলল, "আজ থাক।"

বলেই বেরিয়ে চলে গেল।

রাস্তায় পড়ে কৃষ্ণনের কথাগুলো মনের মধ্যে নাড়িয়ে নিয়ে দেখতে লাগল। ওঁর দিক থেকে যা বলছেন সবটাই যুক্তিপূর্ণ। কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই। কাজ পাচ্ছেন তার মজুরি দিতে চাইবেন বৈকি? তার জায়গায় অন্য কোনো মেয়ে যদি আসত, এই একই কথা বলতেন। সে ত বিনা বাক্য ব্যয়ে হাত বাড়িয়ে দিত। লক্ষ্মীই বা কেন তা পারছেনা। কী অধিকার আছে তার বলবার—আমি টাকা চাই না, আপনাকে অমনি সাহায্য করছি। তিনি সে সাহায্য নেবেন কেন? সম্পর্কটা নিছক লেন-দেনের। এর মধ্যে আর কিছুই নেই। সে-ই একে একটা মিথ্যার রঙ্ দিয়ে ঘোরালো করে বলতে চাইছে। মনে মনে আকাশ-কুসুম রচনা করে বসে আছে। তার ছবি! কী দায় কী পড়েছে ওঁর, যে বসে বসে তার ছবি আঁকবেন? কে সে? আর্টিস্টের ভাড়া করা মেয়ে, মডেল।

যেদিন থেকে এই কাজে লেগেছে, কৃষ্ণনের প্রতিটি হাবভাব, আচরণ অনুধাবন করবার চেষ্টা করল লক্ষ্মী। আগাগোড়া শালীন, সংযত, শিষ্ট, কোথাও কোনো মোহ দৌর্বল্যের চিহ্নমাত্র নেই। নিরাসক্ত দৃষ্টি, তার মধ্যে মন আছে, হৃদয় নেই। যে যুবকটি দিনের পর দিন অত কাছে বসে দু'চোখ মেলে এক যুবতী নারীর অঙ্গ-বৈচিত্র্য নানা ভাবে নানা দিক থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে তার মধ্যে একজন সৃষ্টিশীল একনিষ্ঠ শিল্পী ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাওয়া গেলনা।

তাই তো হওয়া উচিত। তার সম্মান, সুযশ ও নিরাপত্তার দিক থেকে ঐটাই যে বাঞ্ছনীয়, সকলেই স্বীকার করবে। ঐ দৃষ্টিতে যদি অন্য কিছু থাকত, হেসে উড়িয়ে দর্শকদের লাইনে যা সে লক্ষ্য করেছে, লক্ষ্য করেছে তার সহ-অভিনেতাদের চোখে, অভিনয়ছলে যখন তারা তার অঙ্গ দাক্ষিণ্যে এগিয়ে এসেছে, নাটকের স্বার্থে যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশী অন্তরঙ্গ আকর্ষণে তাকে বুকে চেপে ধরেছে, —তাহলেই বরং আশঙ্কার কারণ ছিল। সেটা যে ঘটে নি, সসম্মানে, নিরুপদ্রবে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছে, তার জন্য সে তো খুশী হবে, কৃতজ্ঞ হবে তার নিয়োগকর্তার কাছে। তার উপরে প্রাপ্তির অঙ্কটাও আশাতীত। সব দিক দিয়ে তার উল্লসিত হওয়া উচিত।

কিন্তু মানুষের মন আর কবে 'উচিত' মেনে চলেছে? সে চিরদিন অবুঝ। তাই লক্ষ্মীর বুকটা কোথায় উল্লাসে নাচিয়ে উঠবে; তা না বাধায় ভেঙে পড়তে চাইল! কিসের বাধা, সে জানে না। কেবলি মনে হতে লাগল, কোথায় যেন তার চরম পরাজয় ঘটে গেছে। তার ভিতরে যে নারী, তাকে যেন অস্বীকারের অপমান নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। সে কি শুধু একটা সুঠাম দেহ, কতগুলো অঙ্গের সমষ্টি, একজন আর্টিস্টের তুলিকে যারা প্রেরণা দেয়, তার রঙ্ যোগায়? তার বেশী আর কিছু নয়?

সুব্রত দু'একদিন খোঁজ নিয়ে গেছে, ছবির কদ্দুর। শেষ হবার পর আবার এল। অনেকক্ষণ ধরে দেখল। তারপর বলল, "মুখের ওপর কারো প্রশংসা করাটা আমার কেমন যেন আটকে যায়। ওটা আমার আসে না। এখন কিন্তু বেশ অসঙ্কোচে বলতে পারছি, এ আপনার একটা কীর্তি হয়ে রইল, মিষ্টার কৃষ্ণন।"

কৃষ্ণনের দৃষ্টিও ছিল ঈজেলের উপর। এবার সেটা সুব্রতর দিকে ফিরিয়ে এনে হাসিমুখে বলল, "কীর্তি কিনা জানি না। তবে এর মধ্যে কৃতিত্ব যদি কিছু থাকে তার বেশির ভাগই ওঁর।

চোখের ইঙ্গিতে লক্ষ্মীকে দেখিয়ে দিল। সে, যেমন থাকে, কোণের দিকে চুপ করে বসে ছিল। কথাটা অবশ্যই মেনে নিলনা, কিন্তু প্রতিবাদও করল না। শুধু চোখ দুটো নত করল।

সুব্রত সোৎসাহে বলে উঠল, "সে তো নিশ্চয়ই। উনি না এলে তো ছবিই হত না। আর তার জন্যে আমারও খানিকটা কৃতিত্ব আছে, মানতে হবে।"

হেসে হো হো করে হেসে উঠল। কৃষ্ণন বলল, "একবার নয়, একশবার মানতে হবে। আপনার কাছে আমার—

সুব্রত তাড়াতাড়ি বাধা দিল—"এই দেখুন, আপনি এটা সিরিয়াসলি নিলেন নাকি? আমি এমনি বলছিলাম। আসলে ওঁর এখানে আসবার ব্যাপারে আমি কিছুই করি নি। আমি ওঁকে বলিনি পর্যন্ত। জিজ্ঞেস করুন না? যা কিছু করেছেন আমাদের জয়া বৌদি।

—আমাকে যদি একদিন ওঁর কাছে নিয়ে যান, সুব্রত বাবু, ওঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসতে পারি।

—তিনিই আপনার ছুটিতে একদিন আসতে বলেছেন। ছবিটা দেখতে চান। আর সেই সঙ্গে—

—ঘোর ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গিয়েছিল। সেই দিকে তাকিয়ে কথাটা শেষ করল সুব্রত, "আপনার যেমন হালিকে"।

"তাই নাকি!" সশব্দে হেসে উঠল কৃষ্ণন "ওর কীর্তিও দিবে পৌঁছেছে তাঁর কানে?"

—অনেকদিন।

—তিনি আসবেন, এ যে আমার কত বড় সৌভাগ্য! আপনি আর দেরি করবেন না, সুব্রতবাবু। ঈশ্বরিরই এক দিন নিয়ে আসুন তাঁকে। কিংবা আমি গিয়ে—

—না না; আপনার যাবার কোনো দরকার নেই। তিনি নিজে থেকেই আসবেন।

দিন তিনেক বাদেই এল জয়া। সঙ্গে সুব্রত এবং লক্ষ্মী! কৃষ্ণন গেটে দাঁড়িয়েছিল। গাড়ির অভ্যর্থনা করে একেবারে উপরে নিয়ে গিয়ে বসাল। জয়া বলল, "চলুন আগে আপনার ছবি দেখি।"

—আসুন।

ছবিকে এর মধ্যে ইজেল থেকে খুলে দেয়ালে হেলে এক পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। জয়া কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে বলল, এ তো একেবারে বসানো লক্ষ্মী, শুধু মুখখানা বাদ দিয়ে, ওর নাকটা অত চাপা নয়। কিন্তু সব মিলিয়ে যেন কিছুটা আসল আসে। তাই না, ঠাকুরপো।

—"বিশেষ করে চোখের দুটো তারা" জয়ার পাশে দাঁড়িয়ে নিম্নস্বরে বলল সুব্রত।

—ঠিক ধরেছে।

কৃষ্ণনের দিকে ফিরে বলল, "আমি আপনাদের আর্ট-টার্ট কিছু বুঝি না। ভালো ছবি বলতে বুঝি, যা চোখে ভালো লাগে, দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। সেদিক দিয়ে আপনি ভীষণ রাগ করে ফেলেছেন। লক্ষ্মী, এটা তোমার একটা মস্ত বড় জয়।"

জয়! কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠল লক্ষ্মী। সে তো জানে, এটা তার পরাজয়। দুদিন আগেও সেই কথা মনে করে তার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। এর ভিতরে সে কোথায়? তাকে ছাড়িয়ে উঠেছে তার স্নেহের বিকাশ, তার হাত বুক গলা কাঁধ হয়তো বা চোখের তারা। তাতে তার কী? কিন্তু সেকথা কাউকে বোঝানো যাবে না। কেউ বুঝবেনা।

জয়া আসর জমাতে জানে। কৃষ্ণন যদিও একটু চুপচাপ ধরনের মানুষ। মজলিসী বাকপটু বলে তার খ্যাতি নেই। মহিলা সব অনভ্যস্ত। জয়ার পাল্লায় পড়ে কিছুক্ষণের মধ্যে জড়তা কাটিয়ে উঠল এবং বেশ সহজ-ভাবে গল্পে ভিড়ে গেল। লক্ষ্মীরও চুপচাপ এককোণে বসে থাকা চলল না। ছবিটা খোঁচা যাবার পর এক-আধটু মুখ খুলতে হল। প্রায় ঘণ্টাখানেক জমাট আড্ডার পর জয়া বলে উঠল, "আপনার বাথরুমটা তো দেখছি না। আমাকে দেখে পালাল নাকি?"

—'তাই তো' সুব্রতরও হঠাৎ খেয়াল হল, 'এতক্ষণ আড়ালে থাকবার পাত্তর তো সে নয়।'

কৃষ্ণন দরজার দিকে চেয়ে উঠবার উদ্যোগ করতেই বাধা এল সুব্রতর কাছ থেকে, "আহা, আপনি উঠছেন কেন? সে ঠিক সময় মত এসে পড়বে। আমাদের কোনো তাড়া নেই। কি বলেন বৌদি?"

"কিছুনা, কিছুনা। কিন্তু সে গেল কোথায়?"

"সে বোধ হয় কিচেন দিয়ে একটু ব্যস্ত আছে" কৈফিয়তের সুরে বলল কৃষ্ণন।

—কিচেন দিয়ে!

—হ্যাঁ; দেখুনতো আমি বলেছিলাম, "ওঁরা আসছেন, সামনে তো কিছু দিতে হবে। তবে করে দেবো, সে উপায়

হবে নেই, কটা সকেল নিয়ে আয়। সে কি আমার কথা শোনে? তাহলে আর তাকে কেয়ামতি রইল কোথায়? কী সব খাবার- টাবার করছে ওখন থেকে।"

—ওহ, তাই নাকি? চলুনতো দেখে আসি, কী করছে। ঠাকুরপো, লক্ষ্মী, তোমরাও এসো।

দেখনহাসি ততক্ষণে ডিংড়িং কাটলেটগুলো ভেজে রেখে উনুনে কফির জল চাপিয়ে টেবিল গোছাতে শুরু করেছিল। জয়া সদলবলে গিয়ে উপস্থিত হতেই প্রথমে সামান্য একটু অপ্রস্তুত হল। সে আর কতক্ষণ! তারপরে ছুটে গিয়ে টিল করে এক প্রণাম তার পায়ের কাছে এবং সেই সঙ্গে দশন কান্তির পূর্ণ বিকাশ।

জয়া তাড়াতাড়ি উঠল, "এই ছোড়া পেন্নাম-টেন্নাম পরে করিস। তার আগে তোর বিয়েটা একবার পরখ করি। নিয়ে আয় কি কি রেঁধেছিস।"

দেখনহাসি ছুটল রান্নাঘরে। শুধু কাটলেট নয়, আরো কি সব এনে যোগাড় করল টেবিলের উপর। জয়া চোখ কপালে তুলল, "সর্বনাশ! করেছিস কী? রীতিমত খাজিয়াগ্রা। আপনারা দাঁড়িয়ে কেন বসে পড়ুন।"

কৃষ্ণও সুব্রতর দিকে ফিরল এবার। তারপর লক্ষ্মীর দিকে চেয়ে ঠোঁটের কোণে একটি বিশেষ হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল, "কী হল! চুপচাপ দাঁড়িয়ে যে? ও না হয় রেঁধেছে, দেবে কে? শুরু কর। তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা?"

এমন একটা আবৃত্তির সুর লাগাল শেষের দিকটায়, যে দুটি পুরুষ-কণ্ঠের তুমুল হাসিতে ঘর ভরে গেল। তার মধ্যে লক্ষ্মীর মৃদু-কণ্ঠের তিনটি শব্দ আর কেউ শুনতে না পেলেও তার কানে এসে লাগল—"তাছাড়া আর কী?" চকিতে চোখ তুলে একবার তাকাল তার মুখের পানে। সবটুকু দেখা গেল না। লক্ষ্মী তখন নীচু হয়ে কাজে লেগে গেছে। তাহলেও এই আনন্দময় পরিবেশের সঙ্গে একান্ত বেমানান একটি ম্লান ছায়া জয়ার নজর এড়াল না। মুহূর্তের জন্য একটু যেন চিন্তিত দেখাল তাকে। তার পরেই আবার হাঁক-ডাক হাসি-গল্পের লহর তুলে সবাইকে মাতিয়ে তুলল।

পরিবেশনের ভারটা আপনা থেকেই লক্ষ্মীর হাতে গিয়ে পড়েছিল। তাকে সাহায্য করছিল দেখনহাসি। জয়া খেতে খেতে এটা-ওটা ফরমাশ করছিল। এক ফাঁকে বলে উঠল, কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে, আমাদের লক্ষ্মী কিন্তু ভীষণ কাজের মেয়ে। মাঝে মাঝে ছুটি থেকে এক আধবার ছুটি দেবেন। আপনার দেখনহাসিকে একটু ঘষেমেজে টেকিয়ে দিয়ে যাবে।

"সর্বনাশ! উনি এসব ঝঞ্ঝাট পোহাতে যাবেন কেন? এমনিতেই ত ওঁকে অনেকক্ষণ আটকা থাকতে হয়।"

জয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, ঐখানেই আপনারা ভুল করেন মিষ্টার কৃষ্ণ, যেখানেই যতই আটকা থাক, ঘর-সংসারের কাজকে মেয়েরা কখনো ঝঞ্ঝাট বলে মনে করে না। ওটাই তো আমাদের রাজত্ব।"

এতক্ষণ ধরে যা কিছু বলেছিল জয়া, সব তরল-সুরে, হাল্কা ধরণের হাসি পরিহাস। এবারকার সুর একেবারে আলাদা। কথাগুলোই যে শুধু সিরিয়াস ধরণের তাই নয়, বলবার ভঙ্গিটাও তাই। তফাৎটা কৃষ্ণ এবং সুব্রত দু'জনেই অনুভব করল।

লক্ষ্মীর কানে যেতেই সে নিজের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ চমকে উঠল। কী বলতে চায় জয়া বৌদি!

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তার মুখের পানে এবং চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিল।

॥ আট ॥

গভর্নমেন্ট আর্টস্কুলে একটা প্রদর্শনী চলছিল। খ্যাত, অখ্যাত অনেক আর্টিস্টই ছবি পাঠিয়েছিলেন। সুব্রত এবং কৃষ্ণের দু-একটা শিল্পী-বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে তার এই সদ্য-সমাপ্ত ছবিখানাও পাঠানো হল। নামকরণটা সুব্রতর—"তুষার কন্যা"। তার মতে, যে উৎস থেকে এ-ছবির জন্ম, এবং যে-ঘটনাবলীর ভিতর দিয়ে তার পরিণতি, সবটাই রইল ঐ নামের মধ্যে। নির্জন হিমালয়ের বনভূমির সঙ্গে যুক্ত হয়ে রইল অনাকীর্ণ 'টারের' রহস্যক। ওটা শুধু নাম নয়, ইতিহাস। অর্থোপকের ব্যাখ্যা। আর্টিস্টের দাবী কি অস্বীকার করে?

সংসারের অবস্থা খুব একটা সচ্ছল নয়। তাহলেও

ছবিখানাকে হাতছাড়া করবার ইচ্ছা ছিল না। একদিনের পাঠাবার আগে কৃষ্ণন ক্রেমের গায়ে একটুকরো কাগজ এঁটে তার উপর লিখে দিয়েছিল—NOT FOR SALE.

ছবিটা দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছিল। অর্থও সেত যদি মতপরিবর্তনে রাজী হত কৃষ্ণন। প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের আগ্রহ এবং যে দাম তারা দিতে চায় তার আকর্ষণীয় অঙ্কটা আর্টিস্টকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণন রাজী হয়নি।

প্রত্যক্ষভাবে অর্থাগম না হলেও, এই ছবিই পরোক্ষে তার পথ খুলে দিল। বেশ কিছু অর্ডার এল নানা জায়গা থেকে। তার মধ্যে কয়েকটা পোর্ট্রেট পেইন্টিং। আপাততঃ সেগুলোর দিকে মন ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে 'না' বলে দিল। আর কিছু এল, যাকে 'তুষার কন্যার' দলে ফেলা যায়। বিভিন্ন পরিবেশ ও পটভূমির উপর কল্পিত নারীমূর্তি। তারই ভিতর একটি প্রস্তাব তাকে আকৃষ্ট করল। পার্টিকে তখনই কথা দিল না। বলল, ভেবে দেখি।

লক্ষ্মী মনে করেছিল, এবার তার ছুটি, যদিও তেমন কোনো আভাস কৃষ্ণনের কাছে পায়নি। কিন্তু আর কী কাজ থাকতে পারে তার? তবু রোজই একবার করে আসে, কখন জবাব তার জন্যে অপেক্ষা করে, কিছুক্ষণ থেকে চলে যায়।

মাঝে মাঝে আর্ট নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়। ঠিক আলোচনা নয়, কৃষ্ণন বলে, সে শোনে। বেশিরভাগ কথাই দেহশিল্পকে আশ্রয় করে। মানবদেহের সর্বাঙ্গীন বিকাশের মধ্যে নিহিত যে বিপুল ঐশ্বর্য, প্রতি অঙ্গে বিন্যস্ত যে লাবণ্য-লহর, সভ্যতার আদিযুগ থেকে, (তাই বা কেন, তারও আগে অরণ্যচারী উলঙ্গ মানুষ যখন একখণ্ড পাথর কুড়িয়ে নিয়ে পাহাড়ের গায়ে কিংবা গাছের উপর আঁক কাটত, তখন থেকে) শিল্পীরা যাকে নানা ভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছে, এখনো করছে এবং চিরদিন করে যাবে। রূপ দিচ্ছে কি এক ভাবে? কেউ এমনি ছবি আঁকছে, কেউ পাথর কেটে কেটে মূর্তি গড়ছে, কেউ মাটি দিয়ে পুতুল তৈরি করছে —এই দেহেরই নানা ভঙ্গিমা, নানা অভিব্যক্তি— কেউ কাগজের উপর কালি ও কলম দিয়ে লিপির রেখায় ফুটিয়ে তুলছে তার অপূর্ব আলেখ্য। কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, কথা ও সুর তালের উপকরণ। তারই চিত্তের দিয়ে অহরহ লাভ করছে এই দেহের অপরূপ কান্তি, তার নানা অর্থের ব্যঞ্জনা।

এই প্রসঙ্গে একদিন, যে নতুন ছবির কথা সে ক'দিন ধরে ভাবছিল, ধরবে কিনা তখনো স্থির করে উঠতে পারেনি, তার প্রথম উল্লেখ করল লক্ষ্মীর কাছে।

কি ভাবে কথাটা পাড়বে মনে মনে একটু গুছিয়ে নিয়ে বলল, আপনার মনে আছে মিস্ সে, কদিন আগে এক ভদ্রলোক আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন, ঐ যে আপনি যখন বাড়ি বাচ্ছিলেন?

লক্ষ্মী ঘাড় নাড়ল। তার মনে পড়ল, একজন লোক নিচের বসবার ঘরে বসে কৃষ্ণনের সঙ্গে কথা বলছিল। সে বারান্দা থেকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে যখন বলছে "সিটিং রংটা কুরিয়ে গেছে", লোকটি তার দিকে চেয়েছিল। যখন চলে যাচ্ছে, পিছন থেকে শুনতে পেয়েছিল,—"ইনি কে?" কৃষ্ণন বলেছিল, আমার অ্যাসিস্টান্ট।

কৃষ্ণন কিরে গেল তার কথায়—ভদ্রলোক একটা জিনিস আঁকাতে চাইছেন, জিনিসটা একটু অদ্ভুত ধরণের। বৈষ্ণব কবিতার দুটি লাইন। তার ভেতরে যে বর্ণনা রয়েছে তাকে ছবিতে ফোটাতে হবে। উনি একজন কবি। তাছাড়া ছবি বোঝেন, রুচি আছে। যা-তা দিয়ে খুশ করে দেওয়া চলবে না। তাই একটু ইতস্ততঃ করছিলাম। আপনি যদি ভরসা দেন তো নিয়ে নিই। আপনার সাহায্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দরকার হবে।

লক্ষ্মী ঠিক বুঝল না নতুন করে তার সাহায্যের কথা কেন তুলছে কৃষ্ণন। সেইজন্যেই তো সে এসেছে, টাকা নিচ্ছে। আর এব্যাপারে তার ভরসারই বা মূল্য কী? সে তো শুধু কলের পুতুলের মত হাত পা নাড়বে। তবু বলল, বেশতো নিন না। আমাকে কি করতে হবে, বলে দেবেন।

—সেই ভরসাই চাইছিলাম আপনার কাছে। আপনাকে একটু নিবারণ, মানে যাকে বলে, উদয়ে চতে হবে, সমস্ত ব্যাপারটাকে আর্টিস্টের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে।

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট না বুঝলেও আন্দাজ করতে পারল লক্ষ্মী। মুখের উপর একটা লজ্জার সংকোচের ছায়া পড়ল।

অনেক দিনের কথা মনে পড়ল। তখন সবে ঢুকেছে এই কাজে। কৃষ্ণন কোথায় বেরিয়েছিল। ষ্টুডিওর পাশে ছোট ঘরটার অপেক্ষা করছিল লক্ষ্মী। সোফার উপর একখানা মোটা ইংরেজি বই পড়েছিল। আগে একদিন কৃষ্ণনকে পড়তে দেখেছে। আর্টসম্পর্কীয় বই হবে নিশ্চয়ই। তুলে নিয়ে পাতা উলটে দেখছিল। অনেক ছবি রয়েছে তার মধ্যে। আশ্চর্য সব মূর্তি, নারীপুরুষের। সব নগ্ন। একটু লজ্জা লজ্জা করলেও ভালো লাগছিল ছবিগুলো। যেমন ভালো লেগেছিল, সুনীতি দত্তের ওখানে যখন ছিল, মেয়েরা মিলে গঙ্গার ধারে, কার এক মস্ত বড় বাগানবাড়িতে পিকনিক করতে গিয়ে দেখা গ্রীক দেবদেবীর কয়েকটি মর্মর মূর্তি। কী জীবন্ত! আগাগোড়া অনাবৃত, কিন্তু একটুও সঙ্কোচ হয়নি তাকাতে। মনে হচ্ছিল প্রতিটি শুভ্রদেহ থেকে একটা পবিত্রতা আভা ঠিকরে পড়ছে।

হঠাৎ পায়ের শব্দে মুখ তুলেই বইখানা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে ফেলে দিয়েছিল সোফার উপর। বুকের চিপচিপ কিছুতেই থামে না। যেন সোপনে কী একটা অন্যায় করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। তার সে ত্রস্ত ভাবটা কৃষ্ণন লক্ষ্য করেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তখনকার কথায় কোনো আভাস পাওয়া যায়নি। পরে কাজ করতে করতে বলেছিল, মিস্ দে, আপনি যখন এলাইবে এসে পড়েছেন, আপনাকে কিছু পড়াশুনো করতে হবে। ঐ যে বইখানা দেখছিলেন, আর্ট সম্বন্ধে অমন ভালো বই খুব কমই আছে। আর ওর ছবিগুলো সব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা।

একটু থেমে ওর দিকে একবার দেখে নিয়ে হাতের কাজে ফিরে গিয়ে বলেছিল, প্রথমটা একটু বাধো বাধো ঠেকবে। ক্রমে আর্টিষ্টের চোখ দিয়ে দেখলে আর সেটা থাকে না। তখন শুধু ওর সৌন্দর্যটাই ভেসে উঠবে চোখের ওপর। অর্থাৎ ওর যেটা আর্টিষ্টিক দিকটি।

সেদিনও এই কথাটাই ব্যক্তার করেছিল কৃষ্ণন—আর্টিষ্টের চোখ দিয়ে দেখা। দৃষ্টা মনে পড়তেই সেদিনকার সেই লজ্জার শিহরণ টুকুও জেগে উঠল বুকের মধ্যে। ওতটা প্রবল নয়। এতদিনের সান্নিধ্য, কথাবার্তা, পরিচয় তাকে অনেকখানি সহজ ও সাবলীল হতে সাহায্য করেছে। তবু চোখে চোখে তাকাতে পারল না। পাতা দুটি নিজে থেকেই নেমে এল।

কৃষ্ণন অতশত লক্ষ্য করল বলে মনে হল না। আলোচ্য প্রসঙ্গে ফিরে গেল—"কবিতার লাইন দুটি, আমাদের ছবির যা বিষয়, বোধহয় চণ্ডীদাসের। ঠিক বলতে পারবো না এ কালের বাংলা সাহিত্য মোটামুটি পড়বার চেষ্টা করেছি, বৈষ্ণব লিটারেচার আমার তেমন পড়া নেই। আপনার জানা থাকতে পারে। রাধিকার স্নানের দৃশ্য। যমুনার জল থেকে সবে উঠে দাঁড়িয়েছেন। পরনে নীল শাড়ি। তাছাড়া যে ওঁকে আর কোনো রং-এ মানায় না, বৈষ্ণব কবিরা তা ভালো ভাবে জানতেন। কনক চাঁপার মত দেহ, তার ওপরে নীলাম্বরণ। কী চমৎকার কম্বিনেশন! ওরা শুধু কবি ছিলেন না, আশ্চর্য চিত্রশিল্পীও। সেই লাইনটা একবার মনে করুন তো—চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর ....

যাক, যা বলছিলাম, স্নান সেরে ঘরে চলেছেন রাধা। সিক্ত বসন, সিক্ত কেশরাশি। তার থেকে জল ঝরছে। পেছনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখছেন কবি। সেই দৃষ্টি ফুটে উঠল তাঁর ভাষায়—

সিনিয়া উঠিতে নিতম্বতটেতে পড়্যাছে চিকুর রাশি,
কাঁদিয়া আঁধার কনক চাঁদার পরশ লইল আসি।

কৃষ্ণনের গম্ভীর মৃদুকণ্ঠ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। আধ্যে চোখ দুটি বুজে এল। একটি প্রশান্ত তন্ময়তা ফুটে উঠল মুখের উপর। সদ্যস্নাতা রাধারাণীর চলন ঘুরটি বোধহয় নিজের চোখে একবার উপভোগ করে নিল। তারপর চোখ খুলে তাকাল লক্ষ্মীর দিকে। সেও যেন কেমন এক গভীর ভাব বোধে আচ্ছন্ন হয়ে বসে আছে। কৃষ্ণনের কথায় হঠাৎ চমক ভাঙল।

—"এরকম আশ্চর্য ইমেজারি কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

সিক্ত বসনের নীলা ভেদ করে ফুটে উঠেছে কটিতটের উজ্জ্বল সৌর। তার ওপরে এক রাশ জল-ঝরা কালো চুল। তাই দেখে কবির মনে হল, আঁধার যেন কেঁদে এল পরশ বিহনে কনকবর্ণ চাঁদের। কী অপরূপ উপমা।

এতক্ষণ ধরে কৃষ্ণন যেন এক ভাবরাজ্যে বিচরণ করছিল। তার কণ্ঠস্বরও ছিল অনেকটা ভাব গভীর। এবার সহজ স্বাভাবিক সুর ফিরে এল। লক্ষ্মীর মুখের পানে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, এই ছবি আঁকতে হবে। পারবো ?

লক্ষ্মীর চোখে মুখে একটি উজ্জ্বল হাসি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মুখ ফুটে না বললেও তার অর্থ অতি পরিষ্কার—নিশ্চয়ই পারবেন।

কৃষ্ণনের এই রূপটি তার কাছে একেবারে নতুন এবং অজ্ঞাতসারে সেটা তাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল নিশ্চয়ই, যার অভিব্যক্তি ঐ নীরব সম্মতিজ্ঞাপন। কৃষ্ণনও সেই হাসিটি থেকে অনেকখানি জোর পেল মনের মধ্যে। আশ্বস্ত হয়ে বলল, তাহলে নিয়ে নিলাম। আজই আবার আসবেন সেই ভদ্র লোক। এ ছবিতে আপনার অংশ যেটুকু, আমি মনে মনে ভেবে রেখেছি। কাল বলবো। আজ অনেকক্ষণ আটকেছি আপনাকে, আর নয়।

পরদিন যেতেই লক্ষ্মীর কী কী করণীয়, একে একে জানিয়ে দিল। তার আগে একটা ভূমিকা ছিল—"আমি জানি, মিস্ দে, এর মধ্যে এমন কিছু থাকতে পারে, যা আপনার রুচিতে কিংবা সংস্কারে বাধে। তা যদি হয়, আমি আপনাকে কখনো তা করতে বলবো না। দরকার হলে ছেড়ে দেব এ ছবি। তার জন্য আপনি কিছু ভাববেন না।

পরিধানের দিক থেকে দেখতে গেলে লক্ষ্মীর কাজ তেমন কিছু বেশী নয়। একখানা নীলাম্বরী আর কিছু প্রাচীন যুগের অলঙ্কার, বাধার অঙ্গে যেটা মানাবে, আগেই রেখে নিয়েছিলেন ভদ্রলোক। সেইগুলো পরে নিয়ে পাশের বাথরুম থেকে স্নান করে ভিজে চুলে, ভিজে কাপড়ে এসে পিছন ফিরে দাঁড়াতে হবে ইজিলের একটা চিহ্নিত জায়গায়। পায়ে, পিঠে, মাথায় হেলানে যে বিশেষ ভঙ্গিমার প্রয়োজন তার নির্দেশ ক্রমশঃ দেবেন শিল্পী।

লক্ষ্মী নিঃশব্দে শুনে গেল। মনটা সঙ্গে সঙ্গে বিরূপ হয়ে উঠল—না, এ সে পারবে না! ছিঃ! তারপর কৃষ্ণনের কথাগুলো, এ সম্পর্কে যখন যা কিছু শুনেছে তার মুখ থেকে, সব একে একে নিয়ে এল মনের মধ্যে। সেই সঙ্গে তার চোখ দুটি, যার দিকে তাকালেই মনে হবে, তারা যা দেখছে, তাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে বোধ হয় কোন নিজস্ব ভাবরাজ্যে। সে দৃষ্টিতে একটা গভীর নিবেশ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি, যেন তারা ডুবে আছে কোন ধ্যানের মধ্যে। আর দেখেছে এক অদ্ভুত ধরণের হাসির রেখা।

এই সুন্দর অদ্ভুত সুগঠিত রূপটি ভালো লেগেছে, [illegible] করে দেখছেন আর তুলির টান দিচ্ছেন ক্যানভাসের উপর, কিন্তু এর উপরে কোন মোহ নেই, আসক্তি নেই। এ যেন নারী দেহ নয়, সুন্দরী যুবতীর সুপুষ্ট, সুবিন্যস্ত অঙ্গ-

প্রত্যহ নয়, এবেলা ওবেলার বন্ধু. ওঁর মুখে প্রায়ই যার কথা শোনা যায়, কোন্ ইংরেজ কবি নাকি বলে গেছেন 'এ থিং অব বিউটি'।

আর একটা কথা মনে হল লক্ষ্মীর। এই ছবিখানা ঐ মানুষটির কাছে একটা অভ্যাস মাত্র নয়, ওর সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গেছে শিল্পী সত্তা। যেন বৈষ্ণব কবির ঐ লাইন দুটিকে তুলির রঙে রূপায়িত করা ওঁর নিজের প্রেরণা। তাইই দেওয়া আশ্বাস তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। মনে মনে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। তার কাছ থেকে ভরসা পেয়েই এগিয়েছেন। এখন সে সরে দাঁড়ায় কেমন করে?

তাছাড়া তিনি তো কোনো অস্পষ্টতা রাখেন নি। আজ যা চাইছেন বারবার তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। বলেছেন আর্টিষ্টের চোখে নগ্নতা বলে কিছু নেই। মানুষের দেহের নিজস্ব যে সুষমা, সেই দিকে তার লক্ষ্য। বসনের প্রয়োজন শুধু ততটুকু, যতটুকু সেই সুষমাকে প্রস্ফুটিত করতে সাহায্য করে। যেখানে করে না সেখানে সে অনাবশ্যক।

এমনি বিভিন্ন সময়ে বলা প্রতিটি কথা এখন লক্ষ্মীর মনের মধ্যে অনুরণিত হতে লাগল।

কৃষ্ণন নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল। মনঃস্থির করতে সময় লাগবে বৈকি? কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেও যখন কোনো সাড়া পাওয়া গেল না, তখন বলল, বুঝেছি, আপনার অসুবিধা হচ্ছে। তাহলে থাক।

উঠে পড়তে যাচ্ছিল। এমন সময় লক্ষ্মী বলে উঠল, "আজই আরম্ভ করতে চান?"

—"তাইতে. ইচ্ছা ছিল"—উৎসুক সুর. কিন্তু মুখের উপর তখনো একটু সংশয়ের ছায়া।

—"ড্রিঙ্কিংগুলো কোথায়?"

—"এই যে দিচ্ছি"—ছুটে গেল টেবিলের দিকে। ড্রয়ার খুলে শাড়ী আর গয়না ক'খানা বের করে লক্ষ্মীর হাতে দিয়ে বললে, পরে নিয়ে আমাকে ডাকবেন।

পাশের কামরায় যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার চুলটা একটু খুলবেন?

লক্ষ্মী সলজ্জ হাসি মুখে খোপা খুলে মাথার একটা ঝাঁকানি দিতেই আষাঢ়ের মেঘের মত এক রাশ কালো চুল সারা পিঠময় ছড়িয়ে গেল।

"বাঃ!" মুগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল কৃষ্ণন, "এই চুল দেখেই বোধ হয় কবি ঐ লাইন দুটো লিখেছিলেন।"

॥ সাত ॥

অফিসে বেরোবার মুখে ভরা যখন টিফিনের কৌটোটা হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে, মোহিত বলল, মলয় এসেছিল এর মধ্যে?

—না তো।

—একজায়গায় একটা সাইড-রোলের কথা হচ্ছিল, তারা ওকে দেখতে চায়। এলে একবার ব'লো দেখিনি।

—বলবো।

স্ত্রীর এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে মোহিত কিছুটা বিস্ময় বোধ করল। আগে আগে এ ব্যাপারে বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করত ভরা। কবে, কোথায় কিরকম দেখে তারা, খবরটা তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেওয়া দরকার কিনা, এমনি অনেক প্রশ্ন করত। মেয়েটার উপর ওর টান আছে, তার সাংসারিক অবস্থা জানে, সে জন্যে উদ্বেগও কম নেই। কিন্তু এখন যেন বড় বেশী নির্লিপ্ত বলে মনে হল। মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখল, সেখানে কিছু পড়া গেলনা। সে আশাও অবশ্য করেনি। স্ত্রী জাতির মুখের ভাব থেকে তাদের মনোভাব কোনো পুরুষ কবে জানতে পেরেছে? যার সঙ্গে সাত বছর ধরে ঘর করছে তার বেলাতেও ঐ একই কথা! এই সনাতন দার্শনিক সত্যকে মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে নিষ্ক্রান্ত হল মোহিত বোস।

ভরা বুঝল, লক্ষ্মী সম্পর্কে তার এই অনুৎসাহ মোহিতকে বেশ খানিকটা অবাক করে দিয়েছে। এখন অফিসের তাড়া আছে বলে প্রসঙ্গটা চাপা পড়ল। হয়তো আজ রাত্রেই আবার তুলবে। তোলে, তখন সময়োপযোগী একটা কিছু জবাব দেওয়া যাবে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তাতা চলবে না। দুটো কারণে। এক, লক্ষ্মীর এই নতুন কাজ সম্বন্ধে স্বামীর ধারণা যে কত বিরূপ, তা তার আগেই জানা আছে। এ খবর শুনলে সে মোটেই চুপ করে থাকবে না।

ওখান থেকে ফেরটাকে বের করে আনবার চেষ্টা করবে। দুই,—এই দুইটা একটু গণ্ডারত্ব।

প্রথম যেদিন লক্ষ্মীকে তাদের নাটকে নামবার জন্যে মোহিত স্ত্রীর সাহায্য চায়, জয়া বলেছিল, কেন, আমার কি গরজ। খাল কেটে কুমীর আনতে যাব কিসের জন্য? সেটা নিছক রসিকতা। জয়ার স্বভাবটাই পরিহাস-প্রবণ। কিন্তু কিছু দিন যেতেই তার নিজের মুখের এই উক্তিটা এক টুকরো কালো মেঘের মত মাঝে মাঝে তার মনের কোণটা ছুঁয়ে যেত অনেকের ভয়ে একটুখানি ম্লান ছায়া ফেলত তার মুখের উপর। তাকে অবশ্য টিকতে দিত না জয়া। সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে দিত। কিন্তু সে একেবারে চলে যায়নি।

জয়া এযুগের মেয়ে। ছিঁচ কাঁদুনে নয়, কথায় কথায় আঘাত পায়না। পেলেও চাপতে জানে। সেন্টিমেন্ট আছে, কিন্তু সেই ধোঁয়াটে বস্তুটা যেন তার বাস্তব বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন না করে বসে, সে বিষয়ে সে সর্বদা সচেতন। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বিষয়েও তার মতবাদ যথেষ্ট উদার।

একবার এক কলেজ-সঙ্গীর সঙ্গে দেখা। বিয়ের পরেই আমেদাবাদে গিয়ে ঘর বেঁধে ছিল। পাঁচ বছর পর এসেছে কলকাতায়। মুখখানা কেমন গম্ভীর গম্ভীর, কোথাও যেন একটা কাঁটা লুকিয়ে আছে। প্রাণ খুলে দিতে পারছে না অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে।

—তোর কি হয়েছে বলতো? এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করল জয়া।

—হবে আবার কী?

—আমার কাছে লুকোসনে। আমি তোর পুরো দু'বছরের সিনিয়ার, তা জানিস?

—কিসের সিনিয়ার? আমি বরং কিছুটা বড় হবো তোর চেয়ে।

—"আরে, সে সিনিয়ার নয়," নিজের সিঁথির দিকে আঙুল তুলল, "তোর পাঁচ, আমার সাত।"

—"ও-ও," হেসে ফেলল সখিটি। তারপর তার মনোবেদনার কথা টুকুও জানা গেল। সেই চিরন্তন কাহিনী। এতদিন বেশ ছিল দু'জনে। সম্প্রতি কয়েকটি বান্ধবী জুটেছে ভদ্রলোকের এবং বহির্বাসনের সময়টাও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

—"এই ব্যাপার?"...অর্থাৎ ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়, এমনি ভাবে বলল জয়া, "তা, অ্যাদ্দিন তো ঘুঁটোয় বেঁধে রাখলি, এবার ঘড়িটা একটু ঢিলে কর, একটু চরতে দে বেচারাকে!"

—তোর সব তাতেই ঠাট্টা। নিজের যদি হত, তাহলে বুঝতিস।

—হুঁ, তাহলেও এই বুঝতাম যে রাশভারী-বন্ধন বলে যে রাশিটা আছে তার পাক সাতই হোক আর সতেরই হোক, সেটা ধরে বেশী টানাটানি করতে নেই। করলে—

—ছিঁড়ে যাবে বলছিস?

—যেতে পারে।

—যায় তো থাকলে!

—যদি যায়, ওরা ঠিক পাড়িয়ে থাকবে, আমরাই ছিটকে পড়বো।

প্রিয় বান্ধবীকে জ্ঞানদানচ্ছলে বললেও কথাগুলো ঠিক ওর কথা নয়। জয়ার স্বভাবটা স্বচ্ছ সাংসারিক বুদ্ধি নিজের জীবনেও তাকে মোটামুটি এই নীতি অনুসরণ করতে শিখিয়েছিল। তাই যেদিন বুঝতে পারল, তার স্বামীর মন-জানালার মলয়াকে ঘিরে কিঞ্চিৎ মলয় বায়ু বইতে শুরু করেছে এবং তারপর কানে গেল (তারেরই কোন ব্যর্থ প্রতিদ্বন্দ্বীর চেষ্টায়) যে 'তুষার ঝরায়' নায়ক তার নায়িকাকে মাঝে মাঝে স্টেজের বাইরেও নায়িকারূপে পাবার জন্যে সচেষ্ট, তখন জয়া অন্য পাঁচটি কাঁচা স্ত্রীর মত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল না, গলার জোরে কিংবা মান-অভিমানের ঝড় তুলে রাশভারী অধিকার প্রয়োগ করতে গেল না, কিংবা 'বরের বাজারে ঘাসুক সাজারে' বাপের বাড়ির দিকেও রওনা দিলনা। স্বামীকে জানতেই দিল না, যে সে কিছু জানে। লক্ষ্মীকে সাবধান করে দিতে পারত। দিলনা: বোধহয় মর্যাদায় বাধল। তাছাড়া, তার ধারণা, এ এমন জিনিস, যাকে ঐভাবে হঠাৎ বাঁধা দিতে গেলে ঠেকানো যায় না, বরং তার রোখ বেড়ে যায়। প্রাবল্যের মুখে জলস্রোতের গতিরোধ করতে নেই।

তার চেয়ে কিছুটা বইতে দেওয়া ভালো। তারপর যখন আপনা থেকেই কেটা মরম হয়ে আসে, তখন কৌশলে আরম্ভে আনবার চেষ্টাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কী করে সেটা করা যায়, সেই সঙ্গে ঐ অসহায় মেয়েটাকেও বাঁচানো যায়—(সে যে 'নেপথ্য নায়িকা'র পথে যেতে চায় না, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল জয়)-এই সব যখন ভাবছে, তখন এল সুব্রত। কিন্তু যে প্রস্তাব নিয়ে এল তার মধ্যে জয়ার নিজের দিকে যে সমস্যা তার সমাধানের সন্ধান থাকলেও, জয়ার সম্পর্কে চিন্তামুক্ত হল না। ছটফট চাটুর উপর থেকে আগুনের মধ্যে নিয়ে ফেলা হবে না তো মেয়েটাকে? সে ভাবনা দূর হল লক্ষ্মীর মুখের দিকে যখন চোখ পড়ল, আর কানে এল অস্ফুট স্বরে বলা মধুর লজ্জায় জড়ানো সেই তিনটি শব্দও যার শুধু একটি অর্থই হতে পারে এবং কোনো মেয়েই সেখানে ভুল করবে না।

এতদিনে লক্ষ্মী যদি তার ঠিক জায়গাটি খুঁজে পেয়ে থাকে, জয়ার একমাত্র কাজ সেইখানে তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করা। সেই পথ ধরেই চলেছে এবং চলতে হবে। সেখানে বিন্দুমাত্র বাধা সৃষ্টি হতে পারে, এমন কিছু সে করতে পারে না। তাই স্বামীর প্রশ্নের উত্তরটা তাকে অতি সংক্ষেপে সারতে হল। আপাতত মিথ্যার আশ্রয় নিল না বটে, কিন্তু সত্য চাপা রইল। দরকার হলে মিথ্যা বলতেও সে দ্বিধা করবে না।

একটা দিন গেল চুলের পেছনে। খোলা, এলো চুল, কবিরা যাকে বলেন আলুলায়িত কুন্তল, তার মধ্যে একটা উদ্দাম চাঞ্চল্য আছে। সে হাওয়ায় ওড়ে, মেঘের মত তার গতি তার মধ্যে লুকিয়ে আছে বিদ্যুৎ শিহরণ। 'মুক্ত কেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি।' কিন্তু কৃষ্ণন আজ, যে চিকুর রাশির' কৃপাণে ব্যস্ত, সে শান্ত, সংযত, ক্রন্দনরত, তার থেকে অঝোরে জল ঝরছে। এতখানি অনুপম দেহের উপর নিজের নিকষ কৃষ্ণ রূপ রাশি ছড়িয়ে দিয়ে সে স্থির হয়ে আছে।

সেই দিকে বারবার চেয়ে দেখছিল আর মোটা তুলির দীর্ঘ টান দিচ্ছিল ক্যানভাসের উপর। বাঁ দিকে তার চিহ্নিত স্থানটিতে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্মী—নিশ্চল, নির্বাক, মাথাটা ঈষৎ আনত, দু'পায়ে কিঞ্চিৎ চলনাভাস। সিনিয়া উঠিতে, অর্থাৎ স্নান সেরে উঠেছেন রাজরানী এবার ঘরে ফিরে যাবেন। এও আরেক খানা ছবি, ইজলের উপরে যেটি রয়েছে তার মত অপূর্ণাঙ্গ নয়, পরিপূর্ণ।

মোটা তুলি রেখে তার চেয়ে অনেকখানি সরু একটা তুলে নিল কৃষ্ণন। এবার শুরু হবে মিহি কাজ, সূক্ষ্মটান পড়বে এখানে ওখানে। তুলিটা ধুয়ে রং-এ ডোবাতে গিয়ে এতক্ষণের একটানা নীরবতা ভঙ্গ করল—"গা-হাতে ব্যথা হয়নি তো?"

—না, ব্যথা হবে কেন?

—বড়ি দুটো খেয়েছিলেন?

—ভুলে গেছি।

—ভুলে গেলে তো চলবে না। খেয়ে নেবেন। হঠাৎ অসুখ করতে পারে।

—আমার অত অসুখ করে না।

—তা কি বলা যায়? ভিজে চুলে, ভিজে কাপড়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা।

—কিছু হবে না।

—না হলেই ভালো। তবু সাবধান হতে দোষ কী?

কথাবার্তার সঙ্গে কাজও চলছিল। আরো কিছুক্ষণ পরে ঘেরাটোপের দিকে চোখ তুলল কৃষ্ণন। তারপর তুলিটা তার জায়গায় রেখে বলল, ব্যস, আজকের মত এই থাক। কাপড়টা বদলে নিন। আমি একবার বেথনগালির শরণ নিই।

লক্ষ্মী এদিকে ফিরে সিক্ত বসনে ঢাকা বুকের উপর দু'খানা হাত জড়ো করে স্নান ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, আমি কিন্তু কফি খাবো না।

—কফি নয়, চা। আপনার দেশের জিনিস।

—আমার দেশের! যুবতী ঈষৎ কিরিয়া অবেকের জন্যে থমকে দাঁড়াল লক্ষ্মী।

—হ্যাঁ; দার্জিলিং টী।...বলে, স্মিত মুখে ইঙ্গিতে

দেখিয়ে দিল বেরালে টাঙানো 'তুষার কন্যার' দিকে।

লক্ষ্মীও হাসল—সলাজ মৃদু হাসি। তারপর দ্রুত পায়ে স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পরদিন ইথালঘরে কাজ শুরু হল। জল সিঞ্চিত আবরণ অঙ্গ থেকে শিল্পীর সদ্য স্নাতা সাহায্যকারিণী যতক্ষণ না তার বিশেষ ভঙ্গিমায় নির্দিষ্ট স্থানটিতে এসে দাঁড়ায়, সে বাইরে অপেক্ষা করে। দরজার গায়ে দাড়া দিয়ে অনুমতি নিয়ে ঢোকে। আজ যখন এল মুখখানা সমাহিত, দৃষ্টি শান্ত, গভীর। ধীর পদক্ষেপে পোল টুলটির উপর এসে বসল।

কেশপর্ব শেষ; আপাততঃ। এবার তার তুলিকায় নিম্নাবতরণ। ক্ষীণ কটি এবং সেখান থেকে ক্রমশঃ বিস্তৃত যে সুপুষ্ট, সুডৌল বাঁকটি নারী দেহের নিজস্ব সম্পদ। যার অজস্র আলেখ্য ছড়িয়ে আছে প্রাচীন কাব্যে, মন্দির গাত্রে, গিরি-গুহায়, তাকে আকার দিতে হবে। শুধু আকার নয়, সেই সঙ্গে তার যে স্বর্গ বৈশিষ্ট্য, তাকেও ধরে রাখতে হবে। সেটুকু এখান থেকে পুরোপুরি পাওয়া যাবেনা। রাধার অঙ্গের সেই কাঞ্চনাভা, কবি যাকে 'কনক চাঁপা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন, এ মেয়ে তা কোথায় পাবে? তাকে যথার্থ রূপ দিতে হলে শিল্পীকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে। এই মুহূর্তে কৃষ্ণনের মনটা হয়তো সেইখানেই বিচরণ করছিল। এবং তাই তাকে অমন চিন্তান্বিত দেখিয়ে থাকবে।

কৃষ্ণন ভাবছিল, কবিরা কথায় কথায় চাঁদকে নিয়ে টানাটানি করে থাকেন কিন্তু এখানকার এই উপমাটি সে ধরণের মামুলি প্রয়োগ নয়। এর একটা নিগূঢ় তাৎপর্য আছে। চাঁদের যে রূপ, তার মধ্যে প্রখরতা নেই, স্নিগ্ধতা আছে। চাঁদ হীরক নয়, সে কনক! কিন্তু রাধারানীর অঙ্গে তো হীরার দীপ্তি। যখন চলেন, সারাদেহ থেকে রূপ ঠিকরে পড়ে। তার জ্যোতি চাঁদের চেয়ে প্রখর। কনকের চেয়েও উজ্জ্বল। তবে যে কবি বললেন, কনক চাঁপা? তার কারণ আছে। যে বিশেষ অঙ্গের কথা বলেছেন কবি, সেটি এখানে বসনাবৃত, সূক্ষ্ম, সিল্ক নীলাম্বরে ঢাকা। সে আবরণ গৌর তনুর ঔজ্জ্বল্যকে আচ্ছাদিত করেনি, শুধু তার চোখ ঝলসানো তীব্রতাকে কিঞ্চিৎ ম্লান করে দিয়েছে, একটি কোমলতার স্পর্শ এনে দিয়েছে তার মধ্যে। সে স্নিগ্ধতা চন্দ্রের, সে কোমলতা স্বর্ণের। তাই কবি তাকে যুক্ত আখ্যা দিলেন—কনক চাঁপা।

কটিবিলম্বিত নীল শাড়ী এঁটে বসে আছে দেহের সঙ্গে। তার অন্তরালে যে অনবদ্য অবয়ব, তার স্পষ্ট রূপটি উঠে এল ছবির গায়। রেখায় রঙে ধরা দিল। এবার রং। পরপর বাটিগুলো সাজানো আছে। কোনটির সঙ্গে কোন টিকে মেলাতে হবে, একটু ঝুঁকে পড়ে সবগুলো দেখে নিচ্ছে কৃষ্ণন, বাইরে থেকে ডাক এল, মিষ্টার কৃষ্ণন আছেন?

ভুরু কুঁচকে মাঝখানে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল। এ সময়ে আবার কে এল তার কাছে। লেখনহাসিকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে, কাউকে উপরে নিয়ে আসবে না, নীচের ঘরে বসাবে, লোক বুঝে চলে যেতে বলবে। নিশ্চয়ই পড়ে পড়ে ঘুম দিচ্ছে হতভাগা, সদর দরজাও খুলে রেখে দিয়েছে।

আগন্তুকের গলাটা আর একটু চড়ল—মিষ্টার কৃষ্ণন আছেন কি?

লক্ষ্মীর নিশ্চল দেহ একটু নড়ে উঠল!

—"কে?" তুলে রেখেই সাড়া দিল কৃষ্ণন।

"আজ্ঞে আমি। দোরটা একটু খুলুন না?"

স্বর শুনে প্রথমটা হঠাৎ চমকে উঠল লক্ষ্মী। পরমুহূর্তেই ছুটে গিয়ে ঢুকল বাথরুমে এবং সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

কৃষ্ণন উঠে এসে স্টুডিওর দরজা খুলে বলল, ও, আপনি!

নিরুত্তাপ স্বর। মুখেও অতিথিকে অভ্যর্থনা করবার মত কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। মোহিত সে সব লক্ষ্য করেও করল না, কাঠ হাসি হেসে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, কাজ করছিলেন বুঝি? অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম। তবে আপনার মূল্যবান সময় খুব বেশী নষ্ট···এ কি, এগুলো কার!

ঘরের এক কোণে কার্পেটের মেঝের উপর ছেড়ে রাখা শাড়ি-সায়া-জামার দিকে দৃষ্টি পড়ল মোহিতের।

নীল শাড়িটা এক-ঘর থেকে পরে নিয়ে, (তখন কৃষ্ণন থাকেনা) নিজের জামা কাপড় হাতে করেই বোজ বাথরুমে ঢোকে লক্ষ্মী, আজকেও রেখে গেছে। আজ ভুলে এখানে ফেলে গেছে।

কৃষ্ণন ওগুলো আগে লক্ষ্য করেনি, মোহিতের তর্জনী অনুসরণ করে দেখল। চোখে মুখে ও কণ্ঠস্বরে কোন ভাবান্তর হল না। একটি মহিলা আমার ছবি আঁকায় সাহায্য করেন, তাঁর।

—ও, আপনার মডেল? ইস, আপনার অত্যন্ত দরকারী কাজে বাধা দিলাম। কেরি দ-চি। তা, তিনি গেলেন কোথায়?

—আপনার প্রয়োজন যদি একটু তাড়াতাড়ি জানান—

—বড় ভালো হয়। সে তো অবশ্যই। এমনিতেই আপনার অনেক ক্ষতি করিয়ে দিয়েছি। (কথাগুলো এবং তার সঙ্গে যে হাসিটি ছিল, দুটোই ইঙ্গিতপূর্ণ) আমার দরকার অতি সামান্য। মলয়া বলে যে মেয়েটাকে আমার নাটকে হিরোইনের পার্ট করতে দেখেছিলেন, আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই, তাকে আমার বিশেষ দরকার। আগে কাজের জন্যে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসত। অবস্থা খুব খারাপ, নীতী ব্যামেলী। বড় ভাইটা খোঁড়া, ঘরে পড়ে আছে। ওকেই সব চালাতে হয়। আমি একটু-আধটু সাহায্য করছিলাম। বেশ কিছু দিন হল তার কোনো পাত্তা নেই। একটা কাজ প্রায় ঠিক হয়ে আছে। আপনি কি তার কোনো খবর রাখেন?

—"রাখি।"

—"কোথায় আছে সে?"···আগ্রহের ঝোঁকে সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ল মোহিত।

—তিনি আমার এখানে কাজ করেন।

—ও, সে-ই বুঝি আপনার মডেল? ঠিকই আন্দাজ করেছি। ছি ছি ছি! শেষকালে এই পথে এসে নামল মেয়েটা।

শেষের কথাগুলো কতকটা স্বগতোক্তি। তারপর হঠাৎ গুল ছেড়া বেলুনের মত সোজা হয়ে বসল মোহিত। তর্জনী তুলে দৃপ্তকণ্ঠে বলল, দেখুন, ওকে আমি খুব ভালোভাবে জানি। খেতে না পেয়ে মরে গেলেও এত নীচে সে নামতে পারে না, এমন করে থাকে বলে দেহ-বিক্রী করতে পারে না।

—"দেহ-বিক্রী।" কৃষ্ণনের গম্ভীর কণ্ঠে দৃঢ় প্রতিবাদ। চোখে মুখে তীব্র বিরক্তি ও বিস্ময়।

—তাছাড়া কী? এই জামাকাপড়গুলোই কী তার সাক্ষী নয়? আপনিই বলুন কি সৎ কাজে ব্যস্ত ছিলেন তিনি এতক্ষণ? আর এখন পালিয়েই বা আছেন কেন? দেহ-বিক্রী আর কাকে বলে মশাই?

রেগে দিয়ে শুরু করলেও শেষ দিকে উত্তেজনা চাপা রইল না। কৃষ্ণন সংযত স্বরেই বলল এসব বিষয় নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না। আশা করি, আপনার আর কিছু বলবার নেই।

—নিশ্চয়ই আছে। আমি আপনাকে সহজে ছেড়ে দেবো না। নিজের ইচ্ছায় নষ্ট হবার মেয়ে সে নয়। আপনি নিশ্চয়ই ভাবে ভুলিয়ে বের করে এনেছেন? এনটাইস্ করেছেন একটা গেরস্ত ঘরের ভালো মেয়েকে।

কৃষ্ণন কোন জবাব দেবার আগেই আন্ত ঘরের দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। ছিটকে বেরিয়ে এল লক্ষ্মী। ভিজে নীলাম্বরির উপরে জড়ানো একখানা বড় টার্কিশ তোয়ালে। প্রদীপ্ত চোখ দুটি মোহিতের চোখের উপর অর্পিত করে বলল, না আমি নিজের ইচ্ছায় এসেছি। যদি নষ্ট হয়ে থাকি, নিজের ইচ্ছাতেই হয়েছি। আমার ভালোমন্দের জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।

বলেই, সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে চলে গেল। মোহিত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। লক্ষ্মীর নাটকীয় আবির্ভাবের সঙ্গে সেই যে সহসা চোখ তুলে তাকিয়েছিল মোহিত তার দিকে, সে সরে যাবার পরেও তেমনি তাকিয়ে রইল। বিশ্বাস হচ্ছিল না, এই সেই মলয়া যে কখনো তার মুখের পানে চায়নি, মৃদু, বিনীত প্রায়-অস্ফুট স্বরে ছাড়া কথা বলেনি। আর আজ যেন স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে রিহিয়া কিংবা অন্য অভিনয় করে গেল। তার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। শুধু বন্ধ করা নয়, বলতে গেলে সোজা ধাক্কা দেখিয়ে দিল। যেটুকু বলল, তার চেয়ে যা অনুক্ত রইল, তার অর্থ আরো সুস্পষ্ট। 'আমার জন্য আপনাকে ভাবতে হবেনা,' অর্থাৎ 'আপনি এবার যেতে পারেন।' তাই হয়। এই-ই সংসারের নিয়ম। ওর কাছে তার যে প্রয়োজন ছিল, সেটা ফুরিয়ে গেছে। মোহিত ঘোষের ভূমিকা এইখানেই শেষ, এবার তার প্রস্থান। শুধু প্রস্থান নয়, বিদায়। কিন্তু নাটক চলতে থাকল।

সেখানে নতুন ভূমিকা নিয়ে সগৌরবে প্রবেশ করল আরেকজন।

কিছুক্ষণ বাথরুমের রুদ্ধ কপাটের দিকে চেয়ে থেকে নিজেকে যেন একটা ঝাঁকানি দিয়ে টেনে তুলল মোহিত। সেই দিকে চোখ রেখে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আসছি।

অর্থাৎ রজমঞ্চ থেকে অত সহজে বিদায় নেবার পাত্র মোহিত ঘোষ নয়। তার 'রোল' জোর করে কেটে দেওয়া হল। সেটা সে নিঃশব্দে মেনে নিয়ে সরে যাবে, তার সম্বন্ধে এ ধারণা যদি কেউ করে থাকে, সে ভুল করেছে। সে দেখতে চায়, নাটক কি রকম জমে!

স্বামীর সম্বন্ধে ঠিকই অনুমান করেছিল জয়া। স্ত্রীর ঐ সংক্ষিপ্ত উত্তরে খুশী হয়ে মলয়ার সন্ধানে সে নিরস্ত হবেনা। মোহিত তা হয়নি। তখনি সন্দেহ করেছিল, জয়া তার কাছে কিছু লুকোচ্ছে। লক্ষ্মী সম্বন্ধে এত উদাসীন সে নয়, যে, দীর্ঘকাল তার কোনো খোঁজ খবর রাখবে না। এরকম একটা আশঙ্কাও জেগেছিল তার মনে,—এই মেয়েটার সঙ্গে তার নেপথ্য-সংযোগের কাহিনী হয়তো একটু পল্লবিত হয়ে জয়ার কানে উঠেছে, (তার দলের লোকেরাই কেউ তুলে থাকবে) তাই সে চায়না, মলয়া আবার এসে দাঁড়াক তার স্বামীর সামনে। সে নিজে থেকেই সরে যেতে পারে। কোথায় গেছে, জয়া জেনেও তাকে চাইছে না। কিম্বা ওর চেষ্টাতেই হয়তো একটা কোনো নতুন সংস্থান জুটে গেছে তার। পাড়ায় এবং পাড়ার বাইরেও জয়ার একটা প্রতিষ্ঠা আছে, যেন কিছু ভক্ত আছে তার, সেটা মোহিত জানে। সুতরাং লক্ষ্মীর জন্যে একটা কিছু ব্যবস্থা করা তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব নয়। তাছাড়া মেয়েদের এই অভিনয় বৃত্তিতে তার মনের সমর্থন কোনো কালেই নেই। এ-ব্যাপারে যা কিছু করেছিল, সবই স্বামীর খাতিরে এবং পীড়াপীড়িতে।

যাই হোক, মলয়া-প্রসঙ্গে স্ত্রীকে ঘাটিয়ে কোনো লাভ হবে না, বরং নিজের দিক থেকে কিছু লোকসান হতে পারে, মোহিত সেদিন আফিসের পথেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল; কিন্তু তাই বলে এ অধ্যায় ঐখানেই শেষ করে দেওয়া যায়না। মলয়া যে তার মনে কিঞ্চিৎ মোহ সঞ্চার করেছে, নিজের কাছে এ সত্য সে অস্বীকার করতে চায় না। তাকে কাছে পেতে ইচ্ছা করে বৈকি? বেশী কিছু নয়, একটি সুদর্শনা যৌবনবতী বান্ধবীর একটুখানি নিবিড় সঙ্গ, মাঝে মাঝে তার সদ্য পরিস্ফুট রেশের দু'টি একটি পাড় উত্তপ্ত স্পর্শ, নিরাপদ নির্জনে তাকে পাশে বসিয়ে পাইবে, তার মুখে একটু সলজ্জ হাসি ফুটিয়ে তুলে, বিনম্র মধুর কণ্ঠের দুটো কথা শুনে, তারমধ্যে যে অমৃত আছে—এর বেশী আর কিছু তার কাম্য নয়। এতে দোষেরই বা কী আছে? পত্নীর নীতি-বাগীশ ছাড়া কোন্ পুরুষ এটা চায় না বা সুযোগ পেলে নেয় না?

তার সুযোগ ছিল, নেবার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু পুরোপুরি নিতে পারেনি। মেয়েটাকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও হাতখানি টেনেছিল, তা পায়নি; মনোমত সাড়া আসেনি তার কাছ থেকে। আশা করেছিল, আপনে আসবে। বয়স অল্প, সবে বাইরে পা দিয়েছে, সংসারের আসল রূপটা এখনো চিনতে শেখেনি। জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। সে অপেক্ষা যে অন্তহীন হয়ে দাঁড়াল।

হঠাৎ সুব্রতর কথা মনে পড়ল। সে তো একবার তার সেই আর্টিস্ট বন্ধুর জন্যে মডেল খুঁজছিল এবং মলয়াকে বলা যাবে কিনা জানতে এসেছিল তার কাছে। সে অবশ্য সরাসরি 'না' বলে দিয়েছিল। তার পরেও সুব্রত ঐ নিয়ে অগ্রসর হবে সেটা সম্ভব নয়। এসব বিষয়ে একটা ইন্টারেস্ট কিংবা গরজ দেখাবার মত ছেলে সে নয়। প্রফেসর মানুষ পড়াশুনো নিয়ে থাকে। স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারে মাথা গলাবে না। আর, ইচ্ছা থাকলেও, মলয়াকে সে পাচ্ছে কোথায়? কোন্ সূত্রে ধরে ধরবে তাকে?

তবু একবার সুব্রতকে কথায় কথায় জিজ্ঞেসা করা যেতে পারে, যাকে বলে সাউণ্ড করা।

বড় রাস্তায় পড়ে মোহিত ট্রাম বা বাস্ এর জন্যে মিনিট 'টেন' অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। কোনটারই দেখা নেই। তারপর তখন কোথায় কি নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছে পুলিশের সঙ্গে 'পাব্লিক্'এর। যান-বাহন সব বন্ধ। অতএব আফিসে যাওয়া শিকেয় উঠল। আরো কিছুক্ষণ দেখে সুব্রতর বাড়ির দিকে চলল। সে বেরো করে ফেলেছে যায়, এখন

নিশ্চয়ই বাড়ি আছে। রাস্তার অবস্থা যদি না জেনে থাকে, তার কাছ থেকে শুনবার পর বেরোবার প্রশ্নও থাকবে না। নিশ্চিন্ত হয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে। সেই সুযোগে এক ফাঁকে মলয়ার ব্যাপারটাও তোলা যাবে।

সুব্রতর বাড়ি গিয়ে জানা গেল সে কোলকাতায় নেই। বারাসাতে তার ভাই এক মামা থাকেন। তাঁর অসুখ শুনে সেখানে দেখতে গেছে। আর বারোটার মধ্যে ফিরবার কথা। ছুটোর ট্রেণ ধরেছে। সুব্রতর মা মোহিতকে বসিয়ে আরেকটু অপেক্ষা করতে বললেন। বৃথা হবে বলে সে আর বসল না।

বাড়ি ফেরা ছাড়া আর উপায় কী? কিন্তু সে ইচ্ছা একেবারেই ছিল না। তবু এতক্ষণে খেয়ে দেয়ে ঘুম দিচ্ছে, কিংবা বোধ হয় কেউ আসছে। এ সময়ে পত্নি দেবতার পুনরাবির্ভাবে বিশেষ প্রশ্ন হবে না। আরো কয়েক বছর আগে হয়তো হত। এখন আর সেটা আশা করা যায় না। আকর্ষণ নেই, তা নয়, তার জোর পড়ে গেছে। পুরনো হলে সব জিনিসেরই যেমন যায়। তখন দাম্পত্য সম্পর্কের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে সংসার-জীবনের নিত্যকার অভ্যাস-গুলো। একথা তার সম্বন্ধেও সত্য। অফিস থেকে ফিরে বিশ্রাম ও চা ইত্যাদির পর পা ছুটো যখন গ্রাম মুখে, তখন যদি স্ত্রী এসে আবদার করে, এসো, বসে বসে একটু গল্প করি, মনটা কি খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠবে?

এ সময়ে বাড়ি ফেরার সাধারণ অনিচ্ছার সঙ্গে আর একটা বিশেষ কারণ আজ যুক্ত হয়েছিল। তবু ইচ্ছা করে মলয়ার খবরটা তার কাছে চেপে গেছে, এ সংশয় তার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছিল না। তার জন্যে কিছুটা বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ না হয়ে পারেনি।

কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে হঠাৎ মনে হল, কৃষ্ণনের ওখানে একবার ঢু মারতে ক্ষতি কী? খানিকটা সময় কাটানো যাবে। সেই থিয়েটারের পর একবার যাওয়াও তার উচিত ছিল। সে কাজও হবে, আর মলয়া সম্পর্কে ও যদি কোনো সন্ধান রাখে, কথাচ্ছলে তাও জেনে নেওয়া যাবে।

সে সন্ধান যে এমন করে উদ্ঘাটিত হবে, মোহিত একবারও ভাবেনি।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে যা ঘটে গেল, তার আকস্মিকতাই মোহিতের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। রাস্তায় পড়ে সে ভাবটা যখন কেটে গেল, তখন সব কিছু ছাপিয়ে পরাজয়ের আক্রোশ তার মনের মধ্যে মাথা তুলে উঠল। শুধু পরাজয় নয়, তার সঙ্গে অপমান। এমন করে তাকে অগ্রাহ্য করে চলে গেলে একটা উদ্ভ্রান্ত মেয়ে! তাকে ফেলে আশ্রয় করল ঐ পটুয়াটাকে। কী আছে ওর? কত টাকা দিচ্ছে একটা মডেলকে, কত দিন দিতে পারবে?

বুকের ভিতরটা জ্বালা করে যেতে লাগল, যখন মনে পড়ল, তাকে ও কোনোদিন আমল দেয় নি। রিহার্সালের অবসরে যখনই একটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছে, সঙ্গে সঙ্গে যেন ছিটকে সরে গেছে। হাত ধরাটা পর্যন্ত পছন্দ নয়, জোর করে ছাড়িয়ে না নিলেও নীরব আপত্তিটা অস্পষ্ট রাখেনি। হোটেলের নির্জন কেবিনে ধরা দেওয়া ঘুরে থাক সামান্য একটু স্পর্শেই কুঁকড়ে গেছে। যেন লজ্জাবতী লতা! আজ কোথায় গেল সে সতীপনার ভড়ং? নিজেকে বে-আব্রু করে তুলে ধরেছে একটা অচেনা অজানা বিদেশী লোকের সামনে! কোথায় সে জন্যে লজ্জিত হবে, তা না তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এসে চোখ রাঙিয়ে গেল! এতখানি স্পর্ধা কেমন করে সহ্য করা যায়।

তাছাড়া—নিজেকে আরেক দিক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল মোহিত—তার একটা দায়িত্ব আছে ওর সম্পর্কে। তার কথাতেই ও একদিন বড়ি আচারের হেঁড়ি ছেড়ে থিয়েটারে নেমেছিল। ওর একমাত্র অভিভাবক সেই অতি মহাশিরা দাদা, সে পর্যন্ত জানে না। জানলে আসতে দিত না। সুতরাং কার্যতঃ মোহিতকেই ঐ মেয়ের অভিভাবকত্বের ভার গ্রহণ করতে হয়েছে। অভিনয় ছাড়া (যার মধ্যে কোনো অসম্মান নেই) আর কোনো কাজে তাকে লাগায়নি। আজ যখন সেই মেয়ে তার অজানতে শুধু অসম্মান নয়, অধঃপাতের পথে নিজে নেমেছে, তখন তার পক্ষে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা চলে না। যেখান থেকে যেমন করে হোক ওকে উদ্ধার করতে হবে: এটা তার কর্তব্য।

॥ দশ ॥

কৃষ্ণন তার সেই টুলটার উপরেই চুপ করে বসে ছিল। হঠাৎ

যে বিদ্যা কাওটা হয়ে গেল, তার কদর্যতা যেমন একদিকে তাকে পীড়া দিচ্ছিল, তেমনি তার লাম্পট্য প্রতিক্রিয়াও তাকে কম তাতিয়ে তোলেনি। সে ভাবছিল লক্ষ্মীর কথা। ঘুণাক্ষরেও যদি জানত তার কাছে এসে মেয়েটিকে এমন ভাবে লাঞ্ছিত হতে হবে, কখনো ওকে চাইত না। সুব্রতও হয়তো এরকম একটা পরিস্থিতির কথা ভাবতেও পারেনি। সেটা তেমন আশ্চর্য নাও হতে পারে। কিন্তু মিসেস বোস যে স্বামীকে লুকিয়ে লক্ষ্মীর এখানে এসে কাজে লাগার সম্মতি দিয়েছেন, সেইটাই কৃষ্ণনের কাছে অত্যন্ত দুর্বোধ্য হয়ে গেল। স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে, যে কারণেই হোক মোহিত এর ঘোর বিরোধী। কিংবা লক্ষ্মীকে সেছাড়তে চায় না।

মোহিত যে এখানেই থেমে যাবে, তেমন আশা করা দুরাশা মাত্র। লক্ষ্মীর ঐ সামান্য কটি কথা, যেমন দৃঢ় তেমনি সংযত, তাকে যে রীতিমত ক্ষীপ্ত করে তুলেছিল, তার চিহ্ন তার তখনকার হাব-ভাব এবং আচরণে কিছুমাত্র অস্পষ্ট ছিল না। সে আক্রোশ কোন পথ নেবে, কে জানে? এর পরে যদি ওকে আরো অপমান সইতে হয় কিংবা বিপদে পড়তে হয়, সে কেমন করে মেয়েটিকে রক্ষা করবে, এইটাই এখন কৃষ্ণনের সব চেয়ে বড় দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

ঘটনাটা যতই অপ্রীতিকর হোক তার ভিতর থেকে একটা সূক্ষ্ম আনন্দ তার মনকে বারবার স্পর্শ করে যাচ্ছিল। কখনো যাকে মাথা তুলে কথা বলতে কিংবা চোখ তুলে তাকাতে দেখা যায় নি, যার প্রতিদিনের আচরণে একটি শান্ত বিনম্র সলজ্জ সঙ্কোচ ছাড়া কিছু নেই, সে কেমন করে একবণ্ড ধারালো ইস্পাতের মত বেরিয়ে এসে দাঁড়াল লোকটার সামনে এবং যা বলল তার সবটাই একটি মাত্র উদ্দেশ্য প্রণোদিত—একজন সামান্য পরিচিত বিদেশী আর্টিস্ট যার কাছে সে কাজ করে, তাকে এক অবশ্য আক্রোশের হাত থেকে বাঁচানো। একবার ভেবে দেখল না, আরেক জনকে রক্ষা করতে গিয়ে সে নিজে কী কঠিন সঙ্কটের মুখে গিয়ে পড়ল। এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি নিশ্চয়ই আছে! তবু সব বুঝেও অসঙ্কোচে এগিয়ে এসে দাঁড়াল তার পাশটিতে। অথচ কী সম্পর্ক তার সঙ্গে!

লক্ষ্মীর সেই মুখখানা, সেই দীপ্তিমান চোখ দুটো কৃষ্ণনের চোখের উপর ভাসছিল। একটু নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিল তার মধ্যে।

হঠাৎ তাকে স্নানের ঘর থেকে বেরোতে দেখে চমক লাগল। এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশের বসবার ঘরে চলে গেল। লক্ষ্মী তার জামা কাপড়গুলো তুলে নিয়ে আবার বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

আজ অন্তত ছুটির কাজে আর ফিরে যাওয়া অসম্ভব। লক্ষ্মীও সেজন্য অপেক্ষা করলনা। বেরিয়ে এসে বলল, আমি যাচ্ছি।

— ... নি। আপনার একা যাওয়া কি ঠিক হবে? চলুন, আমি গাড়িটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

—না, যেতে পারবে।

—তাহলে এক কাজ করুন। নীচে থেকে দেখেশুনে ট্যাক্সি ডেকে নিন। বাস পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।

লক্ষ্মী মাথা নুয়ে জানায় আচ্ছা।

পরদিন সে এল না। কৃষ্ণনের দুশ্চিন্তা বাড়ল। তার বাসার ঠিকানা জানা নেই। সুব্রতর কাছে গিয়ে খবর নিতে পারে। সে বাড়িটাও ঠিক চেনে না, রাস্তাটা অবশ্য চেনা, খুঁজে খুঁজে যাওয়া যায়। কিন্তু সে কি এসব ব্যাপার জানে? জানলে হয়তো একবার আসতো।

সাত পাঁচ ভেবে স্থির করল, আর একটা দিন দেখা যাক।

লক্ষ্মীর আসবার সময় ছিল দেড়টা থেকে দুটো। খাওয়া দাওয়া সেরে আসত, এদিকে কৃষ্ণনও লাঞ্চ সেরে তৈরী হয়ে নিত। পরের দিনও সে সময় পেরিয়ে এল। বেলা পড়লে একটা কিছু করতেই হবে ভেবে নিয়ে উপরের ঘরে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল কৃষ্ণন। দরজার পায়ে মৃদু শব্দে সচকিত হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে অনেকটা নিশ্চিন্ত। একটি গোপন খুশিও অজান্তে এসে মাথা তুলল মনের কোণে। দুবেলার আগে অন্তত একটু নরম গলা করেই লক্ষ্মী তার পৌঁছবার সংবাদটা দিয়ে যেত।

দরজাটা ভেজান ছিল। বসে বসেই বলে দেওয়া যেত আসুন। কিন্তু কৃষ্ণন উঠে এসে নিজের হাতে কবাট খুলেই

অবাক হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে ঢুকবার পথ করে দিল। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অভ্যর্থনার কথাটা মুখে ফুটল না। নমস্কার কথাটাও মনে পড়ল না।

সামনে জয়া তার পিছনে সুব্রত। দুজনেই যেন অন্য মানুষ। বিরস মুখে মাথা নত করে ধীরে ধীরে সোফার উপর গিয়ে বসল। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

কৃষ্ণন বুঝতে পারছিল, ভীষণ কিছু একটা ঘটেছে লক্ষ্মীর। জিজ্ঞেস করতে যেন সাহস হচ্ছিল না। তারপর একসময়ে বলে ফেলল, ওঁর খবর কী?

—"খবর ভালো নয়" উত্তরে বলল সুব্রত, "তার বাবা তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি।"

—বলেন কী! এখন কোথায় আছেন?

"ওর এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে উঠেছে। সেই মেয়েটিই আমাকে জানিয়ে গেল কাল।"—এ উত্তরটা জয়ার। মুহূর্ত কাল থেমে যোগ করল, "সেখানে ওর থাকা চলবেনা। আমার কাছে আসতে বলেছিলাম, আসেনি। সেটা অবশ্য আশা করাও যায় না।"

শেষ কথাটার মধ্যে একটা সহায়হীনতার করুণ সুর ছিল। তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অক্ষম বেদনা বোধ। কারণটা বুঝতে কৃষ্ণনের অসুবিধা হল না। জয়া তো একা নয়। তার কাছে মানেই আর একজনের কাছে, বাড়ির যে আসল মালিক। লক্ষ্মী জলে ঝাঁপ দেবে তবু ওখানে গিয়ে উঠবে না তার দাদার কাছে সব ব্যাপারটা যে মোহিতই গিয়ে লাগিয়েছে, সেটা জিজ্ঞেস না করেও স্পষ্ট বোঝা গেল। সেই সঙ্গে অনুমান করা গেল, লাগাতে গিয়ে তার মধ্যে কত কুৎসিত রঙ ঢেলেছে লোকটা, লক্ষ্মীর দাদার মত লোককে এক মুহূর্তে কীর্ণ হিংস্র করে দিয়েছে।

কিন্তু কৃষ্ণন কী করতে পারে? তার মা বাবা থাকলেও লক্ষ্মীকে রাজী করিয়ে এ বাড়িতে নিয়ে আসতে পারত, এখানে এসে উঠবার প্রস্তাব অন্তত: করতে পারত। আর এই একা বাড়িতে তা পারে না। বিশেষ করে যে সব ব্যাপার ঘটে গেছে তারপর আর তা সম্ভব নয়। তাতে করে তাকে আরো বিপন্ন করা হবে। এই পাড়ার মধ্যেই মোহিতের বাড়ি। এখানে তার খানিকটা প্রভাবও আছে এবং সেটা ছেলে ছোকরাদের উপর, যাদের এই নিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলা কঠিন হবে না। তাছাড়া জিনিসটা কোনো তরফ থেকেই শোভন নয়। অথচ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই সব কিছুর জন্যে দায়ী। তাকে কেন্দ্র করেই একটি নিরপরাধ মেয়ে কতকগুলো কল্পিত কলঙ্কের বোঝা নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে, কোথাও একটু আশ্রয় পর্যন্ত পাচ্ছে না।

কৃষ্ণনের হঠাৎ মনে পড়ল, যারা চাকরি, বাকরি, কাজ কর্ম করে সেই সব মেয়েদের থাকা খাওয়ার জন্যে কিছু মেস-হস্টেল আছে কোলকাতায়। কোথায়, তার ঠিক জানা নেই। সুব্রতকে জিজ্ঞাসা করল, সে কোন খোঁজ রাখে কিনা। সেই সঙ্গে বলল আপাততঃ আশ্রয় তো একটা চাই।

জয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, লক্ষ্মীর একটি মাত্র আশ্রয়ের কথাই আমরা ভাবতে পারি, মিষ্টার কৃষ্ণন। আপাততঃ নয়, বরাবরের জন্যে।

কৃষ্ণন চমকে উঠল। চকিত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল জয়ার মুখের দিকে। তারপর চোখ নামিয়ে চুপ করে রইল। জয়া আবার বলল, আমার কথাটা আপনি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই।

না বুঝবার মত কিছু ছিল না। কৃষ্ণন বলল, আমি তো ওকে সেভাবে কখনো দেখিনি, মিসেস বোস।

—জানি। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি বদলায়, বদলাতে হয়।

কৃষ্ণন নীরবে মাথা নত করে বসে রইল। জয়া কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, ওকে তো আপনি কিছুদিন থেকে দেখছেন। খুব কাছ থেকে দেখছেন। কিছু কিছু পরিচয়ও পেয়ে থাকবেন। আপনার কি মনে হয় মিস্টার কৃষ্ণন, ও আপনার নিতান্ত অযোগ্য?

—না, না, উনি কেন, কারো সম্বন্ধেই আমি তা মনে করি না। নিজের সম্বন্ধে অতখানি অহঙ্কার আমার নেই। আমি শুধু বলছিলাম, জীবনের ঐ দিকটা আমি একবারও ভেবে দেখিনি। বেশ ক বছরের মধ্যে ভাববার দরকার হবে, তাও মনে করিনি।

কথাটা সুব্রতর মনে লাগল। সে পুরুষ, নিজেকে

দিয়েই জানে, এ এমন একটা ব্যাপার যার জন্য সকলের আগে একটি মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। জয়া কিছু বলবার আগেই সে কৃষ্ণনের কথার মাঝ দিল—আপনাকে এখনই মনঃস্থির করতে হবে, এ কথা আমরা বলছি না। অনেক কিছু ভাবতে হবে বৈকি ?

জয়া যোগ করল, তাই বলে একথা কিন্তু ভাববেন না, নিরাশ্রয় বলে ওকে আমরা জোর করে কোন রকমে আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্যে এসেছি।

—ছিঃ ছিঃ—জিভ কেটে ঘন ঘন মাথা নাড়ল কৃষ্ণন, "আপনার বা সুব্রত বাবুর সম্বন্ধে এ রকম ধারণা করতে পারি, এই পরিচয়ই কি দিয়েছি আপনাদের কাছে ?

কথা কয়টির মধ্যে একটা আহত অভিমানের সুর ছিল, যা জয়ার মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করল। অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল, আমাকে মাপ করবেন, মিষ্টার কৃষ্ণন, কথাটা আমি হঠাৎ বলে ফেলেছি। ভেবে বলিনি।

একটু থেমে অনেকটা যেন আত্মগত ভাবে বলল, কী পরিচয় দিয়েছেন, সেটা আপনার মুখের ওপর বলতে চাই না।

সুব্রত উঠবার উদ্যোগ করে বলল, তাহলে আজকের মত আমরা উঠি ? চলুন বৌদি।

..."কাল আবার আসবো"... বলে, জয়াও উঠে পড়ল।

কৃষ্ণন যেন অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল। অতিথিদের উঠতে দেখে হুঁশ ফিরে এল, এবং ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। কখনো আজকের ভাবটা কাটেনি। ওদের সঙ্গে কয়েক পা এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ অসংলগ্ন ভাবে বলে উঠল, একটি মেয়ের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে—

কপালে সংশয়ের রেখা। সম্ভবতঃ তাই জন্যে বাকী কথাগুলো আটকে গেল। জয়া ফিরে দাঁড়াল। সস্নেহে তাকিয়ে দেখল কৃষ্ণনের আনত মুখের পানে। মৃদু হেসে স্নিগ্ধ কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলল, না, তা যদি হত আমরা কখনো এই অনুরোধ নিয়ে আপনার কাছে আসতাম না। মনে রাখবেন আমিও মেয়ে। আরেকটি মেয়ের মর্যাদার প্রশ্নই আমার কাছে সব চেয়ে বড়। তাছাড়া ভুলে যাচ্ছেন কেন, এই মেয়েটাকে আমি ভালবাসি।

—আপনি ঠিক জানেন তার দিক থেকে—

—"জানি ভাই"—সরে এসে কৃষ্ণনের বাহুটা ধরল জয়া, "শুধু আজ নয়, যেদিন ওকে তোমার কাছে পাঠিয়েছি, সেদিন থেকেই জানি। তুমি কি কিছুই বুঝতে পারনি ?"

কৃষ্ণনের মুখের উপর একটি সংজ্ঞ হাসির আভাস ফুটে উঠল। সুব্রত বলল, আর্টিস্টরা হচ্ছে একচক্ষু হরিণ, শুধু একটা দিক দেখে।

"আর্টিস্টদের দোষ দিচ্ছ কেন ?" ঝঙ্কার দিয়ে উঠল জয়া, "তোমরা সবাই ভাই।"

রেজিষ্ট্রেশন অফিসে দু'পক্ষ থেকেই সাক্ষীর প্রয়োজন। জয়া এবং সুব্রত সে কাজটা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল। বরাবরের সম্পর্ক বদলে তারা বধূবেশে ঘরে এবং ঘরের বাইরে দাঁড়াবে, এইটাই ছিল অপ্রত্যাশিত। লক্ষ্মীকে নিজের বোনের মত দেখে জয়া, কৃষ্ণন সুব্রতর বন্ধু। কিন্তু জয় পক্ষ বদল করল। আফিসে ঢুকতে বলল, কৃষ্ণন, আমি কিন্তু তোমার দিকে।

—নিশ্চয়ই। সে প্রশ্রয়টুকু তো আগেই পেয়ে গেছি, দিদি।

—"তুই এমন করে তাকাচ্ছিস কেন ? হিংসে হচ্ছে বুঝি ?" —লক্ষ্মীর দিকে ফিরে ফোড়ন কাটল জয়া। সঙ্গে সঙ্গে চাপা কণ্ঠের উত্তর—"তা একটু হচ্ছে বৈকি ?"

জয়া কলরব করে উঠল, "ও মা, মেয়ের তো বেশ কথা ফুটেছে দেখছি। আর ক্যাদিন সাত চড়ে রা করত না।"

জয়ার উক্তিতে অন্ততঃ তার প্রথমাংশে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নেই, তার আরো জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেল। সবাইকে অবাক করে দিয়ে লক্ষ্মী সুব্রতর কাছে সরে গিয়ে বলল, মানা ? আমার দিকে আমার দাদা আছেন।

সুব্রতর মনটা মাধুর্যে ভরে গেল। এ মেয়েটিকে চরম দুর্দশা ও লাঞ্ছনার ভিতর থেকে তুলে এনে একটি সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে জয়া বৌদি যা করেছেন, সংসারে তার তুলনা নেই। সে আর কতটুকু

করেছে ? সেই সামান্যই যে এতবড় পুরস্কার পেয়ে ধন্য হবে, কখনো ভাবতে পারেনি।

লক্ষ্মীর কাঁধে একটি হাত রেখে বলল, আছে বৈকি ? আর ওপক্ষ যদি মনে করে থাকেন, ওদের চেয়ে আমরা কিছুমাত্র দুর্বল, তাহলে মস্ত ভুল করেছেন।

মনে পড়ল লক্ষ্মীর তবে আর একটা কাজ এখনো তার বাকী রয়ে গেছে। সে তার ও-ই তাকে দিয়েছে। এটা তাকে এখন চেষ্টায় করতে হচ্ছে, অবশ্য বন্ধুদের সাহায্যে। লক্ষ্মীর চোখের দিকে চেয়ে মুকুল এই আনন্দের মুহূর্তেও সে চিন্তা তাকে ব্যাকুল করে তুলেছে। এবার তাকে আরো তৎপর হতে হবে।

কয়েকদিন পরে একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করেছিল কৃষ্ণন। তার ইচ্ছা ছিল কোনো হোস্টেলে ব্যবস্থা করা। কিন্তু তার সম্ভোলতঃ অভিভাবিকা সে প্রস্তাব নাকচ করে দিল। বলল, কেন, তোমার মেসবাড়ি কোথায় গেল ?

—সে তো রয়েছে। কিন্তু—

—আবার কিন্তু কী ? সে ছোড়া একাই একশ। তারপর আমরা রয়েছি কী করতে ?

দেখা গেল, জয়া ঠিকই বলেছিল। একশ না হলেও অন্ততঃ পাঁচজন জোয়ান মানুষের কাজ করল একলা মেসবাড়ি। অবশ্য লক্ষ্মী আর সেই প্রথম দিনটির মত আড়ষ্ট হয়ে কোণে দাঁড়িয়ে রইল না। নববধূর নিষ্ক্রিয় অন্তরাল থেকে বেরিয়ে গোড়া থেকেই তাকে গৃহিনীর ভূমিকায় নেমে যেতে হল। কিন্তু জয়াকে ঠিক তার সেই বরাবরের নিজস্ব রূপটিতে পাওয়া গেল না। এল অনেক আগে, দেখল, করল, তবু সব কিছুতেই কেমন যেন একটু নির্লিপ্ত। জিনিসটা শুরু থেকেই লক্ষ্মীর নজর এড়াই নি। একফাঁকে সকলের অলক্ষ্যে কাছে এসে দাঁড়িয়ে নীরবে একবার শুধু মুখের দিকে তাকাতেই জয়া সব বুঝল। ধীরে ধীরে বলল, ভাখ, এসব তো তোর বাড়িতে হবার কথা নয়। এ আমার কাজ। সেটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

সে দুঃখ যে কত বড় লক্ষ্মীর চেয়ে কে বেশী জানে ? তার মূলে যে লজ্জাকর এবং বেদনাময় ইতিহাসটি লুকিয়ে আছে, জয়ার মত মেয়েকে যা উঠতে বসতে আঘাত করছে, তাও তার অজানা নয়। তাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর, বলল, আমার বাড়ি কি তোমার নয়, দিদি ?

—আচ্ছা, চল।

এর পরে তার আচরণে এবং কথায় বার্তায় উৎসবের উপযোগী উচ্ছলের অভাব টের পাওয়া গেলনা। অন্ততঃ বাইরে থেকে যারা এসেছে, কৃষ্ণনের দু-তিনটি আর্টিস্ট বন্ধু এবং লক্ষ্মীর বাড়ি-আচারের সঙ্গিনী সেই যে মেয়েটি ওকে আশ্রয় দিয়েছিল, তারা কিছুই ধরতে পারলনা। এই বাক-নিপুণা মধুর বচনা মহিলার প্রাণোচ্ছল হাসি পরিহাসে সকলেই অভিভূত হয়ে রইল।

অতিথিরা তখন চলে গেছে, জয়া নীহারের বসবার ঘরে বসে কথা বলছে, সেই অবসরে লক্ষ্মী চোখের ইশারায় সুব্রতকে ডেকে নিয়ে গেল ও দিকের বারান্দায়। কিন্তু বলবার আগেই সুব্রত তার উৎকণ্ঠ চোখ দুটি লক্ষ্য করে বলল, আমি খবর নিয়েছি। তিনি ভালো আছেন। যাকে দিয়ে নিয়েছি, সে পাড়ারই ছেলে। ছেলেটি ভাল। নাম হচ্ছে সুদীপ, সুদীপ সেন।

—ও, সুদীপদা ?

—তুমি চেন নাকি ?

—হ্যাঁ, বাবার কাছে আসেন মাঝে মাঝে।

—ও-ই চেষ্টা করে কয়েকটি ছেলে ছুটিয়ে দিয়েছে। তারা দু'বেলা এসে পড়ে ওঁর কাছে। যা দেয় ওঁর কোনো রকমে চলে যাবে। অন্য কোনো সাহায্য তো নেবেন না। আর সেই বাচ্চা ঝিটিও আছে। রান্না-বান্না, সেবা শুশ্রূষা করে। তার মাও এসে খোঁজ খবর নেয়।

লক্ষ্মী যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে শুনছিল। তার চোখ দুটি কখন জলে ভরে গেছে জানতে পারেনি। সুব্রত সেই দিকে চেয়ে বলল, কেঁদো না। কাঁদবার কী আছে ? একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল, আপনাকে কিন্তু মাঝে মাঝে তার খবর জানিয়ে দিতে হবে।

—তা দেব বৈকি ? সেটা এমন কিছু শক্ত নয়। ঐ সুদীপের ছোট ভাই আমাদের কলেজে পড়ে। আমার ছাত্র।

—ও, তাই বুঝি।

—হ্যাঁ। আরেকটা দিক দিয়েও কোন বন্দোবস্ত করা যায় কিনা, চেষ্টা করা হচ্ছে। যদি লেগে যায় ওর সম্বন্ধে আর কোনো ভাবনা থাকেনা।

লক্ষ্মী উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল, "কী বন্দোবস্ত?"

সুব্রত বলল, তোমাকে জানাই নি, কেননা জানাবার মত অ্যাদ্দিন কিছু ছিল না। এবার একটু এগিয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে, উনি যে ফ্যাকটারিতে কাজ করতেন সেখান থেকে কিছু কমপেনসেশন আদায় করা যায় কিনা, তাই নিয়ে মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। ঐ সুধীপ একটু-আধটু ট্রেডইউনিয়নের কাজ করে।

—'কিসের কাজ করে?'—কথাটা লক্ষ্মীর কাছে একেবারে নতুন।

সুব্রত বলল, "সে সব বুঝতে তোমার অনেক সময় লাগবে। আমিও যা জানি নেহাৎ ভাসা-ভাসা। কাজটা খুব ভালো। কলকারখানার মালিক যাতে কর্মচারিদের ঠকাতে না পারে, তারা যাতে তাদের ন্যায্য পাওনা পায়, তার জন্যে ওদের জোট বাঁধতে শেখানো, তাদের ঘরে লড়া—এইসব আর কী।

—ও, সেই জন্যে বুঝি সুধীপদা একবার জেলে গিয়েছিল।

—তা হবে। এগুলো যারা করে তাদের মাঝে মাঝে জেলে যেতে হয়। সে যাক, শুধু সুধীপ নয়, ওদের যারা নেতা তাদের মধ্যে একজন এই নিয়ে চেষ্টা করছে। আমিও একদিন সেই মালিক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে এসেছি। বললেন, বিপদটা সেক্ষ ওঁর নিজের দোষে ঘটেছে। তা সত্ত্বেও তিনি কিছু দিয়েছেন।

—হ্যাঁ, দাদা তখন হাসপাতালে! খুব উপকার করেছিলেন ভদ্রলোক।

—লোকটি ভালো। তাতেই আশা হচ্ছে, আরো কিছু পাওয়া যাবে। তাছাড়া সুধীপরা সহজ পাত্তর নয়। সে ভয়ও আছে।

লক্ষ্মীর চোখ দুটো আশায় উজ্জ্বল এবং কৃতজ্ঞতায় আর্দ্র হয়ে উঠল।

॥ এগারো ॥

নীচেকার বসবার ঘরের পাশে ঢাকা বারান্দায় ওদের খাবার জায়গা। একখানি ছোট ডিম্বাকৃতি টেবিল। লক্ষ্মী যখন আসে নি, তার পাশে একখানা হাতল-বিহীন বেতের ছাওনিয়ালা চেয়ার বসানো থাকত। এবার উলটো দিকে আরেক খানার আগমন ঘটেছে। একই রকম চেহারা, কিন্তু নতুন। কৃষ্ণন তার পুরনো আসনেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, নতুন এখনো অনধিকৃত। যার উদ্দেশ্যে তার আমন্ত্রণী তাকে শুধানো বলানো হয় নি। কৃষ্ণন কয়েকবার বলেছে। উত্তরে প্রায় একই কথা শুনতে হয়েছে—"আমার এখন কত কাজ! কিংবা একেবারে খিদে নেই। তুমি বসো, আমি পরে খাবো।"

একদিন যখন কিছুতেই এ সব মিথ্যা অজুহাত শুনতে চাইছে না কৃষ্ণন, লক্ষ্মী কিছুক্ষণ লজ্জানত মুখে চুপ করে থেকে বলেছিল এক সঙ্গে খেতে নেই।

—কে বলল নেই? সবাই তো খায় আজকাল।

—তা হোক আমার কি রকম বিচ্ছিরি লাগে।

কৃষ্ণন আর পীড়াপীড়ি করে নি।

আজও সে একাই চা খেতে বসেছিল। লক্ষ্মী রুটিতে মাখন মাখিয়ে একটি একটি করে এগিয়ে দিচ্ছিল প্লেটের উপর। মাঝে মাঝে স্বামীর মুখের দিকে দৃষ্টি ফেলছিল। কৃষ্ণন বেশ কিছুটা গম্ভীর এবং অন্যমনস্ক। যেন হাসি ছিল না। একটু আগে বাজারে বেরিয়ে গেছে।

চায়ে চিনি মিশিয়ে পেয়ালাটা সামনে এগিয়ে দিয়ে লক্ষ্মী বলল, ছবিটা শেষ করবে না?

কৃষ্ণন হঠাৎ চমকে উঠল, আচমকা কোনো চিন্তা সূত্র-ছিঁড়ে গেলে যেমন হয়। কোনো জবাব দিল না। লক্ষ্মী আবার ঐ একই প্রসঙ্গের পুনরুক্তি করল, "কতদিন ঘরে পড়ে আছে ছবিখানা সেদিন দেখছিলাম, কোথাও কোথাও রংটা যেন একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

কৃষ্ণন শুধু বলল, 'দেখি।' বলে তাড়াতাড়ি চা-টা শেষ করে উঠে পড়ল।

লক্ষ্মী একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মনে হল, বিষয়টা যেন এড়িয়ে গেল।

বিয়ের পরে আর একদিনও সেই পরনো ছবিতে হাত দেয়নি, অন্য কোনো ছবিও করেনি। প্রথম কদিন তো হৈ হৈ করে কাটল। এখানে ওখানে বেড়াতে যাওয়া কোনো কোন দিন সহর ছাড়িয়ে বাইরে—। ছুটীর পর ছুটী ধরে গল্প করা, ঘর সাজানো, কেনা-কাটা, সংসার নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। ক্রমশঃ সেগুলো মিটিয়ে এল। এখন কখনো বসে বসে ভাবে, কখনো পড়ে, ইুডিওতে যায়, বেশীক্ষণ থাকে না, ম্লান মুখে পাশের খোলা ছাদটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে উঠে। সোহাগে করে জড়াজড়ি করে স্ত্রীকে। লক্ষ্মী ছুটতে ছুটতে আসে, কী হল!

—সারাদিন কী তোমার কাজ বল দিকিন।

—ওমা, কাজ থাকবে না?

—না।

—তাহলে কী করতে হবে শুনি?

—কিছু করতে হবে না। এসো।

হাত ধরে নিয়ে যায় উপরের ঘরে। পাশে বসিয়ে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে, ছেলে মানুষের মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এক একদিন মেঘ নিবিড় ঘন কালো চুল গুলোর মধ্যে মুখ লুকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

সুযোগ বুঝে আবার একদিন ছবির কথা পাড়ল লক্ষ্মী, "তুমি যখন বেরিয়েছিলে, সেই ভদ্রলোক এসে অনেকক্ষণ বসে ছিলেন।"

কোন ভদ্রলোক, জানতে চাইলেও কৃষ্ণন। সে জানে। বলল, এবার যেদিন আসবে, আমি যদি না থাকি, বলে দিও, ও ছবি হবে না। দুয়ারের ভিতর থেকে শাড়িটা আর গয়না গুলোও ফেরৎ দিয়ে দিও।

লক্ষ্মীর মুখে অনেকক্ষণ কোনো কথা সরলনা। শুধু বিস্ময় নয়, কেমন এক ধরণের ভয় তার মনের উপর কালো ছায়া ফেলল। এই ছবি উপলক্ষ করে কী না ঘটে গেল তাদের জীবনে। কত লজ্জা, কত লাঞ্ছনা। তাই কি ওর উপরে এত বিরূপ হয়ে উঠছে কৃষ্ণন? কিন্তু আরেক দিক দিয়ে দেখতে গেলে ঐ ছবিই তাদের মিলনের সেতু। বড় ব্যথার ভিতর দিয়ে ও-ই তাদের দুজনকে আজকের এই আনন্দোজ্জ্বল নতুন জীবনের মূলে এসে দাঁড় করিয়েছে। লক্ষ্মীর কাছে ও মঙ্গলের দূত। আর স্বামীকে যদি সে সুখী করতে পেরে থাকে, তাঁরও একে সাদরে গ্রহণ করবার কথা।

তাছাড়া, এই ছবির সঙ্গে কৃষ্ণনের কত স্বপ্ন, কত সাধনা, কত উদ্দীপনা জড়িয়ে আছে! তার শিল্পী-জীবনের মহৎ প্রতিশ্রুতি লুকিয়ে আছে। এর প্রতিটি নিপুন রেখায়। একে কখনো বর্জন করা যায়?

লক্ষ্মী কিছুতেই ভেবে পেল না এ ছবির উপর ওর এতখানি বিতৃষ্ণার কারণ কী। হঠাৎ মনে হল তার কাছ থেকে, শুরু থেকে যে সাহায্য পাচ্ছিল, এখন নানা কাজের মধ্যে তার সুবিধা সুযোগ হবেনা, এই ভেবেই হয়তো এগোতে চাইছে না। সে সম্বন্ধে ওকে নিশ্চিন্ত করা দরকার। বলল, তুমি কি আমার কথা ভেবে দোমনা করছ?

না, না, আমার কোনো অসুবিধে নেই। আমি সব সময়েই তৈরী। যখনই বলবে, এসে দাঁড়াবো।

"না, এখন আর তোমাকে ওখানে এনে দাঁড় করানো যায় না—" শুষ্ক গম্ভীর স্বরে বলল কৃষ্ণন।

লক্ষ্মী মনে করল এটা পরিহাস, যদিও সুরে বা মুখের ভাবে তার কোনো লক্ষণ ছিল না।

—"কেন? আমি কি এরই মধ্যে দেখতে বিচ্ছিরি হয়ে গেছি?" বলতে বলতে লক্ষ্মীর সুন্দর ঠোঁট দুটিতে একটি চাপা হাসি খেলে গেল। 'বিচ্ছিরি' সুরের কথা এই কদিনে তার রূপের জোয়ার কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। শুধু নিজের চোখে নয়, স্বামীর দুটি মুগ্ধ চোখ দিয়েও তা সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।

কৃষ্ণন সে দুর্লভ হাসিটুকু যেন দেখেও দেখল না। আগেকার গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বলল, জিনিসটা তোমাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না, লক্ষ্মী। কি জানো? আমার ঐ টুলটাতে বসে একদিন তোমাকে আমি যে চোখে দেখেছি আই হ্যাভ্, লষ্ট্, দাট্, আর্টিষ্টস আই, সে চোখ আমি হারিয়ে ফেলেছি।

বিহ্বল, বিদ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চেয়ে রইল লক্ষ্মী, কী বলতে চাইছে কৃষ্ণন! এ কথার অর্থ কী। সে তখনও বলে চলেছে, "তোমাকে নিয়ে যখন ছবি আঁকতাম, আমার

কাছে তুমি ছিলে একটি সুন্দর দেহ, এ বিউটিফুল ফিগার। তার প্রতি অঙ্গের আশ্চর্য গঠন আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি, তাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি আমার তুলির মুখে। তার সঙ্গে ঐ টুকুই আমার সম্পর্ক। তার ওপরে আমার কোন আসক্তি ছিল না। আর্টিষ্ট্ ছাড়াও আমার মধ্যে যে একটি মানুষ রয়ে গেছে, রক্তমাংসের মানুষ, যার প্রবৃত্তি আছে, প্যাশন আছে, তাকে সে কোনদিন স্পর্শ করেনি। সে যে শুধু একটা ফিগার নয়, একজন মানুষ, মেয়ে মানুষ, যার ভিতরে প্রাণ আছে, তাতে রক্তের স্রোত বইছে যার বুকে, সে সম্বন্ধেও বলতে গেলে আমি নির্বিকার ছিলাম।

আজ তার সব রূপটাই আমার চোখে বদলে গেছে। সে এখন কেবল মাত্র একটি স্ত্রীদেহ নয়, সে আমার স্ত্রী। তাকে আমি আমার কামনায়, আমার বাসনার রং-এ রাঙিয়ে দেখছি। তাকে আমি ভালবাসি, তার ওপর আমার প্রচণ্ড লোভ। তাকে কাছে পেতে, ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছে করে। সে আর যা-ই হোক, আমার ছবির মডেল হতে পারে না।"

লক্ষ্মী ওঠার হয়ে শুনছিল। শেষের কথাগুলো তার সারাদেহ ছুড়ে বহু সঞ্চার করছিল। কোন্ স্ত্রীর না হবে? তারপরেই সে সহসা সজাগ হয়ে উঠল। একটা অপরাধ বোধ ধীরে ধীরে মাথা তুলে উঠল তার চেতনার মধ্যে। স্বামীর প্রেমের অখণ্ড অধিকার সে পেয়েছে। তার চেয়ে বড় গৌরব আর কী আছে? কিন্তু সে প্রেম যদি তার প্রতিভার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়, কোথায় রইল সে গৌরব? কী মূল্য সে স্ত্রীর, যে শুধু তার স্বামীর শয়নের সঙ্গ দেয়, কর্মে প্রেরণা দেয় না? বিবাহ যদি শিল্পীর সাধনাকে ব্যাহত করে, তার সার্থকতা কোথায়?

কৃষ্ণনের সব কথা লক্ষ্মী ঠিক বুঝতে পারেনি। তার গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করবার মত শিক্ষাও ছিল না। যে টুকু বুঝেছিল তার থেকে নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হয়। সে এসেছিল কৃষ্ণনকে সাহায্য করতে এবং তাই নিয়ে মনে মনে গর্ববোধ করেছিল। সে একজন শিল্পীর সাধন-সঙ্গিনী! তার এই দেহটা তুচ্ছ নয়, এর ভিতর থেকে একজন চিত্রকর তাঁর সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহ করছেন। সে সৃষ্টি তাকে শুধু তৃপ্তি দেবেনা, খ্যাতি ও গৌরবের আসনে নিয়ে বসাবে। অন্তরাল থেকে সে-ও তার অংশীদার।

আজ এই গর্ব তার ধূলিসাৎ হয়ে গেল। নিজের কাছে বড় ছোট হয়ে গেল লক্ষ্মী। তারই জন্যে তার স্বামীর শিল্প-জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে?

কোনো কথা না বলে সে ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল। তার দুচোখ জলভরে ফেটে পড়ছিল। এই মুহূর্তে এমন একটা নিভৃতি দরকার যেখানে সে প্রাণভরে কাঁদতে পারে।

কৃষ্ণনের এমন কোন পুঁজি ছিল না যার উপর দীর্ঘ দিন নির্ভর করা যেতে পারে। বিয়ে উপলক্ষে তার অনেকটা বেরিয়ে গেছে। পরবর্তী খরচ-পত্রেও হিসাবী গৃহকর্তার পরিচয় পাওয়া যায়নি। বরং কিছুটা অমিতব্যয়িতার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষ্মী বাধা দেবার চেষ্টা করেছে, এতে কী হবে! তিনটি প্রাণী।

"তা হোক" বলে কাটিয়ে দিয়েছে কৃষ্ণন। যখন তখন অনাবশ্যক উপহারে বিব্রত বোধ করেছে লক্ষ্মী। প্রতিবাদ করেছে, কোনো লাভ হয়নি। স্ত্রীকে সে শুধু সুখী রাখতেই চায় না। জীবন যাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা দিতে চায়।

হঠাৎ তার মায়ের কথা মনে পড়ে গেছে। প্রথম জীবনে টানাটানি থাকলেও পরের দিকে তার বাবার অবস্থা অসচ্ছল ছিল না। কিন্তু নিছক সাংসারিক প্রয়োজনে যা লাগে, তার বাইরে একটা কোনো মৌসিম জিনিস তিনি স্ত্রীর হাতে কোনদিন এনে দেননি, উপহার তো দূরের কথা। মায়ের মনে সেজন্য ক্ষোভ ছিল, যদিও মুখ ফুটে কিছু বলেননি। কৃষ্ণন লক্ষ্মীর মনে কোনো ক্ষোভ থাকতে দেবে না। তার বাবার ত্রুটি সে এইভাবে কিছুটা পূরণ করতে চায়।

মাস কয়েক পরে বাড়ি ভাড়ার সামান্য টাকাটা স্ত্রীর হাতে দিয়ে কৃষ্ণন বলল, আপাততঃ এটা রাখ। বাকীটা কদিন পরে দিচ্ছি।

লক্ষ্মী টের পেয়েছিল, 'বাকীটা', যা এতদিন ব্যাঙ্কের পাস-বই থেকে আসছিল, এবার অন্য কোনোখান থেকে সংগ্রহ করতে হবে। কয়েকদিন ধরে বোধহয় সেই

চেষ্টাই করছিল কৃষ্ণন। একটা স্ক্যাণ্ডেল নিয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে গতি দেখে লক্ষ্মীরও বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে তার মধ্যে শিল্পীর মন ছিল না, কিংবা অনভ্যাসের দরুন হাত চলছিল না।

যাই হোক, বিলম্বে হলেও ছবি একদিন শেষ হল, বিক্রীও হয়ে গেল কোন একটা একজিবিশনে। অর্থ যা এল আশানুরূপ নয়। সংসারের মালিক বোধ করা গেল না। অবশ্য তারই মধ্যে খরচটা সন্তর্পণে টানাটানি করে চালাচ্ছিল লক্ষ্মী। শিশুকাল থেকে এর চেয়ে অনেক বেশী অভাবের সঙ্গে লড়াই করে এসেছে। সংসার কি বস্তু, তার চেয়ে কেউ বেশী জানে না।

লক্ষ্মীরাণী রাধারানীর সেই অসমাপ্ত মূর্তিটা স্টুডিওর এক কোণে পড়েছিল। সে দিকে তাকাতে গেলে লক্ষ্মীর বুক ফেটে যেত। তবু একদিন, সংসারের অবস্থা ভেবে, তার কথা আবার পাড়তে হল। এবার অন্য প্রস্তাব—"এক কাজ করলে হয় না? মডেলের কাজ যারা করে, তাদের মধ্য থেকে দেখে শুনে আর একটিকে যদি রাখা যায়—"

কথাটা শেষ করতে পারল না। গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠছিল কান্না। কোন রকমে চেপে রাখল।

কৃষ্ণন ছবিখানার দিকে একবার চেয়ে দেখল। তারপর বলল, তাই কি হয়? যাকে তাকে দিয়ে এ কাজ চলে না।

ইদানিং বেশীর ভাগ সময় কৃষ্ণন বিমর্ষ হয়ে থাকত। যখন তখন বাড়ি হয়ে বেরিয়ে যেত। চেহারা দেখলেই বোঝা যেত, খুব ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে।

হঠাৎ একদিন প্রভুর মুখে হাসি ফিরল। সরলা খুলল দেখনহাসি। মনিব এবং মনিব পত্নীর দেখাদেখি সেও কিছুদিন থেকে যখন তখন তার হাসির ছটা ছড়িয়ে দেওয়া বন্ধ রেখেছিল। আজ সে বাঁধন খুলে গেল। কৃষ্ণন ঢুকেই ডাকল, "লক্ষ্মী"। সেই প্রাণ খোলা ডাকের গলার ডাক অনেকদিন পরে শুনল লক্ষ্মী। সঙ্গে সঙ্গে আসতে পারল না। নীচের কলতলায় ঢুকে সবে কয়েক মগ জল মাথায় ঢেলেছে। দেখনহাসি ছুটে গিয়ে দরজার বাইরে থেকে বলল, বৌদিমনি শীগগির। সাহেব ডাকছেন।

—এই তো আমার হয়ে গেল। বল, এখুনি যাচ্ছি।

বিয়ের পর লক্ষ্মীকেও যেম সাহেব বলতে শুরু করেছিল দেখনহাসি। কেউ বলে দেয়নি। সাহেবের স্ত্রীলিঙ্গ যে মেম সাহেব, সেটুকু ব্যাকরণ জ্ঞান তার ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু লক্ষ্মীর ধমক খেয়ে নিরস্ত হতে হল। 'মা' বলাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হত। কৃষ্ণনই ওকে চাকরি দিয়েছে। তার বাবার আমলের লোক নয়। কিন্তু সবে বিয়ে হয়েছে, 'মা' ডাকটা কেমন যেন বুড়োটে মনে হল লক্ষ্মীর। তাই 'বৌদিমনি'তেই রয়ে গেল। কৃষ্ণনকেও সেই সুবাদে 'দাদাবাবু'তে দাঁড় করাতে চেয়েছিল। দেখনহাসি দাঁতে জিভ কেটে ঘন ঘন মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল। না, ওটা সে মরে গেলেও পারবে না। সাহেব থেকে দাদাবাবু! বৌদিমনি বলে কী?

আন সেরে একখানি কচি কলাপাতা রং-এর তাঁতের শাড়ি আর রক্ত রং-এর খাটো হাতা ব্লাউজ পরে এক বোঝা ভিজে চুল পিঠময় ছড়িয়ে দিয়ে লক্ষ্মী যখন তাদের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল, তখনো তার কপালে, গায়ে চোখের নীচে ছোট ছোট জলের কণা লেগে আছে। কৃষ্ণন খাটের উপর বসে এইমাত্র তার কফির পেয়ালা শেষ করেছে। স্ত্রীকে যেন নতুন দেখল। সুচোখে বিমোহিত দৃষ্টি। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাতে টেনে নিল বুকের মধ্যে। এই প্রগাঢ় বাহুপাশের স্বাদ লক্ষ্মীও যেন অনেক দিন পায় নি।

"একটা খবর আছে," স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে শুরু করল কৃষ্ণন। তার একটা হাত তখনো ওর হাতের মধ্যে, "এক দিক দিয়ে সুখবর। কেননা, প্রোপ্তিটা বেশ ভালো, কিন্তু আরেক দিক দিয়ে মনটা সরছে না।

"কোন নতুন অর্ডার?" জিজ্ঞেস করল লক্ষ্মী।

—হ্যাঁ। এখানে নয়, বাইরে।

—বাইরে। কোথায়?

—খুব বেশী দূরে নয়। বেনারস। ওখানে গিয়ে থাকতে হবে বেশ কিছু দিন। ফ্রেসকোর কাজ।

—সেটা কী?

—বাংলায় একে বলে প্রাচীর চিত্র। কয়েকজন শেঠ একটি মন্দির তৈরী করছেন। তার দেওয়ালে ছবি আঁকতে হবে।

লক্ষ্মীর মনের মধ্যে একটি আশার অঙ্কুর মাথা তুলে উঠল। সেও কি এই সঙ্গে যেতে পারে না? কাশীর নাম শুনেছে, কখনো দেখেনি। কোলকাতা ছেড়ে কোথাও যায় নি। একটু বেড়াতে ইচ্ছা করে।

কৃষ্ণনের শেষের কথাতেই অঙ্কুরটি মিলিয়ে গেল। ওখানে থাকতে হবে ওদেরই একজনের বাড়িতে। ওর একার মত ব্যবস্থা। অবশ্য কিছু দিন পরে হাতে কিছু টাকা এলে একটা বাসা-টাসা দেখে নেবার চেষ্টা করা যেতে পারে। সে সুদূর সম্ভাবনায় লক্ষ্মী মনে মনে বিশেষ আশ্বস্ত হতে পারল না। তবু জোর করে খানিকটা উৎসাহ সঞ্চয় করে বলল, তার জন্যে এত ভাবছ কী? মেঘন-হাসিকে সঙ্গে দিয়ে দেবো। ও যতটা পারে করবে।

—কী যে বলো: তুমি একা থাকবে এই বাড়িতে?

—একা কোথায়? পাশের ঘরেই তো ভাড়াটেরা রয়েছেন। গিন্নী খুব ভালো লোক। আমাকে একেবারে মেয়ের মত দেখেন।

—তাহলেও, একেবারে একা কখনো থাকা যায়। মেঘন-হাসি তোমার কাছেই থাকবে। আমি একটা লোক দেখে নেবো। সেটা কোনো সমস্যা নয়। তোমাকে ফেলে যেতে হবে, সেই কথা ভাবছি।

স্বামীর কাঁধের উপর মাথাটা নামিয়ে দিয়ে তার একটা বাহু জড়িয়ে ধরে লক্ষ্মী বলল, আমারই কি ভালো লাগছে? কিন্তু উপায় কী? এমন একটা কাজ!

বিয়ের পর লক্ষ্মী বড় একটা অন্নদার ওখানে যেত না, সেই আসত ওর কাছে। ইদানিং কৃষ্ণন যে কেমন মন-মরা হয়ে ঘুরে বেড়াত, স্ত্রীর কাছ থেকেও দূরে সরে যাচ্ছিল, অন্নদার তীক্ষ্ণ চক্ষুতে সেটা এড়ায় নি, যদিও কথাবার্তায় কোনো আভাস পাওয়া যায় নি। লক্ষ্মীও কিছু বলেনি। এবার একদিন গিয়ে কৃষ্ণনের কোরস যাবার খবরটা জানিয়ে দিল। অন্নদা যেন একটা দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, এমনি ভাবে বলল, বাঃ, এমন একটা অবর খবর আমাকে আগে জানাতে হয়। আমি হাওড়ায় গিয়ে 'সী অফ্' করে আসতাম।

—জানাবার সময় পেলাম কই? দুদিনের মধ্যে গোছগাছ করে বেরিয়ে পড়তে হল।

—তুই আবার ঠ্যাং ছাড়িয়ে ক'দিন [illegible]?

—কী যে বল!

—শোন, এবার একটু গাম্ভীর্যের ছায়া তরল অন্নার মুখে, এটা খুউব ভালো হয়েছে। এমনি মাঝে মাঝে ওদের বাইরে যেতে দিতে হয়। আঁচল চাপা দিয়ে রাখ-বার মত জাত ওরা নয়। বড়শি-গাঁথা মাছের মত। খানিকটা সুতো না ছাড়লে তাদায় তোলা যায় না।"

—এমন সব উদ্ভট কথাও তোমার মাথায় আসে!

—উদ্ভট হলেও কথাটা খাঁটি। যাক, তোর মেঘন-হাসি আছে তো?

—আছে।

—ব্যাস, তাহলে আর কথা কী, যখনই দরকার বোধ-করবি, একবার যেন দীপ দেখিয়ে যাস। তুইও আসবি মাঝে মাঝে। আমি তো যাবোই।

বিকেল হতেই উঠে পড়তে যাচ্ছিল লক্ষ্মী। অন্না বলল, এত তাড়া কিসের? বোস না? সে এখানে নেই।

—নেই! কোথায় গেলেন?

—কি জানি অম্বলপুর না উটকামণ্ড, ঠিক মনে নেই। সুটিং-এ গেছে।

—সুটিং-এ।

—হ্যাঁ; সিনেমায় নেমেছে তো।

লক্ষ্মীর মুখে আর কথা সরল না। শুদ্ধ হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। অন্না আড়চোখে একবার দেখে বলল, ও অবিশ্যি একটু কিন্তু-কিন্তু করেছিল। আমি তো জানি ওটা মুখের কিন্তু, মনের কিন্তু নয়। তাই বেশ জোর দিয়ে বললাম, এ চান্স কখনো ছাড়তে আছে?

—বলতে পারলে?

—কেন পারবো না? ঐ দিকে ওর মন-প্রাণ পড়ে আছে, পাউনও রয়েছে, আর সেটা সে জানে। এতটা জেনেও বাধা দিতে যাবো কেন?

—কিন্তু—

—তোর মুখেতে সেই কিন্তু! ...বলে হেসে ফেলল।

বলার খানিকটা গম্ভীর হয়ে বলল, দাখ, অনেক দেখে আর তে একটা কথা শিখেছি, সাধারে জোর জুলুম করে কিছু ওয়া যায় না। যেটুকু পাবার আপনা থেকেই পাবো. যে হা পাবার নয় তার জন্যে কাড়াকাড়ি করতে গেলে, র হয় শুধু লজ্জা আর গ্লানি, তার সঙ্গে একরাশ দুঃখ। থাটা তুইও মনে রাখিস।

॥ আট ॥

বেনারসে পৌঁছে মাসখানেক গেল প্রাথমিক আলোচনায়, মিলপত্র সংগ্রহ এবং অন্যান্য আয়োজনে, এতবড় একটা জ শুরু করবার আগে যার একান্ত প্রয়োজন। তারপর ছন কলিনের জন্যে কোলকাতায় ঘুরে গেল। এর পরে র সময় হবে না। একবার লেগে পড়লে রং তুলির রাজ্য কে বেরিয়ে আসা শক্ত। তাতে যে মানসিক ছেদ পড়ে ছের কাজের পক্ষে সেটা হানিকর।

লক্ষ্মী আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, কত রোগা হয়ে ছ এরই মধ্যে। তার মানে, ঠিক মত খাওয়া দাওয়া ছনা।

—কে বললে ? প্রচুর খাচ্ছি সেঠবাবুদের সেদিকে নজর ছে। আর্টিস্টকে যে শুধু ফুলের গন্ধ আর দক্ষিণ হাওয়া লে চলে না, তা বিলক্ষণ জানে। রোগা হবার কোনো যগই তারা রাখেনি।

থাকা করা সম্বন্ধে কৃষ্ণন কোন ভরসার কথা শোনাতে রল না। জায়গাটা সহর থেকে দূরে। কাছাকাছি য়ানো বসতি নেই। দু একটা ধর্মি আছে, সেখানে বাড়ি লা অসম্ভব। মিললেও মোটা অঙ্কের বাংলা আমার কথা লে এমন একটি প্রাণীও পাওয়া যাবে না। লক্ষ্মী সেখানে দিনও টিকতে পারবে না। বাঙালী পল্লী অনেক দূর, শচিকটায় বাসা পাওয়া যায়। কিন্তু আসতে যেতেই দিন যাবার। কাজ এগোবে না। মালিকরাও তাতে রাজি বে না। তার চেয়ে একটানা খেটে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সব কাজ শেষ করে ফিরে আসার চেষ্টাই ঠিক হবে।

"কতদিন লাগবে ?" জিজ্ঞেস করল লক্ষ্মী।

—তা, পাঁচ-ছ মাস তো বটেই।

দেখতে দেখতে প্রায় ছমাস হতে চলল। এর মধ্যে আর আসবার ফুরসত হয়নি। মাঝে মাঝে চিঠি আসে, খুব সংক্ষিপ্ত চিঠি, আর মাসের গোড়ার দিকে একটা করে মণি-অর্ডার। তার কূপনে দু এক লাইন লেখা—ভয়ানক ব্যস্ত। সাবধানে থেকো।

একদিন একটা মোটা খাম দেখে আশ্চর্য হল লক্ষ্মী। খুশীও যে হল খুব, সে কথা বলবার অবকাশ রাখেনা, কিন্তু সেই সঙ্গে কিছুটা চিন্তিত। এতো বড় চিঠিতো কখনো আসেনা। কী জানি কী আছে এর মধ্যে। খুলে, একবার চোখ বুলিয়ে আশ্বস্ত হল—না, আশঙ্কার কোন কারণ নেই।

একখণ্ড সেকথার পর লিখেছে কৃষ্ণন—জান, লক্ষ্মী, এখানে এসে এই দেয়ালের গায়ে ছবি আঁকতে আঁকতে আমার নিজের যে লাইন, যেছন্দি, তার সম্বন্ধে অনেকখানি চোখ খুলে গেল। এখানে আমাকে অজন্তা ইলোরার কিছু ডিজাইন, তাছাড়া কোনারক এবং দক্ষিণের আরো কয়েকটা মন্দিরে যে-সব ছবি বা মূর্তি আছে, তার অনুকরণে দেয়ালের ছুটো দিক সাজাতে হচ্ছে। ঐ মন্দির আর গুহা গুলো সবই আমার দেখা। কিন্তু এমন খুঁটিয়ে তো দেখিনি। এখন তাই দেখছি আর স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। নরনারীর দেহে যে কত বিস্ময় লুকিয়ে আছে, কত সম্পদ কত-লীলা, কত মহিমা, এই সব হাজার হাজার বছর আগেকার নামহীন মহান শিল্পীরা শুধু আবিষ্কার করেন নি, তা আশ্চর্য নৈপুণ্য দিয়ে প্রকাশ করে গেছেন বিশাল বিশাল মন্দিরের গায়, তোরণে স্তম্ভে দুর্গম পাহাড়ের অন্ধকার গুহায়।

এই নারী মূর্তিগুলো দেখে এবং রূপ দিতে গিয়ে বারবার আমার তোমার কথা মনে পড়েছে। মনে পড়েছে বললে ঠিক বলা হলনা, তোমাকেই আমি দেখতে পাচ্ছি এদের মধ্যে। তোমার ঐ অনবদ্য দেহ, তার সুষম বিন্যাস, তার ঐশ্বর্য। কী ভুলই করেছি আমার সেই রাধারানীর ছবিটাকে শেষ না করে! তুমি বারবার করে বলেছিলে, আমি শুনলাম না। কী যে ভূত চেপেছিল মাথায়।

অবিশ্যি তখন যে আশঙ্কা আমার মনে হয়েছিল, সেটা মিথ্যা নয়। তোমাকে জানিয়ে ছিলাম। মনে আছে ?

আজ সে তাগিদ কাটিয়ে উঠেছি মনে হচ্ছে। মন স্থির হয়েছে তখন। দেহে মনে দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। সে উত্তেজনা অনেকটা ঘুচিয়ে গেছে। এবার তোমাকে আবার সেই আগেকার চোখ দিয়ে দেখতে পারবো। আর্টিস্টের নিরপেক্ষ দৃষ্টি, যার মধ্যে লোভ বা কামনার আবিলতা নেই।"

শেষ শিরের এই লাইন কটা পড়েই লক্ষ্মীর বুকের ভিতরটা খচ করে উঠল। সে কি তাহলে এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেল? এই দেহ, যার এত প্রশস্তি শুনে আসছে স্বামীর মুখে সে আর তার চোখে মোহ-সঞ্চার করবে না? আকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বালাবে না তার মনে?

চিন্তাটা মনে উদিত হল কিন্তু বিস্তৃত হবার সময় পেল না। তার আগেই লক্ষ্মী তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ফিরে গেল চিঠির পাতায়।

"কদিন ধরে একখানা নতুন ছবি ঘুরছে মাথার মধ্যে। তোমাকে একবার বলেছিলাম, হয়তো মনে আছে। তখন সবে আমার রাধারানীর 'চিকুর রাশি' শেষ হয়েছে। কথায় কথায় শুধু একটু আভাস দিয়েছিলাম, আর যে কবিতাটি আশ্রয় করে ছবিটা গড়ে উঠবে, সেটা একবার তোমাকে পড়তে বলেছিলাম। কাল রাত্রে আবার অনেকক্ষণ ধরে পড়লাম সেই লাইনগুলো। এবারে বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী'—'অজ্ঞাত নীরবতীরে রমণী যেদিন নামিলা স্নানের তরে।' যে কোনো একজন রমণী নয়, কোনো বিশেষ দেশের বা কালেরও নয়, 'রমণী' বলতে যে রূপটি ফুটে ওঠে তোমার মনের পাতায়, তারই প্রতিকৃতি। The universal Woman—বিশ্ব রমণী। নারীর যে বিশ্বজনীন চিরন্তন রূপ।...সে কথা থাক। এবার চল আমরা ছবিটা দেখে নিই।

সরসী নীরে নামবার আগে রমণী একটি একটি করে খুলে নিল তার বেশবাস। 'সুনীল বসন' পড়ে রইল শিলাতলে, পড়ে রইল মেখলা, নূপুর কনক কঙ্কণ, স্বর্ণ পাত্রে চন্দন-কুঙ্কুম। 'বক্ষের নিচোল বাস' 'ভালে স্বর্ণ ছেড়ে কঠিন 'পাষাণে পড়াশড়ি' যেতে লাগল।

তারপর 'স্নান লীলা'। কী অপরূপ বর্ণনা! আপাতত তাঁর লোভ মাদের ছাড়তে হবে। স্নান শেষে 'সোপানে সকল চরণ চিহ্ন রেখে যখন তীরে এসে দাঁড়াল তখন সে বিবসনা। তার 'চাহিবার' ঘিরে আছে শুধু 'নিবিড় বাতাস আর অনন্ত অবকাশ।' এইখান থেকে তাকে আমাদের প্রয়োজন। সে নির্বৃত নিটোল চিত্রটি কবি আমাদের জন্যে এঁকে রেখে গেছেন। সামান্য কয়েকটি কলমের আঁচড়, কিন্তু তার কাছে হার মানবে শ্রেষ্ঠ চিত্র-করের তুলি।

তীরে উঠিলা রূপসী।
স্নিগ্ধ কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।

তার 'অঙ্গে অঙ্গে' যৌবনের যে 'উজল তরঙ্গ' 'লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে' বন্দী হয়ে আছে, (কথা গুলো সব কবির)—

তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র—ললাটে অধরে
উরু-পরে কটিতটে স্তনাগ্র চূড়ায়
বাহুযুগে—সিক্ত দেহে বেথায় বেথায়
ঝলকে ঝলকে।

কবির এই বিজয়িনীকে আমি রূপ দেবো। তোমার প্রতিঅঙ্গ থেকে জন্ম নেবে তার প্রতিঅঙ্গ। তুমি হবে আমার নতুন বিজয়িনী। আমার কি মনে হচ্ছে, জান লক্ষ্মী, তোমার কানে কানে বলে রাখি, এই ছবি যেদিন শেষ হবে, লোকে দেখবে, শিল্প-সভায় আমিও সেদিন বিজয়ীর আসন দখল করবো।

কয়েক দিনের মধ্যেই আমি আসছি।

চিঠিখানা শেষ করে লক্ষ্মীর সারাদেহে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ খেলে গেল। উঠে গিয়ে দাঁড়াল ড্রেসিং টেবিলের দীর্ঘ আয়নির সামনে। নিজের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল, অনেকক্ষণ ধরে দেখল। তারপর ধপ করে বসে পড়ল সামনেকার ছোট টুলটার উপর। তার সারা চোখ মুখ তখন ভয় আর হতাশার কালো ছায়ায় ভরে গেছে।

কুড়ি এসে পড়ল দিন দশ বারোর মধ্যেই। আসে থেকে খবর দেয়নি। হঠাৎ গিয়ে চমকে দেবে, এইছিল মতলব। মাথার ভিতরটা তখনো ছেয়ে আছে 'বিজয়িনী'। ট্রেনে বসে সারা পথ মনে মনে ছবি আঁকতে আঁকতে

আসছে। লক্ষ্মীর একখানা পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে কল্পনার তুলির মুখে। রাধার বেলায় তাকে পুরোপুরি পারেনি। এবার পারে। তার সমস্ত অবয়বটি মনোমত রং ও রেখায় বন্ধনে ধরে রাখবে। বৈষ্ণব কবি তাকে সে সুযোগ দেননি, রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন।

ছ-সাত মাস আগে যে স্ত্রীকে সে রেখে গিয়েছিল, বিশেষ করে সেই দিনটিতে, যখন তার ডাক শুনে তাড়াতাড়ি আন সেরে শাড়িখানা কোনো রকমে গায়ে জড়িয়ে লক্ষ্মী এসে দাঁড়িয়ে ছিল শোবার ঘরে খাটের পাশে, তাকেই সারাক্ষণ ভাবতে ভাবতে আসছিল। বিয়ের পরে আরো কত সুন্দর হয়েছে লক্ষ্মী। যেখানে যেটুকু পরিণতি এবং পূর্ণতার অভাব ছিল, এতদিনে সব ভরে উঠেছে, একটি নিটোল, সুষম রূপ নিয়েছে।

বাড়ির বাইরে থেকে তার ডাক শুনে চমকে উঠল লক্ষ্মী। সেই গম্ভীর ভরাট গলা। তার বুকে উপচে পড়ল আবেগ। কতকাল শোনেনি। শুয়ে ছিল। ধড়মড় করে উঠে বসল। কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে শোবার ঘরের জোড়া দরজা খুলে বেরিয়ে এল। দেখনহাসি তার আগেই ছুটে গিয়ে সদরটা খুলে দিয়েছিল। তারপরেই গাড়ি থেকে জিনিস পত্র নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কৃষ্ণন 'লক্ষ্মী' বলে আর একটা হাঁক দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে শোবার ঘরের সামনে গিয়েই থমকে দাঁড়াল—এ কে!

প্রথমটা হঠাৎ চিনতে পারেনি। মনে হয়েছিল, পাড়ার কোনো স্ত্রীলোক, লক্ষ্মীর কাছে বেড়াতে এসেছে। সে এখনই এসে পড়বে। তারপর একটু ঠাহর করেই বুঝল, না, এই লক্ষ্মী। ভারী দেহটাকে কোনো রকমে ঘরে এনে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সর্বাঙ্গে গর্ভিনী নারীর বিকৃতি। বোধহয় আসন্ন প্রসবা। রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখ, কোটরে ঢোকা চোখ।

এক পলক তাকিয়েই কৃষ্ণনের মুখখানা অকস্মাৎ আশা ভঙ্গের বেদনা ও ব্যর্থতার ক্ষোভে ম্লান হয়ে গেল। একটি কথাও বলল না। একবার জানতেও চাইল না কেমন আছ। এগিয়েও এল না, ওখান থেকেই ফিরে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

লক্ষ্মী পিছন থেকে ডাকল, শোনো। নিজের কানেই বড় ক্ষীণ শোনাল সে স্বর। কৃষ্ণন ফিরল না। হয়তো শুনতে পেলনা। পর মুহূর্তেই তীব্র অভিমানে চোখ দুটি জলে ভরে গেল। ঘরে ফিরে এসে লুটিয়ে পড়ল খাটের উপর।

তার সে রূপের লেশ নেই, দেখতে বিশ্রী হয়ে গেছে, তাই মুখ ফিরিয়ে চলে গেল স্বামী! সে যে মা হতে চলেছে, তারই সন্তানের মা, সে কথাটা একবার ওর মনে এল না। তার দেহটাই সব? তার যেন সে আর কিছু নয়? আর কোনো দাম নেই তার? সে যে ওর স্ত্রী। তার কোনো স্থান নেই ওর কাছে। তার পেটে যে এসেছে তার কোনো মর্যাদা নেই।

লক্ষ্মীর হঠাৎ মনে হল, জীবনে অনেক লাঞ্ছনা তাকে সইতে হয়েছে, কিন্তু আজকের মত এতবড় অপমান তাকে কেউ করেনি। শুধু তার অপমান নয়, তার আসন্ন মাতৃত্বের অসম্মান।

চোখের জল তার শুকিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে এল আগুনের ফলক। উঠে বসে চেঁচিয়ে ডাকল পল্টু।

দেখনহাসির আসল নাম। একদিন এমনিই জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছিল লক্ষ্মী। কিন্তু কোনো দিন ব্যবহারে ডাকেনি, স্বামীর দেওয়া নামটাই নিজের করে নিয়েছে। আজ ইচ্ছা করেই সেটা মুখে আনল না।

দেখনহাসি তখন উপর থেকে টাকা এনে ট্যাক্সিওয়ালার পাওনা মেটাতে যাচ্ছিল। মনিব আয়ার ডাক শুনে চমকে উঠল। এখানে এসে অবধি ঐ দুটি অক্ষর তো সে কারো মুখেই শোনেনি। ওটা যে তারই নাম, বাপ মায়ের দেওয়া, প্রায় ভুলতে বসেছিল। আবেকবার শুনতেই ছুটে গেল, "বৌদিমনি!"

—একটা ট্যাক্সি ডেকে আনো।

—ট্যাক্সি! কার জন্যে?

—আমি যাবো।

—আপনি যাবেন! কোথায় যাবেন এই দুপুর বেলা?

—সে কৈফিয়ৎ কি তোমাকে দিতে হবে?

—না, মানে, সায়েব এই মাত্তর এলেন আর আপনার শরীরটাও—

—তোমাকে যা বলছি তাই করো।

'বৌদিমনির' এই মূর্তি সে কখনো দেখেনি। অত্যন্ত কোমল শান্ত স্নেহভরা দুটি চোখ। মিষ্টি মোলায়েম ব্যবহার। রূঢ় কথা দূরে থাক, একটা ছোট মন্দ শব্দও সে কোনোদিন শোনেনি তার মুখে। ভয়ে ভয়ে বলল, এই যাচ্ছি। ও, ট্যাক্সি এখানেই একটা আছে।

—দাঁড়াতে বল।

পাশের একটা কোন ঘরে বাকস-পেটরার ভিতর থেকে খুঁজে পেতে একটি বিবর্ণ টিনের সুটকেস্ বের করে নিয়ে এল। তার কুমারী জীবনের একমাত্র সম্পত্তি। খুলে দেখল, খান দুই জামা কাপড় পড়ে আছে তার মধ্যে, তার নীচে একটা খামে সামান্য কিছু টাকা—ঐ সময়ের রোজগার, বের করতে ভুলে গেছে। তুলে নিয়ে ব্লাউজের ভিতর রাখল। দেখনহাসিকে বলল, এই সুটকেসটা গাড়িতে তুলে দাও।

এক ঘরে বেরিয়ে এল। এখানকার সব ঐশ্বর্য পড়ে রইল পিছনে।

লক্ষ্মী গাড়িতে উঠবার পর বাক্সটা পাশের কাছে রেখে দেখনহাসি বলল, আমি সামনে উঠি?

—না।

তবু দাঁড়িয়ে রইল দেখনহাসি। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিতেই চোখ দুটো তার ছলছল করে উঠল। তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে ছুটতে ছুটতে উঠে গেল উপরে। কৃষ্ণন তখন স্নানের ঘরে। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে হাতের তালু দিয়ে দরজায় আঘাত করল।

"কে?" ভিতর থেকে সাড়া দিল কৃষ্ণন।

—আমি, সায়েব।

—কী চাই?

—একটু জলদি বেরিয়ে আসুন।

—কেন, কী হয়েছে?···বলতে বলতে ভিজে গায়ে তোয়ালে পরা অবস্থাতেই দরজাটা খুলে সামনে এসে দাঁড়াল। দেখনহাসি তখনো মুখে বলল, বৌদিমনি ট্যাক্সি করে চলে গেলেন।

—ট্যাক্সি করে চলে গেলেন কোথায়?

—কিছু বললেন না।

—কখন গেল?

—এই তো এই মাত্তর। ট্যাক্সিও ছেড়ে দিল, আমিও ছুটে ওপরে উঠে এলাম।

—বলিস কী!

কৃষ্ণনের বাকী স্নানটা আর সারা হল না। মাথা মুছে আপনার কোলাপুরী পা-জামাটা টেনে নিয়ে পরতে পরতে বেরিয়ে এল।

কোথায় যেতে পারে লক্ষ্মী, সে সম্বন্ধে একটি জায়গার কথাই কৃষ্ণনের মনে হয়েছিল। জয়ার বাড়ি। বেশী দূরে নয়, হেঁটেই যাওয়া যায়। তবু একটা গাড়ি নিল। ঠিকানাটা জানা ছিল, কখনো যায় নি। একটু ঘুরতে হল। গেটের সামনে নেমে ট্যাক্সিটা ছাড়ল না। একবার মনে হল, যদি মোহিত থাকে? সে সম্ভাবনা অবশ্য খুবই কম। এখন আফিসের সময়। তবু যদি থাকে, জয়াকে বিব্রত করবে না। খবরটা নিয়েই চলে যাবে।

কয়েকবার বেল-এর সুইচ টিপবার পর একটি ঝি এল ঘুম চোখে। দরজা খুলে অপ্রসন্ন মুখে বলল, বাবু বাড়ি নেই। মা ঘুমুচ্ছে।

কৃষ্ণন জানতে চাইল, কিছুক্ষণ আগে একটি মহিলা গাড়ি করে এসেছেন কিনা। সে জানাল, না, কেউ আসে নি। কৃষ্ণন যখন ভাবছে, তাহলে আর জয়াকে বিরক্ত করে কী হবে, এবং ঝিও যখন দরজাটা বন্ধ করবার আয়োজন করছে, ভিতর থেকে জয়ার গলা শোনা গেল, কে রে ঝিন্নী?

—একজন বাবু।

—কাকে চায়? নাম কি জিজ্ঞেস কর।

ঝি জিজ্ঞেস করবার আগেই কৃষ্ণন নিজে থেকে বলল, কৃষ্ণন।

—ও, আপনি! লক্ষ্মী দিদিমনির—

—হ্যাঁ। লক্ষ্মী এখানে আসে নি?

—দিন পাঁচ ছয় আগে একবার এসেছিল। তারপর তো আর আসে নি।

জয়া তৎক্ষণে উঠে পড়েছে। বেরিয়ে এসে কৃষ্ণনকে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হল. এ কী! তুমি তবে এসে? ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? লক্ষ্মীর খবর কী?

খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল জয়া কিছুক্ষণ পরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কৃষ্ণনের মুখের দিকে চেয়ে বলল. ব্যাপারটা কী, বল তিকিনি? হঠাৎ এমন কী ঘটল, যার জন্যে—

কৃষ্ণন বলল, আমি এই কিছুক্ষণ হল এসে পৌঁছেছি। তারপর একটা কথাও হয় নি। তবে—থাক, সে কথা আপনাকে পরে বলবো।

—বেশ তো, তার জন্যে কোনো তাড়া নেই। এখন একমাত্র দরকার হচ্ছে ওকে খুঁজে বের করা।

এক মুহূর্তে কি ভেবে নিয়ে জয়া উঠে পড়ল। ভিতরে যেতে যেতে বলল, তুমি বসো. আমি আসছি।

কৃষ্ণন উঠে গিয়ে ট্যাক্সিটা বিদায় করে দিয়ে এল। জয়া ভিতরে গিয়ে সুব্রতর কলেজে ফোন করল। এক ভদ্রলোক জানালেন. সে ক্লাসে আছে। ডেকে দিতে হবে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। জয়া বলল, "ডেকে দেবার দরকার নেই। ক্লাস থেকে বেরোলেই যেন এখানে একটা ফোন করে, দয়া করে এইটুকু জানিয়ে দেবেন"—বলে, নম্বরটা জানিয়ে দিল।

বাইরের ঘরে ফিরে এসে বলল, সুব্রতকে পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবিশ্যি ডাকবে। তার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করবার নেই।

কৃষ্ণন মাথা নত করে বসে ছিল। সেই দিকে চেয়ে বলল, তুমি এত মুষড়ে পড়ছ কেন? লক্ষ্মীকে আমি চিনি। ড্রাইক কিছু করে বসবে, সেরকম মেয়ে সে নয়।···তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, খাওয়া হয় নি। চান করেছ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে দু'খানা লুচি করে দিই। ভাত-টাত করতে গেলে দেরি হবে।

—না, দিদি, ওসব কিছুই আপনাকে করতে হবে না। আমার একেবারে খিদে নেই।

—না খেয়ে থেকে কী লাভ ভাই? দু'গ্রাস কিছু মুখে দিয়ে নাও।

ওখান থেকেই ডাকল দিদী। সে বোধহয় এই ফাঁকে জয়া অনমনস্ক মিনিটটুকু পেয়ে নিচ্ছিল। সাড়া দিল না। জয়াকে গলা চড়াতে হল। এবার এল ছুটতে ছুটতে। তাকে কয়েকখানা লুচি আর একটা সাদা তরকারী করবার নির্দেশ দিয়ে জয়া আবার কৃষ্ণনের দিকে ফিরল—"তুমি যে শীগগিরই আসছ, লক্ষ্মী আমাকে জানিয়েছিল। সেইজন্যে এ দিকের খবর কিছু তোমাকে লিখিনি। আগের দিকে জানিয়ে দেবার জন্যে কয়েকবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু লক্ষ্মী কিছুতেই তোমার ঠিকানা দেবে না। ঐ এক কথা না, না, ছিঃ। অতিরিক্ত প্রেম যখন হয়, অনেক মেয়েই অমনি লজ্জায় জড় সড় হয়ে থাকে। তাছাড়া ওর বোধহয় ইচ্ছে ছিল, তোমাকে একটা সারপ্রাইজ্ দেবে। তাই আসে কিছুতেই জানাতে দেয় নি।

—না, দিদি। এখন আমি বুঝতে পারছি, ওর আপত্তির কারণ সবটাই লজ্জা নয়। আর সারপ্রাইজ যদি বা কিছু দেবে থাকে, সেটা সেন্সেশনাল নয়, অন্তত ও তা মনে করে নি। যাই হোক, এটাও আমি আপনাকে পরে বলবো। তার আগে—

টেলিফোন বেজে উঠতেই জয়া বলল, ঐ বোধহয় সুব্রত ডাকছে! বলেই উঠে পড়ল।

সুব্রতই বটে। জয়া জিজ্ঞেস করল, তোমার আর ক্লাস আছে?

—আছে একটা।

—বাস যাও। দিয়ে এখনি বেরিয়ে পড়।

—কী ব্যাপার বলুন তো?···সুব্রতর কণ্ঠে উদ্বেগ ফুটে উঠল।

—না, সেরকম কিছু নয়। তাহলেও তোমার তাড়াতাড়ি আসা দরকার। আর, তোমার সেই ছাত্রটি, যার বাবা ফোম ইউনিয়নের পাণ্ডা, কী নাম যেন?

—সুধীশ?

—হ্যাঁ, সেই সুধীশের ভাইকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। দরকার আছে।

॥ ভেরো ॥

গিরিনাথের সেই বরাবরের বাচ্চা কি, টুলি আর একটু সেয়ানা

(২৩৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

নারী ছলনাময়ী

শিবরাম চক্রবর্তী

ইঁদুর-অর্চনার রেওয়াজ এদেশে নেই, কিন্তু সিদ্ধিদাতার বাহন শ্রীমান মূষিকও কিছু কম সিদ্ধিপ্রদ নন— উৎস-র এই কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারব।

এমনকি, অতঃপর ইঁদুরকে নিয়ে একেবারে বারোয়ারী সার্বজনীনের চল না হলেও ছোট-খাট ঘরোয়া উৎসব বেশ জমতে পারে, আশা করব অবশ্যই।

পর্বতের মূষিক প্রসব বলা ঠিক না গেলেও মূষিকের পর্বত প্রসব হয়ত বা বলা যায়। পর্বত না হলেও পার্বতী তো বটেই!

সেদিন সকাল আটটার সময় চোখ মেলেই উৎস দেখতে পেল তার ঘরের জানালার গা ঘেঁষে রঙীন শাড়ি ঝুলছে একখানা। তার ওপরকার ফ্ল্যাটে ভাড়াটে এলো তাহলে! এতদিনে!

রঙীন শাড়িটা তার মনেও একটু রঙ ধরালো বুঝি!

উপরে নীচে পাশাপাশি অনেকগুলো ফ্ল্যাট নিয়ে তাদের পাঁচতলা বাড়িটা। একতলার ফ্ল্যাট, দু'ঘরো, আর তিনঘরো ফ্ল্যাট সব। প্রত্যেক ফ্ল্যাটের সঙ্গে সংযুক্ত রান্নাঘর, স্নানের ঘর ও সব কিছু। টেলিফোনও আছে প্রত্যেক তলাতেই। তার নিজেরটায় দু'টি শয়নকক্ষ। আর উপরেরটাও দু'ঘরা ফ্ল্যাট—উৎস এখানে এসে আগেই ওটা দেখেছিল, তার পরে দু'টোর ভেতরে পছন্দ করে এই নীচেরটাকেই সে বেছে নিয়েছে।

নিয়েছিল যে তার ভাগ্যি! নইলে, উপরের ফ্ল্যাট হলে এই শাড়িবাহিনীর আবির্ভাব তার অলক্ষ্যেই থেকে যেত হয়ত। তারপরে, যাঁর শাড়ি তাঁর সঙ্গেও তার দেখা হয়েছে মুখোমুখি—সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে একাধিকবার। মেয়েটি তরুণী সুশ্রী আর অবিবাহিত—দেখেছে সে।

সেগে তার মনে হয়েছে যে, উপরের ঘর ভাড়া নেবার এমন কী দরকার ছিল মেয়েটির! তার পাশের ফ্ল্যাটটাই ত খালি পড়ে আছে, আর, যে কালে প্রত্যেক ফ্ল্যাটই সতন্ত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ আর প্রত্যেক তলাতেই টেলিফোন।

আর। একই ভাড়া যখন সব ফ্ল্যাটের, তখন পাশাপাশি বাস না করে উপরে গিয়ে থাকার কোনোমানে হয়?

সিঁড়ি ধরে ওঠা নামার অবসরে গায়পড়া আলাপও যে এক আধটু পড়ায়নি তা নয়। উৎস জেনেছে যে মেয়েটি কোন ইস্কুলের শিক্ষিকা, একলাই থাকে। আর নাম তার পার্বতী। আর সেই সূত্রে মেয়েটিকেও সে জানিয়ে দিয়েছে যে সে হচ্ছে উৎস, এক কলেজে

প্রফেসারি করে সম্প্রতি ভাইরেক্টের পদটির দিকে লেখার উৎসাহই।

এর বেশি এগোয়নি আর। তবে নীচের ঘরে নিজের বিছানায় শুয়ে বা ডেকচেয়ারে বসে বসেই সে উপরের খবর সব রাখতে পারে। কখন মেয়েটি বেরয়, কখন ফিরে আসে, কখন তার স্টোভ ধরায় আবার কখনই বা সে বাথরুমে যায়—নীচে বসেই সব টের পায় উৎস।

আর, সেই আন্দাজে যথাসময়ে সে সিঁড়িটার মাথায় গিয়ে দাঁড়ায়। দেখতে পায় নেমে আসছে মেয়েটি—কিন্তু তার কুশল জিজ্ঞাসা আর মেয়েটির মিষ্টি হাসির বেশি আর এগোয় না কিছু। নিজের কাজে বেরিয়ে যায় মেয়েটি।

এইরকমই চলেছে, অকস্মাৎ একদিন ধারাটা যেন পালটে গেল কেমন করে।

উৎস বেড়াতে বেরিয়েছে, কিন্তু সিঁড়ির সম্মুখে পৌঁছতে না, পৌঁছতেই ত্বর ত্বর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো মেয়েটি ভীত চকিত বন্যহরিণীর মতই।

'উৎস বাবু! বেরুচ্ছেন নাকি আপনি?' জিজ্ঞেস করেছে সে। 'বেরুচ্ছিলাম, তবে দূরে কোথাও নয়, এই ডাকবাক্সে একটা চিঠি ফেলতেই যাচ্ছিলাম'। দাঁড়িয়ে গেল সে।

'আমার ঘরে একটা ইঁদুর!' জানালো পার্বতী। 'আমি ছুটে পালিয়ে এসেছি।' উৎসর হাতে যে কোনো চিঠি-পত্র ছিল না তা সে লক্ষ্য করেনি।

'চলুন তো দেখি।' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে উৎস শুধোয়—'নেংটি ইঁদুর? না, বাড়ী একটা?'

খুব বাড়ীও নয়, নেহাৎ নেংটিও না, তার মাঝামাঝি ···কিন্তু ভয়ঙ্কর!'

'তা, ইঁদুর একটু ভয়ঙ্কর বই কি!' উৎস আর দেয় তার কথায়? কামড়ে দিলেই ত র‍্যাবীজ্‌ভার। তার কোনো চিকিচ্ছে আছে কিনা আমার জানা নেই।'

'কী সর্বনাশ!' বলে মেয়েটি নিজের ঘরের দরজা খোলে। তারপর তড়াক করে এক লাফে একটা চেয়ারের ওপরে গিয়ে দাঁড়ায়—'ওই! ওই যে!' ভয়-বিহ্বল চোখে সে তাকিয়ে থাকে।

'ওটাকে ধরতে না পারলে তো রাত্তিরে আমি ভয়ে ঘুমুতেই পারব না।' সে বলে, 'পারবেন তো পাকড়াতে?'

'চেষ্টা করে দেখা যাক।' উৎসাহিত হয়ে এগুলো উৎস। 'যদিও আমার প্র্যাকটিশ করা নেই। ধরতে গেলে এটা বেড়ালদেরই কাজ তো।'

একটু তাড়া পেতেই ইঁদুরটা উধাও হয়েছে। চকিতের মধ্যে চোখের উপরেই যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। আনাচে-কানাচে কোথাও আর তার পাত্তা নেই।

'যাক্ পালিয়ে গেছে ইঁদুরটা। এতক্ষণে তিনটে বাড়ি ছাড়িয়ে গেছে আমার বিশ্বাস। এ তল্লাটেই নেইকো আর। যা তাড়া লাগালুম ওকে!' বলতে গেছে উৎস; বাধা পেয়েছে মেয়েটির কাছ থেকে: 'পালাবে কোথায়! ওই তো, পাপোষের পাশটিতে ধাপটি মেরে বসে আছে।'

'তাইত! পাপোষের আড়ালেই আত্মরক্ষা করছে বটে।'

'যাক্, এইবার ওকে ঘেরাও করতে পারব। ডাণ্ডা-টাণ্ডা কিছু দিন ত আমার।' উৎস বলল, 'ঠাণ্ডা করে দিই ওকে।'

তাড়া খেলেই ইঁদুররা নিজেদের গর্তে গিয়ে সেঁধোয়, তার এতকালের বদ্ধমূল ধারণা যেন টলিয়ে দিল ইঁদুরটা। পাপোষের সঙ্গে আপোষ করে উৎসর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হল সে।

'না না না!' আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটি: 'মারবেন না বেচারীকে। ঐ ঝাড়নটা দিয়ে তাকে ধরে বাইরে নিয়ে গিয়ে দূরে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসুন বরং। পাকড়াতে পারবেন না ঝাড়ন দিয়ে?'

ঝাড়নটার বর্ণবৈচিত্র্যে ইঁদুরটা সম্মোহিত হয়েছিল মনে হয়। সহজেই উৎসর হাতে ধরা দিল সে।

ইঁদুরটা ধরা পড়বার পর চেয়ার থেকে নামল পার্বতী। 'আপনি আমায় বাচালেন উৎসবাবু।' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল সে।

কুণ্ডলী পাকানো ইঁদুরের পুঁটুলিটা হাতে নিয়ে রাস্তা পেরিয়ে ওধারের পার্কে ছেড়ে দিয়ে এল উৎস।

•বাড়নটা নিয়ে ফিরে আসতে দেখল, পার্বতী দেবী তাদের দু'জনের জন্যে দু'পেয়ালা কফি আর বিস্কুটের বাক্স বার করেছে।

কিন্তু ঐ কফির পেয়ালা পর্যন্তই। তার বেশী আর এগুতে পারেনি উৎস।

কতোবার ভেবেছে যে সে শুধোয়—বিকেল বেলায় ঘরে বসে বসে করেন কি! চলুন না কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি। কিম্বা, সামনের পার্কটায় গিয়ে আসুন একটু হাওয়া খাওয়া যাক। সিনেমায় যাওয়ার কথাও তার মনে হয়েছে, কিন্তু কোথায় যেন আটকায়। মেয়েটার মধ্যেই, না, তার নিজের মনেই কোথায় যেন বাধা রয়েছে। কেমন বাধ বাধ ঠ্যাকে।

তার মনে হতে থাকে যে নিজের সুবর্ণ সুযোগটা সে ফস্‌কে যেতে দিয়েছে। তার জমাবার সেই মাহেন্দ্রক্ষণ সে হারিয়েছে কখন যে।

অনেকবার তার মনে হয়েছে সেই ইঁদুরটা ফিরে এসে যদি তার ভ্রষ্ট লগ্ন আবার তাকে ফিরিয়ে দেয়? দ্বিতীয়বার কফিপানের অবকাশে কফির পেয়ালায় তুফান তুলবার সুযোগ আর কি হবে তার? ভাবতে ভাবতে কত রাত্তে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

অবশেষে এক সুপ্রভাতে ঘুম থেকে উঠতেই তার মাথায় একটা আইডিয়া খেলল।

সটান সে চলে গেল নিউ মার্কেটে। পোষ্য পশু-পক্ষীর এলাকাটায়।

'একটা ইঁদুর চাই আমার।' পকেটস্থ এক বুড়ো দোকানীর কাছে গিয়ে বলল।

'একটা ইঁদুর? নিশ্চয়। এই যে, দেখুন না কি চমৎকার ইঁদুর সব। দেখছেন?'

খাঁচা ভর্তি সুশ্রী সাদা রোমশ বহু ইঁদুর—দেখলে চোখ জুড়োয়, সত্যি। মনে হয় যেন খরগোসের বাচ্চারা।

'না, না। এ ইঁদুর নয়। এরা তো বিলিতি ইঁদুর। আমি চাচ্ছি আমাদের দেশী বাঙালী ইঁদুর। আমাদের ঘরে বাইরে যাদের দেখতে পাই—সেই রকম ধরোয়া ছিনিস।'

'আজ্ঞে, সে আমাদের কাছে আপনি পাবেন না। রাখিনে আমরা।' অবজ্ঞায় নাক কুঁচকে বলল দোকানদার; 'কেউ আবার চায় নাকি সে সব ইঁদুর! বাড়িতে দেখতে পেলে মেরে তাড়ায়।'

'তাই একটা আমার চাই যে।' জানাল উৎস: 'ভয়ঙ্কর দরকার ছিল। যা দাম লাগে দেব।'

'দিয়ে যান দাম। চেষ্টা করে দেখব। আশপাশের বাড়ির বাচ্চা চাকরদের বলে-কয়ে যদি যোগাড় করতে পারি একটা।'

উৎস তক্ষুণি তার হাতে দশটাকার একখানা নোট ধরে দিল।

'আপনার ঠিকানাটা দিয়ে যান বাবু!' বলল দোকানীটা: 'আপনার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব ইঁদুর।'

দিন কয়েক বাদেই পৌঁছল এসে ইঁদুরটা।

তারপর পার্বতীর কক্ষে ইঁদুরটার অনুপ্রবেশের অপেক্ষায় মুহূর্ত গুনতে লাগল উৎস—নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে কান খাড়া করে।

যখন তার বাথরুমে যাবার আওয়াজ এল তার কানে, স্নানের ঘরে কল খোলার শব্দ পেল সে—আস্তে আস্তে উপরে গিয়ে, ঘরের দরজা একটু খানি ফাঁক করে, ইঁদুরকে ঢুকিয়ে দিয়েই না, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চুপ চাপ ফিরে চলে এল উৎস নীচে। নিজের ঘরে বসে পার্বতীর চীৎকারের প্রতীক্ষায় রইল নিঃশব্দে।

একটু পরেই, সেই আগের দিনটির মতই, চুপচাপ পায়ের আওয়াজ তীব্রবেগে নেমে এল তার দরজায়। দুয়ার ঠেলে তার ঘরে সন্ত্রস্তা পার্বতীর আবির্ভাব ঘটল।

'উৎস বাবু! আসুন আসুন! চট করে একবারটি আসুন ওপরে।' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে—'আমার ঘরে

আবার একটা ইঁদুর! সেই ইঁদুরটাই ফিরে এল কিনা কে জানে!'

'তাই নাকি? কী সর্বনাশ!' উৎসবমুখ উন্মুক্ত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে উৎসর পা-ও চঞ্চল হয়ে উঠল।

উঠল গিয়ে একেবারে পার্বতীর ঘরে।

'কোথায় সে হতভাগা? দেখিয়ে দিন।'

'ঐ যে— ঐ টিপয়ের তলায়।'

দেখেই চিনতে পারল উৎস। তারই সদ্য আমদানি কৃত সেই নেংটি।

পূর্ব পরিচয়ের জন্যই কিনা কে জানে, ইঁদুরটা উৎসকে দেখে ভয়ে যেন শিটিয়ে গেল। সহজেই ধরা দিল তার হাতে।

বিজয় গর্বে কলরবলিত করে যেই না উৎস উঠে দাঁড়িয়েছে, অমনি অপর কোণ থেকে আরেকটা ধেড়ে ইঁদুর তেড়ে এল টিপয়ের দিকটায়।

'ও বাবা! এ আবার কে! আরেকটা ইঁদুর দেখছি যে!' লাফিয়ে উঠেছে উৎস। পার্বতীও তৎক্ষণাৎ নিজের বিছানায় গিয়ে উঠেছে—'কী হবে উৎস বাবু! এটা যে আরো সর্বনেশে চেহারার।'

'একটা কেঁদো ইঁদুর!' উৎস বলল, 'গেরস্থ বাড়ি সচরাচর তো দেখা যায় না এমনটা। সরকারী গুদামের চালমারা ইঁদুর মনে হচ্ছে—খেয়ে খেয়ে বেশ নাদুস নুদুস হয়েছে।'

কেঁদো ইঁদুরটাকে ধরতে রীতিমত বেগ পেতে হল উৎসকে। তারপর কেঁদো আর কাঁদো কাঁদো দুটোকেই পাকড়ে কাড়নে জড়িয়ে ছেড়ে দিয়ে এলো সেই পার্কটায়।

কাড়নটা ফিরিয়ে দিতে এসে আবার দেখল টিপয়ের ওপরে কফির পেয়ালা সাজানো—সেই আগের বারের মতই।

এবারকার সুযোগ সে আর হাত ছাড়া করল না।

কফি পানের ফাঁকে ফাঁকে পাড়ল কথাটা—'আপনার ঘরে যেমন ইঁদুরের উপদ্রব, তাতে দেখছি, ইঁদুর তাড়াবার জন্যই একটা লোক না রাখতে হয় আপনাকে।'

'ভাবছি তাই।' কিছু না ভেবেই জবাব দিয়েছে পার্বতী।

'যদি রাখেনই কোনো লোক,' বলল উৎস, 'তাহলে আমার আবেদনটা করে রাখছি সবার আগে এই সুযোগে। আমাকেই রাখতে পারেন।'

পার্বতী এর কোন উত্তর দিল না, তার সারা মুখ সিঁদুরের মত টকটকে হয়ে নিজের নিরুত্তরটা জানাল।

তারপরে, ইঁদুর-দায় থেকে গোধূলির সিঁদুর-লগ্নে পৌঁছতে আর বিশেষ দেরি হল না উৎসর।

সেদিন উৎস এসে আমন্ত্রণ জানাল আমায়—'আমাদের বিয়ের উৎসবে আসবেন দাদা! রীতিমত প্রেম করে বিয়ে, বুঝলেন? বলে সে পুনশ্চ যোগ করে—'তা প্রেম করেই বলুন বা ইঁদুর ধরে বিয়ে করাই বলুন!'

'প্রেম করা তো ইঁদুর ধরার মতই দুঃসাধ্য ব্যাপার ভাই।' আমি বলি: 'শুনি তো ব্যাপারটা।'

তারপর তার থেকে যা উৎসারিত হল সেই কাহিনীটাই উদ্ধৃত করেছি এখানে।

'কিন্তু আসল কথাটাই আপনাকে বলা হয়নি দাদা!' তার উৎসার শেষ হবার পর সারাংশ সে নিবেদন করে: 'আজ সকালে যখন আপনাকে নেমন্তন্ন করতে বেরুচ্ছি, দেখি যে নিউ মার্কেটের সেই লোকটা ঘুর ঘুর করছে আমাদের বাড়ির সামনে—যার কাছ থেকে ইঁদুরটা আমি কিনেছিলাম।'

'ইঁদুর ধরবার ফিকিরেই ঘুরছিল বুঝি?'

'তা নয়। কী দরকারে এসেছে তাকে শুধাতে, সে একটা চিরকুট আমার হাতে দিয়ে বলল, এই ঠিকানার একটি মেয়ে কয়েকটা ইঁদুর চেয়েছিলেন···।

'সে কি!' কাগজখানা পড়ে দেখি—পার্বতীর নাম ঠিকানা তাতে লেখা।

আমি আরো অবাক হলাম যখন সে বললে, মেয়েটি মাসখানেক আগে একটা ইঁদুর কিনেছিলো তার কাছে, আর দিন কয়েক আগেই নিয়েছে আরেকটা। আরো বলেছে যে হয়তো আরোও কয়েকটার দরকার হতে পারে, তাই আমি তাঁর খোঁজ নিতে এসেছিলাম···।

'না, না ইঁদুরের আর দরকার হবে না', আমি বলে দিলাম তাকে। বলল উৎস: 'ইঁদুর ধরা পড়েছে—দরকার নেই আর ইঁদুরের। ইঁদুর দিয়েই ইঁদুর ধরেছে মেয়েটা।' বলে, মনে হল, উৎস নিজের প্রতিই যেন কটাক্ষপাত করল—'পার্বতীই মূষিক প্রসব করল, না মূষিকটাই পার্বতী প্রসব করল!—এখনও আমি ঠিক ঠাওর করতে পারছি, না দাদা।'

———

সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। তারপর একটু একটু কান্না। সনাতন ভেবেছিল, এ কান্না বেশিক্ষণ নয়। খানিক পরেই হয়ত থামবে। কিন্তু থামা দূর-স্থান; বিকেল নাগাদ সেই কান্না অবিশ্রান্ত রোদনে গিয়ে দাঁড়াল। সনাতন মনে মনে চটছিল আকাশের আক্কেল দেখে। দাওয়ায় বসে বিড়ি টানছিল আর আকাশকে গালাগালি দিচ্ছিল। অবেলায় কান্না কেন বাপ? এই কি কাঁদার সময়! সময়ে যদি কাঁদতে তবু তা'তো ফসল ফলত। তা না, বড়লোকের মেয়ের মতো এখন কাঁদতে লেগেছে। এতে কার উপকার হচ্ছে, শুনি! সনাতনের?

তবু, আকাশ সনাতনের এ-সব প্রশ্নোত্তরীয় অভি-যোগের উত্তর দেয় না। এখন, সনাতনকে বিরক্ত এবং বিব্রত করাই তার কাজ, তাই করতে থাকে। সকাল হাসে আসে; দুই আর থাকে না। অথচ সনাতনকে আজ বেরুতেই হবে। পুরো দুটো সকাল-দুপুর সে বেরুতে পারে নি। এই তিনদিন একটা পয়সাও কামাতে পারে নি সনাতন। চাল ফুরিয়েছে, শুকিয়ে গেছে, কতক ফেলে দিয়েছে; কতক মুড়ি বেচে সনাতনের ঘরের কানাইয়ের মা, তাকে দিয়েছে। কানাইয়ের মা বিধবা, ঘরে কালেভাবে-কাটা ঠাকুরের ছবি আছে। আর, চনমনে রেবেকেট করেছিল একটা। সেটা দিয়েছে তাদের বস্তীর লাগোয়া ঐ বড় বস্তীর মেয়েটিকে। মেয়েটি মাঝে-মধ্যে তার কাছ থেকে চাল নেয়। একটি ছেলে, ফর্সা ছেলের সঙ্গে তার ভাব আছে। সনাতন জানে, যেদিন ওরা দু'জনে বেড়াতে বেরোয় সেদিন মেয়েটি সনাতনের কাছ থেকে দাল কিনে খোপায় গুঁজবে। সব দিন বেরুতে পারে না, তাই সব দিন কেনাও হয় না।

বৃষ্টি ধরল প্রায় সাতটার পরে। বিকেল থেকে যারা সেই একজায়গায় বসে ছিল সনাতন। এক পা নড়ে নি, বসে বসে নি, লঙ্কন জ্বালে নি। শেষ অবধি রাগের-ও আর তেমন জোর ছিল না। ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তবু, রাগ আর বিরক্তি বহুক্ষণ জায়গা ছুড়ে থাকার দরুন ভেতরটা তখনো কিরকম ভার-ভার। গলার কাছে ঢোক গিলসে বাধা। বুকের এ-পাশ থেকে ও পাশ ছুঁচের মতো এক সরু যন্ত্রণা মাঝে-মধ্যে উত্থান নামা-নামি করে বেড়াচ্ছে। মুখের স্বাদ একটুও স্বাভাবিক নয়। যেন অন্য কারো স্বাদ সনাতন মুখে করে নিয়ে বসে

আছে। অনবরত বিড়ি খাওয়ার দরুণ এ-রকম হয়েছে কি না কে জানে!

বৃষ্টি ধরল। কিন্তু ততক্ষণে সনাতনের আলস্য ধরে গেছে। ঠিক আলস্য নয়, একরকম অচল স্থায়িত্বের ভাব। এই স্থায়িত্বে তার কোন দাবী নেই, হয়ত তেমন আগ্রহ-ও নেই। তবু, কার্যকারণ যাই হোক্, এই কিছুক্ষণ ধরে তার সমস্ত চেতনাকে ঘিরে এক স্থায়িত্বের বোধ জন্মেছে। দাওয়ার এই জায়গাটুকু, এই বিষণ্ণ অন্ধকারটুকু, তার কতকগুলো বাঁধাধরা দুঃখ, রাগ হতাশার ভাবনা—সব মিলে তাকে সেই স্থায়িত্বের ভাব দিচ্ছিল। আর সময়! সময় পৃথিবীর আর যেখান থেকেই পালিয়ে বেড়াক না কেন, ঠিক এক্ষুণি সনাতনের চারপাশে ভীষণভাবে আটকে পড়েছিল।

অথচ সাতটা বেজে গেছে। ওঠা তার দরকার, ওঠা উচিতও। দু'দিন একটিও সওদা হয়নি। বেরুতে পারে নি ঘর ছেড়ে। তবু, মনে মনে দুর্বল একটি যুক্তি খাড়া করতে চাইছিল সনাতন। বেরুবে কি না! সাতটা বেজে গেছে, এত পরে বেরিয়ে তার কি লাভ হবে?

'কি সনাতনদা, অন্ধকারে ব'সে ব'সে কী করতেছ?' ওপাশের ঘরের পেয়াদ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল তা'কে। পেয়াদকে আগেই দেখতে পেয়েছিল সনাতন। খানিক আগে অফিস থেকে এসেছে সে। কোনএক অফিসে যেন পিয়নের কাজ করে। সুতরাং স্বাভাবিকেই সে খবরের জাহাজ। এই বস্তীর সব অধিবাসীদের দুনিয়ার যত গোপন খবর সে-ই নিয়মিত যুগিয়ে থাকে।

কথা বলতে সনাতনের ভালো লাগছিল না, তবু কোনরকমে পাশ-কাটানো উত্তর দিল, 'এই ব'সে আছি।'

পেয়াদের এই জবাব তেমন দরকার ছিল না। সনাতনের কথার ভাড়ের ওপরেই বলতে গেলে সে আর একটি প্রশ্নকে চাপিয়ে দিল।

সনাতন নিজেও এ-প্রশ্নের সঠিক জবাব জানত না। জবাব দিতে গেলে অনেকগুলো কথা খরচ করতে হয়। অথচ সনাতনের এত সামর্থ নেই। সে জবাবের জন্যে একবার আকাশের দিকে তাকাল, একবার পেয়াদের অন্ধকার মুখের দিকে। তারপর চুপ ক'রে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করল। খুব সম্ভব, নৈঃশব্দকে বলল তার হয়ে জবাব দিতে।

কিন্তু পেয়াদ বরাবর নৈঃশব্দের জাত-শত্রু। অফিসে কী করে, সনাতন তা জানে না, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় যতক্ষণ ধরে থাকে ততক্ষণ সে অনর্গল বকে চলে। হয় চিৎকার ক'রে ছেলেকে বকে, বউকে বকে; নয় বস্তীর লোকদের ডেকে ডেকে একটানা খবর শোনায়। এই খবরের মধ্যে রাজনীতি, পাড়ার কেচ্ছা, বাজারের চাল-ডাল, তরিতরকারীর খবর, রাইটার্স বিল্ডিং-এ মন্ত্রীদের নাড়ীনক্ষত্র থেকে সিনেমার হালফিল খবর এবং আবহাওয়া সংবাদ পর্যন্ত সবই থাকে। পেয়াদ মানেই খবর।

সনাতন জানত পেয়াদ এক্ষুণি কোন দরকারী খবর শোনাতে চায়। তাই, সে আর ওকে অনর্থক ভাঁস ছাড়াতে না দিয়ে সোজা শাঁসেই পৌঁছে দিতে চাইল।

'আজ শহরের খবরটা কী বল দিকি, ঠাহর করে?'

'আজ বেরুতে পার। শহরের অবস্থা এখন ঠাণ্ডা। তবে খালি পুলিশ সনাতনদা, যত লোক তত পুলিশ। বিহার থেকে এসেছে।'

সনাতন আর ব'সে না থেকে উঠে পড়ে। একবার ঘুরে দেখেই আসা যাক্ পথ-ঘাটের চেহারা। দু'দিন যা তাণ্ডব গেছে! শহরের শরীরে যেন শয়তান ভর করেছিল। অনেকদিন এরকম ক্ষেপাক্ষেপি দেখা অভ্যাস নেই সনাতনের। এক দাঙ্গার সময় দেখেছে আর দেখেছে সেই স্বদেশী আমলে। দাঙ্গাহাঙ্গামা সনাতন মোটে সহ্য করতে পারে না। এখন তো পারেই না। শরীরে রক্তের জোর কমে এসেছে। এখনও পারত না। স্বদেশী করা খুব অপছন্দ করত। ইংরেজরা হ'ল গিয়ে খাঁটি সাহেব। তা'রা মাথার ওপর আছে ব'লে খাওয়া-পরা চলছে, চন্দ্র সূর্য উঠছে। খামখা ওদের খাঁটানো সনাতনের তখন একদম ভালো লাগত না।

তখন নাগাড়ে এসব হ'ত। গোলাগুলি, ধরপাকড়, মিটিং, মিছিল, ধরপাকড় লেগেই থাকত। তা ইংরেজ গেছে আপদ গেছে (যদিও সনাতন বিশ্বাস করে ইংরেজ যাওয়াতেই দেশের যত দুর্দশা বেড়েছে। রাজা চালানো কি এদের সাধ্য! ওরা চিরকালের রাজার জাত, ওরা পারে) এখন এসব হবার মানে কী? গোলাগুলি, ট্রাম পোড়ানো, বাস পোড়ানো, খালি মিছিল আর ধর্মঘট। সনাতনের এত কাণ্ড মোটেই ভালো লাগে না। শান্তি বলতে কিছু নেই, এত অশান্তি আর দুশ্চিন্তায় কি মানুষ বাঁচে! একটু হাত-পা মেলবার উপায় নেই গো!

সনাতন ঘর থেকে ফুলের ঝুড়িটা বা'র ক'রে নিয়ে এল। তার কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগটা। ঝুড়ির ওপর থেকে কলাপাতাগুলো সরিয়ে খানিক জলের ছিটে দিল ফুলে। একবার ভাবল ঘরে চাবি দিয়ে যাবে। তারপর ভাবল দিয়ে কী-ইবা হবে! ঘরে আছে কী নেবার! তাছাড়া, এর মধ্যে ছেলেটা যদি আসে! বাইরে থেকে শিকল তুলে দেয় সনাতন। দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠোনটুকু পার হয়ে যায়। কেউ যদি পেন্নাদ ধরে! আজ, কেন কে জানে কথা বলতে একদম সা নেই সনাতনের।

আকাশের তখনো থমথমে চেহারা। খুব কান্নাকাটির পর যেমনটি হয়। বস্তীর গলির মুখটায় জল। রাস্তার আলো সবটা পৌঁছোয় না। যেটুকু পৌঁছোয় তাও কিরকম অন্যমনস্ক আলো। যেন এখুনি অন্য কোথাও চলে যাবে। বেরুতেই নাকে একটা দুর্গন্ধ পায় সনাতন। গোবর এর সার আর কী কী সব মিলে বৃষ্টির পরে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। অবশ্য নাকটাক বহুদিন নেই সনাতনের। জিবে জিব নেই, নাকে নাক নেই। এই বস্তীতে যারা থাকে তাদের ওসব থাকতে নেই। তবু দুর্গন্ধটা আজ বেশী বলেই বোধ হয় সনাতনের নাকে গিয়ে ঢোকে।

কিন্তু সনাতন তো চিরদিন এই বস্তীতে থাকত না। থাকত সেই আলীপুরে। কত বড় বাড়ি, বাড়ির চারপাশে কি প্রকাণ্ড বাগান। বাগানে কি ফুল, কি ফুল! সেই ফুলের মধ্যেই তো বড় হয়েছে সনাতন। সকালে ঘুম ভাঙলে নাকে ফুলের গন্ধ, রাতে আবার সেই ফুলের গন্ধে গন্ধেই ঘুমিয়ে পড়া। মস্ত ফটক ছিল, ফটকের একপাশে দারোয়ান ব'সে থাকত। আর ওপাশে ছিল তিন তলা সমান ইউক্যালিপটাস গাছ। অত লম্বা আর সাদা ইউক্যালিপটাস সনাতন আর দেখল না! গাছের গা দিয়ে শিরশির করে হাওয়া বইত। পাতা ঝরাত, গন্ধ ছড়াত। সনাতন আউটহাউসে মালীর ঘরে শুয়ে শুয়ে কত রাত সেই পাতা ঝরার শব্দ শুনেছে।

মস্ত এক সাহেবের বাড়ি ছিল সেটা। ওর বাবা ছিল সাহেবের খাস মালী। পনেরো বছর বয়সে সনাতনকে নিয়ে এসেছিল ওর বাবা দেশ থেকে। নিজের কাছে কাজ শেখাবে বলে। বাবার ছুটি হ'য়ে গেলে সে-ই হবে এখানকার খাস মালী। আস্তে আস্তে দেশী-বিলিতী ফুল চিনল, গাছ-পাতা চিনল, তাদের স্বভাব চিনল, র‍্যাঙ্কট করা, কাটিং বার করা শিখল সনাতন। বাইশ বছর বয়স হ'তে সাহেব নিজে উদ্যোগ করে তার বিয়ে দেওয়ালো।

তারপর হঠাৎ একদিন সব শেষ হ'য়ে গেল। এক রাত্তিরের একটুখানি দুঃস্বপ্নের মতো ঘটে গেল সব ব্যাপারটা। সনাতন অত কিছু বোঝে নি। তার বাবা বোধহয় বুঝেছিল, তাই আগেভাগে দেশে গিয়ে বসেছিল সে। সনাতনের সব মনে আছে। সেই সন্ধ্যেটার কথা। সেদিন আবার বিকেল থেকে ঝড় উঠেছিল। গাছে গাছে কি খসখস, মচমচ শব্দ! বিকেলে সনাতন বাগানের কাজ করতে পারে নি ঝড়ের জন্যে।

সন্ধ্যের আলো জ্বলতে সাহেব ওদের ডেকে পাঠাল। হলঘরের মাঝখানে ব'সে ছিল সাহেব। ফুট-টুলে পা ঝুলে। ঘরে একটিমাত্র হাঁসের মতো আলো। সনাতন সেই সাদা, কোমল, সংক্ষিপ্ত আলোয় দেখল সাহেবের মুখ গম্ভীর। অথচ সাহেব এমনিতে খুব আমুদে। চাকর-বাকর, দারোয়ান, বাবুর্চি, মালী সকলের সঙ্গে সমান ভাবে আনন্দ করতে পারে। মেম সাহেব কিন্তু অত দিলখোলা নয়। নিজেকে খুব গুটিয়ে রাখত সকলের

কাছ থেকে। সনাতন বুঝতে পারত, ছোটলোকদের মত লাই দেওয়া মেমসাহেবের পছন্দ ছিল না।

'বহট ডুক কি বাট্'। সাহেব এমনি ক'রে সেদিন কথাটা পেড়েছিল।

ওদের মধ্যে যারা বিচক্ষণ তারা হয়ত আঁচ করেছিল। সনাতন কিন্তু তখনও বুঝতে পারে নি। অবাক হয়েছিল সে। সাহেব অমন করছে কেন? কী বলতে চায়! এমন ক'রে তো কখনো কথা বলে না সাহেব। বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলা ওর ধাতে নেই। ও তো সব সময় চড়চড় করে ভেঙে পড়ে। আর দুঃখ! দুঃখ কিসের?

'হম্ ভুলুক চলা যায়েগা, হমারা ডেশ···ইংল্যাণ্ড···'

দেশে চলে যাবে! এ-সম্ভাবনার কথা তো কোনদিন ভাবে নি সনাতন। তাহলে তার কী হবে! কোথায় থাকবে! কার বাগানে কাজ করবে! সেখানকার লোক কিরকম হবে, এই সাহেবের মতো কি না! সনাতন বেজায় চিন্তায় পড়ল। ও জানতনা ওর ভিতরে কোথাও কান্নার একটা মুখ আঁট করে বাঁধা ছিল, সেটা যেন খুলে যেতে লাগল।

'লেকিন হম্ সব কোই কো থোড়া থোড়া রুপিয়া দেনে মাংটা।' সাহেব বলেছিল। 'উসলে কাম চলা জায়েগা কুছ্ রোজ। ফির, হুমরা নেকরী ছুঁড় লে না।' তারপর সাহেবের মাথাটা যেন চলে নেমে আসে। ডান হাতটা কোলের উপর,—ঝড়ের সময় জানলার পাল্লার মতো একবার ওঠে, একবার পড়ে। 'আফশোস্···' 'আফশোস্' বলতে বলতে সাহেব উঠে ভিতরে চলে যায়।

সনাতন চাকরী পায় নি। দেশে ফিরে বসে ছিল অনেক দিন। বাপের কথায় চাষবাসে মন দিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু চাষে আর সেই আঠা ছিল না। সংবৎসরের খোরাকী রেখে, ধান বিক্রী করেও সংসার চালানো কঠিন। একবার তো ধানের বদলে শুধু ধুলো উঠল জমি থেকে।

তাছাড়া গাঁয়ের মন-প্রাণ পাল্টাচ্ছিল। সনাতন দেখে, সকলেই সকলকে ঠেলে বাঁচতে চায়, এখানে। সকালবেলা যার সঙ্গে হেসে কথা বলছে, বিকেলবেলা স্বার্থে একটু ঘা পড়েছে কি পড়েনি, তাকে মারমুখো হ'তে বাধছে না। দেখে দেখে সনাতন অবাক। থাকতে না-পেরে সে একজনকে বলেও ছিল, 'কি গো কর্তা, মরাইয়ে তো আজকাল ধান নাই গো, তা মায়া-দয়া, বিচার-বিবেচনা গুলোক কি সেথায় রাখছেন না কি?'

কিন্তু একদিন সনাতনের সঙ্গেই লাগে। লাগে তার দূর-সম্পর্কের এক কাকার ছেলের সঙ্গে। কিছুই না অতি সামান্য কারণ, ভাবলে আজও সনাতনের লজ্জা হয়। বাড়ির পিছনে, নিমগাছের ধারে ছোট পুকুরটার সাড়ে-তিন আনার শরিক তার কাকা। সনাতন ক'টা বক-ঠুঁটো মাছ ধরেছিল, সেই পুকুর থেকে। ওর কাকার ছেলে সিধে হটাৎ কোথা থেকে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় মাছগুলো।

'হেই, তুই আমার মাছ নে যাস কেন?' সনাতন হেঁকে উঠেছিল।

'তুমি শহরের লোক, জাননি আমার বাপেরও ভাগ আছে যে গো এ-পুকুরে।' সিধে জবাব দেয়। তারপর খানিক এগিয়ে বোধ হয় ভাবে দাবীটা তেমন জোরদার হয়নি, তাই আরেকটু যোগ ক'রে দেয়—জোরের বাকী অংশটুকু সম্পূর্ণ করতে।

'পুকুরে জল থাকে বলে কি ভাগটাও বিশ বাওয়ে যাবে না কি?'

সিধের কথায় যেন বিষ ছিল। তাই সনাতনের সারা অঙ্গ জ্বালা ক'রে ওঠে।

'আমি বলতেছি তুই মাছ খুয়ে যা বেথা, নইলে তোর ধরে ঐ মুখখানা আর থাকবে নি।' কিন্তু সনাতন অবাক হয় যখন দেখে গাঁয়ের লোক সিধেকেই সমর্থন করে। সনাতনের কথা কেউ বুঝতেই চায় না? সে মনে মনে গিয়ে বলে, মাছে তা'র বা তা'র পরিবারের কা'রো তেমন লোভ নেই। যদিও তাদের অংশটাই কেবী এ-পুকুরের। মোটে একদিন সখ ক'রে সে মাছ ধরেছিল। তা-ও যদি সিধে এসে ভালোভাবে চাইত, ও হয়ত দিয়ে দিত। কিন্তু এ কি ব্যবহার! দুনিয়ায় কি কাণ্ডজ্ঞান,

বিবেচনা ব'লে কিছু থাকবে না? ভদ্র ব্যবহার, দু'টো মিষ্টি কথা, চোখের চামড়া সব লোপ পেয়ে যাবে? প্রথমে সনাতনের মনে হয় ওরা যেন ওর কথা একটুও বুঝতে পারছে না। যেন সনাতন কোন বিদেশী-পরদেশী ভাষায় কথা বলছে। তারপর মনে হয়, ওর আবেদন-নিবেদন, বোঝাবার নানান চেষ্টা সব বিফলে যাচ্ছে। ও বেশ বুঝতে পারে, মামলায় হার হচ্ছে ওর। হার হবেই, কেননা মামলার রায় যে ওরা আগে থেকেই তৈরি ক'রে রেখেছে।

সেই অভিমানে দেশ ছেড়ে চ'লে আসে সনাতন। আর, ও-মুখো হয়নি। শহরে এসে প্রথম ক'দিন আলীপুরের সেই বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করেছে। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে তাকিয়ে তাকিয়ে বিশ্বাস করতে চেয়েছে, এইখানে সে একদিন ছিল! ঐ সেই অদ্ভুত সাদা আর লম্বা ইউক্যালিপটাস গাছ—কত রাত যার পাতা-ঝরার শব্দ শুনেছে! আর, ঐগুলো—ঐ পিটুনিয়া পোর্টুলিকা, ওগুলো কি তারই হাতে লাগানো? বেগুনী বোগেনভিলিয়া সহজে দেখা যায় না, সনাতনই এনে লাগিয়েছিল। সব ঠিক আছে, সব। শুধু সাহেব নেই, আর নেই সে। ফটকের গায়ে সাহেবের নামের ফলক ছিল। সেখানে এখন অন্য নাম, নতুন প্যালিকের নাম। গেটে অন্য দারোয়ান। সনাতনকে সে চেনে না। কিন্তু এই বাড়ির কোথায় কোথায় যেন সনাতন ঘুরে গেছে। লোক মারা যাবার পর-ও কি দেওয়ালে ছবি থেকে যায় না?

এরপর সনাতন কয়েকটা খুচ্‌রো মালীর কাজ পেয়েছিল। কিন্তু কোথাও বেশীদিন টিকতে পারে নি। সাহেব ছাড়া বাগানের কাজ কে এত বোঝে। বাগানের প্রতি কা'রই বা এত সত্যিকারের টান। এখানকার লোকে বাগান করে ভালোবাসায় নয়, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের কাছে নিজের মান-ইজ্জত বাড়াবার জন্যে। আর, সনাতন দেখছে মালীকে লোকে চাকরের মতো ব্যবহার করে। মালীকে মালী, আবার চাকরকে চাকর। শেষপর্যন্ত সনাতনের পোষায় নি কোথাও।

তখন থেকে সে নিজে স্বাধীন ফুলের ব্যবসা করে। ফুল কিনি করে, ফুলের তোড়া গড়ে, বিয়েতে, উৎসবে-অনুষ্ঠানে ফুল যোগান দেয়। ফুলের তোড়া-তবক বানায়, দরকার পড়লে সিংহাসনও সাজিয়ে দিয়ে আসে। এর মধ্যে ঘর সংসার থেকে বাবা গেছে, বউ গেছে। আগে তবু গুটিকয়েক সিধে ছিল দেশে। এখন সিধেরা দলে বেজায় ভারি হয়েছে। তাদের দাপট-দৌরাত্ম্যে গাঁয়ে পা দেবার জো নেই। আর, সনাতনের ছেলে নিবারণ বড় হয়েছে। শুধু বড় নয়, বড় আর লায়েক। কি গরম-গরম তা'র কথা—বাপরে বাপ! সনাতন অনেক কথা-ই বোঝে না। শুধু—বোঝে ওর কথার কী যেন আছে—শুনতে শুনতে সারা শরীরে জ্বালা ধ'রে যায়। ভয়ও করে একটু একটু, ওর সামনে ব'সে থাকলে মনে হয় যেন ঠাসা প্রচণ্ড বারুদের মাঝখানে ব'সে আছে। কখন ফেটে পড়ে তার ঠিক নেই।

নিবারণ এর মধ্যে চার-পাঁচটা কারখানা ঘুরে এসেছে। কোথাও থাকতে পারে নি। সনাতন ছেলের দোষ দেয়। ছেলে বেশ কারখানার মালিকদের দেবে। বলতে বলতে নিবারণের হুঁশ থাকে না, রাগে আত্মহারা হয়। সনাতন ভেবে পায়না, তা'র ছেলে হ'য়ে ও রাগ কোথায় পেল এত! সেই নিবারণ-ই সনাতনকে বুঝিয়েছে, শহরে কেন এত দাঙ্গাহাঙ্গামা। কেন এই ক্যাপামি; এই ট্রাম-বাস পোড়ানো, দলে দলে লোকেদের মিছিল আর সম্মিলিত আওয়াজ। নিবারণ বলে, এই আওয়াজ না কি ওদের টলিয়ে দেবে, এই আওয়াজ একদিন আকাশে গিয়ে পৌঁছুবে।

'তুমি যারে, ক্যাপামি বলতেছ সেটা ক্যাপামি নয়।'

'তো কী এটা তুই ক'রে দে।'

'এটা জ্ঞানের লড়াই।'

'এতগুলান জান লিয়ে তুই কী জ্ঞানের লড়াই করতেছিস।'

বাপের কথায় ছেলে হাসে। বাপের অল্প পুঁজি দেখে। কত কী জানে না সনাতন। না জেনে কেমন নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছে। নিবারণদের কাজ কি কম।

বাইরে ওদের সঙ্গে লড়তে হবে আর ঘরে সনাতনদের সঙ্গে।

'বাঁচার লড়াই করতেছি গো বাবা, খাওয়ার লড়াই!' নিবারণ জবাব দেয়। তারপর, বোধহয় বাইরের ছড়ানো আগুন থেকে জ্বালিয়ে নিয়ে আসে নিজের চোখ, দপদপ ক'রে ওঠে নিবারণের চোখ আর গলায়—গলায় ঠিক কী তা সনাতন জানেনা। হয় ও কা'রো টুঁটি টিপে ধরেছে অথবা ওর টুঁটি কেউ টিপে ধরতে চাইছে—এই রকম ভয়ংকর এক উত্তেজক গলায় নিবারণ ছেলে বলে, 'যাবে, জান অমন যাবেই। বিষগুলাক উগরে ফেলতে হবে নি?'

ছেলের ঐ বেদামাল মূর্তি দেখে ভয় পায় সনাতন। ওর মনে কেমন যেন এক স্পষ্ট আশংকা হ'তে থাকে, এ-ছেলে একদিন না একদিন ওর হাতছাড়া হ'য়ে যাবেই। সনাতনের সাধ্য নেই সেই বিপদকে ঠেকায়। একচুল সাধ্য নেই তা'র। সনাতনের মন সেই কবে ছাইগাদা হ'য়ে গেছে, শরীরে এক কোঁটা শক্তি নেই। পিঠ বেঁকে এসেছে, পা দু'টো সরু, লিকলিকে আর পেটটা মোটা। সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত পিচুটি ভ'রে থাকে চোখে। ওর তো শিকড় মরে এসেছে। টান মেরে একদিন উপড়ে ফেললেই হয়। ও কি পারে এই দুঃসময়ের মহড়া নিতে!

তবু সনাতন ছেলেকে বলেছিল, 'বিষ যে তোরা আরো ঢুকোয়ে দিতেছিস, বাপ! এই বিষ একদিন তোদেরও শেষ করবে নি?'

সনাতন হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এসে ছিল। বড় রাস্তায়, ঠিক বাজারের মোড়ে যেখানে ফুল নিয়ে সন্ধ্যের কিছুক্ষণ বসে সনাতন এবং আরও কেউ কেউ। সেখানটা খাঁ-খাঁ। জল থইথই করছে। ছোট কাঠের পিড়িটা, যেটায় রোজ সে এসে বসে, সেটা জলে ভাসছে। হয়ত আজো কেউ আসে নি। একে শহরের গোলমাল, পরপর বৃষ্টি—কে আসবে! ফুল কেনার তো গরজ কা'রো থাকতেই পারে না, এক কোর গরজ।

যেমন সনাতন বেচার গরজেই তো বেরিয়েছে। চারটি পয়সা ঘরে নিয়ে যাওয়া তার বড় দরকার আজ। অবশ্য ছেলে তাকে পাইপাই ক'রে বারণ করেছে বেরুতে। দুরে যেতে, কিন্তু ও তো জানেনা, জানলেও হয়ত চোখ বুজে থাকে। দু'বেলা ডাল হাতটা মুখ অবধি আসা তো চাই। নিজে তো বছরে চার মাস চাকরী করে আর আট মাস ব'সে থাকে। সনাতনের না বেরুলে চলবে কেন। অথচ সনাতন চায়না বেরুতে, পারেও না। একএক সময় চুলচাপ হাত-পা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে। যাক্ না, কোথায় নিয়ে যাবে, যাক্।

তবু, সনাতনের কেন যেন ফুল বিক্রী করতে ইচ্ছে করছিল না আজ। এদিককার রাস্তাগুলোয় কিরকম ছমছমে অন্ধকার। লাইট পোস্ট, বাড়ির থাম, রাস্তার মাঝে মাঝে গাব গাছ, বকুল গাছ—সব কিছুর আড়ালে সনাতনের মনে হয় যেন অনেক অনেকগুলো কালো মুখ লুকিয়ে অপেক্ষা করছে। শরীরের চেয়ে তাদের ছায়াগুলো বড়। কখন হুট্ ক'রে বেরিয়ে আসে কে জানে।

আকাশের একপাশে কিছু কিছু তুলো-ধোয়া মেঘ, আকাশের বেশী অংশটায় তখনো থাবা পেতে রয়েছে কালো-হুলো মেঘ। আর, চাঁদ আকাশের লম্বা দালানে খেলনার মতো গড়িয়ে বেড়াচ্ছে এপাশ-ওপাশ; একবার সাদায় একবার কালোয়।

কয়েকবার 'ফুল চাই' বলে ডেকেছিল সনাতন। তখন রাস্তায় লোক দেখেছিল, আলো। তখন, বাড়িগুলোকে বাড়ি, গাছ গুলোকে গাছ, আলোর থাম গুলোকে থাম মনে হচ্ছিল। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে এখন কোথায় এসেছে সনাতন! এ কি বিশাল অন্ধকারের রাজ্য! শহরে যে বন নেমেছে গো, বনের অন্ধকারে। এই অন্ধকারে কে তার ফুল নেবে? নেয় কেউ? সনাতনের কেমন যেন ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল হাঁটতে হাঁটতে। আর শরীর কি ভীষণ হালকা। মাথায় ফুলের ঝুড়িটার পর্যন্ত যেন ওজন নেই। ভাবনাগুলো মাথার ভিতর নির্বিকার মাছের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। তবু সনাতন কেন কে জানে, বোধহয়

কোন মায়ার বশবর্তী হয়ে আরো এগিয়ে চলে। অন্ধকারে পথ কেটে কেটে।

'হল্‌ট···' অন্ধকারের গলা শোনা যায়।

সনাতন বুঝতে পারে না। ওভাবে, ও বুঝি লোকালয়ের কাছাকাছি আসছে। এবার আলো দেখা যাবে। কোন বাড়ির বন্ধ জানালা খুলে গিয়ে হয়ত ফুল কিনতে চাইবে তাঁর কাছ থেকে। আগে তো এমন কত হয়েছে। বাড়ির মেয়েরা জানলা থেকে ডেকে ফুল কিনেছে। সনাতন সেই আশায় হেঁকে ওঠে, 'ফুল চাই···বেল-ই ফুল, রজনী গন্ধা···'

আবার অন্ধকারের জবাব আসে, 'হল্‌ট···।' এবার, ঘুরে কতকগুলো ভব্‌রে লোকার মতো। অন্ধকারের শরীরকে নড়াচড়া করতে দেখে সনাতন।

'ফুল চাই, ফুল···।' সনাতন ডাকতে ডাকতে সেই অন্ধকারের শরীরগুলোর দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ, কাছাকাছি এক প্রচণ্ড আওয়াজ হয়। যেন সনাতনের বিশ হাতে ঘুরে সমস্ত পৃথিবীটা একসঙ্গে ভেঙে পড়েছে। আর কিছু উপলব্ধি করার আগেই সনাতন টের পায় ঐ প্রচণ্ড শব্দটা তারই বুকে চিরস্থায়ী হয়ে গেছে। ওর মাথা থেকে ফুলের ঝুড়িটা খসে পড়ে। ঘুম পায় সনাতনের ···মারাত্মক ঘুম। ঘুমের ভারে সনাতনের শরীরটা মাটিতে নেমে আসে।

ওদিকে কতকগুলো ভারি পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। আওয়াজটা সনাতনের শায়িত শরীরের কাছে এসে থামে।

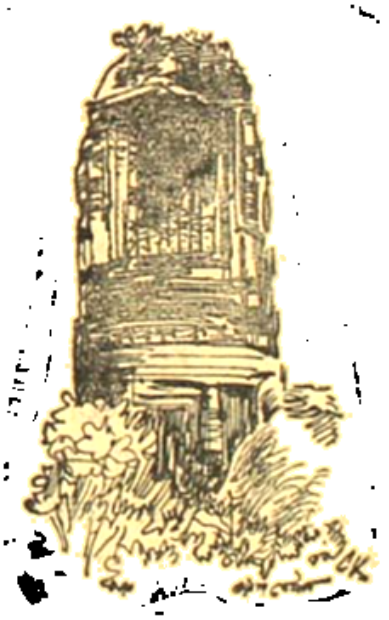

অরুণা ঘরে ঢুকে সটান চলে যাচ্ছিল, বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে সুধাকর ওর শাড়ির আঁচল চেপে ধরল।

অরুণা প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। পাঁচ সাত মিনিট আগেও সে এ-ঘরে এসেছিল। সুধাকর তখনো শুয়ে. কিছুটা শিথিল ভাব, পাশ বালিশটা বুকের কাছে জড়ানো। মাথার দিকে জানালাটা খুলে দেবার সময় অরুণা ওর মৃদু নাক ডাকার শব্দও শুনতে পেয়েছিল। এখন সুধাকরের আকস্মিক ব্যবহারে ও বিব্রত হল।

সুধাকর হাসছিল। অরুণার আঁচল তখনো ওর হাতের মুঠোয়, অরুণার বুকের ওপর কাপড় নেই, ক' পাক ঘুরে অরুণা তখন কিছুটা দূরে। সেই অবস্থায় ক' পলক তাকিয়ে সুধাকর ওর শরীর দেখল। অরুণার চোয়াল ও চিবুক ভারি, মাঝারি কপাল, ঘাড়ে বেশি মাংস থাকার দরুণ গ্রীবার টান টান ভাবটুকু অদৃশ্য, মুখ কটিদেশ সমতা হারিয়ে নিতম্বের উচ্চতায় মিশে গেছে।

দু' এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে মুঠি শক্ত করে অরুণাকে কাছে টানার চেষ্টা করল সুধাকর। অরুণা বিরক্ত হল, আঁচলটা সুধাকরের করতল মুক্ত করার চেষ্টা করে বলল, 'ছাড়ো।'

সুধাকর ছাড়ল না। সকালের আলস্য তার চোখে, বেলা পর্যন্ত ঘুমানোর ফলে চোখ মুখ ফুলেছে। অল্প হেসে বলল, 'দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের গল্পটা জানো?'

'কেন!'

'ইন্টারেস্টিং। না জানি কতো রূপসী ছিলেন তিনি; অহো, সেই দৃশ্য যারা দেখেছিল তারা কতো ভাগ্যবান!'

'আমি দ্রৌপদী নই।'

আঁচলটা এবার শক্ত হাতে কেড়ে নিল অরুণা; সেই টানে যেন কতো জোর! বিছানার ওপরেই খানিকটা গড়িয়ে এসে হাল ছেড়ে দিল সুধাকর।

'সাত সকালে কি অসভ্যতা শুরু করেছো!' কাপড় গুছিয়ে ভিরস্কারের ভঙ্গীতে অরুণা স্বামীর দিকে তাকাল। 'খুকু আছে, মা আছে। দিন দিন তোমার আক্কেল যেন বাড়ছে। বয়স আছে নাকি!'

'কার? তোমার না আমার?'

বিছানার ওপর বাবু হয়ে উঠে বসল সুধাকর; বালিশটা টেনে নিল কোলে। স্ত্রীকে নিরুত্তর দেখে

বলল, 'চল্লিশে আমাদের দ্বিতীয় যৌবন শুরু হয়। শুনলে না, খুকু কাল কি বলছিল?'

'কি বলছিল?'

অরুণা ঈষৎ অন্যমনস্ক। ঘরের কোণে দেয়াল ঘেঁষে তাদের মালপত্র সাজানো। বড় ট্রাঙ্কের ওপর দুটো বড় সুটকেশ, তার ওপর আবার ছোট দুটো। কথাটা আলগোছে স্বামীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ছোট সুটকেশ দুটো নামিয়ে ওপরের বড় সুটকেশটার দিকে হাত বাড়াল অরুণা।

সুধাকর ইতিমধ্যে সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছিল। সুখাবেশে এক মুখ ধোঁয়া টেনে বলল, 'ঐ যে গো, জামাইবাবু, দিদির পাশে আজকাল আপনাকে কেমন বাচ্চা বাচ্চা লাগে!'

'আদিখ্যেতা রাখো। তোমার সঙ্গে রসিকতার সময় নেই।'

অরুণা সুটকেশ থেকে একটা কর্সা, পুরনো শাড়ি বের করে দু' আঙুলের চাপে ফরফর করে ছিঁড়ে ফেলল। অল্প পরিশ্রমেই ও হাঁফিয়ে উঠেছিল। দূর থেকে সুধাকর ওর কপালে ঘামের বিন্দু দেখল, বুকের অস্পষ্ট ওঠানামা লক্ষ করল।

'বড় বেরসিক তুমি হে।' কপট গলায় বলল সুধাকর, 'ওই সকালে রাগ করে শাড়িটা ছিঁড়ে ফেললে!'

স্বামীর কটাক্ষ গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না অরুণা। বারেক চোখ তুলে দেখল সুধাকরকে; ওর চোখে অসহায় বিরক্তি মেশানো।

'খুকুর হঠাৎ শরীর খারাপ শুরু হয়েছে। দিদি মেয়ে, এখনো নিজে কিছু শিখল না! আমার হয়েছে জ্বালা!'

'ওঃ, এই! সে তো সুখবর।' ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আড়-মোড়া ভাঙল সুধাকর; চোখের জল দিয়ে কৌতুকভরে দেখল অরুণাকে। 'তা কাপড় কেন?'

'ওসব নেই। কবে কার কি হবে আমি কি হাত গুনব!'

'কি আর করা!' স্ত্রীকে বিরক্ত দেখে শব্দ করে হাসল সুধাকর, 'এ ব্যাপারে তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারছি না। আমাদের সাবজেক্টে বলে··'

'তোমাদের সাবজেক্টে আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই। বেশি, সরো··'

হ্যাঁচকা টানে সুধাকরের কোল থেকে বালিশটা কেড়ে নিল অরুণা, দ্রুত হাতে মশারির দড়ি খুলে ফেলল। সুধাকর ততক্ষণে বিছানা থেকে নেমে পড়েছে। রবারের চটিটা পায়ে গলিয়ে, পাজামার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে জানলার কাছে গেল। রৌদ্ররেখায় কণা কণা ধুলোর রেণু উড়ছে। সুধাকর খানিক রোদ দেখল, খানিক অরুণাকে।

মশারি, বালিশ যথাস্থানে রেখে বেডকভার বিছিয়ে কাপড়ের টুকরোটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে অরুণা বলল, 'তোমার সঙ্গে এখানে আসাই আমার ভুল হয়েছে।'

স্ত্রীর গমন পথের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল সুধাকর। যেন সে জানত, অরুণা এই কথা বা এইরকমই কোন কথা বলবে। সে তৈরী ছিল। কোন কথায় অরুণার কি প্রতিক্রিয়া হয়, অরুণা কোথায় নরম, কোথায় তার জ্বালা, অরুণার প্রতি মুহূর্তের প্রত্যেক আচরণ, এমন কি তার নিঃশ্বাস পড়ার সূক্ষ্মতম শব্দটি পর্যন্ত সে অনায়াসে বিশ্লেষণ করতে পারে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে হাতের সিগারেটটা শেষ করল সুধাকর।

এই জায়গাটা স্বাস্থ্যকর, পাঠকবাবু লিখেছিল, আপানাদের কলকাতার চেয়ে ঢের ঢের স্বাস্থ্যকর। না গরম না শীত। বাতাস আছে, প্রচুর আলো আর রোদ্দুর—ছুটি-ছাটায় বেড়ানোর পক্ষে আদর্শ। নদী, ঝর্ণা দেখতে চান পাবেন, অবশ্যই পাহাড়ী নদী; কাছেপিঠে দু'দশ মাইলের মধ্যে প্রাচীন আর দর্শনযোগ্য জায়গাও আছে। এখানের জলে হজমের রোগ সারে। সপরিবারে চলে আসুন তার, দেখবেন আপনাদের ভালই লাগবে।

সুধাকর ভেবে দেখল, লোকটি মিথ্যে বলে নি। চিঠিতে যা লিখেছিল ভাল লাগার ব্যাপারে সে তার চেয়ে কিছু বেশিই পেয়েছে। যে-ধরণের চাকরি, তাতে ছুটি সে প্রায় পায়ই না। বড় ছুটির মধ্যে পুজোর ক'টা দিন, শুয়ে বসে, বাজার করে, বই পড়ে, বৈচিত্র্যহীন হাই তুলতে তুলতে কেটে যায়। তার ওপর টুলটুলের ভাবনা আছে। বছরে দু'বার কার্সিয়াংয়ের স্কুল থেকে তাকে নিয়ে আসতে হয়, ছুটির শেষে আবার রাখতে যেতে হয়। ওর ঝকি পোহাতেই অস্থির। অরুণা ঘরকুনো, অল্পেই খুশি, অভ্যাস সম্পর্কে ভয়ঙ্কর সেনসিটিভ, সহজে নড়তে চায় না। এবার সুযোগ ফুটে গেল।

টুলটুল গেল, তার পরেই বরুণারা এল। মা ও মেয়ে। সঙ্গে [redacted] বরুণাও যেন বদলে গেল রাতারাতি। চল, বেড়িয়ে পড়া যাক। এই একাস্থবর্তিতার বাইরে ক'টা দিন ঘুরে আসা, মন্দ কুড়নো—সুধাকরেরও মন্দ লাগছিল না। আঃ, কতোদিন পরে সুধাকর এই মুক্ত প্রকৃতির, পরিচ্ছন্ন রোদ্দুর, সুবাতাস ও অপরিমেয়তার সান্নিধ্য পেল!

সুখকর অনুভূতির মধ্যেই গায়ে সার্ট জড়িয়ে সুধাকর বাইরে এল। সামনে করিডোরের মতন ফালি জায়গা, তারপর বারান্দা, কোমর-উঁচু রেলিং, রেলিংয়ের দু'ধারে বাগানের মধ্যে দিয়ে অপরিসর সুরকির পথ গেট পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে সুধাকর শাল কি সেগুনের গাছ, পাহাড়ী পথ, ঝকঝকে আকাশ, সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। ছিমছাম হাওয়ায় নতুন পাতার গন্ধ ভেসে আসছে। রাতে হয়তো বৃষ্টি হয়েছে; রোদ উঠলেও সুরকির পথ এখনো ভিজে। ওপরে তাকিয়ে সুধাকর সেই ভিজে, ঈষৎ বনজ গন্ধের ঘ্রাণ নিল।

অরুণা সেই যে গেছে, তারপর আর দেখা দেয়নি। বারান্দার একদিকে বেতের গোল টেবিল ঘিরে চেয়ারগুলো এলোমেলো ছড়ানো। এত নিঃশব্দ চতুর্দিক যে মনে হবে এই মুহূর্তে সুধাকর ভিন্ন এই বাড়িতে দ্বিতীয় কেউ নেই। অরুণা গেল কোথায়!

খুঁজতে না পেরে সুধাকর ঘরের দিকে যাচ্ছিল, দেখল কেয়ারির পাশ দিয়ে হেঁটে বরুণা আসছে। সুধাকর ভিতরে গেল না। সহাস্য চোখে দেখল বরুণাকে, একাগ্র হবার চেষ্টা করল। তীব্র বনজ গন্ধ ওকে বার বার অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল।

'গুড মর্ণিং, জামাইবাবু।'

'গুড মর্ণিং। এসো, খুকু।'

বরুণার পায়ের পাতা অদ্ভুত সাদা। ছোট ও নিটোল, পায়রার মাথার মতন গোড়ালি, হালকা পা ফেলে এগিয়ে আসার সময় ও যেন সুরকির পথের ওপর মৃদু মৃদু টোকা দিয়ে আসছে। সিল্কের শাড়ি পরার দরুণ বরুণার অস্ফুট স্তন, নাভির ওপর ঈষৎ উঁচু, গোল পেট, সলজ্জ উরু, হাঁটুর হাড় ইত্যাদি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

'কোথায় গিয়েছিলে, খুকু?'

'ঐ তো, টিলার কাছে। জামাইবাবু, ওখানে দুটো সাঁওতাল মেয়ে ফুটস বিক্রি করছে। দে আর সো লাইভলি!'

'ওরা এমনিই।' সুধাকর থামল, এক পলক দেখল বরুণাকে। 'তোমার মা কোথায়?'

'জানি না তো, বোধহয় পুজোয় বসেছেন।'

'বরুণা তুমি আজ শাড়ি পরেছ যে!' আলতো গলায় বলল সুধাকর, ওর ঠোঁট সিরসির করছিল। সিগারেট খুঁজল, পেল না।

'দিদি বলল।' বরুণার দৃষ্টি আনত। চাপা, পাতলা ঠোঁটে হাসলে ঠোঁটের দু'দিকে কোলন ড্যাসের মতো সমান ভাঁজ পড়ে। 'আমার হ্যাবিট নেই।' এক পলক সুধাকরকে দেখে নিচু গলায় বরুণা বলল, 'জামাইবাবু বলেন এ্যাট দিস এজ ইউ শুড ওয়্যার স্কার্টস; স্যাট কীপস্ ইওর মাসলস্ ফ্রী।...জামাইবাবু, আমাকে মানায়?'

'চমৎকার। এসো, তোমাকে ফুল চিনিয়ে দিই। হেয়ার ইই হাড গ্রেনটি অফ দেম।'

'তোমার চা দিয়েছি।'

বরুণার এক পা সিঁড়িতে, আর এক পা বারান্দায়। হাওয়ায় পুবের টান। বরুণা যাদের দেখেছিল টিলার

কাছে, মাথায় বুড়ি নিয়ে সেই সাঁওতাল যুবতীদের টিলার পাশ দিয়ে ঢালু সমতলে নেমে যেতে দেখল সুধাকর।

চায়ের কাপ হাতে অরুণা দাঁড়িয়েছিল। সুধাকর এগিয়ে গিয়ে কাপটা ওর হাত থেকে নিল। অরুণা বোধহয় নিজের হাতেই চা করেছে, গরম ভাপ লেগেছে মুখে। গলায় ঘাম, গুচ্ছো কয়েকটা চুল কপালে জড়ানো।

'অরুণা রাত্রে কি তোমার ঘুম হয় নি?' চায়ের কাপে আস্তে চুমুক দিয়ে গলার স্বরে গাঢ়তা আনল সুধাকর, 'তোমাকে ক্লান্ত লাগছে।···বরুণা, আর এক দফা হবে নাকি? তোমার দিদি আজ চা টা ভালই বানিয়েছে।'

'কেন আগে কি কখনো ভাল চা খাও নি?' রুক্ষ চোখে স্বামীকে দেখল অরুণা; ওর চাহনিতে ভ্রূকুটি ও সন্দেহ, গলায় শ্লেষ। কেমন অবলীলায় এই মানুষটি একসঙ্গে দু'টো কথা, দু' ধরনের কথা বলতে পারে ভেবে অবাক হল ও।

সুধাকর গা করল না। অরুণাকে কিছু নতুন দেখছে না। এই মুহূর্ত বলে নয়, কিছু দিন থেকেই লক্ষ করছে সুধাকর, অরুণা যেন ঠিক আগের অরুণা নেই—যে অরুণাকে সে দেখেছে কলকাতায়, বাড়িতে, যখন সে আজকের সুধাকর হয়ে ওঠেনি তখন থেকে, লণ্ঠনের পোড়া আলোয় বা ফ্লুরোসেন্ট টিউবের উজ্জ্বলোর নিচে, সুখে, দুঃখে, যে-অরুণা টুলটুলের মা, শান্ত ও নির্বিকার, অভিযোগহীন। আজ হঠাৎ তার এত অনুযোগ কেন? এত বীতরাগ কেন! কথায় কথায় এমন প্রবঞ্চনা কেন!

চায়ের কাপ হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল সুধাকর। অরুণাকে কিছু বলবে কি না ভাবল। এক ধরনের বিমর্ষতা তা'কে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল। অরুণা, তোমার বোন বরুণা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে সন্দেহ না করো, ওকে উপেক্ষা কর না। ছেলেমানুষী করার বয়স আমরা অনেকদিন আগে ফেলে এসেছি। এই কথাগুলি মনে মনে উচ্চারণ করল সুধাকর, বলা প্রয়োজন মনে করল। কিন্তু, মুখ ফুটে বলতে পারল না।

সুধাকর, নীরব দেখে অরুণা অপ্রসন্ন হল। সব সময় মানুষের মেজাজ ভাল থাকে না, বেফসকা দু' চারটে কথা মুখ থেকে বেরিয়েই পড়ে। তা বলে তুমি অগ্রাহ্য করবে, হেনস্থার ভাব দেখাবে, তাই বা কেমন কথা!

বিভ্রান্ত সুধাকর আস্তে হেঁটে গিয়ে চেয়ার টেনে বসল। কতো বেলা এখন? ঘর থেকে বেরুবার সময় দেখেছিল সাড়ে দাতটা। যাই হোক, সুধাকর ব্যস্ত বোধ করল না।

অরুণা দাঁড়িয়েছিল। বরুণার চোখ নিচু। আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে যাবার উপক্রম করল অরুণা।

'যাচ্ছ কোথায়?'

'কেন?' যেতে যেতে ফিরে দাঁড়াল অরুণা। তাকাল 'কি বলবে তাড়াতাড়ি বল। আমার কাজ আছে।'

'এত কাজ কি তোমার!' সুধাকর সিগারেট ধরাল; অসহিষ্ণুর মতো। 'ক'লকাতার কাজ, এখানেও কাজ! দু' দণ্ড বসলে কোন রাজ্যপাট যাবে!'

'আর তোমার কাজ নেই, তাই বলছ!' রুক্ষ গলায় বলল অরুণা, 'আমি আর কোনদিন হাত ছেড়ে বসে থেকেছি!'

অরুণা আর দাঁড়াল না।

সুধাকরের ভাল লাগল না। আজকের সকালটা ছিল সুন্দর, যত রোদ তত হাওয়া, বৃষ্টির জলে ভেজা সজীব তৃণ ও গাছ, পাতার মোলায়েম গন্ধ থেকে থেকে সুড়সুড়ি দিয়ে যাচ্ছিল নাকে; সুধাকরের মনে ক্রমশ একটা শীতল আমেজ গড়ে উঠছিল। অরুণা যেন সব গণ্ডগোল করে দিয়ে গেল। বস্তুত, সুধাকর অনুভব করছিল, দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের কোথায় যেন এক অদৃশ্য ফাটল ধরেছে, সে অনুভব করে অথচ স্পর্শ করতে পারে না—কবে, কোন মুহূর্তে বা কোন প্রশ্নে এর সূচনা বোঝা যায় না, কিন্তু ধরা ছোঁয়ার বাইরে এই ব্যবধানের চেয়ে বড় সত্য আজ আর কিছুই নেই। এই মুহূর্তে ব্যাপারটা চিন্তা করে ক্ষুব্ধ হল সুধাকর। ধোঁয়ার গলার কাছে নিশ্বাস কুণ্ডলীকৃত হতে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। এতক্ষণে তার খেয়াল হল বরুণা দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

'খুকু, এখানে এসো।' গলার স্বরটা সম্ভব স্নেহের টান এনে সুধাকর বলল, 'খুঁজে দেখ, আমার মাথায় আর ক'টা চুল পেকেছে।'

'আহা আপনি যেন কতো বুড়ো।'

বরুণা কাছে এল। কানের পাশে সুধাকর ওর নরম হালকা স্পর্শ পেল। বরুণা খুঁজছে, ঘন চুলের ভিতর দিয়ে বরুণার আঙুল ওর চাঁদির ওপর নখের মৃদু আঁচড় কাটছে। সুধাকর একটা গন্ধ পাচ্ছিল, নতুন ধানের গন্ধের মতো রহস্যময়, যে-গন্ধে নিশ্বাস জুড়িয়ে আসে।

'জামাইবাবু, সেই গল্পটা আপনি কিনিশ করেন নি।'

'কোনটা?' সুধাকর অবাক ভাব দেখাল।

'কাল ইভ্‌নিংয়ে যেটা বলছিলেন। সেই যে, আপনাদের রোমান্স'···

'ও হ্যাঁ,' সুধাকর স্মরণ করতে পারল, 'কতোটা বলেছিলাম?'

'সেই যে দিদিকে সাইকেলে বসিয়ে ময়দানে ঘুরছিলেন আপনি।'···

'দাঁড়াও, ভেবে দেখি।'

চোখ বন্ধ করে কাল কতোটা বলেছি, কি বলেছি মনে করার চেষ্টা করল সুধাকর। আবছাভাবে তার কিছু কিছু মনে পড়ছিল; পুরো ঘটনা, অর্থাৎ তার আগে ও পরে কি ঘটেছিল ঠিক স্মরণ হচ্ছিল না। একবার সুধাকরের মনে হল, তখন বর্ষা কাল, বৃষ্টি পড়ছিল অঝোরে, ঘন মেঘ বজ্রের সঙ্গে মিশে আকাশ তোলপাড় করে ফিরছে, নির্জন প্রান্তরে অরুণাকে নিয়ে দ্রুত সাইকেল ছুটিয়ে চলেছে সে। পর মুহূর্তেই ভাবল সুধাকর, যে-টুকু মনে পড়ে, এ-রকম তীক্ষ্ণ পালায়নের কোন ছবি তার স্মৃতিতে নেই। তা'হলে কি তখন শীতের সময়, না কি বসন্ত! সময়টা সকাল না বিকেল, স্পষ্ট মনে করতে পারছিল না সুধাকর। বরুণার মুখটা এই মুহূর্তে তার কাছে কেমন হেঁয়ালির মতো মনে হল।

সুধাকর অত্যন্ত বিমূঢ় বোধ করছিল। এটা ঠিক, ঘটনাটা সে বানিয়ে বলে নি। বরুণাকে জিজ্ঞাসা করলে সে হয় তো আগের ঘটনা, সুধাকর যে-রকম বর্ণনা করেছে, ঠিক ঠিক বলে দিতে পারবে। কিন্তু, সে বড় লজ্জার ব্যাপার।

অসহায়ের মতো খানিক আচ্ছন্ন হবার চেষ্টা করল সুধাকর। ঈষৎ ঘাড় ঘুরিয়ে বরুণাকে দেখল। বরুণার আঙুল তখনো ওর চুলে; পিঠের কাছে ঘন হয়ে থাকায় সুধাকর ওর বাহুর খানিকটা ধূসর কাপড় ও ধরেরি ব্লাউজের কিয়দংশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না।

গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলে সুধাকর বলল, কিছু বা ক্লান্ত গলায়, 'খুকু, তোমাকে আমি পুরোটাই বলব। এখন নয়, পরে।'

দুপুরে খাবার পর ঘুমের জড়তা নামল সুধাকরের চোখে। মনের ভিতর একটা পীড়ন ছিল; সকালের ঘটনা, ভুলে-যাওয়া গল্পটা সারাক্ষণ মনে করার চেষ্টা করছিল সে। বিছানার ও'রে অস্বস্তিতে কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করল, একাগ্র হবার চেষ্টা করল। পারল না। যেন তার চোখের সামনে কেউ একটা মুণ্ডহীন ধড় মেলে ধরেছে, ভাখো, একে চিনতে পার কিনা; এ তোমার পরিচিত, হাত পা সমগ্র অবয়ব খুঁটিয়ে ভাখো, চিনতে পার কিনা।

জানালার পাশে টুলের ওপর বসে অরুণা উল বুনছে। যে-কোন শব্দেই ও মুখ তুলে বাইরে তাকিয়ে দেখছিল। দু'জনে অনেকক্ষণ কাছাকাছি আছে। এর মধ্যে শুধু একবার প্রশ্ন করেছিল অরুণা, 'আমরা কবে ফিরছি?' ওর কথার অর্থ ঠিক ধরতে না পেরে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল সুধাকর, 'কেন?'

'জানি না' একটু ভেবে অরুণা বলল 'এই জায়গা বড় অসহ্য লাগছে।'

সুধাকর অরুণাকে দেখল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে; অরুণাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করবে কিনা ভাবল। অরুণার হয়তো সবই মনে আছে, অরুণা হয়তো বলতে পারবে।

'অরুণা···।' নিকটতম গলায় ডাকল সুধাকর।

নিচু হয়ে পায়ের পাতা ঢেকে নিল অরুণা, শাড়িটা নামিয়ে দেখল সুধাকরকে।

'তোমার মনে পড়ে, অনেকদিন আগে একদিন তোমাকে সাইকেলে চড়িয়ে ঘুরিয়েছিলাম।'

'কবে!' অরুণার স্বরে বিস্ময় ফুটল, কাঁটা তুলে ঘাড়ের কাছে গুঁজিয়ে নিল। হাই তুলে হাত চাপা দিল ঠোঁটে।

'আমার মনে নেই। হঠাৎ বলছ যে!'

'তোমার কিছুই মনে থাকে না। বারো কি পনের বছর আগের কথা, তাও না! কি মন! হোপলেস্! লোকে গত জন্মের কথা মনে রাখে!'

'অযথা আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন!' অরুণা বিরক্ত; 'কখন তোমার প্রাণ উথলে উঠবে, আমাকে কি সে-জন্য তৈরী থাকতে হবে! আমার কিছুই মনে নেই…'

'তা থাকবে কেন! তোমার মন কোথায় থাকে আমি জানি।'

ইতরের মতো কথা বলো না। তোমাকে আমি চিনেছি।

'কি বললে! আমি ইতর! তুমি কি, তুমি একটা…'

' একটু আস্তে—। তোমার সম্ভ্রমবোধ না থাকতে পারে, আমার আছে। ওরা শুনতে পাবে।' উত্তেজনায় ঠোঁট কাঁপছিল অরুণার। 'এই তামাশা আর ভাল লাগে না।'

' 'ভাল না লাগলে ছেড়ে দিলেই পার। কেউ তোমার আটকে রাখে নি!'

' 'জানি, তাহ'লে তুমি বেঁচে যাও।' অরুণা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অরুণা চলে যেতে সুধাকর কুণ্ঠা বোধ করল। এভাবে কথাটা বলা উচিত হয় নি। অরুণার দোষ কি! অরুণা কি করবে! অথচ, একই সময়ে সুধাকর এটাও বুঝতে পারছিল, কথাটা সে এভাবে বলতে চায়নি, হঠাৎ বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। আজকাল প্রায়ই এমন হয়, নিজের ওপর কোন অধিকার থাকে না। অসহায়তার ভিতর পূর্বাপর অনেক কথা মনে পড়ল সুধাকরের। এতদিন তেমন করে ভাবে নি, আজ মনে হয় অরুণা চলে গেছে দূরে, এই দূরত্ব থেকে তার নাগাল পাওয়া কঠিন।

আলস্যে হাই তুলল সুধাকর। চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে শুল। এখন তার কিছুই করার নেই। অরুণা নিশ্চয় পাশের ঘরে গেছে। ওখানে বরুণা আছে, ওদের মা আছেন। বিকেলে পাঠকবাবুর গাড়ি নিয়ে আসবার কথা। সুধাকরের স্নায়ুগুলি ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়ছিল। আচ্ছন্নতার মধ্যে সুধাকর বরুণাকে হাসতে শুনল; তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল সুধাকর। স্বপ্নের ভিতর টুলটুলকে দেখল—সে, টুলটুল আর অরুণা ফুটপাথ ধরে হাঁটছে। তারপরেই হঠাৎ কালিয়াংয়ের পাহাড়ী পথে টুলটুলকে দৌড়তে দেখল। টুলটুল ছুটছিল, সুধাকর দেখছিল; হঠাৎ একটা বিশ্রী তারস্বর চীৎকার শুনল সুধাকর! ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙার পরেও পরিষ্কার স্বপ্নটা মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারল সুধাকর এবং নিজের সাফল্যে, পুরোপুরি স্বপ্নটাকে ধরে রাখতে পেরেছে ভেবে খুশি হল। কিন্তু, দু' দণ্ড পরেই নতুন চিন্তা এসে বিঁধল তাকে। স্বপ্নের ভিতর, মনে পড়ে, সে একটা চীৎকার শুনেছিল। কার চীৎকার! টুলটুলের! নাকি অরুণার! ভীত, বিহ্বল সুধাকরের সহসা মনে হল, অসম্ভব নয়, চীৎকারটা তার নিজেরও হতে পারে।

সুধাকর এতই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকতেও অস্বস্তি হচ্ছিল তার। কেমন শ্বাসকষ্টের মতো ব্যাপার, এই অস্বস্তিকে বিশ্লেষণ করা যায় না। মাথার ওপর পাখাটা ফুল করা আছে, তবু উঠে বসার পর নিঃশ্বাস নেবার জন্য হাঁ করতে হল সুধাকরকে। এইভাবে তার নাভির তল থেকে বুক হয়ে কোলাহল করতে করতে বাতাস উঠে এল, মুখে লোনা গন্ধ টের পেল; গন্ধটা স্বাস্থ্যকর নয়। সুধাকরের মনে হল, অনেকদিন আগে—সাত, আট বছর হবে, এপেণ্ডিসাইটিস অপারেশনের পর তাকে কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল, শেষবারের মতো তখনই এই বিস্বাদ, কটু গন্ধের অস্তিত্ব টের পেয়েছিল সে। টুলটুল তখন অনেক ছোট। ছেলে সামলিয়ে ক্লান্ত

অরুণা আসত বিকেল শেষ করে, কোনদিন বা দেখার সময় পেরিয়ে যেত। একা হাসপাতালে খুব অসহায় ও নিঃসঙ্গ বোধ করত সুধাকর। সঙ্গ-লোভে অসহনীয় হয়ে উঠলে যন্ত্রণা শুরু হত পেটে, আর, তখন, এই গন্ধটা উঠে আসত মুখে।

বিছানা থেকে নেমে বাইরে এল সুধাকর। বারান্দায়। তখনো তার চোখে ঘুম, মুখে ঘাম। স্বপ্নটা তখনো ঘুরছিল মাথার ভিতর। কখনো সে টুলটুলকে ধরতে চাইছিল, কখনো অরুণাকে, কখনো নিজেকে।

পড়ন্ত বেলা। এমনও হতে পারে রৌদ্রে ছায়া মিশে আকাশটাকে বিষণ্ণ ও বৈকালিক করে তুলেছে। দূরের শালবীথির পাশে কোনাকুনি এবড়ো খেবড়ো পথে কয়েকজন হাটুরে আপন মনে পথ হাঁটছে।

'অরুণা···', সুধাকর হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাকল। সেই শব্দে দূর থেকে দূরগামী হাটুরের দল চকিতে থেমে দাঁড়াল, মুহূর্তের জন্য পিছনে তাকিয়ে দেখল। তারপর যতোদূর চোখ যায় সুধাকর দেখল দীর্ঘ গাছ ও টিলার বাঁকে লোকগুলি কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সুধাকরের মাথায় কেমন এক রোখ চেপে গেল হঠাৎ। সহসা ভয় পেলে মানুষের চোখে মুখে যেমন এক আর্তভাব ফুটে ওঠে, এখন ওর মুখের চেহারা তেমনি। বেলাও টান টান করে ও বাগানের নিবিকার ফুলগুলির দিকে তাকাল; হাতের মুঠো শক্ত হল। যেন এইভাবে মনে যথাসাধ্য সাহস এনে অনন্ত আকাশ, দূর প্রান্তর ও পরিব্যাপ্ত নীরব চরাচরের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা করছিল সুধাকর। এইভাবেই নৈঃশব্দ্যের মুখোমুখি হল সে। গলায় থুথু গিলে আবার চেঁচিয়ে ডাকল: 'অরুণা ··অরুণা···'

'যাই—ই—ই—' শব্দটা ধাতব, ভাঙাচোরা, দুরাগত অনেকটা সেই স্বপ্নের ভিতর শ্রুত ধ্বনির মতো। বারেক ধরা দিয়েই সুধাকরের চেতনার মধ্যে হারিয়ে গেল আবার।

'জামাইবাবু!'

সুধাকর কিছুটা আচ্ছন্ন ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সামনে হঠাৎ বরুণাকে দেখে ও লজ্জিত হল, কুণ্ঠিতভাবে হাসল।

'দিদি বাথরুমে।'

'অমন চীৎকার করে উঠলেন কেন! ·উঃ, ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম! ···কি হয়েছিল?'

বিব্রতভাবে হাসল সুধাকর। বরুণাকে দেখল।

'কিছু না। কিছু হয় নি তো।'

গলার স্বরের কৃত্রিমতায় নিজের কাছেই ধরা পড়ে গেল সুধাকর।

সুধাকর নিজেই ষ্টিয়ারিং ধরল। গাড়িতে উঠে বরুণাকে ডাকল, 'খুকু, তুমি সামনে এসো। আমার পাশে।'

গাড়িটা ছোট। পাঠকও সামনে বসেছে। বরুণা একবার পাঠককে দেখল, তারপর দিদিকে। অরুণা অন্যমনস্ক, বাইরে মুখ করে বসে আছে। তারা ছাড়াও এ-গাড়িতে একজন মহিলা আছে, নিতান্ত ভদ্রতা করেও তার সঙ্গে দু' চারটে কথা বলা উচিত, অরুণা যেন তা খেয়াল করে নি। অরুণাকে দেখে এই প্রথম মনে হল বরুণার, দিদি কেমন অখুশি ও বিরক্ত, অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুধু সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে।

গাড়ির দরজা খুলে উঠতে উঠতে বরুণা বলল, 'জামাইবাবু, আপনার অসুবিধে হবে না তো?'

'না, মোটেই না।' সুধাকর সরে গিয়ে বরুণাকে বসার জায়গা করে দিল। গিয়ার চার্জ করে বলল, 'তুমি হলে আমার স্টেপনি। তোমার ভরসাতেই তো যাওয়া।'

সুধাকরের কথা শুনে সশব্দে হেসে উঠল পাঠক। বরুণা অসহায়ভাবে তাকাল সুধাকরের দিকে। চালু পথে গাড়িটা প্রায় গড়িয়ে চলল। তারপর সমতল। সুধাকর বাঁ দিকে বাঁক নিল। দু'পাশে দীর্ঘ গাছের সারি, উঁচু নিচু জমি, সমতলের পথও সহজ নয়। ইতস্তত ছড়ানো পাথরের টুকরোয় ধাক্কা খেয়ে গাড়িটা মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছিল।

'আই কুড'নট হ'লো···', পুরনো কথার জের টানল বরুণা, 'জামাইবাবু, আপনি কি বললেন! স্টেপনি কি?'

'স্টেপনি বোধ হয়!' শব্দ করে হাসল সুধাকর। 'পাঠকবাবু, আপনার গাড়িতে স্টেপনি আছে তো? নাকি চার চাকাই ভরসা?'

'যা বলেছেন, স্যার, চার চাকাই ভরসা। আমার কপালে ওসব জোটেনি।' নিজের রসিকতায় মুগ্ধ পাঠক খানিক মোটা গলায় হেসে নিল। হাসির শব্দ মিলিয়ে যেতে, নৈঃশব্দের মধ্যে সুধাকরের মনে হল, ছায়ার ঘন আকাশ ক্রমশ নিচু হয়ে আসছে। না কি মেঘ? বলা যায় না। এখানে কখন কি হয়, হওয়ার চাল কখন কোনদিকে, অনুমান করা কঠিন। সুধাকর অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। আবার চালু পথ, অল্প খাড়াই থেকে থেকে হার্ডল সৃষ্টি করছে। মেঘ আছে কি না দেখার জন্য চোখ তুলল সুধাকর।

অরুণা দেখল সুধাকর অন্যমনস্ক; বাকি সবাই চুপচাপ, এমন কি বরুণাও। গাড়িটা ঝোঁকের মাথায় নেমে চলেছে। এতক্ষণ ওরা কি কথা বলছিল, কেন হাসছিল, ওদের হঠাৎ তামাশার কিছু মনে আছে কি না স্মরণ করার চেষ্টা করল অরুণা। মনে পড়ে না। তাহলে কি সারাক্ষণ, এই সারাটা পথ সে অন্যমনস্ক ছিল।

গাড়ির ঝাঁকুনি ও সম্মুখের শূন্যতায় বরুণা অলস বোধ করছিল। সুধাকরের পেশির চাপ তার কাঁধের ডান দিকে অনেকটা অংশ অবশ ও শিথিল করে দিয়েছে, অনুভূতির মধ্যে দূরের অবসাদের ভাব ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ। ছোট হাই তুলল বরুণা। সীটের পিছনে মাথাটা হেলিয়ে দেবার আগে ও পিছন ফিরে অরুণাকে দেখল। দিদি, তুই এত চুপ কেন? বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে পারল না। সামনের দিকে তাকিয়ে ভীত, আর্ত একটা চীৎকার বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে।

চকিতে গাড়িটা এক পাশে কাত করে, চূড়ান্ত চেষ্টায় ব্রেক কষে থামিয়ে ফেলল সুধাকর। উত্তেজনায় তখনো ভার নিঃশ্বাস দ্রুত। সামনে চড়াই। আনোয়ারটা সিং হুমড়ি খেয়ে ছুটতে ছুটতে প্রায় অর্ধেক উঠে এসেছিল, চড়াই বলেই আগে বোঝা যায় নি; ক' মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল, গাড়িটা দেখল। তারপরেই বিরাট অবয়ব নিয়ে নিমেষে পিছন ফিরে উধাও হল।

'কি ভাবে চালাও! মারবে না কি!'

স্ত্রীর কথায় আমল না দিয়ে আবার গাড়ি স্টার্ট করল সুধাকর। উত্তেজনা কমে আসার পুরনো ঘাম জমে উঠল কপালে।

'এত সুন্দর তুমি!'

'নিজের কথা বলি নি।' অরুণার কণ্ঠ সম্মোহিত ও আর্দ্র। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'নিজের জন্যে আর ভাবি না।'

সুধাকর কথা বাড়াল না। এতক্ষণে তার হুঁশ লাগছিল নিজেকে।

কিছুক্ষণ কাটল। দু'পাশের বনানী ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। সম্মুখের পথও আর তেমন প্রশস্ত নয়।

'স্যার, আজ আর দুর্গা দেখা হবে না। বরং বাঁ দিকে চলুন।' পাঠক বলল, 'কাছাকাছি একটা পাহাড়ী কর্ণা আছে! সাইট ভাল, টিলার ওপর থেকে দেখা যায়।'

'কতো দূর এখান থেকে?'

'কাছেই।' মুখ বাড়িয়ে আকাশ দেখল পাঠক। 'মেঘ করছে, হয়তো বৃষ্টি হবে। ঘুরে গিয়ে কাজ নেই।'

সুধাকর জবাব দিল না। অরুণা কি বলল এবং যা বলল, কেন বলল, অনুভবে ধরার চেষ্টা করল সে। কথার ধরনেই বোঝা যায় অরুণা নিশ্চিত কিছু 'মীন' করেছে। সুধাকরের মুহূর্তের ত্রুটি ও অন্যমনস্কতা হেতু যদি তেমন কোন অঘটন ঘটত, যার ফল হত অনিবার্য ও ভয়াবহ; অরুণা যেন বুঝিয়ে দিল সে-রকম কিছুর জন্যও সে তৈরী; তার কোন ভাবনা নেই। অরুণা কি তার জন্য ভাবিত, বা বরুণার জন্য! বোঝা যায় না, কিছুই বোঝা যায় না।

মনের এই অনিশ্চিত অবস্থায় সুধাকরের হঠাৎ সেই বিস্মৃত গল্পটির কথা মনে পড়ল। বরুণা সেই ঘটনার শেষ শুনতে চাইবে! তখন কি বলবে সুধাকর, কি বলতে পারে বরুণাকে।

'ব্যাস, এইখানে।'

প্রান্তরের ওপর দিয়ে খানিকটা ছুটে গিয়ে গাড়ি থামল।

'স্যার, আপনি যেন কেমন আনমাইওফুল হয়ে গেছেন।' আক্ষেপ করল পাঠক, 'এতটা রাস্তা এলেন, কিছুই তাকিয়ে দেখলেন না!'

'দেখেছি তো।' গাড়ি থেকে নেমে সিগারেট ধরালো সুধাকর। প্যাকেটটা এগিয়ে দিল পাঠকের হাতে। 'চমৎকার জায়গা, ফুল অফ ন্যাচারাল বিউটি! থেকে যেতে ইচ্ছে করে।'

চতুর্দিকে তাকিয়ে অনতিদূরে পাহাড়ের সারি দেখল সুধাকর। হয়তো পাহাড় নয়, ওগুলো সত্যিই টিলা—দূরে থাকার জন্য পাহাড় বলে ভ্রম হয়। আকাশ ঘন হয়ে আসছিল; ম্লান সূর্যালোক দিনের শেষে পৌঁছে শেষবারের মতো প্রকৃতি ও চরাচরের ওপর চোখ বুলিয়ে দিচ্ছে। আকাশের ভাবগতি ভাল নয়; সুধাকরের মনে হল যে-কোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে।

'ঝর্ণাটা কোথায়, মশাই? টিলার কাছে নাকি?'

'উঠলে দেখা যাবে। খাড়াই তেমন নয়।' পাঠক বলল, 'কেন, শব্দ শুনছেন না?'

সুধাকর কান পাতল; সত্যিই জল পড়ার কোন শব্দ শোনা যায় কিনা অনুধাবনের চেষ্টা করল। অপরাহ্নের বাতাস তার শ্রবনে বাধা দিচ্ছিল। সুধাকর বলল, কই না!'

'জামাইবাবু, আমি কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।' সামনে হাঁটতে হাঁটতে বরুণা বলল, 'আপনি বোধ হয় কালা হয়ে গেছেন।'

'তোমার দিদি বলে বধির।' সুধাকর হাসল। 'আমি নাকি অন্ধ; তাকে দেখি না, তার কথা শুনতে পাইনা! কিন্তু জলের শব্দ শুনতে পাব না এ কেমন কথা!'

অরুণা কিছুটা পেছিয়ে পাঠকের বউয়ের সঙ্গে সঙ্গে আসছে। সুধাকর অল্প দাঁড়াল, অরুণার জন্য অপেক্ষা করল। অরুণা কাছে এলে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছো, অরুণা? ঝর্ণার শব্দ?'

অরুণা এমন মুখ ভঙ্গী করল যাতে মনে হবে সুধাকর গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিজ্ঞাসা করছে, জবাব দেওয়াটা জরুরী। কান খাড়া করে শুনল অরুণা, সময় নিল। তারপর ঘাড় নাড়ল, যার অর্থ, 'না'।

ওরা পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পড়ল। দূর থেকে যা মনে হয়েছিল কাছে এলে সুধাকর বুঝল তা নয়, এটা পাহাড়ই, রীতিমতো উঁচু। একটা নয়, পর পর প্রায় সমান মাথা অনেকগুলো পাহাড় যেন পাঁচিল হয়ে রুক্ষ প্রান্তরকে আগলে রেখেছে।

'আপনারা উঠুন।' পাঠক বলল, 'আমরা আগেই দেখেছি, আর উঠব না।'

'আচ্ছা।'

বরুণা হঠাৎ ঘোড় দিল। পাহাড়ের ওপর দু'তিন ধাপ উঠে গিয়ে ডাকল, 'জামাইবাবু, আসুন।'

'এসো, অরুণা।' পিছন ফিরে সস্নেহে স্ত্রীকে ডাকল সুধাকর, 'পারবে না উঠতে?'

'দেখি।' শান্ত গলায় জবাব দিল অরুণা, 'তুমি ওঠো, সাবধানে। খুব ধাপাধাপি করছে ভয় লাগে।'

অরুণার কণ্ঠস্বরের উদ্বেগ সুধাকরকে স্পর্শ করল। এক ধরনের আবেগে ওর গলা বুঁজে এল। সামনে তাকিয়ে দেখল বরুণা উঠে যাচ্ছে, খেলাচ্ছলে, কালো পাথরের ওপর ওর অসম্ভব সাদা দু'টি পায়ের পাতায়, দুঃসাহসিক চাঞ্চল্য, যেন যমজ খরগোস আপন মনে খেলছে, ছুটছে। বরুণা হোঁচট খেল, পড়তে পড়তে সামলে নিল। পিছনে তাকাল সুধাকর। অরুণার দৃষ্টি নত, ও ওপরে কিছু দেখছে না, প্রতিটি পাথরের বাঁক লক্ষ্য করছে, হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে পরখ করে নিচ্ছে, যেন প্রতি পদক্ষেপে ওর জন্য দুর্বিপাক লুকানো। সুধাকর স্ত্রীর জন্য করুণা অনুভব করল, অপেক্ষা করবে কিনা ভাবল। ওপরে তাকিয়ে দেখল বরুণা অনেকটা উঠে গেছে। বরুণা ও তার মধ্যে, তার ও অরুণার মধ্যে দূরত্ব প্রায় সমান।

'খুকু...' হাত দুটো মুখের কাছে চোঙার মতো করে ধরে চেঁচিয়ে বলল সুধাকর, 'তুমি বড় তাড়াতাড়ি উঠছো। পড়ে যেও না।'

'ইস, ভয় দেখাবেন না।' খুশির চাঞ্চল্য বরুণার কণ্ঠে, থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'এ আপনার সাবজেক্ট নয়, জামাইবাবু; ঘটানী নয়। দেখুন, কি নিরেট সবকিছু, শুধু পাথর আর মাটি। একটা ঘাস নেই!'

কথা শেষ না হতেই বরুণার যেন হঠাৎ চোখ পড়ল অরুণার ওপর। দেখল। তারপর বলল, 'দিদি, তুইকি! তুই না স্পোর্টসে ফার্স্ট হতিস! তাড়াতাড়ি আয় না।'

বরুণার অবজ্ঞা অরুণার কানে পৌঁচেছে বলে মনে হল না। কোনক্রমে সুধাকরের কাছাকাছি উঠে এল ও। ওর কপালে, গলায়, মুখের ত্বকের সর্বত্র ঘাম, নিঃশ্বাস দ্রুত। সুধাকর হাত বাড়াল। যেন অরুণা ওর হাত ধরে উঠে আসে।

আকাশে ক্রমশ গোধূলির রঙ ধরছে। হু হু-করা বাতাস। নিচে, সমতলের দিকে তাকাতে অপেক্ষামান পাঠক হাত নেড়ে ইশারায় উঠে যেতে বলল। সুধাকর অনুমান করল তারা প্রায় অর্ধেক উঠে এসেছে; এখান থেকে পাঠকদের দেখায় শিশুর মতো। আরো দূরে ছায়া, ইষৎ আলো, যে-পথে এসেছিল সে-পথের কোন চিহ্নই আর দৃশ্যমান নয়।

'আমি আর পারব না', অরুণা বলল, 'আমি হাঁফিয়ে উঠেছি।'

'অরুণা, ওঠো! আমার সঙ্গে এসো।'

'তুমি আর কতো নিয়ে যাবে!' হতাশ ক্লান্ত গলায় বলল অরুণা, 'চেষ্টা তো করলাম, আ পারছি না।'

'কি যা তা বলছ!' সুধাকর স্ত্রীর হাত ধরল। 'আ একটু তো। তুমি নিশ্চয় পারবে।'

'না...'

আস্তে সুধাকরের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত ক অরুণা। ক্লান্ত চোখ তুলে স্বামীর মুখের দি তাকাল। তারপর বলল, 'আমি নামতে পারব। তু উঠে যাও।'

আঁচল তুলে কপালের ঘাম মুছল অরুণা। দু' মুহূর্ত। তারপর নামতে শুরু করল।

বুকের ভিতর হঠাৎ এক শূন্যতা অনুভব করল সুধাক অরুণা নেমে যাচ্ছে, ক'পলক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল নিঃশ্বাস ভারি হয়ে ওঠায় কিছুই চিন্তা করতে পারল না অসহনীয় অবসাদের ভারে কেঁপে উঠল হাঁটু দুটো ঘর্মাক্ত যে-হাতে অরুণার হাত ধরেছিল, সেই হ চোখের সামনে মেলে ধরল সুধাকর, কিছু দেখা যা পাগল যেমন পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে হঠাৎ নিজের কর-রে দেখে। এখানে নৈঃশব্দ্য বড় বেশি। সুধাকর নিজে উত্থান পতনের, গাঢ় নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি বুকের ভিতর যতটা সম্ভব হাওয়া টেনে চূড়া লক্ষ্য ক সোজা ওপরে উঠতে লাগল সুধাকর।

প্রেমের কবিতা

কিরণকুমার রায়

সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। তারপর কখন যে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি চলেছে, একটানা একঘেয়ে। অবুঝ অভিমানী মেয়ের মত আকাশের চোখ থেকে টিপটিপ জল ঝরছে তো পড়ছেই। মেঘের ফোকরটা সরিয়ে একটি বারের জন্যও কাঁচা-সোনা রোদালোকের হাসিমুখ উঁকি দেয়নি। অথচ লণ্ডনের এপ্রিল মাস গড়িয়ে গড়িয়ে শেষ সপ্তাহে এসে পৌঁছেছে।

ভদ্রলোক সকাল থেকে সেই যে বই-এর ভঙ্গাল আর লেখা-পত্র নিয়ে একমনে লিখতে শুরু করেছেন, একটি বারের জন্যও মাথা তোলেন নি। খসখস কলম চলছে, তাঁর মুখে একাগ্রতার নিখুঁত চেহারা। ক্যানি একবার এসেউঁকি দিয়ে গিয়েছিল, কাঁচের শার্সির সামনে দাঁড়িয়ে পেছনও করল কয়েকবার, অন্যমনস্ক মন নিয়ে তাকিয়ে থাকল বৃষ্টিভেজা গাছপালার পাতায় বিম্বিম জলবিন্দুর নাচন। কিন্তু ভদ্রলোকের নজর পড়ল না।

আঠারো বসন্তের জোয়ারে ক্যানির দেহ যৌবনে টুইটুম্বুর। মাথায় সোনালি ঝাকড়া চুলের ঝাড়, চোখের কোণে কিকিমিকি কৌতুক আর কৌতূহল। সদা চঞ্চল, সদা সপ্রতিভ। কিন্তু ভদ্রলোক গম্ভীর, বিষণ্ণ, সবসময়ই যেন চিন্তায় মগ্ন। অন্য সবার থেকে একেবারে আলাদা। ভদ্রলোকের বন্ধু মিঃ ব্রাউন, কেমন হাসিখুশি, নাচতে ভালবাসেন, আড্ডা জমিয়ে গল্প করতে জানেন, পার্টিতে নেচে ছন্দে মেতে উৎসুক। ব্রাউনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে ক্যানির খুশি। যেখানে যেতে চাও ব্রাউন নিয়ে যাবেন; যত খুশী আড্ডা মারতে চাও, নাচের ক্লাবে যত ইচ্ছে দেরি করতে চাও ব্রাউন কখনো বিরক্ত হবেন না। কখনো তাড়া দেবেন না। অথচ এই ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের নাম জন কীটস্, কবিতা লেখেন, সম্প্রতি এঁর কবিতার বই ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। একজন বলেন বাঃ সুন্দর কবিতা, আবার অন্যজন বলেন কবিতা না ছাই ভস্ম, ভদ্রলোক তো ব্রাউনের মত না, অন্য কোন চেনা লোকের মতও নন, না জানেন হাসতে, না জানেন কুসুম আড্ডা জমাতে, এমন কি নাচতে পর্যন্ত জানেন না।

অথচ ভদ্রলোকের চোখের তারায় কি যেন অদ্ভুত ভাষা আছে, যার মানে ঠিক বোঝে না ক্যানি, অথচ তাকে দারুন আকর্ষণ করে। ইচ্ছে হয় ভদ্রলোকের হাত ধরে টেনে সামনের বারান্দায় গিয়ে বসে, গোলাপ ফুলের সারির মধ্যে দিয়ে দু'জনে হাঁটে, হাঁটতে হাঁটতে গল্প করে দুজনে, গল্প করতে করতে হারিয়ে যায় অনেক দূরে।

কিন্তু ইচ্ছেটা বাস্তবে ঘটে না কোনদিন। কি আশ্চর্য! নির্নিমেষ চোখে তাকায় ভদ্রলোক ক্যানির দিকে, মনে হয় যেন মনের অন্তস্থল পর্যন্ত তাকিয়ে দেখে নিলেন। ক্যানির সারা শরীর শিউরে উঠে। কিন্তু পরক্ষণেই উবাস, কেমন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যান ভদ্রলোক।

অন্য পুরুষদের চোখেও আলো জেগে উঠতে দেখেছে ক্যানি, তারপর তারা আরও ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে, ওয়ালজের তালে তালে নাচের ছলে ক্যানির শরীরকে তারা আরো কাছে টেনেছে, আরো নিবিড় কাছে, গরম হাতের তাপ অনুভব করেছে ক্যানির হাত। সে দিন লণ্ডনের ক্লাবে নেভীর আধ-বুড়ো ক্যাপ্টেন নাচতে নাচতে ক্যানির শরীর নিয়ে জড়াজড়ি করতেই ব্যস্ত ছিল, ভাগ্যিস, হাসির ফুলঝুরি ছড়োড়ে সবাই বুড়োকে এমন তাড়া লাগিয়েছিল, নইলে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে যেতে পারত।

সকলের থেকে একেবারে আলাদা বলেই এমন আকর্ষণ আছে ভদ্রলোকের। তিনি যখন কথা বলেন, ক্যানির সমস্ত স্নায়ু সজাগ হয়ে থাকে, তিনি যখন কবিতা পড়ে শোনান, ক্যানির সমস্ত মনে শিরশির করে একটা আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। অথচ এই গোপন অনুভূতি

ব্যক্ত করতে জানে না ক্যানি। কীটসের মুগ্ধতা জেনেও তার আত্মার আকুলতা প্রকাশ করতে গিয়ে ক্যানি বারেবারেই বিপরীত ব্যবহার করে ফেলে।

আজ সারাদিনে একবারের জন্যও ভদ্রলোক মাথা তুলে তাকান নি। বিষণ্ণ অথচ গভীর দৃষ্টির সেই আশ্চর্য সুন্দর দু'টি চোখ, না, সে-চোখ আজ সারাদিন একবারের জন্যও ক্যানির চোখের সঙ্গে কথা বলে নি।

কিন্তু সে চোখ কি কখনো অকৃত্রিম ভাষায় কথা বলেছে ক্যানির সঙ্গে! হয়ত না। কত কথা তিনি বলেছেন, কত আবৃত্তি তিনি আবেগ ভরে শুনিয়েছেন হো হো করে হেসেছেন, মাঝে মাঝে অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে অনেক কিছুর প্রতিবাদ করেছেন। অথচ সুন্দর চোখের মায়ায় যে আশ্চর্য কথাটি গান হয়ে মন ছুঁতে চায়, তা কখনো অস্ফুট স্বরেও অর্থ-স্ফুটিত হয়নি।

'ক্যানি—'

চমকে তাকাল ক্যানি। কাচের শার্সি দিয়ে দেখা যায়, ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। চেয়ারটাকে সরালেন, এগিয়ে এসে দরজা খুললেন। কাল ক্রানেলের মাফলার জড়ান রয়েছে তাঁর গলায়, ওভারকোটটা মোটা পশমী স্যুট পরণে। একটু এলোমেলো চুল, পুরুষ চোয়ালে সামান্য ক্লান্তির পাণ্ডুরতা।

'ক্যানি, ওখানে কি করছ?'

একটু হাসল ক্যানি। বলল, 'বৃষ্টি ভিজছি।'

'দূর পাগল, ভেতরে এসো।'

'না।'

'শোনো, শোনো। ভেতরে এস—'

লাল গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়ে ক্যানি আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। ঘরের ভেতরে ঢুকে হাতার-প্লেসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা বন্ধ করে ভদ্রলোক বসলেন। বললেন, 'তোয়ালে দিয়ে চুল মুছে আগুনের কাছে বসো।'

'না।'

কিছুটা অবাক হলেন ভদ্রলোক।—'না কেন?'

'আমাকে এক্ষুণি চলে যেতে হবে। মা এখনও ফিরে এলেন না। আমার পোশাকটার না জানি কি হবে। ভারী মুস্কিল হল।'

'মুস্কিল আবার কি? আর না এলে কাল ঠিক পৌঁছে যাবে।'

'না, এ-পোশাকটা আমার আজই চাই, আমার সব চেয়ে সুন্দর পোশাক। জড়ির কাজ করান ইভিনিং সিল্কের ফ্রক।'

'তাতে কি? তোমার পোশাকের তো কমতি নেই।'

'ওসব আপনি বুঝবেন না। আজ সন্ধ্যায় লণ্ডনে যাচ্ছি, মস্ত পার্টি হচ্ছে। এই চমৎকার পোশাকটা না হলে পার্টিতে যাওয়াই বৃথা।'

'পার্টিতে তাহলে পোশাক দেখাতেই যাও?'

কথার জবাব দিল না ক্যানি। মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল তারপর চলে যাবার জন্য দরজার দিকে এগোল।

'কি হল?'

ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকাল ক্যানি। অভিমানে কালো হয়ে উঠেছে তার মুখ। আস্তে আস্তে বলল 'জানি, আপনি আমাকে খারাপ মেয়ে বলেই মনে করেন!'

'খারাপ?' ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে আহত বিস্ময়।

'হুঁ। আমি সব সময় ফ্যাসন নিয়েই মত্ত।'

এবার হাসলেন ভদ্রলোক। বললেন, 'জান, আমি ওসব ভাবি না। তবে পোশাক-টোশাক ছাড়াও জীবনে অনেক দামী জিনিস আছে বলে মনে করি।'

'আপনি বুঝতে পারছেন না, আজ আমাকে সবচেয়ে ভাল পোষাক পরে যেতেই হবে।'

'শুধু আজ কেন? আজ ব্রাউন সঙ্গে যাবে বলে ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে কৌতুক। কৌতুকের সঙ্গে ভদ্রলোকের চোখে তীক্ষ্ণতা ঝলসে উঠল, তাও দেখতে পেল ক্যানি।

একটু উচ্চকণ্ঠে ক্যানি বলল, 'দেখুন, বোকার মত কথা বলবেন না। মিঃ ব্রাউনের সঙ্গে আজ আমি নড়ছি না।'

'হুঁ। তাও বটে!'

'কেন, আপনি এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু দেখছেন ? পরিষ্কার করে বলুন।'

ভদ্রলোকের চোখে এবার রহস্যময় চেহারা স্পষ্ট হল। ঠোঁটের রেখায় বেদনার্ত হাসির অস্ফুট ভঙ্গী। বললেন, 'না না ক্যানি। তোমার সঙ্গে আমি কিছুতেই ঝগড়া করতে চাই না। বিশেষ করে, আজ তোমাকে সারাদিন দেখতেই পাই নি। একটা কথা বলবে ?'

'বলুন।'

'তুমি আমার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে থাক কেন ? আমি কি খুব খারাপ লোক ?'

চোক গিলল ক্যানি। চোখ নামিয়ে বলল, 'মা বলেছিলেন আপনার অসুখটা নাকি ছোঁয়াচে।'

'কি আশ্চর্য !'

'পরে অবশ্য মিঃ ব্রাউন বলেছেন, আপনার গলায় নালীতে একটু ঘা হয়েছে। আপনাকে যিনি চিকিৎসা করেন সেই ডাক্তারও মাকে বলেছেন।'

চুপচাপ ভদ্রলোক।

দ্রুতকণ্ঠে বলল ক্যানি, 'সকলেই বলেছেন, আপনার সেরে যাবে দু'দিনে সেরে যাবে।'

আবার সেই বিষণ্ণ ছায়া নামল ভদ্রলোকের চোখের তারায়। টেবিলে ছড়িয়ে থাকা কাগজগুলি থেকে কটা কাগজ তুলে কিছুক্ষণ আঙুল ঘষে আবার নামিয়ে রেখেছেন তিনি।

বললেন, 'জানি না কবে সারবে। তবে এই যে বেঁচে আছি, এই বেঁচে থাকাকে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করতে চাই।'

একটু থামলেন ভদ্রলোক। ক্যানি চোখের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'বিকেলে যখন সূর্য অস্ত যায়, আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি। নিস্তব্ধ রাত্রিতে সিংহের হেঁটিদেলের সুরেলা ডাক আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনি। ই ঘরে বসে কাচের শার্সি দিয়ে দেখি তোমার যাওয়া-সা। তোমাকে কখনো প্রজাপতির মত মনে হয়, যার কখনো মনে হয় সকাল বেলাকার মর্নিং গ্লোরি। মি যখন ঘোড়ার গাড়ি চেপে লণ্ডন যাও, তোমার খুশি মুখ ফ্রকের তলায় তোমার রেশমি পেটিকোটের উজ্জ্বল রঙ আমার সমস্ত অনুভূতিতে জোয়ারের ঢেউ তুলে দেয়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ক্যানি। তারপর বলল, 'কিন্তু এই প্রাণহীন বাড়িতে আস্তে আস্তে আপনি শুকিয়ে যাবেন—'

'না। যে বাড়িতে তুমি থাক, সে—বাড়ি আমার কাছে মোটেই প্রাণহীন নয়। জান, তুমি যখন মোজার্ট বাজাও, আমি কান পেতে শুনি, আমার মন কোথায় দূরে আনন্দলোকে ভেসে যায়। তবে আজকাল দেখছি তুমি হাল্কা নাচের সুরই বেশি বাজাচ্ছ—যেমন ওয়ালজ—'

ক্যানি এতক্ষণ আগুনের পাশে নিচু চেয়ারটায় বসেছিল। তার পোশাক শুকিয়ে গেছে। চুলের ফাঁকে ফাঁকে জমান জলবিন্দু উড়ে গেছে। সে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'কিন্তু ওয়ালজ খারাপ সুর আপনাকে কে বলল ? চমৎকার হলঘরে ওয়ালজের সুরে পা মিলিয়ে মিলিয়ে নাচতে থাকার সুখ তো আপনি জানেন না। তাই বলতে পারলেন।'

'নাচ তোমার খুব পছন্দ, না ?'

'হুঁ। আপনি নাচ ভালবাসেন না ?'

'আমি নাচতে জানি না। তবে শেখালে শিখতে পারব।'

ক্যানি হাসল। বলল, 'আমি নাচ শেখাই না।'

ভদ্রলোকও হাসলেন। বললেন, 'তাও জানি। তুমি ক্লার্টিং ছাড়া অন্যকিছু শেখাও না।'

'কী বললেন ? আমি ক্লার্ট গার্ল ?'

এবারও হাসলেন ভদ্রলোক। বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করো। আমি ভেবেছিলাম, আধুনিক তরুণীদের এও একটি শিক্ষার অঙ্গ।'

'আপনি মেয়েদের সম্পর্কে এত অল্প জেনে কিভাবে কবি বলে নিজেকে প্রচার করেন ! কবিতা লেখেনই বা কিভাবে !'

'আজ সারাদিন আমি শুধু কবিতাই লিখেছি।'

'দেখেছি। শুধু লেখা, লেখা আর লেখা। জীবন

উপভোগ করলেন না কখনো অথচ প্রেমের কবিতা লেখেন। আমার কাছে ভারী অবাক লাগে।'

ভদ্রলোক অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন ক্যানির দিকে। বললেন, 'আজ একটা প্রেমের কবিতা লিখেছি। শুনবে? প্রিয়াকে নাচের আসরে না যাওয়ার জন্য অনুনয় করছে প্রেমিক—

To night if I may guess, thy beauty wears
A smile of such delight,
As brilliant and as bright
As when with ravished aching Vassel eyes
Lost in a soft maze
I gaze, I gaze!

যখন প্রেমিকের অনুপস্থিতিতে অনেক পুরুষ সেই প্রেমিকাকে ঘিরে থাকবে তখন প্রেমিকের ভাবনা—

Who now with greedy looks, eats up my feast?
What stare outfaces now my silver moon?
Ah! Keep that hand unravished at the least;
Let, let the amorous burn
But pry thee, do not turn
The current of your heart from me so soon.
O! Save in charity
The quickest pulse for me!"

কবিতা শেষ না করেই ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন ক্যানির কাছে। আচমকা গাঢ় চুমো খেলেন ক্যানির ঠোঁটে। দীর্ঘ তপ্ত উন্মত্ত চুমো। চুমোর পর চুমোর মুক্তাধারা বৃষ্টি।

লাজিতা সর্পিনীর মত রোষে সরে গেল ক্যানি। গর্জে উঠল, 'আপনি আমাকে কি ভেবেছেন? অপমান করতেও সাহস পান, অ্যাঁ?'

'অপমান? না না, তোমাকে অপমান করা আমার পক্ষে অসম্ভব। শোনো, শোনো, ক্যানি, লক্ষ্মীটি, যেও না—'

কিন্তু ক্যানি আর একমুহূর্তও দাঁড়াল না। দরজা খুলে কোনদিকে না তাকিয়ে বেরো বারান্দা পেরিয়ে দ্রুত চলে গেল। কি আশ্চর্য, ভদ্রলোক দেখলেন, এতক্ষণ পর ইলেশগড়ি বৃষ্টি থেমেছে। পামগাছের অশ্রুসিক্ত পাতায় রোদ্দুরে আলো লুটিয়ে পড়ে হাসছে। স্বপ্ন স্বপ্ন কলা বনের ভিড় সরে গিয়ে সাদা মেঘের বলাকা ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে।

জানালা থেকে সরে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন ভদ্রলোক। বাথরোবটা খুলে ভাঁজ করে গলায় বাঁধলেন গরম পোশাকের ভেতরে শরীরটা পুরো ঢাকা, অথচ আর যেন শীতের কাঁপুনি হাড়ে-মাংসে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ঘরের সবগুলো জানালা বন্ধ, রুমহিটার-প্রেসে আগুন আজ একমুহূর্তের জন্যও নেভানো হয়নি। তবু শীত যেন সর্বক্ষণই কামড় বসিয়ে রয়েছে। তার সঙ্গে দেহের প্রতিটি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ক্লান্তি আর অবসাদের মৃত্যুসাপ যেন অষ্টপ্রহর জড়িয়ে আছে। এই মৃত্যুসাপই কামড় দিয়েছিল মাকে। ভদ্রলোক ভাবতে লাগলেন। এই সাপটাই ছোটভাই টমকে কামড় মেরে অকালে মেরে ফেলেছিল। এই সাপটার নামই বন্ধ্যা। বন্ধ্যা মেরেছে মাকে, ভাইকে। আমাকেও কি মারবে? সেই ভয়ঙ্কর দিনটা হয়ত অনেক দূরে নেই।

না, না। মৃত্যুর কথা থাক। অথচ মৃত্যুকে কি ভোলা যায়? ওই সমাপ্তি বহ্নি বলেই তো জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এত ক্ষণময়, এত স্পর্শচেতন। শেষের সেদিন আছে বলেই তো একটি এত মূল্যবান। ক্যানি, সুন্দরী ক্যানি, ক্যানির হাসি, ক্যানির গান, ক্যানির মিষ্টি কণ্ঠস্বর—সবমিলিয়ে ক্যানির প্রতি মুগ্ধ আবেশ, এ যে জীবনকে পরম রমণীয় করে তুলছে।

ভদ্রলোক টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটি কবিতার বই বার করলেন। তাকালেন বইয়ের নামের দিকে, কবির নামের দিকে। বই এর নাম:

'এণ্ডিমিয়ন : এ রোমান্টিক রোমান্স' কবির নাম জন কীটস। খুব সাধ পুরনো একটি নাতিপ্রাচীন কাব্যগ্রন্থ। নতুন বেরিয়েছে, অনেকদিন বই-এর অন্তত একটা গন্ধ আছে, ভদ্রলোক নাক দিয়ে গন্ধটা একবার শুঁকলেন।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আয়না-লাগান আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাকালেন আয়নার দিকে। নিজের চেহারা আয়নায় পড়ে। বয়স ছাব্বিশ, নতুন যৌবনের সবল দেহ প্রায় বছর খানেক ধরে প্রতিদিনের অসুস্থতায় কিছুটা পাণ্ডুর দেখাচ্ছে। নিজের চেহারা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিজেকে ভাবতে শুরু করলেন। বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা কাব্যখ্যাতি ছুটেছে ঠিকই, কিন্তু তার থেকেও বেশি ছুটেছে রক্ষণশীল সাহিত্য পত্রিকাগুলির সমালোচনার নামে অকারণ ব্যঙ্গ আর অপমান। নিশ্চিত উপার্জনের আশাহীন দাদামশায়ের উইলের টাকাই একমাত্র ভরসা, এক তরুণীর প্রতি অব্যক্ত প্রেমে মোহান্ধ। সব মিলিয়ে এই হচ্ছে ভদ্রলোক। নাম জন কীটস। বিষণ্ণ বড় বড় চোখ, সোনালি চুল, চওড়া চিবুক, সুশ্রী সুদর্শন, প্রেমভাবী কিন্তু কোন কিছুর লোভেই বিকিয়ে দেবার পাত্র নন। আর হৃদয়? পরম রূপের পিপাসায় তীক্ষ্ণ সংবেদনশীল।

বারান্দায় কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কে, ব্রাউন কি ফিরে এল? ভাবলেন জন কীটস। ব্রাউনের মত এমন মমতাময় বন্ধু আর তাঁর কেউ নেই। ছোট ভাই টমের মৃত্যুর পর কীটস যখন কিছুটা বিপন্ন, ব্রাউন তখন তাঁকে জোর করে নিয়ে এসেছে নিজের বাড়িতে। ডাক্তার আর ওষুধের ব্যবস্থা করেছে। শহরের তিনজন বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছে ব্রাউন, ডাক্তারের পরামর্শ মত ইতালির কোন স্বাস্থ্যপ্রদ শহরে কয়েক মাসের জন্য কীটসকে ঘুরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও সব ঠিক করে ফেলেছে। না, ব্রাউন নয়। অন্য কারোর পায়ের শব্দ। শব্দটা সোজা এসে স্তব্ধ হল তার দরজার কাছে। কাচের শার্সি দিয়ে দেখলেন কীটস, মিসেস ব্রন দাঁড়িয়ে আছেন। মিসেস ব্রন ফ্যানির মা।

দরজা খুলে দিলেন কীটস। মিসেস ব্রন স্মিত হাসি ঠোঁটে মেখে একটা চেয়ারে বসলেন। বললেন, 'আজ কেমন আছেন মিঃ কীটস?

'ধন্যবাদ। ভালই আছি।'

'দেখুন একটা কথা বলতে এলাম। সোজাসুজি বলাই ভাল।' ভদ্রমহিলার ঠোঁটের বাঁকে ফাঁকা হাসিটা ততক্ষণে নিশ্চিহ্ন হয়েছে।'

'বলুন।'

'দেখুন, ইয়ে মানে—'

হাসলেন কীটস। বললেন, 'আপনি ইতস্তত করছেন কেন? স্পষ্টই বলুন। আমি কিছু মনে করব না।'

'না, বলছিলাম কি। আমার মনে হয়, আপনি ফ্যানিকে ভালবাসেন।'

জবাব না দিয়ে শোনার জন্য অপেক্ষা করলেন কীটস।

'দেখুন আমার মেয়ে সুন্দরী। ভাল নাচ জানে। পার্টিতে ওর নাচের সঙ্গী হবার জন্য বড়লোকের ছেলেরা লালায়িত। মেয়েও আমার কম চালাক নয়। আমার ইচ্ছে, ফ্যানি ওদের মধ্য থেকেই স্বামী বেছে নিক।'

'নাচের পার্টনার হিসেবে ওকে পছন্দ করবে, এ নাও হতে পারে। আপনাকে সবিনয়ে জানালাম।'

'সেসব আমি বুঝব। কিন্তু চাল চুলোহীন অখ্যাত কবিকে ফ্যানি যে ভালবাসতে পারে না তাতে আমার সন্দেহ নেই।'

'আর কিছু বলার আছে?'

'দেখুন আপনার ব্যবহার-টাবহার দেখে আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছি। সে জন্যই ওকে এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছি। সে এখন থেকে মামার বাড়ীতে থাকবে। মামাতো বোনদের সঙ্গে রোজ পার্টিতে যাবে।'

'ভালকথা। তবে জানেন কি, মানুষের সব আকাঙ্খা ঈশ্বর পূরণ করেন না।'

'আচ্ছা। পূর্ণ হয় কিনা আমি দেখব। গুড বাই।' ভদ্রমহিলা ভারী ভারী পায়ের শব্দ করে চলে গেলেন।

চলে গেলেন, কিন্তু যন্ত্রণা রেখে গেলেন ছাব্বিশ বছরের একটি বেদনার্ত বুকে। অর্থের পরিমান দিয়ে

কি জীবনের সার্থকতার পরিমাপ করা চলে, না প্রেমের আন্তরিকতায়। টেবিলে মাথা রেখে চুপচাপ সময় কাটাতে লাগলেন জন কীটস।

দরজায় কে মৃদু আঘাত করছে। কে?

দরজা খুলে দিলেন কীটস।

বীড়ানম্র লজ্জাবতীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে ফ্যানি। হাতে একটি বড় গোলাপ। কীটসের দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গীতে হাসল। বলল, 'আসব?'

'নিশ্চয়!'

ফ্যানির হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন কীটস। বললেন, 'তোমাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। তুমি যদি দেখতে পেতে নিজেকে!'

আবার হাসল ফ্যানি। বলল, 'আমাকে মাপ করুন। দুপুরে কত সব বাজে কথা বলেছি।'

'না না। তোমার কোন কথাই বাজে নয়। তোমার সব কথার মধ্যেই আমার জীবনের নানা পর্যায়, এ আমি জানি।

'আমি না বলে চলে গিয়েছিলাম বলে কিছু মনে করেন নি, বলুন?'

'তোমার উপর আমার রাগ আসে না।'

'তাহলে কি আসে?

'সত্যি বলব? হা আসে তার নাম অনুরাগ!'

কিসে করে হাসল ফ্যানি। বলল, 'ধাঃ আপনি বড় মিথ্যুক।'

'রাখো, এখানে হাত রেখে রাখো।' ফ্যানির দুহাত নিজের বুকের উপর চেপে ধরলেন কীটস।)

পুরুষের বুকে মাথা রাখল ফ্যানি। একটা গভীর শ্বাস ফেলল। বলল, 'আমি বুঝতে পারি নি।'

চোখের তারায় হাসি ফুটল কীটসের। বললেন, 'এখন।'

খুব আস্তে আস্তে জবাব দিল ফ্যানি। বলল, 'বুঝেছি, আমাকে নিয়েই তুমি আজ সারাদিন কবিতা লিখেছ।'

বুকের উপর থেকে ফ্যানির গাল নিজের গালে জড়িয়ে রেখে অস্থির আবেগে কয়েকবার তার সারা শরীরে চাপ দিয়ে কীটস আজন্ত উৎসুকো ফ্যানির ঠোঁটে অসংখ্য চুমোর রেখা এঁকে দিতে থাকলেন।

'ফ্যানি—'

—'বলো।'

'আমাকে তুমি বিয়ে করবে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ফ্যানি। কয়েকটা মুহূর্ত অস্থির উত্তেজনায় কাঁপলেন কীটস।

'আমি তোমার!'

'তোমার মা যদি বাধা দেন?'

'আমরা জানে পালিয়ে যাব।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল ব্রাউন। দীর্ঘকায় মানুষ, গায়ে রেনকোট; হাতে ছাতা। দুজনেই লজ্জিত হয়ে চলে যেতে চাইল। বলল, 'প্রেমে ব্যাঘাত করলাম বলে খুব দুঃখিত।'

'যাচ্ছ কোথায়? বসো।' কীটস অভয় দিলেন।

ফ্যানি বলল, 'আমি যাই।' ব্রাউন হা-হা করে বাধা দিতে গেল, কিন্তু দাঁড়াল না ফ্যানি। লজ্জিত অথচ পরিতৃপ্ত পদক্ষেপে সে চলে গেল। যাওয়ার সময় কীটসের টেবিলে রেখে গেল হাতের সেই তাজা রক্ত গোলাপ।

'কীটস, তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রেমে তুমি জয়ী।'

'কিন্তু—'

তৎক্ষণাৎ প্রবল কাশির তোড়ে অস্থির হয়ে উঠলেন কীটস। কাশির ধাক্কায় মুখ লাল হয়ে উঠল। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ ঢেকে কীটস কয়েক বার কাশলেন। কষ্টদায়ক কাশির বেগ কমবার জন্য বুকে হাত চেপে রইলেন। তারপর আবার এল কাশির দমক। যন্ত্রণাদায়ক কাশির প্রাবল্যে ক্লিষ্ট কীটস রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে রইলেন।

কাশির ধাক্কা আস্তে আস্তে কমে এল। খানিকটা সুস্থ হলেন কীটস। কিন্তু তৎক্ষণাৎ রুমালের দিকে চোখ পড়তেই তীব্র আর্তনাদ করে উঠলেন, 'ব্রাউন, এ যে রক্ত—'

ব্রাউন এগিয়ে এসে দেখলেন রুমালের দাগ। কালচে রক্তের দলা রুমালে জড়িয়ে আছে!

কীটসের আর্তনাদ শুনলেন ব্রাউন। —'এই রক্ত আমি চিনি। আমার মা এই রক্ত কেশে কেশে মারা গেছেন। ছোট ভাই টমও মরেছে এভাবে। ব্রাউন, আমি আর বাঁচব না ভাই।'

বাইরে সন্ধ্যার আকাশে তখন একটি ম্লান তারার টিপ। অনেক আলোর কাছে একটি টিপের তারায়।

ছাত্ররা রোডের মোড়ে নিতাই প্রধানকে চাপা দেবার পরই মোতাহের চাকরী ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ঠিক পরে পরেই নয়। বাসের পাবলিক, রাস্তার পাবলিক, রকের পাবলিক, তিন পাবলিকের হাতে জোর ঠ্যাঙানি খেয়েছিল মোতাহের।

'আমি অফকটে বাস চালাই এই বাস হামেরার বা দিকে ঘুরে আমি জানি না।' ও আর্তনাদ করেছিল।

পাবলিক অবশ্য ঠেঙিয়েছিল। জানি না, জানতে কি হয়?

'যারা নরা মানুষকে, পশু অচিনা মানুষকে ঘরে দেয় তাদের দোষ ভাইছাব।'

'ছার' বলে কেন? তবে কি ও মুসলমান?

'আল্লার দো'ই ভাইছাব আমার মেয়েন না।'

বকরীদের বকরীটাকে যখন পাছড়ে ধরে তার মতই মোতাহেরও চেঁচিয়েছিল। তা ছাড়াও 'পাডনার, পাডনার' বলে ভীষণ চেঁচিয়েছিল মোতাহের কিন্তু কণ্ডারটর ততক্ষণে ল্যান্সডাউন রোড ধরে বকুলবাগানের গলিতে হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

এই সময়ে রকের পাবলিকরা নেমে এসেছিল আর পুলিশও এসে পড়েছিল। পুলিশের হাতে মোতাহের নিজেকে ছেড়ে দিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। ভয়। পাবলিকের ভয়। পুলিশ অনেকক্ষণ অবধি ওকে টেনে গাড়ীতে তুলতে পারে নি।

কেস। পুলিশ কেস, সরকার বনাম মোতাহার হোসেন। আদি মোকাম জলপাইগুড়ি, থানা মহনা-গুড়ি, বয়স তিরিশ। এখন নিবাস কসবা-বোস পুকুর। সাইলেন্সে লরীরের অ্যাইডেনটি ফিকেশান মার্কা ছিল বাঁ ভুরুর ওপর কাটা দাগ। কিন্তু ঠিক সময়ে জেল খেটে যখন মোতাহের বেরিয়ে এল তখন ওর শরীরের সব জায়গায় নতুন নতুন দাগ। জেলেও দুটোএকটা দাগ হয়েছিল। যেমন ডান পায়ের ওপর বালতি পড়ে কাটার দাগ ও বাগান করবার সময়ে খুরপীতে হাঁটু কেটে যাবার দাগ।

জেলেও থাকতে হয়েছিল। তুমি সাত নম্বর বাস চালাতে দুম করে আট নম্বর চালাতে এসেছিলে সে কথায় তো চিড়ে ভেজে না। নিতাই প্রধানের হাঁটু থেকে যে বাদ পড়ে গেল সে ক্ষতিটা দেখ।

'নছিবটাই মন্দ!' মোতাহের মনে মনে ভাবলে। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে আর কোনদিকে না তাকিয়ে

সোজা রাঁচির টিকিট কাটলে। রাঁচিতে হরনাম সিং আছে।

'তোর হামি আছি মোতাহের' হরনাম সিং ভারী মোলায়েম গলায় বলেছিল। এক বছর আগে মোতাহের যখন কলকাতায় চলে আসে তখন কথা হয়েছিল।

'হুজুর!'

'তু হামার কাছে কাম করলি না মোতাহের, না করলি। যা, দেখ্‌কে আর কোন কোম্পানীর চাকরে ঢুকিস কত।' হরনাম সিং পরীর নাচিয়ে হেসেছিল। হরনাম সিং বৈশাখী পরবের দিনে বিছিনের আগে লাঠি নিয়ে নাচত। যখন জোয়ানকালে ছিল। এখন আর নাচে না, তবে পা নাচানোর অভ্যেসটা ওর আছে।

'তু হামার কাছেই আসবি' বলতে বলতে হরনাম চোখ বুজেছিল, তাকিয়া ঠেস দিয়ে খাটিয়ায় গড়িয়ে পড়েছিল।

মোতাহের মনে মনে বলেছিল 'সেই নছিব আমায় দিও না আল্লা, সেই নছিব দিও না।' মোতাহের হরনাম সিং-কে ভয় পেত। হরনামকে ভয় পেত, ওর অর্জুন বাস সার্ভিসের ভাইভার কর্তার সিং-কে ভয় পেত, ভয় পেতে পেতেই মোতাহের বড় বয়সটা কাটিয়ে দিল।

তবু হরনাম সিংয়ের কাছেই ফিরে এল মোতাহের। ফিরে আসবার আগে মনে মনে অনেক ভাবল। কিন্তু কাজ যদি কেউ দেয় তো হরনামই দেবে। জলপাইগুড়ি থেকে কুচবিহার, জলপাইগুড়ি থেকে এদিকে শিলিগুড়ি ওদিকে দার্জিলিং পরী সার্ভিসে হরনামই ওকে ঢুকিয়েছিল। মোটর চালাবার লাইসেন্স হরনামই ওকে করিয়ে দেয়। লাইনে কম্পিটিশন দারুণ বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হরনাম যখন রাঁচি চলে এল তখন মোতাহেরকে তাড়া দিয়ে সঙ্গে এনেছিল।

'হামি তুকে ছাড়ব না,' মোতাহেরের কর্সা মুখ, চওড়া বেঁটে শরীর, ভয়ে থ' মারা হাঁদা চাউনির ওপর চোখ রেখে রেখে হরনাম বলেছিল।

'প্রীতম বলে তু বেইমানের জাত, বেইমানী করবি।

হামি জানি তু কিছু করবি না মোতাহের।'

মোতাহের বলেছিল 'আমি বেইমানীতে ডরখাই হুজুর।'

'ও জন্যেই তো তু'কে রেখেছি।' হরনাম বলত। হরনাম জানত মোতাহের মুরগী কাটতে ভয় পায়, ওর বউ মুরগী কাটে। মোতাহের রাস্তায় বাস উলটোতে দেখলে ভয়ে বমি করে। একেবারে ছিচু মোতাহেরকে দিয়ে সুবিধামত কাজ আদায় করা যাবে তা হরনাম জানত।

জানত বলেই ওকে রেখেছিল। নইলে হরনামের বত ভাইভার শিখরা আর কবে মোতাহেরের মত লোকদের বিশ্বাস করেছে। ছেলে প্রীতম, ভাইপো বলদেব সকলেই হরনামকে যা তা বলত কিন্তু হরনাম ওদের কথায় কান দিত না। বলত 'হরনাম সিংয়ের বুদ্ধি তু'দের চেয়ে বেশী।' ওরা সেকথা বিশ্বাস করত না।

ওদের দেশ ছিল পাঞ্জাবের গুরুদ্বারা জেলায়।

মোতাহেরকে যে বিশ্বাস করতে নেই তা ওরা ভাল করেই জানত।

কিন্তু সেইসঙ্গে ওরা হরনাম সিং-কে ভয়ও পেত। মুখে বসন্তের দাগ, এক চোখ কানা, প্রীতমই বাপকে আড়ালে একচোখো শয়তান বলত।

একচোখো শয়তান যখন মোতাহেরকে রেখেছে তখন বুঝে সুঝেই রেখেছে এই মনে করে ওরা চুপ করে থাকত। শুধু মনে মনে গজরাত, ফোঁস ফোঁস করত। তিস্তার ব্রিজ থেকে পাঞ্জরে ছোরা বসিয়ে মোতাহেরকে ফেলে দেবার কথা প্রীতম অনেক সময়ে মনে ভেবে শান্তি পেয়েছে।

প্রীতম, বলদেব, দলীপ, ওরা কেউ নয়, কর্তার সিং মোতাহেরকে রাঁচি থেকে তাড়াল। ট্রেণে চেপে রাঁচি আসতে আসতে সব মনে পড়তে লাগল মোতাহেরের। এতদিন বাদে হলে কি হয়, সব মনে আছে মোতাহেরের। এখনো মেয়েটার মুখ মনে পড়লে মোতাহেরের গা হিম হয়ে যায়। ঘুমের মধ্যে ও অস্পষ্ট শব্দ করে এপাশ ওপাশ করে। ওর বউ মরনাবিবি ওকে কত সময়ে ধাক্কা দিয়ে তুলে দেয়।

বলে 'পাশ ফিরে শোও। ওগোও কেন, জ্বর না কি খোয়াব দেখ, জ্বা? ঠিক কাতে শোও, বুকে পীরের নাম করে দি।'

বউ খুব পীর ফকিরের নাম, মন্ত্রতন্ত্রর জানে। ঝাড় বল, ফুঁক বল, অসুখ বিসুখে মাদুলীতাবিজ দেওয়া বল, সব জানে। ঘোস পুকুরে ওর নাম ডাকও আছে। বউয়ের বাপও সব জানত শুনত। মরণ কালে বোধ হয় মেয়েকে সব বিদ্যে দিয়ে গেছে।

আগেকার বউটা এ সব কিছু জানত না। শুধু নখে রঙ আর চোখে কাজল দিতে জানত। রাঙা টুকটুকে দুটি পায়ে রূপোর তোড়া আর ছবি আঁকা খড়ম পরে কমঝম করে ঘুরে বেড়াতে জানত। রান্নাবান্না ঘর সংসার সবই করত, আবার ছুটে ছুটে রাস্তার ঘোসালের বিয়ের মিছিল, বাবুদের ভোটের মিছিল, গ্রামোফোনওয়ালার গানের সঙ্গে ছোকরা রাধার নাচ দেখতে যেত।

মোতাহেরের কুদু বলত 'বয়সের তেজে ছটফটায় রে বউ। এখনো কোলে কাঁখে ছেলে নেই, মেয়ে নেই, তাই ছটফটায়।' মোতাহের মনে মনে হাসত। বউকে চাসি খুশি দেখতে ভাল লাগত মোতাহেরের। হরনামের কাছে মোতাহের বাইরে বাইরে থাকত তাই যে ক'দিন বাড়ীতে থাকত সে ক'দিন কুদুর কচকচি, তামাক খাওয়া বল তামাক খাওয়া ওর মোটে ভাল লাগত না। বউয়ের নামে কুদু যে কথাই বলত সে কথাই অবিশ্বাস হত মোতাহেরের। তামাক খাওয়া মানুষের মনও আমাদের ধোঁয়ার মতলা হয়। নিশ্চয় হয়, নইলে এমন বউয়ের নামে এত মন্দ কথা কুদু বলত কি করে কে জানে।

বউয়ের নাম ছিল পরী। সেবার মোতাহের যখন রাঁচিতে যায় বউ জেদ ধরেছিল 'আমারে নে যাও না কেন?'

'পরে যাবি।'

'কত পরে?'

'যাবি, সময় হলে যাবি।'

বিদেশে, বিভূঁয়ে নিয়ে যেতে ভয় পেয়েছিল মোতাহের, কিন্তু নিয়ে গেলেই বুঝি ভাল হত। পরীও বোধ হয় একলা থাকতে ভয় পাচ্ছিল।

মোতাহের সেটা বুঝতে পারে নি। চক চকে, ঝক ঝকে জিনিসের ওপর খুব লোভ ছিল পরীর। চাদি ফেলে রেখে কাচ পরত। সিনেমা থিয়েটারের নামে নেচে উঠত। বায়স্কোপ দেখাবার টোপ ফেলেই টকি-হাউসের ছেলেটা পরীকে নিয়ে চলে গেল।

'এই বউয়ের জন্যে কেন্দে না বাপ' কুদু সান্ত্বনা দিয়েছিল 'উ-র মন ঘরে সংসারে ছিল না, ভাতের হাঁড়িতে বাড়া ছিল না।'

তবে কি পরীর স্বভাব খারাপ? তাই যদি হবে তাহলে পরনের শাড়ী, নতুন চটি জোড়া কিছু নিয়ে যায়নি কেন? মোতাহেরের এমন কথাও মনে হয়েছে কেউ ওকে ভুলিয়ে বাইরে নিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছে।

পরের বউ কুদু এনে দিল। মরনাবিবি মরতী গেরস্থি মোটাসোটা ঠাণ্ডা মানুষ। বয়সে হয়তো মোতাহেরের সমান সমান হবে কিন্তু কুদু বলল 'বাপ, উ মরম পায়ে হাঁটে কিন্তু শব্দ হয় না। উ-র গলা কেউ কানে শোনে না, উঁচু কথা কয় না। উ-র হাতে পায়ে সংসারের ভাল আছে বাপ।'

তারওপর মরনাবিবি কানেও একটু কম শোনে, রাস্তা দিয়ে শত বাদ্যবাজনা গেলেও ও উতলা হবে না। মোতাহেরের মনে হল এই ভাল। এর চেয়ে ভাল আর কি হবে। পরী দেখতে মোটামুটি ভাল ছিল কিন্তু পরী চলে যাবার পর মোতাহেরের ক্রমেই এ ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছিল পরী রূপে গুণে আশ্চর্য। যেন আসমানের পরী, যেন জোস্না রাতের খোয়াব। নিজেকে মনে হত, ক্রমেই মনে হত বাদশা হয়ে ও বাদশা হতে চেয়েছিল। তুমি গোলাপ, তুমি সোনার তাজ চেয়ে দেখতে পার কিন্তু সে-তাজ মাথায় পরতে পার কি? পরী ছিল মোতাহেরের সোনার তাজ। মোতাহেরের নসীব ওর গালে থাপড় মেরে সেই তাজ কেড়ে নিয়ে চলে গিয়েছে।

দুঃখে. বড় গভীর দুঃখে, ময়নাবিবির রেঁধে দেওয়া ভাত প্রথম দিন খেতে খেতে মোতাহেরের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়েছিল। হাঁড়ি, তার উনোন, তার হাতের নাড়াচাড়ার সাথকি বাসন। পরী কেন এমন করে তার যা কিছু সব ফেলে রেখে চলে গেল? আল্লা মোতাহেরকে এই দুঃখ কেন দিল?

ময়নাবিবি মোতাহেরের চোখে জল দেখেছিল। দেখে আস্তে সরে গিয়েছিল। নিজের আর কুকুর ভাত বাড়তে বাড়তে ভেবেছিল পুরুষ তার বিবির দুঃখে কাঁদে। সেই বিবি সুন্দর ছিল, বয়সের বিয়ে তাই দুজনের মনেই সুখ ছিল।

ভাবতে ভাবতে ময়নাবিবি বড় মাছটা কুকুর পাতে তুলে দিয়েছিল। প্রথম দিন কি খেতে দিলে না দিলে মেয়েমানুষের নাম তাতেই হয়। প্রথম দিন বাসন সোনার মত মাজবে, ঘর ধুলোনিঃসরী করে নিকোবে ঝাড়বে, রান্নার মুনবাল ঠিকমত হ'বে। কুকুকে বড় মাছটা দিয়ে ময়নাবিবি নিজের পাতেও চুড়ো করে ভাত তুলে নিয়েছিল।

'কম খেওনি দাদা।' ও কুকু বলেছিল!

'না কুকু, কম খাব না।' ময়না সত্যিকথাই বলেছিল। তার রাধা চিংড়ী—কুমড়োর ঝাল আর কলমীশাকের ঝোল খেলে মরামানুষ তাজা হয়ে ওঠে। তুড়ি দিয়ে বলে আর দুটো খাই ময়না, আর দুটো দে। সেই রান্না খেয়ে যদি কোন পুরুষ রুক্কাতবিবির কথা মনে করে কাঁদে তো কাঁদুক।

তা বলে ময়না কম খাবে কেন? কম খাবে না, কিছু বলতেও খাবে না। বয়সের জ্বালা, বয়সের মন, বয়সের সুখ কি তা ময়না জানে না জানতেও চায় না। ময়না শাস্তি পেতেও চায়, দিতেও চায়।

একটু মোটা, খলখলে দেহ, কপালে উলকি হাতে ঘাউটি ময়নাবিবি মোতাহেরকে ক্রমে ক্রমে অনেক শান্তি দিয়েছিল। মোতাহের রাঁচি থেকে কেন পালিয়ে এসেছিল তা ময়নবিবি জানত না।

দেখেছিল ওর পুরুষের চোখে মুখে ভয়, কিসের যেন ভয়। রাতে ঘুমোতে ঘুমোতে ওর পুরুষ কিসের যেন স্বপ্ন দেখে চমকে উঠত। ময়নাবিবি বলত 'ডাংগাও কেন, জা? না কি খোয়াব দেখ?'

ময়না ওর বুকে হাত রেখে পাঁজরের নাম জপে দিত। মোতাহেরকে ওর ছোটছেলের মতই অসহায় মনে হত। নিজের কোলে একটি ছেলে আসবার পরও স্বামীর ওপর ঐ স্নেহের ভাবটা যায়নি ময়নাবিবির। বোলপুরের বাড়ীতে হাসে, মুরগীতে, কাঁসাপেতলের বাসনে বেশ কিছু নিয়ে এসেছিল ময়না। মশুরডাল, জলপড়া, ঝাড়ফুক করাতেও ওর ঘরে বাতাসা, দুধ, এটা-সেটা আসে।

ময়নাবিবিকে ডেকে পড়শীরা আড়ালে বলে 'বিবি, তোমার আগে পরে মোতাহেরের বাড়বাড়ন্ত। তুমি এত তোয়াজ কর কেন? তোমার কাছে ওনি পাঠাতে পারে?'

'এই কিছিনের কথা ভাল না মিঞা।' ময়নাবিবি পরিষ্কার জবাব দেয়। মোতাহের তাকে সংসার দিয়েছে, শান্তি দিয়েছে, এই শান্তিটুকু ময়নাবিবি চেয়েছিল।

ওর বাপের চাকরী, ময়নাবিবির দরুণ কলাটা, মুলোটা, বা আধপো' বাতাসা, এতেই সংসারের ছবি বেশ ছাপ ছন্দ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কে জানত, কে ভাবতে পারত, মোতাহেরকে হঠাৎ ওরা আট নম্বর বাস চালাতে দেবে? এমন করে কি কেউ জবে দেয়? মোতাহের বাস নিয়ে সোজা বেরিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু হইহই শুনে দিল কামড়ে, বাঁ দিকে ঘোরাতে গিয়েছিল বাস।

জেল থেকে বেরিয়ে এসে তাই, মোতাহের চারদিকে তাকিয়ে সংসারের চেহারাটা দেখল। ময়নাবিবির গলার হাড় উঁচু, গাল বসে গিয়েছে, ছেলেটার চেহারাও ভাল ঠেকল না মোতাহেরের।

'ছাগলটা তো দেখি না?'

'বেচে দিলাম।' ময়নাবিবি সান্ত্বনা দিয়ে বলল 'আবার কিনব। তুমি ছিলে না আমি একলা সামলাতে পারছিলাম না।' শেষের দিকে ময়নাবিবির গলাটা একটু ভেঙে চুরে গেল, ময়না একটু কেশে নিল।

'আমার নছিবে তোর নছিবও মক্ত হল বউ।'

'মন্দ নছিব ভাল হতে কতক্ষণ। নাও ছেলা দেখ আমি কাজে যাই।' মহুয়া বিবি রান্নার জোগাড়ে গেল। যত যা হোক, তাতাপোড়া মরদকে চাঙ্গিতে তেলজল, পেটে দুটো ভাত দেওয়া দরকার। পরের কথা পরে।

খেয়েদেয়ে, দু'তিন দিন মোতাহের পড়ে পড়ে ঘুমোল আর আকাশপাতাল চিন্তা করল। তারপর বলল 'রাঁচিতে যাই মহুয়া। হরনামের কাছে যাই।'

'হরনামের কাছে? কেন, সেখানে যাও কেন জাঁ? সেই কাজে ত তুমি সুখ পাওনা, তবে কেন যাও? তুমি না সে কাজে ডরাও, হাঁ মিছা?'

মোতাহের সে কথার সোজাসুজি জবাব দিলে না। ভয়, হাঁ সে ভয় পায় হরনামকে। হরনামের চেয়েও ভয় পায় কর্তার সিং-কে। একটা নয়, দুটো নয়, অনেক লরী হরনামের। লরীগুলো সারাদিন সোরেন, ধোয়া, বিড্ডি আনে। হরনামের গুদাম থেকে বস্তাবন্দী মাল যায় টাটানগর, দুর্গাপুর, কলকাতা, হাজারীবাগ।

রাতে সেই বস্তার নিচেই চালান হয় সিমেন্টের বস্তা। খালাড়ীর সিমেন্ট। রাঁচি-ধানবাদ রোড ধরে যেতে যেতে ঠিক জায়গায় হরনামের লরীগুলো হেডলাইট নিভিয়ে লাইনের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। ঠিক সময়ে ওয়াগন থেকে সিমেন্টের বস্তা নেমে এসে বিড্ডির বস্তার নিচে ঢুকে যায়। কিছু কিছু লাইসেন্স ছাড়া ট্রাকও আসে বে-আইনীভাবে। পত্রাতু থেকে, খালাড়ী থেকে, মাণ্ডা থেকে।

ভীষণ সাহসের কাজ। রেলের পুলিশ আছে; ধানবাদ, রাঁচি, প্রতিটি শহরের মুখে মুখে অস্ত্র পুলিশও আছে। পুলিশদেরও হাতে রাখতে হয় বইকি। কিন্তু মাঝে মাঝে এক একটা বেয়াড়া দারোগা আসে, বেয়াড়া সি, আই, আসে, তাদের হাতে রাখা যায় না।

সাহসের কাজ। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে মদে চুর হয়ে রাতের রাস্তা যায় টেনে ধানবাদ চলে যাওয়া নয়তো দুর্গাপুর-হাওড়া। টাটানগর, অথবা হাজারীবাগ, অথবা গয়া।

সাহসের কাজ ভিতুলোকে দাবড়ানি দিয়ে করিয়ে নেওয়া যায় তা হরনাম জানত। মাঝে মাঝেই বলত 'তু' কে প্রোমোশন দিয়ে দেব রে। ই কাজে অনেক টাকা পাবি।'

সেই প্রোমোশন আর মোতাহেরের হয়নি। তার আগেই একদিন, হরনামের ট্যাক্সি নিয়ে প্যাসেঞ্জারকে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড ধরিয়ে দিয়ে ফিরে আসবার সময়ে সেই ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল।

সেই বিশ্রী, দুঃস্বপ্নের মত ঘটনা। ভাবতে গেলে এখনো মোতাহেরের শরীরের ভেতর থেকে রক্ত পলিয়ে ঘাম বেরিয়ে আসে। হরনামের সবুজ সিয়াটকে উর্ধ্বশ্বাসে রাঁচি-ধানবাদ রোড ধরে ছুটে যেতে দেখে মোতাহের অবাক হয়ে বোকার মতই পিছু নিয়েছিল। এই গাড়ীটা হরনাম ক্বচিৎ কখনো নিজে চালায়, কিন্তু আজ তো হরনামের শহরে আসবার কথা ছিল না।

কথা না থাকলেও হরনাম যদি আসেও, তাতেও মোতাহেরের কি, সে তো সোজা চলে এসেই পারত। কিন্তু মোতাহেরের মাথায় বোকামি চেপেছিল। সবুজ গাড়ী থেকে একটি মেয়ের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল তাই শুনেই ও বোকার মত কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল।

তারপর, পাহাড়ের রাস্তায় হঠাৎ যখন গাড়ী বোঁ করে ঘুরে জঙ্গলবাংলোর দিকে চলে গেল তখন মোতাহের মেয়েটির মুখ দেখেছিল। ফর্সা, ছেলেমানুষ, ভয়ে দুটো চোখ বিস্ফারিত।

জানলা দিয়ে প্রায় ঝুলে পড়ে মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠেছিল 'ভাইসাব, বুকে বচাও!'

ওর কি সত্যিই কোন ভাই আছে, না মোতাহেরকে দেখেই ও চেঁচিয়েছিল মোতাহের তা ভাল করে বুঝতে পারেনি। শুধু নম্বরটা দেখেছিল, এ তো হরনামের গাড়ীর নম্বর নয়। হরনামের গাড়ীর নম্বর নয় যখন তখন হরনামের গাড়ীও নয় নিশ্চয়ই। গাড়ীর ড্রাইভারকে যে কর্তার সিং মনে হয়েছিল তাও ভুল নিশ্চয়ই। ভীষণ ভয় পেয়েছিল মোতাহের। রাঁচি-ধানবাদ রাস্তায় অনেক ঘটনা ঘটে যা দেখেও দেখতে নেই তা ও জানত।

পুলিশকে অমি সব সময়ে বলেও বিশ্বাস করানো যায় না সব।

বোকার মত, প্রায় বোকার মত, তিনু মোতাহের ট্যাক্সি চালিয়ে ফিরে এসেছিল বাঁচিতে। পরদিন কর্তার সিংকে বলছিল, 'কাল খুব ভয় পেয়েছিলাম ভাই, তোমাকে দেখলাম।'

'কোথায়?' হরনাম জিগ্যেস করেছিল।

'রাস্তায়।'

'তারপর?'

'দেখলাম গাড়ী হুজুরের নয়।'

'কার?'

'নম্বর জানি না হুজুর।'

'বটে!' হরনামের চোখ দুটো আবার ঝিলিয়ে উঠেছিল। তারপর একটু হেসে ও বলেছিল 'তু' কলকাতা যাবি মোতাহের? নোকরী করবি? আমি তো তু'কে প্রোমোশন দিয়ে দেব ভাবছি।' কর্তার সিংকে জলপাইগুড়ি ভেজে দেব।'

কয়েকদিনবাদেই সেই খবরটা বেরিয়ে পড়েছিল। জয়ন্ত বাংলোর কাছাকাছি একটি মেয়ের মৃতদেহ বস্তাবন্দী হয়ে পড়েছিল। সন্ত ঘরেছে, ঘণ্টা চারেক আগে, তখনো পচন ধরেনি। মোতাহের সেদিনও থানবাদে। কার বাঁড়া, কে চেনে বলে পুলিশ যখন ঠাণ্ডিঘরে কাতারে কাতারে মানুষকে মড়া দেখাচ্ছে তখন মোতাহেরও গিয়েছিল।

মেয়েটার মুখ দেখেই ওর মনে পড়ে গিয়েছিল সেই চীৎকার 'ভাইসাব, মুঝে বচাও!'

'হা আল্লা!' বলে মোতাহের ঠাণ্ডিঘরেই বসে পড়েছিল ধপ্ করে।

বলেছিল 'এনারেই তো আমি দেখেছিলাম!'

'কে দেখেছিল, তুমি কে?'

'আমি মোতাহের হুজুর। ইনি চেল্লাচ্ছিল—আমায় বাঁচাও, তা আমি শুনেছিলাম হুজুর।'

'শুনেছিলে তো খবর দাওনি কেন?'

'ডরেছিলাম হুজুর। পুলিশকে আমি ডরাই।'

'বটে?'

বলে বোকা লোকটাকে ধরে ধমকে ধামকে কলে ফেলা করতেই ও যা জানে সব বলে ফেলেছিল। কর্তার সিং লোকটা কি পাজি দেখ, হরনামের গাড়ীরই নম্বর প্লেট বদলে নিয়ে সে রাতে বেরিয়েছিল। ওকে মোতাহের ভুল দেখেনি।

বলতে গেলে মোতাহেরের কথাতেই কর্তার সিং-কে ওরা থানায় আনে। কিন্তু কেন কেন, কারা যেন ভেতর থেকে সব চেপে দিয়েছিল তাই হঠাৎ সব চাপা পড়ে গেল। জয়ন্ত বাংলোর চৌকিদারটা শুধু জেল খাটতে গেল। কর্তার সিং-ও ছাড়া পেয়ে গেল আর হরনামকে বলল 'উসকো হাম খতম কর দেগা।'

'তু জান দেওগে ক্যা?' বলে হরনাম ওকে ধমক দিল।

সেই সময়ে মোতাহের পালিয়ে এল কলকাতায়। হরনামই ওকে বলে দিল অমুক বাবুর কাছে যাবি, অমুককে টাকা দিবি।

অমুক তোকে চাকরী করে দেবে।

বলল 'সব কুছুর যাব তু' হামার কাছে আসবি।'

মোতাহের মনে মনে ভাবল 'সে নছিব আমারে দিও না আল্লা।'

ময়না শুধু বললে 'তুমি যেয়ো না মিঞা।'

মোতাহের মলিন হেসে বলল, 'ডান হাতটা ভালমত উঠে না, বুকে হাঁপি ধরে। বসে বসে কি তোর ভাত খাব?'

'আমার মন কেন্দে'

'নছিবের লেখা ময়না। ই তো'র আমার হাতে নাই।' তারপর নিজের মনে মনেই বললে 'ছেলে ই হতে ভাল ছিলাম' ময়না। সি ঠাইরে এমন হাহাকার নাই।'

গত আটমাস—একবছরে জিনিসপত্তরের দাম যে কোথায় গিয়েছে তা মোতাহের জানত না। যেটুকু জানতে পেত, তাও না জানবার চেষ্টা করত। জলপাই-

গুড়ি, ময়নাগুড়ি বড় দুর্মূল্য জায়গা বলে ওর বাপ সেই কবে এই বোসপুকুরে চলে এসেছিল।

ঘরের ভাত খেতে পাবে বলে মোতাহের তার বোনদের কাছাকাছির মধ্যে এড়াচি-মাণিকপুর—জগদ্দলের গ্রামদেশে বিয়ে দিয়েছিল।

তারাও জমি-জমা হারিয়ে খুইয়ে কে কি অবস্থায় আছে কে জানে। মোতাহের কয়েকদিন তরকারী আনাজ বেচবার ফিকিরে বাজারের ভাবগতিক যাচ করবার ইচ্ছেয় কসবা বাজারের আশপাশে ঘোরাঘুরি করল। তারপরই বলল, 'এই কাজে এখন ভাত নি ময়না। ডেঁড়স-বেগুন বেচে চারটি টেকা হলে তবে এক কিলো চাল। মেয়ে-পুরুষ কেনে ভাতে খেলেও দিন চারটি টেকা দরকার। ই হতে আমি হরনামের কাছেই যাই।'

ময়না চোখ মুছল। ও নিজে আজকাল শুল ঘুঁটে দেয়। ও মাথে, ফুলু দেয়। এই কাজটিতে তো পুরুষকে ডাকা যায় না? বলল 'আমার ভাবনা করো না গো। আমি ছুদুকে নি' থাকব।'

কয়েকদিন বাদে মোতাহের এসে বললে, 'কসবা বাজারে রামধানীকে দেখলাম মদনা। উ বললে হরনাম আমার খুঁজে।

'রামধানী কে?'

'হরনামের গুদামের পাশে উ-র লোহা দোকান। মানুষ সিধে লয় সন্দ হয়। তা খবরটা উ দিবে।'

'কি বলে দিলে?'

'আজ যাই কি কাল যাই।'

কয়েকদিনের মধ্যেই মোতাহের ধানবাদের গাড়ীতে চেপে বসলে। ধানবাদ থেকে রোজ অনেক ট্রাক-ট্যাক্সি রাঁচি যায়। মোতাহেরের সবই বলতে গেলে চেনা-জানা।

ট্রেনের বকবকানি শুনতে শুনতে শুধু মোতাহেরের সেই কথাটি মনে পড়তে লাগল। সেই যে হরনাম বলেছিল 'সব কুছুর পর তু হামার কাছেই আসবি?'

এই সব কিছুটা কি? এক পরবে মোতাহেরের বাপ ওকে রুমাল কিনে দিয়েছিল, তেমনি আরেক পরবের দিনে পত্নী ওর ঘর করতে এসেছিল। এই যে বাপ-মা চিরদিন থাকে না, এই যে পত্নী এল, পত্নী গেল এর নামই কি সব কিছু? সরকারের চাকরী পাওয়া, পাবলিকের হাতে মার, চাকরী ছেড়ে ঘরে বসা তার ময়নার গলায় ছেলেকে ঘুম পাড়ানী 'সোনার ময়ূরা দেখ আসমানে উড়ে রে! হা দেখ সোনার ময়ূরা!' গানটা শোনা এর নামই কি সবকিছু?

আসানসোলে মোতাহের বেশ করে জিলিপী আর চা খেয়ে নিল।

ধানবাদে পৌঁছে, ঘর যদি গাড়ী না পায় তাহলে তো ওখানেই থেকে যেতে হবে। হরনামের কাছে যাবার ভয়টা কেন যেন একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে এখন। হরনাম তো ওর সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেনি এ পর্যন্ত। কিছুদূর যাবার পর অবশ্য সবই নির্ভরের খেলা কিন্তু ঐ কিছুদূর পর্যন্ত যা গড়িয়ে যেতে পারে ক'জন?

হরনাম সাহায্য না করলে কি করে ও এটুকু পথ যা চলতে পারত? এখন হয়তো হরনাম দেখতে পাবে মোতাহেরের ডান হাতটা পাবলিকের ঠ্যাঙানিতে কি রকম হয়ে গিয়েছে। হরনাম হয় তো ওকে রাঁচি ধানবাদ অথবা রাঁচি টাটা অথবা রাঁচি গয়া সার্ভিসে ঠেলবে না। হরনাম তো বলত মোতাহের খুব নির্লোভ লোক। ওকে হয়তো গুদামটা দেখবার ভারও দিয়ে দিতে পারে। মোতাহের ঠিক করলে হরনামের হাঁটু ধরে মিনতি জানাবে।

ধানবাদ যত কাছে আসতে লাগল তত মোতাহেরের মনটা যেন আলগা হয়ে যেতে লাগল।

কেন এই স্বস্তি আর আরাম তা মোতাহের জানে না। একটা বিড়ি খেতে খেতে ও কয়েকবার বিস্বর গলায় সোনার ময়ূরের গানটা গাইল। তারপর প্রায় গায়ে পড়েই পাশের লোকটিকে জানাল ও ধানবাদ যাচ্ছে। বিশেষ দরকারী কাজে।

'উধর কোই বা?'

'আপন জন নয় রে ভাই, দেখ্‌ভালাইয়ের লোক।'

'কাম বা ?'

'আমাদের ট্রাক চলে গাইনে।'

লোকটি মোতাহেরকে বেশ সম্ভ্রমের চোখে দু' এক বার তাকিয়ে দেখল।

হঠাৎ কেন এত হাল্কা আর আলগা লাগল মোতাহেরের তা ও নিজেই জানে না। যেন মনের মধ্যে কোথাও একটা বেসুর বাজছিল, মোতাহের সেটা শুনতে চাইছিল না। মাঝে মাঝেই ও বাইরের দিকে চাইছিল। বিষ্টি যখন এল তখন পাশের লোকটি বলল জানলা বন্ধ করতে, জল আসছে। মোতাহের একটু বিরক্ত হয়েই বলল, 'পানির সময়ে পানি নয় তো কি পড়বে, দুধ ?' ওর মেজাজ খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

ধানবাদ স্টেশনের বাইরে, কি আশ্চর্য, সেই সবুজ গাড়ীটা বিষ্টিতে দাঁড়িয়েছিল। সেই সবুজ গাড়ী, আজ অবিশ্যি মোতাহেরের চেনা নম্বরের প্লেট আঁটা আছে। গাড়ীটার চেহারা একটু লক্কড়-ঝক্কড়, না কি বিষ্টি পড়ছে বলে এ রকম দেখাচ্ছে ?

হরনাম ওখানেই ছিল। নেতাজী খালসা হোটেলে। হোটেলটা খুবই কাছে। মোতাহের হোটেলে কোনদিন ঢোকেনি বটে তবে ও জানত হরনাম ওখানকার রান্না পছন্দ করে। বিশেষ করে ডালাই-চা। চা খেয়ে খেয়েই হরনাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে। ওর ছেলে বা ভাইপোর মত ও কড়া নেশাও করে না সব সময়ে। বলে ওর রক্ত না কি এমনিতেই গরম।

বোধহয় কেউ একজন ভেতরে গিয়ে বলে এল মোতাহের এসেছে। শুনেও তাড়াহুড়ো করল না হরনাম। ঠিক সময়ে মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল। কদম গাছের নিচে, যেখানে মোতাহের দাঁড়িয়েছিল সেখানে এল। গাছটার ছায়া বেশ ঘন।

'তু এসে গেলি ?' হরনাম খুব একটা অবাক হয়নি, তবে বোধ হয় একটুখানি ধন্দ খেয়েছে।

'রামধানী বলেছিল তু আসবি।' হরনাম ওর পিঠে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিয়ে গাড়ীর দিকে হাঁটতে শুরু করলে। মোতাহের গাড়ীতে উঠে বলতে শুরু করল সব। হরনামকে ছেড়ে যাবার পর ওর নছিবের ওঠা-পড়া। হরনাম কিন্তু খুব একটা জবাব করল না। ও যেন কি ভাবছে আর ভাবছে।

'আগে এলি না কেন ?'

'কর্তারের ডরে হজুর।'

'কর্তার তো জেলে রে!' হরনামের চোখে যেন একটা সন্দেহ ঝিলিক দিল।

'আমি জানি না হজুর। আমি জেলে ছিলাম।'

'তু তি জেলে গিয়েছিলি ? কেন ?'

'পাবলিককে চালা দিয়ে ছিলাম হজুর।' মোতাহের ওর জীবনের এই দারুণ গুরুতর ঘটনাটি আবার বলতে যাচ্ছিল বিস্তার করে কিন্তু হরনাম ভাল করে শুনল না। রাস্তার দিকে, বিশেষ করে জঙ্গলের দিকে ও ঘনঘন চাইতে চাইতে চলল।

'আজ রাস্তায় গাড়ী বেশী নি হজুর।'

'না।'

'কর্তারের কেন জেল হল ?'

'তু সব জানিস, ইয়ু শয়তানী খেলছিস ?' হরনাম একটু হেসেই জিগ্যেস করল।

'না হজুর, আমি জেলে ছিলাম। আমার পাবলিক মেরে দিল হজুর…'

'তু যে সেই লাশ রেখে এলি মোতাহের…'

'সি তো চুকে গেল হজুর।'

'না। উ জায়গায় এক শালা এল, আই, ছিল উ কিড়ের মত লেগে রইল। এত টাকা খাওয়ালাম, শালাকে নগদা চালান করে দিলাম, উ ঘুরে ফিরে ধানবাদেই এল।'

'হজুর, আমি জেলে ছিলাম, আমি কিছু জানি না।'

'খুঁজে খুঁজে, উ মেয়েটার কেসটা আবার তুলল রে। প্রীতম, দলীপ, কর্তার উ-রা সব চালান হয়ে গেল।'

'কেন ?'

'উ-রা সব ছিল যে, আরো আরো আদমী ছিল। বনশীবাবুকে জানিস ? বনশীবাবুর ম্যানেজার, কলকাতার ছটোবাবু, সবাই ছিল। সবাই চালান হয়ে গেল।'

'চহুর' আমি ছেলে ছিলাম হুহুর···'

'হামার গুদাম এখন নাই রে, মোতাহের, গুদাম নাই, কারবার বউরের নামে লিখা করে দিয়েছি। হামাকে যদি উ-রা ধরে নিত তো কারবার ভি জলে যেত। তু' হতে ই-সব হ'ল মোতাহের। ওরা জানত তু বেইমান চবি।'

ক্যাঁচ করে হরনাম গাড়ী থামাল। গাড়ীর শব্দ যেন একমাত্র শব্দ ছিল। গাড়ী থামতেই কিঁকি পোকার ডাক জঙ্গলের দিক থেকে ভেসে এল। তা ছাড়া খস্‌খস্ শব্দ। শুকনো পাতার ওপর, দিয়ে কোনো জানোয়ার চলেছে। মোতাহের নিজেও একবার এ রাস্তায় হায়েনা দেখেছিল। হায়েনার হাসি বড় ভয়ঙ্কর।

হরনাম এখন হাসছে। চোখের চাউনি একটু ঝাপসা মত, একটু আহির-আহির।

'হামি ভি ছেলে বেলায় জানদি?'

'কেন হুহুর? আপনি তখন গুদামে ছিলে, আমি তো ছেলে গেলাম হুহুর·····' মোতাহের অসংলগ্ন আর আবোল-তাবোল কি সব বলে গেল।

'গাড়ী হামার,উ-রা হামার লোক। ই কারবারে বাবুরা পয়সা দেয়, তাদের পয়সা হয়, তু হতে হামার সব নাশ হয়ে গেল।

পই কথা, পরিষ্কার কথা। বাবুরা পয়সা দেয়, যাদের আছে তারা দেয়, হরনামরা গাড়ী দেয়। মোতাহেররা মাঝ থেকে জেনে গিয়ে যত গণ্ডগোল বাধায়।

'বেইমান!' হরনাম ওকে ঠেলতে ঠেলতে খাদের ধারে আনল। ডানদিকে পাহাড় আর জঙ্গল। বাঁ-দিকে খাদ। অনেক নিচে সুবর্ণরেখার চড়া আর বালি। ল্যাণ্টানা ঝোপের উপর গাড়ীর আলো পড়েছে।

'তু-কে হামি ছোকা বলে জানতাম। পুলিশের টাকা খেয়ে হামার নামে চুকলি করেছিলি বেইমান!' হরনাম গর্জে উঠল।

'আমি জানি না হুহুর···পাবলিক মেরে ছিলে। আমি তখন ছেলে···'

মোতাহেরের কথাটা মাঝ পথে ঝক্ করে থেমে গেল। যেন ইদের বকরীকে জবাই করে দিল কে। পাঁজরা আর ফুসফুসে বারোইঞ্চি ইস্পাত নিয়ে মোতাহের নিচের দিকে গড়িয়ে গড়িয়ে চলল। অনেক নিচে, সুবর্ণরেখার দিকে। ল্যাণ্টানা ঝোপে পদশব্দ শব্দ করে মোতাহের চারশো ফুট উপর থেকে ধপ করে পড়ল। সুবর্ণরেখার বালিতে ওর নশ্বর ওর জন্যে সাড়ে তিন হাত জায়গা মেপে রেখেছিল।

ধীর পদক্ষেপে ফিরে চলেছেন। পেছন ফিরে একবারও তাকালেন না। চলার মধ্যে ফুটে উঠছে দুর্বলতা। ক্লান্ত পদক্ষেপ।

ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে লিডিয়া। ভাবছে একবার ও হয়ত ফিরে তাকাবেন। না! ধীরে ধীরে তিনি মিশে গেলেন জনতার সঙ্গে। লিডিয়ার বুকফেটে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস। জানি না আর কবে দেখা হবে!

ঘন্টা পড়ল। ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করছে গাড়ীটা। না, আর হয়ত দেখা হবে না!

লিডিয়া আর চেখভ!

'পিটার্স' বুর্গের সেই দিনগুলো কি করে ভুলবে লিডিয়া। কি করে ভুলে থাকবে সেই আনন্দময় মুহূর্তগুলোকে!

যাক্ একদিন হয়ত সবই এমনি করে শেষ হয়। এমন ভাবেই ভুলে যেতে হয় আপনজনকে। যাকে কাছে পাওয়ার পরম আর্তি আর চরম সাধনা—সে হয়ত এমনি করেই যায়!

কিন্তু কি করে ভুলে যাবে সেই প্রথম দর্শনের দিনটি!

ছোটবোন নাদিয়ার বাড়ীতে তাদের প্রথম দেখা। সেই প্রথম দর্শনেই অভিভূত। চিরকাল লিডিয়া চেখভের গল্প ভাল বেসে এসেছে। ভালবেসেছে সেই সঙ্গে চেখভকেও! তাই মন প্রাণ দিয়ে খুটিয়ে খুটিয়ে পড়ে তার প্রতিটি রচনা।

নাদিয়া আর সাভির সুন্দর সংসারে সেদিন এসে ছিল আনন্দের জোয়ার। এসেছিলেন অনেক খ্যাত অখ্যাত লেখক আর সাংবাদিক। সাভি সম্পাদক—প্রকাশক।

লিডিয়ার নিরুপম সৌন্দর্যে মুগ্ধ চেখভ। অপূর্ব সুন্দরী। একদৃষ্টেই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। বিস্ময় শুধু বাড়ে। আকর্ষণ ক্রমশঃ নিবিড় হয়ে আসে। চেখভ হাসে। মুগ্ধ লিডিয়া।

চেখভকে ভাল লাগে। আর ভাল লাগে চেখভের আলোচনা। চেখভ যেন সবই বলছে তাকে। সব কথারই লক্ষ্য লিডিয়া। শুনে আনন্দ পায় চেখভ, লিডিয়া দেখে। দেখা বেরিয়েছে এখানে ওখানে।

সেদিন অনেকক্ষণ কথা চলে।

চেখভ তাকে 'আইভনোভ' অভিনয় দেখতে আমন্ত্রণ জানায়।

লিডিয়া বলে—আমি কি করে যাই! আমার আছে সংসার—পুত্র কন্যা স্বামী। কোলে একটি বাচ্চাও আছে।

শুনে যেন চেখভ পুলকিত। লিডিয়া মা জেনে তিনি যেন আরো অভিভূত।

লিডিয়া আরও আশ্চর্য হয়ে যায়। চেখভের কথায় তার পৃথিবী যেন সুন্দর হয়ে ওঠে। মাইকেলকে নিয়ে তার অতৃপ্ত জীবনের কয়েক দিনগুলোতে কে যেন নতুন রঙ এনেদিতে চায়। তার আকাশ কত বড়। সে মা! সে কত সুখী!

বিদায় নিয়ে ফিরে আসে লিডিয়া।

মন আজ আনন্দময়। কম্পমানের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। পেছনে মাইকেল। স্বামী। লিডিয়ার লজ্জানম্র বেশ তাকে বিক্ষুব্ধ করে। কুৎসিৎ ভাবে বলে ওঠে—তোমার সেই চেখভের সঙ্গে ভালবাসার খেলায় মেতে উঠেছিলে বুঝি। ঘরে যার কয় সন্তান, তার আবার এসবও আসে!

হায় কি কুৎসিৎ জীবন। সব আনন্দ আহ্লাদ একমুহূর্তে ম্লান হয়ে যায়। একি মর্মান্তিক সংলাপ! কি নিরানন্দ! এ তো সে চায়নি। জীবনকে এতখানি দীন ভাবেনি সে। বাঁচার আনন্দ এ ভাবে হারাতে হয়, এই কি জীবন! তবু চেখভ তাকে প্রাণ দিয়ে যায়। চেখভ তাকে দেখায় বেঁচে থাকবার একমাত্র পথ।

সে অনেক দিন আগেকার কথা। মাইকেলের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকাপাকি ঠিক হয়ে গেছে। লিডিয়ার বিয়ের কথা শুনেই 'রাশিয়ান থটে'র সম্পাদক সাবধান করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—

ওপথে যাবেন না। লেখক জীবনের ইতি হবে।

কিন্তু লিডিয়া প্রমাণ করতে চেয়েছিল তা অসম্ভব।

অসম্ভব সম্ভব হোল।

মাইকেল তার জীবনে যেন দুষ্ট গ্রহ।

লিডিয়া লিখতে বসলে মাইকেল এসে হল্লা করে। গান করে। শিস দেয়।

এর মধ্যে দিন কাটে। সংসার চলে। লিডিয়া যেন আপোষ করে নেয়। মাইকেলের নিরানন্দ সংসারে লিডিয়া একমাত্র স্ত্রী বনে যায়। তার যেন আর কোন সত্তা নেই। সে হারিয়ে যায়।

বছরের পর বছর সন্তান আসে। আসে মনের মৃত্যু এগিয়ে।

কিন্তু একদিন চেখভ আসে। আসে সমস্ত মন-প্রাণ নিয়ে। দুরন্ত ভালবাসার আগুনে উদ্দীপ্ত করে তোলে লিডিয়াকে। সে ভালবাসার স্পর্শ পায় লিডিয়া। মাইকেল বোঝে। কিন্তু সে জানে এ পথে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই।

আবার আসে চেখভ। প্রথম সাক্ষাতের তিন বছর পর। উন্মুখ হয়েছিলেন দু'জনেই। কবে আবার দেখা হবে! অদর্শন যেন তাদের অনেক কাছাকাছি টেনে এনেছে। উন্মনা দু'জনেই।

দেখা হয় সাভ্যির বাড়ীতেই। ছুটে যায় লিডিয়া। দু'হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নেন চেখভ। লিডিয়া চেখভের প্রশান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—

—ভাবি নি আবার আমাদের দেখা হবে!

—আমি জানতাম তুমি আসবে—বলেন চেখভ।

উৎসবের ভিড় এড়িয়ে তারা দু'জনে গিয়ে বসেন ড্রয়িং রুমে। দীর্ঘদিন পরে দেখা! কত কথা জমে আছে। আজ আর্গল খুলে তারা বেরিয়ে আসতে চাইছে। মন-প্রাণ উথলে ওঠে লিডিয়ার। উচ্ছ্বসিত সে। মনে পড়ে না তার স্বামী আর সন্তানদের কথা। এখানে শুধু সে আর চেখভ।

প্রশান্ত চেখভ। কেমন যেন উদাস। অন্ধকার আকাশে মিটমিট তারা। সেদিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছেন তিনি বন্ধ জানালার মধ্য দিয়ে। হঠাৎ তিনি বলে ওঠেন—

জান লিডিয়া আমরা একদিন হারিয়ে গিয়েছিলাম। সে যেন কোন আর এক জন্মের কথা। আমার মন কেঁদেছে। কেঁদেছে তোমারও। মন আমাদের ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। খুঁজেছি উভয়ে পরস্পরকে। তারপর হঠাৎ একদিন আমার হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছি।

হয়তো তাই—বলে লিডিয়া।

জান লিডিয়া—ভালবাসার একখানা নৌকায় চেপেছিলাম আমরা দুই বন্ধু—দুই যুবক যুবতী। একদিন ডুবে গেল আমাদের নৌকাটা। তুমি দু'হাতে জড়িয়ে ধরলে আমার গলা।

লিডিয়া বলে—আমি তো সাঁতার জানি না। ভয় পেয়েছিলাম।

আমি ও সাঁতার জানি না। তাই ডুবলাম দু'জনেই।

লিডিয়া তাকায়। দেখে চেখভকে। এতটুকু ছলনা নেই। শান্ত কণ্ঠে সে বলে ওঠে—তোমাকে আমিই ডুবিয়েছি চেখভ। কিন্তু তাতে আমার দুঃখ নেই একফোটাও। আমি জানি আমার হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে আমি আবার ফিরে পেয়েছি।

তুমি আমায় অবিশ্বাস কর না তাহলে—বলেন চেখভ।

তুমি আমায় ভোবালে—আর আমি কি তোমায় বিশ্বাস করতে পারি—। হেসে ওঠেন দু'জনে।

কি মধুর সম্পর্ক। কী গভীর তাদের প্রেম।

জান চেখভ, বিয়ের আগে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। তখন তোমায় খুঁজেছি অনেক। কিন্তু তখন পাইনি। ব্যর্থ অপেক্ষায় কেঁদেছি। ভেবেছি তুমি আসবে। তখন থেকেই তুমি আমার হৃদয়ে আসন নিয়েছ। আর আজ, আজ আমি পর স্ত্রী। আমার পেছুটান গভীর। বাস করি মাইকেলের ঘরে। তার সন্তানের জন্ম দেই। কিন্তু আমার হৃদয়-মন তোমার চিন্তায় ভরে আছে সর্বক্ষণ। আমার উন্মনা উদাস ভাবকে ঘৃণা করে মাইকেল। কুৎসিৎ ভাষায় গালি দেয়। তবুও আমি তোমায় ভুলতে পারি না।

—লিডিয়ার কথায় বিস্মিত চেখভ।

সে রাতে লিডিয়া চেখভকে নিয়ে যায় মাইকেলের সঙ্গে আলাপ করাতে। মাইকেল অভ্যর্থনা জানায় চেখভকে। কিন্তু অনেক নীরবে। যেন লিডিয়ার ভয়েই চেখভকে সে স্বীকার করে নেয়।

তারপর আর এক জীবন, আর এক অধ্যায়। দু'জনের না-বলা মনের কথায় ভরে উঠত চিঠির পাতা। লিডিয়ার বাঁধাধরা জীবনে ওটাই ছিল বড় আনন্দ। বেঁচে থাকার মস্ত বড় প্রেরণা। চেখভের চিঠি দেখে মাইকেল। কিন্তু চেখভকে লেখা লিডিয়ার চিঠিগুলো দেখতে পায় না।

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সে। তবু লিডিয়া নিজের পথে অটল।

আবার আসে চেখভ। এবার বাধা তোলে মাইকেল, তুমি চেখভকে দেখতে অমন করে ছুটে যাও কেন লিডিয়া! এই ভাবে তুমি যে আমাকে ভুলে যাবে। ভুলে যাবে নিষ্ঠুর ভাবে তোমার সন্তানদের।

কিন্তু লিডিয়াকে আটকাতে পারে না।

এবার দেখছি অনেক পাল্টেছেন। বয়স যেন বেড়েছে। লিডিয়াকে দেখে উচ্ছ্বসিত তিনি। শুনতে চান লিডিয়ার ছেলেমেয়েদের কথা। শুনে আনন্দ পান।

চেখভ কেন বিয়ে করেন নি, জানতে চায় লিডিয়া।

বিয়ে—বিয়ে করলেই কি সুখী হওয়া যায়? তুমি কি সুখী লিডিয়া?

চেখভের প্রশ্নে ধাক্কা খায় লিডিয়া। কি সাংঘাতিক কথা! কি বলতে চান? নীরবে বলতে থাকে—সুখ কাকে বলে জানি না—তবে আমার জীবনে এখন চাই মুক্তি, চাই সুখ। তাই-ই আমার কাম্য। জানি এই সংসার-জাল থেকে আমার মুক্তি নেই। ভুলে থাকতে চাই নিজেকে। নিজের সত্তাকে।

এ-কথায় উত্তেজিত হন চেখভ। বলে ওঠেন—এ কথাই তো তুমি লুটিয়ে তুলতে পার লিডিয়া। বলতে পার নারী জীবনের বঞ্চনার কথা, তোমার গল্পে উপন্যাসে। জান লিডিয়া আমি যদি বিয়ে করতাম—তবে আমার স্ত্রীকে রেখে দিতাম দূরে। তাহলে আমাদের সম্পর্ক থাকত মধুর। কাছে থাকার তিক্ততায় বিবাক্ত হোত না সে সম্পর্ক।

সে রাতের আলাপ বেশীদূর এগোয় নি। তবে তারা যে কত কাছাকাছি তা আর কারো কাছে অস্পষ্ট ছিল না।

আবার তাদের দেখা হয় পিটার্সবুর্গের শেষ প্রান্তে এক বাড়ীতে। শীতের রাতে বরফ জমা পথে দু'জনে পাশা-পাশি বসে ফিরছিলেন স্লেজ গাড়ীতে। লিডিয়া সেদিন বলেছিলেন তিনি একটি অমর প্রেম-কাহিনী লিখবেন। প্রেমিক জানে না প্রেমিকার প্রেমের কথা। সে যে কত গভীরভাবে ভালবাসে তার পরিচয় তার চিঠিগুলো। সেই প্রেমিকের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল হোল প্রেমিকার হৃদয়ের উজাড় করা ভালবাসা। সেই মানুষ যদি তুমি হও, তবে উৎকণ্ঠিত প্রেমিকা যেন হারিয়ে না যায়।

লিডিয়া আমন্ত্রণ জানায় চেখভকে একদিন রাতে। সেদিন মাইকেল থাকবে না বাড়ীতে। চেখভ আসবে। লিডিয়ার মন তাই নেচে ওঠে আনন্দে। সারাদিন প্রস্তুতি চলে তার। নিজের হাতে খাবার তৈরি করে সাজিয়ে রাখে। এমন সময় আসে মাইকেলের এক বন্ধু আর তার স্ত্রী। যাদের সহ্য করতে পারে না লিডিয়া। সাজান খাবার খেয়ে যায় তারা। এই

মুহূর্তে আবির্ভাব চেখভের। মন ভেঙে গেছে লিডিয়ার। কোন কিছুতেই আনন্দ নেই তার। একান্তে পেতে চেয়েছিল সে চেখভকে। কিন্তু একি দুর্বিপাক। বিষণ্ণ মন তার। তারা চলে যায়। লিডিয়া স্বাভাবিক হতে পারে না। বিস্মিত চেখভ। হতাশ হয়ে পড়ে সেও। রাগ করে চলে যান সেদিন।

তারপর থেকে লিডিয়া আশ্চর্য অধীর। সব সময়েই উন্মনা উদগ্রীব। কি খোঁজে, কার জন্যে পথ চেয়ে থাকে। মাইকেলের তাড়নায় দিন দিন আরও বিদ্ধ হয়ে ওঠে। জীবন ক্রমশঃ তিক্ত হয়ে উঠতে থাকে। জানে না সে তার এই মন নিয়ে খেলার পরিণতি কোথায়।

কিন্তু হঠাৎ একদিন চেখভকে সে খুঁজে পায় এক রন-নাচের আসরে। লিডিয়া ভেঙে পড়ে। বলে ওঠে—

জান চেখভ, আমার জীবনের আনন্দ মুহূর্তগুলি তোমাকে ঘিরে। তোমাকে ছেড়ে আমি দূরে থাকতে পারি না। তুমি বিশ্বাস কর চেখভ!

তোমার ভালবাসার অবিশ্বাস আমার নেই লিডিয়া। আমাদের মনের সে বেদনাদায়ক-সংগ্রাম তাহলে আমাদের পবিত্র ভালবাসার জন্যেই।

ক্রমশঃ লিডিয়ার জগত থেকে মুছে যেতে থাকে মাইকেল। মুছে যেতে থাকে তাদের সন্তান। লিডিয়ার শয্যায়, তার পাশে যেন শুয়ে আছে চেখভ। সে স্বপ্ন দেখে চেখভকে। চেখভকে ভেবে ঘুমায়। সে যেন চেখভের শয্যাসঙ্গিনী। কি নিদারুণ যন্ত্রনায় ঘরে কাতর লিডিয়া।

তারপর এক চরম মুহূর্তে দেখা হোল চেখভ আর লিডিয়ার। কেউই প্রস্তুত ছিল না এর জন্য।

অসুস্থ শরীর নিয়ে চেখভ এসেছেন মস্কোয়। কিন্তু সে-কথা জানাননি লিডিয়াকে। চিঠি দিয়েছেন লিডিয়া যেন মস্কোয় আসে তার হোটেলে। নিশ্চিন্ত কাটাতে চায় একটি দিন।

দেখা করতে যায় লিডিয়া। কিন্তু কোথায় চেখভ। সবই আছে ঘরে। কিন্তু চেখভ নেই। দারুণ হতাশায় ভেঙে পড়ে লিডিয়া।

তারপর খবর পায়। চেখভ দারুণ অসুস্থ। মুখ দিয়ে অবিরত রক্ত উঠছে। লিডিয়া ছুটে যায় হাসপাতালে। অনেক অনুরোধের পর দেখা পায় চেখভের। তাকে দেখে উত্তেজিত চেখভ। লিডিয়া শুধু জানতে চায়—

কেমন আছো?

নিদারুণ শ্রান্ত চেখভ। কথা বলতে কষ্ট হয়।

সেই মুহূর্তগুলি অমর। দু'জন দু'জনকে শুধু অবাক-বিস্ময়ে দেখে। দু'একটি কথার পর বিদায় নেয় লিডিয়া।

কিন্তু এ কি দেখে এল চেখভের মুখে? এ যে মৃত্যুর পদধ্বনি! জীবনকে সেকি পাবে না! বারে বারে কি ধরা দিয়েও হারিয়ে যাবে! চেখভও যেন সেই হারিয়ে যাওয়া পথেরই আর একজন পথ যাত্রী। লিডিয়ার জীবনের চারদিক বিষণ্ণতায় যেন মোড়া। আকাশ বাতাস পথ ঘাট নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সবই কি এমনই ব্যর্থতায় কেঁদে কেঁদে ফিরবে।

সারাটা জীবন তাকে কেবল আঘাতই পেতে হবে! তার জীবনে আনন্দ নেই। নেই পূর্ণিমার নির্মল চাঁদ—সূর্যের আকাশ বরফ ঢাকা করুণ!

চেখভ তো অনেক কিছু চেয়েছিল তার কাছে। কিছুই তো সে দিতে পারে নি। সঙ্গীহারা চেখভের জীবনে সে উজ্জ্বল আলো জ্বেলে দিতে পারল কৈ। বেদনার মাঝখানে সুখের সামান্যতম স্পর্শটুকুও দিতে পারল না! এই কি জীবন!

আবার যায় লিডিয়া। এবার নিয়ে যায় লাল গোলাপ, লিলি। চেখভের বড় প্রিয় ফুল। চেখভ সজীব হয়ে ওঠেন। লিডিয়ার দেরী হওয়ায় ক্ষুব্ধ হন। ক্ষুব্ধ হন যখন লিডিয়া জানায় সে কালই ফিরে যাবে পিটার্স-বুর্গে। আপত্তি জানায় চেখভ। কিন্তু মাইকেলের ভয়ে ভীত লিডিয়া। তাকে আটকাতে পারেন না চেখভ। ফিরে যায় সে।

তারপর দীর্ঘকাল দেখা নেই।

এমন সময় প্রকাশিত হোল চেখভের 'অ্যাবাউট লাভ' গল্পটি।

এ গল্পের নায়ক তারা দু'জনে। নায়ক চেখভ, নায়িকা লিডিয়া। বাস্তব সত্য ঘটনা। চেখভেরই নিজের জীবন—সে এক নিদারুণ কাহিনী। এই গল্পের পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে তাদের প্রেম-জীবনের কথা। গভীর ভালবাসার কথা বলতে চেয়েছেন এই কাহিনীতে। চেখভের নায়ক বলেছেন, তিনি নায়িকার স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে সাজানো সংসার ভেঙে দিতে পারেন না। তারা পরস্পরকে ছেড়ে বাঁচবে কি করে।

আবার দেখা মস্কোর সেই রেল স্টেশনে। ১৮৯৯ সালের ১মে।

তারপর লিডিয়ার কাছে চেখভ স্মৃতি।

জীবন্ত হোল চেখভের চিঠিগুলো।

ইতিহাস.এরপর সম্পূর্ণ নীরব।

সমীরণের বিয়ে

শিশির লাহিড়ী

সমীরণের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

একে শ্রাবণের এই ভ্যাপসা গরম, তার আকাশের মজাব বোঝা ভার; এই টলটলে নীল, এই চড়চড়ে রোদ্দুর, আবার এই কালো মেঘ ঘনিয়ে এল, গুড়গুড় করে মেঘ ডাকল, তারপর নামল বৃষ্টি। কালো কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে সমীরণ বিপদ গুনল, টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত ছুটোছুটি করতে করতে ঘাম বেরোবার হয়ে যাচ্ছে, এরই মধ্যে যদি আবার বৃষ্টি নামে তাহলেই কর্ম ফতে।

সিগারেটের ধোঁয়া গলায় আটকে একটা বিষম খেল সমীরণ, মুখটা তেতো তেতো লাগল। সিগারেটের টুকরোটা আঙুলের টোকা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে চেয়ার ঠেলিয়ে দোওয়ার মত বসল। এতদিন 'ভক্তে', 'হবে' 'ভবিষ্যৎ' এসবকান একেবারে পাকা কথা দিয়ে দিয়েছেন মা, বাবা। সামনের সাতাশে বিয়ে, আজ বিশে, মাসে মাত্র সাতটা দিন। অন্যমনস্ক সমীরণ টেবিলে রাখা ফটোটা তুলে নিয়ে, অপ্রয়োজনে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ফটোর দিকে চেয়ে থাকল।

ফটো দেখে কিছু বোঝা যায়? যেমন বাবা, তেমনি মা। তার উপর বাপটাও কি হয়ে গেছে আজকাল। এই তো দুমাস আগেও বেশ কুলিয়ে চাকিয়ে খাচ্ছিল। ভিজে বেড়ালের মত একপাশে বসে খাতা পত্তর নিয়ে ইউনিভার্সিটি যাবার নাম করে কার্জন পার্কে সেই কুলপিওলা কালো আর্টিস্ট-ইথমেন্টার সঙ্গে বসে বসে আড্ডা মারত, বাসায় ভাত্তো খেত, আর এরি মধ্যে দুমাস বিয়ে হতে না হতেই একেবারে বদলে গেল। মেয়ে দেখতে গেল, আর, বোদ, ঘরে ঢুকিয়ে লাজুকে দুটো কথা বলে না, তা নয়, ফটোটা ছুঁড়ে দিয়ে, গুমরে ছুটে বের হয়ে গেল।—কি ব্যাপার? না, শ্বশুর বাড়ি যেতে হবে এখুনি, গাড়ি নিয়ে বসে আছেন, আর পাওতির চোখে চালাকে। চালকে না চাই! সমীরণ হাতে হাত ঘষল, মনে মনে বলল, আসতে আজকালকার মেয়েগুলো হয়ে উঠেছে কড় ছাংলা, একমিনিটও যেন ছেড়ে থাকতে পারে না। আরে বাবা, বর কি আইসক্রীম, যে সব সময় চুষে চুষে খাবি? সেলফিস! হাড় সেলফিস সব।

দরজা ঠেলার আওয়াজ হতে সমীরণ হাতের ফটোটা টেবিলে নামিয়ে রাখল, সিগারেট হাতের মুঠোয় লুকিয়ে বসল। মস্ত একটু ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব। মোক্ষদাময়ী ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন, তোদের ব্যাপারটা কি বল খোকা? এখনও ঘরে বসে? হাতে কটা মাত্র দিন,

দুয়েকজন এয়ো টেয়ো না আসলে আমি একা হাতে হাতে কি করি বল দিকিনি?—ছিরি বরণডালাই বা কে গড়ে?

সারা সকাল ঘরে ঘুরেছে সমীরণ। বাবার শুধুই মুখে হাক-ডাক, কাজের চেয়ে আওয়াজ বেশি, এ'কটা দিন ঘুরতে ঘুরতে কাজ করতে করতে বেঁচে থাকলে হয়। সমীরণ গোমড়া মুখে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বলল, অর্ডার দিয়ে দাও।

মোক্ষদাময়ী হতচকিত হয়ে পড়লেন, অর্ডার দিয়ে দেব কিরে? আজকাল কি এ-সব কিনতে পাওয়া যায় নাকি?

সব! মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি-হাসি মুখ করল সমীরণ, মা-মণি তুমি সেই সেকেলেই রয়ে গেল। আজকাল প্রজাপতি অফিসে অর্ডার দিলে, তারা গাদা গাদা কনে, ভট্টাচার্যি, নাপিত টাপিত এনে বিয়ে পর্যন্ত দিয়ে যায়;—ছিরি বরণডালা কোন ছার।

মোক্ষদাময়ী হেসে ফেললেন, আবার ফাজলামি।

সমীরণ ব্যাঙের মত মুখটা কোলাল; বেশ, কথা বললেই যদি ফাজলামি হয়, তাহলে আমি স্পিক-টু-নট্। এই চুপ করলাম।

মোক্ষদাময়ী আরও কাছে এগিয়ে এলেন, ছেলের মাথায় হাত রেখে, চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললেন,—ও মানুষটা মানুষের বার, তার ওপর তুইও রাগ করলে আমি কি করি বলদিকিনি! নে, ওঠ, মুখ হাত-পা-ধুয়ে নে। একবার তোর বড়পিসি, ছোটমাসি, রানীদের বাড়িটা আমায় ঘুরিয়ে আন। নইলে আতান্তরে পড়ে যাব। চিৎকার, চেঁচামেচি আর রাগারাগিতে শুভকাজ গোড়াতেই ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

সমীরণ উঠে পড়ল, বুকল গায়ে ফুরফুরে হাওয়া লাগিয়ে, পরণের পাঞ্জাবি পরে, গোড়ের মালা গলায় ঝুলিয়ে, বিয়ে করতে যাবার আগে অনেক দুর্ভোগ সইতে হবে।—মর্ণিং সোজ মি তে।—যে ভদ্রলোক এ-কথা প্রথমে বলেছিলেন তাঁকে বোধহয় নিজের বিয়ের কাজ, সব নিজেকেই করতে হয়েছিল। অগত্যা সমীরণ ঘুরে [illegible] বেড়ি করে যাও, কোথায় যাবে চল।

বাড়িতে পা দিতে না দিতেই সমীরণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত লোক গিজগিজ করছে। চারিদিকে কলকল আওয়াজ উঠছে।—শালা যেন অফিস টাইমের ষ্টেটবাস। সমীরণ মনে মনে গজগজ করল, ভীড় ভীড়: আর ভীড়! ঘাম, গন্ধ, কলকোলাহল এড়িয়ে সমীরণ নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

থাক,—বাঁচা গেল। এবার নিশ্চিন্তি। স্বার্থপরের মত সমীরণ ভাবল, শিব দিল।

আরেব্বাস! কি শিব! অন্ধকার-অন্ধকার বিছানা থেকে কে যেন কথা বলল, সমীরণ চমকে উঠে আলো জ্বালিয়ে তাকিয়ে দেখল—নন্দা, ছন্দা আর রমাদি তারই বিছানায় ঘাঁকিয়ে শুয়ে। ব্যাজার মুখটাতে তরল হাসি মাখিয়ে সমীরণ বলল, আরে বাবা একেবারে ত্রিমূর্তি যে!

যাক বাবা,—দেখতে পেয়েছিস তাহলে, আমরা ভাবছিলাম, এক মূর্তির ধ্যানে ধ্যানস্থ হয়ে তুই আমাদের দেখতেই পাবি না।

—রমাদি হাসল।

কি যে বল! সমীরণ হাসল। তারপর ছন্দা ও নন্দার দিকে তাকিয়ে বলল,—তা আবার এ দুটো টিন এখানে কেন?

—পাকাচ্ছি একটু।

তুমি আবার কি পাকাবে?—সমীরণ হাসল, ওরা তো পেকে টুসটুস করছে। সব সময় বালিকা বধূর রিহার্সাল দিচ্ছে মনে মনে।

আমরা না হয় রিহার্সাল দিচ্ছি, ছন্দা বলল, তা তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে সমুদা, পথে পথে বিবাগী হয়ে ঘুরছিলে নাকি?

যা বলেছিস। সার্টটা মাথার ওপর তোলা, জামা খুলতে খুলতে সমীরণ বলল, বিবাগী হবারই কথা। এত অ্যাও সামলাতে হবে জানলে, কোন শালা বিয়েতে মত দিত।

রমাদি হাসতে হাসতে [illegible] বলে সোনার-টোপর, না লোহার-টোপর।

সুস্থিপরে পাখার নিচে বসতেই টকটক ঘাম-ঘাম গন্ধে আয়গাটা ভরে উঠল। —কি বিশ্রী ওডার! নন্দা নাকে রুমাল চাপার ভঙ্গী করল, তুমি সেই চিরকালের নোওরাই রয়ে গেলে সমুদা। চুলটুল, ইয়েকিয়ে এখন কাটনি! কবে কাটবে?

দু'হাতের আঙুলে চুলগুলো চুড়ো করে তুলে ধরে নিরাসক্ত মুখে সমীরণ বলল,—কাটলেই হ'ল, না কাটলেও চলে।

ওরা দু'জনে মুখিয়ে উঠল। —না মশাই না, ওটা আগে চলত, এখন চলেনা।

ঐ কেয়ারফুল কেয়ারলেস ইমেজ। এখন সবই টিপ্-টপ্, পিন পয়েন্টেড, ক্ষুরের ধারে ধার।

রমাদি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল,—এতও জানিস।

ছন্দার বেলের গোড়ে কেয়ার খোপা নেড়ে, ছন্দার বাঁশির মত নাকটা টেনে সমীরণ বলল, খুব ধারটার বুঝতে শিখেছিস দেখছি,—তা কিছু লেখাপড়া হচ্ছে, না পাড়ায় পাড়ায় ধার দিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস খালি।

ছন্দা আঙুল তুলে নাড়ল। —সবডক্কা। বুঝলে সমুদা, লেখাপড়া পড়াশুনোর জন্যে নয়, ওটা একটা প্যাস্টাইম।

মা বাবার বলতে সুবিধে, নন্দা গা দুলিয়ে বলল, মেয়ের এবার থার্ড ইয়ার।

—তোরা এবার চুপ কর, রমাদি বলল, কাজের কথা কইতে দে।

—হ্যারে মেয়ে দেখেছিস সমু? কেমন দেখতে?

সমীরণের কাটা ঘায়ে কে যেন নুন ছিটিয়ে দিল।—না, ফটো দেখেছি, সমীরণ ঘোরে বলল, বিলিতি কোম্পানির তোলা ফটো।

ধ্যা বাবা! মেয়ে দেখছি, জানাশুনোও হয়নি! এ আবার কি রকম বিয়ে?

সে কিরে! রমাদি বলল, মেয়ে দেখিস নি? সত্যি?

তুমি তো তোমার কাকামণিকে জান রমাদি, সমীরণ ক্ষোভের সুরে বলল, মেসোমশাই মেয়ে দেখার কথা তুলেছিলেন, তা তোমার কাকামণি কি বলে জান!—আমার, ওর মার আর তোমার চোখে তো ছানি পড়েনি হারান, যে খোকাকে মেয়ে দেখাতে হবে? তাছাড়া, ওদের এখন বয়েসের চোখ হে, মেয়ে দেখলেই ভাল লাগে। ওরা আবার বিচার করবে কি?

রমাদি খুক খুক করে কেশে হাসি চাপতে চাপতে বলল, —তা রানী, কাকামণি এদের কাছে শুনেছিস নিশ্চয়ই।

রানীর কথা ছেড়ে দাও, ওটা গোল্লায় গেছে। আর —তোমার কাকী। সমীরণ মায়ের গলার স্বর নকল করল।—জানিস সমু মেয়ে দেখে এলাম। মেয়ে বেশ লম্বা-সম্বা, ধকধকে গড়ন-পেটন, এবার থার্ড ইয়ার চলছে, গান বাজনাও কিছু কিছু জানে।—আর কি বলব তোকে, মুখখানি এমন মিষ্টি না, দেখলেই মা বলে কাছে ডেকে নিতে ইচ্ছে যায়।—আচ্ছা বল, সমীরণ উত্তেজিত হল—এর থেকে কিসসু বোঝা যায়? না, আমিও 'মা' 'মা' বলে ডাকতে শুরু করব?

খিল খিল হাসিতে ঘরটা ভরে গেল।—তোর পেছনে-লাগা স্বভাবটা গেল না সমু, রমাদি বলল।—ও-রকম করলে বৌ না আবার পালিয়ে যায়!

সমীরণ হতাশ হতাশ ভঙ্গী করল।—শেষ অবধি বিয়ে হয় কিনা দেখ, তারপর পালান।

সমীরণ অফিস যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। আজই ছুটির দরখাস্তটা সই করিয়ে নিতে হবে। অফিসের বন্ধু বান্ধবদের নিমন্ত্রণ সেরে ফেলতে হবে। পরেশদা, ধর্তীন ওরা জানিয়ে যাচ্ছে। বাবা, ফাঁকতালে দু'খানা ভালডার লুচি আর অমৃতি খাইয়ে ম্যানেজ করবে ভেবেছো, সে সব হবে না বাবা। দু'এক পেগ মালকাল খাওয়াও, সেলিব্রেট কর, তবে না! বুড়ো হরিহরবাবুরও সঙ্গে আছেন, তাল ঠুকছেন, আর তো তোমার দেখা পাওয়া যাবেনা হে। আমাদের সান্ধ্য আসরকে তোমার নিত্য-বাসর যে দুও দেবে বাবা। যা হোক একটা ভাল করে

প্রি-ম্যারেজ বউনি হোক, তবে তো আমরা প্রাণখুলে আশীর্বাদ করবো যে তুমি ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করো। —ওদেরও আজ কোথাও নিয়ে গিয়ে একটু আধটু জলপান করিয়ে আনতে হবে। তাছাড়া, এতদিন খাটা-খাটুনি, এ-সব তো অভ্যেস নেই, নিজেরও গা-গতর কেমন যেন টাটিয়েছে, একটু রিক্রেসড হওয়া দরকার। ব্যস! তারপর কাল থেকে লক্ষ্মী ছেলে, তিনদিন ঘরে শুয়ে থাকবে, কোথাও যাবেনা। তারপর দেখা যাক কপালে কি আছে!

জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে সমীরণ শিষ দিচ্ছিল. মোক্ষদাময়ী ঘরে ঢুকলেন। আচমকা শিষটা থামিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে সমীরণ বলল, আবার কি!

ওহো! মোক্ষদাময়ী বলে উঠলেন, বড্ড ভুল হয়ে গেছে খোকা। একটি মেয়ে কাল তোকে বার দু'তিন ফোন করেছিল, বলেছিল, বড্ড জরুরি দরকার।—তা তোকে একদম বলতে ভুলে গেছি বাবা।

—মেয়ে? আমাকে ফোন করছিল?

—হ্যাঁরে হ্যাঁ!

—ধ্যাস! তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

—কি যে বলিস। তিন তিনবার ফোন করল, আর আমি ভুল শুনব।

—নাম বলেনি? ঠিকানা?

—না তো!

- তবে বোধ হয় কেউ ইয়ার্কি করেছে।

আমার মত বুড়ী মাসীর সঙ্গে কে ইয়ার্কি করতে আসবে? হ্যাঁরে খোকা, তোর কোন বন্ধুর বোন-টোন, কি অফিসের কোন মেয়ে-টেয়ে নয়ত?

সমীরণ তাকিয়ে দেখল, মায়ের চোখের ভুরুতে যেন একটা জিজ্ঞাসা উৎকণ্ঠিত হয়ে আটকে আছে। সমীরণ বিরক্ত বোধ করল,—না বাবা, ওসব মেয়ে ফেয়ের ব্যাপার আমার নেই! থাকলে তোমরা এতদূর এগুতে পারতে না। বুঝেছ।

মোক্ষদাময়ী ঘর ছেড়ে যেতে যেতে বললেন, ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না, তবে কোথায় যেন শুনেছি শুনেছি মনে হল। তা তোকে আবার ফোন করবে বলেছে, জরুরী দরকার কি না!

বাসষ্টপে দাঁড়িয়ে একটা বাস ছেড়ে দিল সমীরণ।—কে হতে পারে? কে? কি এমন জরুরী দরকার? বারবার তিনবার ফোন করেছিল, অথচ নাম বলেনি! কোথায় যেন একটা রহস্যের গন্ধ রয়েছে। সমস্যাটা ক্রমশঃ সঙ্কুল হয়ে উঠছে। কি রকম বিশ্রী উৎকণ্ঠা।—শালা মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে কি হত? সমীরণ ভাবল। তাহলে তো ফুঃ করে উড়িয়ে দিয়ে ভাবনার হাত থেকে রেহাই পেত।

অফিসে এসে কাজে মন বসল না সমীরণের, কেমন যেন উদভ্রান্ত উদভ্রান্ত দেখাল।

বতীন বলল, কি ব্রাদার! এত উড়ু উড়ু দেখাচ্ছে কেন?

কি বলবে ভেবে পেলনা সমীরণ। হাসি হাসি মুখ করে বলতে চেষ্টা করল, আর বলিস কেন? ঝামেলার কি অন্ত আছে ভাই। আজ আবার ছোড়ের পাঞ্জাবি, গরদের জুতো কিনতে যেতে হবে তাই ভাবছি।

একগাল হেসে বতীন বলল, সেটা আবার কি ব্রাদার। এরি মধ্যে এই? বিয়ে হলে না জানি কি করবি?

ওই হল আরকি! কথাটা উড়িয়ে দিয়ে সমীরণ খাতায় ঝুঁকে পড়ল, যা পালা, কাজ করতে দে।

বতীন যেতে যেতে হেসে বলল, মাথায় মেয়ে-ফেয়ে ঘুরলে, কাজ রসে উঠে যায়। আমার আর কাজ দেখিও না ব্রাদার।

খাতার অঙ্কগুলো সচল কালো কালো পিঁপড়ের মত চোখের সামনে নাচছে। যতবারই যোগ দিয়ে মেলাতে গেল সমীরণ ততবারই ভুল হচ্ছে। কেবল ঐ ফোন আর মেয়েটার কথা মনে পড়ছে সমীরণের।—কে হতে পারে? কে? কেন ফোন করল তাকে? কি এমন জরুরী দরকার? কি? কি? কি?

ঠিক লাঞ্চ-আওয়ার-এর আগেই ফোনটা ক্রিং···ক্রিং করে বেজে উঠল।

দিদি মেমসাহেবের উচ্ছল হাসিটা যেন শুনতে পেল সমীরণ।—মিষ্টার সেন। এ কল ফর ইউ। সমীরণ কোনটা তুলে কেমন যেন বোকা বোকা চোখে চাইল। দুরুদুরু স্বরে যতটা সম্ভব মিষ্টি করে বলল,—ইয়েস সেন স্পিকিং।

—আপনি কি সমীরণ সেন কথা বলছেন?

—হ্যাঁ।—আপনি কে?

—আপনি আমাকে ঠিক চিনবেননা, বিশেষ দরকার, আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে কি?

—হ্যাঁ। সমীরণ মন ভাববার জন্ত করে বলল, পাঁচটা অবধি অফিসে আছি। তার মধ্যে আসতে পারেন।

—না, না, অফিসে আমি যেতে পারব না। আমি এমব্যারাস্‌ড ফিল করবো।—তার চেয়ে অন্য কোথাও হলে ভাল হয়।—একটু নির্জন।

সমীরণ থমকে পড়ল, রহস্যটা ধরতে পারছে না। কাঠ কাঠ গলায় বলল, আপনি কে?

—ধরুন আপনার কোন শুভানুধ্যায়ী।

—কি দরকার?

—লাইফ এণ্ড ডেথের কোয়েশ্চেন, জীবন মৃত্যুর ব্যাপার!

সমীরণ চমকে উঠল, কি বললেন।

—ঠিকই বলছি।

—কোথায় যেতে চান?

—ধরুন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগান।

—কটা নাগাদ?

—এই চারটে থেকে চারটে দশ।

—যদি বলি, যাওয়া সম্ভব নয়।

—তাহলে বুঝবো, আপনি কাপুরুষ! কাউয়ার্ড।

সমীরণ আবার চমকাল।—যদি বলি যাবো।

—তাহলে জানবো, গাটস্ আছে। আপনার হবে।

ভাজ্জব ব্যাপার। মেয়ে না রকেট। সমীরণ ভাবল। বুদ্ধিতে শান দিতে একটা সিগারেট ধরান দরকার।—কি হল? মেয়েটি বলল।

ভাবছি। সিগারেটে আগুন জ্বেলে সমীরণ বলল, ভাবছি, চিনবেন কি করে?

এক মুহূর্ত যেন দম নিতে দেরী করল মেয়েটি। তারপর বলল, আপনার ফটো আমার হাতব্যাগে, ঠিক চিনে নেব।

—আমি চিনব কি করে?

অল্প কিছুক্ষণ নিশ্চুপে কাটল। তারপর মেয়েটি বলল, চারটে থেকে সওয়া-চারটে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ছাতিমতলা, একটি মেয়ে লাল চোলি, লাল শাড়ি, লাল স্লিভলেস ব্লু, মাথায় বুকে খোঁপা—চোখে কাল গগলস, হাতে কাল ভ্যানিটি। —এবার চিনবেন বোধ করি।

নিশ্চয়ই চিনব। সমীরণ বলল, কিন্তু আমি তো যেতে পারব না।

কেন? মেয়েটি যেন কিঞ্চিৎ বিমর্ষ ও হটাৎ উত্তেজিত।

—নাম না জেনে, অচেনা, অজানা কারও সঙ্গে দেখা করা যুক্তিযুক্ত বোধ করছি না।

—এক্সকিউজই শুনবেন?

—হ্যাঁ। কারণ দরকারটা যখন আপনার।

লিলি গুপ্ত। মেয়েটি ছোট্ট করে বলল।

এক মুহূর্ত বোধ করি সমীরণ স্তম্ভিত হয়েছিল, তারপর বলল, কি? কি নাম বললেন? ততক্ষণে লাইন কাটা, মেয়েটি ছেড়ে দিয়েছে।

ফোন নামিয়ে রেখে সমীরণ ভীষণ চঞ্চল বোধ করল। কি ব্যাপার? —লিলি গুপ্ত। পকেট থেকে আর একবার বিয়ের কার্ডগুলো বের করে নামটা মিলিয়ে দেখতে চাইল। —হ্যাঁ! ঠিকই তো। অমুক চন্দ্র অমুকের একমাত্র কন্যা কল্যাণীয়া লিলির সহিত—। সমীরণের কপালে বুদ্বুদ্‌বুদ্‌ বুদ্বুদ্‌ ঘাম ফুটে উঠল। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে যেন। গ্লাসে ঢাকা জলটা ঢক ঢক করে খেয়ে, টাইয়ের নট আল্গা করে, চেয়ারে হেলিয়ে পড়ল সমীরণ।

—অল্প পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করল। যে মেয়েকে

দেখা হয়নি বলে, একটা ক্ষোভে, অন্তর্দাহে সমীরণ পুড়ছিল, তার নিবৃত্তি হবে। বিয়ে হবে বলেই, শুভ-দৃষ্টির আগে একবার চাক্ষুস দেখা হবে না, এটা মেনে নিলেও মনে মনে মানতে পারছিল না সমীরণ। বেদনা পাচ্ছিল, হতাশ হচ্ছিল, অথচ বাক্ত করা যাচ্ছিল না। কিন্তু বেচে যখন সুযোগ এসে পড়েছে, তখন এমন সুযোগ ছাড়ার কোন মানেই হয় না। খুশীতে সমীরণ শীষ দিয়ে উঠল, একটা লোভে একান্ত লোভী-লোভী দেখাল সমীরণের মুখ। লিলি নামটাকে কেমন একটা গোল্লা পাকিয়ে মনে মনে বারবার আস্বাদ করতে থাকল সমীরণ, লিলি, লিলু, লিলুয়া! —লিলি, লিলু, লিলুয়া!…

পৌনে চারটের আগেই এসে হাজির হয়েছে সমীরণ। সমুদ্রের ঢেউ এর মত মনের একটা উত্তাল তরঙ্গ সমীরণকে তাড়িয়ে ফিরছিল। ছুটির দরখাস্ত সই করান, বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা, সর্বশেষে বিয়ের ব্যাপারটা সেলিব্রেট করার জন্য দু'এক পেগ চড়িয়ে নেবার কথা—সব যেন ভুলে গেল সমীরণ। —কাল হবে, বলে সমীরণ বের হয়ে পড়ল। —বের হয়ে, একবার মনে করল সমীরণ, এটা একটা মস্ত ধাপ্পা হতে পারে,—কিম্বা হয়ত আসবেনা লিলি, শুধুই একটা বেমক্কা ব্ল্যাঙ্ক দাবার করেছে ওর কোন বান্ধবী।

লিলির ফটোটা মনে মনে দেখতে লাগল সমীরণ। চোখের সেই হালকা আচ্ছন্ন ভাব, বেঁকান ভুরু, শাখের মত মুখ, কপালের কাছে ঝুরি নামান কয়েকটি রিং —সমীরণের মুখস্থর মত মনে পড়ছিল। মুখে একটা অদ্ভুত কমনীয়তা আছে। সমীরণ ভাবল,—আচ্ছা দেখাই যাক। তারপর সমীরণ ইতস্ততঃ হালকা ছায়ার ছায়ায় ঘুরতে লাগল। এরি মধ্যে এখানে ভিড় জমে উঠেছে। ঘাটিতে শুয়ে আছে ছেলেটি, তারি পাশে হেলান দিয়ে যে মেয়েটি বসে আছে, তাকে দূর থেকে দেখলে মনে হয়, ছেলেটির বুকের ওপর যেন হঠাৎ গজিয়ে ওঠা। …ওপাশে দু'জন কাঁধে কাঁধ লাগান, গভীর আলোচনায় মত্ত।… এপাশে আরও দু'তিন জনের দঙ্গল কামড়াকামড়ি করে বাদাম ভাজা খাচ্ছে আর কারণে অকারণে উচ্চগ্রামে হাসছে।

একটা কালো মেঘ উড়ে এসেছে। বাতাস থমকে আছে। হয়ত বৃষ্টি হতে পারে। সিগারেটে টান দিয়ে একটা রিং ছাড়ল সমীরণ। সেই বড়ো রিংটার ভেতর দিয়ে আর একটা মাঝারি, মাঝারির মধ্যে আরও একটা ছোট রিং গলিয়ে, সমীরণ তাকিয়ে থাকল।

একটার পর একটা, তিনটে সিগারেট খেল সমীরণ। —ওমোট কেটে এরি মধ্যে দমকা বাতাস দিচ্ছে, আকাশের দিকে তাকাল, কালো মেঘটা উড়ে উড়ে যাচ্ছে যেন, ওড়া মেঘের ফাঁকে মাঝে মাঝে পড়ন্ত দুপুরের রোদের ঝিলিক শানিত ছুরির মত ঝলসাচ্ছে। আকাশের থেকে চোখ নামিয়ে বাইরের গেটের দিকে তাকাল সমীরণ। কেমন একটা ভয় ভয় করছে, দুরু দুরু হিয়া। তাকিয়ে তাকিয়ে সমীরণ দেখল, একটা চলমান রক্তবিন্দু ক্রমশঃ যেন গাঢ় লাল, উজ্জ্বল লাল হতে হতে একেবারে প্রমাণ সাইজের মানবীর আকারে—চোখের ওপর ভেসে উঠল। সমীরণের বোধ হল ঠোঁট দুটো যেন শুকিয়ে উঠেছে। ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে একটা ঢোক গিলে সহজ হবার চেষ্টা করল সমীরণ।

কেমন যেন অত্যন্ত শ্লথগতিতে গা দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটছে মেয়েটি, দেখলে মনে হয় লম্বা দীঘল শরীরে সে হাঁটার ছন্দ নাচের মত ছড়িয়ে পড়েছে। সমীরণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকল, সিগারেটে টান দিতেও ভুলে গেল। এত রং, এতরূপ! যেন কোন সিনেমা-পোষ্টার থেকে এখুনি নেমে ছবিটা মানুষের মত হাঁটতে শুরু করেছে। তবু তো চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছে না সমীরণ! চোখে আবার না জানি কি যাদু আছে। সমীরণ ভাবল।

ঠোঁটের কোণটা একটু ভেঙে হাতে করে কামড়াল লিলি, বার দুয়েক ঘুরে যেন ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিল, তারপর ফিসফিস গলায় বলল, চলুন কোথাও গিয়ে একটু বসি।

গলা খেঁকারি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিল সমীরণ, তবু যেন স্বরটা একটু কেঁপে কেঁপে গেল। — বাদাম চলবে।

চলতে পারে। লিলি হাসল।

—হাসিতে যে এমন করে বাঁশি বাজে সমীরণ জানত না। অহুচ্চ কণ্ঠের সে হাসিটা সুরেলা একটা প্রজাপতির মত উড়তে শুরু করল। সমীরণের কান ভোঁ ভোঁ করে উঠল, মনে হল দম আটকে যাবে।

শিথিল ভাবে ভেঙ্গে খোসা ছাড়িয়ে একটুকরো বাদাম মুখে দিল লিলি। —আপনাকে বলে আপনি হয়ত কষ্ট পাবেন, তবু বলতে হচ্ছে। এ বিয়েতে আপনি মত দেবেন না মিষ্টার সেন।

ঠিক এরকম একটা পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না সমীরণ। কান গরম হয়ে উঠল সমীরণের, মুখ লাল।

কেন? কারণটা জানতে পারি কি? সমীরণ বলল।

—কারণ জানা কি একান্ত প্রয়োজন?

নিশ্চয়ই। সমীরণের কথার স্বর একটু চড়া শোনাল। এরকম একটা বাজপড়া ডিসিশন নিতে গেলে, ভাল-মন্দ সব ভেবে নিতে হবে, ধাঁই করে একটা এগার হুঁকি খান ইঁট ছুড়ে মারলে চলবে কেন? সমীরণ বলল।

লিলি চুপ করে থাকল। সে যেন ভেবে নিচ্ছে, কারণটা বলা উচিত হবে কি হবে না। অল্প একটু চুপ করে থাকল সমীরণ। এখন একটু শঙ্কা জাগল। এই আধুনিকা, তন্বী, অনেকটা যেন দেখতে লিলির মত, তবু যদি লিলি না হয়!

—রোদ পড়ে গেছে, দয়া করে সান-গ্লাসটা খুলে ফেলুন।

—কেন?

এবার একটু কঠিন হল সমীরণ। দেখুন চোখ না দেখলে মানুষকে চেনা যায় না। চোখেই লোকের ভাল-মন্দ, চেনা-অচেনা সব কিছু। তাছাড়া আপনি লিলি, কি লিলির হিতৈষী, কি শত্রুপক্ষ—চোখ না দেখলে তা কেমন করে বুঝবো? আমার জানা চাই, আমি কার সঙ্গে কথা বলছি।

ওঃ মুক্তের! কেমন একটা টানাটানা স্বরে কথা বলল মেয়েটি। চশমাটা খুলে চোখ নাচিয়ে বলল, এবার নিশ্চয়ই চিনতে কষ্ট হচ্ছেনা।

—অপলকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল সমীরণ। এ চোখ যেন 'ছুটির প্রহর' শুধু চোখে চোখে তাকিয়ে একটা জীবন-বুত্তি কাটিয়ে দেওয়া যায়। একটা দীর্ঘ শ্বাস পুড়ল সমীরণের,—কারণটা জানতে পারি কি?

আমি একজনকে কথা দিয়েছি। —অত্যন্ত মৃদু গলায় বলল লিলি।

সমীরণের গালে আচমকা একটা চড় পড়ল যেন। হুমড়ি খেয়ে সুরে একটু ছিটকে পড়ল সমীরণ।—কথা দিয়েছেন? কথাটা পাকাপাকি হবার আগে, এ কথাটা জানান নি কেন?

জানিয়েছিলাম। খুব সহজ, সরল দেখাল লিলির মুখ। মা বাবা কথাটা কানেই তুললেন না। বললেন ওসব ট্রাম-বাসের আলাপ ট্রাম-বাসেই শেষ হয়, বাসের অবধি পৌঁছয় না।

মা বাপের প্রথম কথাটুকু সুবোধ মেয়ের মত শুনেছেন, সমীরণ রেগে বলল, শেষটুকু শুনতে কেন কি? ট্রাবল ক্রিয়েট করে কি লাভ হবে?

ট্রাবল নয়। এটা নেসেসিটি। আপনার মত একজন ভদ্রলোকের সর্বনাশ করতে আমার ইচ্ছে নেই।

সর্বনাশের আর বাকি কি আছে! এখন যদি বিয়ে ভেঙ্গে যায়, তাহলে লোকের সামনে মাথা উঁচু করে চলতে পারব? —বাড়ি ভর্তি লোকজন আত্মীয়-স্বজন, অফিসের বন্ধু-বান্ধব। আমার মা—বাবা, আমি কত ছোট হয়ে যাব বলুন তো।

—আপনি ম্যাগ্নানিমাস,—উদার হৃদয়। সকলের কথাই ভাবছেন, কেবল নিজের ছাড়া। অন্যের বাগদত্তাকে নিয়ে সুখী জীবন কাটাতে পারবেন? প্রেস্টিজ টিলে হয়ে যাবে না?

সমীরণ দাঁতে দাঁত চাপা গলায় বলল, আমার প্রেস্টিজ দেখতে হবে না। নিজের দিকটা দেখুন। আপনার মা বাবার সম্মান নেই, লোকে হাসবে না?

আপনি বড় একগুঁয়ে, একরোখা। লিলি বলল, আমার কথা তাঁরা কি ভেবেছেন, যে আমি তাঁদের কথা ভাবতে যাব?—আমার লাইফ, মাইও, ফিউচার ভেবেছেন তাঁরা?

সমীরণ রেগে আর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, আপনার জীবন ও ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁরা এগিয়েছেন, হয়ত মনের কথা চিন্তা করেন নি। আপনার পছন্দ করা হাঁটে হ্যাতলা পড়ান ছেলের চেয়ে আপনার বাপ-মার পছন্দ করা পাত্র নিশ্চয়ই অনেক বেশি কজেটেড।

—কজেটেড হলেই যে ওয়ার্ম-হার্টেড হবে, এমন কোন কথা নেই।

সেটা বিচার্য। সমীরণ বলল।

ডান হাতে বাঁধা মেয়েলি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লিলি

যেন একটু ব্যস্ত হল।—কি ঠিক করলেন? বিয়ে ভেঙে দেবেন কি না?

লিলির মুখের দিকে তাকিয়ে সমীরণের চোখের পাতায় কাঁপন জাগল। শাঁখের মত গড়ন, কান অবধি টানাটানা চোখ, চোখের পাতা ভারি আলসে, টিকালো নাক, ঠোঁটে আলতায় মেশান রঙ, আর কি 'পবিত্র', পবিত্র যেন। সমীরণ ঘাড় নাড়ল, —না। সে আমি পারিনা।

—আমি যদি পালিয়ে যাই?

—তাহলে কোন দুঃখ থাকবে না। খুব আপনার চেহারাটাই সুন্দর, মনটা নয়। আপনার মনে ভালবাসা বলে কিছু নেই।

—বাঃ! এটা কি রকম লজিক হল। লিলি বলল —ভালবেসেই তো যাচ্ছি।

যে বাবা-মাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসতে শেখেনি, তাঁদের সম্মান-অসম্মানে যার কিছু যায় আসে না, সে কি করে একটা বাইরের লোককে ভালবাসবে?—ওটা ভালবাসা নয়, চোখের খিদে, কিম্বা দেহের কামনা।

—ইরেলেভ্যান্ট কথাবার্তা বলবেন না, ইডিয়টিক শোনায়।

সমীরণ দেখল লিলির গাল লাল। উত্তেজনায় কানের লতির লাল পাথর আরও লাল, রক্তরাঙ্গা পোষাকে যেন আগুন ধরে গিয়েছে। বুকটা ফুঁসে ফুঁসে উঠছে. অমন ঈষৎ চোখে শুধু মেঘের ছায়া,—যাই বলুন, সমীরণ বলল, আমি মাটি কামড়ে পড়ে থাকব, যা করতে হয় আপনি করতে পারেন।

তাহলে আমি কি করবো! অকস্মাৎ লিলির চোখ জলে টলটল করে, উঠল, আমি কি করব বলতে পারেন?

এতক্ষণে যেন হাওয়া বোধ করল সমীরণ, মনের আকাশের মেঘটা কেটে গেল। বসে থাকার ভঙ্গী বদলে, পেছনে হাত ছড়িয়ে, নিজেকে এলিয়ে দিল।—এমন মেয়েকে হাতছাড়া করে কোন শালা।

—কেন? সমীরণ হাসি মুখে বলল, চোখের জল মুছে, হাসি মুখে, শুভদিনে, শুভক্ষণে, কপে চন্দন দিয়ে, বেনারসী জোড় পরে, ফুলের মালা গলায় ঝুলিয়ে, উপোষ করে বিয়ে করবেন।

ইয়ার্কি করছেন! এবার লিলি যেন কেঁদে উঠল, সে আমি কক্ষণো পারব না, কক্ষণো না।

আর একটা সিগারেট ধরাল সমীরণ।—পারবেন, পারবেন, নিশ্চয়ই পারবেন। মাঠে নেমেছিলেন ঠিকই। কিন্তু রেকারি চিনতে ভুল করে লাইনস্‌ম্যানের কাছে গিয়ে পড়েছিলেন। ওরা ফ্ল্যাগ দেখায়, বাঁশি বাজায় না। নড়িস হলে, অমন একটু আধটু হয়, ওতে দোষ নেই।

এবারে ভেঙে পড়ল লিলি।—ওর কাছে আমার চল্লিশ খানা চিঠি আছে যে। বিয়ের দিন প্রেজেন্ট করবে বলেছে।

শুধু চল্লিশ! সমীরণ হা হা করে হেসে উঠল. একশো চল্লিশ নয়? আপনি কিস্যু ভাববেন না। কালরাত্তির দুয়োবার আগেই ওগুলো দিয়ে সিগারেট বানিয়ে ফুকে উড়িয়ে দেব।

দু'হাটু জড়ো করে হাতে মাথা রেখে লিলি বসেছিল। সমীরণ দেখল লিলির পিঠ কাঁপছে, একটা চাপা কান্নার শব্দ উঠছে যেন। সমীরণ খুব ধীর নম্র গলায় বলল, চলুন, এবার যাওয়া যাক।

—আপনি যান। আমি একটু একা একা থাকতে চাই।

না। সমীরণ বলল, কাল আপনার আশীর্বাদ। এখনই আপনি বাড়ি যাবেন। একা একা থাকবেন না. অনেক লোকের সঙ্গে হাসিতে, স্ফূর্তিতে থাকবেন—উঠুন, চলুন আপনাকে একটু এগিয়ে দি।

লিলির শরীরে যেন কোন জোর নেই, কেমন ভেঙে পড়েছে। তবু বলল, না, না। আপনি কষ্ট করবেন কেন? আমি একা একা যেতে পারব।

—তা জানি। কিন্তু আপনার মন চঞ্চল আছে। আপনাকে একটু এগিয়ে দেওয়া দরকার।

লিলি জলে ভেজা আয়ত চোখ তুলে সমীরণের মুখের ওপর রাখল। আপনাকে, আপনাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি তো?

ইচ্ছে করেই লিলির কথাটা ঘুরিয়ে ধরে হাসল সমীরণ। —নিঃসন্দেহে। আমি বর্ন প্লেয়ার। নেট প্র্যাকটিস করা আমার অভ্যেস নেই।

যাঃ! লিলি নিশ্বাসের মত বলল, আমি বুঝি তাই বলেছি।

হাসতে হাসতে চলতে চলতে সমীরণ তাকিয়ে দেখল। লিলিকে বৃষ্টি-ধোয়া একরাশ হাসুহানার মত দেখাচ্ছে। একটু আগের রজনীগন্ধা দণ্ডের মত লিলি, এখন কত নম্র, শিথিল ভঙ্গি। হাঁটারও কেমন যেন পরিবর্তন হয়েছে। নাচের ছন্দ বদলে, একটা ধীর শান্ত, অচপলতা নেমেছে, পা দুলছে না, উঁচু হাই হিলের জুতোটা যেন চটির মত টেনে টেনে চলছে ফট্‌ফট্ ফট্‌ফট্ করে ফুট কাটছে না। চুড়ো বাঁধা মাথার খোঁপা ভেঙে গুটিয়ে ঘাড়ের ওপর নেমে এসেছে। হাওয়ায় দু'চারটে চুল উড়ছে। দূর আকাশে শেষ বিকালের পড়ন্ত আলো যেন আবছা আলোর আবির ছড়াচ্ছে লিলির মুখে।

অধিকারি

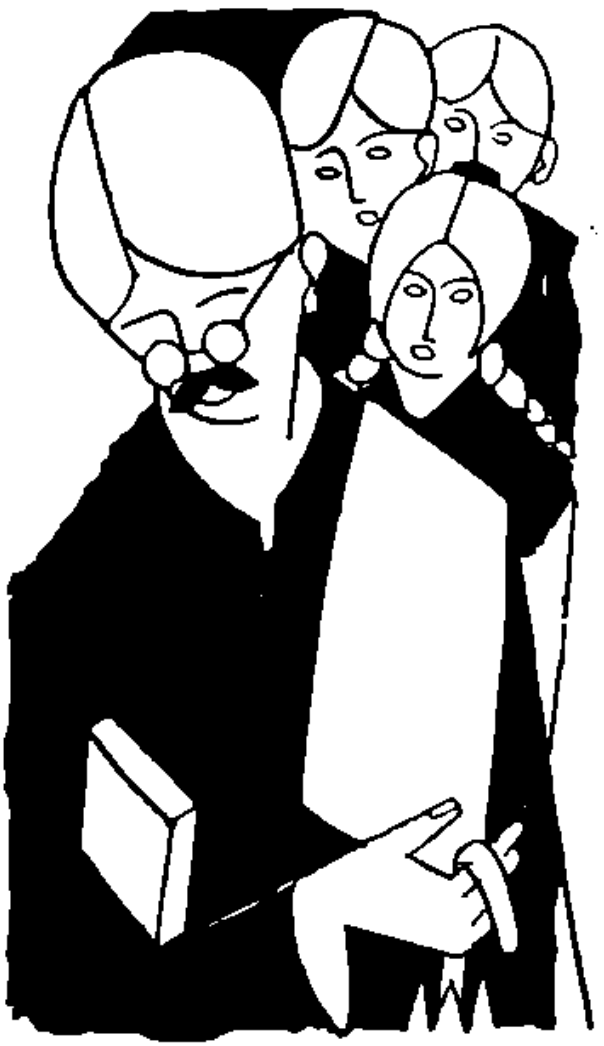

মেয়েটার বয়স বছর চোদ্দ-পনেরোর বেশি নয়, কিন্তু খাটো স্কার্ট আর আঁটো জামাটার কারণে ওকে অধিকারী তাকে 'গার্ল' বানিয়েছে।

তবু যেটুকু সন্দেহ আসতে পারতো, সেটুকুও মেরে দেওয়া হয়েছে কোমরে ওই চওড়া অথচ কোমল বন্ধনীকে কষে বেঁধে দিয়ে। ওটার জন্যেই বিশেষ করে 'বালিকা বালিকা' লাগে। তাছাড়া চেহারায় লিঙ্গ নিয়ে যেটুকু দ্বিধা থাকে, তাও ঘুচে যায় ওই খাটো স্কার্ট, আঁটো জামাটা আর চওড়া কোমর বন্ধের দেওয়ালের মধ্যে আটকে রেখেছে। পুরনো কালের চীনের মেয়েদের লোহার জুতোর পা আটকে রাখার মত।

অধিকারীকে সবাই 'অধিকারী মশাই' বললেও 'ভবানী

অপেরা'র অধিকারী কৃষ্ণলাল দাস সেই সম্বোধনটাকে খুব না-পছন্দ করে। বলে, 'বিষ্টার দাস বললে কি হয়? কি হয়?'

হ্যাঁ 'বিষ্টার' শব্দটা বিশেষ পছন্দ কৃষ্ণলালের। কারণ নিজেকে সে 'প্রোপ্রাইটার' বলে থাকে। তা বলবার অধিকার তার নেই তা' নয়।

প্রোপ্রাইটার দাসের 'ভবানী-অপেরা' শুধু মফস্বল শহরেই 'নাম' কিনে বেড়ায় না, কলকাতার যাত্রা প্রতিযোগিতার উৎসবেও এসে নাটক দেখিয়ে মেডেল নিয়ে যায়।

পৌরাণিক পালার দিকে মন নেই কৃষ্ণর, সামাজিক নাটক নামায় সে। সমাজের সর্ববিধ অনাচার কদাচারকে লোকের সামনে তুলে ধরে তার ওপর চাবুক মেরে দেখাতে চায় কৃষ্ণ, কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে সমাজ, কী পরিমাণ দুর্নীতিতে ডুবে যাচ্ছে দেশ।

তাই কৃষ্ণর পালাগুলির নাম সাধারণতঃ এই ধরণের হয় 'ভবানীর মুখোশ', 'একেই কি বলে দেশসেবা?' 'দুঃখীর রক্ত', 'নিরন্নের কান্না', 'চাবুক', 'কষাঘাত' ইত্যাদি।

কৃষ্ণ অধিকারী যে কত বড় বুকের পাটাওয়ালা লোক একথা টের পাওয়া যায় ওই সব পালা দেখলে। রাজা-উজির থেকে সুরু করে, দারোগা, দেশ-নেতা, কালোবাজারী বা অসতী নারী, সবাইকে এক তরোয়ালে কাটে কৃষ্ণ, এক চাবুকে মারে।

কাউকে রেয়াৎ করে না।

শোনা যায় কোথায় নাকি কোন দারোয়ারি পুজোর মণ্ডপে একখানা পালা নামিয়েছিল কৃষ্ণ, যার নাম ছিল 'দুঃশাসন' এবং যার নায়ক ছিল এক পুলিশ ইনস্পেক্টর। সারা বাংলায় দারোগাবাবু।

বলা বাহুল্য সে নাটকে দারোগাবাবুদের প্রীত হবার মত উপকরণ ছিল না। আর ভাগ্যের খেলায় সেখানে দর্শকের আসনে এক দারোগাবাবু উপস্থিত ছিলেন। খুব সম্ভব তিনি ওই উদ্যোক্তাদের কোনো মাননীয় আত্মীয়, আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন।

'দুঃশাসন' নামটি শুনেই তিনি মহাভারতের পুঁথায় পৌঁছে গিয়ে ছিলেন, এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এবং তারপর একটি 'রক্তপাত উৎসবে'র অপেক্ষায় স্পন্দিত হচ্ছিলেন।

কিন্তু অভিনয় সুরু হতেই কেমন যেন চাঞ্চল্য অনুভব করতে থাকেন দারোগাবাবু, তারপর মাঝপথে হঠাৎ 'রে রে' করে তেড়ে ওঠেন। আর সেই 'রে রে' করার প্রতিক্রিয়ায় কৃষ্ণকের কাজের অভাব প্রায় পূর্ণ হয়।

দারোগাবাবুর চীৎকার, সমবেত জনগণের প্রবল প্রতিবাদ, আর শিশুকুলের কান্না, সব মিলিয়ে সে একেবারে হেলেন্ডারীর চরম। দারোগাবাবু হাঁপিয়ে বেড়ান 'আমি ওই অধিকারী শা-কে এ্যারেষ্ট করবো, ওকে আমি ঘানি-টানাবো, ওকে ওর বাবার বিয়ে দেখাবো, ওর 'যাত্রাপালা' করে বেড়ানো জন্মের শোধ ঘোচাবো', ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ একজন ক্ষমতা মদমত্ত ব্যক্তির আগুন জ্বলে ওঠা মাথায় যা যা বলা সম্ভব সবই বলে চলেন। ওদিকে নাটক পণ্ড হওয়ায় অপমানিত অসহিষ্ণু দর্শক হৈ চৈ করতে থাকে।

কিন্তু সহসা এক নাটকীয় আবির্ভাব ঘটে।

বুক ভর্তি মেডেলে সুসজ্জিত ও গর্বস্ফীত প্রোপ্রাইটার কৃষ্ণ দাস এসে কথার ভনিতায় একেবারে ঠাণ্ডা করে দেয়।

কৃষ্ণ দাস এসে দাঁড়ায়, তার বুকের উপরকার মেডেলগুলো আলো পড়ে ঝকমকিয়ে ওঠে, আর সিল্কন থেকে একটা লোক সেই আদ্যিকালের গ্রামোফোনের চোঙ্গা একটা বাড়িয়ে ধরে কৃষ্ণর মুখের কাছে।

কৃষ্ণ তার ভিতর থেকে আবেদন জানায়, 'গরীবের মা বাপ দারোগা সাহেব, অ্যারেষ্টই করুন, আর ফাঁসিই দিন, কোনো আপত্তি নেই, দয়া করে শুধু আপনকার সামনে একখানা প্রশ্ন নিবেদন করতে দিন।'

হঠাৎ এই বাক্যবাণে নোলনালটা উদ্যমতা হারায়, সকৌতূহলী জনতা কান খাড়া করে সেই 'প্রশ্ন খানি'র আশায়। দারোগাবাবুও হঠাৎ একটু থিতিয়ে যান।

আর ছিন্ন মাইরস্ ভয়েসের চোঙ্গা বলে চলে, 'অপরাধটা আমার কোথায় বলতে পারেন আজ্ঞে? মানছি আমার নাটকে একজন পাজী বদমাস ঘুষখোর দারোগার চরিত্র-চিত্রণ করা হয়েছে। যে লোকটা হাতে পাওয়া ক্ষমতা বলে বহু পাপ করছে বেআইনী কাজের সাহায্য

করে তার বিনিময়ে মোটা মোটা টাকা উৎকোচ নিচ্ছে। আছে আমার নাটকে এমন চরিত্র। কিন্তু বাবুমশায়, বলুন একবার, সেই লোক কি আপনি? আপনার চরিত্র কি এত নীচ? বলুন? বলুন, আমার 'দুঃশাসন'কে দেখে কি আপনার নিজের প্রতিবিম্ব বলে মনে হচ্ছে? তা' যদি হয়, আমাকে এখুনি গুলি করুন, মানীলোকের মানের ক্ষতি করেছি, এই ভেবে কান মুলতে মুলতে মরবো।'

কিন্তু বাবুমশায়, 'আমার প্রশ্ন খানার জবাব দিয়ে তবে গুলি করতে হবে। বলুন নাটকের এই চরিত্র আপনকার প্রতিবিম্ব বলে মনে হচ্ছে?'

বক্তব্য, এবং বক্তব্যের ভাষায় দর্শকদের মধ্যে থেকে একটা চাপা হাসির গুঞ্জন ওঠে। আর দারোগাবাবুর মুখ লাল হয়ে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ পরিস্থিতির পরিবর্তনে তাকে সামলাতে হয় তাঁকে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গাম্ভীর্য এনে বলেন তিনি, 'আমার কথা হচ্ছে না, কিন্তু এভাবে একজন পুলিশ ইনস্পেক্টরের গায়ে কালি ছিটানো মানেই পুলিশ জাতটাকেই অপমান করা।' স্বজাতি প্রেমে বিগলিত দারোগাবাবু এবার কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তোলেন। বলেন, 'সেই অবমাননার অপরাধে তোমার নামে চার্জ আনবো আমি।'

তথাপি কৃষ্ণ দাস ভয়ে ভীত হয় না।

কৃষ্ণ দাস আবার চোঙের পিছনে মুখ রাখে, আর চোঙের মুখ খন্‌খনে গলায় বলে চলে, 'চার্জ আপনি আমার নামে একটা কেন, একশোটা আনতে পারেন বাবুমশায়, আপনিই যখন ইনচার্জ, চার্জের ভাঁড়ারটাইতো আপনকার হাতে। কিন্তু তা'হলেও আবার একখান প্রশ্ন রাখতে হয় বাবুমশায়। প্রশ্ন খানা হচ্ছে, অধম কৃষ্ণ দাসকে চার্জে ফেলার আগে এ প্রমাণটা দিতে পারবেন কি 'সমগ্রো' পুলিশ বিভাগে কোথাও ঘুষ নেওয়া নেই, চোর বদমাসদের সাহায্য করা নেই, 'পকেটমার'দের সহায়তা করা নেই?··· জবাবটা তার দিতেই হবে।···তারপর আমি আছি, আপনি আছেন, আর আপনার চার্জ আছে।'

দারোগাবাবুর মাথার মধ্যে সমুদ্র রোল। দারোগা-বাবুর কানের মধ্যে হাসির কলকল্লোল। এই ভনিতা, এই বাক্‌চাতুরী, এর সঙ্গে লড়তে পারবেন তিনি? পারতেন, শুধু 'দু'জনে মুখোমুখী' হলে, মাথার বিলু বার করে দিতেন অধিকারীর। কিন্তু এখানে সহস্রলোক। আর অন্তরলোকে অনুভব করতে পারেন, সেই সহস্রের উনসহস্রই অধিকারীর পক্ষে।

কিন্তু তাই বলে তো চুপ করে থাকা চলে না? দারোগাবাবু তাই যথাসম্ভব গলা চড়িয়ে বলে ওঠেন, 'এক আধটা বেচাল লোক সর্বত্রই থাকে অধিকারী, কাজেই তামা-তুলসী নিয়ে শপথ করতে পারিনে। তথাপি আমি নিশ্চয়ই আপত্তি তুলবো, এ ভাবে যাত্রা-থিয়েটারের নামে, সেই এক আদ্যনের একজনকে টেনে এনে 'ইয়ে করা।'

কথা জোগায় না বলেই 'ইয়ে' দিয়ে সারেন দারোগা-বাবু। তারপর চেঁচিয়ে বলেন, 'থানায় তোমায় যেতেই হবে।'

'হিজ মাষ্টার্স ভয়েসে'র চোঙ্ আবার খনখনিয়ে ওঠে, 'সে তো বুঝতেই পারছি স্যর! আপনকার যখন হুকুম। তবে এইটাই বুঝছিনা স্যর, আমার এই নাটকে এই যে একটা অতি কুচরিত্র মেয়েছেলের পার্ট রয়েছে, যে নাকি নিজের স্বামীকে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা করছে, কই তাকে দেখে তো এখানের এই শত শত মা লক্ষ্মীদের মধ্যে কেউ আপনার মতো ক্ষেপে উঠলেন না? কই বলে উঠলেন না তো—'যেহেতু ও মেয়েছেলে। সেই হেতু আমাদের গায়ে অপমানের কালি এসে লেগেছে!' তবে সাধ্যিতো বলি—বলবেন কেন? ওনারা—আমাদের সতী সাধ্বী মা-জননীরা জানেন, নাটক-নবেলের কাজই এই! মন্দকে চোখে ধরিয়ে দেওয়া। পাপকে উচ্ছেদের চেষ্টা করা! ওনারা ওই বদ্ মেয়েছেলেটাকে মোটেই 'স্ব-জাতি' বলে মনেই করছেন না। তাই ওনারা নীরবে নাট্যসুখ নেবেছেন! তা' সে যাক্—এখন বলুন বাবুমশায়। নাটক বন্ধ করে এই দণ্ডে আপনকার সঙ্গে থানায় যেতে হবে, না নাটকটা আজে শেষ করা যাবো? তবে পালিয়ে

আমি যাবো না। বলুন এখন আপনার কী আদেশ?'

দর্শকমণ্ডলী এতক্ষণ যাত্রাপালার বদলে তর্জার লড়াইয়ের আস্বাদ অনুভব করে চুপ করে ছিল। এবার তুমুল হট্টগোল ওঠে, 'নাটক হোক! পালা চলুক!'

দারোগাবাবু এই উন্মত্ত গণদেবতাদের দিকে তাকাল, তারপর, 'আচ্ছা ঠিক আছে—' বলে গট গট করে বেরিয়ে যান।

তুমুল হর্ষোচ্ছ্বাসের মধ্যে আবার তাড়া-পালা জোড়া লাগে। দর্শকরা হাততালি দিয়ে দিয়ে হাতে ব্যথা ধরিয়ে ফেলে।

বলাবাহুল্য পরে দারোগাবাবু তা'কে 'দেখে নেবার' চেষ্টাটা আর করেন নি।

এই। এই বুকের পাটা, আর এই বাক্‌চাতুরীর জোরেই কুঞ্জ দাস দলের লোকগুলোকে মুঠোয় পুরে রেখেছে।

নচেৎ—জগতের যত 'শাসন শোষণ নিষ্পীড়নের' দৃশ্য তুলে তুলে সমাজের চৈতন্য করিয়ে দিতে আসে বলেই যে কুঞ্জ নিজে ওই দোষগুলোর বাইরে, তা নয়। দলের লোকদের উপর কুঞ্জর ব্যবহার দারোগার বাবা-সদৃশ।

তবে মারধোর করে না সে।

কাউকেই না।

ওই লিলিটা তো সেই তিন চার বছর বয়েস থেকে অধিকারীর কবলে, বলুক দিকি মার কোনোদিন খেয়েছে? অধিকারীর শাসন-নীতি অন্য ধরণের। সে হাতে মারে না, ভাতে মারে। খেতে না দেওয়া হচ্ছে তার প্রধান শাসন। তাছাড়া—খাটানো। সেও একরকম শাসন। যে যেদিন অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তার ওপর দলের সমস্ত লোকের রান্নার ভার পড়ে, অধিকারীর কাপড় বিছানায় সাবান লাগাবার ভার পড়ে, কাঠ কাটা, জল তোলা, বাসন মাজার ভার পড়ে। বামুনের ছেলে হলেও রেয়াৎ নেই।

ব্রাহ্মণত্বের গৌরবে কেউ প্রতিবাদ তুললে, কি মৌজ হয়ে থাকলে, অধিকারী তার নিত্য মধুর বচন ঝাড়ে।

'বামুনের ছেলে? অ্যাঁ কী বললি? বামুনের ছেলে! ওরে বাপধন, সেই দৈব ঘটনাটা এখনো মনে রেখেছিস? ভুলে যা বাপ, ভুলে যা! মনে রাখলে শুধু যন্ত্রণা। ওরে তুই যে একদা বামুনের ঘরে জন্মেছিলি, সেটা সেরেফ্ দৈবাতের ঘটনা। মানুষের পেটে কখনো কখনো যেমন তেপেয়ে জীব জন্মায়, একটা নাথ্ দুটো ধড়-মাজর প্রাণী জন্মায়, তেমনি!···'বামুনের ছেলে। বাসন মাজবোনা—' শুনে হাসিতে যে পেট গুলিয়ে উঠছে রে! বলি—জ্ঞান তোর এখনো আছে? বামুনের ছেলের যা যা কর্ত্তব্য করিস সব? ত্রিসন্ধ্যে গায়ত্রী? স্নপাক হবিষ্যি? বল? বল বাপ!'

আশ্চর্য! তথাপি রাগ করে চলে যাওয়ার ঘটনা প্রোপ্রাইটার কুঞ্জদাসের দলে বিরল ঘটনা! ওই বাক্য-সুধা পানের পর অপরাধী ব্রাহ্মণ তার ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জন দিয়ে অধিকারীর নির্দেশিত কাজই করে। চিঁকেও যায়।

তবে, শাস্তি স্বরূপ দৈবাৎ ভাত বন্ধ করলেও এমনিতে কুঞ্জর এখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা দস্তুর মতো ভাল! আর সে খাওয়ায় পক্ষপাতিত্ব নেই।

অধিকারী নিজে যা খায়, সতরঞ্চি গুটোবার চাকর কেষ্ট বাগ্‌দীও তাই খায়।

ওই যে লিলি, যাকে না কি সবাই ব্যঙ্গ করে বলে থাকে, অধিকারীর 'পুত্তিপুত্তুর', তারও ওই একই বরাদ্দ।

ভাল আয়োজন হলো তো 'ভালো', আর সুবিধে অসুবিধের আয়োজন খারাপ হলে 'খারাপ'।

আদুরে খুকী লিলি কোনো কোনো দিন আদুরে গলায় বলে, 'চচ্চড়ি আমি খাবো না। ডাল ভাত আমার বিচ্ছিরী লাগে, আমি শুধু মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাবো।'

অধিকারী তার জোড়া বেণীর একটাকে টেনে তাকে কাছে নিয়ে এসে বলে, 'বুঝলাম খাবে। ডাল ভাত তোমার রোচে না, তাই শুধু মাছের ঝোল ভাত খাবে। কিন্তু বলতো যাদু, কেন তা খাবে? কিসের দাবিতে? সবাই যা করছে, তুমি তাই করছো! যাবে যাবে পাঁচ করছো, আর কি? আর কিছু নয়। তবে? ভাবছো যে অধিকারীর আদুরী আমি, আমার জোর বেশী কেমন? ভুল! ভুল মাইডিয়ার, একেবারে ভুল। এই

প্রোপ্রাইটার কৃষ্ণ দাসের কাছে একচোখোমি পাবে না, সব সমান! তুমি এখনও পর্যন্ত চুল গুটিয়ে ছেলে সাজচো, তোমার দক্ষিণে কম! যখন চুল এলিয়ে হিরোইন সাজবে, তখন দক্ষিণে বাড়বে। ব্যস!'

তবে মন ভাল থাকলে আর সময় থাকলে যখন পাকা চুল তুলতে ডাকে লিলিকে, তখন একটু প্রশ্রয় দেয় লিলিকে। চোখ বুজে বুজেই বলে, 'এবারে পুজোয় কি নিবি বল? আনারসী শাড়ী? কুন্তিবার জুতো? লাল রিবন? আচ্ছা আচ্ছা হবে।'

আবার কোনো সময় গল্পও করে কৃষ্ণ লিলির সঙ্গে। 'জেষ্টা হতভাগা কতবড় হতভাগা জানিস? সেদিন নাকি শতরঞ্চির ওপর কোন বাবু ভাইয়ের একখান মনিব্যাগ পড়েছিল, ছোঁড়া নাকি সেটা বিপিন সরকারের কাছে বন্ধা দিয়ে দিয়েছে! দেখ তবে কতবড় মুখ্যু আর হাতভাগা। নিয়ে নিতিস, কে দেখতো শুনি?'

লিলি ঠিকরে উঠে বলে, 'ভগবান দেখতো।'

'ভগবান! ও বাবা! সে লোকটা আবার দেখতে পায় নাকি? সে তো বোবা কালা অন্ধরে।'

'কক্ষনো না, ভগবান সব দেখে! এই যে তুমি সবাইকে এত কষ্ট দাও, ভগবান নিশ্চয় দেখতে পায়।'

আহ্লাদী!

আহ্লাদী বলেই এতটা বলতে সাহস পায়।

তা' এ রকম সময় কৃষ্ণ দাস বিশেষ শাসন করে না। হয়তো শুধু বলে, 'পায়? দেখতে পায়? তবে তো তোকে কাল উপোস করিয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখে দিতে হয়।'

লিলি উত্তেজিত গলায় বলে, 'কেন? কেন শুনি? আমার সঙ্গে কি?'

অধিকারী মোলায়েম গলায় বলে, 'ভগবানতো দেখবে? দেখে আমার কি শাস্তি করে, সেটাই দেখতে চাই।'

লিলি রেগে বলে, 'শাস্তি কি আর এ জন্মে হয়? পরের জন্মে হবে শাস্তি।'

'পরের জন্মে?'

অধিকারী হা হা করে হেসে ওঠে বলে, 'তবে নির্ভয় হইলাম। পরের জন্মে তো গরু গাধা ঘোড়া ছাগল এই রকমই একটা কিছু হবোই, মনিবে পিটুনি দিয়ে দিয়ে খাটিয়ে নেবে, এতো পড়েই আছে।'

লিলি গম্ভীর ভাবে বলে, 'ভালো কাজ করলে আসছে জন্মে বামুন হতে পারতে তুমি।'

'বামুন? ওরে সর্বনাশ!' কৃষ্ণ দাস কানে হাত দেয়, 'তা'হলে তো কাজের ছায়া মাড়ানো বন্ধ করতে হয়।'

'বামুনের ওপর তোমার এতো রাগ কেন বলতো?

লিলি অধিকারীর পাকা চুল তোলার শেষে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে, আদুরে গলায় বলে, 'তুমি নাকি বামুন বেছে বেছে বলে নাও, আর তাদের ওপর অত্যাচার কর?'

'বলে বুঝি?' কৃষ্ণ এবার গলা খুলে হাসে। 'বলেছে তোমার কাছে? বামুন ব্যাটাগুলো আচ্ছা ধূর্ত তো! ধরে ফেলেছে সব।'

ওদিকে নিমাই, জগবন্ধু, সনাতন, বিপিন, ব্রজ সবাই চোখ টেপাটেপি করে, 'কর্তার মেজাজ খুব শরীফ দেখছি। 'পুষ্পিপুত্তুর' বুঝি পাকাচুল তুলতে গেছে?'

'এখনো খুকী করে রেখে দিয়েছে। ব্যাপার কি বল দিকি? ইচ্ছে করলেই তো একটা 'বেন্' পার্ট দিতে পারে?'

'দেবে না। মতলব আছে ভেতরে ভেতরে!'

'কী মতলব বল দিকি?'

ব্রজ সবজান্তার ভঙ্গীতে বলে, 'বিয়ে দেবে। কন্তে দানের পুণ্যি কুড়োবে! এখন খুকী সেজে বেড়াচ্ছে। নয় তো নাটকে 'বালক' সাজছে, লোকের চোখে পড়ছেনা, শাড়ী পড়ে নাটকে অবতরণ করলেই তো হয়ে গেল। সবাই চিনে ফেলবে। বিয়ের বাজোটা বেজে যাবে।'

'বিয়ে দেবে?' নিমাই হি হি করে হাসে, 'দেবে তো আমার সঙ্গেই দিক না বাবা! দিব্যি সুন্দরী, চং চাংও জানে খুব।'

'তুই তো বামুন ?'

'বামুন! ছাৎ!' নিমাই বলে, 'বিষ ছাড়িয়ে ঢোঁড়া। বের তো দুকে নিই।'

'বেরে না।' সনাতন বিচারকের রায়ের মত অনোঘ ভঙ্গীতে বলে, 'তুই বামুন বলেই বেরে না।'

'আচ্ছা কেন বল দিকি? বামুনের ওপর ওর এত জাতক্রোধ কেন?'

'জানিসনে বুঝি?' বিপিন ওরই মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, আর বিপিন সব থেকে পুরনো। তাই বিপিন জ্ঞান দেয় ওদের, 'ওর পরিবার যে ওদের দেশের এক বড়লোক বামুনের ছেলের সঙ্গে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বলিনি তোদের এইবা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছিলে বটে একদিন। কিন্তু সেটা কি সত্যি?'

'অসত্যির কী আছে? জগতের কোথাও কারুর বিয়ে করা বৌ পর-পুরুষের সঙ্গে চুলের বার হয় না?'

'তা বলছি না! তবে—'

বিপিন বলে, 'আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক তো। ওর বিত্তান্ত আমিই বেশী জানি। বৌ পালিয়ে গেল, বছর পাঁচেকের একটা না-বরা ভাগ্নে ছিল সেটা মরে গেল। ও তাই ঘটিবাটি তুলে গ্রাম ছেড়ে একটা যাত্রার দলে ঢুকলো। 'মাধব অধিকারী'র যাত্রার নাম শুনেছিস? না, নামকরা খুব নয়, তবে ছিল তখন। সেইখানে ওর হাতে খড়ি। তা ও নাকি নিজে একখানা পালা লিখে নিয়ে গিয়েছিল। 'নারী না নাগিনী'? বলেছিল সেইটা আসরে নাবাতে। অধিকারী বলতো, 'দেখবো দেখবো', দেখতে গা করতো না। একদিন বললো, 'দেখেছি, অখাদ্য!' ব্যস হঠাৎ আমাদের কর্তা চটেমটে খুব বকুনি লাগিয়ে দিল, রাগের মাথায় খাতাটা ছিনিয়ে নিয়ে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে অধিকারীর মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে, নিজে দল খোলবার তাল করে বেড়াতে লাগলো। তারপর তো এই দেখছিস!'

'তা' পনি তো আর লেখেনা কই নিজে?'

'না! বোধ হয় বুঝেছে অখাদ্যই হয়েছিল।'

নিমাই মিটি-মিটি হেসে বলে, 'নারী না নাগিনী'! নিজের সেই লক্ষীছাড়া বৌটার কাহিনী নয় তো?'

'হতে পারে।' বিপিন বলে, 'আমারও সে সন্দেহ ছিল। তবে বলি নি কোনোদিন কিছু। কি জানি মুখে মুখে ছড়িয়ে যদি দুর্বাসার কানে যায়। আমি যে ওর ইতিহাস জানি, ওর পাশের গাঁয়ের লোক, কিছুই বলি নি কোনো-দিন। বললে কোপে পড়ে যাব কিনা কে জানে।···এই আজ হঠাৎ তোদের কাছে বলে ফেললাম, দেখিস যেন পাঁচ কান না হয়।'

ওরা সবাই এক যোগে হেসে ওঠে।

বলে, 'পাঁচ কান? সে তো হয়েই বসে আছে। নিমাই, জগবন্ধু, সনাতন, ব্রজ, আর বিপিনদা নিজে, পাঁচ দু'গুণে দশ কান!'

'আরে বাবা, অধিকারীর কানে না গেলেই হল—' বিপিন বলে, 'রাগলে দুর্বাসা—'

এই রকম আলোচনার ক্ষেত্রে হঠাৎ লিলি এসে দাঁড়ায়। বেণ্ট বাঁধা কোমরে একটা হাত দিয়ে মহারানীর ভঙ্গীতে বলে, 'কী হচ্ছে কি তোমাদের? কাজ কর্ম নেই?'

বিপিন বিরক্ত গলায় বলে, 'আছে কি নেই তাতে তোর দরকার কিরে ছুঁড়ি? তুই নিজের চরকায় তেল দিগে না।'

'আমার চরকা?' লিলি হি হি করে হাসে। 'আমার চরকায় তো তেল দিয়ে এলাম এতক্ষণ ধরে? একশো ডিনটে পাকা চুল তুলেছি।'

'আরো তুলছি না কেন? যাথা বেল করে দিগে না!' বিপিন রেগে রেগে বলে।

লিলি কিন্তু রাগে না। সে ঘাগরা ঘুরিয়ে একটা পাক খেয়ে বলে, 'বলে দেব 'পোপাইটার'কে!'

'দিগে যা, লাগানি-ভাঙানী-খোসামুদী!'

লিলি এবার রেগে [illegible]। বলে, 'দেখ বিপিনদা, ভাল হবে না বলছি! তোমরা এখানে আড্ডা দিচ্ছ, তোমাদের হাসিতে পোপাইটার মশাইয়ের ঘরের ছাত কাটছে। তাই আমাকে বলে দিল, 'যাতো লিলি, দেখে আয় তো

বাছাধনেদের এত ফুর্তি কিসের? কাজ কর্ম নেই? উচ্চ হাসির বান ডাকিয়েছেন একেবারে!'

ব্রজ এই 'পুষ্টিপুতুর'টিকে একেবারে দেখতে পারে না। তাই রুক্ষ গলায় বলে, 'কেন? তোর পোপাইটারের অধীনে যারা আছে, তাদের কি হাসতেও বানা?'

'তা আমি কি জানি?' লিলি তার একটা গোড়ালীর উপর দেহের সব ভারটা চাপিয়ে আবার এক পাক ঘুরে নিয়ে বলে, 'জানি না বাবা! পোপাইটার আবার পাঠালো তোমাদের শাসন করতে, তাই এলাম।'

নিমাই চড়া গলায় বলে, 'তা' হয়েছে তো শাসন করা? এবার যা আমাদের নাবে লাগাতে-ভাঙাতে?'

'ভাল হবে না বলছি নিমাই দা?' লিলি নিমাইয়ের লম্বা লম্বা চুলের মুঠিটা একবার ধরে নাড়া দিয়ে বলে, 'সব সময় তুমি আমার সঙ্গে লাগতে এসো না।'

ব্রজ একটা ছ্যাবলা মার্কা হাসি হেসে বলে, 'নিমাই-বাবুর তো সেই ভাল। সব সময় যাতে তোর সঙ্গে লেগে থাকতে পারে, সেই আশায়—'

বালিকা লিলি চেঁচিয়ে ওঠে, 'কেন? কেন সব সময় আমার সঙ্গে লাগতে আসবে? বলে দিচ্ছি গিয়ে—'

লিলি চলে গেলে এরা বলে, 'খুকীপনা আর গেল না!'

'যাবে কোথা থেকে? কর্তাপাইয়ের পুষ্টিপুতুর যে!'

'হুঁ তারপর দেখিস, খুকীটি হঠাৎ কোনদিন কার সঙ্গে ভেগে পড়ে। সেই জ্যোচ্ছোনা রাতের কথা মনে আছে তো? সে তো আর কর্তার পুষ্টিকন্যা ছিল না। কর্তা তাকে খাইয়ে পরিয়ে বড়টি করেছিল অলক্ষ্যে ভোগে লাগাবে বলে, যাদ ছোঁদ না পার হোতেই নীল পাখী পালক গজিয়ে ফুড়ৎ!'

'এই জগবন্ধু, ও কথা বলছিস কেন? কর্তার আর যাই দোষ থাক, ও দোষ নেই।'

'নেই, তোকে বলেছে। জ্যোচ্ছোনাকে কী রকম আগলাতো মনে নেই? কারুর [redacted] একটু হেসে কথা কয়েছে কি মার-মার কাট্-কাট্। ও কি শুধু-শুধু হয় বাবা? স্বার্থ চিন্তা থাকলেই তবে হয়।'

'ওটা কর্তার স্বভাব! মেয়েছেলেকে একচুল বিশ্বাস করে না! ছোঁয়াও করে না। নববালা, বাসবতী, এদের কী রকম তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রে দেখেছিস তো? নেহাৎ কাজে পড়ে দলে রাখতে হয় তাই, নচেৎ সেই আদ্যিকালের মতন ব্যাটাছেলে গুলোকে গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সাজাতে পারলেই বোধহয় বাঁচতো ও।'

তা কথাটা ওদের মিথ্যে নয়, অধিকারীর মনোভাবটা প্রায় সেই রকমই। বলেও যখন তখন 'দলের মধ্যে পাঁচটা মেয়েছেলে পোষা কি কম ঝকমারী? একগোটা ব্যাটা-ছেলের যা যা ঝক্কাট, একটা মেয়েছেলের জন্যে তা কয়াট! কী করবো, কালের গতিকে না রাখলেই নয়। এখন যে সব বায়োস্কোপ দেখা চোখ হয়েছে বাবু বিবিদের। গোঁফ কামানো মুখ নিয়ে শাড়ী পরা দেখলেই হাসির হুল্লোড় উঠে যাবে।'

দেখতে পারে না কৃষ্ণ। একটা মেয়েকেও দেখতে পারে না। কাজেই তার সম্পর্কে 'স্বভাব দোষের' কথাটা নেহাৎই গায়ের জ্বালা থেকে উদ্ভূত।

'জ্যোৎস্না নামের মেয়েটাকে সে আগলে বেড়াতো, সে শুধু সখের বাতিকে, আর শাসনের হয়ে। তবু রক্ষা করতে পারল না জ্যোৎস্নাকে, সে একটা ডবকচীর সঙ্গে পালালো।

কৃষ্ণদাস যখন টের পেল, তখন কিন্তু লাফালাফিও করল না, 'মার-মার' ও করলো না। শুধু বললো, 'যে যার উপযুক্ত কাজই করেছে। 'কাঁঠালে মাছি' কি আর কাঁঠালী চাঁপায় বসতে যাবে? পচা কাঁঠালেই বসেছে।'

তবু আবারও নেয়ে নিতে হয়েছে প্রোপ্রাইটার মিস্টার দাসকে। এবারকার নায়িকা হচ্ছে চারুহাসিনী। নববালা আর বাসবতী গিন্নীবের পাট শেষ করে। তাদের নিয়ে কারো মাথা ব্যাথা নেই, শুধু কৃষ্ণ দাসের আছে কড়া শাসন। খাও দাও কাজ করো ব্যস! আড্ডা, গল্প, ভাল-বাসাবাসি, এ সব চাও তো কেটে পড়ো।

শুধু ওই আদুরী মেয়েটা? লিলি! তার প্রতি যে অধিকারীর কী ভাব বোঝা শক্ত। কখনো মনে হয় বেজায় প্রশ্রয় দিচ্ছে, কখনো মনে হয়, নাঃ ওসব কিছু নেই, সকলের প্রতিই সমান অপক্ষপাত অধিকারীর।

তবে লিলির জীবনটা একটু অদ্ভুত রৈকি। সে জানে না কখন তাকে মাথায় তোলা হবে, আবার কখন তাকে পায়ে ঠেলা হবে।

হয়তো সেই জন্যেই লিলি 'বালিকা' থাকাটাকেই নিরাপদ মনে করে। তাতে মান অপমানের প্রশ্নটা কম থাকে।

কখনো দলের মেয়েদের সঙ্গে হি হি করে, চাঁচি পান চেয়ে খায়, কাল ঘুগনী এনে দেবার জন্যে বায়না করে, কখনো অধিকারীর তরফ হয়ে পাকা চোপা বুলিতে শাসন করে।

তা' ওই দলের লোকেরা লিলিকে মুখে যতই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করুক, মনে মনে না মেনে পারে না। কারণ অধিকারীর 'পুষ্যি কন্যে'। সময় অসময় তাই তোয়াজও করতে হয় তাকে।

তোয়াজ করে না শুধু বরুণ।

ওই ব্রজ বিপিনের দল থেকে সে সম্পূর্ণ পৃথক। আর থাকেও সে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে। বরুণ 'পার্ট প্লে' করে না, বরুণ 'পালা' লেখে। বরুণের ভাই কৃষ্ণ দাসের কাছে বিশেষ খাতির। একমাত্র বরুণকেই কৃষ্ণ কখনো উঁচু কথাটি বলে না, কখনো তুমি ছেড়ে তুই করে না।

বরুণের প্রতি কৃষ্ণর যেন গুরু পুরুষের ভাব।

কারণটা হয়তো ক্ষমতাবানের প্রতি অক্ষমের মুগ্ধতা। যে ক্ষমতা কৃষ্ণর মধ্যে থাকবার ইচ্ছে কৃষ্ণর, সে ক্ষমতা নেই তার। অথচ সেটা বরুণের আছে।

কৃষ্ণর ভিতরে ভাবের জোয়ার, অথচ কৃষ্ণর সে ভাব প্রকাশের ক্ষমতা নেই। বিপিনের কথা যদি সত্যি হয় তো কৃষ্ণ অধিকারীর প্রথম এবং শেষ রচনা 'নারী না নাগিনী'?

কিন্তু বরুণের কলম হচ্ছে সাধা কলম।

ধরলেই সফল। যাই ধরুক।

কৃষ্ণ বরুণের এই অপূর্ব শক্তিতে অভিভূত। তাই কৃষ্ণ তার ভাব আর ইচ্ছে ব্যক্ত করে; আর অনুরোধ জানায়, 'লিখে ফেলো লেখক, এটা লিখে ফেলো।' খুব জলভ ভাষায়। সমাজের দুর্নীতি, বক্তব্য এর ওপর দু' ঘা চাবুক কষানো দরকার।

ব্যস্ শুরু হয়ে যায় লেখা।

কৃষ্ণ লেখে সে যা চেয়েছিল, ঠিক তাই। অথচ বুঝিয়ে বলতে কতটুকুই বা পেরেছিল সে? শুধু ইচ্ছে প্রকাশ করা! বরুণ যেন মনের ভিতরের কথা টেনে বার করে সুন্দর আর সহজ করে স্বচ্ছন্দে লিখে দেয়। কৃষ্ণ আশ্চর্য হয়ে ভাবে, কই আমি তো এত সব গুছিয়ে বলিনি?

অথচ যত শুনি ততই মনে হয় ঠিক, ঠিক এইটাই বলতে চাইছিলাম।

নিজের মনের কথা লোকে না হয় লিখতে পারে, কিন্তু অপরের? অপরের মনের কথা লেখে কেমন করে?

তা'ছাড়া বরুণের ভাষার জোর কত!

বরুণের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা কত! আগাগোড়া পালাটাই যেন হীরে চুনী পান্না! মুহুর্মুহু হাততালি পড়ে কি আর সাধে? ভবানী অপেরার ধারণীয় মহিমার মূলে বরুণ। সেই বরুণকে পুষ্যি করবে না ভবানী অপেরার প্রোপ্রাইটার? তবে নাটকের নামকরণের ভারটি কৃষ্ণর নিজের হাতে। ওইটি তার নিজের এলাকা। মনে মনে আর একটি সংকল্প আছে কৃষ্ণর, সেটা আজ পর্যন্ত ব্যক্ত করে নি কারো কাছে।

কিন্তু কৃষ্ণর কি তা'হলে মনের কথা বলবার কেউ নেই? সত্যিই কৃষ্ণ নারী-সম্পর্ক বর্জিত? তবে কৃষ্ণ সুযোগ সুবিধে পেলেই আমতা লাইনের কোন্ একটা গণ্ডগ্রামে যায় কেন?

তা কৃষ্ণ দাসকে জিগ্যেস করবে কে?

'আমতা লাইনের ওই গ্রামটায় তোমার কি কাজ?' এ কথা জিগ্যেস করতে গেলে তো চাকরী যাবে।

ওই পালাঘরের যদি 'আসল বাস' বলে কিছু থাকে তো কৃষ্ণর আসল বাস কাটোয়ায়।

সম্প্রতি এদিক ওদিক ঘুরে এসে, কিছুদিন আবার কাটোয়ায় স্থিতু হয়েছে কৃষ্ণ। আর নতুন একটা নাটক লেখা চলছে।

কোণের দিকের একখানা ঘরে কৃষ্ণকে আর বরুণেতে নিভৃত পরামর্শ চলছে। হাতের কাছে কোনো 'বায়না' নেই বলে ব্রজ আর বিপিন ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে।

বাসন্তী গেছে তার গুরুপীঠ নবদ্বীপে। জগবন্ধুর এই কাটোয়াতেই বোনের বাড়ি, তাই এখানে যখন থাকা হয়, জগবন্ধু বোনের বাড়িতেই থাকে খায়। কাজেই দল এখন হালকা, কাজ কর্ম কম।

নিমাইয়ের হাতে কিছু টাকা ধরে দিয়েছে কুঞ্জ, বলেছে, 'তোতে আর খুনাতনেতে পালা করে দোকান বাজার করবি, নববালা রাঁধবে, ব্যস! কোনো যেন গণ্ডগোল শুনি না, দু'বেলা যেন ঠিক সময় খবার পাওয়া যায়। এই হচ্ছে আমার সাফ্ কথা। বেতিক্রম হলে কুরুক্ষেত্তর করবো।'

অতএব ঠিক মত কাজ চলছে।

কারণ কুরুক্ষেত্তর করবার ক্ষমতা যে কুঞ্জর আছে, সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যারা পড়ে আছে, তাদের তিন কূলে কেউ নেই বলেই তো পড়ে আছে।··· তারা তো সন্ত্রস্ত থাকবেই।

তবে কুঞ্জ এবার মনের সুরটি বদলেছে।

কুঞ্জ গলা নামিয়ে বরুণকে নির্দেশ দিচ্ছে 'চাবুক-টাবুক তো ঢের হলো নাটোকার, এবার একটা রোমান্টিক পালা লেখো দিকি।'

রোমান্টিক!

কুঞ্জর অভিলাষ!

ভূতের মুখে রামনাম!

বরুণ অবাক হয়ে বলে, 'রোমান্টিক? হঠাৎ এ খেয়াল যে মিস্টার দাস?'

এই—এই আর একটি গুণের জন্যেও বরুণ কুঞ্জর প্রিয়-পাত্র। 'মিস্টার দাস', ছাড়া কখনো আর কিছু বলে না বরুণ।

মিষ্টার দাস অতএব হৃষ্টচিত্তে বলেন, 'মাঝে মাঝে নতুনত্বের দরকার বুঝলে? ভেবে ভেবে এটাই এখন ঠিক করেছি আমি। 'ভবানী অপেরা' মানেই জলন্ত আগুন, এটাও ঠিক নয়। একটি ফুটন্ত গোলাপ দেবার ক্ষমতাও যে 'ভবানী অপেরা' রাখে, সেটা দেখানো দরকার।'

বরুণ স্বল্পভাষী, বরুণ 'স্বল্প হাসি' ও।

সেই স্বল্প হাসিটুকু হেসে বরুণ বলে, 'কিন্তু আমার তো মনে হয়না সেটা দেখে লোকে খুশী হবে।'

'হবেনা? বল কি নাট্যকার? তোমার লেখা নাটক, তাও যদি আবার রোমান্টিক হয়, লোকে তো লুফে নেবে।'

'আমার ওপর এত আস্থা রাখবেন না'—বরুণ বলে, 'লোকের ধর্ম যে কী তা বোঝা বড় শক্ত, মিষ্টার দাস! 'লোক-চরিত্র' স্বয়ং ভগবানেরও অজানা। ওযে কিসে রুষ্ট কিসে তুষ্ট! তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, কেউ যদি একটা কিছু বিশেষ জিনিস দিতে পারলো, তো লোকে তার কাছে কেবল সেইটাই চাইবে। যে লোক 'কমিক' করছে, তাকে চিরদিনই ওই কমিকের ভাঁড়ামীই চালিয়ে যেতে হবে। একটা গভীর জিনিস কি সিরিয়াস জিনিস,

কেউ নেবেনা তার কাছে। তেমনি আপনার এই ভবানী অপেরার কাছে লোকে অবিশ্যি ওই চাবুকই চাইবে, মধুর কিছু দিতে যান, হয়তো 'ডেসিওর' হতে হবে! লোকে বলবে দূর ভবানী অপেরা 'আর আগের মত নেই।'

কুঞ্জ সস্নেহের গলায় বলে, 'যাঃ কেন তা বলবে? লোকে তো নতুনই চায়?'

বরুণ হাসে, 'চায়! নতুনের কাছে চায়।'

'একথা তোমায় কে বললো বলতো নাট্যকার? বয়েস তো তোমার এই বাছা, লোক চরিত্র এত দেখলে কোথায়?'

'দেখবার চোখ থাকলে, দেখতে বেশী সময় লাগেনা মিষ্টার দাস!'

'হুঁ! তা বটে! নইলে এতগুলো অমন আগুন আগুন নাটক লিখলেই বা কি করে? তবু আমার ভারী একটা সাধ হয়েছে রোমান্টিক একটা লেখো তুমি! আজই সুরু করে দাও।'

বরুণ হাসে, 'ভাবতে হবে না?'

'ভাবতে! আরে বাবা রোমান্টিকের আবার ভাবা-ভাবির কী আছে? দুটো তরুণ তরুণী খাড়া করে হয় ভালোবেসে—এই তোমার গিয়ে কি বলে পূর্বরাগ অনুরাগ ঘটিয়ে বিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেবে, নয়, অগ্নে মিলন, মধ্যে বিরহ, পরে আবার মিলন, এই ভাবে ছক্ কেটে ফেলে—।'

বরুণ বলে, 'তা' হলে পৌরানিক কি ঐতিহাসিক কোনো চরিত্র নিয়ে কাজ করলেও হয়।'

কুঞ্জ হা হা করে ওঠে। 'না না ওসবে দরকার নেই। ওসব কি আর কেউ বাকি রেখেছে হে? পড়ে আছে পুরাণে ইতিহাসে, আবহমানকাল ধরে যে পারছে, ধরছে আর চোরের মার খাচ্ছে। না না, তুমি বাপু কাল্পনিক চরিত্রই গড়ো।'

বরুণ মৃদু হাসে।

তারপর আস্তে বলে, 'কাল্পনিক চরিত্র মানেই তো আজকালকার জীবন? আজকের জীবনে রোমান্স কোথায় মিষ্টার দাস?'

কুঞ্জ অধিকারী 'মিষ্টার দাসে'র মহিমা ভুলে চোখ গোল করে বলে ওঠে 'নেই? রোমান্স নেই? তুমি যে তাজ্জব করলে হে লেখক, আমি তো দেখি এটা রোমান্সেরই যুগ। এত রোমান্স যে ঘরের দেওয়ালে আর আটক থাকেনা, পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, মাঠে ময়দানে, রোমান্সের ছড়াছড়ি!'

'আপনি শহরের দুই পাশের দোকানগুলো দেখেছেন মিষ্টার দাস? মুক্তোর বাজার ছড়াছড়ি।'

কুঞ্জদাস এক লেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে হঠাৎ 'ওহো হো-হো' বলে বরুণের পিঠটা চাপড়ে দেয়। তারপর বলে, 'খুব উত্তর খানা দিয়েছ বটে।···কিন্তু তুমি যাই বলো, আমি নিরুৎসাহ হচ্ছিনা। আমার এবার বিশেষ বাসনা—'

বরুণ হেসে বলে, 'তবে তো ভাবতে হয়।'

'ভাবো,—ভেবে গল্প ঠিক করে ফেলো। আমায় আসছি আমি, তুমি কতকটা খসড়া করো। তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এই রোমান্টিকের মধ্যেও সমাজ চিন্তা থাকবে। প্রেম করলাম বলেই যে বেহেড্ হয়ে প্রেম করবো তা' নয়।'

কেন কে জানে বরুণের হঠাৎ মেজাজ বদলে যায়।

বরুণ হঠাৎ রুক্ষ গলায় বলে, 'হেড্ বেহেড্ জানি না মিষ্টার দাস, প্রেমের নাটক লেখা আমার দ্বারা হবে না।'

কুঞ্জ দাস কি ক্রুদ্ধ হয়?

না উৎফুল্ল?

বোঝা যায় না। কারণ কুঞ্জদাসের মুখটা গম্ভীর দেখাচ্ছে, কিন্তু চোখটা যেন আলো আলো। তা' হয়তো বা রাগের আগুন। এবার হয়তো কুঞ্জ তার এতদিনের পুঞ্জি 'লেখক'কে অপমান করে বসবে।

কিন্তু চট্ করে তা করেনা বুদ্ধিমান কুঞ্জ দাস। সে শুধু গম্ভীর ভাবে বলে, 'হবে না কেন, সেটা শুনতে পাইনা?'

'হবে না। হবে না। এর আর 'কেন'র কি আছে?' বরুণ অবহেলার গলায় বলে। 'ওসব আমার দ্বারে আসবে না।'

কুঞ্জ এবার একটু ঘনিষ্ঠ হয়, গলা নামিয়ে বলে, 'ব্যাপার কি বলতো নাট্যকার? কোথাও ধাক্কা টাক্কা পাওনি তো?'

বরুণ আরো অগ্রাহ্যের গলায় বলে, 'মাপ করবেন স্যর। আমার কোনো অতীত ইতিহাস আবিষ্কার করতে বসবেন না। আপনাদের ওই 'লাভ' ব্যাপারটাতেই আমার অশ্রদ্ধা! 'প্রেম' বলে সত্যিই কিছু আছে না কি? রাবিশ!'

কৃষ্ণ অরুণা গলায় বলে, 'একেবারে রাবিশ?'

'আমার কাছে অন্ততঃ! ওসব শুনলেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বিয়ে কর, ঘর সংসার কর, আপত্তির কিছু নেই। সেটা হতেই লেনদেনের ব্যাপার। একটা চুক্তিপত্রের ব্যাপার। আমি তোমার স্বামী সংসার দিলাম, সামাজিক পরিচয় দিলাম, তুমি আমায় স্ত্রী-পুত্র দিলে, রোগে অসুখে দেখলে, চুকে গেল। তা' নয় প্রেম, লাভ, মিলন, বিরহ। জগতে যা নেই, তাই নিয়ে মচকচি। এসব পালা লেখাতে হলে আমায় ছাড়ুন মিষ্টার দাস।' বরুণ কলমটা কামড়াতে থাকে।

কৃষ্ণ অধিকারী মানী লোক, তবু আশ্চর্য, এতবড় অপমানেও আহত হন না। বলে, চটছো কেন মাটাবার চটছো কেন? ভাবলাম একটা নতুনত্ব করা যাক। যাক্‌গে দরকার নেই, ওই যে সেই কালোবাজারীদের নিয়ে কি একটা লিখবে বলছিলে—'

বরুণ আত্মস্থ।

বরুণ বলে, 'আমি বলিনি, আপনি বলেছিলেন—'

'ও সে একই কথা! সেটাই কর।'

কৃষ্ণদাস ওর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু বেজার মুখে নয়। কৃষ্ণদাসের মুখে বরং যেন একটা আশার দীপ্তি।

এই রকম মুখ দেখালেই কৃষ্ণকে আমতা লাইনের সেই গ্রামের পথটায় হাঁটতে দেখা যায়। যখন যে নাটকটা নামায়, সেটায় হৈ-চৈ পড়লে, নতুন মেডেল পেলে, বাবুদের দু'কথা শোনাতে পারলে—কৃষ্ণ ট্রেনের টিকিট কাটে।

কৃষ্ণ এক আধবেলার জন্যে হাওয়া হয়ে যায়।

আর কৃষ্ণ হাওয়া হলেই দলসুদ্ধ সকলের পোয়া বারো। মায় কোমরে বেল্ট আঁটা লিলির পর্যন্ত।

লিলি সেদিন 'ঘুকী'র খোলস ছেড়ে তরুণী হয়ে ওঠে। ফ্রকের ওপরেই ব্যাঙার সাঙের একটা শাড়ী জড়ায়। আর নিমাইয়ের কাছে গিয়ে কাছ ঘেঁসে বলে, 'পোপাইটার নেই বলে, খুব 'ভোক' লাগানো হচ্ছে, না?'

নিমাই মুচকি হেসে বলে, 'তা হবে না কেন? তুইও তো সুযোগ পেয়ে হিরোইন সেজে বসে আছিস।...কী বলবো লিলি, শাড়ীতে আর ওই ঘাগরাতে যেন আকাশ-পাতাল তফাৎ দেখায় তোকে।'

লিলি তার সেই 'অবোধ শিশু চঙে' এমন একটি কটাক্ষ করে, যা দেখতে পেলে কৃষ্ণ অধিকারীর রাগে বুক ধড়ফড় করে উঠতো। আর হয়তো মেয়েটাকে ধরে চাবুক পেটাতে যেতো!

কৃষ্ণ তার পুষ্যি কচ্ছেকে 'খাটো ফ্রক আর খাটো জ্যাকেট পরিয়ে খুকী করে রেখে নিশ্চিন্ত আছে। তবে কৃষ্ণ মেয়েটাকে 'বাবা' বলতে শেখায় নি, অদ্ভুত ওই ভাবটাতেই অভ্যস্ত লিলি। 'পোপাইটার।'

ছেলেবেলার আধ উচ্চারণটাই রয়ে গেছে জিভে।

তবু লিলি প্রায় বাপের চোখেই দেখে কৃষ্ণকে।

তাই কৃষ্ণ যখন স্টেশনে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে, লিলি গিয়ে আদুরে গলায় বলে, 'আমায় নিয়ে যাওয়া হয় না একবারও। এ্যাঁ। আমি যেন মানুষ নই।'

লিলিকে তখন শিশুর মত দেখতে লাগে। কৃষ্ণ তাই নিশ্চিন্ত।

নিশ্চিন্ত কৃষ্ণ বলে, 'মানুষ আবার কিরে? মানুষ কাকে বলে? বাঘুরকে কি গরু বলে? ব্যাঙাচিকে ব্যাং? বলি তারকে কি নারকেল বলে? এঁচড়কে কাঁঠাল? মানুষ হবার বয়েস হবে, তবে তো মানুষ হবি?...তা' এখন আমি বেরোচ্ছি—নিমাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবি না বুঝলি? আর মববালার সঙ্গে সঙ্গে থাকবি।'

লিলি মাথা নেড়ে জবাব দেয়, 'তোমার আদরের নিমাই দা ঝগড়া-ফুটে! ওই তো ঝগড়া বাধায়। আমাকে 'তুই' বলে, 'আহলাদী' বলে। আবার রাগ হয় না?'

কৃষ্ণ মৃদু হাসির সঙ্গে বলে, 'ভাল তো কোনোটাই

নয়। সন্ধ্যা, জগৎ সবকটাই তো পাজীর পাঝাড়া।'

লিলি একগাল হাসির সঙ্গে বলে, 'যা বলেছ! ছোটলোক এক একটা!'

কুঞ্জর এ সময় নেজাজ শরীফ।

স্টেশনে যাবার সময় কুঞ্জকে বাসন্তী নববালার সঙ্গেও হেসে কথা কইতে দেখা যায়।

লিলির সঙ্গে কইবে সে আর আশ্চর্য কি! হেসে উঠে বলে, 'তা একটা ভদ্দরলোক তো আছে। ভদ্দরের মতন ভদ্দর, তার কাছে বসে থাকলেই পারিস। তোকে আর তাহলে জ্বালাতে আসবে না ওরা।'

লিলি মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'সে ভদ্দরলোকটা আবার কে গো পোপাইটার?'

'কেন বরুণ? যাকে বলে ভদ্দর!'

লিলি ঠোঁট ওল্টায়।

'বরুণ? লেখকবাবু? সে যা মেয়াকী! কথাই কয় না আমার সঙ্গে!'

কুঞ্জ সহসা কৌতূহলী হয়, 'কথাই কয় না তোর সঙ্গে?'

'মোটে না।' লিলি বলার মেয়, 'কী লিখছে একটু দেখতে গেলে এ্যাইসা খিচোয়। বলে, 'পালা, পালা বলছি। কাজের সময় গোলমাল করতে আসিসনি।' তোমার দলের কেউ ভালো নয়।'

কুঞ্জ বলে, 'তুই তো ভালো, তা'হলেই হলো।'

বলে ওর হাতে দুটো একটা টাকা গুঁজে দিয়ে হাসি-হাসি ভাবটাকে চাপা দিতে দিতে বেরিয়ে যায়।

'যাক্ এখন দশ-বারো ঘণ্টার জন্যে নিশ্চিন্দি'—এঘরে এসে পা ছড়িয়ে বসে লিলি। চোখ মুখের ভঙ্গী করে হাতের টাকা নাচাতে নাচাতে বলে, 'এই দেখো নিমাই দা!'

নিমাই ব্যাজার মুখে বলে, 'দেখে কি করবো? বেশ থাকলে কাকের কি? রাজা যদি বিলোচ্ছেন কোথায়? না অন্তঃপুরে। কুড়োচ্ছেন কে? রাজকন্যে। এইতো?'

লিলি টাকাটা নিয়ে লোকালুফি করতে করতে বলে, 'আমি তো রেল ভাড়া জমাচ্ছি।'

'রেল ভাড়ার দরকার কি!' নিমাই বলে, 'এবার তো নাটক দেখাতে কলকাতায় যাওয়াই হচ্ছে। নাটকের লড়াই হবে, কারটা কাই হয়। যেমন হয়। গেলে তো দলবল সবাই যাবো।···আর কলকাতার শহরে একবার হারিয়ে গেলে খুঁজে বার করে কার সাধ্য!'

'পালাটা কি?'

'তা জানিনে! কোনটা বাছবে কে জানে। মোট-কথা যাওয়া হবে। বরুণবাবু তো আবার পালা লিখছে!'

'বরুণবাবু!'

লিলি মুখটা বাঁকায়, 'যা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে আমায়! দেখলে গা জ্বলে যায়।'

নিমাই হাসে, 'গা জ্বললে আর কি হবে, কর্তা তো ওকে জামাই করবে ঠিক করেছে।'

'ঠিক করেছে!'

লিলি পনেরো বছরের মুখে পঁচিশ বছরের ভঙ্গী করে বলে, 'ঠিক করলেই হল? আমার দায় পড়েছে।'

'কর্তা জোর করলে কী করবি?'

'আহা রে! কী করবো যেন জানেন না!'

চওড়া দরির কোমর বন্ধটার ওপর হাত রেখে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ায় লিলি, 'এখন আবার ন্যাকা সাজছো যে?'

নববালা জল আনতে গিয়েছিল, ঘড়াটা এনে দুম্ করে বসিয়ে রেখে কটু গলায় বলে, 'বামুন গেল ঘর, শাঙল তুলে ধর।' কর্তা বেরিয়েছে, আর কটি নষ্টি হচ্ছে, কেমন?'

খাটো স্কার্ট আর আঁটো জ্যাকেটের মধ্যে থেকে কণিনী ফোঁস করে ওঠে, 'তোমায় খেয়ে কষ্টি নষ্টি করছি? তুমি বলবার কে?'

'ওমা! মেয়ে দেখ! যেন কণা ধরা কণিনী!'

নববালা গমগম্ করে চলে যায়।

কুঞ্জর অনুপস্থিতিতে দলের চেহারাটা অনেকটা এই রকমই। এখন শুধু সবাই নেই, থাকলে দেখবার মত।

শুধু মাঝে মাঝে কুঞ্জ অনুপস্থিত হবেই।

কুঞ্জ সেই একটা নাম হীন পরিচয় হীন গণ্ডগ্রামে পৌঁছে, তার বাঠের নাবখান দিয়ে পুকুর ধার দিয়ে সরু

একটা পায়ে চলার পথ ঘরে গিয়ে ঠেলে উঠবে একখানা জরাজীর্ণ একতলা বাড়ির সামনে।

উঠোনের বেড়ার দরজাটার বাঁধন দড়িটা খুলে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াবে।

'আজও তেমনি দাঁড়ালো।

কিন্তু আশ্চর্য, বেড়ার দরজার সাড়া, জুতোর শব্দ, এই দুটো ঘটনাতেও সাননের ঘর থেকে কোনো সাড়া এল না। অথচ ঘরের মধ্যে মানুষ নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে তা' টের পাওয়া গেল।

দেখা মেলনা কাউকে, তবু কুঞ্জদাস দাওয়ায় উঠে পড়ে পা ঝুলিয়ে বসলো। পিঠটা ঘরের দিকে। গলা তুলে বললো, 'বাড়ি ঘর আলগা রেখে বাড়ির লোক উধাও! চোর ঢুকলো বাড়িতে তা' হুঁশ নেই।'

কথার উত্তর এল না, শুধু ভিতরের নড়া-চড়াটা যেন আরও স্পষ্ট হলো।

কুঞ্জদাস সেই ভাবেই বললো, 'মনস্থির করে ফেললাম! ওইখানেই মেয়ের বিয়ে।'

এবার হঠাৎ ঘরের বাতাস অলক্ষ্যে কথা কয়ে উঠলো, 'ওই ঘানটা' আবার কোন ঘানটা? চাল-চুলো আছে না কি?'

কুঞ্জ এবার গলাটাকে আরো নরম করে, 'যে চালের নীচে আছে সেইটাই তার চাল, যে চুলোয় থাকে সেই-টাই তার চুলো।'

আবার শব্দভেদী বাণ, 'তার মানে অধিকারীর সমস্ত উত্তরাধিকারী হবে ওই কুড়নো মেয়েটা! যার জাতের ঠিক—'

'থাক্ থাক্, আর বাহাদুরীতে কাজ নেই।'

অলক্ষ্য থেকে—

'তা' হঠাৎ মনস্থির করবার হেতু?'

'করছিলামই! নতুন করে আবার বাজিয়ে নিলাম। রোমান্টিক পালা লিখতে বললাম, বললো, 'আমার দ্বারা ওসব প্যান প্যানানি হবেনা।' ব্যস করে ফেললাম মনস্থির—'

ঘর থেকে অবাক গলা ভেসে আসে, 'এতে কি হলো?'

'কী হলো?' কুঞ্জদাস একটি রহস্যময় হাসি হেসে বলে, 'বোঝা গেল, সাচ্চা পুরুষ ছেলে। গাঁকা ভাল-বাসাবাসির ধার ধারে না। তবু আরো একটু বাজাবো!'

ভিতর থেকে এবার একটু স্থির স্বর শোনা যায়। স্থির ভাষী!

'যে ছেলে ভালবাসার ধার ধারে না, সেই তা'হলে কন্যে সম্প্রদানের পক্ষে সুপাত্র?'

'অলাবৎ! আর তার কথাবার্তা কি ঝোরালো!' বলে, 'বিয়ে বুঝি, ঘর সংসার বুঝি। সেটা হচ্ছে বিজি-নেসের মতন লেন-দেনের ব্যাপার। রোমান্স আবার কি? নেই ওসব ঝুটমুটে!'

'ওঃ!' তা' হ'লে আগের যুগে ছিল!'

'ছিল, সেই হাবাকেষ্টর আমলে ছিল। ব্যস্। তার পরে আর না। তারপরে যা আছে, সবটাই ধরবানি, আর ঝাকামী!'

'ওঃ! ভাল কথা।'

আলাপ চলছে।

অথচ সেই দূর ভাষণে।

একজন দেওয়ালের আড়ালে, আর একজন পিঠ ফিরিয়ে। তবু কথা কাটাকাটিও কম্বুর নেই।

একটা গলা বলছে, 'বিয়ে দেবার আগে মেয়ের ইতি-হাসটা বলতে হবে।'

আর একটা গলা জোর গলায় জবাব দিচ্ছে, 'কেন? কী দায়ে পড়েছে? ওরই বা তিন কুলে কটা গার্জেন আছে?'

'তবু তো ভদ্দর ঘরের ছেলে!'

'কুঞ্জদাসও অভদ্র ঘরের ছেলে নয়।'

'মেয়েটা তো শুনেছে দাস বসাইয়ের কুড়নো মেয়ে!'

'কুড়নো তো কুড়নো! অমঙ্গলের কোনো ছাপ নেই?'

'তা বটে! কিন্তু রেলগাড়ীর হাতমুখ ধোওয়া হবে, না ধুলো পায়েই বিদায়?'

'তা সেটা হলেই ভাল হতো, নিতাইই ক্লান্ত ভাই—'

অতঃপর এক সময় দেখা যায় কৃষ্ণ সেই উঠোনটা পার হয়ে পিছনের একটা দরজা খুলে পুকুরে হাত পা ধুচ্ছে।

এক সময় দেখা যায়, সেই দালানেই একধারে পাতা আসনে বসে পড়েছে কৃষ্ণ, সামনে পরিপাটি করে বাড়া অন্নব্যঞ্জন।

আচ্ছা, লোক তো ত্রিসীমানায় নেই, এসব করলো কে? ভূতে নাকি?

তা' তাই।

ভূতই।

কৃষ্ণ যখন হাতমুখ ধুয়ে বললো, 'যাই একবার মিষ্টির দোকানটা ঘুরে আসি, আকাশে তখন ঝিকিমিকি বেলা। অথচ তখন এই কুহকার বাড়ির কুহকার রান্না-ঘরটার মধ্যে দু'টো উনুন জ্বলে উঠেছে। শুকনো কাঠ গোছানো ছিল বোধহয়।

মিষ্টি কিনে আরো এদিক ওদিক ঘুরে কৃষ্ণ যখন ফিরলো, তখন আসন পাতা, অন্ন প্রস্তুত।

কৃষ্ণ আবার পিঠ ফিরিয়ে বসে, আর বলতেই হবে ভূতে ভাতের থালা নামিয়ে রেখে যায়।

খাওয়া মেটে, তবু অনেকটা রাত পর্যন্ত এমনি লুকোচুরি খেলা চলে। তারপর একজন বলে, 'বাড়ি ফিরতে হবে না?'

আর একজন বলে, 'বাড়ি না ঘোড়ার ডিম! সরাইখানা!

'তা সেই যেখানেই—'

'ট্রেন তো সেই ভোরে।'

'তাই আছে চিরকাল।'

'তার মানে সমস্ত রাত ইস্টিশানের চালার নীচে পড়ে থাকা!'

'তা' মানে তাই দাঁড়াচ্ছে বটে।'

অগত্যাই রাগরাগ ভাবে উঠে পড়ে কৃষ্ণদাস। বলে, 'আর আসছি না।'

ভিতর থেকে ছোট্ট একটু শব্দ, 'আচ্ছা!'

কৃষ্ণ গম্‌গমিয়ে বলে, 'আচ্ছা? হুঁ:! জানা আছে কি না আসতেই হবে ঘুরে ফুটো নিয়ে!'

'কেন? কে আসতে দিব্যি দিয়েছে?'

'কে দিব্যি দিয়েছে? ওঃ খুব বোলচাল শেখা হয়েছে। কিছুদিন কলকাতায় বাস করে এই উন্নতিটি হয়েছে।'

'যাত্রার দল খুলেও সে উন্নতি কম হয়নি।'

'হুঁ! চোটপাটটি ঠিক আছে। যাক বিদেয় হওয়া যাক!'

বলে অধিকারী কৃষ্ণদাস পেঁছে থেকে এক গোছা নোট বার করে সামনের ওই ঘরটার দরজার কাছে নামিয়ে রেখে গলা তুলে বলে, 'কাগজের টুকরো ক'খানা তুলে রাখা হোক। ইঁদুরে না কাটে।'

এবার ঘর নিঃশব্দ।

কৃষ্ণ গলাটা একবার ঝেড়ে নিয়ে বলে, 'বাগদী মেয়েটা এসে কাজকর্ম ঠিকমত করে দিয়ে যায়?'

'যায়।'

কৃষ্ণ ছাতাটা দাওয়ার পাশ থেকে উঠিয়ে নিয়ে উঠোনে নামে, জুতোটা পায়ে দেয়, বেড়ার দরজাটা খুলে বেরোয়, বাইরে থেকে আবার সেটা আটকে দেয়, তারপর সেই পায়ে চলা পথটা ধরে আস্তে আস্তে এগোতে থাকে পকেট থেকে টর্চ বার করে আলো ফেলতে ফেলতে।

সারারাত এখন স্টেশনের সেই বয়োগেটের চালাটার নীচে পড়ে থাকতে হবে, রাত্তির শেষে ট্রেন। অতিজাত স্টেশন নয় যে, ওয়েটিং রুম থাকবে।

তবু মরতে মরতে এখানে আসতে হয় কৃষ্ণদাসকে। মাঝে মাঝেই আসতে হয়। ওই কাগজের টুকরোগুলোর পরমায়ুর কাল আন্দাজ করে করে তো আসতেই হয়। অকারণেও হয়। হঠাৎ মন ভাল হবার যোগ এলে, নাটক জমলে, মেজেন্স পেলে। এই পায়ে চলা পথটা যেন প্রবল আকর্ষণে টানতে থাকে কৃষ্ণকে।

কিন্তু কেন?

কিসের দায়ে বাঁধা কৃষ্ণ?

তা সে কথা যদি বলতে হয় তো অনেকগুলো বছর আগে পিছিয়ে যেতে হয়। মন দিয়ে শুনতে হয় একটা ধূলত্যাগিনী মেয়ের নির্লজ্জ ধৃষ্টতার ইতিহাস! সংসারে আর কোথাও কেউ এতখানি ধৃষ্টতা দেখিয়েছে কিনা সন্দেহ।

তবে বৃদ্ধদাসকে দেখতে হয়েছে।

ধূলত্যাগিনী ওই মেয়েটার দুঃসাহসিক আবেদন রাখতেও হয়েছে তাকে।

বৃদ্ধ যখন একটা আসার মন আর তার বলবল নিয়ে যেখানে সেখানে 'চান্স' বলিয়ে বেড়াচ্ছে। তখন একদিন বৃদ্ধ একখানা চিঠি পেল। হাতের লেখা দেখে বৃদ্ধ প্রথমে ছিঁড়ে ফেলতে গেল। তারপর আস্তে আস্তে শুধু খামের মুখটা ছিঁড়লো।

দেখলো কটা মাত্র লাইন। সম্বোধন বিহীন।

...'নির্লজ্জতার সীমা নেই। তা হোক নির্লজ্জের আর লজ্জা কি? বলতে পড়েছি একবার এসে দাঁড়াতেই হবে। নিচে ঠিকানা দিলাম।'

কলকাতার পুব অঞ্চলে একটা গলি-পথের ঠিকানা।

চিঠিখানা নিয়ে সেদিন বৃদ্ধরাত্রিতে পায়চারি করলো, তারপর সকালে একটা কাগজে লিখলো, 'এখনও মুখ দেখাতে সাহস?' খামে ভরলো, উচিত মত ষ্ট্যাম্প মেরে ফেলে দিল।

তারপর মনের জোর করে নাটকের মহলা দেখতে বসলো।

কিন্তু নির্লজ্জতা আর ধৃষ্টতার চরম পরাকাষ্ঠার নমুনা নিয়ে আবার একছত্র চিঠি এল, 'ডেডিকেটেড দেবতার বিধি, মুখ দেখাবো না। তবু না এলেই নয়।'

অধিকারী বৃদ্ধদাস হঠাৎ অস্থির করে ফেললো।

গায়ে জামা চড়িয়ে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে একখানা কাপড় গেঞ্জি আর যতগুলো পারলো টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

সেখানে গিয়ে দেখে এক বিভিকিচ্ছিরি কাণ্ড। একটা সরু গলির মধ্যে পাকা দাঁপুনির এক বস্তি, তারই একটা ঘরের সামনে এক মড় পড়ে।

ভোরবেলার পুরুষের মড়া।

ভেতরে প্রায় ভরাভরি।

ঘরে গেলেও রোকা যাচ্ছে।

বৃদ্ধ ঢুকে পড়তেই একটা হোহোরোল উঠলো।

অনেকগুলো মেয়ে-পুরুষ এক সঙ্গে কথা কয়ে উঠলো, ঘরের মধ্যে একটা মেয়ে-গলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'ভাসুর বুঝি? তা' বিপদের সময় অত ভাসুর ভাশুরো মানলে চলে?'...তারপর কোন ঘর থেকে একটা বয়স্থ বেটাছেলে বেরিয়ে এসে ছেঁড়ে গলায় প্রশ্ন করলো, 'আপনিই বুঝি অমলবাবুর দাদা? তা ভাই মরে গেল তবে এলেন? প্রতিজ্ঞে ছিল বুঝি মরামুখ দেখবেন? তা তেমন প্রতিজ্ঞের উলটুক লোকই ছিলেন বটে শ্রীযুক্ত অমলবাবু! মরে গেছেন, আর বলতে কিছু চাইনা। তবে চটপট ব্যবস্থা করে ফেলুন মশাই।'

করতেই হল ব্যবস্থা।

বোথাকার এক নকষল শহরের কমল মুখুয্যের ছেলে অমল মুখুয্যের লিভার পচে মরা মেয়েটার সদগতি করতে নিয়ে গেল কৃষ্ণবিহারী দাস। মুখাগ্নিও সেই করলো, কারণ তখন সে অমল মুখুয্যের দাদা।

ভাস্করবৌ!

সামনে বেরোয় না। কিন্তু কথা না বললে চলছে না।

দরজার আড়াল থেকে বলে, 'আর কিছুদিন আগে এ দয়া হলে মেয়ের লোকটা বিনি চিকিচ্ছেয় মরতো না।'

কৃষ্ণর চারিদিকে দু'জনে করে চোখ কান।

কৃষ্ণ তবু গলা নামিয়ে বলে, 'বড় দুঃখ হচ্ছে না?'

'তা!' একটা মানুষ বেঘোরে মরলে হয় বৈকি দুঃখ।'

'আমার একটা বাসনা পূর্ণ হয়েছে!'

কৃষ্ণ চাপা নিষ্ঠুর গলায় বলে, 'মুখে আগুন দেবার বাসনাটা পূর্ণ হল।'

'আরো একটা বুঝতো বাকি—' ঘরের ভিতরটা যেন আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে কথা কয়ে ওঠে, 'সেটারও কি এ গতি হবার আশা আছে?'

কৃষ্ণ গম্ভীর গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'গ্যারান্টি দিতে পারছি না।'

'তা' থাক্। মুখে আগুন দেওয়াটা ভাগ্যচক্র। যে জন্যে ডেকেছি, বলি—'

বললো সেই কথা, সেই দুঃসাহসিক মেয়ে মানুষটা!

বছর তিনেকের একটা মেয়ে আছে তার, সেটার ভার নিতে হবে কৃষ্ণকে।

ভার নিতে হবে মানে?

মানে কিছুই নয়। নিতেই হবে তাই! সেটাই বক্তব্য ওই অদর্শনার। মেয়েটার বাপ মরেছে নানা-রোগে, মা মরবে মানে মরতে বসেছে যক্ষায়, অতএব পরেক্ষে মেয়েটা ভাইবীনে যাবে। কৃষ্ণ ভার না নিলে নেবে কে? পথের কুকুর বেড়াল ছানার মতো মরবে?

তা মরুক না। কৃষ্ণর কী লোকসান তাতে? অমন কত মরছে জগতে।

হ্যাঁ, সেই জবাবই দিয়েছিল কৃষ্ণ।

ভোটপাট বলেছিল, 'বেড়াল কুকুরের মতো সে অপেক্ষাই বা কিসের? পানে আছাড় দিলেই তো চুকে যায়।'

'তো, তা হলে তাই দিয়ে যেতে হবে—' অন্তরাল-বর্তিনী বলেছিল, 'সেটাও একটা উপকার করে যাওয়া হবে। ওর মার তো সেটুকু ক্ষমতাও নেই গায়ে।'

'হুঁ! তার পর? সেই জননীটির শেষ গতি কি হবে?'

'তার গতি?' একটু হাসি শোনা গিয়েছিল, 'যক্ষা হাসপাতালের মুদফরাস্ নেই?'

'তা ভালো! উচুদরের গতির ব্যবস্থা হয়ে আছে তা'হলে! তা' হাসপাতালের ব্যবস্থাটা হয়েছে?'

'হবে! বাড়িওলাই নিজের গরজে টেনে ফেলে দিয়ে আসবে। যাক্ মেয়েটাকে আছড়ে দেওয়ার কাজটা সেরে যাওয়া হয় যেন।'

পাশের ঘরে এ-পারে ও-পারে অনেকগুলো কান ভাস্কর-বৌয়ের আলাপ শোনার আশায় উগ্র হয়েছিল। তারা মুখ বাঁকিয়ে বললো, 'খোসটার ভেতর খ্যামটা নাচ!'

আরো অনেক কিছুই বললো তারা।

এবং অপেক্ষা করতে লাগলো, লোকটা বিদেয় হলে আচ্ছা করে একবার শুনিয়ে ছাড়বে বামুন বৌকে। বলি এতই যদি কথার বান, মুখ দেখাদেখিতেই যত দোষ? আরো বলবে, 'ভেতরে ভেতরে এতবড় একটি ব্যাপো পুষে রেখে এতগুলো লোককে মজাচ্ছো তুমি?'

কিন্তু শুনিয়ে দেবার আশাটা আর মিটলোনা তাদের।

লোকটা চলে গেল না।

গেল একেবারে বামুনবৌকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে, আর তার বাচ্চা মেয়েটাকে নতুন জামা জুতো পরিয়ে সঙ্গে নিয়ে।

হাসপাতালের খরচের দায়িত্ব তো অগত্যা কৃষ্ণ দাসকেই নিতে হবে। আর রুগীটা যখন মরবেই তখন তার মা-মরা মেয়েটারও যাবজ্জীবনের দায়িত্ব নিয়ে নিতেই হবে। উপায় কি? মানুষ বৈ তো অন্য জানোয়ার নয় কৃষ্ণ?

কিন্তু আশ্চর্য, ফটিটা মরলোনা।

অপাঙ্গের প্রাণ যমেরও অরুচি বলেই হয়তো মরলোনা, মারলো। অতএব হাসপাতালের চারগাছুড়ে আর থাকা চললো না।

অনেক ঘাটের জল খেয়ে অনেক অবস্থা পার হয়ে, অবশেষে আমতা লাইনের একটা গণ্ডগ্রামের এই আশ্রয়। সাড়ে সাতশো টাকা দিয়ে কেনা হলো এই মলাট ছেঁড়া বইয়ের মত বালিখসা বাড়িটা।

আর বাড়িটা নিজের ট্যাঁকের কড়ি খসিয়ে কিনেছে বলেই হয়তো কুঞ্জদাসের এটার ওপর এত টান!

বছরের পর বছর করে অনেকগুলো বছরই তো পার হলো, টানটা বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছেনা। বোধকরি মুখ না দেখানোর প্রতিজ্ঞাটা বজায় আছে বলে, রুটাও অ-বিবর্ণ, উজ্জ্বল।

আগে কখনো কখনো বলতো কুঞ্জ, 'মেয়েটাকে ইচ্ছে করলেই বেড়াতে আনতে পারি।'

ঘরের দেওয়াল বলেছে 'থাক্'!

'লোকসান কি?'

'আছে। মিছিমিছি একটা অবোধ শিশুর মনে কৌতূহল জাগিয়ে দেওয়া। পাঁচটা প্রশ্ন তার মনে তোলা।'

'কত বড়টা হলো, দেখবার সাধও হতে পারে, তাই ভেবেই বলা।'

'নাঃ সে সাধ নেই।'

তা' নেই সে সাধ নিশ্চয়।

সাধ থাকলে ওই দুষ্ট নির্লজ্জ মেয়েমানুষটা নির্ঘাৎ নিজে থেকেই বলতো, 'কতবড়টি হলো দেখতে সাধ হয়।'

তা পারতো ও বলতে।

ওর অসাধ্য কাজ যখন নেই।

সাধ নেই দেখবার, তবু কুঞ্জদাস তার নাটকের সেই ছেলে সাজা মেয়েটার ফটোগ্রাফ তুলে তুলে মাঝে মাঝে ওই নোটের গোছার সঙ্গে দরজার বাইরে রেখে যায়।

ঘরের ভিতর থেকে তাচ্ছিল্যের স্বর ভেসে আসে। 'দরকার ছিল না। না দেখে মরছিল না কেউ।'

কুঞ্জ চটে যেতো।

বলতো, 'কেনই বা মরে না? মরবার তো, কথা। গর্ভে ধরলেই তার ওপর মায়ার টান—'

'সবই কি আর এক নিয়মে চলে? বিতেষ্টাও থাকতে পারে।'

'হুঁ। অবোধ শিশু, তার ওপর বিতেষ্টা! আর—'

শব্দভেদী বাণ বলে, 'থামা হলো কেন? সবটা হয়ে যাক?···আর পাপে বিতেষ্টা ছিলনা। অনাচারে বিতেষ্টা ছিলনা, এই সব তো?'

কুঞ্জ বলতো, সেধে সেধে অপমান গায়ে মাখা! কুঞ্জদাস অত ছোট কথা কয় না।'

'আমার ঘাট হয়েছে।'

এই তর্কাতর্কি কখনো কখনো বাতাস উত্তপ্ত করে তুলতো।

কুঞ্জ বলতো, 'আর আসবো না।'

ঘরের দেওয়াল তখন হেসে উঠতো। বলতো, 'টাকাটা তা'হলে নদিমর্ডায়ে আসবে? না কি বল?'

কুঞ্জ রাগ করে বলতো, 'সাধে আর বলেছে বর মেয়েছেলে!'

চলে যেত গটগটিয়ে।

আবার আসতো।

বরং সেবারে আরো তাড়াতাড়ি আসতো।

ক্রমশঃ এই আসাটা চন্দ্র সূর্যের মত নিশ্চিত নিয়ম হয়ে গেছে। আসবেই কুঞ্জ। নতুন নেভেল পেলে সেটা দরজায় ফেলে দিয়ে বলবে, 'বেশসুদ্ধ লোক পুজো করে বৈ হেনস্থা করে না। মেডেল কেউ অমনি দেয় না।'

কোনো বই খুব নাম করলে, এসে ওই উল্টোমুখো বসে পা দোলাতে দোলাতে বলে, 'হাজার হাজার লোক দেখছে, আর অহঙ্কারীদের গরবে গরবে মাটিতে পা পড়ে না।'

ঘরের দেওয়াল বলে, 'সেবাটা হবে কেমন করে? আদরের কানাচে হাড়ি বাউরীদের দলে বসে?'

'সে কথা কেউ বলেছে?' কুঞ্জ রেগে উঠে।

জবাব আসে হাসির সঙ্গে, 'বলবে কেন? যা ঘটবে সেটাই হচ্ছে কথা।'

কুঞ্জ চুপ করে থেকেছে।

কুঞ্জ আর কোনো আশ্বাসের কথা খুঁজে পায়নি তখন।

তারপর হয়তো কুঞ্জ সহসা বলে উঠেছে, 'তেত্রিশ কোটি দেবতার দিব্যিটা কি জীবনভোর পালতে হবে?'

ঘরের মধ্যে একটা অস্ফুট আওয়াজ যেন চমকে উঠেছে। তারপর আস্তে আস্তে যেন ঘুমন্ত মানুষ কথা বলেছে, 'দেবতার দিব্যি জন্মভোর কেন জন্ম-জন্মান্তর পালতে হয়।'

'তেত্রিশকোটি তো আছে যেচু। মা-কালী ওর মধ্যে পড়ে না।'

'পড়ে। মা-কালীকে আগে নিয়ে তেত্রিশ কোটি।'

'দিব্যি দেবার আর বস্তু খুঁজে পেল না! ছ্যাঃ।

যেমন বুঝিতে চলেছো চিরদিন !'

আক্ষেপ, রাগ অসহিষ্ণুতা, এই ছিল সমাপ্তি সঙ্গীত।

ক্রমশঃ সেটাও গেছে।

এখন শুধু যেন মস্ত একটা নেশার আভাস।

আসে, উল্টোমুখো হয়ে বসে পা দোলাতে দোলাতে বাতাসকে কথা বলে, পুকুরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আসে, একবেলার ভাতটা খায়, তারপর ছাতাটি নিয়ে স্টেশনে গিয়ে টিনের চালার নীচে সারারাত পড়ে থেকে, সকালের গাড়ীতে ফেরে।

হাতে থাকার কথা ওঠে না।

নানান জায়গায় থাকা, নানান দেশ থেকে বাসনা, কত লাইনের গাড়ীতে চড়তে হয় দলবল নিয়ে, কিন্তু ওই আসতা লাইনটায় কখনো ভুল হয় না।

প্রথমবারে ভাত পায়নি।

কুরু যে হোকানের বিই এনে ধরে দেয় একরাশ, তাই থেকেই সাজিয়ে গুছিয়ে ধরে দেওয়া হয়েছিল কুরু সামনে।

কুরু রেগে উঠে বলেছিল, 'ভাতের আগে এই এত সব খেতে হবে ?'

ভাত !

ঘরের মধ্যে থেকে একটা প্রেতাত্মার ছায়া কণ্ঠ বলে উঠেছিল, 'ভাত খাওয়া হবে এখানে ?'

'হবে না তো কি এই পিত্তিগুলো গিলে রাত কাটাতে হবে ? ভাত ছাড়া হাতে আর কিছু খাই কখনো আমি ?'

সেই স্বর বলেছিল, 'এখানে আমি ছাড়া আর কে আছে দিবার ?'

কুরু ব্যস্ত হয়ে বলেছিল, 'ওঃ তা' শরীর বুঝি ভাল নেই ? তবে থাক্, তবে থাক্।'

কুরু ওই কণ্ঠস্বরের মধ্যে বোধকরি ভয়ানক একটা ভ্রান্তির আভাস পেয়েছিল।

কিন্তু কুরু উত্তরটা পেল উল্টো।

'শরীর খুব ভাল আছে। হাতে খাওয়া হবে কি না সেই কথাই হচ্ছে।'

'ও হাতে খাওয়া !'

কুরু একটা বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠেছিল, 'ধর্মজ্ঞান ! বলি জলটা দিল কে ?'

'জলে আর ভাতে অনেক তফাৎ।'

'কিছু না, কিছু না, কোনো তফাৎ নেই। খাওয়া নিয়ে কথা।' বলেই কুরু আরো হেসে ওঠে, 'আর সে ধরতে গেলে তো ভাতে উঁচু হয়েই খাওয়া হয়েছে। স্কুলের মুখুটি মুখুয্যে কুলিন।'

ভিতরের স্বর এবার সজীব সতেজ, 'আরো একটা কথা আছে। কালির ঝানো হয়েছিল—'

'রোগ সারলে আর কষ্টি কিসের ? বেশী কষ্ট না হলে ভাত দুটো চড়ানো হোক।'

সেই থেকে ওই একবেলা ভাত।

আর তার সঙ্গে এক পাহাড় কথা !

কথা, কথা ! কথা কইবার জন্যেই যেন ছুটে আসে কুরু। অথচ একটা অশরীরি আত্মার সঙ্গে কথা।

আর নূতন কথা কিছুই নেই।

তবে ইদানীং কুরুর ওই পুষ্টি মেয়েটার বিয়ের কথা নিয়ে কথা চালায় কুরু !

তার সঙ্গে নিজের বুদ্ধির বড়াইও।

'উঁহু, কাপড়-কাপড় দিই নি এখনো। ওই ঘাগরা পরিয়েই ছেড়ে রেখেছি। বয়েস ধরা যায় না। তা' ছাড়া স্বভাবেও একেবারে বাচ্চা ! মায়ের তো কাঠ কবুল প্রতিজ্ঞে 'দেখবো না', নইলে মনে হয় নিয়েই চলে আসি। এত বায়না করে ! হাত ধরে ঝুলে পড়ে।'

'অত আহ্লাদেপনা কেন ?'

'আহ্লাদেপনা আবার কি ? একটা স্নেহ মমতার জায়গা ও তো থাকবে মানুষের ?'

'সম্পর্কটা ভালই পেয়েছে।' একটু হাসির শব্দও আসে কথার সঙ্গে।

'সম্পর্ক ! সম্পর্ক নিয়ে কে ধুয়ে জল খাচ্ছে ? তবে এই আগে থেকে বলে রাখছি, বিয়ে দিয়ে জামাই নেয়ে এনে দেখাবোই। তিন সত্যি !'

'পরিচয়টা কী দেওয়া হবে ?'

'সে আমি বুঝবো।'

আবার আসে—

বলে, 'মনস্থির করেছি, তবু এখনো আরো কিছু বাড়িয়ে নিতে বাকি। তবে দেরী করবো না, ছেলে-বয়স থাকতে থাকতেই দল থেকে সরাতে হবে। অবিশ্যি খুব ছুঁদে আছে মেয়েটা, কাউকে পরোয়া করে না, সব কটার সঙ্গে ঝগড়া। তাই আবার শান্তি।'

কুরুর পুষ্টি মেয়েটা ছুঁদে বলে কুরুর শান্তি !

আর কুরু তার পায় ঠিক করে ফেলেছে বলে কুরুর শান্তি !

তবু পায়টাকে এখনো বাড়িয়ে নিতে বাকি।

সেই বাড়ানোর পদ্ধতিটাই ধরে কুরু।

লিলিকে ডেকে ডেকে বলে, 'সারাদিন শুধু হি হি করে বেড়াস কেন ? শেলেট পেন্সিলটা নিয়েও বসতে পারিস

দু'দণ্ড! বাড়িতে একটা লেখা-পড়া জানা ভদ্র ছেলে রয়েছে, তার কাছেও একটু পড়া বুঝে নিলে হয়। তা' নয় কেবল ওই মুখ্যুগুলোর সঙ্গে—'

'বরুণদা পড়াবে আমাকে? তা' বলেই হয়েছে!'

লিলি ঠোঁট উল্টোয়।

কৃষ্ণ অস্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

আবার এক সময় অন্য পথ ধরে কৃষ্ণ।

বলে, 'লিলি, যা দিকি বরুণকে এক পেয়ালা কড়া করে চা দিয়ে আয় দিকি। রাত জেগে বই লেখে! মেয়ে যেন আর কাউকে বরাত দিসনি, নিজে করে দিবি।

লিলি প্রোপ্রাইটারের কথা ঠেলতে পারে না।

কিন্তু খানিক পরেই লিলি রাগ রাগ করে ফিরে আসে, 'আর কক্ষনো বরুণদাকে চা করে দেব না। এত বকে!'

'বকে? বকবে কেন?'

'কেন? তোমার ভাল ছেলে ভদ্দর ছেলে যে! চা দিতে গিয়েছি, বলে কি না 'কে তোকে চা নিয়ে আসতে বলেছে? চা খেতে চেয়েছিলাম আমি? খবরদার যদি আর কখনো শুধু শুধু এ ঘরে আসবি তো দেখাবো মজা। যা ফেলে দিগে যা'।

লিলি কাঁদো কাঁদো হয় এবার।

কিন্তু কৃষ্ণর মুখ হাসি হাসি।

কৃষ্ণর যেন অনেক বল মিলে গেছে। কৃষ্ণ বলে, 'তুই বললি না কেন প্রোপ্রাইটার বলেছে।'

'বলতে সময় দিয়েছে? দূর দূর ছেই ছেই! শেষ কালে যখন বললাম, 'ফেলে দেবে তো—পোপাইটারের সামনে গিয়ে ফেলে দাও গে। যে চা দিতে বলেছে—' তখন বললো,—'সে দিয়ে যা।'

কৃষ্ণ মৃদু হেসে বলে, 'রাত দিন চড়া চড়া পালা লেখে তো? মেজাজটা তাই চড়া।' তার মুখে প্রসন্নতার দীপ্তি।

এই ঠিক ছেলে।

মেয়ে মানুষকে দূর দূর করে মানেই, বিয়ে করা পরিবার ছাড়া জীবনেও আর কারুর দিকে তাকাবে না। তা' ছাড়া লিলির সঙ্গে বেঁধে দিতে পারলে চিরকাল আমার কাছে বাঁধা থাকবে লেখক। আর লিলিও কাছে থাকবে।

কৃষ্ণ বরুণের ঘরে এসে ঢোকে।

'চা খেয়ে রেগে উঠলে কেন গো নাটাকার? রাত জেগে লেখো, তাই ভাবলাম একটু কড়া করে চা খেলে—'

'না, না আমি ওসব পছন্দ করি না—। বরুণ বিরক্ত গলায় বলে, 'খুব খারাপ লাগে আমার ওই মেয়ে-কেয়ে ঘরে ঢোকা।'

কৃষ্ণ উদার গলায় বলে, 'আরে বাবা, একটা বাচ্চা মেয়ে—।'

'তা' হোক!' বরুণ রুক্ষ গলায় বলে, 'বারণ করে দেবেন।'

কৃষ্ণ ছদ্মচার গলায় বলে, 'তা না হয় দিলাম। কিন্তু মেয়েছেলে দেখলেই যদি তোমার এত গা জ্বলে, যে বাঁ করবে কি করে?'

'বিয়ে করবো, এ কথা আপনাকে বলতে যাই নি।'

কৃষ্ণ হেসে উঠে বলে, 'আহা তুমি তো বলতে যাও নি। কিন্তু আমি তো মনে মনে ঠিক করে রেখেছি তোমাকে ঘর জামাই করে নেব।'

বরুণ হঠাৎ ভুরু কুঁচকে বলে, 'কেন? হঠাৎ আমার প্রতি এমন নেক্‌ নজর কেন?'

'আহা রাগ করছো কেন? তোমাকে যে আমার ভারী পছন্দ, ভাই!'

'বিয়ের সঙ্গে তা'র কি সম্পর্ক? পছন্দ করেন, করুন।'

'নাঃ এখন তোমার মেজাজ ভাল নেই, থাক্ ও কথা! পালাটার কতদূর হলো?'

'এগোচ্ছে।'

'শুনতে পাইনা একটু?'

বরুণ একবার এই লোকটার প্রার্থী প্রার্থী মুখের দিকে তাকায়। এটাও আশ্চর্য! দলের আর সকলের ওপর ব্যবহার তো দেখেছে, যেন হাতে মাথা কাটছে।...অথচ বরুণের সামনে যেন বেচারী! যেন কৃতার্থমন্য অনুচর।

তার মানে, বরুণের মধ্যেকার শিল্প-স্রষ্টাকে শ্রদ্ধা করে ওই গোঁফওয়ালা বেঁটে খাটো লোকটা।

বরুণ হঠাৎ নিজের কঠোরতার জন্য লজ্জিত হয়।

বলে, 'আচ্ছা শুনুন খানিকটা—'

পড়ে কিছুক্ষণ, তারপর মুখে মুখে বাকিটা শোনায়। একজন ভেজালদার কালোবাজারী ধীরে বিষাক্ত চর্বি ভেজাল দিয়ে কেমন করে নিজের পরিবারেরই সকলের মৃত্যু ডেকে আনলো, তারই কাহিনী। তারপর ভেজাল-দারের একমাত্র জীবিত কন্যা, পদ্মা উন্মাদিনী হয়ে গিয়ে কীভাবে অনন্ত ভাণ্ডার ভরতের সমস্ত লোভী মুনাফাখোর আর ভেজালদারদের উদ্দেশে অভিসম্পাত দিয়ে বেড়াতে লাগলো, এ তারই কাহিনী!

আধুনিক কোনো 'একাঙ্কিকা নাটিকা'র নাটকায় বরুণের নাটককে কানা কড়িও মূল্য দেবে কিনা সন্দেহ। বরং হয়তো তার মোটা আবর্শ, আর তার মোটা প্রকাশ ভঙ্গী দেখে কৌতুকের হাসি হাসবে, তবু বরুণরাও একেবারে অসার্থক নয়। তাদেরও গুণগ্রাহী আছে,

তাদেরও শ্রোতা আছে, দর্শক আছে।···তুচ্ছ রসের সন্ধানদারই বরং কম। এই মোটা রসের মানুষই তো দেশ জুড়ে। দেশ যতই তার সাহিত্য আর শিল্পের উৎকর্ষের বড়াই করুক, আজও নাটকান্তে নায়িকাকে পাগলিনী করে ছেড়ে দিয়ে তার মুখের অসংলগ্ন ভাষার মধ্যেই নাট্যকারের মূল বক্তব্যটি চালিয়ে দেওয়ার যুগ প্রায় অবিচলই আছে।

কাজেই কুঞ্জ অধিকারী মুখে বরুণের নাট্যকাহিনী শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হয়, আর কল্পিত এক আসরে বসে হাজার হাজার করতালির ধ্বনি শুনতে পায়।

হঠাৎ তাই বরুণের হাতটা চেপে ধরে কুঞ্জ, বলে, 'এইটাই তুমি ভাল করে খাড়া করে কোলো লেখক! কলকাতার পুরনো রাজবাড়ির যাত্রা 'অপেরা' কম্পিটিশনে এটাই নামাবো।'

বরুণ ওই আশার উদ্বেল আগ্রহ ব্যাকুল মুখের দিকে তাকায়, আর আস্তে আস্তে হাসে। বলে, 'সবটা করে কেমন দাঁড়াবে দেখি।'

'তোমার হাতে আবার কেমন দাঁড়াবে! অপূর্বই দাঁড়াবে।' কুঞ্জ ওর হাতটা আরো জোরে চেপে ধরে বলে, 'নাট্যকার তুমি কখনো আমায় ছেড়ে যেওনা।'

বরুণের মুখে আসছিল, 'শ্রোতের ভালো কি কখনো এক জায়গায় আটকে থাকে?'

কিন্তু বলতে পারলো না।

ওই বয়স্ক লোকটার নির্ভরতায় ভরা মুখটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

তারপর লেখা কাগজগুলোয় মন দিল।

একটু ক্ষণ চুপ করে বসে থেকে কুঞ্জ উঠে গেল।

কুঞ্জ একা পায়চারী করতে করতে, ওই জলস্ত ভাষা, আর চারুহাসিনীকে মনে করতে থাকে।

পারবে কি?

পারবে বোধহয়!

কলকাতার পুরোনো রাজবাড়ি থেকে বোলপাটা একবার পেলে হয়।

কিন্তু হলো একটা ব্যাপার।

কলকাতার ডাক আসবার আগেই মহিষাদল থেকে একটা ডাক আসে। জমিদারী না থাক্ জমিদার বাড়ী। এখনো পুরনো ঐতিহ্য রয়ে গেছে।

একমাত্র ছেলের পৈতে, সেই উপলক্ষে বিরাট ঘটা, আর সেই ঘটা উপলক্ষে যাত্রা আর কবিগান দেবেন তাঁরা।

দুর্গাপুজো বায়না কুঞ্জ অধিকারীর পালার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় আছে, তাই তাকেই খবর পাঠিয়েছেন।

কুঞ্জ বলে, 'আমি বলি কি নাট্যকার, তোমার ওই নতুন পালাটাই লাগিয়ে দিই।'

বরুণ বিস্মিত হয়, বরুণ বলে, 'রিহার্সালের সময় কোথা?'

'হবে হয়ে, যাবে।' কুঞ্জ আগ্রহের গলায় বলে, 'পিটিয়ে পিটিয়ে করে তুলবো। নেবুলীপুরের দিকে লোকের তোষার গিয়ে এই সব চেতনা বেশী। সেখানে তোমার এ পালা নামালে দেখবে কাণ্ড!'

বরুণ হাসে, 'দেখুন।'

কুঞ্জ কিন্তু হাসে না।

কুঞ্জ সিরিয়াস গলায় বলে, 'দেখবো না, দেখেছি। তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকো নাট্যকার, কোনো বাধাকেই ভয় করি না।'

বলে।

অথচ বরুণ তার কে?

বরুণ তার নাটকের নাট্যকার, এইমাত্র।

বলতে গেলে পথে কুড়নো।

আর বলতে গেলে কুঞ্জরই গঠিত বিগ্রহ।

কোথায় যেন দল নিয়ে চলেছে কুঞ্জ, হঠাৎ রুক্ষমাথা, ধুলোভর্তি পা, আধময়লা ধুতি শার্ট পরা ছেলেটা রেল-গাড়ীতে উঠে পড়ে বলে, 'পয়সা নেই, বিনাটিকিটে উঠেছি, আমায় ভাড়াটা দিয়ে দিন না।'

চমৎকৃত কুঞ্জ 'চমৎকার' ভাবটা গোপন করে বলে, 'তা' যাবোকা আমি তোমার রেলভাড়াটা দিয়ে দেব কেন হে বাপু? তুমি আমার কে বাপের ঠাকুর চৌদ্দ-পুরুষ?'

ছেলেটা ঘাবেনি।

বলেছিল, 'এরাই বা আপনার কে? এই যে দলবল নিয়ে যাচ্ছেন?'

'এরা? এরা তো আমার 'দল'। 'জয়ানী অপেরা'র নাম শুনেছ? আমি হচ্ছি তার প্রোপ্রাইটার কৃষ্ণবিহারী দাস।'

ছেলেটা বলেছিল, 'নাম শুনিনি, এই শুনলাম। তা' বেশ তো, আমাকেও দলের লোক করে নিন।'

চাইছে, অথচ প্রার্থীর ভাব নেই, যেন দাবির সুর। কৃষ্ণর ভাল লেগে গেল। হাত কচলানো কৃপাপ্রার্থী দেখে দেখে অরুচি। আর তা না হলো তো ছেড়ে ঘটঘট! এর ভাব আলাদা!

কৃষ্ণ সকৌতুকে বললো, 'তা বলে না হয় নিলাম। কিন্তু তোমার কি গুণ আছে শুনি?'

ছেলেটা বললো, 'গুণ কিছু নেই, তবে যাত্রা নাটকের পালা লিখতে পারি কিছু কিছু।'

পালা লিখতে পারে!

আহা-হা এই লোকই তো খুঁজে বেড়াচ্ছে কৃষ্ণ। যার ক্ষমতা আছে, অথচ আত্মঅহমিকাবোধ নেই। এর নেই, সেই বুঝেছে কৃষ্ণ। নিজের গুণ সম্পর্কে যেন তাচ্ছিল্য [illegible]।

ব্যস্ সেই রেলগাড়ীতেই হয়ে গেল সম্পর্ক স্থাপন।

তারপর—কৃষ্ণর উৎসাহ, কৃষ্ণর প্রেরণা আর বরুণের সহজাত ক্ষমতা। কৃষ্ণ অবশ্য বলে 'লেখাপড়া জানা ভদ্দর।' কিন্তু বরুণ নিজে কোনোদিন নিজের পরিচয় দেয় নি। বলে 'মায়ে তাড়ানো বাপে খেদানো রাস্তার ছেলে! ব্যস্। এই হচ্ছে আমার পরিচয়।'

তবু কোথায় যেন দুঃখ আছে।

আছে আভিজাত্য।

কৃষ্ণ তাকে 'বশ করে কেনবার' সংকল্প নিয়ে নিজেই বশ্যতা স্বীকার করে বসে আছে। কৃষ্ণ তার মহিমায় বিবশ। কৃষ্ণ দলের আর সকলের উপর রাজা, বরুণের কাছে প্রজা।

তাই বরুণ থাকলে সে আর কিছু ভাবেনা।

মহিমাদলে যাবার তোড়জোড় চলে, আর চলে জোর মহলা। কয়েকদিনের মধ্যে তৈরি করতে হবে।

হঠাৎ এই মোক্ষম সময়, যখন আর দিনতিনেক দেরী, চারুহাসিনী পড়লো জ্বরে। রীতিমত জ্বর। যে চারুহাসিনীর ভূমিকা উন্মাদিনী নায়িকার।

কৃষ্ণ নিজের মাথাটা দেয়ালে ঠুকে গুঁড়ো করতে যায়। কৃষ্ণ বুকে কীল মারতে যায়। এখন কী করবে সে? নবরাগা? বাসন্তী? ছি ছি!

হঠাৎ বরুণ বলে বসলো, 'ভাবছেন কেন অত? আপনার লিলিকে নামিয়ে দিন না।'

লিলি!

কৃষ্ণবাস হকচকিয়ে বলে, সে কী!'

'কেন, অবাক হবার কি আছে?' বরুণ অবহেলাভরে বলে, 'রিহার্শাল শুনে শুনে তো মুখস্থ। যখন তখনই তো আওড়ায়। গানও তোলে।'

ইদানীং আর অনেকদিন কমবয়সী ছেলের পার্টের দরকার হয়নি। তাই লিলির কথাটা যেন ভুলেই গিয়েছিল প্রোপ্রাইটার। লিলি শুধু কোমরে বেল্ট বেঁধে সেই কোমরে হাত দিয়ে দলের ওপর সর্দারী করে বেড়ায়। আর কৃষ্ণ ইস্টিশানের পথ ধরলেই নিমাইয়ের গা ঘেঁসে বসে ঠুক নাচিয়ে বলে, 'আচ্ছা নিমাইদা, পোপাইটার দেরায় দেরায় কোথায় যায় বলতো?'

কৃষ্ণ সে খোঁজ রাখে না, তাই কৃষ্ণ অগ্রাহ্যের হাসি হেসে বলে, 'মুখস্থ বলেই তো হল না হে! মানাবে কেন? ওটা হল একটা যুবতী মেয়ের পার্ট।'

বরুণ অন্যদিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলে, 'আপনার লিলিকে তাতে মানানো হবে না। ওই ঘাগরা ছাড়িয়ে শাড়ী পরিয়ে দেখুন গিয়ে।'

কৃষ্ণ তথাপি হাসে, 'আহা গড়নটা একটু বাড়ন্ত, তা' বলে কি বয়েসের ভাবটা আনতে পারবে?'

বরুণ তাচ্ছিল্যভরে বলে, 'পারে কি না, আসরে নামিয়ে দিয়ে দেখুন। বয়েস আর ছোট নেই ওর।'

বরুণের মুখে আরো আসছিল বলে, 'আর ওই নিমাই কোম্পানীর দলে ছেড়ে দিয়ে আড়াল থেকে দেখুন।'

বলে না।

ভাবে, আমার কি দরকার!

মেয়েটাকে সে ওই পাখানীর জন্যেই দেখতে পারে না।

তবে অস্বীকার করতে পারে না, মেয়েটার মুখস্থ করার ক্ষমতাটা।

ওরা যে যার পার্ট রিহার্শাল করে, লিলি শুনে শুনে সবাইয়ের পার্ট মুখস্থ করে ফেলে। ভাব ভঙ্গী কিছুই বাদ যায় না। গানও তোলে। তবে কৃষ্ণ সম্পর্কে সাবধান থাকে। কৃষ্ণ বাড়ি থাকলে গলা তোলে না, পাছে বকে।

বকবে, এই ধারণাটাই ছিল লিলির।

বরুণের কাছ থেকে লিলির নাম প্রস্তাবে কৃষ্ণ খুব একটা আশান্বিত না হলেও, ইষৎ কৌতূহলাক্রান্ত হয়েই ডেকে পাঠালো লিলিকে।

তারপর বললো, 'তুই পার্ট মুখস্থ করিস?'

লিলি ভয় পেলো।

বললো, 'না তো।'

'না? তবে যে বরুণ বললো। ওকি মিছে কথা বলবার ছেলে?'

লিলি ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'না নয়! আমার নামে তোমার কাছে মিছে মিছে লাগিয়েই তো ও তোমার স্নেহো হয়েছে।'

'এই দেখো। নিন্দে কোথায়? সুখ্যাতি তো! বলছিল, লিলি ঠিক চারুর মতন পার্ট বলতে পারে। লিলির গানের গলা আছে।'

লিলি সন্দেহের সুরে বলে, 'তুমি বানাচ্ছো।'

'এই দেখো! আমার বানাবার দরকার কি? তবে ভাবলাম চারুর তো জ্বর, কে ওই পদ্মার পার্টটা করে। বরুণ বলছিল তোর নাকি সব মুখস্থ!'

লিলি এবার পুলকিত হয়।

লিলি অতএব বলে ওঠে, 'শুনে শুনে মুখস্থ করেছি, বলবো?'

কৃষ্ণ প্রসন্নমুখে বলে, 'বল।'

লিলি মনশ্চক্ষে আসরের মাঝখানে নিজের শাড়ীপরা মূর্তিটাকে দেখতে পায়। যে মূর্তি জলন্ত ভাষায় বলছে, 'পাপ! পাপ! পাপের ভারে জর্জরিত পৃথিবী দু'হাত তুলে আর্তনাদ করছে……শুনতে পাচ্ছো না তোমরা? ওই পাপ মায়ের বুক থেকে স্নেহ চিনিয়ে নিচ্ছে, নারীর প্রাণ থেকে ভালবাসা। আর পুরুষ জাতকে? শয়তানে পরিণত করছে, নিষ্ঠুর নির্বন্ধ লোভী শয়তান! যে শয়তান ধর্ম মানে না, বিবেক মানে না, মানে না লজ্জা ভয়।…এই পাপের একটা পোষাকী নাম আছে জানো তোমরা? জানো না? হাঃ হাঃ হাঃ। সে নামটি হচ্ছে সোনা! বুঝলে।……যার পিপাসা রাবণের চিতার মত শুধু জ্বলছে। নিবৃত্তি নেই।……এত সোনা নিয়ে কী করবে গো? খাবে? বিছানা পেতে শোবে? আর নরকে যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যাবে? হাঃ হাঃ হাঃ। কিসে করে নিয়ে যাবে? লোহার সিন্দুকে?'……

পাগলিনীর সুর, পাগলিনীর ভঙ্গী! চোখে-মুখে

কায়দা! কৃষ্ণও পাগল হয়ে ওঠে।

উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে, 'শাড়ী নিয়ে আয় একটা, মাটিতে আঁচল লুটিয়ে পর, চুলের ঘড়ি খুলে ফেল।'

'তোমার তেত্রিশকোটির দিবিটা একদিনের জন্যে বাতিল করবে?'

উত্তেজিত কৃষ্ণদাস ঘরের দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলে, 'এ শুধু হতভাগা কৃষ্ণদাসের মেজেল নয়, তোমার লিলির মেজেল। আসরে নেমেই বাজি মাৎ! ফাষ্ট নাইটেই মেজেল! বাড়ির কর্ত্রী একটা দিল, আর মহারাজা গর্গ বাহাদুর একটা! কী হাততালির ঘটা! আসর ফেটে যায় একেবারে! হাজার হাজার দর্শক লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল। তবুনি পাশের গাঁয়ে আরও একটা বায়না হয়ে গেল।'

ঘর থেকে সাড়া নেই।

ঘর নিঃশব্দ!

কৃষ্ণ দাস গলা চড়ায়, 'কথা-গুলো কানে গেলনা বুঝি? স্বভাবটি চিরকাল এক রইল। দেমাকীর রাজা! বলি মেজেলটা দেখা হবে? না কি তাতেও অগ্রাহ্যি?···তিন বছরের শিশুটাকে চোখ ছাড়া করে রেখে গিয়েছিলে, সে আজ মেজেল লুটে এনেছে, হাজার লোকের ধন্যি ধন্যি কুড়িয়েছে,এতেও নিয়ম ভেঙে একবার উঁকি দেওয়া যায় না?'

এবার ঘরের মধ্যে থেকে স্বর আসে। শীতল কঠিন।

'মেজেলটা লুটেছে তো আসরে নেচে কুঁদে?'

হঠাৎ কৃষ্ণ দাস যেন মাথায় একটা লাঠির ঘা খায়।

লিলির ওই অভাবনীয় সাফল্যে কৃষ্ণ যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল, কৃষ্ণ বুঝি নিজের নীতিও বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। কম বয়েসে বিয়ে দিয়ে যাত্রার দল ছাড়া করে ঘরগেরস্থী করে দেবে লিলিকে। এই সংকল্পটার কথা মনেও ছিলনা আর!

কৃষ্ণ আজ ক'দিন ধরে স্বপ্ন দেখছিল, আলকোজ্জ্বল আসরে লিলি। আসর মাতাচ্ছে। হাততালি কুড়োচ্ছে, মেজেল লুটছে।···

বারবার বহুবার।

অজস্র বায়নায়। অজস্র আসরে।

কৃষ্ণ স্বপ্ন দেখছে কলকাতার যাত্রা প্রতিযোগিতায় ফাষ্ট হয়েছে কৃষ্ণর ভবানী অপেরা পার্টি, থিয়েটারের মালিকরা এসে চুপি চুপি ধর্ণা দিচ্ছে মেয়েটাকে ভাঙিয়ে নেবার জন্যে।···আর কৃষ্ণ সগর্ব হাস্যে বলছে, 'আজ্ঞে না বাবু মশায়, ও আমার মেয়ে। নিজের মেয়ে! ওকে আমি—।'

আর কৃষ্ণ স্বপ্ন দেখছে, চাকে হাদিনীকে আর তোয়াজ করতে হচ্ছেনা, বায়ে বায়ে রিহার্শাল দেওয়াতে হচ্ছে না।

কৃষ্ণর ঘরের মধ্যে এমন দামী বস্তু ছিল। আর কৃষ্ণ তার খবর রাখতো না?···কৃষ্ণ নিজেকে সান্ত্বনা দেবার অবীশ্বর ভাবছিল।···আর ভাবছিল, এই ভয়ঙ্কর আহ্লাদের ঢেউয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে অন্তরালবর্তিনীর তুচ্ছ প্রতিজ্ঞা।

দু'জনে মুখোমুখি বসে দেখবে লিলির মেজেল।

সত্যিকার মা বাপের মত।

কৃষ্ণ যে ওর কেউ নয়, বলতে গেলে পরপক্ষ। তা' তো কৃষ্ণও মনে নেই! নিঃসন্তান কৃষ্ণর অপত্য স্নেহটা ওই-খানে গিয়েই পড়েছে।

তবু কৃষ্ণ যেন ঠিক ভোগ করতে পারেনা। সন্তানকে সন্তানের মায়ের সঙ্গে না দেখলে কি সত্যকার আস্বাদ পাওয়া যায়?

সেই আস্বাদ পেতে ছুটে এসেছিল কৃষ্ণ! আগ্রহের মন নিয়ে। সেই মনে লাথি খেলে।

পাথরের দেয়াল বলে উঠলো, 'মেজেল তো আসরে নেচে কুঁদে?'

কৃষ্ণ ওই লাঠির ঘায়ে স্তব্ধ হয়ে গেল, তারপর কৃষ্ণর নিজস্ব স্বভাব ফিরে এল। চড়া গলায় বলে উঠলো, 'কৃষ্ণ অধিকারী তোমার মেয়েকে বাইজীর নাচে নাচায় নি।'

ভেতরের গলা সমান ঠাণ্ডা!

'মেয়ে আমার নয়, মেয়ে অধিকারীরই। তবে গোড়া থেকে শুনেছি কি না অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে ঘরগেরস্থী করে দেওয়া হবে—'

কৃষ্ণ সক্রোধে বলে, 'তা সেটা হবে না, কে বললো? নিরুপায়ে পড়ে একদিন নামিয়ে দিলাম, মেয়ের এখন

ব্যাপারটা যে তাতেই ধস্তি ধস্তি পড়ে গেল, মেজেল চলে এল, সেই কথাই আহ্লাদ করে বলতে এসেছিলাম। ওকে কি আমি বলে ভর্তি করে ফেলেছি?'

'আর করতে হবে না, ও নিজেই হবে।'

'নিজেই হবে!'

'হবে! 'বাহবা'র নেশা মদের নেশার বাড়া। উচ্ছন্ন দিতে সময় নেয় না।'

কৃষ্ণ উত্তর খুঁজে পায় না।

তাই কৃষ্ণ হঠাৎ একটা বেআব্রু চড়া কথা বলে বসে, কড়া আর চড়া বিদ্রূপের গলায়, 'তাই নাকি? কিন্তু ওর মার তো এত 'বাহবা' জোটেনি, তবু উচ্ছন্ন যেতেও আটকায়নি।'

বলে ফেলে কৃষ্ণ নিজেই থতমত খেয়ে যায়। একথা বলার ইচ্ছে তো তার ছিলনা।

কিন্তু কৃষ্ণকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা হাসি শোনা যায়। সত্যিকার খোলা গলার হাসি। তার সঙ্গে কথা, 'কে বললে 'বাহবা' জোটেনি? বাহবা না জুটলে উচ্ছন্নে যাবার পথটা পরিষ্কার হলো কিসে?'

'বাহবা! ছঃ! বাহবাটা কিসের?'

'কেন রূপের!'

রূপের! রূপের! কনঝনিয়ে উঠল রক্তকোষগুলো।

যে রূপ বহু বহুকাল দেখেনি কৃষ্ণ। যে রূপের প্রতিনাকে হারিয়ে পৃথিবী বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল তার কাছে, আর যে রূপ এই দীর্ঘকাল হতভাগা কৃষ্ণবাসকে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, সেই রূপের উল্লেখ!

সহসা শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় চড়ে ওঠে কৃষ্ণর।

কৃষ্ণ সহসা চীৎকার করে বলে ওঠে, 'তা' এতই যদি রূপের গরব, সেই রূপ ভাঙিয়ে খেলেই হতো! এই গরীব হতভাগাটাকে বাঁদর নাচাবার দরকারটা কি ছিল?

কৃষ্ণ এবার জিভ কামড়ায়, কৃষ্ণ নিজের মুখের উপর নিজে থাবড়া মারে। কিন্তু হাতের ঢিল, আর মুখের কথা!

আশ্চর্য, আজই বা এমন হল কেন?

আজকেই তো সবচেয়ে উৎফুল্ল মন নিয়ে এসেছিল কৃষ্ণ! আশাতঙ্গ হলো? তা' না হয় তাই হয়েছে, তাই বলে কৃষ্ণ এমন রূঢ় কথাটা বলবে? তার মানে, ওই মানুষটা ধরে নেবে, এই বিষ মনে পুষে রেখে সরলতার ভান করে নিয়মিত আসা যাওয়া করছে লোকটা, ঔদার্যতা দেখিয়ে টাকা দিচ্ছে।

কৃষ্ণ মরমে মরে যায়।

কিন্তু যাকে ওই বাক্যবাণটি বেঁধা হলো, সে মরমে মরেছে এমন প্রমাণ পাওয়া গেলনা। সে দিব্য স্বচ্ছন্দে জবাব দিল, 'মরতে পড়েছিলাম যে! এখন তো সে পথ বন্ধ!'

ওঃ! ওঃ!

কৃষ্ণর আবার সর্বশরীরে আগুনের হল্কা ছুটে যায়।

কৃষ্ণ সমস্ত ধৈর্য হারায়।

কৃষ্ণর সত্যিই মনে হয়, এই দীর্ঘ কাল ধরে সে যেন একটা বহু নেয়েনানুষের হাতের সুতোয় তালে বাঁদর নাচ নাচছে।

এখন সে হি হি করে বলছে—'মরতে পড়েছিলাম! উপায় ছিল না।···তাই তোমার মতন বোকা গাধাটার শরণাপন্ন হয়েছিলাম।···না হলে···ভাঙাতার রূপ। বিধাতার দেওয়া ব্যাঙ্ক নোট!'···

এরপরও কৃষ্ণ ধৈর্য হারাবে না?

কৃষ্ণ দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'ওঃ তাই! তাই—'পাষীজুখি খাইনা আমি ধমে দিয়েছি মন!' আর আমি শালা একটা লক্ষীছাড়া বদনেয়েনানুষের পাল্লায় পড়ে—অথবা চং কত! 'মেয়ে আমার আদরে নেচেছে, বাইজী হয়ে গেছে।' ঠিক আছে ও মেয়ে আর আমি রাখছিনা। যার মেয়ে তার কাছে দিয়ে যাব ব্যস! এই আমার শেষ কথা!'

কৃষ্ণ দালানের ধার থেকে ছাতাটা তুলে নেয়।

ভিতর থেকে ঈষৎ ব্যস্ত গলা শোনা যায়, 'তা' রগড়াটা তোলা থাকনা এখন, হাতমুখ ধোওয়া হোক!'

'হাতমুখ ধোওয়া!'

কৃষ্ণ ছিটকে ওঠে, 'আবার এখানে জলগ্রহণ করবো আমি!···ভেবেছিলাম অনুতাপে নাকি সব পাপ ধুয়ে যায়। তবে কেন আর—! থাক ভাল শিক্ষাই হলো! এই যাচ্ছি, কাল-পর্শু এসে মেয়েকে ফেলে দিয়ে যাব, ব্যস!'

কৃষ্ণ ছাতাটা নিয়ে গট্ গট্ করে চলে যায়।

বৃষ্টি পড়ছিল ঝির-ঝিরিয়ে, তবু ছাতাটা হাতেই থাকে।

আজ আর স্টেশনে পড়ে থাকতে হবে না, এখনো ট্রেন আছে। কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠে বসে।

আর অবাক হয়ে ভাবে, কী করতে এসেছিলাম আমি, আর কী করে গেলাম।···আচ্ছা কী কী বললাম আমি!···

মনে করতে পারলো না, শুধু নিজের উপর অপরিসীম ধিক্কারে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে রইল। অথচ একটানা অনেকদূর যাবার পথ নয়, দেহটাকে নিয়ে বহুটানা হেঁচড়া করে তবে গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে হবে। দল এখনো মহিষাদলে পড়ে।

এই টানা-হেঁচড়া করেই এসেছিল, তখন গায়েও লাগেনি, এখন যেন আরে দেহ চলছে না।

আশ্চর্য এতদিন ধরে কী করেছে কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ কি পাগল হয়ে গিয়েছিল?

নাকি কৃষ্ণকে কেউ মন্ত্র প্রয়োগ করে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল?

নইলে কৃষ্ণ তার কুলত্যাগিনী স্ত্রীর একটা 'তু' ডাক পেয়ে ছুটে গিয়ে তার বিপদে বুক দিয়ে পড়তে গেল।

বিপদ কি, না তা'র সেই পাপের সঙ্গীর মৃত্যু! কৃষ্ণ তো তখন তীব্র ব্যঙ্গের হাসি হেসে আঙুল তুলে বলতে পারতো, 'ঠিক হয়েছে! বোঝো—পাপের ফল।'

পারতো, অথচ কৃষ্ণ তা' করলো না।

কৃষ্ণ সবরে তার সেই পরম শত্রুর শেষকৃত্য করলো, কৃষ্ণ তার কুলত্যাগিনী স্ত্রীকে 'মরতে পড়া' মেরে রেখে করলো, আর তার একটা অবৈধ সন্তানের দায়িত্ব ঘাড়ে করলো।

কৃষ্ণ নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে, কিসের লোভে এসব তুই করেছিলি হতভাগা? কিসের প্রত্যাশায়? কিছু না। তবে? নিশ্চয় ওই মেয়েমানুষটার গুণ-সুখের ফল। নইলে ওই তুচ্ছ একটা মেয়েমানুষকে এত ভয়ই বা কেন তার? তাই কিছুতেই সাহস সংগ্রহ করে একবার ঘরে ঢুকে পড়তে পারে না? বলতে পারে না, দেখি সত্যিই তুমি সেই উমা কিনা!

আশ্চর্য, আজ পর্যন্ত ওর মুখ দেখল না কৃষ্ণ, অথচ মাসে মাসে হাসোহারা দিয়ে যাচ্ছে। আর সেও সিঁথি অম্লান বদনে নিয়ে চলেছে।

ভাল মেয়ে হলে নিন্দা হতো না?

সেই, সেই কথাই ভাবা উচিত ছিল কৃষ্ণর। আর ঠাট্টা করা উচিত ছিল, মুখ দেখাতে লজ্জা তোমার, অথচ মুখে হাত তোলার খরচটি নিতে তো লজ্জা নেই।

কিছু বলতে পারেনি কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ শুধু গলার মত গিয়েছে, আর টাকাটি দিয়ে চলে এসেছে। যেন তিনি নিলেই কৃতার্থ!

যত ভাবে ততই যেন নিজেকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে কৃষ্ণর।

'চৈতন্য হবার' যে এত যন্ত্রণা, তা' জানতো না কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ ওই লিলিকে দিয়ে যাবে, ব্যস!

ভাবনার সেই ছেঁড়ে কৃষ্ণকে গাড়ী বদল করতে হয়। এরপর আবার দু'বার বাস বদল করতে হবে কৃষ্ণকে।

আসর থেকে ফিরে আসতেই কৃষ্ণ তো লিলিকে প্রায় কোলে করে নেচেছিল। দলের সবাই অভিনন্দন জানিয়েছিল।···এমন কি নাক উঁচু বকুলও হঠাৎ ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেছিল, 'তোর উন্নতি হবে।'

শুধু বাসমতী আর নববালা মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল, 'ওসব মেডেল হচ্ছে রূপের, আর হাততালি হচ্ছে বয়েসের।'

কিন্তু সে তো বলেছিল আড়ালে।

লিলি যেন আহ্লাদে গর্বে, বিস্ময়ে বৈকল্যে কেমন ধারা হয়ে গিয়েছিল।

এ যেন লিলি স্বপ্ন দেখছে।

লিলির মধ্যে এত ক্ষমতা ছিল? লিলির মধ্যে এমন আশ্চর্য শক্তি! ভাগ্যিস চারুদা ওর হয়েছিল।

অভিভূত ভাবটা কাটলে লিলি হঠাৎ অন্য দিক দিয়ে ভাবতে শুরু করলো। আর তখন লিলির মনে হলো ওই, অধিকারী তার পরম শত্রু! কাউকে বুঝতে দিচ্ছিল না। এমন কি লিলিকেও না। ছেলেবেলায় ধুতি পরিয়ে পরিয়ে বেটা ছেলে সাজাতো, বড় হয়ে অবধি আর সাজতেই দেয় না। শুধু খুকী সাজিয়ে রেখে দেয়।

আবার বিয়ের জন্য ব্যস্ত!

তার মানে লিলির এই নতুন গুণটাকে ফুটতে না দেবার ইচ্ছে। তবে? শত্রু ছাড়া আর কি? নেহাৎ চারুহাসিনী জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে, তাই বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে!

তাও সেই একদিনের জন্যেই।

আগে থেকেই গাওনা হচ্ছে—'একটা দিন করে দে, ভয় খাসনে। ভয় কি?'

মুখের সামনে হাত-আয়না ধরে অনেকক্ষণ নিজের মুখটা দেখলো লিলি।

তারপর পনেরো বছরের লিলি ভাবলো, এত রূপ গুণ থাকতে, আমি কেন বেচারীর মত পড়ে থাকবো? প্রোপ্রাইটার রেখেছে যেন ধন্য করে রেখেছে। দয়ার কি ধার ধারি?

এই তো নিজ গুণেই তো বাজার মাৎ করে ফেললাম। ওই লেখক মুখপোড়া তো দু'চক্ষের বিষ দেখে আমায় কিন্তু যেই আমার নাম-যশ হয়েছে, অমনি সেধে সেধে গায়ে পড়তে এসেছে।

হাসিতে পেট দুলে উঠল।

আসবে।

সবাই আসবে।

ভাল ভাল পার্টি লুফে নিতে চাইবে।

সেখানে কত মান কত যশ, কত টাকা! এই তো চারু হাসিনীর কত মাইনে। লিলির আরো বেশী হবে, কারণ লিলির রূপ আছে।

কিন্তু এই স্বার্থপর কুঞ্জ দাসের কাছে পড়ে থাকলে? একটি পয়সাও না।

এইতো আগে কত পার্ট করেছে। হোক সে ছেলের পার্ট, হোক সে একটুখানি, তবু পার্ট তো?

কই তার বদলে দিয়েছে একটা পয়সাও লিলিকে? দেবে কেন? লিলি যে তার কেনা!

কেন? তিন বছরের একটা মেয়েকে পুষে তার মাথাটা জন্মের মত কিনে নিয়েছেন! স্বার্থপর বেহায়া। কুটিল!

লিলি আর এই স্বার্থপরতা সহ্য করতে পারবে না। লিলি পথ দেখবে।

লিলি সেই পথ দেখার চেষ্টায় নিমাইকে ধরে পড়ে। বলে, 'নিমাইদা কলকাতায় রাজবাড়িতে আর দরকার নেই, চল ভেসে পড়ি এই বেলা।'

নিমাই পাকা-চোকা ছেলে।

নিমাই ওর হাত ধরে বলে, 'কী সাজই সেজেছিলি, বাস্তবিক মনে হচ্ছিল পরী।'

বাচ্চা লিলি চোখমুখ ঘুরিয়ে বলে, 'আহা সাজতো কত! পাগলিনী!'

'ওতেই তো আমার মুখু লোকটাকে পাগল করে দিয়েছিলি বাবা! যে করে গিলছিল সবাই, মনে হচ্ছিল আমার জন্যে আর কিছু রাখবে না।'

'ভাগ ছোটলোক।'

লিলি বাসন্তীদের মত ভঙ্গী করে।

তারপর ওরা বিচার করে সিদ্ধান্ত করে, এত গুণ নিয়ে এখানে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না।

এখানে প্রাণপাত করেও বড়জোর দু'খানা মেডেল, আর দুটো তোয়াজী কথা! তার বেশী নয়।

তাছাড়া—'ভবানী অপেরা'র পালায় বহুরে তো শুধু ওই, পাগলিনী সাজ!···'লাভ' নেই রস নেই সাজাগোজা নেই। অথচ অন্য অন্য পার্টিতে?

রাণী সাজো, মহারাণী সাজো।

\বাবার আদরের রাণী মহারাণী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না লিলি।

অতএব নিমাই আর লিলি নিজেরাই একটা দল খুলবে। ব্রহ্মটাকেও তাড়িয়ে দিয়ে যাওয়া যাবে, লোকটা অধিকারীকে মোটেই দেখতে পারে না।

বলা যায় না জগাও যেতে পারে।

অধিকারী বলবে অকৃতজ্ঞ?

বললে তো বড় বয়েই গেল।

নিজে যে স্বার্থপর?

বিবেক মুক্ত হলো লিলি। নিমাই তো হয়েই ছিল।

কলকাতায় 'কম্পিটিশান' পর্যন্ত আর দৈর্ঘ ধরছে না তাদের। তাছাড়া—লিলি বায়না ধরেছে আগে বিয়েটা সারা হয়ে যাক, তারপর।

প্রথমটা অবশ্য নিমাই বলেছিল, 'বিয়ে করলে তো বৌ হয়ে গেলি। ঘরের বৌকে কি আমি আসরে নাচাবো?'

লিলি রেগে উঠে বলেছিল, 'তবে বিয়েটা কার সঙ্গে হবে শুনি? না কি হবেই না? তবে আমি তোমার সঙ্গে যাবই না।'

অতএব বিয়ে।

কালী ঘাটে গিয়ে সিঁদুর নেওয়া।

ব্রহ্ম জানে; ব্রহ্ম সব সাহায্য করবে।

রাত্তিরে আর ফেরা সম্ভব হল না।

রাতটা হাওড়া স্টেশনে খেয়ে আর শুয়ে সকালের গাড়ীটা ধরলো কৃষ্ণ মেদিনীপুরের। পাঁশকুড়ো থেকে বাসে তমলুক, তমলুক থেকে মহিষাদল।

রাত্রে খেয়ে আর শুয়ে হঠাৎ আশ্চর্য ভাবে চিন্তার ধারাটা ঘুরে গেল কৃষ্ণর।

সমস্ত রাগ ঘৃণা বিতৃষ্ণা হাপসা হয়ে গিয়ে ভয়ানক একটা লজ্জায় যেন ডুবে পড়লো কৃষ্ণ।

কী করে এসেছে সে!

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে এসেছে!

ভুল মানুষেরই হয়, ওরও হয়েছিল; কিন্তু সেই ভুলের মোহাংও দিতে হয়েছে কম নয়।

কুলত্যাগ করে চলে গিয়েও, বিপদে পড়ে যে তার স্বামীকে মনে পড়েছিল, এতে কি বোঝায়? অথচ আজ কৃষ্ণ সেই বিষম প্রাণটাকে পায়ে মাড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়ে এল।

কৃষ্ণ টাকার থোঁটা দিল।

ছি ছি। এত নীচ কি করে হল কৃষ্ণ!

যদি এই ধিক্কারে 'ও টাকায় খেয়ে আর বেঁচে থাকার নেই' ভেবে আত্মঘাতী হয় উমা?

হতে পারে।

চিরকালের অভিমানিনী। মরবেই হয়তো। তাহলে বলতেই হবে কৃষ্ণ লোকটা খুনী! একটা মানুষের মৃত্যুর কারণ মানেই খুনী!

এখন কৃষ্ণ যত ভাবতে থাকে, তার নিজের দিকের পাল্লাটা অপরাধের ভারে ঝুঁকি হয়ে পড়ে।

মনের অগোচর পাপ নেই, লিলির সেদিনের সাফল্যে কৃষ্ণ পূর্বের সমস্ত সংকল্প বিসর্জন দিয়ে ভাবেনি কি, বরাবরের মত নায়িকার অভাব মিটলো কৃষ্ণর। আর চাক ঢোকর তোয়াজ করতে হবে না।···তার মানেই উমা যা বলেছে তাই।

ওকে সময়ে বিয়ে দিয়ে সংসারী করার ইচ্ছেটা আমারে ছল। যেই স্বার্থর গন্ধ পেয়েছি সেই ছল উড়ে গেছে।

হঠাৎ একটা অমন সাহসিক প্রতিজ্ঞা করে বসে কৃষ্ণলাল।

হ্যাঁ দু'একদিন পরেই লিলিকে নিয়ে তার মার কাছে যাবে কৃষ্ণ, কিন্তু একা লিলিকে নিয়ে নয়, 'জোড়ে' নিয়ে। প্রেমিয়ে দেবে উমাকে সবটাই তার ভুল ছিল না।

বন্ধনের কাছে হাত জোড় করে বলবে, 'এই বিয়েটা না হলে একটা লোক আত্মঘাতী হবে। এ তোমাকে করতেই হবে।'

কৃষ্ণ যখন পৌঁছলো, তখন কালের সূর্য মধ্যাহ্ন আকাশে।

কৃষ্ণ বসে পড়ে বললো, 'এক গ্লাস জল।'

ঙ্ক ভিন বাসন্তী।

দু'চক্ষে যাকে দেখতে পারে না কৃষ্ণ।

কথাটা তন্ময়ি চেঁ-চেঁ করে গেয়ে না নিয়ে ভুরু কুঁচকে বললো, 'দিদি কোথায়?'

বাসন্তী খনখনে গলায় বলে উঠলো, 'সেই সকালে উঠে কোথায় কি কালীঠাকুর আছে, সেখানে না কি নরবলি হতো, তাই দেখতে গেছে।'

কৃষ্ণ ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'একলা?'

'একলা কেন!' বাসন্তী আরো খনখনায়, 'সেখানের বন্ধু মিনাইলা গেছেন সঙ্গে—'

'থামো চুপ করো।'

কৃষ্ণ ওর বিরক্ত চিত্তের ভাবটা একটা প্রচণ্ড ধমকের মধ্যে দিয়ে কিছুটা লাঘব করে নিয়ে বলে, 'এলে আগে আমার কাছে আসতে বলবে।'

তারপর কৃষ্ণ ও বাড়ি চলে যায়।

যে বাড়িতে বরুণ আছে।

যারা 'ভবানী অপেরা'কে এনেছিল তারা মেয়াদ নিয়ে গেছে, তবে পাশের পাড়ায় আর একটা বায়না জুটেছে বলে, কৃষ্ণর দলকে এরা থাকতে দিয়েছে।' কিছু লোককে কাছারি বাড়িতে কিছু লোককে বসত বাড়ির বৈঠকখানোয়।

সেই কাছারি বাড়ির দোতলাতে বরুণের স্থিতি।

কৃষ্ণ সেখানে গিয়ে বসে।

বরুণ হাতের কাজ রেখে বলে, 'মিষ্টার পাল এসে গেছেন? কতক্ষণ? খানটান হয়নি এখনো?'

কৃষ্ণ অপ্রতিভভাবে বলে, 'নাঃ! সকলকে জানি। দুটো কথা শোনার সময় হবে তোমার বরুণ?'

'বরুণ একটু চমকায়।

কৃষ্ণ কখনো 'বরুণ' বলে ডাকে না।

তবু বরুণ সে প্রশ্ন তুললো না। শুধু বললো, 'কী আশ্চর্য সময়ের অভাব কি? বলুন!'

'বরুণ', কৃষ্ণ আবেগের গলায় বলে, 'আমার ওই মেয়েটাকে তোমায় নিতে হবে বরুণ।'

এবার বরুণ চমকায়।

আর প্রায় রুক্ষ গলায় বলে ওঠে, 'কী বলছেন?'

'হ্যাঁ জানি তুমি চমকে উঠবে', কৃষ্ণ ওর হাতটা চেপে ধরে বলে, 'তবু তোমাকে এটি করতেই হবে। নচেৎ একটা মানুষ আত্মঘাতী হবে।'

বরুণ অবাক দৃষ্টিতে তাকায়।

লোকটা কি অসময়ে নেশা-টেশা করে এল নাকি। আস্তে বলে, 'আমি আপনার কথার মানে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

কৃষ্ণ ক্লেদের গলায় বলে, 'মানে পরে বুঝো, তুমি আগে কথা দাও।'

'তাই কখনো সম্ভব মিষ্টার পাল, আপনিই বলুন?'

'কিন্তু অসম্ভবই বা কিসে বরুণ? লিলি দেখতে বলতে গেলে একখানা সুন্দরী, আর পরে নাও আমার নিজেরই নেয়ে। কাজে কাজেই আমার সবস্বই তব, মানে তোমার হবে। জীবনে আর কোনো চিন্তা থাকবে না তোমার,

শুধু নিজ মনে লিখবে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে।'

বরুণ হেসে ফেলে বলে, 'সুখে থাকবো কি না জানি না, তবে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবো তা' ঠিক। এখন যেমন রয়েছি। চাকরীর বাজারে না খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, আপনি—আপনার সেই দয়ার ঋণ শোধ দেবার নয় বলেই তুলি না। কিন্তু একটা কথা জিগ্যেস করি, আপনার সর্বস্ব পণ দিয়ে সুন্দরী মেয়েটিকে হাতে তুলে দেবার মত এমন কি দামী পাত্র আমি?'

'দামী! দামী!' কোহিনূর হীরে। 'কৃষ্ণ আত্মিপ্রসাদ দেখায়, 'চিনেছি বলেই বলছি। মেয়েটাকে বড্ড ভালবাসি বলেই বলছি বরুণ, তা ছাড়া ও একেবারে গচ্ছিত ধন, ওর যদি ভাল ব্যবস্থা না করি, ধর্মের কাছে পতিত হতে হবে আমায়।'

'কিন্তু আমি যদি বলি—' বরুণ নুয়ে গলায় বলে, 'আমার মত একটা রাস্তার লোক, যার জাত ধর্মের ঠিক আছে কি নেই, তার হাতে তুলে দেওয়াটাও আপনার এমন কিছু ধর্ম হবে না।'

'সে আমার ভাবনা।'

কৃষ্ণ আস্তে গলায় বলে, 'জাতের পরিচয় কি তার গায়ে লেখা থাকে লেখক? থাকে তার আচরণে। ওই সনা; ব্যাটা তো বামুন। ভট্টচায্যি বামুনের ছেলে। ওর আচরণটা ভাবো? মনে হয় চাঁড়াল। আর এই আমি? কায়েতের ঘরের ছেলে, কী আচরণ আমার?··· ও সব জাত-ফাত ছেড়ে দাও।'

'তা' না হয় ছেড়ে দিলাম—'

বরুণ কঠিন গলায় বলে, 'কিন্তু জন্ম? সেটা ছাড়তেও আপত্তি নেই আপনার আমি ভাল পালা লিখতে পারি বলে?'

কৃষ্ণ এতক্ষণ ওর হাতটা ধরে রেখেছিল, এবার আস্তে ছেড়ে দেয়।

কৃষ্ণর মুখে একটা রাপসা রহস্যের হাসি ফুটে ওঠে। কৃষ্ণর কপালে শুকিয়ে ওঠা ঘামের চিহ্নগুলো আবার ফুটে ওঠে। কৃষ্ণ কোঁচার খুঁট তুলে মুছতে মুছতে বলে—'তবে —তোমাকে একটা কাহিনী শোনাই, লেখক, শোনো। হয়তো তোমার একটা নাটকের প্লট হয়ে যাবে।'

বরুণ বাধা দিয়ে বলে, 'কিন্তু তারও আগে আপনার স্নান আহার করে নিলে হতো না?'

'নাঃ ওসব আপদ বালাই এখন থাক বরুণ, আমার মনের মধ্যে এখন সমুদ্দুর উথলোচ্ছে। এই গল্পটা আগে শোনাই তোমাকে, তারপর বুঝতে পারবে কেন তোমায় অকস্মাৎ অমন কথাটা বলে ফেললাম!'

বরুণ খাতা-পত্র সরিয়ে রেখে বলে, 'বলুন!'

কৃষ্ণ তার চেহারার সঙ্গে বেমানান আবেগের গলায় বলে, 'দেশটার নাম করবো না, শুধু বলি এক দেশে একটা বাঁদরের গলায় একটা মুক্তোর মালা ছিল। মালাটা জুটেছিল বাঁদরটার ঘরে কিছু পয়সা ছিল বলে। তা' হতভাগা বাঁদর বৈ তো নয়? সে ওই রাজার গলার উপযুক্ত মুক্তোর মালার মর্ম বুঝতো না, তাকে ঘরে ফেলে রেখে পাড়ার এক সঙ্গের খিয়েটারের দল খুলে সেখানেই রাতদিন পড়ে থাকতো। কখনো সৌক কাঁসিয়ে মেয়ে সাজতো, কখনো কখনো সৌক লাগিয়ে চাকাত সাজতো।

ঘরে ভাত ছিল, তাই পেটের ধান্দা ছিল না।

কিন্তু ওদিকে সরলা-বোলা ঘরে মুক্তোর মালা পড়ে, চোরের দৃষ্টি পড়বে সেটা আশ্চর্যির নয়। বল লেখক আশ্চর্যি?'

বরুণ বাধা নাড়ে।

হঠাৎ কৃষ্ণ সন্দিগ্ধ গলায় বলে, 'গল্পটা ধরতে পারছো তো লেখক?'

বরুণ ওর দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে বলে, 'পারছি।'

'হ্যাঁ কি বলছিলাম? সেই চোরের দৃষ্টি না? তা সেই চোরের দৃষ্টি পড়ার পর যা হয় তাই হল। মুক্তোর মালা হাওয়া হয়ে গেল।···বুঝলে নাট্যকার? বাঁদরটা ঘরে এসে দেখে ঘর খালি। তখন···বুঝলে তখন সেই শূন্য ঘর দেখে বাঁদরটা টের পেলো তার কী ছিল! তখন মন বুঝলো। কিন্তু তখন আর উপায় কি? হতভাগাটা তখন—'

কৃষ্ণর গলাটা বসে আসে।

আর সেই বসা গলায় সে এক হতভাগা বাউণ্ডুলের

কাহিনী বলে চলে, যা পাশাকার বরুণের বুঝতে অসুবিধে হয় না।

অসুবিধে হয় না, সে শুধু বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে শুনে চলে একটা অবোধ প্রেম-কাহিনী।

যে প্রেমিক জানে না সে ভালবাসছে।

যে শুধু ভেবে এসেছে না করলে চলবে কেন, মানুষ বৈ তো জানোয়ার নয় যে!

আশ্চর্য অধিকারী কুণ্ড দাস, রংচটা ছড়ভাবী নিতান্ত গ্রাম্য চেহারার এই লোকটা, সে এমন কবিত্বের ভাষা পেল কোথায়?

জীবনভোর যাত্রা গান করে আর দেখে? না কি এই ঘর ছাড়া বরুণটা তার এই উন্নতি সাধন করেছে?

ভাবের সন্ধান দিয়েছে, তাই ভাষা এসেছে তার পিছু পিছু!

সেই ভাষা আসছে কুণ্ড অধিকারীর জিভে, 'চোরটা আবার আর এক বাঁদর। বুঝি বাঁদরও নয় ভালুক। তাই মুক্তোর মালাটা নিয়ে গলায় না পরে তাকে ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে মাড়িয়ে নিজে মরলো। তারপর—'

বেলা বেড়ে উঠেছে। ও বাড়ি থেকে বিপিন ব্রজ সনাতন অনেকে এই কাছারী বাড়িতে এসে উঁকি দিয়ে গেছে, দু' দু'বার ডাকের পর ডাকের মুখের ওপর ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে কুণ্ড!

বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'তোমার চান আহার হয়েছে তো?'

বরুণ মৃদু হেসেছে।

কুণ্ড সেই হাসিটার অর্থ খুঁজতে বসেনি। কুণ্ড তার কাহিনীর হারিয়ে যাওয়া সূত্র খুঁজতে অতীত হাতড়েছে।···

বন্ধ দরজার মধ্যে সেই মৃদু কণ্ঠের কথন, বরুণের চোখে খুলে দিয়েছে একটা বন্ধ দরজার কপাট।

সেই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বরুণ আস্তে বলেছে, 'সেই মেয়ে! আপনি তাকে? আশ্চর্য!'

কুণ্ড ম্লান হেসে বলে, 'তাবলে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু আরো তলিয়ে ভেবে দেখলে জগতে কিছুই আশ্চর্য নেই লেখক। সবইতো মনের ওপর নির্ভর। সেই মনটা দিয়ে তোমাকে আমি পরম বন্ধু ভাবাতে পারি, পরম শত্রু ভাবাতে পারি। সেদিন সেই অকস্মাৎ গিয়ে পড়ে আমাদের গ্রামের সেরা বড়লোক কমল মুখুয্যের ছেলে অমল মুখুয্যের মড়াটাকে একটা বস্তির উঠোনে বাঁশের খাটিয়ায় পড়ে থাকতে দেখলাম, হঠাৎ যেন চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা খুলে গেল। দেখলাম জগৎ সংসারের এই লীলাটার যেন কোনো মানেই নেই। যেন একটা হাসির ঘটনা। তোমরা যেমন হাসির নাটক লেখো, বিধাতা পুরুষ তেমনি একখানা বড়সড় হাসির নাটক লিখে রেখেছে। পার্টগুলো প্লে করছি আমরা।···মরে গেলাম ফুরিয়ে গেল বাস।···ওই মেয়েটাকে যদি আমার শত্রুর মেয়ে না ভেবে আমারই মেয়ে ভাবি? হলটা কি? কিছু না। অনেক ল্যাঠা মিটে গেল বরং! আর উমা? তাকে তো মরবে বলেই দিয়ে এসেছিলাম। যখন দেখলাম ফিরে এল, তখন আহ্লাদে দিশেহারা হয়ে—!'

কুণ্ড চুপ করে একটু।

বরুণ সেই অবসরে মৃদু হেসে বলে, 'দিশেহারা হয়ে ভাবলেন ছড়ানো মুক্তোগুলো দিয়ে আবার মালা গাঁথি?'

কুণ্ড ওর দিকে তাকায়।

আস্তে বলে, 'তা' ঠিক নয় লেখক। অতটা আশা করিনি, শুধু ভেবেছিলাম—না। কিছুই বোধহয় ভাবিনি। শুধু একটা নেশার অভ্যেসের মত করে চলেছিলাম। তা' কাল তো ভালই করে এলাম। এখন শুধু ভাবছি তার কাছে মুখ দেখাবার একমাত্র পথ হচ্ছে—'

আসেই কথা হয়ে গেছে। তাই খেয়ে যায় কুণ্ড!

তারপর বলে, 'জানিনা সে সময় মিলবে কি না। হয়তো আগুঘাতীই হয়ে বসবে—!'

বরুণ মাথা নেড়ে বলে, 'না! তা মনে হয় না। যে রকম শুনলাম, সে ধাতুর মেয়ে নয় বলেই মনে হয়।'

'তা' হয়তো তাই। তবে টাকা আর নেবে কি না সন্দেহ। টাকার থোটাটা মোক্ষম দিয়ে এসেছি কি না।'

'তাও বলা যায় না হয়তো নেবেন।'

কুণ্ড ব্যগ্রভাবে বলে, 'নেবে? তুমি কি করে জানছো বলতো?'

'এমনি, অনুমান! আপনার প্রকৃতি ওর জানা। যেমন আমরা একটা বই পড়ে তার সবটা বুঝে ফেলি, প্রায় তেমনি। উনি জানেন আপনার মুখের কথা যাই হোক, ভেতরের ভাবটা কি।'

কুণ্ড গম্ভীর গলায় বলে, 'এবার বুঝতে পারছো বরুণ কেন তোমায় স্বপাত্র বলে ভাবছি? পাদা দেখো বলে নয়। 'মানুষ' বলে। চোখ কান আন্দাজ অনুভবও না আর একটা মানুষ বলে। আমার অনুরোধ রাখবে না বরুণ?'

বরুণ মাথা নীচু করে বলে, 'দেখুন জীবনের ছক্ কেটে-ছিলাম অন্য রকম, সে ছক্ হচ্ছে কোনোখানে স্থিতু হবো না স্নেহের বন্ধনে বাঁধা পড়বো না, ভেসে ভেসে বেড়াবো। কিন্তু অজান্তে কখন যে আপনার কাছে বাঁধা পড়ে বসে আছি। সেবড় পিছিয়ে গেছে, টেরই পাইনি। এখন হঠাৎ টের পাচ্ছি। কিন্তু লিলি তো আপনার সত্যি মেয়ে নয়! তার মধ্যে অন্য প্রকৃতি, অন্য স্বভাব।'

কুণ্ড বোঝে।

বোঝে বরুণের বাধাটা কোথায়।

কিন্তু কুণ্ড তার সেই একান্ত স্নেহপাত্রীটিকে বোঝেনা। তাই কুণ্ড সান্ত্বনার গলায় বলে, 'তা আমি স্বীকার করছি বরুণ, মেয়েটা ছেলেমানুষ বড়ভাবের। বয়েস পেরায় পনেরো ষোলো হলো, তবু জ্ঞান বুদ্ধি হয়নি। তবে হবে। আমি বলছি হবে। ভেতরে রস মাত্র না থাকলে দুটো দিনের রিহার্সালে অমন 'প্লে'খানা করতে পারতো না। তোমার লেখা ভাষার মানে বুঝেছে ও, বলছি আমি তোমায়। মানে না বুঝলে—'

বরুণ আস্তে বলে, 'তা বটে!'

'তবে? তবেই বোঝো?' কুণ্ড আবার সাগ্রহে ওর হাত চেপে ধরে বলে, খুকী সেজে বেড়ায়, তাই খুকীপণা করে। আর সর্বদার সঙ্গী তো ওই অকাল কুষ্মাণ্ডগুলো? তোমার হাতে পড়লে দেখো? ভোল বদলে যাবে। মাতৃত্ব বলেও তো জিনিস আছে লেখক?'

বরুণ চুপ করে থাকে।

কুণ্ড বলে, 'তাহলে কথা দিলে?'

'দিলাম।'

কুণ্ডর এতক্ষণের উত্তেজনা সহসা স্থির হয়ে যায়। কুণ্ড জামার হাতাটা চোখে ঘসে ঘসে চোখের জল মোছে।

তারপর কুণ্ড মনে মনে ছক্ কেটে ফেলে। 'ধাড়া-বাড়ির' বায়না হচ্ছে সামনের পূর্ণিমায়, হাতে এখনো চার পাঁচটা দিন। এর মধ্যেই শুভ কাজটা সেরে ফেলে উমার কাছে নিয়ে যেতে হবে। আর এই বরুণকে দিয়ে হাত জোড় করিয়ে আর একটা 'শো'র জন্যে অনুমতি চাইয়ে নিতে হবে। বায়না করেছে, অগ্রিম টাকা দিয়েছে, দশদিন ধরে এতগুলো লোককে পুষছে, না করলে মহা অধর্ম।.....

তাছাড়া বড়লোকের মেয়াজ, হয়তো লিলির বদলে চারুকে দেখলে পুলিশকেস্ করতে আসবে।

জামাই গিয়ে ধরলে 'না' করতে পারবে না।

ভেঙেপড়া কুণ্ড একটা মানুষের আশ্বাসবাক্যে আবার যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। অবোধ হৃদয়টা নিয়ে স্বপ্ন দেখতে বসে, জামাই দেখে বিগলিত হয়েছে উমা, পুরনো ক্ষোভ বিসর্জন দিয়েছে। মুখ দেখাতেই হাসছে, কথা কইছে, তাদের খাওয়াচ্ছে, মাখাচ্ছে, আর.....হঠাৎ আহ্লাদ করে বলে উঠেছে.....'জামাইয়ের লেখা 'পালা' মেয়ের এ্যাক্টো, তবে চল দেখেই আসা যাক।'

কিন্তু কি জানি, কেমন দেখতে হয়েছে এখন সেই মুখ! এই দীর্ঘদিনে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে আসতে অবগুণ্ঠনে ঢাকা-মানুষটার শুধু হাতের একটুখানি দেখেছে কুণ্ড। মুখ দেখেনি। জানেনা বয়সের ছাপ কতটা পড়ছে তাতে।.....

লিলি হকচকিয়ে যাবে।

ভাববে 'মা আছে আমার, জন্মে জানতাম না সেকথা হঠাৎ এই পরীর মত মা।'

হঠাৎ 'পরী' শব্দটাই মনে আসে কুণ্ডর, 'দেবী' নয়। অথচ সেটাই এলে ভাল হতো।

হয়তো কুণ্ডর এই বিশ্লেষণটা পূর্ব স্মৃতির উপর নির্ভরশীল।

কুঞ্জ তাই ভাবে ওই পরীর মত মা দেখে আহ্লাদে মূর্চ্ছা যাবে বুঝি।.....

আর কুঞ্জ এসেছে মূর্চ্ছাহত হয় আলকোজ্জ্বল আসরে সামনে এসে বসেছে নায়িকার মা। তার গৌরব কত।

কিন্তু ওর বেশ-ভূষাটা কেমন?

সধবার মত তো? না কি বিধবার মত? অমল বুঝি মরেছে বলে কি লোক দেখিয়ে বিধবা সাজতে হয়েছিল বামুন বৌকে, সর্বাঙ্গে চাদরমুড়ি দিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল, এসেছিল, রেলগাড়ীতে ট্যাক্সীতে সবই একরকম। কেজানে সিঁদুর পরে কিনা, শাঁখা পরে কিনা।

আচ্ছা যদি ওই অমলটার কথা ভুলে ফেলে থাকে ও, যদি নিজের পুরনো জীবনেরই সাথেই অচল থাকে?

তা'হলে তো আবার লিলির মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই লিলির বাপকেও ডেকে আনতে হয়। কুঞ্জ কি তবে এবার সেই পোষ্টটা পাকাপাকি দখল করবে?

তা' করতে তো হবেই।

কন্যা সম্প্রদান করতে হবে না?

কিন্তু বিয়েটা এত তাড়াতাড়ি কোথায়—

কুঞ্জর চিন্তায় বাধা পড়লো।

কারণ কুঞ্জর এই বন্ধ দরজায় জোরে জোরে ঘা পড়লো। নিশ্চয় খেতে ডাকছে।

কুঞ্জ এতক্ষণে অনুভব করে খিদের পেটটা জ্বালা করছে।

কুঞ্জ তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দেয়।

কিন্তু কুঞ্জকে কি ওরা খেতেই ডাকতে এসেছিল? অনেক বেলা হয়ে গেছে বলে বিচলিত হয়ে ওর বন্ধুনিয় ভয় ত্যাগ করে?

পাগল?

এত ভাল কে বাসছে কুঞ্জকে?

ব্রজ? বিপিন? নবদ্বীপ?

ওরা দরজায় ধাক্কা দিয়ে কুঞ্জকে উপহার দিতে এসেছে একমুঠো জ্বলন্ত আগুন।

যে আগুনে কুঞ্জর ওই নিরাবরণটি পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

সেই আগুনটা একটা খবর।

কিন্তু আগুনতো খবরেরই হয়।

ওরা বলতে এসেছে বহুক্ষণ অপেক্ষা করে করে এবার অধিকারীকে না জানিয়ে পারছে না, লিলি নিমাই আর সনাতন সেই ভোর সকালে বাঁশী মন্দির দেখতে যাবো বলে বেরিয়েছে, এখনও দেখা নেই। এরা অধীর হয়ে ঘর বার করতে করতে, হঠাৎ সন্দেহের বশে ওদের ঘর দেখতে গিয়েছিল, দেখেছে তিনজনেরই জামা কাপড় জিনিস পত্র, সুটকেস গামছা, আর্শি চিরুণী সব নিশ্চিহ্ন।

তার মানে পালিয়েছে।

অথচ আশ্চর্য, কেউ এটা স্বপ্নেও সন্দেহ করেনি। আরও আশ্চর্য, জিনিস পত্রগুলো পাচার করলো কি করে? নিশ্চয় রাতারাতি কোথাও সরিয়ে রেখেছিল।

কুঞ্জ যদি শুধু শুনতো ওরা সেই ভোরবেলা কোথায় না কোথায় গিয়ে এখনো ফেরেনি, তাহলে কুঞ্জ পাগল হয়ে ছুটোছুটি করতো, কিন্তু এরা শুধু সেই খবরটাই দেয়নি, এই জিনিস পত্রের খবরও দিয়েছে।

কুঞ্জ তাই পাথরের মুখচোখ নিয়ে বসে আছে।

কিন্তু যে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে, সেই শুধু পাথর হয়ে যেতে পারে? আর অন্তরাবাসের অন্তরালে যে মানুষটা নিজেকে আরো আড়াল করে রেখে দেয় দেওয়ালের আড়ালে, অবগুণ্ঠনের আড়ালে? সে?

না কি নতুন করে পাথর হবার আর অবকাশ নেই তার? পাথর দিয়েই বুক বাঁধা তার? না হলে অতবড় অপমানের পরও তো ছুটে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিলনা সে? এমন কি মাথাও ঠুকলনা, কেঁদেও ভাসাল না।

সে শুধু বেড়ার ঝাঁপটা বন্ধ হবার শব্দ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠোনে নেমে পড়ে ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো।

দেখলো বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝিরিয়ে তবু ছাতাটা হাতে নিয়েই চলেছে লোকটা। দেখতে পেল চলেছে, তারপর

একটা ডাঙাবাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর আবার অনেকদূরে দেখা গেল।

ক্রতবৃদ্ধভঙ্গী!

যে ভঙ্গী বহুকাল দেখেনি উমাশশী!

ইদানীং যে ভঙ্গীটা দেখতে পায় এই গাছের আড়াল থেকে, সে ভঙ্গী শিথিল অনিচ্ছা ময়র। যায় যায় আর ফিরে ফিরে তাকায়। উমাশশীকে তাই আত্মগোপন করে থাকতে হয়।

আজ আর হলনা আত্মগোপন করতে।

আজ লোকটা গটগটিয়ে বেরিয়ে গেল।

অবেধা বরুণ আবারে বলেছিল, 'উনি অন্ত ধাতুর।'

কথাটা ঠিক।

অন্ত ধাতুরই।

নইলে যে লোকটা ওকে অত যাচ্ছেতাই করে গেল তার জন্যেই ওর মনপোড়ে?

লোকটা যে রাগের চোটে ছাতা মাথায় দিতে ভুলে গেছে, আর ঝিরিঝিরি বৃষ্টিটা যেন জোর জোর হয়ে আসছে, এই ভেবেই মন পোড়ানি উমাশশীর। নিজেও যে ভিজছে, সে কথা মনে থাকে না, ডাঙাবাড়ির গুপারটা পর্যন্ত দেখতে থাকে।

আজ এখনো বেলা আছে, আজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অন্য দিন তো অনুমানে দেখা। লোকটা যে টর্চ ধরে ধরে যায়, প্রকৃতপক্ষে সেই আলোটাই দেখা। তবু কোনো কোনো দিন, যেদিন জ্যোৎস্নায় ভরা রাত থাকে, সেদিন উমাশশীর স্মরণীয় দিন।

অথচ ওই লোকটাকেই একদিন পুরনো কাপড়ের মত পরিত্যাগ করে চলে এসেছিল উমাশশী।

উমাশশীকে একদিকে টেনেছিল দুরন্ত প্রলোভন, আর একদিকে ঠেলে দিয়েছিল দুরন্ত অভিমান।

এই দুই টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে উমাশশীর জীবনের বুহুনিটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে জট পাকিয়ে গিয়েছিল।

বৃষ্টিটা জোর হতেই উমাশশীকে ফিরে আসতে হলো।

এসে দাওয়ায় বসে সেই মেডেলগুলো হাতে তুলে নিল উমাশশী। আর অতখানি অপমানেও যা হয়নি, তাই হল হঠাৎ। হঠাৎ প্রবল বর্ষণে ভেসে গেল তার চোখ গাল বুকের কাপড়।

উমাশশীর বিধাতা উমাশশীকে এত নিষ্ঠুর করে কেন গড়েছিল? কী হতো, যদি উমাশশী ওই মেডেলের খবরে আহ্লাদ প্রকাশ করতো! উমাশশীর কোন মুখটা আছে যে সেই তিন বছরের মেয়েটার দাবি ভুলে, এখন তার যাত্রার আসরে নাচার বাক্যোক্তি করলো?

উমাশশীর কি সত্যি মেয়ে বলে টান আছে তার ওপর? উমাশশী কি তাকে দেখলে চিনতে পারবে?

বহুবার তো বলেছিল ওই মহৎ মানুষটা, 'নিয়ে এসে দেখাই, নিয়ে এসে দেখাই' উমাশশীই তো নিষেধ করেছে। নিষেধ করেছে, উমাশশী পাষাণের মত নিষ্ঠুর বলে। 'দেখলে নতুন করে মায়ায় জড়াবো' এটা যে সে ভেবেছিল মনে মনে, ওটা বাজে কথা। 'পাপের ফল' বলে বিতেষ্টা, এটাও বাজে কথা। মনকে চোখ ঠারা? আসলে ভয় ছিল পাছে আবার মেয়েটার দাবির ঘাড়ে পড়ে। পাছে ও বলে বসে, 'মেয়ে তো বড় হচ্ছে, এবার মায়ের কাছে থাকাই ভালো।'

এই, এই ভয়েই উমাশশী নিজি মায়ের সেই তিন বছরের মেয়েটাকে 'মা' থাকতেও 'মা' নাম ভুলিয়ে রেখেছে।

অবৈধ বলে মমতা নেই, এটা কি সত্যি?

নিঃসন্তান নারীচিত্ত, প্রথম যে সন্তানকে কোলে পেল, তার উপর থেকে কি মন সরিয়ে নিতে পারে? তাছাড়া —তখন তো উমাশশী অবল মুখুয্যের আদরে সোহাগে ভাসছে। ফুল নামের একটা ঝুনো-মানুষের জন্যে দু'দণ্ড মন খারাপ করে বসে থাকবারও সময় নেই তার। তখন তাই সন্তানে ও ভগবান।

অথচ সেই সন্তানকে সে দাবির নেবার ভয়ে বিলিয়ে দিয়ে রেখেছে। বিলিয়ে দিয়েছে না হয় একটা মহান লোকের হাতে, কিন্তু তার পরিবেশটা যে মহান নয়, তা'তে উমাশশীর অজানা ছিলনা।

যাত্রার দলে আছে মেয়ে, ছেলে সেজে পার্ট করছে। দরকার হলে সখী সাজছে, এ সব তো জানতোই উমা। যাত্রার অধিকারী নিঃস্বার্থ তাই কোনোদিন বলেনি, 'দিন গুণছি কবে ওটা বড় হবে।'

বললেই বলতে পারতো।

উমাশশীর কিছু বলবার ছিল না।

যাত্রার দলে মানুষ হওয়া মেয়ে নায়েক হয়ে উঠে আসরে নাচবে, এটাইতো স্বাভাবিক। অথচ এই স্বাভাবিক নিয়মটার বিরুদ্ধেই উমা এমন একখানা প্রতিবাদের আস্পর্ধা দেখালো, যা এখন ভেবে মরমে মরে যাচ্ছে সে।

এ আস্পর্ধার কারণ কি!

না। ভাল লোকটা উমার লোকটা একদা ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল 'ওকে আমি বিয়ে দিয়ে ঘর সংসারী করে দেব।'

ঘর সংসার জিনিসটার ওপর কি তবে এত মোহ উমাশশীর যে, সেই আশা ভঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো? একটা তুলসী মন্দিরের মত পবিত্র ঘর সংসার পায়ে ঠেলে দিয়ে চলে এসে কি 'ঘর সংসারের' মূল্য টের পেয়েছে উমাশশী?

দাওয়াতেও আর বসা চললো না। বৃষ্টি প্রবল হচ্ছে।

উমাশশী ঘরে গিয়ে ততক্ষণে আছড়ে পড়ে আর বার বার বলতে থাকে, 'ঠাকুর, মেয়ে জন্ম দিয়ে এত নিষ্ঠুর করে পাঠালে কেন?

ও যদি আর না আসে?

ও যদি সত্যিই মনিঅর্ডারে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বসে থাকে।'

হ্যাঁ টাকাও দেবেই, তা জানে উমাশশী।

উমাশশী কষ্টে পড়তে পারে, এমন কাজ ও করবে না। কষ্ট দেওয়া কাজটা উমাশশীরই একচেটে।

উমাশশীর আর একটা ভয়ানক বর্ষার রাতের কথা মনে পড়ে আজ।···মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল, বাজ চমকাচ্ছিল।···অধিকারী কৃষ্ণদাস খাওয়া দাওয়ার পর বলেছিল, 'যা দেখছি আজ তো আর যাওয়া হবেনা।'

বলে দাওয়ার ভিতর দিকটায় জলচৌকীটার উপর উঠে বসেছিল।

তারপর নিজ মনে বাতাসকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলেছিল, 'দাওয়ায় একখানা তক্তাপোষ টক্তাপোষ পাতিয়ে রাখতে হবে। এ রকম বেঘোরে পড়ে গেলে বসে রাত কাটাতে হবেনা।'

উমাশশী তখন কোনো কথা বলেনি।

তারপর রাত বোধকরি বারোটা বৃষ্টি একটু ধরেছিল, তখন উমাশশী ঘর থেকে বলে উঠেছিল, 'এখন তো বিষ্টি কমেছে, এই বেলা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলে হয়।'

লোকটা অবাক হয়ে গিয়েছিল তা'তে আর সন্দেহ কি! বোধহয় আশা করেনি এমন কথা শুনতে হবে।

তাই বিস্ময়ের গলায় বলে উঠেছিল, 'এখন যাওয়া দেব?'

'তাতে কি?' উমাশশী অভয় দিয়েছিল, 'শুধু এই হাটাটুকু! রাতভোর তো ইস্টিশনেই পড়ে থাকা হয়।'

ঘরের ভিতরকার অভয় বাণী বৃষ্টির ছাট খেয়ে বসে থাকা মানুষটার প্রাণে শীতলবারি নিক্ষেপ করেনি।

সে বলেছিল, 'ওঃ! তা যাচ্ছি। তবে এমন রাতে লোকে বেড়ালটা কুকুরটাকেও দূর দূর করে তাড়ায় না।' বলে উঠে পড়েছিল।

আশ্চর্য উমাশশী এত নিষ্ঠুরতার শিক্ষা কোথায় পেয়েছিল? তাই উমাশশী ছুটে এসে পথ আটকে বলেনি 'আমার ঘাট হয়েছে, বাপ করো।'

উমাশশী সেই ঘর থেকেই বলেছিল, 'বেড়ালটা কুকুরটা হলে তাড়ায় না, মানুষ বলেই উল্টো নিয়ম।'

'মানুষই। বাঘ ভালুক নয়। কামড়ে দেবে না।'

উমাশশী তথাপি টলেনি।

বরং হেসে উঠে বলেছিল, 'বিশ্বাস কি? তাছাড়া পাড়া পড়শী তো বাঘ ভালুকের কাছাকাছি। সকালবেলা ছাতা জুতো দেখলে—'

কুণ্ণ নিরুদ্যম ভঙ্গীতে চড়ে উঠেছিল, 'কেন এ কথা বলা যায় না দেশের লোক খোঁজ নিতে এসেছিল, বৃষ্টিতে আটকা পড়ে গিয়ে—'

উমাশশী আরো হেসে উঠেছিল। হেসে হেসে

বলেছিল, 'জিগ্যেস করলে বলা যায়। জিগ্যেস না করলে? গায়ে পড়ে বলা যায় না তো?'

'ঠিক আছে যাচ্ছি।'

বলে চলে গিয়েছিল অধিকারী কুঞ্জ দাস।

কিন্তু, 'ঠিক আছে যাচ্ছি', ভিন্ন করে আর, 'আচ্ছা চললাম—' অথবা 'আচ্ছা আসি' বলে কুঞ্জ? কুঞ্জর বিদায় নেবার ভঙ্গীটাই তো রাগ-রাগ!

বিদায় যে নিতে হচ্ছে, সেটাই রাগের।

কিন্তু উমাশশী কী করবে?

উমাশশী তো নিজেই নিজের সুখের পথে কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে।

উমাশশী নিজেই নিজের সুখের পথে কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে।

কিন্তু উমাশশীর মেয়ে?

তা' সে নাকি 'বুদ্ধিমান', অন্ততঃ তার পালক পিতা তাই বলতো, তা সে বুদ্ধিমান বলেই বোধ করি সুখের পথ প্রশস্ত করে নিয়েছে।

একটা মাঠকোঠার হোটেলের দোতলার ঘরে লোহার চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে উমাশশীর মেয়ে বলে, 'পোপাইটারের জন্যে একটু মন কেমন করছে বটে, তিন তিনটে মানুষ কেটে পড়ায় অসুবিধেতে ও পড়বে। তবে খুব চালাকি হল একখানা!'

নিমাই বলে, 'সনার যা পার্ট, ও তো রাস্তা থেকে লোক ধরে এনে আসরে ছেড়ে দিলেও হয়। আমারটা ব্রজরাজ দেবে অখন যা হোক করে চালিয়ে, আর তোর? সে বিষয়ে নিশ্চিন্তে থাকিস। তোকে আর আসরে যেতে হতো না। চারুহাসিনীর জন্য ছেড়েছে, ওর জন্যে ধন, মদনমোহনও ছাড়তো ভেবেছিস?···জোর করে ছাড়ালে, ও তোর গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নিতো! তোর ভাগ্যে এই একটি রজনীই।'

উমাশশীর মেয়েকে শাড়ী পরে মোহিনী দেখায়। উমাশশীর মেয়ের এক মুখ খাওয়া পানের রসটা ঠোঁটের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে, আর সে অভ্যাসের এক উমাশশীর মত ঠোঁট উল্টে বলে, 'ইস। তাই বৈকি। দেখো সহস্রেক রজনী হবে! তুমি একবার পোলো দল।'

ওইভাবে ঠোঁট উল্টে বলতো উমাশশী, 'আমার কপালে অমন সুখ আছে? ইস! কেন? দেখো পরে।'

বলতো বুড়ি পিসি শাশুড়ীকে।

যে নাকি বৌয়ের বেচাল দেখে গাল-মন্দ করতে বসতো।

উমাশশীর মেয়ে সেই ভঙ্গীতে বলে, 'ইস তাই বৈকি। তুমি আগে দল খোলো।'

জানাবধি 'দল' দেখে আসছে, আর সেই বিরাট দলবল আর তাদের সাজ সরঞ্জাম, বাক্স বিছানা নিয়ে নিতান্ত অনায়াসে আনাগোনা করতে দেখেছে। 'দল গড়া' যে চারটি খানি কথা নয়, নিমাইয়ের বাবারও যে সে সাধ্য নেই, সে জ্ঞান হয় না লিলির।

লিলি সামান্য আদরে নিজেকে বঞ্চনা করে, আর বলে 'দলটা গড়ে তোলো, জোগাড় যন্তর করো? দেরী কিসের?'

আরও বলে, 'বিয়েটারই বা দেরী কিসের, নিজেরা নিজেরাই তো করে নিতে হবে। জগাদা বলেছিল 'সব ব্যবস্থা করে রেখে।' সে তো বেইমানী করলো, এই না। সনাতনটা শুধু মায়ায় পড়ে এসেছে, তা সে তো বোকার ধাড়ি। কার পিণ্ডোস?'

নিমাই বলে, 'হবে হবে! সুবিধে হোক—'

লিলিবালা ঝঙ্কার দেয় 'হবে হবে? আমি বলে? বিয়ে কোথায় তার ঠিক নেই স্বামীসুখী সেজে বসে আছি, আর যা খুশি করে চলেছ তুমি। এ-সব আমার ভাল লাগছে না।'

কিন্তু ভাল কি নিমাইয়েরই লাগছে? ওই খুশীটা ছাড়া?

প্রোপাইটারের বাক্স থেকে লিলি যে টাকাটা সরিয়ে এনেছিল, সে টাকা তো ফুরিয়ে এল। লিলির গায়ের গহনাগুলো তো গিল্টির, নিজের আঙুলে একটা আংটি পর্যন্ত নেই উপায়টা কি?

লিলিকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল নেহাৎ লোভের বশে। তা' ছাড়া অধিকারীকে জব্দ করবার মনোভাবও একটু ছিল। যা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে নিমাইকে।

তা সেদিন অমনি ঝপ্ করে বলে বসলে, 'দেখলি? দেখলি লিলির গ্রাজ্জো? ওর পায়ের নখের যুগ্যি ক্ষ্যামতাও নেই তোদের। অথচ এই সাত বছর ধরে ঘসটাচ্ছিস!'

নাও দেখো যার পায়ের নখের যুগ্যিও ক্ষ্যামতা নেই, তাকে পায়ে বেঁধে নিয়ে চলে আসবার ক্ষ্যামতা আছে কি না নিমাইয়ের।

এত তাড়াতাড়ি হয়তো চলে আসতো না নিমাই, সেদিনের অপমানটাও কাজ করেছে।

তাছাড়া ভেবেছিল অজানা অচেনা জায়গা থেকে সরে পড়াই সুবিধে। কেউ বলে দেবেনা, 'আরে তাদের তো দেখলাম পেয়ারাতলার বাসে উঠতে।'···

চলে এসেছে। চালাতে হাড়ে দুখো গজাচ্ছে।

এদিকে সনাতন আর উচিতমত হোটেল খরচা পাঠাচ্ছেনা। অতএব সনাতন দু'বেলা শাসাচ্ছে 'চলে যাব। বলে দেব গিয়ে অধিকারীকে।'

লিলিবালা বলে, 'বলে দিয়ে তো প্রেখব ফাঁসি ডোবায়। তুমিও সমান পাপে পাপী। জেরার সময় আমি বলবো, তুমিই আমায় ফুসলে এনেছ, নিমাইদা তোমার সঙ্গী মাত্তর। বাপার প্রাণ তাই এসেছে।'

'বলবি এ কথা? সনাতন বলে, 'মুখে বাধবেনা?'

'বাধবে কেন? তুমি কি কম শয়তান? সেদিন ঝগড়ার মুখে বলনি ওকে, 'লিলির দায় আমি পোহাতে যাব কেন? তুই কি আমায় ওর ভাগ দিবি! তবে? শয়তান আবার কাকে বলে?'···

খাটো স্কার্ট আর আঁটো জ্যাকেটের মধ্যে বন্দী থেকেও লিলি তাই জগৎ সংসারের কোনো কথা শিখতে বাকি রাখেনি, তাই নববালা যাসমতীদের ভাষার সঙ্গে লিলির ভাষার বিশেষ কোনো তারতম্য নেই।

তবে লিলি জানে নিমাই তার 'বিয়ে করা স্বামী', শুধু অনুষ্ঠানটা বাকি।

বাকিটা কেবলমাত্র নিমাইয়ের আলস্যের জন্যে হচ্ছেনা।

কিন্তু নিমাই?

সেও কি তাই জানে?

আহা বুড় অধিকারীর কি হল?

ভবানী অপেরার প্রোপাইটার মিষ্টার দাসের?

সে কি আজও পাথর হয়ে বসে আছে?

নাঃ তা বসে থাকলে কি চলে?

পৃথিবী বড় কঠিন জায়গা।

বাস্তব বড় নির্মম।

যারা যাত্রার টাকা নিয়েছে, দশদিন ধরে এককাড়ি লোক খুঁজছে, তা'রা ছেড়ে কথা কইবে? 'পালা' নামাতেই হয়েছে কুরুক্ষেত্র। চারুহাসিনীকে দিয়েই

চালাতে হয়েছে। রব তুলতে হয়েছে লিলিবালার দিদিমার হঠাৎ মরণ অসুখ, তাই চলে যেতে হয়েছে লিলিবালাকে।

তা' থাকগে, সালা পালাটা এমনিতেই জম্ জমাট! বকুলের কলঘের গুণেই মুহুর্মুহু হাততালি, আর চারু-হাসিনীও একেবারে ফেলনা নয়। চালাচ্ছিল তো এতদিন।

পালা শেষে জাল গুটিয়ে চলেও আসতে হয়েছে বৈ কি কুঞ্জকে কোমর তুলে। লিলিবালার দিদিমার মরণে লিলিবালার সেখানে আটকে পড়েছে বলে কি অধিকারী কুঞ্জবাস ভেঙে পড়ে মাটিতে পড়ে থাকবে?

তবে হ্যাঁ দু'দুটো ছেলেকে লিলির সঙ্গী হিসেবে পাঠিয়ে অসুবিধের একটু হয়েছে, তারাও তো আটকে পড়েছে।

তা' কি আর করা যাবে?

তেমনি, যে মানুষ পালা লেখা ছাড়া আর কখনো কিছু করে না, সেই মানুষই বুক দিয়ে করলো।

ছড়ানো জাল গুটিয়ে আবার কাটোয়ায় এসে ফেলে সবে স্থির হয়ে আমতা লাইনের সেই গ্রামের পথটায় পাড়ি দেবে হঠাৎ বাবুড়া থেকে এক তলব এসে হাজির।

'নতুন কি এক পালা বয়েছেন না কি চোরা কারবারি-দের টুকে, মেদিনীপুরে জয় জয়াকার করে এসেছেন, বায়না করতে এসেছি তার।'

কুঞ্জ গম্ভীর ভাবে বলে, 'ওইটি আজ্ঞে করবেন না বাবুমশায়, আর যেটা বলেন রাজী!'

হ্যাঁ বাইরের লোকের সঙ্গে কথা কইতে কুঞ্জ বাবুমশায় টশায় বলে।

এসেছেন বাঁকুড়ার নামকরা এক ডাক্তার বাড়ি থেকে, ডাক্তারের শালা জন্মাষ্টমী উৎসবে যাত্রাগান দেবেন। লোকটা একটু স্বদেশী স্বদেশী, ছেলেমেয়েরা না কি চেয়েছিল জলসা হোক। তিনি বলেছেন, 'না দেশের পুরনো জিনিস হোক।'

কথাটা ভাল লাগে কুঞ্জর।

কিন্তু ওই পালাটা?

যেটার সঙ্গে কুঞ্জর জীবনের সব সর্বনাশ জড়িত।

'ওটা হবে না বাবুমশায়, আর যা বলেন।'

বাবুমশায় সন্দেহের গলায় বলেন, 'কেন ওটাতে পুলিসের ঝোপে-টোপে পড়েছিল নাকি?'

'না না! সে সব ভয় কুঞ্জ অধিকারী করে না। ওটার মানে, এ্যাকটার এ্যাকট্রেস নেই এখন।'

'নেই কি মশাই? এই ক'দিন আগে মেদিনীপুর কাটিয়ে এলেন।'

'দু'তিনজন' পালা মেরে দিয়েই দেশে গেছে।'

'আহা এখনো তো দু'চারদিন রয়েছে। দেশ থেকে আনান।'

কুঞ্জ তবু ঘাড় নাড়ে, 'আসবে না দেশে অসুখ।'

বাবুমশাই কিন্তু নাছোড়বান্দা।

এটা তিনি করিয়ে তবে যাবেন।

টাকা নিয়ে এসেছেন বায়নার।

কুঞ্জ হতাশ গলায় বলে, 'আমার অসুবিধাটা বুঝছেন না বাবু, ওটা ছাড়া অন্য কিছু বলুন।'

তা হয় না।

ওটাই চাই।

আপত্তির কোনো অর্থ নেই।

দুটো মাত্র কারণ থাকতে পারে আপত্তির, এক আইনের ধার, দুই কম্পিটিশনে নামবার জন্যে নতুন নাটক তুলে রাখছে।

প্রথমটা যখন নয়, তখন দ্বিতীয়টা।

কিন্তু ওটা অধিকারীর ভুল ধারণা; তাতে রাগ নাম চড়াবে। যুক্তির পরপর্যা।

হয়তো এই আপত্তিটাই বাবুমশাইকে এত এখন আগ্রহে উত্তেজিত করেছে। আপত্তি করেছে? নিশ্চয় তা'হলে ভিতরে কোনো গূঢ় কারণ আছে। তবে ওই আপত্তিটা ভাঙবার জন্যে গাইটি পাবল লাগাও।

অনেক কথা অন্তে নিরুপায়ে কুঞ্জ হতাশ গলায় বলে, 'আচ্ছা বাবুমশায়, আপনি একটা বেলা সময় দিন আমায়, চিন্তা করে বলবো। বুঝতেই তো পাচ্ছেন, সাধ্যপক্ষে এত কথা কইতাম না আমি।'

বাবুমশাই বলেন, 'ঠিক আছে, এখানে আমার

ভাইকিং বাড়ি, থাকবো আজকের দিনটা। কোথাকার মানুষ কোথায় এসেছি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, বিফল হয়ে ফিরে যাব? আপনার দলবলের আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হবে না, দেখবেন।'

বাবুমশাই চলে যাবার পর কুঞ্জ ভয়ানক একটা অস্থিরতা অনুভব করে।

যা কাম্য, যা প্রার্থিত, তাই এসে যাচ্ছে হাতের মুঠোয়, যথা অর্থ সম্মান। অথচ কুঞ্জ তা' নিতে পারছে না। কেন? বাধাটা কোথায়? পালাটা অপরা? ওই 'মহাকালের খাতা'—থেকেই কুঞ্জর জীবনের হিসেবের খাতা এলোমেলো হয়ে গেল।

কিন্তু ওই কুসংস্কারটা যদি না মানা যায়?

যদি কুঞ্জ ভাবে ওগুলো ঘটতোই।

সুখ-দুঃখ, বিপদ-সম্পদ সবই চন্দ্র সূর্যের মত অমোঘ নিয়মের অধীন তারা যথাসময়ে আসবেই মানুষের জীবনে যতটা আলোছায়া ফেলবার তা' ফেলবেই। তা হলে? ঠিক তাই।

সিলি লক্ষ্মীছাড়ীর পালিয়ে যাওয়া কুঞ্জর কপালে ছিল। উমার সঙ্গে অকারণ বিচ্ছিন্নতা কুঞ্জর কপালে ছিল। এসব অমোঘ অনিবার্য।

কুঞ্জ সেই ব্যাপারটাকে কুসংস্কারে ফেলে অন্য চেহারা দিচ্ছে।

নাঃ এসব দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছু নয়। কুঞ্জ নেবে বায়না। সিলি মুছে যাক। চারুহাসিনী তো আছে। নিমাই চুলোয় যাক, বরুণকেই এবার আসরে না নামে ছাড়বে কুঞ্জ।

হঠাৎ একটা নতুন উৎসাহে টগবগিয়ে ওঠে কুঞ্জ! আগে সকালে যে সেই লোকটার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছে, তার জন্যে লজ্জাবোধ করে।

ওকে না হয় বলে দেবে, 'মনস্থির করে ফেলনাম বাবু-মশায়। নিলাব বায়না।'

বরুণ আপত্তি করবে?

সে আপত্তি খণ্ডন করে ছাড়বে কুঞ্জ। বলবে 'নিজের ভাবা একবার নিজের মুখে বলে দেখছে, দেখ যে কী উদ্দীপনা পাবে।'

ভাবতে ভাবতে নিজেই উদ্দীপনা বোধকরে কুঞ্জ।

নতুন শহরের নতুন আসর তার আলোকমালা নিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

কুঞ্জ সেখানে বুকভর্তি বেড়ে নিয়ে দীপ্ত মহিমায় ঘোষণা করে···'শুনুন বাবু সকলরা, এ এক ভেজালদার চোরাকারবারীর কাহিনী। কিন্তু এ একের কাহিনী নয়। সহস্রের কাহিনী। মানুষ মারার কারবার খুলে বসেছেন এঁরা!···কিন্তু বাবু মশায়, আজও চন্দ্র সূর্য উঠছে, তাই এঁদের হিসেব লেখা হচ্ছে। লেখা হচ্ছে 'মহাকালের খাতায়।'

কুঞ্জর বিষিল মন খাড়া হয়ে ওঠে।

কুঞ্জ বরুণের কাছে আজি পেশ করতে যায়। ওই ভেজালদারের এক বন্ধু আছে, যে তার হিতৈষী যে সত্যব্রতী। তার মুখে অনেক উপদেশ বাণী আছে। সে পার্টটা নিমাই করে। নিমাইয়ের উচ্চারণ ভালো। গেলবারে ভ্রমকে দিয়ে চালাতে হয়েছে। কিন্তু ভ্রমর উচ্চারণ অস্পষ্ট। অমন চরিত্রটা অমন জায়গায়, ওই দোষে যেন ঝুলে গেলো।

বরুণ যদি নিজে শুতে নামে, মারকাটারী হবে।

তা বরুণ বুঝি সত্যিই ওই দুর্বৃ কুঞ্জদাসের কাছে সেই অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছে। যে বন্ধন স্বাধীন চিত্তের স্বাধীনতাটুকু হরণ করে নেয়।

নইলে কুঞ্জর অনুরোধ রাখতে রাজী হয় বরুণ?

বলে, 'কিন্তু একদিনের জন্যে।'

'ঠিক আছে তাই সই।'

কুঞ্জ আবার নবীন বয়সের উদ্যম পায় যেন। কুঞ্জ চারুহাসিনীকে গিয়ে অবহিত করে। তারপর—বাঁকুড়ার ডাক্তারবাবুর শালাকে জানায়, 'মনস্থির করেই ফেললাম বাবু।'

এই উত্তেজনার মাথায় পরদিনই বেরিয়ে পড়লো স্টেশনের উদ্দেশে। গিয়ে পড়ে বলতে তো হবে, 'বড়-মুখ করে বলেছিলাম বেরেকে দিয়ে যাব। মুখ থাকলো না।

বেরে সেই মুখে চুনকালি দিয়ে চলে গেছে !'

দেওয়ালের ওপার থেকে নিশ্চয়ই বাঙ্গ হাসি উঠবে। মেয়ে যে আসতে নেচে নেতেল লোঠার খবর থেকেই যে এ খবরটাও পাওয়া গিয়েছিল, সেই উল্লেখ থাকবে সে হাসিতে।

থাকুক, তবু বলতে তো হবে।

জানাতে তো হবে মুখে কুটো দিয়ে, তোমার গচ্ছিত ধন আমি রক্ষে করতে পারিনি।

ক'দিন ধরেই মনে মনে চালাচ্ছিল এ মহলা, কিন্তু ভয়ানক একটা ভয় যেন গ্রাস করে ফেলছিল বৃন্দাকে।

বৃন্দা পেরে উঠছিল না।

নিজে পথ করে কাঠগড়ায় উঠতে কে যায়? নিজে দড়ি টেনে গলায় ফাঁসি কে লাগায়?

কিন্তু আজ হঠাৎ উৎসাহের জোঁকে বল সংগ্রহ করে ফেললো। চললো মহলা করতে করতে। উমাকেও বলতে হবে, 'যা হবার তা হবেই। তাকে রোধ করা যায় না।'

কিন্তু বৃন্দার গ্রহ নক্ষত্র বোধহয় এখন প্রতিকূল, তাই বৃন্দার অত মহলা বিফলে গেল। বৃন্দা একটুর জন্যে ট্রেন ফেল্ করলো।

আজ আর সুবিধের ট্রেন নেই।

অথচ আর সময়ও নেই।

কাল বাদ পরশু বাঁকুড়ায় যাবার ব্যবস্থা।

এই দলবল এই পাহাড় প্রমাণ সাজ সরঞ্জাম। এসব গুছিয়ে নিয়ে যাওয়া সোজা নয়। ছেলে ছোকরাদের মধ্যে তো ছোট নেই। বিপিন থেকে শুরু করে সকলেই প্রায় বয়স্ক।

তাদের আবার ধমক দেবার জো নেই।

তোয়াজ করে করে নিয়ে যাওয়া।

দুটো দিন হাতে রাখতেই হবে। ট্রেনের টাইম আছে, ট্রেনের ধকল আছে।

এ যাত্রা আর হল না।

ঘুরে এসে হবে। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা পয়ষট্টি!

ভাবছেই তো ঝগড়া করে চলে এসেছি, তাই যাচ্ছিনা, আরো দু'দিন ভাবুক!

বৃন্দা আজ বাইরে গেছে। কালকের আগে আসবে না।

নববালা আর বাসন্তী রান্নাঘরে বসে বিড়ি টানছিল, আর সুখ দুঃখের কথা কইছিল।

আবার হুই হুই করে ছোটো এক দেশে।

অরুচি ধরে গেছে বাবা!

এর থেকে এসব ছেড়ে ছুড়ে ইস্টিশানে পানের দোকান দিলে হয়। তা থেকে খুব পেট চলবে। অথচ খাটুনী নেই।

আর এই বস্তি বাসে?

হাড় পিত্তে যায়।

শুধু তো পাট করা নয়, এই রাবণের গুষ্টির ভাত রাঁধা।

গল্প যখন উদ্দাম, হঠাৎ বুকের ভেতর ধড়ফড়িয়ে উঠলো। এ কী, অধিকারীর গলা না? চলে গিয়েছিল যে।

ওরা তো ধরে নিয়েছিল মাঝে মাঝে যেমন একদিনের জন্যে ডুব মারে কর্তা, তেমনি গেছে।

এই নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা করে তারা।

কোথায় যায় অধিকারী?

এদিকে তো বাজা-গোঁয়ার, ওর যে কোথাও কোনো-খানে ভাবের লোক আছে তা' তো মনে হয় না। তবে আছে কে? বলে না কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে। আসেও ঠিক নিয়ম মাফিক।

জল্পনান্তে ওরা ধরে নিয়েছিল নিশ্চয় কোনো দেবস্থানে যায়। চেপে যায়। অনেকের আবার ওতে লজ্জা আছে। ঠাকুর দেবতা করে, লুকিয়ে।

আজও তাই গিয়েছে জানে, হঠাৎ কর্তার গলার স্বর। কাকে যেন বলছে, 'নাঃ বেরোলাম না ফিরেই এলাম। শরীরটা তেমন ইয়ে ঠেকলো না।'

হাতের বিড়ি ফেলে দিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল

ওরা। বাসন্তী বলে উঠলো, 'শরীর বুঝি খারাপ ?'

'শরীর শরীর খারাপ হোক।'

বলে চলে যায় কৃষ্ণ।

কৃষ্ণর কানে একটা সুর এসে বাজে।

কে কোথায় কী সুর বাজাচ্ছে কে জানে।

কৃষ্ণর বিস্বাদ মনটা হঠাৎ একটা আনন্দের আস্বাদে ভরে যায়। কৃষ্ণ ভাবছিল, এ পৃথিবীতে বুঝি ভাল জিনিস বলে কিছু নেই। কিন্তু তা তো নয়। আছে ভাল জিনিস। সুর আছে।

সুর আছে এটা যেন কৃষ্ণ প্রায় ভুলেই যেতে বসেছিল। সুর হারানো প্রাণ নিয়ে কেবল ভেবে এসেছে, জগতে শুধু বেসুরো অ-সুর আছে। আর কৃষ্ণর হাতে চাবুক আছে।

অথচ এখনো সুর আছে, গান আছে!

কৃষ্ণ তার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে ভাবে, তার পৃথিবীকে কি আবার সুরে ভরে তোলা যায় না?

হয়তো ঠিক এই ভাষায় ভাবতে পারে না, মূর্খ কৃষ্ণ, তবে ভাবটা এই।

জীবনের রাজপথে চলতে চলতে, তার অনেক গলি খুঁজেও চোখে পড়ে বৈকি। দেখা যায় সেখানেও লোকে দিব্যি বাস করছে বড় রাস্তার ধারের বাসিন্দাদের মতই।

কত সময় কত 'বিয়ে না হওয়া' 'স্বামী স্ত্রী'কে ঠিক স্বামী-স্ত্রীর মতই সংসার করতে দেখলো কৃষ্ণ, দেখলো কত বিধবাকে সহজভাবে একটা আত্মীয় পুরুষের ঘর করতে। অথচ তাদের মধ্যে কোনোখানে অস্বচ্ছন্দতা নেই।

কৃষ্ণই বা কেন তবে একটা দৈবাৎ উল্টোপাল্টা হয়ে যাওয়া ঘটনাকে সোজা করে নিতে পারলো না? কেন চিরদিন দেওয়ালের বাইরে রইল?

এটা কি কৃষ্ণরই ত্রুটি?

কৃষ্ণ যদি ধাবি খাটাতো?

কৃষ্ণ যদি ভয়ে না মরতো? কিন্তু কৃষ্ণ ভয় পায়। কৃষ্ণ ঠিক করলো এবার, কৃষ্ণ নির্ভয় হবে। কৃষ্ণ ধাবির বলে দেওয়াল ভাঙবে। দেখবে কেমন না মুখ দেখায় সে।

ধাকড়োর পালাটা একবার সেরে আসতে পারলে হয়। কিন্তু পালা তো সহজে মেটে না।

ধাকড়া থেকে আবার পুরুলিয়ায় ডাক আসে।

হাততালির স্রোতে কৃষ্ণ মানের মানুষটার ভিতরের সত্তাটা যেন ভেসে ভেসে দূরে সরে যায়।

পুরো একটা লরি ভাড়া নিয়ে ভবানী অপেরা পার্টি ধাকড়া থেকে পুরুলিয়ায় হওনা হয়।

এর ফাঁকে কৃষ্ণর কাটোয়ার বাড়িতে সনাতন নামের সেই পালিয়ে যাওয়া ছেলেটা কোড়ো কাকের মূর্তি নিয়ে এসে আরো দুটো পালানে মানুষের কীর্তি কাহিনীতে রং চড়িয়ে চড়িয়ে গল্প করে পুরনো করে ফেলে, এখন মনের সুখে খাচ্ছে আর ঘুনোচ্ছে।

আর খাবে নোড়া একটা চিঠি এসে কৃষ্ণর ঘরের চৌকীর ওপর পড়ে আছে। শিখন বলে দিয়ে গেছে জানলা দিয়ে।

চিঠিটার মধ্যে শুধু একটাই লাইন, নাম সম্বোধনহীন।

'মতলবটা কী? না খাইয়ে মারতে চাও বুঝি?'

পুরুলিয়া থেকে ফিরে এল ভবানী অপেরা পার্টি নতুন বেতেল নিয়ে।

একটা তেজালদার তার নিজ পরিবারের সকলের মৃত্যুর কারণ হওয়ায় যেমন লোকে 'বেশ হয়েছে' বলেছে, তেমনি কৈফেছে, শিউরেছে।

এবং নাট্যকার আর পরিচালকের দরদ আর দুঃসাহসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে লোকে।

ভরা মন নিয়ে এসে ঢুকলো কৃষ্ণ, আর এসেই দেখলো সনাতন। দেখেই চড়াৎ করে পায়ের রক্ত মাথায়! 'তুই এখানে? আবার তুই মুখ দেখাতে এসেছিস?' বলে পায়ের জুতো খুলে মারতে উঠে গেল।

'মুখ দেখানো' শব্দটাই হঠাৎ মনের মধ্যে আলোড়ন তুললো। জুতো ফেলে বললো, 'আর দুটো কই?'

'তারা আসেনি' ঘাড় গুঁজে উত্তর দেয় সনাতন।

'তারা আসে নি? শুধু তুমি? কেন তোমারই বা আসবার দরকার কি ছিল? কোথায় তারা?

'জানি না।'

'জানিস না? মিথ্যেবাদী হারামজাদা! একসঙ্গে ভাগলি, আর—'

'আমি ভাগিনি ওরাই আমায় বলে···,' সনাতন বোঝে এই মরতায় ছাড়া কথাগুলো বলা যাবে না। তাই সনাতন তড়বড় করে বলে ওঠে, 'যা কষ্ট দিয়েছে আমায়! খেতে দেয় নি—তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'খেতে দেয় নি? খেতে? নবাব খাজা খাঁ আবার খেতে চান! বলি ওরাই বা কোথা থেকে খেতে দেবে শুনি?'

সনাতন এখন রাজসাক্ষী।

সনাতনকে এখন নিজের দিক বাঁচিয়ে কথা বলতে হবে। তাই সনাতনের বলতে বাধে না, কর্তার ঘর থেকে টাকা চুরি করে পালিয়েছে লিলি।

আর সে টাকা শেষ হতে লিলি রোজগার ধরেছে। না করে উপায় কি! খেতে তো হবে।

রোজগার!

কুঞ্জর অসতর্ক কণ্ঠ বিস্ময়ের চাবুকে আহত হয়ে উচ্চারণ করে ফেলে, 'কিসের রোজগার?'

সনাতন ঘাড়টা হেঁট করে।

আর হঠাৎ তার সেই হেঁট হওয়া ঘাড়ের ওপর ঘটাঘট করে এসে পড়ে একটা ভারী জুতোর পাটি। 'বলবি আর? বলবি আর?'

সনাতন ছুট দেয়।

আর কুঞ্জ জুতোটা হাত থেকে ফেলে ঘরে ঢোকে। ঢুকেই স্তব্ধ হয়ে যায় কুঞ্জ।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে চৌকীর ওপরকার জিনিসটার দিকে।

তারপর জুতোর হাতটা ধুয়ে এসে, আস্তে খামটা খোলে।

পড়ে—'মতলবটা কি? মা খাইয়ে মারতে চাও বুঝি?'

আবার পড়ে।

আবার পড়ে।

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দু'দিক থেকে দু'পাটি কুড়িয়ে নিয়ে পায়ে দিয়ে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

আবার আমতা লাইনের সেই গণ্ড গ্রামটার সেই পায়ে চলা কাঁচা পথের উপর দু' পাটি ভারী ভারী জুতোর ছাপ পড়ে···ভারী জুতো আর আধময়লা ধুতি শার্ট পরা একটা লোককে আবার সেই বেড়ার দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে দেখা যায়।

ভিতরের দৃশ্য যথাযথ।

সেই উঠোনে তুলসী বাড়, এখানে ওখানে গাঁদা টগর জবা, দাওয়ায় উঠতে তিনটে সিঁড়ি। কোনো বিষয়ের এদিক ওদিক নেই।

তবু যেন বুকটা কেঁপে ওঠে কুঞ্জর।

তবু কুঞ্জ অধিকারীর মনে হয় যেন বাড়িটা শ্মশান শ্মশান। যেন এখুনি কোনোখান থেকে প্রেতাত্মারা কথা কয়ে উঠবে।

কী হয়েছে? কেউই তো থাকে না কোনো দিন, তবে আজ এমন কেন? সত্যিই তো তা'হলে—

কিন্তু আজও কুঞ্জ দাওয়ায় দাঁড়িয়ে কেন? কুঞ্জর যে সংকল্প ছিল এবার আর তার না। এবার নিজের দাবিতে সরলে ঘরে প্রবেশ করবে।

এবার বলবে, 'জগতে কতই দেখলাম। কত ভুলের কারবার 'ঠিক'-এর বাজারে চলে যাচ্ছে, কত গলি খুঁজি রাজরাস্তায় এসে মিশছে। তবে বৈরাতের একটা ভুল শুধরে নিতে বাধা কোথায়?···ভুল তুমিও করেছ, আমিও করেছি, ব্যস্ শোধ-বোধ। আবার জীবনের পথে—।

কিন্তু সে সব কথা হারিয়ে গিয়ে আবার শুধু ভয় কেন?

কেন আজও দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছে বোকার মত?

কতকাল ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে ও?

অনন্তকাল?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালো কুঞ্জ। দেখতে পেলো, উঠোনের দড়িতে একটা কাচা শাড়ী মেলিয়ে শুকোচ্ছে, দেখলো দাওয়ার ধারে মাজা ঘটিতে জল।

তার মানে বাড়িতে আর মানুষ আছে।

আর সে নিত্যকাজ করছে।

কোথায় তবে গেল সে?

পড়শীর বাড়ি?

পুকুরে জল আনতে?

কতক্ষণের জন্যে?

ভরা দোদুরের বিকেল, চারিদিক আলোয় খাঁ খাঁ করছে, শূন্য বাড়ির দাওয়ানে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে গলাটা শুকিয়ে আসে কুজর। আর নিজেই হঠাৎ সে প্রেতাত্মার গলায় কথা বলে ওঠে, 'একটু জল পাওয়া যাবে? খাবার জল?'

কাকে বলে জানে না।

কিন্তু তার এই অবোধ প্রশ্নের উত্তর এসে যায় হঠাৎ! ঘরের মধ্যে থেকে একটা ক্ষীণ রোগী কণ্ঠ উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে, 'কে? কে? জল চাইলো কে?'...সত্য ঘুম ভাঙার গলা? না? ভয়ে আচ্ছন্নর গলা?

কুজর বিহ্বল চেতনা যেন ঝাঁকুনি খেয়ে হঠাৎ সজাগ হয়ে ওঠে।

কুজর সেই সাহসী সংকল্প দৃঢ় হয়ে দাওয়া থেকে ঘরে এনে ফেলে কুজকে!

অতএব কুজর ঘরে ঢোকা হয়।

হয়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে পিছিয়ে আসতে হয় কুজকে। বুঝিবা চোখটাও বুজে।

বিছানায় যে পড়ে আছে, সে কে!

মুখের প্রায় সবস্ত চামড়াটা পোড়া কেঁকড়ানো, কালো জামড়ো পড়া।...তার মাঝখানে মাঝখানে সত্যিকার রক্তের এক এক চিলতে আভাস যেন আরো ভয়াবহ বীভৎসতার সৃষ্টি করেছে।

যে 'সত্যি'টা 'পরী'র তুলনাবাধী ছিল।

আর যার অহংকারে সেদিন ওই মুখরা মেয়েটা সদর্পে বলেছিল, 'বাহবা'ও ছিল বৈ কি। ছিল রূপের 'বাহবা'।

কুজ ভাবতে পারতো এ উমাশশী নয়, আর কেউ।

ভাবতে পারতো, উমাশশী মরে গেছে, এটা তার প্রেতাত্মা। কিন্তু কুজকে সেই 'ভাবনা'র শান্তিটুকুও দিল না ওই শয্যাবিলীনা নারী।

শক্তি নেই তবু মুখর হাসি হেসে বলে উঠলো, 'ভেবেছিলাম আর থাকতে এই পোড়ামুখটা আর দেখাব না, একেবারে নয়া মুখই দেখাবে। হল না। দেখে ফেললে।'

'উমাশশী নয়,' বলে আর খুঁজি পাওয়া যায় না।

কুজ মেঝের পাতা বিছানার ধারে মাটিতে বসে পড়ে হাহাকারের গলায় বলে, 'এ কী?'

উমাশশী হাসে। ভারী বিকৃত দেখায় মুখটা।

ক্ষীণকণ্ঠে বলে, 'কোনটা? বিছানায় পড়ে থাকা, না পোড়া মুখটা?'

'দুই! দুইই উমা। এ কী করে হলো?'

উমা কষ্টে বলে, 'এত দেরীতে এলে, বলবার সময় আর কই? তা বলে ভেবো না, না খেতে পেয়ে মরছি। সে অহংকার তুমি করতে পারতে না। এখনো অনেক টাকা আছে। গয়লা বৌ আমার অনেক করছে, বলেছি তাকেই দিয়ে যাব।...চিঠিটা? হলনা। দুষ্টুমি! তোমার টনক নড়াবার চেষ্টা। অসুখই। জ্বর রক্ত আমাশয়। একেবারে শেষ করে ফেললো।'

কুজ আর্তচীৎকার করে বলে, 'ডাক্তার দেখেনি? ওষুধ পড়েনি?'

'পড়েছিল।' আবার হাসে উমা, 'গয়লা বৌয়ের টোটকা। তার পর থেকেই চরমে উঠলো আর কি।'

'তোমার চিঠি আমি পাইনি উমা—'কুজ হাহাকার করে ওঠে, 'বাইরে বাইরে ঘুরছিলাম। এক 'বাস' পালা নিয়ে—'

'পাওনি বুঝেছিলাম।'

কুজ হাউ হাউ করে কেঁদে বলে, 'বুঝেছিলে? এখনো এত বিশ্বাস করেছিলে আমার ওপর?'

'কি যে বল!'

উমা আরো আস্তে বলে, 'যেদিন বেলেঘাটার বস্তিতে এসে দাঁড়ালে সেই দিনই—না তারও আগে বোধ হয়।

নইলে চিঠি দিয়ে ডাকতে পেরেছিলাম কি করে?··· আর এখনো তা' পারলাম কি করে?'

'উমা আমি যাই! ডাক্তার ডেকে আনি—'

'আঃ থামো! পোড়া মুখটা যখন দেখেই ফেললে, তখন নিজের মুখটা দেখতে যাও দু' দণ্ড।'

'আমার মুখটাও পোড়া উমা। অহঙ্কার করে বলে গিয়েছিলাম তোমার মেয়েকে তোমার কাছে দিয়ে যাব। অহঙ্কার রইল না। ফিরে গিয়ে দেখলাম সেই ঘাগরা পরা মেয়েটা—' কৃষ্ণ একটু থেমে বলে, 'দলের একটা ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে। এঁ্যা! পালিয়েছে!' উমা হঠাৎ ভাঙা গলায় উচ্চ হাসি হেসে বলে ওঠে, 'বাঃ বাঃ। মায়ের উপযুক্ত মেয়ে হয়েছে তা'হলে! দেখলে রক্তের গুণ? দূর দূরান্তরে রেখে, একবারও চোখে না দেখিয়ে, তবু কেমন গুণটি ফলালাম?'

'আমি এ স্বপ্নেও ভাবিনি—'কৃষ্ণ কোঁচার খুঁট তুলে চোখ মোছে, 'কত ভাল পাত্তর ঠিক করেছিলাম তার জন্যে'।

'স্বপ্নেও ধারণা করনি? কেন গো? ওর মা বাপের পরিচয়টা বুঝি ভুলে গিয়েছিলে?'

কৃষ্ণ উত্তর খুঁজে না পেয়ে বারে বারে চোখটা মুছে নিয়ে বলে, 'মুখের এ অবস্থা হল কি করে?'

'ওমা এখনো তুমি মুখের কথা ভাবছো? ভাবলাম ভুলে গেলে! কিছুনা। আমার সেই ভালবাসার লোকের ভালবাসার চিহ্ন। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলার পুরস্কার। বিছানায় শুয়েই মুখে এ্যাসিড্ ছুঁড়ে—'

'এ্যাসিড্।'

'হ্যাঁ শুনলাম আমাকে শিক্ষা দিতে হাতের কাছে রাখা ছিল। বস্তির কাকে দিয়ে আনিয়ে—'

'থাক উমা, কথা বোলোনা কষ্ট হচ্ছে। আমি ডাক্তার আনি।'

'আনো তবে। তোমার আবার আক্ষেপ থেকে যাবে বিনি চিকিচ্ছেয় ম'লো—'

না আক্ষেপ থাকেনি কৃষ্ণর।

করেছিল চিকিৎসা।

কলকাতা থেকে ডাক্তার নিয়ে গিয়েছিল। তার নির্দেশে কলকাতায় এনে ভাল হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল। কিন্তু বরেই গেল উমাশশী। তবে কৃষ্ণ তার প্রতিশ্রুতিও রাখলো।

সেই আধপোড়া মুখটায় মুখাগ্নি করলো। করলো শ্রাদ্ধ শান্তি।

আর মোটা বুদ্ধি গ্রাম্য লোকেরা যা করে তাই করলো, সেই উপলক্ষে লোকজনও খাওয়ালো বিস্তর।

কর্তার পরিবার ছিল এখনো, এই দেখে তাজ্জব হয়ে গেল সবাই। আর কর্তার সেই হঠাৎ হঠাৎ চলে যাওয়াটার হদিসও পেল। ছিল গিন্নী কমটুর।

সব মিটে গেলে জীবন যুদ্ধে পরাজিতের চেহারা নিয়ে কৃষ্ণ লিলিবালার অনেক খোঁজ করলো, কিন্তু এই শহর কলকাতার রাক্ষসী কুমার ঠাঁয়ে কোন অতলে তলিয়ে গেছে এক কৌটা লিলিবালা, কে তার পাত্তা দেবে? নিমাই নামের যে অপদার্থ ছেলেটাকে ভর করে অবোধ দুঃসাহসী লিলিবালা ওই রাক্ষসীর গহ্বরে ঝাঁপ দিয়েছিল, সে ছেলেটা হয়তো পালিয়েছে প্রাণে বাঁচিয়ে।

আর লিলিবালা প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায় পথ ভুল করে ধীরে ধীরে নেমে গেছে মৃত্যুর অন্ধকারে।

তবু সাহস করে 'ভবানী অপেরা পার্টি'র দরজায় এসে দাঁড়াতে পারে নি। যেখানে জীবন ছিল, আশ্বাস ছিল, আশ্রয় ছিল।

কোথায় কি থাকে সেটা টের পায়না বলেই না মানুষের এত ভুল পথে ঘুরে মরা!

জলন্ত নাটক নিয়ে রাজবাড়ির যাত্রা প্রতিযোগিতায় আর যোগ দেওয়া হলনা কৃষ্ণর, তবে যেন হয়ে গেছে সে সব। বায়না করাতে এসেও ফিরে যাচ্ছে লোকে, প্রোপ্রাইটারকে পাচ্ছে না।

প্রোপ্রাইটার তখন লিলিবালার মৃত্যু সংবাদ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ওইটা পেলেই যেন বাঁচে সে।

নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ কর্ম করতে পারে।

সেই বাঁচাটা হল না কৃষ্ণর। সে খবরটা না পেয়েই ফিরে এল একদিন কাটোয়ায়।

দলের অবস্থা তখন শোচনীয়।

কেউ ছেড়ে দিয়ে অন্য দলে যোগ দিয়েছে, কেউ ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজে যোগ দিয়েছে। মাইনে পাচ্ছিল না ঠিকমত, করবে কি? আর যারা কৃষ্ণর নিতান্ত পুষ্যি, তা'রা পড়ে আছে আর অধিকারীকে দু'বেলা গাল পাড়ছে। কারণ খাওয়া-দাওয়া খারাপ হচ্ছে।

বাসন্তী আর নবকালী স্টেশনের ধারে পানের দোকান দিয়েছে। পানের সঙ্গে না কি পানীয়ও রাখছে গুকাতে, অতএব তাদের জন্যে ভাবনা নেই। তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

কৃষ্ণ আসতেই ব্রজ বিপিন জলবন্ধু ছেঁকে ধরলো, 'ভবানী অপেরা কি উঠে যাবে?'

কৃষ্ণ ভবভূমি রোদ্দুরে ভেতে পুড়ে এসেছে, তবু সমীহ করলো না। যে মনিব অবস্থান সম্পর্কে উদাসীন, তাকে কে সমীহ করে?

রোদ্দুরে ভেতে পুড়ে এসেছে কৃষ্ণ, তবু ভেতে উঠলো না। শান্ত গলায় বললো, 'বোস বোস, বল দিকি তোরা কি 'চাস?'

'আমরা?'

ওরা মুখ চাওয়া চায়ি করতে লাগলো। ওদের ভূমিকা এখানে কি।

কৃষ্ণ বললো, 'বল? বল কী চাস? থাকবে, না উঠে যাবে?'

ওরা একত্রে বলে উঠলো, 'থাকবে, থাকবে।'

থাকবে না তো তারা কোথায় যাবে?

'বেশ তবে থাকবে।..... ভবানী অপেরা থাকবে, তোরা থাকবি। নতুন করে জাঁকিয়ে তুলি আর একবার, অনেক দিন অবহেলা করা হয়ে গেছে।'

বরুণ এলে নেই, বরুণের কাছে যেতে হয়।

'লেখক, কী লিখলে এর মধ্যে?'

'কিছু না।'

'সে কি রে? এতদিন সময় পেলে?'

'মন লাগেনি। আর ভাল লাগছেলা। আমায় এবার ছেড়ে দিন।'

'ছেড়ে দেব? তোমায়?' কৃষ্ণ হেসে ওঠে, 'তোমায় ছাড়বো তো থাকবে কি আমার।'

'সবই থাকবে।' বরুণ নির্লিপ্ত গলায় বলে, 'চলেই যেতাম! নেহাৎ আপনার সঙ্গে দেখা না করে—যেতে পারা গেলনা তাই—'

'দেখা করলেই পারা যাবে কেমন।'

কৃষ্ণ বলে, 'এই তো হল দেখা, কই যাও?'

বরুণ হেসে ফেলে বলে, 'আপনি অনুমতি করলেই যেতে পারি।'

'ওঃ অনুমতির অপেক্ষা? অনুমতি না দিলে তো যাওয়া বন্ধ? ঠিক আছে, দিলাম না অনুমতি, এবার কি করবে কর?'

'করবার আর থাকছে না কিছু। কিন্তু বাস্তবিকই আমাকে আর আটকাবেন না। রাস্তার লোক আবার রাস্তাতেই ফিরে যাই।'

'হবে না বাটাকার, ওসব হবে না।' কৃষ্ণ আগের মত উদাত্ত গলায় বলে, 'ভবানী অপেরা পার্টিকে আবার নতুন করে জাঁকিয়ে তুলতে হবে। সখল সহায়হীন হয়ে পারবো কি করে?'

বরুণ নির্নিমেষ চোখে একবার ওই অতি উৎসাহী মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, 'আর পারবেন বলে মনে হচ্ছে না।'

কৃষ্ণ ঈষৎ মলিন হয়ে যায়।

বলে, 'পারবো না বলছো?'

'বলছি না। মনে হচ্ছে, সেটাই বলছি।'

'কিন্তু আমি বলছি বরুণ পারবো! কেউ পাশে থাকলেই সব পারা যায়। একটা ভালবাসার লোক কাছে আছে, এটুকু জানতে পারলেই মনে বল আসে ভাই।.....হ্যাঁ ভাই-ই বলবো এবার থেকে।' কৃষ্ণ একটু হাসে, 'বরাবর ইচ্ছে হতো মুখে এসে পড়তো, কিন্তু সামলে নিতাম। কেন জানো?'

বরুণ অবাক হয়ে তাকায়।

এই নির্দোষ সম্বোধনটা মুখে এসে পড়লেও সামলে নেবার কারণ আবিষ্কার করতে পারে না সে।

কৃষ্ণ আর একটু হাসে, 'জামাই করবো বলে।..... বুঝলে? রেলগাড়ীতে দেখে পর্যন্তই ওই বাসনা। দেখ মুখ্যমি? মাথা নেই মাথা ব্যথা! মেয়ে নেই জামাই।... বল, লিলি কি আমার মেয়ে? অথচ তাকে 'মেয়ে' সাজিয়ে জামাই ঠিক করতে বসলাম! মুখ্যমির ফল ফললো তো? ওর বাপ আমার মুখে ছুতো মেরে গেল।'.....

কৃষ্ণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে বলে, 'তবে আক্ষেপটা রয়ে গেল এই, মেয়েটা আমায় মায়া মমতাহীন নিষ্ঠুরই ভেবে গেল। মানে ভেতরটা তো ধরতে দিতাম না। ভাবতাম কে কখন সন্দেহ করে বসবে। হয়তো খুঁজে বার করতে চেষ্টা করবে কার গর্ভের মেয়ে।'

বরুণ ওই বেদনাহত মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে বলে, 'সনাতন কোনো খবর করতে পারলো না?'

'নাঃ! যে হারিয়ে যায়, সে নিজে না ধরা দিলে কার সাধ্য খুঁজে পায় সে ভাই। ভেবেছিলাম কষ্টে পড়লে ভুল বুঝবে। এসে দাঁড়াবে।...কিন্তু এখন বুঝছি ভুল ভেবেছিলাম, দাঁড়াবে কেন? শুধু তো সে তার বাপেরই মেয়ে নয়, মায়েরও মেয়ে যে। আমার মধ্যে কি আছে না আছে টের তো পায় নি, আসবে কি করে?'

বরুণ বলে, 'ও নিয়ে আর মন খারাপ করবেন না মিস্টার দাস, ধরে নিন সে যেখানে আছে ভাল আছে, সুখে আছে।'

'তাই, তাই ভাবছি ভাই এখন। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওই বরুণ খবরটা পেয়ে একেবারে নিশ্চিন্তি হয়ে বসি। হল না। তবে ওটাই ভাববো, ভাল আছে সুখে আছে। ...তবে আর তোমার অপেরা পার্টি জাঁকিয়ে তুলতে বাধা কি ভাই?'

বরুণের হাতটা চেপে ধরে অধিকারী কৃষ্ণ দাস।

বরুণ সে হাত ছাড়িয়ে নেয় না।

নরম গলায় বলে, 'না বাধা আর কি, তুলুন জাঁকিয়ে।'

কৃষ্ণ দাস সেই ধরা হাতটায় একটা নিবিড় চাপ দিয়ে দিয়ে বলে, 'তা' হলে এবার আর ছাড়ছি না ভায়া, এবার একটা রোমান্টিক কাহিনী লিখতেই হবে।...আর 'চাবুক' নয়, 'দুঃশাসন' নয়, 'মহাকালের খাতা' নয়, শুধু ভালবাসার কথা। স্নেহ প্রেম মায়া মমতা ভালবাসা।...মহাকালের খাতায় কার কি জমা খরচ লেখা হচ্ছে, আমরা কি তার হিসেব রাখতে যাবার অধিকারী। তবু শুধু শুধু বড়াই কেন? ও খাতায় হাত দেবার আস্পর্ধা করতে গেলে কোন ফাঁকে নিজের জবার ঘরেই খুণ্যি বসে যাবে কি না কে জানে।'

• • •

বক্রেশ্বর : একটি নূতন সম্ভাবনা

... অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

"গৌড়দেশে মহৎ ক্ষেত্রং বক্রেশ্বর-সুসঙ্গতম্।
স্নানমাত্রেণোপি ক্ষুণাতে সর্ব্বকিল্বিষং ॥"
(ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ)

গৌড়দেশে বক্রেশ্বর একটি মহাক্ষেত্র। এর নাম স্মরণ মাত্রেই সর্ব পাপ হতে মুক্ত হওয়া যায়—এই হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের 'বক্রেশ্বর মাহাত্ম্যের' সাধারণ পরিচয়। উক্ত পুরাণ মতে বক্রেশ্বর অষ্টাবক্র মুনির সিদ্ধিস্থান। মুনি সুব্রত (অষ্টাবক্রের পূর্বনাম) লক্ষ্মীর বিবাহে ইন্দ্রসভায় অর্ঘ্য পেতে একটু বিলম্ব হওয়ায় ক্রোধে ইন্দ্রকে শাপ দিতে গিয়ে অপরকে আত্মসংবরণ করেন। কিন্তু ক্রোধ সংবরণের ফলে তাঁর অঙ্গাঙ্গি বেঁকে যায়। এই অবস্থায় তিনি কাশী ছুটলেন শিবকে তুষ্ট করার জন্য। শিব তখন তাঁকে গৌড়ের গুপ্তকাশীতে তপস্যা করতে বললে। অষ্টাবক্র বীরভূমের এই স্থানে এসে দশ হাজার (অন্যান্তরে ত্রিশ হাজার) বছর শিবস্তুতি করেন। এই তপস্যার ফলেই তাঁর নিকট পাবকার কুণ্ড আবির্ভূত হয়; এর জল স্বর্গ প্রদায়ক। যাই হোক, অষ্টাবক্রের তপস্যায় মহাদেব তুষ্ট হলেন। বর দিলেন—'যে অষ্টাবক্রকে প্রথমে অর্ঘ্য দিয়ে পরে তাঁর পূজো করবে তার আর পুণ্যের অবধি থাকবে না।' বিশ্বকর্মাকে নির্দেশ দিলেন অষ্টাবক্রের মন্দির নির্মিত করতে। স্থানটি একটি সিদ্ধপীঠে রূপান্তরীত হল। আলোচ্য পুরাণেই মঙ্গলকোটে শ্বেত নামে এক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি প্রত্যহ বক্রেশ্বরে এসে বক্রনাথ মহাদেবের অর্চনা করতেন। এখানকার শ্বেতগঙ্গা কুণ্ড তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বলে জনশ্রুতি প্রচলিত।

এর অনুযায়ী দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগের পর বিষ্ণুচক্রে ছিন্নভিন্ন সতীর দেহাংশের জঙ্ঘা (মন) এখানে—এই বক্রেশ্বরে পতিত হয়েছিল। তাই বক্রেশ্বর একান্ন পীঠের অন্যতম,—মহাপীঠ। দেবীর নাম মহিষমর্দিনী। অনেক মহাপীঠেই দেবীর কোন মূর্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু বক্রেশ্বরে মহিষমর্দিনীর শাস্ত্রোক্ত লক্ষণান্বিত একটি নিখুঁত মূর্তি পাওয়া গেছে।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বক্রেশ্বরের উল্লেখ আছে। নিত্যানন্দের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ বনে গেলা একেশ্বর। (আদিখণ্ড)।

অবশ্য শ্রীচৈতন্যদেব এই যাত্রায় বক্রেশ্বর পর্যন্ত যাননি, পরে কোন সময় গিয়েছিলেন কি না, জানা যায় না। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে উজানীর উল্লেখ আছে। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণোক্ত মঙ্গলকোট পরবর্তীকালে উজানী নামে পরিচিত হয়েছে। বীরভূমের অন্তর্গত শিয়ান (বোলপুরের নিকট) নামক স্থানে শ্বেত বসন্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। সম্ভবতঃ ইনি খ্রীষ্টীয় ৪র্থ/৫ম শতকে বর্তমান ছিলেন। ইনি বক্রেশ্বর তীর্থের সংস্কার সাধন এবং বক্রেশ্বরের বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে এ স্থানের মাহাত্ম্য প্রচার করেন।

তবে বক্রেশ্বরের বর্তমান মন্দির যে কোন সময় নির্মিত হয়েছিল তা সঠিক কিছু বলা যায় না। মন্দির গাত্রে প্রস্তর ফলকে 'নরসিংহ' নামাংশ ক্ষোদিত দেখে অনেকে অনুমান করেন যে কলিঙ্গের পরবর্তী পূর্ব গঙ্গা বংশীয় প্রথম নরসিংহ রাঢ় আক্রমন ও লক্ষ্ণৌর (বর্তমান নগর) জয় (১২৪০ খ্রী:) করে বক্রেশ্বরের বর্তমান মন্দির নির্মাণ করে দেন। এ অনুমান সত্য বলে মনে হয়। কেননা নরসিংহ পুরীর বিখ্যাত কোণার্কের মন্দিরও নির্মাণ করেন। এবং উড়িষ্যার দেউলের সাথে বক্রেশ্বরের মিলও যথেষ্ট দেখা যায়। অপর একটি ফলকে 'দর্পনারায়ণ' নামাংশ দেখে পণ্ডিতেরা বলেন লক্ষ্ণৌর রাজা আসাদউজ্জমানের হিন্দু মন্ত্রী দর্পনারায়ণ ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরের উত্তর-পূর্বাংশ নির্মাণ করে দেন।

১৮৬৩ সালে শ্রীচোলানাথ চন্দ বক্রেশ্বরের বিষয়ে লেখেন: "The Sahib-logues of soory take away the water of these hot-wells for their drink··· The shrine of his godship (Bakreswar) stands aloft like Gulliver amongst a hast Lilliputian temples."

প্রধান মন্দিরটিকে ঘিরে রয়েছে ছোট ছোট অনেক মন্দির। প্রধান মন্দিরের নির্মাণে অনেকটা উড়িষ্যার রেখদেউলের রীতি অনুসৃত হয়েছে।

বক্রেশ্বরে শিবরাত্রির সময় একটি বড় মেলা হয়। অষ্টাহকালব্যাপী এই মেলায় ভারতের দূরদূরান্ত থেকে সাধু সন্ন্যাসীর আগমন ঘটে। চতুর্দশী ও অমাবস্যার দিনে স্নান করতে বহু পুণ্যার্থী এখানে আগমন করেন। মেলাটি যে কতদিনের তা কেউ বলতে পারে না। তবে ১১৭২ বঙ্গাব্দের ৯ ফাল্গুন তারিখের রাজনগরের মুসলমান রাজার সনদে এর উল্লেখ পাই।

বীরভূমের সিউড়ি মহকুমার দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত বক্রেশ্বরের আয়তন ১৬৪ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা হাজারেরও কম। জলবায়ুর দিক থেকে বক্রেশ্বর স্বাস্থ্যকর স্থান। কাছেই সাঁওতাল পরগনার লালমাটি। আশে-পাশে খোলামেলা জায়গা ও অঢেল। বীরভূমের রাঙামাটি বক্রেশ্বরকে গৈরিক বসন পরিয়ে উদাসীন করে রেখেছে। কলকাতা থেকে এর দূরত্ব ২২০ কিলোমিটারের মত। হাওড়া ষ্টেশন থেকে সাহেবগঞ্জ লুপে ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যে পৌঁছে যাবেন সাঁইথিয়ায়। সেখান থেকে অণ্ডাল সাঁইথিয়া শাখা রেলপথে সিউড়ি পৌঁছতে লাগবে এই পঁয়ত্রিশ মিনিট। তারপর বক্রেশ্বর পর্যন্ত বাসে তের-মাইল। দুবরাজপুর রেলষ্টেশনেও নামতে পারেন; বক্রেশ্বরের দূরত্ব এখান থেকে আট মাইল মাত্র। সাঁইথিয়া থেকে বাসেও সোজা বক্রেশ্বর যেতে পারেন। আর যদি আপনি শান্তিনিকেতন থেকে বক্রনাথ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্যুরিষ্ট লজের ট্যুরিষ্ট ট্যাক্সি আপনাকে সোজা বক্রেশ্বরে পৌঁছে দেবে।

বক্রেশ্বরের প্রধান আকর্ষণ উষ্ণ প্রস্রবণগুলি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে এই প্রসঙ্গে উষ্ণ প্রস্রবণে ভূ-গর্ভ থেকে যে জলরাশি নির্গত হয় তার উত্তাপের কারণ অনুধাবন যোগ্য দুটি কারণ থাকতে পারে: (ক) বৃষ্টির জলের যে অংশ মাটির নীচে যায় তা ভূ-তলের কোন উত্তপ্ত শিলার সংস্পর্শে এসে গরম হতে পারে (জিওথার্মিক অরিজিন)। (খ) পৃথিবীর ভেতরে যে গলিত উত্তপ্ত পদার্থ (ম্যাগমা) থেকে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি হয় তার সংশ্লিষ্ট জল ('জুভেনাইল ওয়াটার') যথেষ্ট গরম থাকে। এই জল মাটির নীচের অন্য জলের সাথে মিশে তাকে গরম করে তোলে। যে সমস্ত প্রস্রবণের জল বৃষ্টির সাথে সাথে বাড়ে না, এবং তাতে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড, গন্ধক ইত্যাদি পাওয়া যায়, জুভেনাইল ওয়াটারই সেই জলের উৎসের কারণ।

পাশ্চাত্যে আইসল্যাণ্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, নিউজি-ল্যাণ্ডে অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ বিশেষ করে গেয়ার (যে গুলিতে ফুটন্ত জল প্রবলবেগে উৎক্ষিপ্ত হয়) আছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইয়োলোষ্টোন ন্যাশনাল পার্ক প্রসিদ্ধ; এখানে তিন হাজার উষ্ণ প্রস্রবণ ও দু'শ গেয়ার আছে।

ভারতে বিহারে, বিশেষ করে রাজগীর ও মুঙ্গেরে, পশ্চিম ভারতের বড়গিরি, ধানো, কোলাবা, হিমালয় অঞ্চলে, পাকিস্থানের সিন্ধু—বেলুচিস্থান অঞ্চলে, এবং চট্টগ্রামে খনিজ প্রস্রবণ আছে।

ব্যালনিওলজি ও ব্যালনিওথেরাপির ফরাসী বিশেষজ্ঞ প্রিয়েরে, ষ্টিফেন এবং মোরের মত, উষ্ণ প্রস্রবণের রেডিওঅ্যাকটিভ, খনিজ জল ও তার বাষ্প গেঁটেবাত স্নায়ুশূল ইত্যাদিতে উপকারী; এই জল বেদনানাশক। উল্লেখযোগ্য, কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত সব রেডিও অ্যাকটিভিটির জলকেও এই প্রস্রবণ-জলের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

ইউরোপের উষ্ণ জলের প্রস্রবণগুলিকে কেন্দ্র করেই প্রাচীনকালে বড় বড় জনপদ গড়ে উঠেছিল। জার্মানী আর ফ্রান্সের উষ্ণ প্রস্রবণগুলি বিশেষভাবে খ্যাত। ওদেশের কূপগুলিকে পরিষ্কার-মার্জিত করে Spa-তে পরিণত করা হয়েছে। Spa গুলি সেখানে খুবই জনপ্রিয়। ভ্রমণ এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য লোকে দলে দলে ভীড় করে। সেখানে ক্লিনিক বা চিকিৎসাকেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছে। যে সকল কূপের জলে খনিজ পদার্থ বেশী (১০০০ এ ১ ভাগের অধিক) আর সুস্বাদু তার জল ভর্তি করে বিক্রী করা হয়। জাপান, আমেরিকা—সব জায়গাতেই এ ব্যাপার, প্রস্রবণগুলির আশে পাশে বড় বড় হোটেল আর স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলে পর্যটকদের কাছ থেকে স্থানীয় লোকেরা দু পয়সা কামাচ্ছে।

এ ছাড়া পাশ্চাত্যে উষ্ণ প্রস্রবণের তাপশক্তি শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। কালিফোর্ণিয়ার গেয়ারগুলির কাছে

কূপ খনন করে ভূ-গর্ভস্থ বাষ্পের সাহায্যে তাপ উৎপাদন করা হচ্ছে। হেলিয়াম বাষ্প আবহাওয়া নিরীক্ষক বেলুন ফোলাতে, ডুবুরির নিশ্বাস প্রশ্বাসের অক্সিজেনের সাথে মিশ্রণের জন্য, বড় বড় এরোপ্লেনের টায়ার ফোলাতেও ওয়েল্ডিং-এ লাগে। বিমান পোতাশ্রয়ের সিগন্যাল, নিয়ন সাইনে ও ফুরোসেন্ট টিউবে মিশ্র বাষ্প প্রয়োজনীয়।

বক্রেশ্বরের মন্দিরগুলির দক্ষিণে আটটি কুণ্ড আছে, তাদের নাম ও তাপমাত্রা যথাক্রমে—

অগ্নিকুণ্ড	৬৭°	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
ব্রহ্মকুণ্ড	৪৮°	" "
ভৈরবকুণ্ড	৬১·৫°	" "
ক্ষীরকুণ্ড	৬৬°	" "
সূর্যকুণ্ড	৬১·৫°	" "
ঈশানকুণ্ড	৩৬°	" "
সৌভাগ্যকুণ্ড	৪৮·৫°	" "
শ্বেত গঙ্গা	৩৬°	" "

প্রতিটি কুণ্ডকে ঘিরে দশফুট গভীর সিমেন্ট আছে; সিমেন্টগুলি জল নির্গমনের পথ ছাড়া সম্পূর্ণ ইটের তৈরী, জল নির্গমনের কোন পথ নেই। তাদের ক্ষেত্রে নয় ফুটের স্কোয়ার থেকে ৭৪×৩০ ফুটের rectangle পর্যন্ত। স্নানাদির সুবিধার জন্য জলে নামার সিঁড়ি আছে। নির্গমন পথ দিয়ে সবসময়ই জল ও বাষ্প বেরোচ্ছে। এইসব কুণ্ডগুলির জল গিয়ে পাপহরা গঙ্গা নামে জলাশয়টিতে পড়েছে; পাপহরা গঙ্গার উৎপত্তি বৈতরণী ঘাট (৫০° সেন্টিগ্রেড), আর এখান থেকে জলে গিয়ে ২০০ গজ ঘুরে বক্রেশ্বর নদীতে পড়ছে; পাপহরা গঙ্গার জলের তাপমাত্রা ৩৮°-৪২° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে; এই কুণ্ডটিই স্নানের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। শ্বেতগঙ্গাও স্নানের পক্ষে অত্যন্ত আরামদায়ক। সৌভাগ্যকুণ্ডের জল স্বচ্ছ, কিন্তু অতি প্রত্যূষে এই জল সাদা দুধের মত রঙ ধারণ করে। সম্ভবতঃ জলে কলয়ডাল সালফারের কোয়াগুলেশন তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল এই-ই এর কারণ।

পাপহরা গঙ্গা ও কুণ্ডগুলির জলের পাপক্ষালনের ক্ষমতা নিয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। ছয়টি কুণ্ডে, বিশেষ করে ভৈরবকুণ্ডে র‍্যাডনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য; র‍্যাডন গুণে হেলিয়াম, আর্গন, নিয়ন, ইত্যাদির প্রায় সমান।*

ওডহাম ও টি ভি রা টুচ প্রথম কুণ্ডগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। ১৯৩৯ সালে জিওলজিক্যাল সার্ভের অধ্যক্ষ স্যার সিরিল ফক্স ভারতে সমস্ত উষ্ণ কুণ্ডগুলির বিশদ অনুসন্ধানের জন্য এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। বক্রেশ্বরের কুণ্ডগুলিও এ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এঁরা অবশ্য অগ্নিকুণ্ড আর ব্রহ্মকুণ্ড এই দুটি মাত্র কুণ্ড পরীক্ষা করে দেখেছেন। তেজস্ক্রিয়তার দিক থেকে ইউরোপের কুণ্ডগুলির সঙ্গে তুলনা করে বক্রেশ্বরকে এরা মাঝারি পর্যায়ে ফেলেছেন। সম্প্রতি ১৯৫৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় বক্রেশ্বরের কুণ্ডগুলি সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ডঃ শিবসুন্দর দেব ও অন্য কয়েকজন ভূতাত্ত্বিকের সাম্প্রতিক পরিকল্পনায় ক্যালিফোর্ণিয়ার মত বিদ্যুৎ উৎপাদনে বক্রেশ্বরের কুণ্ডগুলির ভূগর্ভস্থ বাষ্প ব্যবহারের বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। রোগহর ও শিল্পগুণ—বক্রেশ্বরের জলের এই উভয়গুণ সম্পর্কেই বিশদ্ অনুসন্ধান প্রয়োজন।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ বক্রেশ্বরে স্নানার্থীদের সুবিধার জন্য একটি Bathing Pool নির্মাণ করেছেন; কতকগুলি কুণ্ডের জল এখানে জমা হচ্ছে। কয়েকটি স্নানাগারও নির্মিত হয়েছে; সেগুলিতে ব্যবহারের জন্য প্রস্রবণের উষ্ণ জল সরবরাহ করা হচ্ছে। পর্যটন বিভাগ বক্রেশ্বরের কুণ্ডগুলিকে কেন্দ্র করে একটি পর্যটন নগরী নির্মাণের পরিকল্পনা রূপায়ণের কথা বিবেচনা করছেন।

* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্যের মতামত।

(৬৪ পৃষ্ঠার পর)

তারই সর্বশেষ হুকুম এই বোনাটা। সামনে ভরা শীত আসছে। কে আর তার ছেলের জন্য অর্ডার মাফিক জিনিস তৈরি করে বসে আছে। অতএব নিজেই এক রাশ উল আর কাঁটা এনে দিয়েছে। বোনো বসে বসে, যে কটা পারো তৈরি করে রাখো, বেশি হবে না—নার্সিং হোমেও কত শিশুর আমদানী হয় যাদের দরকার অথচ পায় না।

এমনি আবোল তাবোল কথায় অনেক বকাঝকি করে শেষে বুনতে বসিয়ে ছেড়েছে তাকে। দু'দিন একদিন পর-পরই এসে দেখে যায়, বোনা এগুচ্ছে না ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে।

তার অনুপস্থিতিতে আধা-রাগে আর আধা-কৌতুকে সমরেন্দ্রকে ললিতা বলেছে, ছেলে বা মেয়ে যে-ই আসুক, নাম-টাম গুলোও ঠিক করে রেখে দাও, শেষে দেরি হয়ে যাবে না!

সমরেন্দ্র তখন জবাব দেয়নি, পরে অনিমেষের সামনেই ফাঁস করে দিয়েছে। হাসি মুখেই অনিমেষ মন্তব্য করেছে, সমরেন্দ্রর ছেলের নাম হওয়া উচিত গণ-গোলেন্দ্র—যা একখানা দেখাচ্ছ তোমরা—এই দেশেই কিনা পপুলেশান প্রোবলেম!

আস্তে আস্তে বোনাতেও মন এসেছে ললিতার। কেবল ওই বিকেলের সময়টুকু ছাড়া। জানলার ধারে চেয়ার টেনে চিলড্রেনস পার্কের দিকে মুখ করে বসলে কিছু আর মনে থাকে না। দু'চোখ ভরে দেখে ললিতা। দেখে আর একটা সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা একেবারে যেন কল ধরে চোখের সামনে এগিয়ে আসে। ডাক্তার অনিমেষ গাঙ্গুলি যা চেয়েছিল, ললিতার মনের তলায় সেই বিশ্বাস-টুকুই জমে থানা বেঁধে উঠেছে। ভয়ের ছায়া এখনো পড়ে, কিন্তু এমনভ নিজেই সেটা ঝেড়ে ফেলে সহজ হতে চেষ্টা করে।

কিন্তু এবারে যে বিরাট ঘটে গেল তার জের সামলাতে ললিতা যমুর প্রাণ সংশয়। কৃতী ডাক্তার অনিমেষ গাঙ্গুলিরও গণদধর্ম অবস্থা।

শেষের দু'মাসের মাথায় হঠাৎ অঘটন দেখা দিল একদিন। ডাক্তারী ভাষায় যার নাম কনসিলড্ আন্টি-পেটাল হেমারেজ। পেশীর অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণ। সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় নার্সিং হোমে সরানো হল তাকে। রোগিণী বাঁচানোর একমাত্র পথ—অপারেশন। সহজ অপারেশন নয়। সে অপারেশনের ফলে ভবিষ্যতে সন্তান-ধারণের সমস্ত সম্ভাবনা নির্মূল। আর, যে আসতে পারত, এই দুর্ঘটনায় সঙ্গে সঙ্গে সেও গেছে।

কিন্তু রোগিণী বাঁচানোই প্রধান সমস্যা তখন। ভাবার অবকাশ নেই। বন্ধুর দুই হাত ধরে সমরেন্দ্র বলেছিল, যেমন করে হোক ললিতাকে বাঁচাও ভাই, আমি আর কিছু চাইনে।

অপারেশন হয়ে গেল। ললিতা বাঁচল। কিন্তু এই বাঁচা সে বাঁচতে চেয়েছিল কিনা তা সে জানে না।

তার মনের দিক থেকে এবারে যে বিপর্যয় ঘটে গেছে, সেটা সে সামলাবে কি করে, অনিমেষ গাঙ্গুলিও ভেবে পায় না।

তবু ললিতাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, সন্তান হয় না এরকম তো কত দম্পতির আছে। এ নিয়ে আর ভেবে মন খারাপ করে কি লাভ।

ললিতা হাসতেই চেষ্টা করেছে। বলেছে, মন খারাপ তো তোমাদেরই বেশি হয়েছে, আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি।

টানা দু'মাসের আগে নার্সিং হোম থেকে তাকে ছাড়তে রাজি হয়নি অনিমেষ গাঙ্গুলি। ছেড়েছে যখন, ললিতার শারীরিক দিকটা মোটামুটি—সুস্থ।

বিকেলের দিকে বাড়িতে আসার কথা ছিল তার। কলেজ ফেরত সমরেন্দ্রই তাকে নিয়ে আসবে। কিন্তু কলেজে সে টেলিফোন পেল, ললিতা এখনই বাড়ি ফেরার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, শনিবারের বার বেলায় যাবে না, অতএব অনিমেষ তাকে নিয়ে রওনা হচ্ছে।

কলেজ ফেলে সমরেন্দ্র বাড়ির দিকে ছুটল। দোতলায় পা দিয়েই তার মেজাজ বিগড়লো। দেখে, ললিতা শোবার ঘরের ইজিচেয়ারে শ্রান্ত দেহ এলিয়ে বসে

আছে। তার সামনের একটা চেয়ারে অনিমেষ বসে। আর ওদের চোখের সামনে দিয়েই পরিচারিকা সুহাসিনী সেই সব বড় বড় পুতুল, প্যারামবুলেটার, খোনার সরঞ্জাম ইত্যাদি সরাচ্ছে।

বেচারী সুহাসিনীর দোষ নেই। ডাক্তারবাবু তাকে বলে রেখেছিল, বিকেলে বউদি আসছে—তারমধ্যে ওই সব জিনিসপত্র একেবারে চোখের আড়াল করে সরিয়ে রেখে যেন ঘর পরিষ্কার করে রাখা হয়। সুহাস ভেবে রেখেছিল, দিনের কাজ-কর্ম সেরে দুপুরের নিরিবিলিতে নির্দেশমত ঘর গুছিয়ে রাখবে। এই সকালের দিকেই চলে আসবে হঠাৎ, কে ভেবেছিল?

ইজিচেয়ারে বসে তার উদ্দেশ্যে চাপা গর্জন শুনল ললিতা। সকালে যা করতে বলা হয়েছিল কেন তক্ষুনি তা করে রাখা হয়নি। ঠিক শোনা না গেলেও ব্যাপারটা বুঝল ললিতা। বলল, এ নিয়ে তোমাকে এখন রাগা-রাগি করতে হবে না, ভিতরে এসো।

সমরেন্দ্র ভিতরে এসে দাঁড়াল। বিব্রত মুখ। এই মুখ দেখে উল্টে তারই মায়া হল কেমন। পিছনে ভয়ে জড়-সড় সুহাস এসে দাঁড়িয়েছে। ঘর থেকে আরো কিছু নেবার আছে।

ললিতা তাকে বলল, এখন আর কিছু নাড়াচাড়া করতে হবে না, তুমি যাও। সুহাস চলে যেতে আবার বলল, ওগুলো যেখানে সেখানে গুদোম করে না রেখে তোমার বন্ধুর নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিও—যে পাবে সে-ই খুশি হয়ে নিয়ে যাবে।

সমরেন্দ্র চুপ। অনিমেষ গাঙ্গুলিও চুপ।

তিন মাস বছর ঘুরে গেল। ললিতার স্বাস্থ্য ফিরেছে। বাইরের চেহারাটা আগের থেকে আরো বেশি উজ্জ্বল হয়েছে। অনিমেষ এসে আগের মতই ললিতা সখী বলে হাঁক দেয়। হাসি ঠাট্টা করে, টিকা-টিপ্পনী কাটে। কিন্তু ভুলেও কখনো বাচ্চা-কাচ্চা বা ছেলে-পুলে সম্পর্কে একটি কথাও বলে না।

ললিতা আগের মতই গাড়ি হাঁকায়, সমরেন্দ্র আগের মতই বকাবকি করে তাকে, সতর্ক করে। সবই আগের মত চলছে। কিন্তু একমাত্র ললিতাই অনুভব করে, তার জীবনের একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে গেছে। একটা নিশ্চিত পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেছে তাতে। এখন সেই 'আগের মতটুকু'ই সব—তাই নিয়েই থাকতে হবে তাকে। পরের আশা কিছু নেই, আশ্বাস কিছু নেই। তাই সহজ হবার তাড়নায় সে সম্পূর্ণ আগের মত হয়ে উঠতে চেয়েছে।

পেরেছে। সমরেন্দ্র অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করেছে। ক্রমে দুর্ভাবনা কমে এসেছে অনিমেষ গাঙ্গুলিরও।

কিন্তু ব্যতিক্রম হঠাৎ এক একসময় টের পায় পরিচারিকা সুহাসিনী। তার ধারণা, বউদি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে যখন একলা থাকে। এক কথা বলতে এসে আর এক কথা বলে। ডেকে পাঠিয়ে ভুলে যায় কি জন্য ডাকল। তারপর নিজেই অপ্রস্তুত হয় কেমন। তা ছাড়া আর একটা ব্যাপারও লক্ষ্য করেছে সুহাস। বিকেলে বাড়ি থাকলে জানলার ধারে আর ইজিচেয়ার টেনে বসে না বউদি। সজ্ঞানে সেখানে দাঁড়ায়ও না, পার্কে ছেলেপুলেগুলোর হুটোপুটি দেখে না। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতে যেন কখনো সখনো ওই জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়ে যায়। তখন এক অদ্ভুত অন্যমনস্ক মূর্তি বউদির। তখন মনে হয়, পার্কের ওই বাচ্চাগুলো বুঝি বউদির বুকের উপর দিয়ে দুপ-দাপ করে খেলা করে বেড়াচ্ছে, আর বউদি নিঃশব্দে একটা যাতনা সহ্য করে চলেছে।

এ-সব সুহাস নিজেই দেখে আর নিজেই সাত পাঁচ ভাবে—কিন্তু কাউকে কিছু বলতে হবে না।

একে একে আরো দুটো বছর কেটে গেল। ললিতা তিরিশের ওধারে পা দিয়েছে। কিন্তু বয়সের পদক্ষেপ এখনো ভালো রকমই ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছে সে। অনিমেষ গাঙ্গুলি লাগামছাড়া রসিকতা করে বসে এক-এক সময়। সেদিন চোখ পাকিয়ে বন্ধুকে বলছিল, ওহে মিতাচারী শুকনো অর্থনীতি ঘেঁটে যে কি সুখ পাও তুমিই জানো—ঘরে যে ওদিকে তন্ত্র-শাসনের বাঁধ উপচে উঠছে সেদিকে চোখ আছে, না কি?

আত্মীয় পরিজন বা সঙ্গিনীদের সঙ্গে দেখা হলে তারা বলে, বাড়া হাত-পায়ে বেশ সুখে আছো ভাই—আমরা সংসার পঙ্কে ডুবেই গেলাম।

ললিতা হাসে। মুখে বলেও হয়ত কিছু। কিন্তু বুকের ভ্যালায় কোথায় যেন বাতাসের অভাব বোধ করে। নিজে দেখতে পায় না সব-সময়, অপরে তো পায়ই না।

কিন্তু আরো কিছু বাকি ছিল। পায়ের তলার মাটি সরে যাবার মতই ঘটনা বা দুর্ঘটনা একটা।

সেটা ছিল বিয়ের তারিখ আবার অন্নপ্রাশনেরও দিন। এক কথায় শুভ দিন। কিন্তু ললিতার জীবনের সব থেকে দুর্বিপাকের দিন বোধ হয় সেটাই।

অনিমেষ গাঙ্গুলির একটি বোনের বিয়ে। সে আগে থাকতেই বলে রেখেছে, এ বিয়ের কর্তা-কর্তা কেউ নেই, কর্তা-কর্ত্রী আছে—সে ললিতা সখী। অতএব দু'দিন আগে থাকতে তার বাড়ি গিয়ে থাকলে ভালো হয়। ললিতাকে ক'দিন ধরেই বিয়ে বাড়িতে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। অনিমেষের স্ত্রী আর অন্য সকলেও নিতান্ত আপনার জন তাদের। কিন্তু বিয়ের আগের দিন বেশ ঝুটঝামেলার ব্যাপার হল একটা। চন্দন-নগর থেকে মাসি-শাশুড়ী এসে হাজির। বোন পো'র সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন ভদ্রমহিলা। সময়ে অ-সময়ে খোঁজ খবর করেন, বছরে দু'চার দিন অন্তত জোর করেই ললিতাকে ধরে এনে নিজের বাড়িতে রাখেন। যথেষ্ট আদর যত্নও করেন।

এবারে তার আসার হেতুও এক নেমন্তন্নের ব্যাপার। মাসি শাশুড়ীর তিন মেয়ে। তাদের মধ্যে ছোট মেয়ের প্রথম ছেলের অন্নপ্রাশন। যেদিন অনিমেষ গাঙ্গুলির বোনের বিয়ে, সেই দিনই। কিন্তু মহিলাকে বোঝান দায়। বন্ধুর বোনের বিয়েটা নিজেদের ঘরের কাজের থেকেও বড় করে দেখার মত কোনো যুক্তি মানার কারণ নেই তাঁর। ইচ্ছে, বোনপো না থাকুক, ললিতা তাঁর সঙ্গে আজই যাবে এবং দিন-কতক থেকে আসবে। তিনি না-ছোড়।

অগত্যা কষসালা করতেই হল একটা। স্থির হল, পরদিন ললিতা একাই যাবে, কিন্তু বিকেলের মধ্যেই ফিরতে হবে তাকে। আর, সমরেন্দ্রের গাড়ে বিয়ে বাড়ির এত দায়িত্ব যে তার নড়ার উপায় নেই। মাসি খুশ হলেন, কিন্তু অগত্যা এই ব্যবস্থাতেই রাজি।

ললিতার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না একটুও, কিন্তু নিরুপায় হয়ে পরদিন সকালে গাড়ি নিয়ে বেরুতে হল। সমরেন্দ্র বার বার বলে দিয়েছে, বিকেলের মধ্যে যেন অবশ্য চলে আসে, এসে সোজা বিয়ে বাড়িতে চলে যায় যেন। ললিতা তাকে নিশ্চিন্ত করেই বেরিয়েছে। যেতে এক-ঘণ্টা আসতে এক ঘণ্টা, বিকেলের মধ্যে ফিরতে না পারার কোন কারণ নেই। সম্ভব হ'লে অনেক আগেই ফিরবে। আর, বাড়ি হয়েই তারপর বিয়ে বাড়ি যাবে। এই সকালের জামা-কাপড় না বদলে যায় কি করে? তার থেকে বাড়ি এসে তৈরি-টৈরি হয়ে সুহাসিনীকে নিয়ে বিয়ে বাড়িতে চলে যাবে। বলে গেল, সুহাসিনী যেন বাড়িতে থাকে।

বাইরে ফুর্তির অভাব নেই ললিতার। কিন্তু কেন যেন মাসি-শাশুড়ীর বাড়ির উৎসব খুব ভালো লাগল না ললিতার। মাসি শাশুড়ীর আদর যত্নের ত্রুটি নেই, অনেকে বরং তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তবু না। কেবলই মনে হয়েছে, কতক্ষণে আবার বেরুতে পারবে সে।

বাড়িতে বাচ্চা-কাচ্চা ভরতি। মাসি শাশুড়ীর বড় দুই মেয়ের তিনটে চারটে করে ছেলে মেয়ে। মেজ মেয়ের ছোট বাচ্চাটার অটি ন'মাস মাত্র বয়েস। এ ছাড়া মাসি শাশুড়ীর সেজবরের ঘরের শিশু-বাহিনীটিও ছোট নয়। তাদের দাপটে আর দৌরাত্ম্যে ললিতার মাথাটা ঝিমঝিম করছে সেই থেকে। কেন যে তার পালাতে ইচ্ছে করছে নিজের কাছেও স্পষ্ট নয় খুব।

কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই পালানো যায় না। খাওয়া দাওয়া সারা হতে দুপুর গড়িয়ে গেল। তারপর মাসি শাশুড়ী বিশ্রাম না করে যেতে দিলেন না। এদিকে বিকেলের আগেই বাড়িতে আরো অতিথি-অভ্যাগত এসেছে। সকলে সেদিকে ব্যস্ত!

হঠাৎ কোণের দিকের একটা ঘরে তারস্বরে শিশুর কান্না শুনে সচকিত হল ললিতা। কিন্তু সকলে এত ব্যস্ত যে সেদিকে কারো কান নেই। ললিতা সেই ঘরে ঢুকে দেখে ঘাসি শাশুড়ীর মেজ মেয়ের সেই আট ন'মাসের ছোট ছেলেটা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। ঘুমচ্ছিল। ঘুম ভাঙাতে এই চিৎকার। নিজের চিৎকারে নিজেরই দম বন্ধ হওয়ার দাখিল।

ললিতা তাড়াতাড়ি ডাকতে এলো কাউকে। ওর মায়েরই দেখা পেল। কিন্তু কিছু একটা করছে, তার দু'হাত জোড়া। বলল, কাঁদবেই তো, ওর খিদে পেয়েছে —তুমি একটু ধরো না দিয়ে, হাতের কাজটা সেরে আমি আসছি।

ঘরে এসে ললিতা দেখে কান্নার দাপটে শিশুটা একেবারে নীলবর্ণ। তাড়াতাড়ি তুলে নিল। কিন্তু কান্না থামানো দায়। কাঁকিয়ে দুলিয়েও থামানো গেল না। শেষে বুকের কাছে চেপে ধরে পিঠ চাপড়াতে লাগল।

আর, তখনি রোমাঞ্চকর বিভ্রাট একটা। কান্না থামিয়ে ব্যগ্র শিশু তার বুকে মুখ গুঁজে কি যেন খুঁজতে লাগল।···বুকের মধ্যে বার বার মাথাটা গুঁজে গুঁজে সে তার রসদ খুঁজছে আর মুখ দিয়ে অস্ফুট মুন্-মাম্ শব্দ বার করছে।

কি-যে ঘটে যেতে লাগল বুকের ভিতরে ললিতা জানে না। শিশুটা বুঝি তার অবশ হাত থেকে মাটিতে পড়ে যাবে। সেই ভয়েই আঁকড়ে ধরে আছে তাকে। আর শরীরের সমস্ত রক্ত বুঝি সিড়সিড় সিড়সিড় করে পা বেয়ে নেমে যাচ্ছে।

···মাম্ মাম্···মাম্-মাম্···। আরো রেগে গিয়ে শিশুটা তার বুকের মধ্যে আরো বেশি মুখ ঘসছে আর মাথা খোঁড়াখুড়ি করছে।

কি-যে হচ্ছে কে জানে, ললিতা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। কিছু একটা বুঝি ঘটেই যাবে এক্ষুণি। অবশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোনরকমে সক্রিয় করে তুলে দ্রুত ঘর ছেড়ে বাইরে এলো ললিতা, তারপর ওর কর্মরত মায়ের কোলেই শিশুটাকে ফেলে দিল ধুপ করে। অস্ফুট স্বরে বলল, আমি পারছি না, তুমি ধরো ভাই।

বলার জন্য নয়, ললিতার মুখের দিকে চেয়েই ওই শিশুর মা অবাক।

গাড়ি কলকাতার পথে ছুটেছে। সামনের কাঁচায় কত শীত উঠেছে সেদিকে চোখ নেই। ললিতার সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ।

···মাম্ মাম্···মাম্ মাম্···মাম্···মাম্।

কান দুটো কি কালাপালা হয়ে যাবে ললিতার? আর বুকের মধ্যেও একটা স্পর্শ যেন আকুলি-বিকুলি করছে। অসহ্য যাতনায় ললিতার মনে হচ্ছে, এই বুক ফেটে প্রাণটাই বুঝি বেরিয়ে যাবে এক্ষুণি। তাই ছোটার তাড়না, পালাবার তাড়না।

···মাম্-মাম্···মাম্-মাম্···মাম্-মাম্···

প্রাণপণে অকস্মাৎ ব্রেক কষল ললিতা। আগেই দেখেছে একটা বাচ্চা ছেলে হঠাৎ এক দৌড়ে রাস্তা পার হতে চেষ্টা করল। চোখ বুজে ফেলে সমস্ত শক্তি দিয়েই ব্রেক কষেছিল ললিতা। তবু রক্ষা করা গেল না—বেশ জোরেই ধাক্কা খেয়ে সাত-আট হাত ঘুরে ছিটকে পড়ল ছেলেটা। আর, আর অত জোরে ব্রেক কষার ফলে গাড়িটা চাকা ঘষে প্রচণ্ড শব্দ করে রাস্তা ছাড়িয়ে এবড়ো-খেবড়ো মাটির ওপর দাঁড়িয়ে গেল।

দিশে হারা ত্রাসে ললিতা গাড়ি থেকে নেমে ছুটল ছেলেটার দিকে। মাথা ফেটে রক্ত ছুটেছে। তুলে নেবার জন্য ললিতা ঝুঁকে পড়ল তার ওপর। দু'চোখ টান করে ছেলেটা একবার দেখল তাকে, তারপর জ্ঞান হারালো।

এদিকে প্রায় বিশ-তিরিশটি মূর্তি ছুটে এসেছে ততক্ষণে। কতগুলো বাচ্চা-কাচ্চা আশ-পাশের বস্তির আট-দশটা মেয়েছেলে, আর পাঁচ-সাত জন পুরুষ। চেঁচামিচি, আর্তনাদ, হট্টগোল।

তাদের মধ্যে একজন, চাবারে কঠিন চেহারার লোক, একটা চোখ পাকিয়ে এগিয়ে এলো ললিতার দিকে। চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে যেন তার। বলে উঠল, মেম-

সাহেব বনে গেছেন একেবারে, কেমন পরিবের ঘাখা খেতলে দিয়ে গাড়ি হাঁকাতে খুব ভালো লাগে, অ্যাঁ?

ললিতা নিস্পন্দ কাঠ। অস্ফুটস্বরে বলতে চেষ্টা করল, ছেলেটাকে একুণি হাসপাতালে···

.—থাক, থাক, আর দরদ দেখাতে হবে না, তোমাদের মত গাড়ি-হাকানে। নচ্ছাড় চরিত্রের মেয়েছেলে আমি অনেক দেখেছি—

ওদিকে থেকে একটা মেয়েলোক চেঁচিয়ে উঠল, ও বলাইদা, মিঠুকে তোলো শিগগীর, ওখানে করছ কি, গেল যে!

দু'চোখে আর এক-প্রস্ত আগুন ছড়িয়ে লোকটা বলল, বোলো, দেখাচ্ছি মজা—

বলতে বলতে তাড়াতাড়ি আহত ছেলেটার কাছে গেল। দু'হাতে রক্তাক্ত ছেলেটাকে তুলে নিয়ে রাস্তা ছাড়িয়ে গজ বিশেক দূরের চালা ঘরের দিকে ছুটল সে। অনিমিক্ত লোকের ব্যাপার, বড় পুরুষ ক'জন আর মেয়েছেলেরাও উদগ্রীব মুখে পিছু নিল তার। বাচ্চা ছেলেগুলোরও কেউ কেউ ওদিকে এগিয়েছে, কেউ বা হাঁ করে ললিতাকে দেখছে।

কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। ত্রাসে সর্বাঙ্গ কাঁপছে ললিতার। কিন্তু চোখের সামনে যেন নিজের মৃত্যু দেখছে সে। চোখের পলকে গাড়িতে উঠে বসল সে। তারপর চোখ-কান বুজে সবেগে গাড়ি চালিয়ে দিল আবার।

ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতা থেকে মাত্র মাইল বারো দূরে। বাড়ি পৌঁছুতে আর ঘণ্টাও লাগল না ললিতার।

তার মুখের দিকে চেয়ে সুহাসিনী আঁতকে উঠল—। তোমার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি বউদি, এ-রকম দেখাচ্ছে কেন?

—না, খানিকক্ষণের মধ্যেই তৈরী হয়ে নাও, আমি আসছি।

নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। নিস্পন্দের মত বসে রইল খানিক, কিন্তু ভিতরটা কাঁপছে থর-থর করে।

···এ-কি করল সে? আহত ছেলেটার সেই কচি কোমল মুখ, আর তার মুখের উপর সেই একটা চাউনি—যে চাউনি দিয়ে তার আঘাতকারিণীকে একবার মাত্র দেখে নিয়েছিল—সে-সব যেন বুকের মধ্যে কেটে কেটে বসছে এখন। সে পালিয়ে এলো, ছেলেটা যে রক্তপাত হয়েই মরে যাবে! কিন্তু পালাতে পারেনি। ভাবতেও কাঁপুনি। ওই নির্দয় মূর্তি লোকটা কি করত, কি প্রতিশোধ নিত কে জানে। অমন ভয় না পাইয়ে দিলে ললিতা তো ছেলেটাকে হাসপাতালেই নিয়ে আসত।

সর্বাঙ্গ অবশ, মৃতের মত ঠাণ্ডা হাত পা। তবু বাথরুমে ঢুকে স্নান করল অনেকক্ষণ ধরে। বেরিয়ে এসে প্রসাধন করল, বিয়ে বাড়ি যাবার মত সাজ পোষাক করল—কিন্তু তার চোখের সামনে থেকে-থেকে তামাম দুনিয়াটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে বুঝি।

বিয়ে বাড়িতে সমরেন্দ্রও এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে কি-রকম যেন দেখাচ্ছে, শরীর ভালো তো?

ললিতা বলল, না, ভয়ানক ক্লান্ত।

একাই বাড়ি চলে এলো তাড়াতাড়ি। শরীর খারাপ হয়েছে ভেবে অনিমেষও আপত্তি না করে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিল তাকে।

সমরেন্দ্র ফিরল অনেক রাতে। ললিতা জেগে তখনো। কিন্তু মরার মত পড়ে রইল। ভয় ধরেছে তার। এ ভয় থেকে আর বুঝি মুক্তি নেই। সমরেন্দ্রকেও ভয় তার। জোরে গাড়ি চালানোর ব্যাপারে কতবার নিষেধ করেছে, কতবার সতর্ক করেছে, ঠিক নেই। সেই সবও শুধু ভয়ের আকারে ছেঁকে ধরছে তাকে। ভোরের দিকে তন্দ্রা এসেছিল, ঘুম নয়।

···মাম্···মাম্,···মাম্-মাম্···মাম্···মাম্···

···রক্তাক্ত কচিছেলের মুখ একটা—শেষ চাউনির মত চাউনি একটা···

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেছে ললিতা বসু। ঘামছে দর-দর করে।

সমরেন্দ্রর বকাবকির চোটে কাছে না এসে পারল না ললিতা। বকুনি আর বিরক্তি সুহাসিনীর উদ্দেশে।

জানে কি ঘটতে পারে, শুধু ললিতাই জানে। তবু জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে ?

তিক্ত মুখ করে সমরেন্দ্র বলে উঠল, কি আর হবে, এই সব কি চাকরগুলো বা হয়েছে আজ কালকার। কাগজের মাকের সিটটা নেই, খুঁজতে বললাম, তাও এসে বলছে পাওয়া যাচ্ছে না—আজকের কাগজ, উড়ে গেল একেবারে।

ললিতা বিশেষ বিরক্ত হঠাৎ।—তোমার একটুতেই এত রাগ কেন, এক সিটকাগজ পাচ্ছ না বলে বাড়ি একেবারে মাথায় করে তোমার কি আছে, এক ঘণ্টা ধরে খবরের কাগজ পড়ে রোজই তো উদ্ধার করছ সবকিছু।

কি ব্যাপারে কি কথা ! সমরেন্দ্র অবাক। স্ত্রীর এ-রকম মেজাজ শিগগীরও দেখেনি। একটু লক্ষ্য করেই মনে হল মুখখানা বিবর্ণ পাংশু। একদিনের মধ্যে যেন বিরাট কিছু একটা ধকল গেছে তার ওপর দিয়ে।

বার করেক জিজ্ঞাসা করেছে এর পর, কি হয়েছে, শরীর ভালো আছে কিনা, ললিতা তাতেও বিরক্ত।

আজ আর কলেজে যাবে না ভেবেছিল। কিন্তু সময় হতে আর বাড়িতেও ভাল লাগল না। খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে গেল।

দুপুরটা ছটফট করে কাটালো ললিতা। বার করেক টেলিফোনের সামনে গিয়েও ফিরে এলো। বিকেল চারটে না বাজতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। সুহাসকে বলে গেল দাদাবাবু ফিরলে যেন বলা হয় একটা কাজে বেরিয়েছে।

একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা অনিমেষের নার্সিং হোমে চলে এলো। এসে দেখে সে-ও এক কেস নিয়ে ব্যস্ত। তবু দেখা হতে জিজ্ঞাসা করেছে, কি ব্যাপার ?

ললিতা জানালো খুব দরকারী কথা আছে, সময় লাগবে।

অনিমেষ অবাক। মুখ দেখেই মনে হয়েছে বিশেষ কিছু ঘটেছে। চটপটে জবাব দিল, আচ্ছা, আধঘণ্টাখানেক বোসো, হাতের কাজটা সেরে নিই।

ললিতা বসে আছে। আধঘণ্টা সময় ক্লান্তিকর রকমের দীর্ঘ মনে হচ্ছে তার। কিন্তু এ সময়টুকু নির্বিঘ্নে কাটল না। চমকেই উঠল ললিতা। ঘরে ঢুকেছে সমরেন্দ্র। তাকে দেখে অবাক।

—তুমি এ-সময়ে ?

সামলে নিতে চেষ্টা করল ললিতা, হেসেই ফিরে জিজ্ঞাসা করল, তুমিই বা এ-সময়ে কেন ?

সমরেন্দ্র বলল, কালকের কিছু হিসেব-পত্র ওকে বুঝিয়ে দেবার জন্ত, কিন্তু তোমার কি হয়েছে ?

—কিছু হয়েছে বোধহয়, সেটা ডাক্তারের বিবেচনা-সাপেক্ষ।

বলতে বলতে চোখ পড়ল টেবিলের ওপরের খবরের কাগজটার ওপর। সমরেন্দ্র কিছু জিজ্ঞাসা করার আগে ললিতা সেটা টেনে নিল, ওটা দেখার ছলে মুখও আড়াল করা গেল খানিকটা। এ-সময় ঘরের লোককে দেখে তার মনে হয়েছে তার অপরাধের সব থেকে কঠিন দণ্ডদাতা তার সামনে উপস্থিত যেন।

সমরেন্দ্র ব্যস্ত হয়ে উঠল, আমি কালই বুঝেছি কিছু হয়েছে, আমাকে বলছ না কেন ?

—সাফালাকি আর চেঁচামিচি করবে বলে।

—আঃ, কি কষ্ট হচ্ছে তাই বলো না ?

—জীবনটা আর বইতে ইচ্ছে করছে না। হল ?

বলার ভঙ্গিটা কেমন যেন ধারধার। সমরেন্দ্র আর জিজ্ঞাসাবাদ করল না।

দু'জনকে দেখে অনিমেষ কি একটা হাল্কা ঠাট্টা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু আড়াআড়ি ঘর থেকে বেড়িয়েছে বলে খবরের কাগজের আড়ালে ললিতার মুখখানা শুধু সে-ই দেখতে পেল। পায়ের শব্দ শুনে সামনে কাগজটা ধরে রেখেই সেও তার দিকে ফিরে তাকিয়েছে। তার দুই চোখে কি-যেন করুণ মিনতি।

বুদ্ধিমান মানুষ, এক-মুহূর্তে গলার সুর পাল্টে ফেলল। চিকিৎসক সুলভ হাল্কা ব্যস্ততায় বলল, আচ্ছা, এসো ম্যাডাম, দেখি কি গণ্ডগোল বাধালে আবার। সমরেন্দ্রর

দিকে ফিরে তাকালো, কি হে, এক-ঘণ্টাও সবুর সইল না, ওমনি পিছনে পিছনে এসে হাজির।

সমরেন্দ্র জবাব দিল, না, আমি কলেজ-ফেরত এসেছিলাম কালকের হিসেবগুলো বুঝিয়ে দিতে, এসে দেখি এখানে বসে আছে। কি হয়েছে বলো তো?

এই সামান্য প্রশ্নেও ললিতার বিরক্তি, খবরের কাগজটা হাতে করে উঠে দাঁড়াল, সবেতে এত ব্যস্ত হও কেন তুমি, এই জন্যেই তো কিছু বলি না—না দেখে বলবে কি করে কি হয়েছে? হিসেব পরে দাখিল কোরো, এখন বাড়ি যাও, আমি তোমার বন্ধুর বাড়ি হয়ে তবে ফিরব, কাল তাড়াহুড়ো করে চলে এলাম, আজ একবার যাবার জন্য সুমিতা বার বার করে বলে দিয়েছিল।

আর না দাঁড়িয়ে কাগজ হাতে ললিতা ভিতরের চেম্বারে ঢুকে গেল। এবারে সমরেন্দ্র প্রায় অস্ফুট ইশারার মত ক'রে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার?

ভিতরে ভিতরে চিন্তিত অনিমেষও কম নয়। সুমিতা তার স্ত্রী—তার বাড়িতে যাবার কথাটা যে-ভাবে বলল, তাতে সে বরং বেশি অবাক হয়েছে। গোপন করার মত কি এমন থাকতে পারে ললিতার, ভেবে পেল না। জবাব দিল, অস্বস্তি কিছু একটা হচ্ছে, আবার হেপাটাল রিঅ্যাকশনও কিছু হতে পারে—দেখি পরীক্ষা করে। ও-সব হিসেব-নিকেশ পরে হবে, তোমাকে যা বলল তাই করো এখন, বাড়ি পালাও—আমার ওখান থেকে সুমিতা ওকে না খাইয়ে দাইয়ে ছাড়বে না, আমি পৌঁছে দেব'খন।

চিন্তাচ্ছন্ন মুখেই সমরেন্দ্র বিদায় নিল।

ঘরে ঢুকেই অনিমেষের মনে হল সামনে মৃত মুখ দেখছে একটা। টেবিলে দুই কনুইয়ের ওপর ভর রেখে ললিতা কোন রকমে বসে আছে। তাকে দেখে অস্ফুট ত্রাসে জিজ্ঞাসা করল, চলে গেছে?

—হ্যাঁ, কিন্তু হঠাৎ হল কি?

ললিতা চুপচাপ খানিক চেয়ে রইল তার দিকে। চোখের জল সামলাতে পারল না। কেঁদেই ফেলল। শেষে টেবিলে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

অনিমেষ হতভম্ব। সে ডাক্তার। গত-পোনটা মানসিক মনে হতে কান্নায় বাধা দিল না কিছুক্ষণ পর্যন্ত। শেষে ব্যস্ত মুখেই বলে উঠল, কি কাণ্ড, কি হয়েছে বলবে তো আমাকে!

কেঁদে একটু যেন হালকা হতে পেরেছে ললিতা। শাড়ির আঁচলেই চোখ মুখ মুছে নিল। তারপর হাত-ব্যাগ খুলে তার ভেতর থেকে ভাঁজ-করা খবরের কাগজের সিটি বার করল একটা। ভাঁজ খুলে নিঃশব্দে একটা জায়গা দেখিয়ে দিল অনিমেষকে।

খবরটা পড়ে দু'চোখ বিস্ফারিত অনিমেষের। কাগজে লিখেছে, গতকাল বিকেলে ওরুক পথে এক মহিলা সবেগে গাড়ি চালিয়ে দরিদ্র ঘরের একটি সাত-আট বছরের ছেলেকে চাপা দিয়ে পালিয়ে গেছে। স্থানীয় অধিবাসীরা যখন গুরুতর আহত ছেলেটিকে নিয়ে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে মহিলাটি সকলের চোখে ধুলো দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে পালিয়ে গেছে। কাগজের টিপ্পনী, চাপা দেবার পর মুমূর্ষু ছেলেটাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব বোধটুকু পর্যন্ত ওই মহিলা এড়াতে চেয়েছে।

অনিমেষ গাঙ্গুলি স্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তুমি সত্যি ওভাবে পালিয়ে এসেছ?

ললিতা সবই বলল আস্তে আস্তে। কিছুই গোপন করল না। গোপন না করার মত ঘনিষ্ঠতা এই একজনের সঙ্গে বরাবরই ছিল—এখন তো সেই যেন একমাত্র আশ্রয় তার। মনের কোন্ অবস্থা নিয়ে সে মাসি শাশুড়ীর বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, নিজের অজ্ঞাতে গাড়ি কেন জোরে চালাচ্ছিল, ছেলেটা হঠাৎ কি-ভাবে গাড়ির মুখে এসে পড়েছিল, আর সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে কি ভাবে সে তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল—একে একে সবই বলল। আর শেষ পর্যন্ত পালিয়ে কেন এলো, তাও।

সব শোনার পরেও অনিমেষ গাঙ্গুলি নির্বাক অনেক-ক্ষণ। তারপর সান্ত্বনার সুরে বলল, এ অবস্থায় সবাই এই করত। কিন্তু কালই তুমি ব্যাপারটা জানালে না কেন, তাছাড়া সকলের আগে সমরকেই তো বলা উচিত, তাকে লুকোচ্ছ কেন?

সঙ্গে সঙ্গে বিকারগ্রস্তের মত আঁতকে উঠল ললিতা। —না না না? এখন না, এরপর সে আমাকে কক্ষণো ক্ষমা করবে না। আমার সব সুখ শান্তি গেছে সে আমি খুব ভালো করে জানি। বলতে তো হবেই, কিন্তু এখন না। তার আগে তুমি শুধু আমাকে খবর এনে দাও ওই ছেলেটার কি হল, বাই হয়ে থাকে, আমাকে খবরটা এনে দাও, নইলে আমি পাগল হয়ে যাব।

তার মানসিক অবস্থা অনিমেষ ভালই অনুভব করতে পারে। গোপনতার ফলেই যে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে সেটা এখন বোঝাতে চেষ্টা করে লাভ নেই। কাল জানলে নিজেরাই থানায় গিয়ে স্টেটমেন্ট দিয়ে আসতে পারত, গাড়ি আর লোকজন নিয়ে যেতেও পারত। ভেবে দেখল, সমরেন্দ্রকে এখন বললে তার মেজাজ উগ্র হয়ে উঠবেই, এমনিতেই যে রগ-চটা মানুষ। এ অবস্থায় সামান্য আঘাতে ললিতার যে-ক্ষতি হতে পারে তার জের সামলানো হয়ত সব থেকে কঠিন হয়ে পড়বে।

আশ্বাসের সুরে জবাব দিল, সে খবর তুমি কালকের মধ্যেই পেয়ে যাবে, কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা না রাখলে কিছুই পাবে না। মোট কথা এ-রকম উতলা হবার মত সাঙ্ঘাতিক অন্যায় তুমি কিছু করো নি।

ব্যথা-ভরা কৃতজ্ঞ চোখে ললিতা চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর হঠাৎ ব্যগ্র মুখে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, ছেলেটা বেঁচে না থাকলে তো কাগজে বেরুতো?

—এই তো বেশ বুঝতে পারছ, নিশ্চয় বেঁচে আছে।

—কিন্তু যে-রক্ত পড়েছে মা-গো! দৃশ্যটা চোখে পড়তে শিউরে উঠে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল ললিতা।

সমরেন্দ্র তখন কলেজে, পরদিন বেলা এগারোটা নাগাত অনিমেষ খবর নিয়ে এলো, ছেলেটা বেঁচে আছে এবং ভালো আছে, আঘাত একটু বেশিই লেগেছে বটে কিন্তু প্রাণের কোনো আশঙ্কা নেই।

ললিতার বুকের তলা থেকে ত্রাসের একটা জগদ্দল পাহাড় হালকা হতে লাগল যেন। —সত্যি বলছ?

—সত্যি। ইচ্ছে হলে ওমুক হাসপাতালে গিয়ে দেখে আসতে পারো, কিন্তু দেখতে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। অ্যাক্সিডেন্টের খবরটা হাসপাতাল থেকে পুলিসের কাছে গেছে, পুলিসের কাছ থেকে খবরের কাগজের অফিসে।

ললিতা সভয়ে চেয়ে রইল তার দিকে। অনিমেষ জানালো, ওই ছেলেটার সম্বন্ধে অনেক খবরও সংগ্রহ করেছে সে। যেখানে থাকে সেই বস্তি এলাকায়ও ঘুরে এসেছে সে। বলাই মিত্তির, অর্থাৎ ছেলেটার গার্জেন তখন সেখানে ছিল না, আশ-পাশের সকলে অনিমেষকে বড়-সব একজন পুলিস অফিসার ভেবে নিয়েছে।

ললিতা শোনার আশায় উদগ্রীব। আর যে খবর সংগ্রহ করেছে অনিমেষ তার সারমর্ম, যতদূর বোঝা গেছে, বলাই মিত্তির কানু পাজী লোক একটা। চৌদ্দ-পনেরটা বাপ-মা হারা অনাথ ছেলে মেয়ের গার্জেন সে। কোথা থেকে এই সব ছেলে মেয়েগুলোকে সংগ্রহ করেছে সেই জানে। বস্তির আশ-পাশের লোকেরা রীতি মত ভয় করে তাকে। তাদের ধারণা, খেতে পায় না এখন যে ছেলে-মেয়েগুলোর মা নেই, আর বাপও নেই বা থেকেও নেই—এই-রকম একটু সুশ্রী গোছের ছেলে মেয়েদের প্রতিপালনের ভার নেয় বলাই মিত্তির। পরোপকার করে। কিন্তু সেটা কেমন পরোপকার সকলেই জানে। ছেলে মেয়েগুলো যমের মত ভয়ায় তাদের প্রতি-পালককে। মার খেয়ে ছেলেমেয়ে গুলো যখন আর্তনাদ করতে থাকে, কানে আঙুল দিতে হয়।

ওই সব কচি-শিশুগুলোকে উপরন্তু খাটায় সে। খেতের কাজ করায়, মেয়েগুলোকে দিয়ে ঝুপড়ি-টুপড়ি বানিয়ে ঘুরের ঘুরের হাটে বাজারে পাঠায়। ভদ্র-লোকদের বাড়িতেও পাঠায়। খেতে পাচ্ছে না বলে কান্না কাটি করে যারা তারাই বেশি দামে কিনী করে সেগুলো। আর ছেলেগুলোকে দিয়ে চোরাই চালান ফেরি করছে। কৌচড় ভরতি চাল নিয়ে কিনা টিকেটে ট্রেনে চেপে তারা শহরে আসে। বেশি দামে কিনী করে আবার তারা

বিনা টিকেটে কেরে। এর মধ্যে ধরা পড়ে চাল খোয়া গেল বলাই মিত্তির তাদের আধমরা করে ছাড়ে—খেতেও দেয় না। এ-সব কথা সেখানকার লোকগুলো সহজে বলতে চায়নি, বা এতটা স্পষ্ট করেও বলেনি। পুলিসের ভয়ে, আর সম্পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে যেটুকু বলেছে তার থেকে মোটামুটি এই রকমই বোঝা গেছে।

…মিঠু হল বলাই মিত্তিরের সব থেকে পছন্দের ছেলে। বয়েস মাত্র আট হলেও, ছেলেটা যেমন চালাক চতুর তেমনি মিষ্টি মুখ। পছন্দ মত কাজ না হলে সেও প্রচণ্ড মার-ধর খায় বটে, কিন্তু তার চাল বা পয়সা কখনই খোয়া যায়। ধরা পড়লেও মিষ্টি মুখ দেখে লোকের মায়া হয় বোধহয়।

এখন ওই ছেলে গাড়ি চাপা পড়তে বলাই মিত্তির নাকি ক্ষেপে আছে। ছেলেটাকে সেই রাতে পাঁচ মাইল দূরের হাসপাতালে দিয়ে এসে হন্যে হয়ে এখন সেই গাড়ি হাঁকানো মেয়েকে খুঁজে বার করার চেষ্টায় আছে। কয়েক জন পুলিস্ কনষ্টেব্‌ল্-এর সঙ্গে যোগসাজস আছে তার, তাদের কাছেই খোঁজ খবর করছে। অনিমেষ গাঙ্গুলির ছেলেটার সন্ধান পেতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। ঘটনা স্থলের নিকটতম হাসপাতালে খোঁজ করতেই তার সন্ধান মিলেছে। তাকে স্বচক্ষে দেখেও এসেছে সে।

সব শোনার পর ললিতা দ্বিগুন ব্যাকুল। —কেমন হাসপাতাল? কেমন চিকিৎসা হচ্ছে?

কেমন হাসপাতাল বা এ-সব অনাথ লোকের কি রকম চিকিৎসা হয়, অনিমেষ ভালই জানে। বলল, চিকিৎসা যাতে ভালো হয় সে-ব্যবস্থা করা যাবে'খন, ভেবো না।

কিন্তু ললিতা এ-কথায় নিশ্চিন্ত হতে রাজি নয়। —ব্যবস্থা করে এলে না কেন, যত টাকা লাগে আমি দেব, আমার নিজের যত গয়না আছে সব বেচব, তার বেশি লাগলেও দিতে পারব—তুমি আজই গিয়ে ব্যবস্থা করো —ছেলেটা ভালো না হলে আমি বাঁচবই না।

অতএব তাকে বাঁচানোর তাগিদেই ছোটা-ছুটি করতে হল অনিমেষকে। ওদিকে সমরেন্দ্রকেও সেই সামলাচ্ছে। সাবধান করে রেখেছে, আগের সব রিলাট আর অপারেশন-টপারেশনের রি-অ্যাকশন দেখা যাচ্ছে ললিতার, এ-সময়ে যেন কোনো ব্যাপারে তাকে জেরা না করা হয়, যতটা সম্ভব তাকে তোয়াজে রাখা উচিত, একটা উগ্র বা কটু আচরণে বিশেষ ক্ষতি হতে পারে।

বেচারা তাই বিলক্ষণ ভয়ে ভয়ে আছে এখন। বিরক্ত হবে মনে হলে ললিতার কাছেও আসে না।

দু'দিন বাদে ললিতা খবর পেল, ছেলেটার প্রাণের সঙ্কট কেটেছে বটে, কিন্তু মাথায় চোট পেয়ে আর বহু রক্তপাতের ফলে স্বাভাবিক বুদ্ধি-সুদ্ধি আর ফিরে পাবে বলে মনে হয় না। ভালো করে কথাও বলতে পারে না।

ঘাতনায় ললিতার ভিতরটা কুঁকড়ে উঠতে লাগল। রক্তাক্ত ছোট দেহটার ওপর ঝুঁকে পড়েছিল যখন, তার সেই বিস্ফারিত বোবা চাউনিও ভুলতে পারে না।

অনিমেষকে বার বার অনুরোধ করে শেষে কলকাতার বড় হাসপাতালে সরিয়ে আনা হল তাকে। যে হাসপাতালের সঙ্গে শিক্ষকতার ব্যাপারে অনিমেষ গাঙ্গুলি যুক্ত, সেই হাসপাতালে। যেখানে ছিল, সেখান থেকেও তারা ছাড়তে আপত্তি করেনি। অনাথ রোগীকে কেউ যদি টেষ্ট-কেস এর জন্য বড় হাসপাতালে নিয়ে যায় তো রোগীর ভাগ্য।

বড় হাসপাতালের একটা ভালো ক্যাবিনে রাখা হয়েছে ছেলেটাকে। অনিমেষের চেষ্টায় বিশেষজ্ঞ বড় বড় ডাক্তারও দেখছে তাকে। কথা যদিও বা বলতে পারছে—মানুষ চিনতে পারে না।

সমরেন্দ্র কলেজে বেরুলেই ললিতা তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ে। দু'তিন ঘণ্টা ছেলেটার শয্যায় বসে কাটায়। মিঠু হাসে তাকে দেখলেই। ভারী ভাব হয়ে গেছে ললিতার সঙ্গে তার। ললিতার চেষ্টায় আধো আধো কথা বলতে চেষ্টা করে বেশি করে। কিন্তু তাকে একদিনের জন্যেও চিনতে পারেনি। যে-চেনাটা

হয়েছে সেটা নতুন চেনা—তারই গাড়ির ধাক্কায় যে এত কাণ্ড সেটা তার স্মৃতির মধ্যে নেই।

বিকেলের আগেই ললিতা বাড়ি চলে আসে আবার।

সে-দিনটা আবার এক দুর্যোগেরই দিন বুঝি।

মিঠুর ক্যাবিনে ললিতা ছিল আর অনিমেষ ছিল। হঠাৎ দরজার দিকে ফিরে তাকিয়েই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল ললিতা। সবিস্ময়ে অনিমেষও ফিরে তাকালো।

দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলাই মিত্তির। নির্মম ভাবলেশশূন্য কঠিন একখানা মুখ।

অনিমেষ তক্ষুনি বুঝল, লোকটা কে হতে পারে। তবু এগিয়ে এসে রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি? এখানে কি চাই?

লোকটা গম্ভীর বিনয়ে জবাব দিল, আজ্ঞে আমার নাম বলাই মিত্তির।···আমাকে না জানিয়ে হাসপাতাল থেকে আমার ছেলে সরিয়ে এনেছেন, তাই দেখতে এলাম এত দরদ কার।

বলে ঠাণ্ডা দুটো চোখ সে রাখল ললিতার মুখের ওপর।

ললিতা কাঠ।

অনিমেষ গাঙ্গুলির তিরিক্ষি মেজাজ।—তোমার ছেলে কি-রকম। ওই হাসপাতালে লেখা আছে বাপ-মা নেই, অনাথ ছেলে।

—আমার নামও লেখা আছে। আমার কাছে থাকে, আমি ওর গার্জেন। তাও লেখা আছে।

মুহূর্তে কি ভেবে নিল অনিমেষ গাঙ্গুলি। বলল, আচ্ছা, ভেতরে এসো।

বলাই মিত্তির ভিতরে এসে দাঁড়াল। মিঠুকে দেখিয়ে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, দেখো তো, চিনতে পারো?

—পারি বই কি।

—আর, তোমাকে ও চিনতে পারে কিনা দেখো।

বলাই মিত্তির মিঠুর কাছে এগিয়ে গেল। যতটা সম্ভব কোমল গলাতেই জিজ্ঞাসা করল, কিরে মিঠু, কেমন আছিস?

ছেলেটা নির্বাক। বোঝা যাচ্ছে না ও চিনতে পারছে কি না। বোঝা যাচ্ছে না ও লোকটাকে পছন্দ করছে কি না।

বলাই মিত্তির তাদের দিকে ফিরল, বলল, চিনতে পারছে না, তাতে কি হল।

অনিমেষ বলল, আমরা একে ভালো করে তুলতে চেষ্টা করছি—ইনি ওকে ভালো করে তোলার জন্য কত কি করছেন—এ-সময় তুমি বিরক্ত করতে এসেছ কেন?

—আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে, তাই।

রাগে জ্বলে উঠল অনিমেষ গাঙ্গুলি।

—তোমার ক্ষতি হয়েছে কেমন? তুমি কেমন লোক আমি জানি না? তোমাকে পুলিসে দিতে পারি জানো?

বলাই মিত্তিরের পুরু ঠোঁটে ঠাণ্ডা হাসির আভাস চিকিয়ে গেল। জবাব দিল, ভয়-ডর আমার একটু কম বাবু, পুলিসে ধরে নিয়ে গেলেও তো নিশ্চিন্তে খেতে পরতে পাব—আমার ওখানকার বাকি ছেলে-মেয়েগুলো অবশ্য উপোস করে মরবে। তা যাক, ওদের জন্য ভদ্র-লোকদের দরদ কত আমার জানা আছে—আমাকে পুলিসে দিয়ে আপনারা নিষ্কৃতি পান যদি, তাই দিয়ে স্নান।···কিন্তু পুলিস, তো হুজুর এই দিদি ঠাকরুনকেও খুঁজছে!

—শাট আপ! রাগের চোটে অনিমেষ প্রায় মারতেই এলো তাকে। ললিতা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বাধা দিল। তাকে হতভম্ব শিশুটার দিকে ঠেলে দিয়ে বলাই মিত্তিরকে বাইরে ডেকে নিয়ে এলো। আকুল উৎকণ্ঠা নিয়ে বলল, তুমি এ-রকম ছেলেকে নিয়ে কি করবে, আমরা ওকে ভালো করে তুলব, আমার কাছে রাখব, মানুষ করে তুলব!

বলাই মিত্তির জবাব দিল, আপনার অসীম দয়া, কিন্তু তাতে আমার ক্ষতিপূরণ হবে না।

—কি, কি চাও তুমি? টাকা?

—তাই দিয়ে স্নান কিছু।

বরাত্তক্রমে হাত-ব্যাগটা হাতেই ছিল ললিতার। সেটা

খুলে ওটি তিরিশেক টাকা পেল। সবটাই বার করে তার হাতে দিয়ে দিল।

নোট কটা নিয়ে বলাই মিত্তির নির্লিপ্ত মুখে তাকালো তার দিকে।—এতে কি হবে?

ললিতা থতমত খেল।—আর তো নেই।

—তাহলে কাল আবার আমি আসব, কাল নিয়ে আসবেন।

ধীরে সুস্থে প্রস্থান করল বলাই মিত্তির। ললিতা ফিরে আসতেই উত্তেজিত অনিমেষ বলে উঠল, টাকা দিলে বুঝি? কত টাকা?

—বেশি না। ললিতার বুকের ভিতর কাঁপছে তখনো।

অনিমেষ বলল, এই করে ওই শয়তানটার কাছ থেকে পার পাবে না দেখো, ও আবার ঠিক আসবে দেখো।

পরদিন চুপি চুপি একশটা টাকা নিয়ে এলো ললিতা। বলাই মিত্তির আসা মাত্র সেই টাকা তার হাতে দিয়ে বলল, এই নাও, আর এসো না, শিগগীর যাও—ওই ডাক্তার বাবু এসে গেলে মুশকিল হবে।

দাঁত বার করে একটু হাসল বলাই মিত্তির। বলল, আপনি নিজের মুশকিলের কথা ভাবুন দিদি, এই সামান্য টাকায় তো আমার হবে না, আবার তো আমাকে আসতেই হবে।

দু'তিন দিন পরে পরে এসে অন্তত পাঁচ সাত দফা টাকা নিয়ে গেল বলাই মিত্তির। ললিতার আবার নতুন ত্রাস। তার নিজের পাস বইয়ে টাকার অঙ্ক কমছে, কিন্তু একেবারে শূন্য হয়ে গেলেও যে রেহাই পাবে না। সেটা বেশ ভালো করেই বুঝেছে।

সঙ্কটের ব্যাপারটা অনিমেষকেই জানালো আবার। সে-ও প্রথমে ক্ষিপ্ত, পরে চিন্তিত।

সমরেন্দ্রকে জানানোর ব্যাপারে ললিতাকে রাজি করানো গেল। ললিতার রাজি হবার আরো কারণ, মিঠু এ-দিক থেকে ভালো আছে এখন, তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। পরে বেশ সবল সুস্থ হয়ে উঠলে মাথায় অস্ত্রোপচার প্রসঙ্গে বিবেচনা করা যাবে।

সব শোনার পর সমরেন্দ্র রাগ করার ফুরসত পেল না। যে আবহাওয়া রচনা করে অনিমেষ আদ্যোপান্ত জানালো তাকে, তাতে সে থাবড়েই গেল। ললিতার মানসিক অবস্থা চিন্তা করে উতলা হয়ে পড়ল সে।

কিন্তু ছেলেটাকে নিজের বাড়ি নিয়ে যাবার ব্যাপারে তার আপত্তি। শেষ পর্যন্ত সে আপত্তিও টিকল না।

মিঠুকে বাড়ি আনার পরে ভারী একটা পরিবর্তন দেখা গেল ললিতার। সত্যিই যেন ছেলেটার মা হয়ে বসেছে সে। ওই এক ছেলের কারণে সর্বদা ব্যস্ত, সর্বদা চঞ্চল। এই ব্যস্ততা আর চাঞ্চল্যের মধ্যে সর্বদা একটা খুশির ছোঁয়া লেগে আছে। লাজলজ্জা ছেড়ে ছেলেটাকে মা ডাকতে শিখিয়েছে সে। এখন ও খুব ভালো করেই মা চিনেছে। কিন্তু সমরেন্দ্রর বাবা হতে আপত্তি। তাই নিয়ে হাসাহাসি।

কিন্তু এ আনন্দের ওপর কালো ছায়া নেমে এলো দু'দিন না যেতে। দুপুরে সেদিন কে একজন দেখা করতে চায় শুনে ওপরে ডেকে পাঠালো।

তার পরেই ত্রাস। বলাই মিত্তির। নিজেই বলল, অনেক চেষ্টা করে বাড়ির সন্ধান পেয়েছে।

সেই থেকে দু'সপ্তাহের মধ্যে চারবার টাকা দিয়ে বিদায় করেছে তাকে। আবার মাথা খারাপ হবার উপক্রম ললিতার। লোকটা তাকে অব্যাহতি দেবেই না। অগত্যা ব্যাপারটা সে সমরেন্দ্র আর অনিমেষকে জানালো। তারা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল প্রথম, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখল পরিস্থিতি জটিলই বটে।

কিন্তু ইতিমধ্যে আবার এক অতর্কিত বিভ্রাট। মিঠুর জ্বর হয়েছে। একশ দুই-আড়াই জ্বর—তাগিদ দিয়ে ইতিমধ্যে আরো একজন ডাক্তার আনিয়েছে ললিতা। সেও অভয় দিয়েছে, কিন্তু ললিতা নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

দুপুরের দিকে ঘুমন্ত ছেলে হঠাৎ একবার কাতরে উঠতে ললিতা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে এক বিচিত্র কাণ্ড। কি দেখে ছেলেটা আঁতকে উঠল হঠাৎ, তারপরেই

কাঁপুনি আর গো-গোঁ শব্দ। নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই সে-যেন দু'হাতে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করল ললিতাকে।

ললিতা হতভম্ব একেবারে। সভয়ে তিন হাত পিছিয়েই এলো সে। নিজের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখল, কি দেখে ছেলে এমন আঁতকে উঠল। অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না। ঝুঁকে ছিল যখন, ওর মুখের সামনে গলার নেকলেসটা শুধু দুলছিল তখন।

পরক্ষণে চেয়ে দেখে ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ব্যস্ত হয়ে জলের জন্য বেরুতে গিয়েই পা দু'টো যেন স্থাণুর মত মাটির সঙ্গে আটকে গেল। বারান্দায় বলাই মিত্তির দাঁড়িয়ে। ললিতা যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, বলে উঠল, আর এক পয়সাও হবে না, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। ছেলেটা মরবে কি বাঁচবে, ঠিক নেই—তুমি মানুষ না পশু?

বলাই দাস জবাব দিল, মানুষ ছিলাম দিদিমনি এখন ও হয়ে গেছি। কিন্তু হবে না তাহলে?

—না, এক পয়সাও হবে না, তুমি বেরোও এখান থেকে!

বলাই মিত্তির চলে গেল।

জল-বাতাস করে ললিতা ছেলেটাকে সুস্থ করল। চোখ মেলে ছেলে এবারে আর আঁতকে উঠল না। কিন্তু ললিতার বুকের কাঁপুনি থামে না।

সব শুনে অনিমেষ চট করে ভেবে পেল না, কি দেখে ছেলেটা অমন কাণ্ড করতে পারে। শুধু মনে হল একটা কিছু দেখে তার পুরনো স্মৃতিতে ধাক্কা লেগেছে।

ওদিকে বলাই মিত্তিরের ব্যাপারেও আর চুপ করে বসে থাকা চলে না। দুই বন্ধুতে মিলে ছুটল এক পরিচিত অ্যাডভোকেটের কাছে। তাঁর পরামর্শ, সমস্ত ঘটনা এই মুহূর্তে পুলিসকে জানানো উচিত। তারা যা করছে ছেলেটার জন্য, শাস্তি এমন আর কি হবে। কিছুই হবে না, বড় জোর আরো সামান্য কিছু খেসারত দিতে হতে পারে।

অ্যাডভোকেটের পরামর্শটা বড় সময়ে শুনেছিল তারা। কারণ তাদের স্বীকৃতির পরের দিনই বলাই মিত্তির নালিশ রুজু করেছে।

অ্যাডভোকেটের তৎপরতায় কোর্টে কেস্ উঠতে সময় লাগেনি।

ইতিমধ্যে সেই এক ব্যাপার আবার। দেওয়ালে ঘড়ির পেণ্ডুলামটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ছেলেটা আবার একদিন গোঁ-গোঁ শব্দে আর্তনাদ করে উঠল। ললিতা ছুটে এলো। ভয়ে সিঁটিয়ে ছেলেটা আঙুল তুলে ঘড়িটা দেখালো একবার—কিন্তু কি দেখাচ্ছে ললিতা কিছুই বুঝল না। তেমনি গোঁ-গোঁ করতে করতে ছেলে আবার অজ্ঞান।

সমরেন্দ্র বাড়ি ছিল। টেলিফোনে অনিমেষকে খবর দিতে সে ছুটে এলো। মিঠুর যখন জ্ঞান হয়েছে তখন, ললিতা তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়তেই, আচমকা সেই এক ব্যাপার আবার। চোখের সামনে নেকলেসটা দুলতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা প্রাণভয়ে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করল তাকে। এবারে আর অজ্ঞান হল না বটে, কিন্তু হলেই বোধহয় ভালো ছিল। ললিতাকে দেখেও চিৎকার।

এ-ধারে সরে এসে কিছু না ভেবেই প্রায় দিশেহারার মতই নিজের গলার নেকলেসটা খুলে আনল। একটু বাদে অনিমেষ তাকে জিজ্ঞাসা করল, অ্যাক্সিডেন্টের দিন তোমার গলায় ওই নেকলেসটা ছিল?

—ছিল।

—অ্যাক্সিডেন্টের পর তুমি ওর ওপর ঝুঁকে পড়েছিলে?

—হ্যাঁ।

অনিমেষ আর কিছু বলল না। পরদিন রেয়াল ঘড়িটাও সরানো হল। কিন্তু মিঠু এর পর বেশিরকম অসুস্থ হয়ে পড়ল। আবার তাকে হাসপাতালে সরানো হল। বিশেষজ্ঞের মত, আর দেরি না করে অপারেশন করা দরকার।

অপারেশন হয়ে গেল। ললিতা দিবারাত্র অদৃশ্য দেবতার পায়ে মাথা খোঁড়ে, আর হাসপাতালে পড়ে থাকে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক আবার তাকে সেই নেকলেস পরেই কাছে আসতে বলেছিলেন, সেই ভাবেই মুখের ওপর ঝুঁকে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন।

মিঠু চিনেছে তাকে, ভয় পেয়েছে, কিন্তু আর অত আঁতকে ওঠেনি বা অজ্ঞান হয়নি। যত সুস্থ হয়ে উঠছে, ততো যেন আড়ষ্ট।

কিন্তু বিবাদের একটা দুঃসহ বোঝা চেপে আছে ললিতার বুকে। কোর্টের সদয় নির্দেশ, মিঠুকে নিজ হেফাজতে রাখার আবেদন করে তোলার দায়িত্ব ললিতা বসুর। সে সেরে উঠলে বলাই মিত্তির তাকে নিয়ে যাবে।

ললিতা বসু বজ্রাহত যেন। তার মনের অবস্থা অনুমান করতে পারে সমরেন্দ্র আর অনিমেষ। বলাই মিত্তিরকে তারা টাকা দিয়ে বশ করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। কারণ, ললিতা বসুর মানসিক অবস্থাটা সেও অনুমান করতে পারে। দিনের পর দিন সে হাসপাতালে এসে দূরে দাঁড়িয়ে সবই লক্ষ্য করছে। ছেলে তার, তাকে আটকাবে কে? যত দেখছে, ততো যেন ক্রূর আনন্দ তার। মিঠুর ঘরে যখন ওই পুরুষ দুটো থাকে না, বাইরে থেকে গলা বাড়িয়ে অনেক দিন ভিতরের দৃশ্যও দেখেছে। সত্যিকারের মা-ছেলের জড়াজড়ি যেন। তাই অনেক—অনেক—বেশি প্রাপ্তির আশা বলাই মিত্তিরের। সে সবুর করতে জানে।

শেষে সেই দিন এলো, হাসপাতাল থেকে যেদিন মিঠুকে ছেড়ে দেবে। বিবর্ণ মৃত মুখ যেন ললিতার। মিঠু খুশি, সে জানে মায়ের সঙ্গে বাড়ি যাবে। ঘরে অনিমেষ আর সমরেন্দ্রও আছে। তারা গম্ভীর। শেষ চেষ্টা করেও বলাই মিত্তিরকে রাজি করাতে পারেনি। সে বলেছে, ভদ্র সমাজের রীতি জানিনে বাবু, দু'চার হাজারে তারা ছেলে ছেড়ে দেয়?

আসার আগে তারা নীচে বলাই মিত্তিরকে দেখে এসেছে।

এই প্রথম ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল বলাই মিত্তির। ললিতা বসু তাড়াতাড়ি ওদিক ফিরে দাঁড়ালো। তাকে দেখে ছেলেটা নির্বাক, স্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত, তার চোখে মুখে বোবা ত্রাস, বোবা আতঙ্ক।

বলাই দাস হাত বাড়ালো, চল বাড়ি চল্—

হঠাৎ সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল ছেলেটা। দৌড়ে গিয়ে দু'হাতে ললিতাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, মা

আমি যাব না, আমি যাব না, আমাকে ছেড়ে দিও না মা!

দু'হাতে কান চেপে ললিতা ঘর ছেড়ে সোজা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। পাশের ঘর সকলের দিকে চেয়ে যেন আশ্রয় খুঁজল কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই বলাই মিত্তিরের চোখে চোখ পড়ল।

বিবর্ণ মুখ নির্বাক, শান্ত পর মুহূর্তে।

আর অবাক বিস্ময়ে তাকে দেখছে বলাই মিত্তির। নতুন করে কিছু দেখছে যেন।

এগিয়ে এসে মিঠুর হাত ধরলে। তারপরেও দেখল খানিক। বলির পশুর মতই নির্বাক শিশুটা যেন নিজেকে সঁপে দিয়েছে তার হাতে, আর এটুকু আপত্তি করার শক্তি নেই।

হাত ধরে থেকে ওর মুখের দিকে তেমনি চেয়ে থেকে কি যেন একটু ভাবল বলাই মিত্তির। তারপরে হাত ধরেই বাইরে নিয়ে এলো তাকে। কলের পুতুলের মতই ছেলেটা এলো তার সঙ্গে।

নিচেতলার অন্ধকারে সমরেন্দ্র আর অনিমেষও বেরিয়ে এসেছে।

বারান্দায় এসে বলাই মিত্তির থমকে দাঁড়াল। তারপর ঘুরে তাকালো। লম্বা বারান্দার এক প্রান্তে দূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে কাঠের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে ললিতা বসু।

কয়েক নিমেষ থমকে মিঠুর হাত ধরে সেদিকে এগিয়ে গেল বলাই মিত্তির। কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো আবার। স্তব্ধ, নির্বাক মুহূর্ত কয়েকটা।

মিঠুর হাত ছেড়ে দিয়ে বলাই মিত্তির বলল, যা, মায়ের কাছে যা।

ফিরল। সমরেন্দ্রর পাশ কাটিয়ে অনিমেষের পাশ কাটিয়ে শিথিল চরণে বলাই মিত্তির লম্বা বারান্দাটা পেরিয়ে যেতে লাগল।

মিঠুকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ললিতা বসু অবাক বিস্ময়ে বলাই মিত্তিরের প্রস্থান রত মূর্তিটা দেখছে।

দেখছে সমরেন্দ্র বসু আর অনিমেষ গাঙ্গুলিও।

(সম্পূর্ণ উপন্যাস)

নটীর হাটের সেই একটা দিন, প্রায় ছাব্বিশ—না, ছাব্বিশ কেন, আরো বেশী, প্রায় আটাশ বছর আগের কথা ; সেই একটা দিনের কথা ও দু'জন ছাড়া কেউ জানে না।...

জানি কেবল আমি—আমি কাল, লোকে বলে, মহাকাল !

যেমন লোকে জানে না, নটীর হাটের উৎপত্তি কোথা থেকে। যেমন জানে না, কোন্ সূত্রে একদা এই আধা-শিল্প, আধা-গ্রামীণ, আর একেবারে একালের হিসাবে বলতে হয় কিছু বাস্তহারা কলোনী বিস্তৃত, এই নটীর হাটের নামের উৎপত্তি কোথা থেকে।

ইতিহাস নেই, কিন্তু কিংবদন্তী অনেক। নটীর হাট, সেদিক থেকে কিংবদন্তীর দেশ। নামের উৎপত্তির অনেক কিংবদন্তী, অনেক গল্প। তার কোন শেষ নেই। সেই কিংবদন্তী আর গল্প কথা, কেবল শহরে না, পাড়ায় পাড়ায়। কেবল পাড়ায় পাড়ায় না, ঘরে ঘরে। তারচেয়ে বেশী। ভিন্ন ভিন্ন কিংবদন্তী প্রাচীন পরিবারে পরিবারে। কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই। নটীর হাট তাই কিংবদন্তীর দেশ।

কে সেই নটী, কার হাট, কোন দলিল দস্তাবেজে, পুঁথির লেখায়, শিলালিপিতে, কোথাও কিছু লেখা নেই। থাকলে, তা ইতিহাসের পাতায় জায়গা পেত। নটীর হাটের তাই কোন ইতিহাস নেই। নটীর হাট কেবল একটি জায়গা, একটি আধা-শিল্প আধা-গ্রামীণ, আর বাস্তহারা কলোনী ছড়ানো এক মফস্বল শহর মাত্র। তার বেশী কিছু না।

তবু নটীর হাট শুনলেই, চোখের সামনে অনেক কল্পনা ভেসে ওঠে। প্রথমেই ভেসে ওঠে এক নারী মূর্তি, অপরূপ শ্রোণী, অক্ষয় যৌবন, লীলা চঞ্চলতায়, তরঙ্গায়িত যার শরীর। যার আয়ত বিশাল চোখে নিবিড় চাহনি, স্ফুরিত ঠোঁটে মদির হাসি। প্রাণের অচিন লীলায় স্ফুরিত নাসা, ভঙ্গিতে বাঁকা শঙ্খ গলা ! সোনা মরকত হারের নিচে যার বক্ষ বাস অধরা বিলুণ্ঠিত, নয় উন্নত কামার্ত বুক। তবু যেন কিসের কাতরতায় ঈষৎ নত—সঁপে দেওয়া ভঙ্গির মত। সে নটী, তবু যেন সকল, শাস্ত্র সুলক্ষণ ওর শরীরের প্রতি প্রত্যঙ্গে প্রত্যঙ্গে। যেমন, আকুঞ্চিত কেশ, মণ্ডলাকার মুখ, দক্ষিণাবর্ত নাভি, চাঁদ প্রভা মুখ, সুবর্ণোজ্জ্বল রঙ, বিশাল চোখ, বিম্বফল রক্ত বর্ণ ঠোঁট, সবই তার আছে যেন। তার বুকে রোম নেই, নাভিদেশ থেকে অজ্ঞিন ভাবে টানা ওপর দিকে গোল হয়ে ওঠা পিঙ্গল রোমও তার নেই। যেন সে ক্ষীণ কটি, গুরু নিতম্ব, মদালস লাস্যে সুরত প্রার্থনায় এক অপরূপ ভঙ্গিতে অভঙ্গ কম্র। প্রাণের কী এক জানা অজানা বাসনায়, শরীরে তার চঞ্চলতা। সে একভাবে যেন স্থির হয়ে থাকতে পারে না, তাই তার পায়ের নূপুর বেজে যায় বারে বারে। ঝিন্ ঝিন্। ঠিন্ ঠিন্। মহাকালের যে-ভাবলেশহীন, নটীর হাটের ওপর আজও তেমনি করে পড়ে আছে, শুধু তার কানেই বাজে সেই শব্দ।

নটীর হাটের কলকাতার কথক তা-ই মহাকাল স্বয়ং।

মহাকাল বলে, আমি নটীর হাটের শুরু দেখেছি, আজও দেখছি, কিন্তু নটীর হাট যেন আমার চোখেও ধন্দ ধরিয়েছে। আমিও যেন কল্পনা করি, আমারও চোখের সামনে এক নটীর মূর্তি ভেসে ওঠে। সত্যি মিথ্যে আমি ভুলে যাই, কিংবদন্তীর কল্পনায় নানা ছবি দেখি। আমিও যেন এই নারী মূর্তি দেখি, আর নটীর হাটের কোন এক সন্ধ্যায় শুনি, সেই নটীর পায়ের নূপুর বেজে চলেছে রুম্ রুম্ রুম্। আর নটীরহাটের গঙ্গার ওপরে রক্তিম আকাশে ভর করে যেন দাঁড়িয়ে আছে নটী মুগ্ধ মানুষেরা। নটীর হাটের হাটে যারা নিজেদের বিকোতে এসেছে, আপন মনের মূলো না, রক্তের মূলো। যে-নটী বধূ না, মাতা না, কন্যাও না, খবেন্দ্রা উর্বশীর মত যে অক্ষয় উন্নিত যৌবনা।

কিন্তু সে-রকম কেউ কি রক্তে মাংসে ছিল এই হাটে? থাকলে, তার নাম কী? কেউ বলতে পারে না। নটীর হাটের কোন ইতিহাস নেই, এ শহর ঐতিহাসিক না। আছে কেবল শত কিংবদন্তী। হয় তো তার মধ্যে কোথাও, একটা কোন সূত্র রয়েছে, কিন্তু শত সুতোর জটায়, আসল খুঁজে পাওয়া মুসকিল। যেমন, পরশ-পাথর খুঁজে ফেরার ক্যাপা, খুঁজতে গিয়ে কবেই যে পরশপাথর, পাথর বলে ফেলে দিয়ে যায়, নিজেও জানতে পারে না। সেইরকম, কিংবদন্তীর মধ্যে যে আসল গল্পটা কোথায় লুকিয়ে রয়েছে, তা কেউ বলতে পারে না।

মহাকাল বলে, বিশ্ব সংসারের যা কিছু, সব আমার চোখের ওপর দিয়ে ঘটে চলেছে। জন্ম-মৃত্যু, ভাঙা-গড়া সবকিই, সবখানে সর্বত্র, আমি আমার রথে বসে দেখছি। আমার জীবনে এটাই অভিশাপ কিনা, জানি না, কিন্তু সূর্যকে আকাশে ঝুলে দিয়ে আমি ছুটি অস্তের দিকে। ডেকে নিয়ে রাত্রিকে, তোরের শুকতারাকে জাগিয়ে, আবার যাই সূর্যকে তুলতে। উদয়াস্তের দিনপঞ্জী নিয়ে আমার এই চলা নিরন্তর। আমি চিরদিন ধরেই চলেছি, চলবও। আমি সব দেখছি, সবখানে—দেখবও।

তবু, নটীর হাটের পত্তন, তার নামের সৃষ্টি আমাকেও ধন্দ লাগিয়ে দেয়। আমার সারা গায়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখি, কোথাও তার আসল হদিস পাই না। কে সেই নটী, কিংবা কারা সেই নটী, অথবা কোন নটী হয় তো এখানে ছিলই না। কোন নটী হয় তো তার আখেরের জীবনের জন্যে, এখানে কোন হাটের পত্তন করেছিল মাত্র। যে-হাটের তোপা থেকে, সে তার নাগর পরিত্যক্ত বার্ধক্যের জীবন কাটাবে।

কিন্তু তাই যদি হবে, সে কাহিনীর লিখনই বা কোথায় আমার গায়ে। দেখতে পাই না। কেবল একটা বিষয় সবাই জানে, সবাই দেখতে পায়, নটীর হাট, একদিক থেকে সত্যি নটীর হাট। এমন একটা ছোট শহরে, এত নটী কেউ কখনো দেখেনি। পৌরসভার হিসাবে যার, চৌহদ্দি হল, সোয়াবর্গ মাইল। সেই সোয়াবর্গ মাইলের মধ্যে এতগুলো নটী পাড়া, এত নটীর ভিড় কোথাও কেউ দেখেনি।

সেই কারণেই যদি নটীর হাটের নাম, তবে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, এখানেই বা এত নটীর আগমনের কারণ কী। আমার চোখ দিয়ে, আমি কোনদিন দেখিনি যে, এখানে অতীতে কোন রাজা রাজধানী করেছিল, তাই এখানে কোন পুরণো দিনের নগর ছিল। আর সেই নগরে নটীরা বিকোতে এসে ভিড় করেছিল। কোন মুসলমান নবাব বাদশার রাজধানীও ছিল না। যে কারণে নটীদের আবির্ভাব হতে পারে। তবে নটীর হাট তখন শুধু সন্ধ্যায় জাগে না। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য, সব মিলিয়ে নাম ডাক ছিল। পাণ্ডিত্যের গৌরব ছিল। আর সৎ শুদ্রদের হাতে ছিল বড় ব্যবসা। নটীর হাটে একটা গল্প ছিল। বরং তখন নটীর হাটের গঙ্গার ওপারে ছিল বিদেশীদের দখলদারী। ডেনিশ, না ওলন্দাজ, না পর্তুগীজ, না ইংরেজ, যাদেরই হোক নটীর হাটের ওপারে তাদেরই বিরাট হাট। ব্যবসায়ের লেন-দেন, কেনা-কাটার বড় বাজার, তার সঙ্গে তাদের রাজকীয় ইমারত, কোঠাবাড়ি, দালান, গাড়ি ঘোড়া লোক লস্কর, বড় উঁচু চূড়ার বাজে ঘড়ি, ঢঙ্ ঢঙ্ ঢঙ্।...

নটীদের তিন হবার কথা ছিল ওপারেই। নটী বলতে বেবুশ্যেদেরই বোঝায়, আর ওপারেও যে তাদের বিকোবার বাজার নেই, তা নয়। কিন্তু নটীর হাটের মত নয়। এখানে তুমি যেদিকেই যাবে, যেখানেই যাবে, নটীর পাড়া পাবেই পাবে। তা-ই খুঁজে দেখতে ইচ্ছা করে, এখানে এত নটী কেন, এখানকার নাম নটীরহাট কেন। কিন্তু সারা গায়ে খুঁজে পাই না তার আদি কথা।

তবে একদিন নিশ্চয়ই পাব। বিশ্বসংসারের অনেক কিছু হারায়, আমার গায়ের লেখা কিছুই হারায় না। কেবল লিখনের পর লিখনে ঢাকা পড়ে যায়। লিখন তুলে দেখলেই, এক সময়ে তা দেখতে পাব। তাই নটীর হাটের নামের আদি কথা-কাহিনী আমি পরে বলব। এখন আমি, নটীর হাটের সেই একটা দিন, প্রায় আটাশ বছর আগের কথা বলব।

সেই একটা দিন, প্রায় আটাশ বছর আগে, এক ঘোর দুপুরের কথা, যে-কথা, আমাকে বাদ দিয়ে, দু'জন ছাড়া আর কেউ জানে না।

একেবারে জানে না বললে ভুল হবে। আর একজন জানে। যে, সব কিছু নিশ্চুপে দেখেছে, ঘটনার অন্যতম এক নায়ক হিসাবে, নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। নিয়তি তাকে টেনে নিয়েছিল এক প্রবল বাসনার হাত বাড়িয়ে। যে বাসনার মধ্যে ছিল তীব্র বিস্ময়, অশেষ জিজ্ঞাসা। এই অন্যতমের নাম দীপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—নটীর হাটে লোকে যাকে দীপঠাকুর বলে।

কিন্তু আটাশ বছর আগের এক দুপুরের কথা আমার মনে পড়ল। যে কারণে, সেই কথা আগে বলি। আমি দেখতে পাচ্ছি, নয়ন কেওরা মারা গিয়েছে, বংশী মুখুজ্জে সদলবলে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে।

দেখতে পাচ্ছি, এখনো নয়নের সব শ্মশানযাত্রা করে নি। ঘরের বাইরে, টগর কেওরানি তার মৃত স্বামী নয়নের স্পন্দনহীন মরা বুকে পড়ে কাঁদছে, কপাল কুটে কুটে!

বংশী মুখুজ্জে এসে বললেন টগর কেওরানিকে, 'ঘরের জিনিসপত্তর বার করে নাও, ওতে আর হাত দেব না। কিন্তু ঘরটা দখল করব।'

কড়া হুকুম হল, কেওরাপাড়ার জমীদার বংশী মুখুজ্জের।

নটীর হাটের গঙ্গার নিচু পাড় জুড়েই যত অন্তজদের বাস। কেওরাপাড়ার জমিদার একজন, হাড়ি পাড়ার আর একজন। মুচি পাড়ার মালিক একজন, ডোম পাড়ার আর একজন দেখে আর শুনে মনে হয়, নটীরহাট

জমিদারের দেশ। মাঝে মাঝে এই সব পাড়ায় রাজায় রাজায় লড়াই হয়, উলুখাগড়াদের প্রাণ যায়।

হঠাৎ হঠাৎ রব ওঠে, পাততাড়ি গুটোও, পাততাড়ি গুটোও।

ব্যাপার কী? না, রাজা বদল হয়েছে।

কোথায় যেতে হবে?

এখন কিছু দূরে নয়। একঘর হাড়ি যায় ডোম পাড়ায়। দু ঘর কেওড়া যায় নুচি পাড়ায়।

এখন আর সে কথা অবিশ্যি বলা চলে না। নটীর-হাটে জমির বড় টানাটানি। বেশ ভাগাভাগি হয়ে বাড়ির অকুলান। লোকে জমি কিনতে চায়। পঁচিশ টাকার কাঠার জমি হাজার টাকায় সাধা সাধনা করে। সুতরাং একবার উচ্ছেদ করতে পারলে কেউ পুরনো লোককে বসতে দিতে চায় না। একেবারে নতুন মানুষকে কিস্তী করে দেয়। সেইজন্যে; হালের নটীর হাটের অন্যান্য পাড়ায়ও দেখা যাবে, নতুন বাড়ি উঠেছে। হালফ্যাসানের নতুন বাড়ি, দেওয়ালের চেয়ে জানালা বেশী, কাঠের চেয়ে কাঁচ বেশী। ঘরে ঘরে জ্বলে বিজলী বাতি।

অষ্টপ্রহর গান আর বক্তৃতা শোনা যায় রেডিওতে। কিন্তু কেওরাপাড়া এখনো কেওরাপাড়াই। হাড়ি পাড়া হাড়ি পাড়াই। পৌর সভার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই, এখনো মরা গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর এখানেই এনে ফেলা হয়। সেই একই শকুনেরা তাদের বংশ পরম্পরায় মোচ্ছব। ক্ষেত্র ছেড়ে পৌর সভার নির্দিষ্ট ভাগাড়ে যায় না। হোদো ডোম এসে ছুরি দিয়ে ছাল ছাড়াতে বসে যায় গঙ্গার ধারে। শুয়োরেরা তাদের জন্ম মৃত্যুর খেলা খেলে চলেছে ঠিকই। আর যদিও পৌর সভার বানিং ঘাট নির্দিষ্ট আছে বৈদিক পাড়ার সীমানায় হীরাপুরের খালের ধারে, তবুও নটীর হাটের সব ঘাটই শ্মশান, রকবল, লোহার রেলিং দিয়ে রাখা খেয়া ঘাটের সীমানাটুকু ছাড়া। তাই নটীর হাটের মৃত্যুর সঠিক হিসাব যদি কারুর কাছে পেতে হয়, তবে তা এই কেওরা হাড়ি ডোম পাড়াতেই বুড়োবুড়িদের কাছে পাওয়া যাবে।

বংশী মুখুজ্যের দখল নিতে আসার মতো ঘটনা নতুন নয়। নয়ন কেওরার গতি হয়নি? না হয়েছে তো না হয়েছে! আইন তো আইন। নয়ন কেওরার জীবন স্বত্ব ঠিকে, যে মুহূর্তে নয়ন মরেছে, সেই মুহূর্তেই তার দাবী শোধ হয়েছে। সুতরাং এক মুহূর্তে ঘর খালি করে দিতে হবে। অবশ্য ঘরটাও তুলে নিয়ে যেতে পারে টগর। নয়নের ছেলে রাখাল এখন ছোট। গরু মরলে মাছি খবর দিয়ে আসে আকাশে শকুনের কাছে। বংশী মুখুজ্যে একলা নয়, অন্যান্য পাড়ার জমিদারেরা সবাই এসেছে খবর নিতে। কোন সীমানায় কার জমীতে মরল, দেখতে এসেছে সবাই। নইলে ফাঁকি পড়ে যাবার সম্ভাবনা। কে কোনখান দিয়ে এসে কাগজপত্রে কি লিখিয়ে কার টিপসই নিয়ে বসে থাকবে, নিশ্চয়তা কি?

এই গোটা পাড়াগুলি যেন কোর্ট কাছারির হিসেব নিকেশ মানে না। যেন যার যে-দিক দিয়ে রাজাবেরে চলে গেলেই হ'ল, কিস্তি মাৎ। নয়ন কেওরার বুকের ওপর থেকে উঠল টগর। অর্ধ দিগম্বরী, টগরের সে মূর্তি ভয়ংকরী। বয়স অল্পই তার। অসহায় জীবনের লাবণ্য না থাক, রুক্ষ যৌবনের বন্যতা তার সারা অঙ্গের ওঠা-নাবায়, এক পিঠ সাপ-কিলবিলে রুক্ষ চুল। তার দুপুরে গঙ্গার সেই উঁচু পাড়ে, মনে হল, টগরের ছায়া পড়েনি মাটীতে। ভাগাড়ে বোধহয় মরা ছিল, আকাশে তখন শকুন উড়ছে। নয়নের গর্ভবতী বাড়ী শুয়োরটাও সেই মূর্তি দেখে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল। যেন বলতে চাইল, আমাকে মের না, আমি কোন ক্ষতি করিনি। টগর বুক চাপড়ে, চুল ছিঁড়ে বংশী মুখুজ্যেকে গাল দিল, অভিশাপ দিল। বংশী মুখুজ্যের লোকেরা হুকুম পেয়ে ঘরের বেড়া দিল ভেঙে। বংশী মুখুজ্যে হয়ত কিছু ক্ষমা ঘেন্না করতে পারত। নটীর হাটের আদি লোক হলে হয়তো আজকের মত নিষ্কৃতি দিত। মৌরসী পাট্টা গাড়বার আগে, জীবনসত্ব বাতিল করে নতুন করে ঠিকে দিতে পারত টগর কেওরানির নামে। কিন্তু বংশী মুখুজ্যে এখানকার লোক নয়। নটীর হাটের সে দৌহিত্রের সম্পত্তি

পাওয়ার স্বপ্ন ঘরে এসেছে। নটীর হাট আজও তার কাছে বিদেশ। যদিও স্থায়ী হয়ে বসেছে সে এখানে। মায়ের দিকে তাকিয়ে রাখালের ভয় করছিল বটে। কিন্তু বংশী মুখুজ্যে ভয় পাচ্ছিল না, সেই জোরে সে বাঁচেনি। পাড়ার লোক জনেরা সবাই হাতাহাতি করে ঘরের জিনিষ বার করলে। কিছু কাঁথা, মাদুর, তেলচিটে বালিশ। গোটাকয়েক কলাই এ্যালুমিনিয়ামের থালা; গেলাস, নয়নের সারা জীবনের সম্পত্তি। কিন্তু ব্যাপার ঘটল অন্য রকম। বংশী মুখুজ্যের ভাইপো সুন্দর। সুন্দর দাঁড়িয়ে ছিল কাছেই। খুড়ো ভাইপো চিরদিনের সাপে নেউলের সম্পর্ক। যে ভাইপোকে বংশী বলে বেজন্মা, নটীর হাটে সেই তার প্রধান শত্রু। শুধু নটীর হাটে নয়, তার জীবনেই সবচেয়ে বড় শত্রু। এই সুন্দরের জন্মেরও আগে নটীর হাটের নবকিশোর চাটুজ্যের বিধবা মহামায়ার শেষ অবস্থার সংবাদ পেয়ে যেদিন প্রথম এল বংশী, আর তারই পিছনে পিছনে নবীনের স্ত্রী কিরণও এল মুমূর্ষু নবীনকে একলা ফেলে, সেই দিন থেকেই নটীর হাটের আর এক কাহিনীর শুরু।

সুন্দর এল, এসে দাঁড়াল একেবারে নয়নের শবের কাছাকাছি। সুন্দর বলল, জায়গার অভাব কি? পিটুলীতলার ভোলা কেওরার জায়গাটাতো ফাঁকাই আছে। ওটা আমার সীমানার মধ্যে। ঠিকে বন্দোবস্ত দেখাপড়া করে নিও, নয়নের বউকে এখন ওখানেই উঠতে বল। সকলের যেন সম্বিত ফিরল। সবাই ফিরে তাকাল সুন্দরের দিকে। খুড়োর সঙ্গে ভাইপোর চেহারার কোন মিল নেই। বংশী মুখুজ্যে ফরসা মোটা বেঁটে। সুন্দর শ্যাম-বর্ণ, দীর্ঘদেহ, প্রত্যহের দেহচর্চায় কেমন একটু সুঠাম বলিষ্ঠতা কিন্তু মিষ্টতা তার অঙ্গে অঙ্গে। বংশী মুখুজ্যে যখন হিংস্র হয়ে বলে, মুখুজ্যে বংশের রক্ত মাংসে কিছু নেই ওই অ-জাতের গায়ে, তখন সুন্দরের দিকে তাকিয়ে বংশগত চেহারার বিশ্বাসী মন চলে উঠতে চায়। বংশীর দাদা, সুন্দরের বাবা, মুমূর্ষু নবীনকেও যারা দেখেছে নটীর হাটে, তারাও জানে, সুন্দরের সঙ্গে নবীনের সত্যি কোন মিল নেই। মায়ের সঙ্গেও মিল নেই সুন্দরের। শুধু যা কিরণের চোখ দুটি ছাড়া! সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত শ্বেত অপরিমিততার মেলু জুড়ে বসে থাকা ভ্রমরের মত সেই চোখ। আর আজানুলম্বিত বলিষ্ঠ দুটি হাত। অত বড় হাতও নেই মুখুজ্যে বংশে! যে-হাত একবার মাত্র বংশী মুখুজ্যে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করেছিল। বংশীকে অনেক দিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল। সে সুন্দরের সামনে দাঁড়িয়ে, ওকে গালাগাল দিয়েছিল। বংশী, সুন্দরের সেই শেষ, আর সামনে দাঁড়িয়ে গাল দেয়নি। সুন্দরের আশ্বাস বাণীতে আজই মানুষগুলি সব যেন দিশা ফিরে পেল। সুন্দরের সঙ্গে তাদের কিছু যেন জানাজানি আছে।

কিন্তু উপনো টগর চুপ করল না। সে গলার দিকে মুখ করে চিল-গলায় যে দরদ কাহিনী বিবৃত করে গেল, তার মর্মার্থ হল, এই যে ঘাটের মরা মিনসে (বংশী) আজ তাকে আইন দেখিয়ে, মরা স্বামীসহ ঘরের বার করলে, টগরের কাছে তার অভিসারের কথা কেওরাণি ভুলে যায়নি। এও ভুলবে না, রসের নাগরের সঙ্গে সে যদি ভাগাড়ের অন্ধকারে গিয়ে পীরিত করত, তবে আজ তাকে উচ্ছন্নে হতে হত না। যে মেয়েমানুষের ছায়া দেখলে বংশী মুখুজ্যের স্নান করতে হয়, তাদের পা চাটতে আসতে ঘেন্না করে না। টগর তাদের মুখে থুথু দেয়, তাদের গোলির মুখে, ইত্যাদি। মরা নয়নকে সাক্ষী করে এসব কথা সাড়ম্বরে বলল টগর।

মেয়েরা এসে ঘরে করে শান্ত করল তাকে। আর এ ধর্মের পৃথিবীতে যদি ব্রহ্ম তেজ বলে কোন বস্তু থাকত, তবে বংশী মুখুজ্যের চোখের আগুনে তার ভাইপো সুন্দর পুড়ে মরত।

কিন্তু সুন্দর অম্লান। রাখাল বুঝল, মায়ের সঙ্গে থাকবার জন্যে একটি বাসস্থান তাদের হল, তবু বংশী মুখুজ্যের প্রতি ঘৃণা তার গেল না! মানুষকে ঘৃণা এবং রাগ করে মেরে ফেলার মত রাগটা তার গেল না কিছুতেই। কেওরা পাড়ার কেওরা ছেলেদের মত জীবন মরনের এ খেলাকে সে অবহেলার বলে স্বীকার করল না। রাখাল ঘৃণা করতে শিখল।

কোথা থেকে কি হয়ে গেল। নয়নের মরা নাম্বিয়ে নিয়ে গেল কয়েকজন গঙ্গার ধারে। কয়েকজন মিলে, নয়নের পুরনো বেড়া আর চাল দিয়েই ঘর খাড়া করে ফেলল, ছোলা কেওরার পতিত জিটেতে। কেবল ঘরে গেল না টগর। কেওরা পাড়ার বটের তলে, ধনলা জলায় পড়ে রইল উপুড় হয়ে। নন্দ হাড়ীর কছে রইল রাখাল। বাপ মরেছে, বংশী বুখুরো ঘর ভেঙ্গে দিয়েছে, নতুন ঘর হয়েছে, মা পড়ে আছে গাছ তলায়। তবু রাখালের বাঁশীতে দু দেবার সাধ ঠোঁটের কূলে এসে কাঁপতে লাগল। নন্দ হাড়ীর কোন ঘর নেই। বচন সাধুখাঁর জমিতে তার বাস ছিল হাড়ীপাড়ায়। তার নয়, তার বিধবা মায়ের বাস ছিল। বচনের সঙ্গে তার মা নষ্ট হয়েছিল। নন্দ তখন ধরা সরা জোয়ান, তাই শুধু মাকে নয়, বচনকে নাকি মেরে আধমরা করে সে রেখে এসেছিল বচনের বার বারান্দায়। তিন বছর জেল খেটেছিল নন্দ, ফিরে এসে শুনেছিল শুধু, তার শোকেই মা মারা গিয়েছে। নন্দ আর কোনকালে ঘর বাঁধেনি। দুর্বৃত্ত বলেই কুখ্যাত হয়েছিল সে। কিন্তু দুর্বৃত্তের হাতের বাঁশীটা কেমন করে মায়া ছড়ায় সেটাই বিস্ময়। তখনকার নটির হাটের খেয়া ঘাটের বিরিঞ্চিলাল ঘাটদার সেই বাঁশী শুনেই মাঝির কাজ দিয়েছিল তাকে।

কিন্তু কোন কালেই নন্দ একঠাঁই থাকবার মানুষ নয়। পুটনী নৌকোয় করে বিদেশী জাহাজের সঙ্গে কোলকাতা বন্দর আর পশ্চিমদেশের ঘাটে ঘাটে ঘুরেছে। এই চল্লিশ বছর বয়সে, নটীর হাটের ঘাট ছেড়ে আর কোথাও এখন যেতে ইচ্ছে করেনা নন্দ হাড়ির।

আজ আমি, বংশী বুখুরো আর সুজন বুখুরো, বুড়ো ভাইপোকে দেখছি। দেখছি, তাই আমার আটাশ বছর আগের, এক ঘোর দুপুর দিনের কথা মনে পড়ছে।

আটাশ বছর আগে, একদিন ঘোর দুপুরে একটা রেলগাড়ি এসে দাঁড়াল নটীর হাট স্টেশনে। তখন নটীর হাট স্টেশনের চেহারা, আজকের মত ছিল না। এত প্ল্যাটফরম, এত শেড দিয়ে ঢাকা, এত দোকানপাট, কিছুই ছিল না।

ছোট স্টেশন, নিচু প্ল্যাটফরম। বৃষ্টি হলে জল জমে যেত স্টেশনে। স্টেশনের আশেপাশে মেলাই ঝাঁসকাওড়ার জঙ্গল, বট অশথের ছায়া, তেঁতুল শিমুলের ভিড়। পাখী ডাকতো শিক্‌শিক্ করে।

এখন যেমন, যাত্রীদের চেচামেচিতে, কেরীওয়ালাদের ডাকাডাকিতে কানপাতা দায়, তখন তা ছিল না। মনে হত, নটীর হাট যেন কোন আধা গ্রামের স্টেশন। স্টেশনের বাইরে কুল্যে গুটি তিনেক ঘোড়ার গাড়ি। তাও ঘোড়ার গাড়ির যাত্রী তেমন মিলত না। ঘোড়ার গাড়ি চাপবার লোক হাতে গোনা যেত।

আমি দেখলাম, একটা লোক, বয়স তিরিশের কাছাকাছি, বেঁটে মোটা কদমা, প্রায় লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল। লোকটা জামাটাও গায়ে দেবার অবকাশ পায়নি, সেটা কাঁধেই ফেলে রেখেছে। কদমা মোটা গারে, পৈতাগাছটি ঘামের সঙ্গে ল্যাপটানো। হাতে মুঠো করে ধরা রেলের টিকেট। লোকটা ডাইনে তাকাল না, বাঁয়ে তাকাল না, যেন পড়ি মরি করে ছুটল গেটের দিকে। একটু লাল লাল চোখে, কেমন যেন একটা শকুনের দৃষ্টি তার।

ভাবলাম, কী ব্যাপার, এমন লোভীর মত হন্তে হয়ে লোকটা ছুটছে কোথায়। শকুন কি মরার খোঁজ পেয়েছে নাকি।

আরো একজনকে আমার চোখে পড়ল। সে মেয়েমানুষ। সধবা এয়ো স্ত্রীলোক, রূপ দেখে আমার চোখে কেমন যেন একটা ধন্দ লেগে গেল। নটীর হাটে রূপের অভাব ঠিক নেই, তবু বলতে হবে, আর এক নতুন রূপসী এল।

কত আর তার বয়স হতে পারে। পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী না। এদিকে, গৌরী মেয়েটির গায়ে যেন একটি চিকণ স্নিগ্ধতার ঢল ঢল ভাব, অথচ একহারা ভাবের গড়ন। সুগঠিতা সুন্দরী যদি বলতে হয়, তবে এমন গঠনকেই বলতে হয়। গঠনের জন্যেই নারীকে নাম দিতে ইচ্ছা করে সুগতা। কেন না, তার গমনের ছন্দে যেন চির আকাঙ্খার দোলা লেগে যায়।

তার গায়ে গলায় গহনার বাহুল্য নেই। সামান্য এক-গাছি সরু সোনার হার গলায়। হাতে শাঁখা নোয়ার সঙ্গে, দু গাছি করে তামার পাতে মোনা মোড়ানো চুড়ি। নাকে-আকছাবি। খালি পা। একটা সামান্য জামার ওপরে একটি লালপাড় মোটা শাড়ি পরা। তাতেই সে অসামান্য।

সে লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামল না বটে, কিন্তু বড় ব্যস্ততা। তার প্রতিমার মত মুখে, আয়ত চোখে যেন কিসের উদ্বেগ ব্যাকুলতা। বড় অস্থির সে। সেও ডাইনে বাঁয়ে তাকায় না, দ্রুত চলে গেটের দিকে। অথচ তার দৃষ্টি বারে বারে, তার আগে আগে চলা, বেঁটে মোটা ফরসা লোকটির দিকে পড়ছে। দূরত্ব তাদের বেশ খানিকটা। কারণ সধবা স্ত্রীলোকটি ছিল গাড়ির একেবারে পিছনের কামরায়। আর আগের লোকটি আগের দিকে ছিল।

স্টেশনের বাইরে এসে লোকটা সোজা হাঁটা ধরল দক্ষিণ দিকে। একবার পিছন ফিরে তাকাল না। যেন কী হারাতে বসেছে সে।

স্ত্রীলোকটিও দূরত্ব বজায় রেখে তেমনি ভাবেই দক্ষিণে চলতে লাগল।

ভাদ্রমাসের সেই ঘোর দুপুরে। রাস্তায় একটা কুকুর পর্যন্ত দেখা যায় না, মানুষ তো কোন ছার। তখন দোকান পাট এত ছিল না। যে কটা ছিল, সবই সেই দুপুরে বন্ধ। ঠা ঠা রৌদ্র, আগুন আলানো ভাদ্রের দুপুরে রাস্তাটা খাঁ খাঁ করছে। সেই পথ দিয়ে দু'জন চলেছে, সমান দূরত্ব রেখে।

ব্যাপারটা কেমন যেন সন্দেহজনক ঠেকল। দু'জনের মধ্যে কোন রকমের একটা যোগাযোগ আছে বোধহয়। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

প্রায় আধ মাইল গিয়ে, সামনের লোকটি, কোনদিকে না তাকিয়ে ডাইনে মোড় নিল। এখন যে-রাস্তার নাম হয়েছে, নবকিশোর চ্যাটার্জি রোড, তখন সে রাস্তার নাম ছিল বৃন্দাবনের গলি। কারণ সে রাস্তায় ছিল বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির। তখন রাস্তা ছিল কাঁচা, দু পাশে জঙ্গল। আশে পাশে অল্প বাড়ি। আর খালের মত মস্ত কাঁচা নর্দমা। এখনকার মত, সে রাস্তা তখন পীচ ঢালাই করে বাঁধানো হয় নি।

সামনের লোকটা ডাইনে গিয়ে। বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির পার হয়ে, বাঁ দিকের একটা সরু গলিতে ঢুকল। ওটা আসলে গলি নয়, একটা বাড়িতে যাবার রাস্তা। রাস্তাটার দু পাশে, ঝুনো ঝনসার ঝাড়। ভাদ্রের রোদে ঝুনো ঝনসার ঝাড় যেন শুকিয়ে গিয়েছে।

ঝুনো ঝনসার ঝাড়ের বেড়ার দু পাশেই আম জাম নারকেল গাছ, গৃহস্থের বাগান, বোঝা যায়। গলিটা সোজা গিয়ে শেষেছে, একটা বড় গন্ধাল পোঁতা দুপাল্লার খেউড়ির সামনে। পুরনো দরজা, রঙ উঠে গিয়েছে অনেককাল, গজালগুলো ক্ষয়ে গিয়েছে। দরজার পাল্লা দুটো হাট করে খোলা। খোলা দরজার দুপাশে, বসবার হেলান দাওয়া। পাকা দাওয়া। দাওয়ার সিমেন্ট উঠে গিয়েছে, ইঁট বেরিয়ে পড়েছে, বড় বড় ফাটলে হা করে রয়েছে। দেখলেই মনে হয়, গোখরোর চেরা জিভ লকলকিয়ে ওঠাটা আশ্চর্যের কিছু না।

লোকটা যখন সেই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল, সেই রূপসী স্ত্রীর বউটি তখন সরু গলির মুখে। সেও এগিয়ে আসতে লাগল এ বাড়ির দিকেই।

লোকটি খেউড়ি পার হয়ে উঠোনে ঢুকলো। সামনে ঠাকুর দালান। মন্দির নয়, দেউলের কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু এ ঠাকুরদালানে যে আর পূজা পাট হয় না, তা বোঝা যায়। ঠাকুর দালানের সিঁড়িতে ঘাটলা, ঘাওলা ধরা, চারদিকে ভাঙাচোরা। থামগুলোও সব আস্ত নেই, পলেস্তারা খসে গিয়েছে। ছাদ ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। অনেক দিন দাঁড়িয়ে থেকেছে, কিন্তু থাম আর ভার বইতে পারে না, ইমারত মাটি নিতে চায়।

বাঁ দিকে বসত বাড়ির দালান। তার দরজাও খোলা। সেখানেও চারদিকে ভাঙাচোরা, জরাজীর্ণ অবস্থা। ঘাওলা আর বট অশথের চারা গজিয়েছে ইঁটের ফাঁকে। লোকটি বসত বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল। সেখানেও আলাদা উঠোন রয়েছে। উঠোনের তিন

দিকে ঘর, একদিকে ছোট পাচিল, পাচিলের ওপাশে বাগান, যে-বাগান দেখা গিয়েছিল, ঢোকবার সময় ফনী মনসার ঝোড়ার ওপারে। ছোট পাচিলের গায়ে, বাগানে যাবার দরজা। কাঁচা উঠোনের এখানে ওখানে কৃষ্ণকলি ফুলের ঝাড়। দু'তিনটে লেবু গাছ। উঠোনে ঘাস গজিয়ে গিয়েছে।

লোকটি উঠোনে ঢুকে, ডানদিকে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল ঘরে ঢুকবে বলে। তখনই তার নজর পড়ে বাগানের দরজার কাছে। সে থমকে দাঁড়াল। সেখানে একজন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। ছাব্বিশ সাতাশের বেশী বয়স নয়। শ্যামবর্ণ, আজানুলম্বিত বাহু, দীর্ঘ শরীর। চোখা নাক, টানা চোখ, পুরুষের মধ্যে যে কৌমার্যের একটা সৌন্দর্য থাকে, একে দেখে তা-ই মনে হয়। দৃষ্টিতে বুদ্ধির আলো, অথচ গম্ভীর। মাথার চুল ছোট করে কাটা। সামান্য একটা ধুতি সাধারণ ভাবে পরা। খালি গা, চওড়া শক্ত বুকের ওপর ধবধবে শাদা উপবীত দেখা যায়।

আগন্তুক লোকটি যুবকের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল। যুবকটিও আগন্তুকের চোখের দিকে তাকাল। আগন্তুক তখন দরদর ধারে ঘামছে। করসা মুখ আর চোখ, দুই-ই লাল হয়ে উঠেছে। লাল চোখের দৃষ্টিতে সেই লোভের চকচকানি, এবং এখন কিছুটা সন্দেহে কুটিল।

আগন্তুক মুখ ফুটে যখন, যুবকটিকে কিছু জিজ্ঞেস করতে উদ্যত হয়, তখনই যুবকটি মুখ ফিরিয়ে, বাইরের দরজার দিকে তাকায়। তার দৃষ্টি লক্ষ্য করে আগন্তুকও সেদিকে ফিরে তাকায়। সেখানে এসে তখন দাঁড়িয়েছে, লালপাড় শাড়ি পরা, সুগৌরী বউটি।

বউটিকে দেখেই, আগন্তুকের চোখে বিস্ময় দেখা দিল। সেই সঙ্গে একটা ক্রূরতাও। বলল, 'একি বৌঠান, তুমি এর মধ্যে এলে কী করে এখানে?'

বউটিও তখন ঘামছে। তার করসা মুখে রক্তাভা, ঘামে ভেজা। আয়ত চোখের দৃষ্টিতে একটা দৃঢ় কাঠিন্য। সে কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, 'তুমি যে ভাবে এলে ঠাকুর পো, সে ভাবেই।'

'একই গাড়িতে?'

'হ্যাঁ।'

'আর দাদা? তোমার মরণাপন্ন স্বামীকে ফেলে, এ ভাবে চলে এলে?'

বউটির রক্ত রেখাঙ্কিত ঠোঁটের কোণে একটু যেন বাঁক লাগলো। বলল, 'হ্যাঁ, স্বামীর অনুমতি নিয়েই এসেছি, মরণাপন্ন দিদিশাশুড়িকে দেখতে।'

আগন্তুকের চোখ মুখ আগুনের মত দপদপ করে উঠলো। মুখটা বিকৃত করে, দাঁতে দাঁত পিষে হেসে বলল, 'দেখতে নয়, বল সম্পত্তি সামলাতে।'

বউটি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। বলল, 'তুমি যদি তা-ই এসে থাকো, তবে আমিও তা-ই এসেছি।'

'কিন্তু তুমি জানলে কী করে, আমি নটার হাটে এসেছি?'

'যেমন করে তুমি জেনেছ?'

বলে বউটি বাগানের দরজার কাছে, যুবকটির দিকে তাকাল। যুবকটি তেমনি শান্ত, স্থির, গম্ভীর। সে দুজনকেই দেখছিল, এক ভাবেই দাঁড়িয়েছিল।

আগন্তুক এবার তার দিকে ফিরল। যুবককে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি দীপেন্দ্রনাথ—মানে দীপু?'

যুবকটি শান্ত গলায় জবাব দিল, 'হ্যাঁ'

'তুমিই আমাকে চিঠি দিয়েছিলে?'

যুবক বললো, 'আমি এখনো আপনার কোন পরিচয় পাই নি।' আগন্তুক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে বললো, 'আমার নাম বংশীচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।'

যুবক তেমনি শান্ত গলায় বললো, 'হ্যাঁ, চাটুজ্যে গিন্নি আপনাকে চিঠি দিতে বলেছিলেন।'

'আর এ জানল কী করে?'

বলে বউটিকে ইশারা করে দেখালো। বউটি তখন থেকে, দীপেন্দ্রর দিকেই তাকিয়েছিল। আমার মহাকালের চোখে যেন দেখলাম—এক সধবা স্ত্রীলোকের দুটি আয়ত কালো চোখে, এক কুমারীর দৃষ্টি। দীপেন্দ্র চোখ তুলে, বউটির দিকে তাকাতেই, বউ দৃষ্টি একবারের

জন্যে নত করল। দীপেন্দ্রও তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে বললো, 'উনি যদি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী হন, তা হলে, ওঁকেও চাটুজ্যেগিন্নির বাসায় চিঠি দিয়েছি আমি।'

বংশীচন্দ্রের মুখে একটা তীব্র বিদ্বেষ ফুটে উঠলো, 'ওঃ বুড়ি মরতে চলেছে, তবু এদিক ওদিক হবার যো নেই। কোথায়, দিদি মা কোন্ ঘরে?'

'সামনের ঘরেই আছেন, বাম।'

'বেঁচে আছেন তো?'

দীপেন্দ্র কোন জবাব না দিয়ে বাগানের দিকে ফিরতে উদ্যত হল। বংশীচন্দ্র চমকে উঠলো। 'তুমি এখানে কী কর।'

'আমি এ বাড়ির, বৃন্দাবন চন্দ্রের পূজারী, আর চাটুজ্যে গিন্নিকে দেখাশোনা করার কেউ নেই, তাই দেখা শোনা করি।'

বংশীচন্দ্রের ঠোঁট দুটো উল্টে গেল। বললো, 'তা হলে তোমার পূজার দিন ঘনিয়ে এসেছে বলে দিলাম।'

বউটি দীপেন্দ্রর দিকেই অপলক চোখে তাকিয়েছিল। বললো, 'আমি কিন্তু তা বলি না। আপনিই হচ্ছেন দিদিমার সত্যিকারের আপন লোক। কিন্তু সংসার কী বিচিত্র, ওঁর মরবার সময় সম্পত্তি নিতে এসেছি আমরা।' দীপেন্দ্র চোখ তুলে বউটিকে একবার দেখলো। তার সে চোখে চকিতে একটু বিস্ময় বিলিক দিয়ে গেল। আবার তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে বললো, 'চাটুজ্যে গিন্নি আমাকে ছেলেবেলা থেকেই ভালোবাসেন।'

বংশী ঘরে ঢুকতে গিয়েও ফিরে বললো, 'দেখ বৌঠান ওসব বড় বড় কথা বলে ঢাকামী করো না। যা করতে এসেছ, তা-ই কর। কে কার আপন, তা আমার জানা আছে।'

বলা বাহুল্য বউটি নবীন মুখুজ্জের স্ত্রী কিরণ। কিরণ আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বললো, 'ঠাকুর পো, তোমার জানা তোমারই থাক। আমার নিজের জানাটা নিজের জন্যেই থাকুক।'

বলে দীপেন্দ্রর দিকে ফিরে বললো, 'দিদিমার বৃন্দাবন চন্দ্রের পূজা আপনিই বরাবর করবেন।'

দীপেন্দ্র মুখ না তুলেই বললো, 'আমার অভাবের জন্য পূজা বন্ধ নয়। ঘরে দু মুঠো অন্নের সংস্থান আমার আছে। চাটুজ্যেগিন্নির জন্যেই আমার এ কাজ করতে হয়।'

কিরণ, হাসির কিরণ ছড়িয়ে বললো, 'এবার আমাদের জন্যই আপনাকে এ কাজ করতে হবে, ছাড়তে পারবেন না।'

বংশী ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললো, 'আর থাক, পূজারী বামুনের সঙ্গে আর অত আঁসনাই দেখাতে হবে না।'

কিন্তু কিরণ সে কথায় কোন কান দিল না। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

দীপেন্দ্র খুব গম্ভীর গলাতেই বললো, 'আমি এই মাত্র চাটুজ্যেগিন্নিকে পরিষ্কার করে দিয়েছি, তা-ই পুকুরে যাচ্ছি চান করতে।'

বলেই সে অদৃশ্য হয়। কিরণ সেদিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার অন্ধকার ভাব। দরজা দিয়েই সামান্য যা আলো এসেছে। সেই আলোয় কিরণ দেখলো, বংশী ঘুমন্ত বৃদ্ধার শিয়রে হাতড়াচ্ছে। কিরণ ডেকে উঠলো, 'দিদি মা, দিদি মা।'

বৃদ্ধ নড়ে উঠলেন। গোঙানো স্বরে জিজ্ঞেস করলেন। 'কে?'

কিরণ বললো, 'আমি আপনার রামলস্করের নাতবউ, কিরণ।'

বংশী অলস চোখে কিরণের দিকে তাকালো। সে তাড়াতাড়ি বললো, 'আমিও এসেছি দিদিমা, আমি বংশী।'

দিদিমা তেমনি সান্নাসিক গোঙানো স্বরে বললেন, 'তোরা এসেছিস? আ, আমি আর, আমি আর বেশীক্ষণ না।'...

এইটুকুনি বলতেই তাঁর অনেক সময় লেগে যায়। কিরণ তক্ষণে জানালা খুলে দেয়। ঘরে আলো আসে।

বংশী বলে উঠলো, 'জানালা খুলে দিলে যে? দিদিমার ঠাণ্ডা লাগবে না?'

দিদিমাই আস্তে আস্তে বললেন, 'না। খোলাই তো থাকে। আমি ঘুমিয়েছি ভেবে দীপঠাকুর বন্ধ করে দিয়েছে বোধহয়।'

বংশী আবার প্রশ্ন চোখে তাকালো কিরণের দিকে। কিরণ গিয়ে দিদিমার পা ধরে বসে। বলে, 'দিদিমা, আপনি তো মাথা তুলতেই পারবেন না, আর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা হবে না। এমনিই জানাবো।'

দিদিমা আবার বললেন, 'ওতেই হবে লো, ওতেই হবে। আমি তো যাবার পথেই।'

বংশী আর একবার ঠেক খেল। তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'আমার পেন্নাম নিও দিদিমা।'

দিদিমা বললেন, 'হ্যাঁ ভাই। আমি ঘুমোই নি। ভাবলাম দীপঠাকুর আমার বালিশ ঠিক করে দিচ্ছে।'

কিরণ বলে উঠলো, 'না দিদিমা, উনি আপনাকে মুক্ত করে চান করতে গেছেন। ঠাকুরপো আপনার শিয়রে হাতড়াচ্ছিল।'

বংশী গর্জন করে উঠলো, 'মিছে কথা বলো না বৌঠান, বলে দিচ্ছি।'

কিরণ কঠিন মুখে হেসে বললো, 'মিছে কথা আমি বলি নি, ঠাকুর পো।'

বংশী সেকলে বাঁধা ভালুকের মত কিরণের দিকে চেয়ে থাকে। কিরণ দিদিমার পা আস্তে আস্তে টিপতে টিপতে রামনগরের সংবাদ দিতে থাকে।

আর আমি মহাকাল দেখি এক নতুন নাটক। নটীর হাটের নতুন নাটক, নতুন কুশলব। প্রতিটি মুহূর্তে মুহূর্তে, অঙ্কে অঙ্কে তার নতুন বৈচিত্র আর বিস্ময়। মানব জীবন মনের এক দুর্জ্ঞেয় দুরূহ অন্ধকারের প্রকাশ।

সম্পত্তি ভাগের দলিল দস্তাবেজ ঠিকই ছিল। বৃদ্ধা মাতামহী, তাঁর বিশাল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, দুই দৌহিত্রকে ভাগাভাগি করে, আগেই কাগজপত্র করিয়ে রেখেছেন। স্বয়ং বিধুভূষণ কবিরাজ, যিনি তাঁর নিবেদন লেখকছেন, তিনি দলিলের একজন সাক্ষী। আর দীপেন, যে বৃদ্ধার সেবা করে। সে আর একজন সাক্ষী।

কিন্তু নতুন নাটক জমে ওঠে অন্য দিকে। যে দিন বংশী আর কিরণ এল, সেই রাত্রেই বৃদ্ধার বাক্ বন্ধ হল। পরদিন সকালবেলাই তিনি মারা গেলেন। বংশী কিরণের বেটা আশা ছিল, বৃদ্ধার মুখ থেকে সম্পত্তির কথা কিছু জানতে পারবে, সেই আশাটা আর রইল না। অথচ সকলেই জানত, গুপ্ত সম্পত্তির কথা বৃদ্ধা নিজের মুখে কিছু বলে যাবেন, যে-সংবাদ তিনি ছাড়া আর কেউ জানতেন না।

শব যাত্রার সময় গোলমাল দেখা দিল, বৃদ্ধার বালিশ খুঁজে পাওয়া গেল না। বংশী কেবল পাগলের মত চিৎকার করলো না, সে শ্মশানেও গেল না। হয় তো সে কিরণের গায়ে হাত তুলতো। তবটা সাহস অবিশ্যি পায় নি। কিন্তু গোটা বাড়িটা সে বালিশের খোঁজে তছনছ করেছে। বালিশের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় নি।

একমাত্র আমিই তখন জানতাম, সে বালিশ কোথায় ছিল, কার কাছে ছিল, তাতে কী ছিল। সেই বালিশ বাগানের পুকুরের জলে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তুলোতে মাটি মাখিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে, জাকড়া কাদায় পুঁতে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ছিল দামী হীরার জড়োয়া গহনা, কিছু নগদ টাকা।

বালিশটা সরিয়েছিল কিরণই। বৃদ্ধার মৃত্যুর মুহূর্তে, সকালবেলা বংশী যখন চান করতে যায়, সেই অবসরেই কিরণ বালিশ সরায়। তবে একলা আমিই সেটা দেখি নি, আরো একজন দেখেছিল, তার নাম দীপেন্দ্রনাথ। কিরণও সেটা আঁচ করেছে, তবে সঠিক কিছু জানতে পারে নি।

কিন্তু সেই দিনই দুপুর থেকে, বংশী একটু ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তার চোখ মুখ চকচক করতে লাগলো। কেন তাও আমি জানি। দাদামশায়ের ঘরে যে সিন্দুক ছিল, তার চাবি খুঁজে না পেয়ে, শাবলের চাড়ে সেটাকে সে খুলে ফেলেছিল। তার মধ্যে কাগজ পত্র বই পুঁথি

ইত্যাদি ছাড়াও, সে পেয়েছে একটা তামার ঘটি। ঘটির মধ্যে কিছু না হোক, পঞ্চাশ ষাট-টা প্রাচীন সোনার মোহর ছিল।

শ্মশানযাত্রীরা ফিরে আসা পর্যন্ত, আমি দেখলাম, নটীর হাটের এক প্রাচীন চাটুয্যে বাড়িতে একজন পুরুষ, আর একজন নারী, ইঁদুরের মত গোটা বাড়িটা শুঁকে শুঁকে হাতড়ে হাতড়ে চষে বেড়াতে লাগলো। কেউ যায় থালাবাসনের ভাঁই দেখতে। কেউ যায় পুরনো বিছানা পত্র ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখতে।

কিন্তু এর বেশী কেউ আর কিছু পেল না।

এর পরের নাটকটাই সব থেকে জমাটি। দীপেন্দ্র যখন বিদায় নিতে চাইল, বংশী জানালো, 'এখুনি বিদায় হও।'

কিরণ বললো, 'না, আপনি না থাকলে, এ বাড়িতে আমি অরক্ষণীয়া, আপনি যেমন ছিলেন, তেমনি থাকবেন।'

দীপেন্দ্রর মনের কথাটা আমি বুঝেছিলাম। সে বংশীকে বিশ্বাস করতে পারে নি, কিরণকে সত্যি সে অরক্ষণীয়াই মনে করেছিল, তাই থেকে গিয়েছিল। কিরণ রান্না ঘরে গিয়ে রান্নার দায়িত্ব নিল। বংশী বললো 'তুমি বিষ দেবে, তোমার হাতে খাব না। নটীর হাটের উড়িয়া পাচকের হাতে খাব।'

কিরণ বললো, 'বাঁচালে।'

সে দীপেন্দ্রর রান্নাও নিজেই করলো।

আমি কিন্তু কিরণের চোখে অন্য কথা দেখেছি। আমি ওর, কুমারী বুকের নিচোল উত্তরীয় কান পেতে, ভিতরের কথা শুনেছি। শুনেছি, 'দিদিমাদের পূর্ব পুরুষের ঘড়ায় মোহর ছিল। একটা আধটা নয়, গোনা গিয়েছিল আটটা ঘড়া ভরতি মোহর কোথাও লুকানো আছে। দিদিমা জানতেন তা কোথায় আছে। তিনি বলে যাবার সময় পান নি। কিন্তু সে খবর কি দীপেন্দ্রর অজানা? হতে পারে না। দীপেন্দ্র ছিল বৃদ্ধার চাবি-কাটি। বৃদ্ধা ঠিকই চিনেছিলেন। এমন নির্লোভ সৎ ব্রাহ্মণ সন্তান, সব যুগেই বিরল। দীপেন্দ্রকে আমি ছাড়তে পারব না।'

কিরণের মনের কথা আমার কাছে গোপন থাকে নি। আমি শুধু দেখার দেখা দেখি না, যা দেখা যায় না, তাও দেখি। কিরণ সেই চাবি-কাঠিটি হস্তগত করতে চায়।

কিন্তু কেমন করে?

যেমন করে, চির নারী, চির পুরুষের দরজা ভেঙেছে, তেমনি করে। আমি দেখলাম, শান্ত গম্ভীর কর্মঠ যুবক ব্রাহ্মণটির গায়ের কাছে এমন করে দাঁড়িয়ে আছে, দীপেন্দ্রর সাতাশ আটাশের বুকে তাতে দোলা লেগে যাচ্ছে। এমনি কি আর দাঁড়ায় কিরণ। প্রয়োজনের জন্যেই, কথাবার্তা বলতে হয়। প্রয়োজনেই কাছে আসতে হয়। খাবার পরে, একটি পান, বাটায় করে দেয় না কিরণ, দীপেন্দ্রর হাতে তুলে দেয়। নিজের হাতে ঘটি থেকে জল ঢেলে দেয় হাত ধোবার জন্যে। হাত মোছার জন্যে আঁচল বাড়িয়ে দেয় না, কিন্তু আঁচল ঠেকাঠেকি হয়ে যায়। আঁচল বিস্রস্ত হয়ে যায়। কিরণের সুবর্ণ মণ্ডিত বুক চিকুর হানা বিজলীতে চমকে যায়।

একদিন দেখলাম, ভোরবেলা বাগানে দীপেন্দ্র পুজোর ফুল তুলছে। কিরণ স্নান করে উঠতে গিয়ে, সিঁড়িতে পিছলে পড়ে আর্তনাদ করলো। সিঁড়িতে শ্যাওলা ছিল, পিছল ছিল ঠিকই, কিন্তু কিরণের পা তো পিছলে যায় নি, মন পিছলে ছিল। আর্তনাদ একটু জোরেই করেছিল। দীপেন্দ্র ছুটে এল, ছুটে এসে কী করবে বুঝতে পারছে না।

কিরণ হাত বাড়িয়ে বললো, 'ধরুন, উঠতে পারছি না।'

দীপেন্দ্র ধরলো। পাচিল ঘেরা বাগান পুকুর, কেউ দেখবার নেই। কেবল যে পাখীটা গাছে বসে ডাকছিল, সে ছাড়া। আর কিরণের বিদ্যুৎবহ্নিময়ী শরীর তেমন শাড়ির মধ্যে যেন দ্বিগুণ ছটায় ঝল্‌মল্ করছিল। তার চেয়ে গায়ে কিছু না থাকলে সুবর্ণচ্ছটা বোধহয় কম লাগতো। কিরণ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো দীপেন্দ্রকে।

দীপেন্দ্রর শ্যাম চিবুক মুখে রক্তের ছটা লাগলো। সে মাটির দিকে চেয়ে, নিজের হাত আলগা করে দিল।

কিরণ বললো, 'আমাকে ছুঁতে কি তোমার ঘেন্না করে?'

দীপেন্দ্র মাথা নেড়ে জানালো, না আবার ধরলো কিরণকে। কিরণ তার সর্বাঙ্গ দিয়ে, দীপেন্দ্রকে ধরে, গা ভিজিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরলো. বংশী এ সময়টা ঘুমিয়ে থাকে, কিরণ তা জানতো। তাই একেবারে ঘরের মধ্যে পর্যন্ত দীপেন্দ্রকে নিয়ে গেল। আজ সে প্রথম দীপেন্দ্রকে 'তুমি' সম্বোধন করলো।

ঘরের মধ্যে গিয়েও দীপেন্দ্রকে ছাড়লো না। কিরণ। দীপেন্দ্র কিছুই বললো না, কিছু জিজ্ঞেস করলো না, তার চোখে রক্তের ছটা, সে মাথানিচু করেই রইলো। সহসা কিরণের কী হল, সে চকিতে একবার দীপেন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়েই, একটু হাসলো। নারী যেন মুহূর্তেই টের পেল, দীপেন্দ্রকে পঞ্চশরে বিঁধেছে।

আমিও দেখলাম, মদন শরের জ্বালায়, একেবারে ওর শাদা উপবীতের মত নিষ্কলুষ দীপেন্দ্রর চোখে প্রায় জল এসে পড়ার অবস্থা। কিরণ তার গায়ের নিবিড় সান্নিধ্যে এসে জড়িয়ে ধরলো। দীপেন্দ্র বললো, 'আপনার স্বামী—।' কিরণ বলে উঠলো, 'তিনি চিরদিনই রুগ্ন। আমাকে দেখে কি তোমার মনে হয়, আমার বারো বছর বিয়ে হয়েছে? এখন আমার পঁচিশ, তের বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল। আমি যদি তোমার মত পুরুষের কাছে থাকতে পারি, তবে আমার কিসের ভয়, কিসের চিন্তা?'

'লোকাপবাদে ভয় পান না।'

'অপবাদের ভয় করি না। লোকজন সবাইকে নিয়েই থাকব, কাউকে তো ছাড়ব না। আমি আর এখানে থেকে যাব না। তুমি রামনগর থেকে আমার অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে আসবে, সংসার দেখবে তুমি। আমাকেও দেখবে, পারবে না?'

দীপেন্দ্র চুপ করে রইলো।

সেই রাত্রেই আমি দেখলাম, কিরণ গভীর রাত্রের অন্ধকারে অভিসার যাত্রা করেছে, দীপেন্দ্রর ঘরে। দীপেন্দ্র দরজায় টোকা শুনে, খুলে দেখলো কিরণ দাঁড়িয়ে। সে নিজে হাত বাড়াতে দেখেনি, কিরণই হাত বাড়িয়ে দিল।

আমি মহাকাল, তাই আমাকে দেখতে হল, যখন সুন্দরের ভ্রূণ মাতৃগর্ভে আশ্রয় নিচ্ছে, তখনই কিরণ সেই মোহরের ঘড়ার কথা জানতে চাইল। দীপেন্দ্র না বলে পারলো না। কেবল সে একটি কথা জানলো, যেন সেই মোহরের ঘড়া থেকে বংশীকে ফাঁকি দেওয়া না হয়। কারণ চাটুর্য্যে গিন্নি দুজনকেই সব দিতে চেয়েছিলেন। তা ছাড়া বংশীকে ফাঁকি দিয়ে সে মোহর পাওয়াও সম্ভব ছিল না। কারণ সেই মোহরের ঘড়া ছিল, বাগানের পুব দিকের নিচে।···

আজ আমার সেই আটাশ বছর আগের কথা মনে পড়েছে, সুন্দরের বয়স এখন আটাশ। তারপরেও অনেক কথা আছে। কিন্তু তার আগে আমি অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাই, যেখানে হাল আমলের সেই ছেলেটি আপন লীলায় চলছে।

আমি নটীর হাটকে দেখছি, প্রতি পলে পলে দেখছি। এই পাল কুণ্ডু সাধুখাঁদের দেশ নটীরহাট। অবশ্য সবাই পরের সম্পত্তিতে বড়লোক নয়, নিজেরও আছে অনেকের। ব্যবসাটা ওদেরই একচেটে।

কিন্তু ও উলুপী বারুণী, সৌরভীবালা, সুখদারা কারা?

ওরা সেকেলে নটী। অর্থাৎ বেকুফে। নটীর হাটের আদিবাসিনী। তবে শোনো, তখন সেই···থাক প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি আবার। যদি ওকে জিগ্যেস করা যায়, কিন্তু এত ব্রাহ্মণ-বসতি হল কি করে, ফোকলা দাঁতে হেসে বলেন, ধর্মের কলে।

উনি বেশি বলেন, ধর্মের কথাটা বাতাসে অথবা আর কিছুতে নড়েছিল সেটা ধরা পড়েছে। মহাকালের সেই চিলেকোঠার ঘুলঘুলিতে, তাহলে চক্রবর্তীদের ইতিহাস···

সে সব থাক ওই ঘোড়ারগাড়ির ঘুমু গাড়োয়ান যেদিন ওর আগুনের মত ঘোড়শী বউ বুনিয়াকে নিয়ে এলো প্রথম ..... থাক সে সব।

ওই যে যাচ্ছেন কনীন্দ্র ঘটক। তার পরমাসুন্দরী সাত মেয়ের কথা ··· না, সেটিও এখন নয়।

গজেন্দ্র গমনে যাচ্ছে পথের মাঝখান দিয়ে ধবধবে কর্সা। মেদবহুলা বাড়িউলী সুখবালা, গোটা মালপোতা পাড়াটা ওর নিজেরই। ওর গায়ের ভাঁজে ভাঁজে আছে নটীর হাটের আদি ইতিকথা তের বছরের মেয়ে সেদিন প্রথম এলো··· থাক সেইসব অ-প্রাসঙ্গিক কথাই এসে যাচ্ছে বারবার। তা হলে মালপোতা পাড়ার অজাতকুলশীল গিরীশ কেমন করে কার্তিক হালদারের মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল সে কথাও বলতে হয়।

আর ওই যে যাচ্ছে সুতারানী বন্দ্যোপাধ্যায় নটীর হাটের হাল কলেজের ছাত্রী, ওর কিংবা অধ্যাপক ত্রৈলোক্য নাথগুপ্ত, কিংবা বিষ্ণুপ্রিয়া স্কুলের মাস্টার বেনুপদ নাথের জীবন বৃত্তান্ত সামান্য জিনিস নয়। কোনটা সামান্য। নটীর হাটের এম. এল, এ কিংবা শ্রমিকনেতা, সাহেব সাহেবকুঠি, ক্লাব, সাহেবদের পরকীয়া প্রবৃত্তি—কিছুই বাদে না ফেলা।

আমি ত আজকে এসব বলতে বসিনি। তবু যে বলতে হল, তার কারণ, যা বলব, তা নটীর হাটের বৃন্তছেঁড়া একটি ফুলমের মত। তাই এত কথা।

আমি দেখছি অবনীকে। তার বিষয়ই হচ্ছে নটীর হাটের সবচেয়ে হালের ঘটনা। সে ঘটনা নিয়ে নটীর হাটে আলোড়ন হয়েছে। অবনীকে দেখলে এমনো যে আলোড়নের ছায়া লোকের চোখে ফুটে ওঠে।

স্টেশন থেকে নেমে কোন রকমে একটি টুথপেষ্ট কিনে অবনী হনহন করে চলেছে বাড়ির দিকে। ওর চীনা-বাড়ির চিকন মসৃণ ঘোটা সোলের জুতোর সব শুনলেই বোঝা যায়, খুসিতে ডগোমগো কুরঙ্গটা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে।

নটীর হাটের মধ্যে বাছা বাছা কয়েকটি ছেলের মধ্যে ও একটি। চোখা নাক। টানা চোখ। রক্তাভ ঠোঁট আর ধবধবে কর্সা রং। কিন্তু একেবারেই উদাসিকের মত দেখায় না। মাথার চুল কোঁকড়ানো নয়। বড় বড় কয়েকটি ঢেউয়ে যেন একটি বিহ্বল অবসাদ চুলের বিন্যাসে। সেটিও বিচিত্র একটি সৌন্দর্য। এমনিতেই অবনী বেরুল ওর সেই সাবলীল ভঙ্গীতে, তখন পুরুষের তিড়ে পুরুষ দেখেও তাকিয়ে থাকতে হয় একটুক্ষণ। ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে সে বি, এ, পাশ করেছে। তারপর তেইশ বছর বয়সেই একটা ভালো চাকরী পেয়ে গেছে বিলিতি মার্চেন্ট অফিসে।

অবনী যাচ্ছে। দক্ষিণ দিকে খানিকটা গিয়ে বেঁকে গেল পুবে। তারপর আবার দক্ষিণে। পুবে আবার। দাঁড়ালো গিয়ে সেই বাড়িটার সামনে। সেই মাদ্রাজীর আমলের বাড়ি। বেটা প্রায় বিঘে দুয়েক জমি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শতাব্দীর ওপরে।

এ বাড়ির নয়। সারা বঙ্গে। নাম বললে সবাই চিনি চিনি করে উঠবে। তাই পরিচয়টা চাপা থাক। অবনী এই বাড়ির বিখ্যাত বংশের ছেলে।

এ দেখা আজ থেকে নয়, শুরু হয়েছে তিন বছর আগে থেকে। তখন ওর চাকরী জীবন শুরু হয়ে গেছে। তিন বছর আগে। সেদিনও সন্ধ্যাবেলা ঠিক এমনিভাবে এ বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো অবনী। কিন্তু থমকে দাঁড়ালো। সেকেলে বাড়ীটার গজালমারা সদর দেউড়ীর সামনে। ইলেকট্রিক নেওয়া হয়েছে, তবু বাড়িটার গা থেকে পিদিম হ্যারিকেনের রেশ ঘুচতে চায় না। দেউড়ির আলোয় মনে হয় গত শতাব্দীর সেই ভুতুরে আলোটাই যেন জ্বলছে। সামনে পোড়ো উঠোন আর ভাঙা ঠাকুর-দালান, ওখানটা অন্ধকার। পাঁচ শরিকের যাওয়া আসার পথ। তাই কেউ তার ভাগের সামান্য মিটার ওখানে খরচ করতে রাজি নয়, তাই ইঁদুর ছুচো ব্যাঙ ছাড়া সাপও থাকতে পারে, আছেও। তবু।

উঠোনের বাঁ দিকে যে ঘরগুলিতে আলো দেখা যায় ওগুলি অবনীদের। বাবা, মা, ভাই, বোন সব মিলিয়ে সংসার ওদের। এখনো পুরোনো বংশ হিসেবে খুবই জমাট।

অবনী থমকে দাঁড়ালো। ওদিকটায় ও যেতে চায় না। কার্তিক মাসের হেমন্ত জোৎস্নায় এখনও কোথাও শরতের সোনার আভাস রয়ে গেছে একটু। তার উপর হৈমন্তিক কুয়াশা কুহকের একটু নির্বাক কৌতুকে রয়েছে চেয়ে। যেন পোড়ো উঠোনে আর ঠাকুর দালানে ঘাপটি মেরে বসে আছে কারা আলো আঁধারীতে। অবনী যেতে চায়, ওদের ঘরগুলি পেরিয়ে, ন'জ্যাঠা-মশায়ের পরিত্যক্ত মহলটায়। কিন্তু ঘরের লোক দেখে ফেলে, সেই ভয়। উঠোনে ঢুকে, বাঁদিকের উপরে ওঠার সিঁড়ি। কিন্তু ভাঙা। উপরে এখন আর মানুষ ওঠে না। যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে হুড়মুড় করে। এই ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটি চোরা সিঁড়ি আছে পিছনের মহলে যাবার। কিন্তু···এগিয়ে গেল অবনী পা টিপে টিপে। পায়ের চাপে সিঁড়িগুলিই দুরুদুরু করে। কিংবা ধুকধুক করে নিজের বুক, ঠিক ধরতে পারে না অবনী। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে; সবে মাত্র চোরা সিঁড়ির শেষ ধাপটায় এসেছে, এমন সময় অস্ফুট আর্তনাদ শুনে থমকে গেল। দেখল, সামনাসামনি দাঁড়িয়ে জড়োসড়ো ললনা। চিনতে ভুল হয়নি, তাই।

অবনী তাড়াতাড়ি বলল,—'আমি, ললনা, আমি অবনী।'

ললনা কাঁপছিল। আর একটি চীৎকার দিয়ে ও অবনীর বুকের কাছে ঘেঁষে এসে ত্রাস-কিসিকিসিয়ে গলায় বলল,—'মা গো! কী ভয় যে পেয়েছিলুম!—এখানে কী করে এলে?'

—'ওধারের পুরনো সিঁড়ি দিয়ে।'

—'কী সর্বনাশ, যদি সাপ খোপ—'

ললনার কথার উপরেই অবনী ঠোঁট চেপে দিল।

ললনা বললে,—'এত ভয় কিসের যে, এমন খারাপ পথ দিয়ে এলে!'

অবনী বলল,—"যার চোখে যে সন্দেহটা দেখা দিয়েছে, সেটা চাপা দেবার জন্য সামনে দিয়ে এসে তোমার ঘোর ঠেলতে হবে না। ভাববে, তবু ছেলেটা একদিন ললনাদের ওদিকে যাওয়া কামাই দিয়েছে।' ভয় ছিল না ললনার বাবা মাকে। ওরা এ বাড়ির লোক নয়। দুর্গতির দায়ে কলকাতা থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে আজ দু' মাস। অবনীর ন' জ্যাঠামশায়রা প্রায় দু পুরুষ ধরে আছেন কলকাতায়। নটীর হাট থেকে মুছে গেছেন তাঁরা। কিন্তু শরিকানার ভাগটুকু খালি রাখতে হয় যে! তাই এখন এসে আশ্রয় নিয়েছেন ন'জ্যাঠামশায়ের ভায়রা ভাই, অর্থাৎ ললনার বাবা। ভদ্রলোক নিজের জীবনটা মামলার বাজি খেলে হেরে গেছেন নিজের জ্ঞাতিগোষ্ঠির কাছে। সব হারিয়ে এসেছেন। আর কারও নয়, ভায়রাভাইয়ের পোড়োভিটের। ইতিমধ্যেই নটীর হাটের মার্কেটে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে নিজেকে। মনে হয় ঠিক নটীর হাটের আদি বাসিন্দা যেন। প্রায় প্রতিদিনই নানান পার্টির সঙ্গে যান মহকুমা আদালতে, সাক্ষী হিসেবে। হক কথা না বলুন, যুধিষ্ঠিরের বিকিকিনির হাটে বিকোচ্ছেন মন্দ নয়।

সে কথা থাক। ভদ্রলোকের কিছু না থাক রূপ ছিল ঘরে একরাশ। নিজের মধ্যবয়সী স্ত্রী থেকে তিন মেয়ে সব কটি শুধু রূপ নয়, অপরূপ। একটা ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মত, যেন বৈশাখের তপ্ত বাতাসে শিহরে রাখা অগ্নিশিখা। অবনীর মায়ের মনের কথায়, পোড়োবাড়িটায় যেন কতগুলি নাগিনী ঘুরছে কিলবিল করে।

সেই চিলেকোঠার ঘুলঘুলি থেকে দেখতে পাওয়া যায় নটীর হাটের যত বাদলাপোকাগুলি পড়ন্ত বেলায় যায় অবনীদের নির্জন পাড়াটায়। মনে হয় বাদলাপোকাগুলো শুধু আগুনে পোড়ে না, সুযোগ পেলে তাদের সাপও সাপটে দেয় টপাটপ।

ওই একরাশ রূপের একটি বড় মেয়ে ললনা। অবনীর পাশে, একটি সুদৃশ্য সোনার হারের সুন্দর লকেটের মত। সু-গৌরী, একহারা, কিন্তু একটি আশ্চর্য বার ওর দেহ লাবণ্যে। ওর চোখে দীপ্ত দুটি তারা। যেদিকে চায়, সেইখানেই দাগ দেয় একটু। কিন্তু রক্তাভ ঠোঁট দুটি কেমন যেন বিলিতি পুতুলের মত বিহ্বল আবেশে ফুলে। ফুলো। তার উপরে এই অভাবের মধ্যেও ললনা সজ্জা

পটিয়সী। প্রথম যেদিন চোখে পড়ল, দাগ পড়ে গেল অবনীর বুকে। তারপর শিকড় গাড়তে গাড়তে জড়িয়ে ধরল আষ্টেপৃষ্ঠে।

ললনার বাবা মা এ সব দেখেও দেখেন নি। কিন্তু দেখতে ভোলেন নি অবনীর বাবা মা তাই যেন আরও পাঁচ শরিকের খুড়ো জ্যাঠা দাদারা। প্রথমে কানাকানি তারপর ফিস্‌ফাস্। তারও পরে গুঞ্জন। কিন্তু ওই দুই বিঘে পুরনো বাড়িটার ভিতরেই যতকিছু। পারিবারিক ব্যাপারটা কেউ বাইরে টেনে নিয়ে যান নি।

অবনী একটু সাবধান হওয়ার চেষ্টা করল। তাই অন্ধকারে, ভাঙা পরিত্যক্ত চোরা সিঁড়ি দিয়ে গোখরোর খোলস বাড়িয়ে এই দুঃসাহসিক অভিসার।

ধরা পড়ে গেল সেটাও। আন্দোলন উঠল সারা বাড়িতে।

কিন্তু এই দু'জনের আন্দোলন তার চেয়ে অনেক বেশী। গোটা বাড়িটা এ টে উঠতে পারল না।

ওরা দু'জনে হল আরো বে-পরোয়া। মাঝখান থেকে ছলনাটুকু গেল। অবনী সোজাসুজি নিজেদের উঠোন পেরিয়েই যাতায়াত করতে লাগল ললনাদের মহলে।

অবনীর মা রান্নাঘরে ভাত দিতে এসে অভিমান ক্ষুব্ধ গলায় বললেন—'এ-সব কী হচ্ছে, তুই না বড় ছেলে এ ঘরের, তবে যা খুশি তাই কর, আমি যাই কিছুদিন দাদার বাড়ি।'

অবনী বলল, 'তার চেয়ে তোমরা থাক, আমিই চলে যাব।'

মনে মনে তবে বিস্ময়ে শিউরে উঠে চুপ করে রইলেন অবনীর মা, ঘর ছাড়তেও ছেলে রাজি আছে তবে।

বাবা ত মুখে একেবারে কুলুপ কাঠিই এঁটেছেন। এখন চেয়েও দেখেন না। অবনীর রোজগার ছাড়া সংসার চলবে না। ওর মুখে চাবিকাঠির ওইটিই কারণ। যদিও জানেন ছেলে তার বিদ্যা বুদ্ধিতে রূপে, ব্যবহারে ও কথায় গোটা নটীর হাটে প্রায় বে-জোড়।

সব জানে, কিন্তু প্রাণ মানে না অবনীর। ললনার চোখের তারা তাকে টেনে নিয়ে যায়।

নাড়া পড়ে গিয়েছে রক্তে, তাকে কি দিয়ে আটকে রাখবে অবনী।

রক্তে দোলা লেগেছে ললনারও। একটু দেরী হলে ঝড় ওঠে তার দুচোখে, অবনী কাছে এলেই দুচোখে আলো জেলে যেন আরতি করে। ঠোঁট দুটি আর একটু ফুলিয়ে বলে, 'এত দেরী করলে যে।'

—'দেরী কোথায়, পাঁচ মিনিট ত।'

—'ওইটুকুই অনেকখানি।

অবনী অবাক বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে ললনার রূপ দেখে ডুবে যায়। তার চেয়ে বেশী ললনা। অবনীকে বলে, 'তুমি যখন আমার রূপের প্রশংসা কর, মনে হয় ঠাট্টা করছ।'

'কেন?'

—'নিজের রূপটা বুঝি তাকিয়ে দেখ না।'

দেখে কিন্তু সেটা স্বীকার করার মত অবিনীত নয় অবনী। বলে, 'পুরুষের আবার রূপ।'

ললনাও কথা জানে। বলে, 'হ্যাঁ, সেটা বলার জিনিস নয়, মনে মনেই জানি। তা ছাড়া তোমার কত গুণ। তোমার পায়ের যুগ্যিও নই আমি।'

অবনী বলে,—'তা ঠিকই, কেননা তুমি যে বুকের যুগ্যি।'

"আহা, ইয়ার্কি।"

কখনো বলে,—'আচ্ছা তোমার হাতের লেখাটা তুমি কি দিয়ে লেখ?

অবনী হেসে বলে,—"কেন, হাত দিয়েই।"

—'তোমার হাতে তবে ছাপাখানার মেসিন বসান আছে। আশ্চর্য, কি সুন্দর তোমার হাতের লেখা।'

কথাটা ঠিক। অফিসের বড় সাহেব থেকে আর্দালিটি পর্যন্ত তার হাতের লেখায় মুগ্ধ। তার ইংরেজী ড্রাফট না হলে ছোট সাহেবের মন ওঠে না। নটীর হাটের ও অফিসের বন্ধুদের অনেকের ইংরেজী চিঠি লিখে দেওয়ার দায়টা সে সানন্দে নিয়েছে।

অবনী ললনাকে টেনে নিয়ে যায় বাড়ির পিছনের

উঠোনের নির্জনে। বলে, 'আমার লেখার চেয়ে তোমার কথা যে আরো সুন্দর।'

কিন্তু দেখা যায় জিতটা শেষ পর্যন্ত ললনার। কেননা অবনীর চেহারা, পোষাক, ওপ, সবই অকল্পনীয়। ললনার বেলায় ললনা নিজেই মুখথাবাড়ি দেয় অবনীকে।

যদিও ললনা কীপ রেখার কাজল টানতে গিয়ে চোখের ধারটা বাড়িয়েই ফেলে বেশী। কাঁধকাটা লাল জামাটার উপরে শাড়িটা এলিয়ে দিতে গিয়েও করে জড়িয়ে ফেলে কোমরে। তাতে তার যৌবন যেন কি এক সর্বনাশ ও রহস্যের মত বিচিত্রময়ী হয়ে ওঠে।

এমনি করে কেটে গেল আরো দুটি মাস। কখনো ভাঙা সিঁড়ি ভেঙে নড়বড়ে দোতলার ঘরে। কখনো শিছনের উঠোনের হাসনুহানার তলায়, ঘোর সন্ধ্যায়, খিড়কি দোর খুলে, লতাজঙ্গলে আবৃত পরিত্যক্ত বাগানে।

বাড়িতে সকলের অবস্থি। নটীর হাটের মানুষেরা নিশ্চিন্ত. সদরে কোন সাড়াই নেই।

মহাকাল ভাবে. তারপর? ঘুলঘুলি দিয়ে একটি লোককে আসতে দেখে সে ললনাদের বাড়িতে। বয়স হবে প্রায় পঁয়তাল্লিশ। ললনারা তাকে বসন্তকাকা বলে। বাড়ি কলকাতায়। অবস্থাপন্নও বটে।

বসন্তকাকা একদৃষ্টে চেয়ে দেখেন ললনাকে। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলেন,—'নটীর হাটে আছ তাহলে ভালই।'

—'যেমন দেখছেন।'

—'দেখতে খুব ভালো নয় অবশ্যি' মনে চয় অন্তরে অন্তরে ভালোই।'

ললনা কোন জবাব দেয় না। মাথা নিচু করে, আঙুলে কাঁস জড়ায় আঁচল দিয়ে।

বসন্তকাকা শান্ত মানুষ. চোখ থাকলার মত তাকিয়ে থাকেন ললনার দিকে, বলে, 'মাসখানেকের মধ্যেই বাড়িটা বোধ হয় কেনা হয়ে যাবে। আলিপুরের সেই বাড়িটা।'

অবনী জিগ্যেস করে অবনীকে 'উনি কে?'

'বসন্তকাকা।'

'আপন কাকা!'

'না, বাবার বন্ধু।'

এ কথা সে কথার পরে আজকাল অবনী প্রায়ই বলে, 'বাড়ির লোকেরা বিয়ে দিলে, আমরা রেজিষ্ট্রী ম্যারেজ করতে পারি।'

অবনীর এ কথার উপরে ললনা শুধু ওর বিলিতি পুতুলের মত রক্তাভ ঠোঁটদুটি দেয় তুলে। অবনীর অসাড় অনুভূতিতে চাপা পড়ে যায় সিদ্ধান্তটা।

তারপর মহাকাল দেখে. তার এই চিলেকোঠার ঘুলঘুলি দিয়ে, আসল সিদ্ধান্তটা বয়ে নিয়ে এলেন বসন্ত কাকা। অবনী তখন অফিসে গেছে। বসন্তকাকা একেবারে লরী নিয়েই এসেছেন কলকাতা থেকে। ললনাদের মালপত্র উঠল তার মধ্যে। মালপত্র সামান্যই। ললনার মা বাবা বোনেরাও উঠল বসন্তকাকার সঙ্গে।

ললনা ওঠার আগে অসঙ্কোচে এলো অবনীদের উঠোনে। একেবারে অবনীর ঘরে। একটি খাম রাখল টেবিলে। তারপর অবনীর মাকে প্রণাম করে, বসন্তকাকার হাত ধরে, লরিতে গিয়ে উঠল।

নটীর হাটের একটি বিশেষত্ব, মানুষ যেমন আসে তেমন ফিরে যেতে পারে না। নটীর হাটের স্মৃতি নিয়ে গেল ললনা।

সন্ধ্যেবেলা যখন নটীর হাটের সদরে আমি শুনতে পেলাম অবনীর পদশব্দ তখন সাহস ছিল না আমার। দেখেছিল মহাকাল।

'বাড়ি এসে না' জ্যাঠামশায়ের উঠোনের দরজাটা সাপটে খোলা দেখে অবাক হল অবনী। অন্ধকার দেখে আরো অবাক।

ঘরে এসে খাম দেখে খুলে ফেলল। চিঠিতে লেখা ছিল,—'বসন্তকাকা আমার নামে একটা বাড়ি কিনেছেন আলিপুরে। আমরা এখন থেকে সেখানেই থাকব। আমাদের পুরনো সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার জন্য বাবাকে সাহায্য করবেন বসন্তকাকা।.....নটীর হাটের স্বর্গবাসে

এইটুকু বুঝে গেলাম সংসারে এখনো কত ভালো মানুষ আছে, কত সুখ ও সৌন্দর্য আছে।—'ললনা।'

অবনী চিঠি রাখে, হাত মুখ ধুয়ে বলে, 'মা খেতে দাও।'

যেন কিছু হয়নি এমনি একটা ভাব করে বসল অবনী। কেবল ওর সুন্দর প্রসন্ন মুখের ঐ ঠোঁট আর নাকের পাশে কয়েকটি সুগভীর রেখা দেখা দিল।

মহাকালের ঘুলঘুলিতে ধরা পড়ল, অবনীর চোখে মুখে অনাবিল বিদ্রূপের চিহ্ন। নিঃশব্দে সব কিছুকেই বিদ্রূপ করছে।

তারপর মাসখানেক বাদে, অফিসের ছোট সাহেব প্রথম ওকে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে। একটি কাগজ দেখিয়ে বললেন,—'এটা কার হাতের লেখা অবনী?'

'—আমার।'

ছোট সাহেবের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেলেও বোধ হয় এত অবাক হতেন না। লাফিয়ে ওঠে বললেন —ইম্‌পসিবল্, এত কুৎসিত হাতের লেখা তোমার?'

সত্যি হাতের লেখাটা অতি কদর্য। বকের ঠ্যাংয়ের মত। অবনী নির্বিকার ভাবে বলল,—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই।

ডেস্‌ক খুলে ছোটসাহেব, আরেকটি কাগজ বার করলেন। তাতে ছিল মুক্তোভরা হস্তাক্ষর। বললেন, —'এটা কার হাতের লেখা তবে?'

ও বলল, 'আমারই। কিন্তু এখন আর আমি ওর চেয়ে ভালো লিখতে পারি নে।' ছোটসাহেব হাসবেন না কাঁদবেন বুঝতে পারলেন না। কয়েক মিনিট প্রায় রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়াতীত চোখে তাকিয়ে বললেন, 'কাগজ,নাও, আমি ডিকটেট করছি, তুমি লিখে যাও।'

অনায়াসে লিখে গেল অবনী। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গোটা অফিসটা হা করে তাকিয়ে রইল অবনীর দিকে, মানুষের পরিবর্তনের সঙ্গে যে তার হাতের লেখারও পরিবর্তন হয় এমন বিচিত্র ব্যাপার কেউ কখনো দেখেনি। ব্যাপার কি? নটীর হাটের মানুষের চোখে এখনও কিছু ধরা পড়েনি।

কিন্তু একদিন ধরা পড়ল। চোখে না ওড়ার ভিতর দিয়ে। অবনীর যাওয়া আসার পথে, দোকানীর আর পড়শী, সবাই একবার ওকে তাকিয়ে দেখত। এইজন্য দেখত যে, পাড়ার সবচেয়ে সুন্দর ছেলেটা যাচ্ছে।

একদিন কেউ ফিরেও দেখল না, কারণ তারা চিনতেও পারেনি যে, অবনী যাচ্ছে। কেননা নটীর হাটের কড়ি মিস্ত্রিরির মত, ছোট ছোট চুলের মাঝখানে সিঁথি কাটা অবনীকে চেনাই দুষ্কর!

ওর ডেলি প্যাসেঞ্জার বন্ধুরা, নটীর হাটের মানুষেরা সবাই অবাক হল। হাসল, দুঃখিত হল। কেউ বলল, এ আবার কেমন ফ্যাসান হে! কেউ বলল, অমন সুন্দর চুলগুলি! একি বিচ্ছিরি, ছি. ছি।

অবনী হাসে। মহাকাল দেখে। হাসির মধ্যে ওর বিদ্রূপই আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার মুখটা যাচ্ছে বদলে। আর হাসিটা অবিকল নটীর হাটের তেজারতী কারবারী নফর কুণ্ডুর মত ছুচলো আর কুৎসিৎ হয়ে উঠল।

এর সঙ্গে সঙ্গেই এলো একটু ধৃষ্টতা। গোমড়া মুখ আর অঙ্ক কষিয়ে বুড়ো মাষ্টারের মত নীরবতা। চোখে ছানি পড়েনি নিশ্চয়। কিন্তু চোখের মণি দুটোও কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল। ধবধবে রঙটা গেল কালো হয়ে। শেষে প্যাণ্টগুলির রঙ এর রুচিই শুধু গেল না, শরীরের তুলনায় বড় ঢলঢলে হল।

ছোট ছোট ছেলেপিলেরা অবনীর পিছনে লাগল একটু একটু করে। কেননা তারা জানে অবুঝ পাগল হয়ে গেছে। আর পাগল হলেই সে আর মানুষ থাকে না। তখন তাকে ঢিল মারতে হয়। কাঁদা ছুড়তে হয়। পিছনে লাগতে হয়। পথে পড়ে কলুইয়ের ঘটকের বাড়ি। তার রূপসী সাত মেয়ে রাস্তার সামনের জানালায় দাঁড়িয়ে হেসে মরে। কেননা অবনীটা যদি পাগলই হল তবে তাদের সাতবোনের পাল্লায় পড়তে বাধা ছিল কোথায়?

রাস্তার দু ধারে দাঁড়িয়ে রোজ দেখল নটীর হাটের মানুষেরা। আর সে সবাইকে যেন ভেংচাতে লাগল। এই কদর্য ভঙ্গিতে। চলার তালে তালে বুকের থেকে

একটা শব্দ এসে বাজল কানে,—'এই, এই ত তাখ চেয়ে, এই আমি।'

কিন্তু সামনের রাস্তায় অনেক লোক ওর পিছনে লাগল। অকারণে ডেকে ডেকে নানান কথা জিজ্ঞাসাবাদ করে। কেউ ঠাট্টা করে, করুণা করে কেউ। ছোঁয়াচে রোগের ভয়ও আছে অনেকের।

ওদের বাড়ি থেকে পশ্চিমে, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার গোকুল মিত্তিরের বাড়ির কাছে এসে অবনী দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে যেতে লাগল রোজ। আগে যেত গোকুল ডাক্তারের বাড়ির উত্তর দিক দিয়ে।

এতদিন যেটা দেখেও দেখেনি, সে হোল দুটি চোখ। অবনীর যাওয়া আসার সময়টিতেই নির্বাক নিশ্চল পটের মত সেই চোখ দুটি গোকুল ডাক্তারের জানালার গরাদ থেকে তাকিয়ে থাকে অপলক, সেই চোখে যত মুগ্ধতা, তত বিস্ময় তত করুণা।

চোখ দুটি গোকুল ডাক্তারের মেয়ে পারুলের। মনে পড়ল, পারুলের চোখ দুটি এমনি পটে আঁকা ছবির মত তিন বছর ধরে তাকিয়ে আছে। কারও চোখে পড়ে না, অবনীরও পড়েনি।

পারুলের মুগ্ধ বিস্মিত করুণ চোখ দুটিতে কী ছিল কে জানে। অবনীর উঁচিয়ে ওঠা কাঁধটা হঠাৎ একটু নেমে গেল যেন।

তারপর একদিন ফেরার পথে সন্ধ্যেবেলা অবনী দাঁড়িয়ে পড়ল পারুলের জানালার কাছে। একবার পারুলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটু সলজ্জভাবেই মাথা নত করল সে। ওর পুরণো কণ্ঠস্বর জিগ্যেস করল,—'গোকুলকাকা ভাল আছেন?'

পারুলের মনে হল, ওর নির্জন নদীটা হঠাৎ বানে একুনি প্লাবিত হয়ে যাবে। কোন রকমে বলল—, হ্যাঁ।'

চলে গেল অবনী। পরদিন আবার দাঁড়াল। বলল,—'গঙ্গার ধারে শিবের ঘাটে আসবে?' পারুলের বুকটা কাঁপছিল। বলল, 'যাব, আপনি যান।'

প্রায় আগের মত হেঁটে অবনী নির্জন শিবের ঘাটে পৌঁছলো। সন্ধ্যে তখনও উৎরোয়নি। নটীর হাটের পশ্চিমাকাশে লাল রঙ লেগে আছে তখনো।

অবনী ভাবতে চেষ্টা করল, এটা কোন মাস? কী ঋতু? বাতাসে ঈষৎ শীতের আভাষ আছে।

নির্জন ঘাট। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে আরো। পারুল নিজেই ওর মুখখানি বাড়িয়ে দিল অবনীর দিকে।

অবনীর অসুখটা যেন সেবারের মত বেড়ে উঠল। জল এলো বোধ হয় চোখে। আকণ্ঠ পিপাসায় পারুলের ঠোঁটের ওপর নেমে এলো সে-চাতকের মত। বলল, 'সেরে উঠেছি আমি পারুল।'

আমি মহাকাল অবাক হয়ে ভাবলাম, 'ঘরের কোণে, পড়ে থাকা ওষুধ লতার এমনি গুণ নাকি? শুধু দুটি চোখের তারায় অসুখও সেরে যায় এই মানুষের সংসারে!'

নটীর হাটের মাথাবাধা আর একবার নতুন করে গুন গুন করে উঠল। কেউ বললে, 'ভূতে ধরেছিল, কেউ বলল, না, এ রকম একটা রোগ সম্প্রতি দেখা দিয়েছে, সেবারে আমার দিদির·····

মুহু! খোঁজ নিয়ে দেখ। নির্ঘাত কোন তালে ছিল। ফেরেব্বাজ নরম সাধু খাঁ জালিয়াতির দায়ে পড়ে একবার বোবা আর কালা হয়ে গিয়েছিল। মনে আছে?

বাহু পুরুতের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে বললে গদাই ওসব শালা কিছু নয়, সেরেফ ভি ভি বাবা, গদাশালার চোখ ফাঁকি দিতে পারবে না, ওসব শালা অনেক শালা···

তা বটে, গদা একসময় হামা দিয়েও চলেছে। এর উপরে আর কথা নেই।

আর আমি নটীর হাটের উপর কেওরাপীর ভিটায় ফিরে যাই। জীবন রহস্যের নতুন খেলা জমেছে সেখানে।

রাত হয়েছে বুঝি অনেক।

গঙ্গার ভাটা মামা নরম পলিমাটির কাদায় কেওরা-পাড়ার ওরোরেরা ফিরে এসেছে সহর পরিভ্রমণ সেরে। শকুনের মত পুরীষ-আলয়ের নীচুতলা, নর্দমা আর আস্তাকুড় ঘেঁটে বেড়ায় কেওরা পাড়ার জানোয়ারেরা। রাত্রে এসে আশ্রয় নেয় গঙ্গার ঘাটের পাকে।

গায়ে গায়ে মুখে মুখ দিয়ে পড়ে আছে মুরোরগুলি। শকুনেরা গাছে না উঠেও নটীরহাটের অন্ত্যজঘাটে নিরাপদে থাকে পাশকে মুখ গুঁজে। বাতাসে দুর্গন্ধ দক্ষিণের বাপটায় চলেছে উত্তরে।

গঙ্গার জলে সমুদ্রদর্শনের গান, আর কালো বুকে নক্ষত্রেরা স্রোতের দীর্ঘ ঝলক-রেখায় যাচ্ছে হারিয়ে।

নয়নের মৃত্যুতে কোন শোকের ছায়া পড়েনি কেওরা-পাড়ার ঘাটে। সে হিসেবে, কেওরা পাড়ার ঘাট চির শোকের তীর্থ। অবসানেরই ইতিবৃত্ত তার পাষাণহীন ঘাটের প্রতি স্তরে স্তরে। শোক শুধু মনসাতলায়, সেখানে পাড়ার বুড়িরা এখনো ভিড় করে আছে টগরকে ঘিরে। কারণ তাদের জানা আছে, টগর আর এখন তাদের মত এই পাপলোকে নেই। জীবিত অবস্থায়ও টগর এখন অন্য সংসারের জীব। কেমন করে এমন হয়, তারা জানে না, কিন্তু হয়। তাই তারা করজোড়ে ঘিরে বসে আছে টগরের কাছে। কারণ টগরের মধ্যেই এখন তাদের অপরিচিত বিশ্ব রহস্য এসে ঠাঁই নিয়েছে। বিশ্ব রহস্যকে তারা প্রত্যক্ষ করতে চায়।

রাখাল ভাই নন্দ হাড়ির কাছেই এসেছে। নন্দ একটি কথাও বলেনি। গঙ্গার ধারে আসস্যেওড়ার জঙ্গলের উঁচু টিবিতে তাড়ির ভার নিয়ে সে বসেছে। ঢোকে ঢোকে খেয়েছে।

তারপর রাখালকে বলেছে,—'হাঁ করু, খাইয়ে দিই, নইলে বাপের বাপের জন্ম মন কেমন করবে খালি।'

গুরুর আদেশ। রাখাল কয়েক ঢোক খেয়েছে।

নন্দ রাখালের ছোট বাঁশিটি তুলে নিয়েছে। ফুঁ দিয়ে বলেছে, 'ইস, আতুর ঘরের ছেলের গলা যে রে!'

তা হোক, তবু নন্দ বাজিয়েছে।

প্রথমে আর্তকান্নার মত। তারপর কখন কান্নার আর্তধ্বনি শেষ হয়ে, মিষ্টি সুর বাতাস, গঙ্গা ও আকাশ-টাকে মাতাল করে দিয়েছে টের পাওয়া যায় নি।

রাখালের মনে হল সুরটা একটি জীবন্ত প্রাণীর মত। তার মধ্যে তার বাবা আছে, মা আছে, এই সংসারের সব কিছুই যেন ওই সুরের মধ্যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, বংশী মুখুজ্জেও আছে যেন। পৃথিবীর একটি বিচিত্র রহস্য যেন সুরের মধ্যে দুলে দুলে উঠছে।

তারপর বাঁশিটা নন্দ তুলে দিল রাখালের হাতে, বলল,—'বাজা।'

বাজাবে? ভালো করে স্বর ফোটাতে পারে না বাঁশির। বাজাবে কেমন করে রাখাল।

নন্দ বলল, 'ফুঁ' দে।' ফুঁয়ের মধ্যে গান কর, গানের সঙ্গে সঙ্গে আপনি আঙুলগুলো ওঠাপড়া করবে, দেখিস্, বাজা।'

ভয় করতে লাগল রাখালের। তবু বাজারের কাছে শুনা সেই অন্ধ ছেলেটার গান তার মনে পড়ল। সে চীৎকার করে, সুর করে করে বলা, 'আমার এই জগতে কেউ নাই গো।'

রাখাল ফুঁ দিল বাঁশিতে। স্বর ফুটল। তারপর যে কোন যাদুস্পর্শে তার কানে গিয়ে ঢুকল—'আমার এ জগতে কেউ নাই গো।'

শুধু একটাই লাইন। একটাই সুর। রাখাল তা বাঁধা ধরে যাওয়া ঠোঁটে বাজাতে লাগল। নন্দ বলতে লাগল বেশ, আচ্ছা, হুঁ। শেখম থেকে কান্না ধরলে বাবা বুক বেঁধে যে। বাহবা। বাহবা। বাজা, বাজা ও একটাই বাজা।

সাতদিন সাতরাত্রি ধরে টগর পড়ে রইল সে মনসাতলায়।

সবাই সংগ্রহ করে দুধ এনে খাইয়েছে টগরকে। সে আসলে পুণ্যি করার জন্যেই। কারণ, টগর দুধ খায়নি টগরের অর্ধ-চৈতন্য মুখ দিয়ে আর কেউ খেয়ে বি রহস্যের এক বিচিত্রকে প্রমাণ করেছে। সেই রহস্যের এক অতল অন্ধকারের মধ্য তীক্ষ্ণ সু সু করে বেজে উঠে খেয়েদের উলুর মধ্যে দিয়ে।

সাতদিন নন্দর কাছেই রাখাল খেয়েছে থেকেছে একটা ছেড়ে দুটি তিনটি চারটি লাইন বাজিয়েছে।

টগর খোঁজও নেয়নি।

সাতদিনের অন্তহীন শোকের পালা শেষ করে এ টগর। প্রথমে বলল,—'আমার ছেলে?'

ছেলে এলো। রাখালকে বুকে নিয়ে স্নান করে এলো টগর। কেওরা পাড়ার বিধবাদের স্নানের ঘাট নেই। পুরণো কাঁচা শাড়ি পরল টগর। চার ইঞ্চি আয়নায় মুখ দেখে কাঠের চিরুনি দিয়ে মাথা আচড়াল। একটা ঠিকে ঘরে বসে নয়নের অসমাপ্ত বাঁশের কঞ্চি আর কাটারি নিয়ে বসল। গাভিন গুয়োরীটাকে ডেকে কাছে শোয়াল।

এতদিনে শোক প্রকাশ করল গুয়োরীটা। যেন কেঁদে কেঁদে বললে,—'বাবুদের বাড়ির ফ্যান পচা পাত শে এনে কতদিন খেতে দাওনি আমাকে। পেটে আমার চা', শহরে গিয়ে ঘুরে ফিরে আর খেয়ে আসতে পারি নে আমি।

টগর আংটা লাগানো টিন নিয়ে ঘুরে এলো বাড়ি বাড়ি। খাওয়ালো গাভিন আনোয়ারটাকে, কিন্তু টগরের মুখে কথা নেই।

কেন?

মাস পেরিয়ে গেল। গুয়োর বিয়ালো। টগর বুড়ি চুপড়ি বিকিয়ে রোগকার রোজ ছেলে নিয়ে গেল। গালে হাত দিয়ে শুনল ছেলের হাসি। কিন্তু রাতে ঘুমুলো না, কথা বলল না কারুর সঙ্গে।

কেন?

শোকের ছায়া গেল। মাথার জটা ত্যাগ হল। সিঁদুর বিহীন সাদা সিঁথিতে, কাঁচের চুড়ি ভেঙে ফেলা খালি হাতে শত লাঞ্ছনাতেও উদ্ধত অটুট শরীরের নতুন লাবণ্যে ত্রিশ পেরিয়ে যাওয়া টগরকে মনে হয় কেওরা-পাড়ার আইবুড়ো মেয়েটি কি এক ভাবে মত্ত হয়ে রয়েছে।

কেন? শোক কি কাটেনি টগরের?

যেন গাছপালা স্থির। কীট পতঙ্গ স্তব্ধ। সারা আকাশটা আড়ষ্ট। ধরিত্রী সহসা কঠিন নির্বাক বিমূঢ় অচেতন।

কেন?

তারপর একদিন আচমকা তার পায়ের শব্দ শোনা গেল। গঙ্গার ধার থেকে সেই প্যাবড়া প্যাবড়া পা দুটি, গভীর রাতের অন্ধকারে জঙ্গল মাড়িয়ে মাড়িয়ে গঙ্গার উঁচু পাড়ে উঠে এলো। যে পায়ে বহু দেশের ধুলি আর বিশ্ব রহস্যের ছাপ—তার কাটা কাটা এবড়ো খেবড়ো দাগে। সেই পায়ের নিশ্চিত পদক্ষেপে ধরিত্রীর নির্বাক বিমূঢ়তা যেন শিউরে উঠল। এসে দাঁড়ালো টগরের বন্ধ ঘরের দরজায়। দরজা খুলে সামনে দাঁড়ালো টগর। প্রত্যাশা ব্যাকুল বিস্রস্তবেশিনী, বিশ্বরহস্যের আদিম রহস্যচ্ছটা কেওরানীর জলে ভেসে যাওয়া চোখে।

শোক গিয়েছে। নতুন সাজ হয়েছে। নবজন্ম হয়েছে। কিন্তু বিশ্ব রহস্যের প্রাণ সংগ্রামের সহস্র মানবী টগর রূপান্তরের কান্নাটা কাঁদতে পারেনি। পৃথিবীর মত বিশ্বরহস্যের অঙ্গ চির সতী টগর নির্বাক বিমূঢ় হয়ে রইল।

অন্যান্য পাড়ার ছন্দময় ও রঙ্গলীলা প্রকৃতির মতই চির যৌবনের লীলায় অমোঘ রূপান্তরের জগৎ সুন্দরী। টগর অকূল সায়রে, সায়রের বড় বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে নির্ভীক শক্তপ্রাণ মাঝি এসেছে পাড়ি দিতে।

নয়ন গেছে, নন্দ হাড়ী এসেছে। এই যাওয়া আসার মাঝে স্বভাব মন্থে চিরবিশ্বাসী টগর তাই নন্দর বুকে পড়ে কাঁদছে অঝোরে। বহু বহুদিন পরে নন্দর কঠিন পাষাণ শিলা স্খলিত প্রস্রবনে টগর আবার মানবী জন্ম পেল। কান্নার পরে টগরের চির রহস্যের হাসির কিঙ্কিনী শুনে রূপান্তর বিলাসিনী পাতকুয়ো গঙ্গা ভাটার জলে ছুটে গেল মহাপ্রলয়ংকর অনেষ অরূপে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নন্দর বুকে মুখ চেপে বলল টগর,—'লোকে বোঝে না'

নন্দ বলল,—কোনদিন বোঝে না।'

টগর বলল,—'কি যে হয়, ছাই মরণ।'

কঠিন ও বিহ্বল সোহাগে নন্দ বলল,—'সেটা কেউ জানে না।'

নটীর হাট দিনে জাগে, রাত্রে জাগে।

নটীর হাটের রাত্রি সেদিন টগরের জন্য জেগে ছিল।

শুধু বিশ্ব রহস্যের এই বিচিত্র লীলা দেখে রাখাল প্রথমে ভয় পেয়েছিল। তারপর নন্দ হাড়ির মত মানুষকে বাবা পেয়ে, পিতৃশোক ভুলে সে-ও পৃথিবীর চিরশিশু-সন্তানের

দলে ভিড়ে গেল। নন্দ টগরের ঘরে থাকে না। তবু বাকি থাকে না জানাজানি হতে। স্বাপদ সমাজের মতই। বিনা দ্বন্দ্বে কেউ কারুর অধিকার কায়েম করতে পারে না এখানে।

কেওরা পাড়ার বুড়ি ছুঁড়িরা ধিক্কার দিতে লাগল টগরকে। ঘটনাটা নতুন নয়। পুরনো সমাজের ওপরের পাটে পাটে অনেক নতুন ভাঁজ পড়েছে। সেলাই সংস্কার হয়েছে। নীচেটা রয়ে গিয়েছে যে-কে সেই। টগরের পূর্ব-সূরী নায়িকার অভাব নেই পাড়ায়, কিন্তু তা বলে মনসাতলায় দাঁড়িয়ে বিকৃত কেন করবে না? নইলে টগর নায়িকা চিহ্নিত হবে কেমন করে।

কেওরাপাড়ার পুরুষেরা নন্দর শাস্তি দাবী না করলে নায়ক বলে চেনা যাবে কেন তাকে?

দ্বন্দ্ব এখানে পঞ্চায়েতের লড়াই। শাস্তি অরিমানা।

কিন্তু নন্দ জন্মক্ষণ থেকেই বোধ হয় সোজা পথ পায়নি। প্রারম্ভেই বেঁকে থাকার দরুণ এখানেও সে বাঁকা। অরিমানা অর্থাৎ গোটা পাড়াকে ভাত আর শুয়োর ভোজ দেওয়া। সে ক্ষমতা তার নেই। আর পাড়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে চীৎকার করেই সব পুরুষ কেওরাদের আহ্বান করলে, 'কে কি বলতে চাও বল, টাকের যুত নেই, অরিমানা দিতে পারব না, আর পারলেও দেব কেন, সেটা বুঝিয়ে দাও।'

বোঝাবার মত ইচ্ছে কারুর ছিল না। আর যে এভাবে বলতে পারে, তার জন্য ঠেকানো কারুর পক্ষে সম্ভব নয়।

জীবন রহস্যের আধার। নন্দ হাড়ীর সেই দুর্বিনীত মূর্তি দেখে রাখাল খুসি হল মনে মনে। কিন্তু নিজেকে তার অপমানিত মনে হল। এ অপমানবোধটাও বোধহয় বিশ্বরহস্যের মধ্যেই পড়ে। নন্দ হাড়ীকে ভালোবেসেও যেন রাখালের ইজ্জতে দাগ লেগে রইল।

নন্দ নয়, অরিমানা দেবার আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করল না টগর। শুয়োর ছানা বেচে, চাল ভাজা আর তাড়ি খাওয়ালে সবাইকে। শান্ত হল কেওরা-পাড়ার আত্মা। হয়ত নয়নের আত্মাও। কারণ সকলের চোখের আড়ালে এই অরিমানার চালভাজা আর তাড়ি উপর নয়নের উদ্দেশে রেখে এসেছিল গঙ্গার নির্জন পাড়ে। স্বচক্ষে দেখে এসেছে একটা কাককে সেই চালভাজা ঠুকরে ঠুকরে খেতে। সেই কাককে জোড়াহাতে বলে এসেছে টগর,—'শাপ দিও নাকো।'

নতুন সুরের ঘাতাঘাতিতে রাখালকে রেখে দিল টগর শুয়োর ছানাগুলির সঙ্গেই।

সংসার এমনি নিদূর মনে করেই রাখাল অসহায় অবাক চোখে চেয়ে থাকে নি। বাঁশি নিয়ে মেতে রইল সে। নন্দ মাকিগিরি করে ইচ্ছেমত। টগরেরটা বসে খেতেই সে অভ্যস্ত হল। আর তালিম নিয়ে চলে রাখালকে। রাখাল তাকে মাৎ করে দিয়েছে এর মধ্যেই। অনেকগুলি সুর বাজাতে শিখেছে সে।

তারপরে রহস্য দেখল রাখাল। তার আবার ভাই হয়েছে।

বিশ্বরহস্যের আরো চাতুরী দেখল রাখাল। দেখল তার মার সঙ্গে নন্দর ঝগড়া। দেখল, নন্দ হাড়ী মারছে তার মাকে ধরে। দেখল, শুয়োর ছানা সব বিক্রিয়ে গিয়েছে। বেচার গোলা ভাঙ্গা, চাল ফুটো। মেঝে কাদা কাদা। হাড়িতেও ভাত নেই।

সে দেখল, মা তাকে মারছে। ভিক্ষে করতে পাঠাচ্ছে রাস্তায়, স্টেশনে।

কিন্তু রহস্যের ঘটনালের আড়ালে নন্দ হাড়ীর জন্য প্রাণটা টনটন করতে লাগল রাখালের। ছোট ভাইটার জন্য কান্না পেল। মায়ের কাছে ঘেঁষতে না পেয়ে বুকটা ফাটতে লাগল তার। রাখাল ওর প্রথম শেখা সুরটা বাজাতে লাগল। 'আমার এ জগতে কেউ নাই, কেউ নাই গো।'

রাখাল দেখল নন্দর চেহারাটা গেছে শুকিয়ে। কাশে ঘং ঘং করে। মুখের উপর সেদিন মায়ের সাড়াশী ছুড়ে দেওয়া ক্ষতের দাগটা কোনদিন যাবে না নন্দর। কিন্তু তার হলে মা আর নন্দ তেমনি করেই হাসে।

একদিন নন্দ ডাকল রাখালকে। বর্ষার গঙ্গা এপার ওপার ভরা ভরতি। জোয়ার উজানে চলেছে উত্তরে।

আকাশে মেঘের ঘন ঘটা। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘেরই মত পশ্চিমা পেয়ার নৌকোর পালগুলি উড়ছে। নটীর হাটের ঘাটে অনেক নৌকো। কেউ যাবে কলকাতায়, কেউ মগরা পাণ্ডুয়া, আরো দূর বর্ধমান ছাড়িয়ে পশ্চিম দেশে।

নন্দ রাখালকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, 'বাঁশিতে পাঁজরা খায়, জানিস?'

রাখাল বলল,—'তা' বললেও আমি বাজাব।'

যেন তাকে বারণ করবে নন্দ, সেই ভয়। নন্দ বললে, 'সাবাস। মার কাছে থাকিস।'

নয়ন কোনদিন ভয় দেখাতে পারেনি রাখালকে। কারণ রাখাল তখন কিছু হারাবার ভয় দেখেনি। নন্দর কথা শুনে তার বুকের মধ্যে চমকে উঠল। বলল, 'তুমি?'

নন্দ গঙ্গার বুকে তাকিয়ে বলল, 'চলে যাব।'

যেন বড়ে ডানা গুটানো চিলটা ডানা ঝাপটা দিয়ে, তার সবল গ্রীবা তুলে, আবার আকাশের দিকে তাকিয়েছে, যদিও চোখে তার ক্লান্তির ছায়া।

রাখালের ঘাড়ে হাত দিয়ে নন্দ বলল,—'কিছু গড়তে পারলুম না, তোদের খাওয়াতে পরাতে পারলুম না, তাই পালাব।'

রাখালের মুখটা নিজের বুকে ঘষে দিয়ে বলল,—'কাঁদিসনে রাখাল, শোন তোকে একটা কথা বলি।'

রাখাল মুখ তুলতে পারল না। জীবনে এইটি তার প্রথম শোক, নিজের বাবার মৃত্যুতে শোক পায়নি। দুঃখ পেয়েছে রাখাল, কষ্ট হয়েছে, শোক আজ জিনিষ। মনের যেখানটায় কালের প্রলেপ সহজে পড়ে না। রাত্রি হলেই আকাশের তারার মত সে চিরদিন ধরে জ্বলে।

রাখাল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলে।

নন্দর গলার শিরাগুলি ফুলে উঠল মোটা দড়ির মত। সেও কিছুক্ষণ ধরে চোক গিলল। বলল, 'শোন রাখাল, একটা কাজের কথা শোন্, কেওরা পাড়ার গুয়োরগুলান জানে না, মানুষ হলে জানতে হয়, সোজাসাপে চিরকাল কেউ থাকতে আসে নাই বাপ, বুইলে? মরণের বাড়া ভয় নেই, ভয় পাস না কোনদিন, নাম তোর রাখাল, এই স্থাখ না আমি কি করে ফেললুম, টগরটাকে ডোবালুম, সাধ ছেল, কিন্তু নিজের মালিক নিজে হতে পারলুম না। শোন, মন খারাপ লাগলে কহে বাঁশি বাজাবি।'

কাউকে উপদেশ দেওয়া নন্দর ধাতে নেই। কিন্তু রাখালকে তার মনের মত কথা কয়টি না বলে পারিল না। কারণ টগরের গর্ভে তার ঔরসজাত সন্তানকে কোনদিন কোলে নিয়ে দেখেনি, নয়নের ছেলে তার ছেলের চেয়ে বেশি।

জোয়ার বয়ে যায়। পশ্চিমা মাঝি ডাক দিল, 'এই হো বাঙালী মাঝি জলদি আও, চলনা হ্যায়।'

নন্দকে ডাকছে। তাকে জড়িয়ে রাখালের হাত দুটি ছাড়িয়ে সে বলল,—'যাই বাপ।'

নন্দর কথা কতখানি বুঝল রাখাল, কে জানে, সে কেবল লাল চোখে তাকিয়ে রইল নন্দর দিকে।

মাঝির কাজ নিয়ে চলে গেল নন্দ। নৌকো চলে গেল উত্তরে। পুব দক্ষিণ কোণ ঘেষা বাতাস পেয়ে পাল তুলে দিল। ঘণ্টা বাজাই নৌকা বন্দর বন্দর করে হারিয়ে গেল দূর বাঁকের মুখে।

মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল রাখাল সামনে পৃথিবী। মস্ত বড় পৃথিবী, কূল কিনারা নেই।

এতবড় পৃথিবীতে এবার কোথায় যাবে রাখাল?

আশ্চর্য! নটীর হাটের চেয়ে পৃথিবী কত বড়! নন্দ চলে গেল। তাই যেন এ বিশ্বের বিরাটত্ব প্রথম অনুভব করল সে।

মায়ের কাছেই এলো রাখাল। নটীর হাটে বড় বড় ঘটনা ঘটে। সভা সমিতি হয়। পৌরসভার ভোট নিয়ে কত মারামারি হয়। প্রতিদিন কত ঠকানো ঝুচ্চোরি, কতজনের সৌধবাস আর সর্বনাশের যুগপৎ খেলা হয়।

কেওরা পাড়ার তাতে কারুর ধার আসে না।

গুয়োর আর একটিও নেই। বুড়ি ঝুলড়িতে পেট চালানো দায়। বাঁশ বাকারি এনেই বা দেয় কে?

পাড়া গাঁ থেকে বাঁশ বাকারি না নিয়ে এলে, শহরের গোলা থেকে বাঁশ কিনে মালের পড়তা পড়ে না।

টগরের বাবা খারাপ হতে লাগল আবার। সেদিন সে বুঝতে পারল নন্দ চলে গিয়েছে, সেদিন সে খুব কাঁদলে। একটি দিন পুরোপুরি কেঁদে, তারপর গঙ্গার জলের নিরন্তর যাওয়া আসার দিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'লোকে বোঝে না।'

ওই লোক যে কে, যে কোনদিন কিছু বোঝে না, চেনা বড় দুষ্কর। এই লোকও সেই বিশ্ব রহস্যের অঙ্গীভূত। যে কোনদিন কিছু বোঝে না, তার পায়ে মাথা কুটেও কোনদিন তাকে কিছু বোঝানো যায়নি এ সংসারে। সে বোবা, কালা, অন্ধ।

টগরের মনে হয়, এ বিশ্বের সব মানুষের মধ্যেই এই লোকটি আছে, যে বোঝে না। সে গঙ্গার কাছে সেই কথাই বলল, নন্দ হাড়ীর জন্য তার প্রাণ পুড়বে, সেটা কেউ বুঝবে না। নন্দ হাড়ীও বুঝবে না। বুঝবে না বালিকা বয়সে নয়নের সঙ্গে কাটিয়ে সে আর দশটি মেয়ের মত জীবনের স্বাদ ভোগ করছিল। তার চেয়ে অনেক বড় পাওয়া হয়েছিল তার নন্দকে। সে পাওয়ার সুখ যত তীব্র, বেদনাও ততোধিক তীব্র। নন্দ তার বাঁধা ধরার মানুষ ছিল না। মনের মানুষ ছিল। সে কাছে থাকলে ধুলো লেগে যায় তারো গায়ে। তখন তাকে আর চেনা যায় না। সে চলে গেলে বোঝা যায়।

নন্দকে পেয়েছিল সে বীর্যশুল্কারূপিনী হয়ে। তাই আপন রক্তের দাপট যে কত, সেটা সে অতীতে টের পায়নি। বুকে যে মোচড় কতখানি লেগেছে, সেটাও কাউকে বোঝানো যাবে না। তার এই প্রস্তর কঠিন শরীরে কালের রেখা পড়ল না আরো, চির যৌবনের জোয়ার বয়ে গেল তার অনার্য সুঠাম অঙ্গে অঙ্গে। কিন্তু রক্তে তার আগুন জ্বলবে না কোনদিন।

পাড়ার সবাই গাল দিল নন্দকে। বললে, 'জানাই ছিল, শত হলেও জাতে হাড়ী ত।'

যেন কেওরা হলেই নন্দ থেকে যেত।

নন্দর ঔরসজাত ছেলেটি মারা গেল।

রাখালের পিঠে রোজ খান কয়েক করে কষি ভাঙতে লাগল টগর। যেন তার জীবনের যত আপন রাগ রাখল। রাখালের বাঁশিগুলির উপর সবচেয়ে বেশি রাগ টগরের। মুরলী বাঁশ এনে রাখাল বাঁশি তৈরী করে। টগর সেগুলি মট্ মট্ করে ভাঙে রাখালের পাঁজরের মত। আর বলে,—'শোরের বাচ্চা, ওর বাবাকেলে বাপের কাছে কানাইবিদ্যি শিখেছে।'

কানাইবিদ্যির মানে সম্ভবতঃ কৃষ্ণবৃত্তি। অর্থাৎ বাঁশি বাজানো।

টগরের প্রতি এখন অসীম ঘৃণা রাখালের। আগেকার মারদোরের মধ্যেও একটা অঙ্গ কিছু ছিল যেন। কাঁদলেই দুঃখ চলে যেত। এখন আর তা যায় না রাখালের। সে ধুলো ছুঁড়ে মারে মাকে। সেও গাল দেয় মাকে সমানে সমানে।

মা যে কি কুৎসিত দেখতে, ঠিক ডাইনীর মত। ভাবলেই রাখালের ইচ্ছে করে কাটারি দিয়ে মায়ের গলাটা কেটে দেয়। মা যে কেন মরে না! হে ভগবান, হে ভগবান, হে কেওরাদের ঠাকুর, হে মা গঙ্গা, মা কবে মরবে? কবে মরবে?

ভাগ্যারের শকুনীরা নাকি অন্তর্যামী। একমাত্র তারাই নাকি জানে, কে কবে মরবে! রাখাল লক্ষ্য করে দেখেছে, শকুন সত্যি যেন সর্বজ্ঞ। তাদের চাউনি এদিক ওদিক ঘাড় ফেরানো দেখলে, বোঝা যায় তারা সব টের পাচ্ছে। কিন্তু রাগ পড়ে গেলে তখন আর মাকে তার তেমন খারাপ লাগে না। রাত হলে এখনো মার কাছে আসতে ইচ্ছে করে। তখন আর মায়ের মার খাওয়ার কথাটা সে ভাবতে পারে না।

কিন্তু টগর এখন আর খেতে দেয় না রাখালকে। রাখালকে নিজের খাবার নিজেরই সংগ্রহ করতে হয়। বাজারের ফড়েদের সঙ্গে দূরের গাঁয়ে যায় মাল আনতে। ফড়ের অনুপস্থিতিতে গদিতেও বসে। কিন্তু সেখানে বিশ্বস্ত থাকবার উপায় নেই। পয়সা না সরিয়ে বিশ্বস্ত থাকলেও অবিশ্বাস এবং মার কপালে থাকবেই। আর দু পয়সা দরদালেও সম্পর্কের বড় একটা এদিক ওদিক হয় না।

কিন্তু তবু মা ছেলের আহার প্রতিদিন জোটে না।

কেওরা পাড়ার ক'জনেরই বা হয় প্রতিদিন ছুটেছে! কেওরা পুরুষের মধ্যে কেউ কেউ আসে টগরের কাছে। কিন্তু পেটে সন্তান আসার ভয়ে কাউকে আর পাত্তা দেয় না টগর।

তবু একদিন রাত্রে আবার দুটি পা এগিয়ে এলো পাটির ঘরের দিকে। সে পা' জোড়া খাবড়া খাবড়া নয়। চকচকে জুতো। সে পালিশের ওপর নটীর হাটের প্রবৃত্তির ইতিহাস ঠিকরে পড়েছিল। জঙ্গল মাড়িয়ে নয়, পাদুকা শোভিত সে চরণ যুগল এলো নটীর বাজারের ইতিহাসেরই স্বচ্ছন্দ সড়ক ধরে।

তার ঠিকরে যাওয়া পালিশ যেন কেউটেরমত চকচকে। ক্ষুধার্ত জিহ্বা যেন লকলক করছে। তার মদমদ শব্দে প্রবৃত্তির দাঁত পেষার নিষ্ঠুর খুসির স্বর্ধন।

দরজা খুলে দাঁড়ালো টগর। চুলে যার খোঁপা বাঁধা। মুখে যার পান। চোখে যার তাড়ির নেশা লাগা জলন্ত অঙ্গারের দপদপানি। নিশ্বাসে যার ঘরের অন্ধকারও বিদাক্ত।

বিশ্ব রহস্যের প্রাণ সঞ্চের সহজ মানবী টগরের আজ রূপান্তরের কায়ার দিন নয়। কিন্তু বিশ্ব রহস্যেরই আরেক রূপান্তরের অসহ্য জ্বালাটা বাকি থেকে গিয়েছিল। সেটাই আজ প্রাণ ভরে করলে টগর সেজেগুজে। তাড়ি খেয়ে, সাটিনের সার্ট জড়ানো বুকে খিলখিল হেসে চলে পড়ে। আজ শোক-সাজ, নবরঙ্গের আর এক দিন। বিশ্ব রহস্যের যে দুয়ারটা আজ খুলেছে, সে খাস্ত শূণ্য হাঁড়ি, নেতানো উনুন, অভুক্ত জঠরের বিবেকহীন বাঁচতে চাওয়ার শুধু জীব-যাতনা।

অসহ্য ঘৃণা দিয়ে জড়িয়ে ধরল, মুখে মুখ দিয়ে হাসল টগর স্বৈরিণী। সোনা ভাতের থালাটা শুধু জেগে রইল তার চোখের সামনে। লোকটা যখন বেরিয়ে এলো টগরের ঘর থেকে তখন আরেকটু দূরে দাঁড়িয়ে রাখাল দেখল তাকে।

লোকটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল বলল, 'কে?'

রাখাল একেবারে হা। লোকটাকে চিনতে পেরে রাখাল যেন বিশ্ব রহস্য দর্শন করতে লাগল। লোকটা একটা সিকি কিংবা আধুলী ছুঁড়ে দিল রাখালের সামনে। বলল, 'নে।' বলে চলে গেল। পয়সাটা কুড়িয়ে নিল টগর।

রাখাল তাকিয়ে রইল মায়ের দিকে। মিথ্যে কৈফিয়ত দিয়ে গল্প খাড়া করার সুযোগ এখানে নেই। তাঁর ধারও ধারে না কেউ। তবু রাখাল যে কবে থেকে এমন গোঁয়ার হয়ে গেছে, টের পায়নি বুঝি টগর। ছোড়া মায়ের দিক থেকে সন্দেহ জিজ্ঞাসু চোখদুটি নামালো না একেবারে। তারপর ভাত রান্না করা পোড়া কাঠ দিয়ে দুঘা বসালো টগর রাখালকে, বলল, 'ঘরের মত অমন করে তাকিয়ে থাকার কি আছে, অ্যা? মায়ের লীলা দেখেছিস রে হারোৎ।

রাখাল যেন হঠাৎ নিজেকে জানতে পারল। এমন একটা দুর্জয় প্রাণী যে ওর মধ্যে আছে সেটা আগে টের পাওয়া যায়নি। আগেই ভাতের হাঁড়িটা দিলে উপুর করে ফেলে।

টগর একেবারে বাঘিনীর মত চীৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল রাখালের উপরে। রাখাল তখন পোড়া কাঠটা ছুড়ে মেরেছে মাকে। অব্যর্থভাবেই সেটা লেগেছে টগরের মাথায়। সেদিকে না তাকিয়ে রাখাল জলের কলসীটা দিলে আছড়ে ফেলে।

কাকে ধরবে টগর। কাকে মারবে? একি টগরের রক্তে গর্ভেরই ঘৃণা ছুঁসে উঠেছে তার গর্ভজাতের বধা দিয়ে। সে যেন ভয় পেল। ভয়ে ও বিস্ময়ে রক্তারক্তি মাথায় হাত দিয়ে টগর এই প্রলয় দেখতে লাগল। রাখাল তখন বেড়ায় গোজা জিনিষপত্র মাটিতে ফেলে তছনছ করছে।

তারপর রাখাল পালাল না ছুটে। ঘরের একটা কোণ নিয়ে দাঁড়ালো মায়ের মুখোমুখি। পাড়ার দু' একজন দেখতে এলো ব্যাপারটা। গালাগালি চীৎকার ত আছেই। নতুন করে কিছু দেখবার নেই। তবু একটু বেশি মাত্রায় হচ্ছে বলেই দু'একজন এলো। এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে, রাখালের যে এই আসল কেওয়ার গুণ ছুটেছে এতদিনে, সে কথা বলাবলি করলে। কত-

ঘর পাজী আর দর্বনেশে ছেলে, কতবড় ডাকাত আর ত্যাকরা সেটা এতদিনে বোঝা গেল।

কিন্তু ছেলে কিংবা মা কারুর পক্ষ থেকেই যখন কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, তখন সবাই চলে গেল। শুধু তারা নাকি বুঝতে পারল না যে, এরা সং, না এসব চং।

টগর চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কাপালে হাত দিয়ে সে মুখগুজে আছে বেড়ায়। দাঁতের কাছে আঁচলে তার রক্ত লেগেছে।

রাখালকে যেন কেউ যাদু করেছে। নড়তে পারছে না। একটু একটু করে নিভে এলো ওর চোখের আগুন। একটু একটু করে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল ওর অবিশ্বাস্য খ্যাপামির তছনছ করা ছবি। তারপর ওর শরীরটা কাঁপতে লাগল। আর জল এলো দুচোখ ফেটে। সে-ও বেড়ায় মুখ চাপল।

এখনো রাখাল কিছুই চাপতে শেখেনি।

তারপর ও শুনতে পেলো মায়ের ভার ভার গলা—'এ্যাই মুখপোড়া, এখানে আয়, আর বলছি।' মায়ের এমনি ডাক কোনদিন রাখাল অমান্য করতে পারে না। মায়ের দিকে না তাকিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো। টগরের হাতের সীধানায় এলো। টগর যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ছেলের দিকে। যেন রাখাল তার অচেনা। টগর যেন কঠিন গলায় হুকুম করল রাখালকে, "আরো কাছে আয় মুখপোড়া।'

লম্ফর আলোয় রাখালের ছায়াটা মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। টগর হাত বাড়িয়ে রাখালকে এক হ্যাচকায় নিজের বুকে টেনে ধরল। বলল, 'এখানে মুখ দিয়ে পড়ে থাক, নড়বি না।' রাখাল দুহাতে মাকে জাপটে ধরে আবার ফুলতে লাগল।

টগর তাকিয়ে দেখল, রাখাল তার বুক ছাড়িয়ে উঠেছে লম্বায়। চোখ তার জলে ভেসে গেল। দু'হাতে রাখালের রুক্ষ মাথাটা জড়িয়ে ধরে শুধু বলল,—'মই, মলুই তুই।' নটীর হাট দিনে জাগে, রাতে জাগে। নটীর হাট হিসেব করে, খুনোখুনি করে। নটীর হাট নানান ভাবে হাসে। গান করে।

কিন্তু নটীর হাট কখনো কখনো মুখ লুকিয়ে না কেঁদে পারে না। তার নানান ডামাডোলের মধ্যে সে কান্না দেখা যায় না। শোনাও যায় না।

টগর কেওরানি আর তার ছেলে রাখাল কেওরার জন্য কেঁদেছিল সেদিন নটীর হাটে। যাদের জন্য মৃত্যুর কর্ম কারণ, হিসেব নিকেশ, যদিও নেই নটীর হাটে। কেঁদেছিল কারণ নটীর হাটের মহাকালেরও বুকি মাঝে মাঝে বুক ফাটে নিজের গল্পটা চালাতে চালাতে।

জমিদারবাবুও নাকি আসেন টগরের ঘরে। নটীর হাটে কেউ কেউ এ নিয়ে আলোচনা করল। সন্ধ্যের কোকে, টগরের দোরের দিকে একটু চোখ বুজে থেকে, দেখতেও পাবে, বুঝতেও পারবে। তা ছাড়া বাবুন কেওরা? সে-ও নতুন নয়।

এই অদ্ভুত পাড়ায়, নটীর হাটের মৃত্যুর গতিয়ান আছে অলিখিত গণনায়। আর এসব পাড়ায় যত প্রবৃত্তির অস্তিত্বান হয়েছে, সেই নতুন পুরনো হিসেবও কেউ ভুলে যায়নি।

কিন্তু তাকে প্রতিদিন মনে করে বসে আছে কে?

এ কথাও ভুলে যেতে লাগল সবাই। কানাঘুষো সব পাড়াতেই হল কয়েকদিন। আবার ভুলে গেল কয়েক দিনেই।

রাখাল আসে অনেক রাতে। বেরিয়ে যায় ভোর বেলা। রাতে এসে খাওয়ার পরে রাখালের যেটা আসল কাজ, সেটা হল বাঁশি বাজানো।

জমিদারবাবুর আসার পর থেকে ও বিষয় নিয়ে রাখালের সঙ্গে মায়ের আর কোন সংঘর্ষ হয়নি। আর কোনদিন মা ছেলে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেনি। টগরের যদিও অনেক কথা থাকে, রাখাল একটা বিস্ময়কর গাম্ভীর্য নিয়ে শুধু হুঁ, হাঁ দিয়ে যায়। মায়ের দিকে ভালো করে তাকিয়েও দেখে না। টগর শুধু হা করে তাকিয়ে থাকে রাখালের দিকে। বরং বেশি কথা বলতেই তার যেন সঙ্কোচের হয়। যেন শুধু হা করে তাকিয়ে থাকে

রাখালকে, আর ভয় করেও কেন যেন-মনটা কোথায় ভরে যায় টগরের। নিজের জন্ম তার ঘৃণাটা ওঠে বেড়ে।

রাখাল গঙ্গার ধারে বাঁশি বাজায়। টগর ঘুমোতে পারে না। নন্দ হাড়ীর গানগুলি সার্থক বাজাতে শিখেছে রাখাল। নয়নের মরার দিনই মনসাতলায় পড়ে প্রথম ভালো করে, মর্মমূল ভরে, নন্দ হাড়ীর বাঁশি শুনেছিল টগর। নয়নের চিতার অঙ্গারে বুঝি জ্বলছিল তখনো। কিন্তু তার মনে হয়েছিল নন্দ হাড়ী তাকে ডাকছে বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে।

অবুঝ রাখাল সেই সুর বাজায়। কিন্তু নন্দ হাড়ী আর কোনদিন আসবে না। শুধু ঘৃণার এক অদৃশ্য চায় সে বাঁধা পড়ে থাকবে চিরদিন।

টগরের সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে। রক্তে তার কি এক গরের আগুন যেন জ্বলে। কিন্তু কিছুই পোড়ানো যায় তাতে। শুধু নিজে জ্বলে টগর। জমিদারবাবুর 'দেখতে লো লেগে' দেওয়া রূপোর কোমর বন্ধনীর চেইন চেষ্টাতেও আর যেন ছিঁড়ে করা যায় না।

রক্তের জ্বালাতেই বুঝি টগরের শরীর স্থূল হয়ে ওঠে। টা হতে থাকে সে। তারপর মোটা হতে হতে মাংসে যায়। ফাটল ধরে। খসে খসে গলে গলে পড়তে কে।

রং এর ভল রং এ মিশলে সহজে টের পাওয়া যায় না। ছ স্বচ্ছ জলে গোপন রাখা যায় না তাকে।

কেওরাণীর তেজোদৃপ্ত, প্রকৃত নারিকা-শুদ্ধ রক্তে ট দ্রুত আর, আর ভয়ঙ্করভাবে জমিদারবাবুর রক্ত ল ছুটে।

জমিদারবাবুর দেওয়া খাটিয়াতেই শুয়ে মরল টগর। মরবার আগে সব আত্মহত্যার পর যখন শান্ত হয়ে টগর। যখন যন্ত্রণা দূরে চলে গেল, মৃত্যু তার নি হাত রেখে, সেবারের জন্ম পৃথিবীকে দেখেও শুনে ফলল, তখন টগর রাখালকে ডেকে বলল,—'সেই গা না কি রে রাখাল বেটা সে বাজাচ্ছো।'

নন্দ হাড়ীর কথা বলল টগর। গানটার রাখালকে বলেছিল নন্দ। টগরকেও অনেকদিন বলে রাখাল বলল,

'সখি যাবার কালে কেন ডাকিলে
ভবেতে বড় দুখ থো।
নির্গান নগরে যেতে মন করে
সেথা বড় সুখ গো।'

টগরের দৃষ্টি স্থির। বলল,—'আর এলো না, ে রাখাল, কাছে আয়।'

রাখাল কাছে গেলো। রাখালের মুখের দি তাকিয়ে একটু বুঝি অভিমান হল টগরের।

আর কোন কথা সে বলেনি। রাখাল বলল,— বলছিস মা।'

বুড়ো ও অন্ধ মুনি কেওড়া বলল,—'মার কিছু ব না তোর মা।'

মারা গেল টগর।

সবাই মুনি কেওরার দিকে তাকালো সভয় বিস্ম কিন্তু টগর তখন সত্যি মারা গিয়েছে।

ইতিহাসে নটীর হাটের নাম নেই। কিন্তু নটীর হা ইতিহাসে এমনি অনেক টগর কেওরানী মরে যুদ্ধোত্তর স্বাধীন দেশে, আজকেও মরছে। কিন্তু ন হাটের ইতিহাসে নাম লেখাবার কোন দাবী তা নেই।

দেহ শিল্পী

(১২৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

হয়েছে, সেইসঙ্গে বেশ খানিকটা খেয়ালী। যাকে মাঝে কাজে আসতে চায় না। সকালে ঘুম ভাঙবার পরেও অনেকক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকে। তার মা ডাকাডাকি করে,

—এখনো শুয়ে আছিস যে? বেরোবি কখন?

—আমার শরীর ভালো নেই।

তার মা জানে, ওটা কিছু নয়। কখনো হুকে, কখনো ভালো কথায় বুঝিয়ে পাঠিয়ে দেয়। কোনো কোনো দিন একেবারে বিগড়ে যায় টুলি। বলে, মামাবাবু বড় খিট খিট করে।

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। লক্ষ্মী চলে যাবার পর বেশ খানিকটা খিটখিটে হয়ে গেছে প্রিয়নাথ। টুলির মা তার হয়েই বোঝায় মেয়েকে, "আহা একটু হবে বৈ কি? নিজের মায়ের পেটের বোন। তাও পাঁচটা নয়, দশটা নয়, একটা। আর কি ভালোই না বাসত! লক্ষ্মী বলতে অজ্ঞান। সে যখন অমন করে চলে গেল, তারপরে কি আর মানুষের মাথা ঠিক থাকে? তার ওপরে কদ্দিন থেকে বিছানায় পড়ে আছে।"

"লক্ষ্মী মাসি আর আসবে না মা?"

"কী জানি, বাছা, আসবে, কি আসবে না। বিয়ে থা হয়ে গেছে, নিজের ঘর করছে। এলেই বা করবে কী?"

টুলি জানে। লক্ষ্মী মাসির বিয়ে হয়ে গেছে, এ খবর সে আসেই শুনেছিল। হঠাৎ শুনে ফেলেছিল। বাইরে থেকে একজন বাবু এসেছিল একদিন। রাস্তায় কাকে যেন জিজ্ঞেস করছিল, প্রিয়নাথবাবুর বাসা কোনটা। সে-ই পথ দেখিয়ে এনেছিল। মামাবাবুর সঙ্গে কী সব কথা হয়েছিল তার, সব সে শুনতে পায়নি, বুঝতেও পারেনি। বেড়ার ওপাশ থেকে ঐ কথাটা শুনেছিল—লক্ষ্মী মাসির বিয়ে হয়ে গেছে, বেশ ভালো বিয়ে হয়েছে। মামাবাবু কি বলেছিল, তাও তার মনে আছে—বেশ, সে যা ভালো বুঝেছে, করেছে। তার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। আমি জানি, আমার একটা বোন ছিল। সে মরে গেছে।

তার কিছুদিন আগে লক্ষ্মীমাসি যেদিন চলে গেল, সেদিনও টুলি ওখানে। মামাবাবুর সে কী রাগ। বিছানায় বসে চেঁচাচ্ছে—"খবরদার তুই আমার বাড়ি ঢুকবি না। তোর মুখ দেখতে চাই না।" আরো কত কী বলেছিল, সব টুলির মনে নেই। ওর সঙ্গে বেলা মামাবাবু তাকে জড়িয়ে ধরল। টুলির বিশ্বাস, উঠতে পারলে হাত ধরে মারত।

লক্ষ্মীমাসি দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। সেখান থেকেই চলে গেল চোখ মুছতে মুছতে। আর আসে নি।

কেন; কী করেছিল সে, টুলি এখনো জানে না। মাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল। মা বলতে উঠেছিল, "তা দিয়ে তোর দরকারটা কী শুনি। যত সব পাকামো।" নিজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিল, নিশ্চয়ই কোনো অন্যায় কাজ, হয়তো খারাপ কিছু যা মেয়েদের করতে হয়।

টুলি যেদিন আসে না বা আসতে পারে না, তার মা আসে। মা এলে চলবে কী করে? খোঁড়া মানুষ, নিজে কিছুই করতে পারে না। আগে তো উঠতেই পারত না। তারপর পাড়ার বাবুরা লাঠির মতন ঐ যে জিনিস দুটো এনে দিয়েছে, কেরেস্তা না কি বলে, তাতে ভর করে ঘর বার করতে পারে···।

সেদিনও টুলির মা এসে বাজার করে এনেছিল। তার পর ঘর ঝোঁটের কাজ সেরে রান্না চাপিয়ে দিয়েছিল। প্রিয়নাথের ছাত্ররা যাকে দশটা সাতে দশটা পঁয়ত্রিশ। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ধীরে সুস্থে স্নান করতে যায়। খেতে খেতে প্রায় বারোটা। সেদিনও তার মধ্যেই খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়েছিল। টুলির মা হেঁসেল সেরে বাইরে যাবার যোগাড় করছে। এমন সময় একটা ট্যাক্সি এসে বাড়ির সামনে থামল। ট্যাক্সি এ রাস্তায় কচিৎ আসে। এলেও চলে যায়। এ বাড়িতে আর ট্যাক্সি করে কে আসবে? টুলির মা খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে দেখল, ভিতরে একজন মেয়েছেলে বসে আছে। ট্যাক্সিওয়ালা নেমে এসে দরজা খুলে খুব আস্তে আস্তে নেমে এল। এক নজর দেখেই এগিয়ে গেল টুলির মা—দিদিমণি।

লক্ষ্মী তখন ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছিল। টুলির মার দিকে ফিরে বলল, ভালো আছ টুলির মা?

—"এই তোমাদের আশীর্বাদে"—বলে কাছে গিয়ে হাতটা ধরল। লক্ষ্মীর পা সরছিল না। যে আকস্মিক উত্তেজনা তাকে পাড়িতে এনে তুলেছিল, এতটা পথ আসতে আসতে তার বেশ খানিকটা প্রশমিত হয়েছে। এখন ঘিরা এসে পা দুটো জড়িয়ে ধরল। এখানেও তো স্বাগত নয়, এ বাড়ির দরজাও তার মুখের উপর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে দৃশ্য তার চোখের উপর জলজল করছে। ছল ছল চোখ দুটী টুলির মার মুখের উপর তুলে বলল, দাদা কেমন আছে?

—ভালো।

—কী করছে?

—"ঘুমুচ্ছেন। চল ঘরে চল। এরকম জ্বর দুপুর বেলা রাস্তাঘাটে বেরোতে নেই। তাও আবার এলো চুলে।"—বলে ওর আঁচলটা তুলে মাথায় দিয়ে দিল।

লক্ষ্মী পা বাড়াল। ধীরে ধীরে খিড়কির দিকে এগিয়ে চলল। টুলির মা, তেমনি তার হাত ধরে নিয়ে যেতে যেতে

বলল, এ অবস্থায় কেউ একা একা পথে বেরোয়? বিপদ আপদ ঘটতে কতক্ষণ। জামাইবাবু এল না কেন?

মিথ্যা বলল লক্ষ্মী তাকে, হঠাৎ বাইরে যেতে হল। আজই গেছে সকাল বেলা। তারপরেই শরীরটা কেমন মনে হতে লাগল। তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

—আসবে বৈকি? এ সময়ে বাপের বাড়িতেই তো আসে সবাই, মা নেই তো কী হয়েছে? অমন দাদা রয়েছে। আমি থাকবো তোমার কাছে। আমারও তো বলতে সেই পাঁচটা ছটা হল। কখন কি করতে হবে, সব আমার জানা আছে। তোমার কোনো ভয় নেই।

ততক্ষণে তারা ঘরের ভিতর পৌঁছে গিয়েছিল। খুব বেশী আস্তে কথা বলা টুলির মার অভ্যাস নয়। প্রিয়নাথের শ্রবণ খুব ঠিকল না। পার্টিশানের ওধার থেকে বলল, কে টুলির মা? কার সঙ্গে কথা বলছ?

লক্ষ্মীর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। এইটুকু আসতেই সে হাঁফিয়ে পড়েছিল। টুলির মা একটা মাদুর পেতে তাকে শুইয়ে পেটে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। সেখান থেকেই সাড়া দিল, দিদিমণি এয়েছে।

—কে?···শুধু প্রশ্ন নয়, তার সঙ্গে অপরিসীম বিস্ময়।

টুলির মা বলল, আমাদের দিদিমনি।

—"কে ঢুকতে দিলে?" গর্জন করে উঠল প্রিয়নাথ এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। "তুমি কি জানো, এ বাড়িতে তার—"

—ছিঃ দাদাবাবু, এ অবস্থায় একটা কুকুর বেড়ালকেও লোকে একটু আশ্রয় দেয়। আর এ তোমার মায়ের পেটের বোন। যা-ই করে থাক, এই সময় কি কেউ তা মনে রাখে?

প্রিয়নাথ হঠাৎ চুপ করে গেল। 'এ অবস্থায়' কথাটার ঠিক অর্থ না ধরতে পারলেও একটু কেমন সন্দেহ হল।

টুলির মা খুশির সুরে বলল, দিদিমণির ছেলে হবে। পুরোমাস চলছে।

—অ্যাঁ, কী বললে! কই সে? কার সঙ্গে এল?

লক্ষ্মী আর শুয়ে থাকতে পারল না। আঁচলটা তুলে নিয়ে প্রায় ছুটে চলে গেল পাশের ঘরে। খাটের পাশে মেঝের উপর বসে পড়ে দাদার কোলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

প্রিয়নাথ আর কোনো কথা বলল না। ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

তেমনি ঘন কালো এক রোখা কোঁকড়া চুল। কত ঝকাঝকি করেছে, ভালো করে আঁচড়ায় না, তেল মাখে না বলে। একটু যেন শ্যামলা হয়ে গেছে আগের চেয়ে। রংটাও তেমন পাট নেই।

বিকেলের দিকে লক্ষ্মী যখন কুয়োর পাড়ে গা ধুতে গেছে, প্রিয়নাথ টুলির মার সঙ্গে বসে তার সম্পর্কেই কথাবার্তা বলছিল—"তুমি বলছ, পুরো এক মাস লাগবে না, তার আগেই হয়ে পড়বে?"

—হ্যাঁ দাদাবাবু, আমার তো তাই মনে হচ্ছে। ও পাড়ার যে ধাই আছে, কালই তাকে ঠিক করে ফেলতে চাই।

—ও-সব ধাই-টাই-এর পাট এখন উঠে গেছে, টুলির মা। তাছাড়া, একটা আস্ত শামলানো তো লোজা ব্যাপার নয়। কে করে? তুমি অভিজ্ঞ আছ, যতটা সাধ্যি করবে। কিন্তু সেঁড় কাপ করবার জন্যে একজন ব্যাটাছেলেও দরকার। আমি তো থেকেও নেই।

টুলির মা খানিকটা চিন্তা করে বলল, কথাটা মন্দ বলনি দাদাবাবু। ঐ জন্যেই তোমাদের ভদ্দরলোকের মধ্যে আজ-কাল ঐ হাসপাতালের রেওয়াজ হয়েছে। আমাদের চাষা-ভুষোর অবশ্যি কেউ কেউ যেতে শুরু করেছে। তাই কর। তা, সেও তো শুনছি আগে থেকেই সব বন্দোবস্ত করে রাখতে হয়।

প্রিয়নাথ বলল, হ্যাঁ, তা না হলে অনেক সময় জায়গাই পাওয়া যায় না। তুমি এক কাজ কর। সকালে একবার সুদীপের কাছে যাও। সুদীপকে চেন তো?

—হ্যাঁ গো, সেই যে ছিদাম মুদীর দোকানের পাশে দোতলা বাড়ি। সারাদিন দু'চাকার গাড়ি করে ঘুরে বেড়ায়, পাতলা মতন বাবু।

—ঠিক বলেছ। খুব সকালে যাবে কিন্তু, তা নাহলে পাবে না। আমার নাম করে বলো, কালই যেন একবার দেখা করে।

বাড়ির সামনে গাড়ি থামবার শব্দ হল। টুলির মা উঠে পড়ে বলল, কারা যেন এল। বলতে বলতেই দরজায় কড়া নড়ে উঠল। টুলির মা গিয়ে খুলে দিতেই সুব্রত এগিয়ে এসে নমস্কার করে বলল, চিনতে পারছেন?

—কী যে বলেন! আপনাকে চিনবোনা? আপনি আমার জন্যে যা করেছেন—

—আমি। কিছুই করিনি প্রিয়নাথ বাবু। যদি কেউ কিছু করে থাকে, সে সুদীপ। সে কথা এখন থাক। আমার বৌদি।

অমাও পিছন পিছন ঢুকে পড়েছিল। তাকে দেখিয়ে দিল। প্রিয়নাথ ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল—আসুন আসুন কী সৌভাগ্য আমার! টুলির মা কোথায় গেলে? আমার ক্রাচ্‌টা···।

অমা বলল, না, না আপনি বসুন।

—আমি তো বলেই আছি। আপনাদের জন্যে—

টুলির মা ততক্ষণে ওপাশ থেকে একটা টুল এনে দেতে দিয়েছে। প্রিয়নাথ জয়াকে বলল, বসুন। সুব্রত বাবু, আপনি আমার এই তরুণপোষেই—

—বসে পড়লাম। আমাদের জন্যে আপনি কিছুমাত্র ব্যস্ত হবেন না।

জয়া বলল, আপনারা গল্প করুন, আমি বরং লক্ষ্মীকে দেখে আসি। সে কোথায়?

—ঐ তো, ও-ঘরে। ঘর বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়। এই বেড়াটার ওধারে। টুলির মা, লক্ষ্মী কি পা ধুয়ে ফিরে এসেছে?

—এই এল বাবাবাবু।

—ওঁকে ভিতরে নিয়ে যাও।

সুব্রত তার ছাত্রকে নিয়ে জয়ার ওখানে পৌঁছবার পরেই ওদের মধ্যে একটা দ্রুত আলোচনা হল। লক্ষ্মীর সম্ভাব্য গন্তব্য স্থান দুটো। দাদার কাছে, আর সেই বাড়ি কাজোনার মেয়েটির বাড়ি। তার ঠিকানা কারোরই জানা ছিল না। তবে মিসেস দত্তের বাড়িটা জয়া চিনত। সেখান থেকে ঠিকানা নিয়ে মেয়েটিকে খুঁজে বের করা হয়তো অসম্ভব হত না। তার আগে প্রিয়নাথের ওখানটা একবার দেখে নেওয়া দরকার। জয়া এবং সুব্রত দুজনেই এ বিষয়ে একমত হল। কৃষ্ণনকে এর মধ্যে টানা বৃথা। সে আর কী বলবে? বলবার মত মনের অবস্থাও তার নয়। বেচারা ভেঙে পড়েছিল।

সুদীপের ভাইকে—তার নাম সুপ্রিয়—তখনই নারকেল ডাঙার প্রিয়নাথের বাড়ি রওনা করে দেওয়া হল। ওদের বাড়িও তো ঐ পাড়ায়। বিশেষ করে বলে দেওয়া হল, খবরটা নিতে হবে যথাসম্ভব গোপনে এবং কৌশলে, অর্থাৎ প্রিয়নাথকে না জানিয়ে। তাই নিয়েছিল সুপ্রিয়। ঘটনা ক্রমে লক্ষ্মীর সঙ্গেই দেখা হয়ে গিয়েছিল। খিড়কির পাশে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। সুপ্রিয়কে দেখে বলল, সুপ্রিয় না? কেমন আছ তোমরা?

—ভালো। আপনি কবে এলেন?

—এই তো আজই এলাম।

—আছেন তো কদিন?

—হ্যাঁ, তা বোধ হয় আছি।

আরো যেন কি বলতে গেল। ও যে সুব্রতর কলেজে পড়ে লক্ষ্মীর জানা ছিল। হয় তো ওকে দিয়ে ওদিকের সঙ্গে একটা যোগাযোগ করবার ইচ্ছা মনে এসে থাকবে। সুপ্রিয় চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে কিছু বলবেন?

কি মনে করে পিছিয়ে গেল লক্ষ্মী। বলল, না।

সুপ্রিয় গিয়ে খবর দিতেই জয়া এবং সুব্রত সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে নিল। সুব্রত একবার বলেছিল, কৃষ্ণনও চলুক এই সঙ্গে। সুপ্রিয়র সঙ্গে লক্ষ্মীর যে কথাবার্তা হয়েছে, তার থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে, তার দাদার সম্বন্ধে আশঙ্কার কিছু নেই। যা আশা করা গিয়েছিল, মানে শেষ পর্যন্ত যা হয়ে থাকে এদের ক্ষেত্রে; তাই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

জয়া বলল, না, কৃষ্ণন আজ থাক। তুমি আর আমি ঘুরে আসি। আবহাওয়াটা ভালো করে না জেনে ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ভাঙির করা ঠিক হবে বলে মনে হচ্ছে না।

লক্ষ্মী তার ঘরের একমাত্র জানালার দিক ধরে দাঁড়িয়েছিল। টুলির মার সঙ্গে জয়াকে এগিয়ে আসতে দেখে চোখ দুটো একবার তুলেই সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিল? জয়া তার পিঠে হাত রেখে কাছে টেনে বলল, চল, বসি।

তরুণপোষে পাশাপাশি এসে যখন বসল দুজনে, তখনো লক্ষ্মী মুখ তুলতে পারছে না। চোখের কোণ বেয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছিল। টুলির মা হয়তো লক্ষ্য করেনি, কিন্তু জয়ার চোখ এড়ায়নি। টুলির মা ঘরের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করছিল। জয়া ভাবছিল, কোনো একটা অছিলায় তাকে সরিয়ে দেওয়া যায় কেমন করে। তার আর দরকার হল না। টুলির মা সে সুযোগ এনে দিল—"আপনারা তাহলে গল্প করুন দিদিমণি। আমি একটু চা-এর যোগাড় করি।"

"না মাঝ নয়" সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দিল জয়া, "কিন্তু শুধু চা, বুঝলে টুলির মা? তার সঙ্গে আর কিছু নয়।"

—তাই কখনো হয়? সেবারে দিন এলেন আপনারা। একটু কিছু যদি সামনে দিতে না পারি, রাত পোহালে দাদাবাবু আমাকে বাড়ি ঢুকতেই দেবে না।

টুলির মা দাওয়াঘরের দিকে যেতে জয়া বলল, বাড়ি ঢুকতে না দেওয়া বুঝি তোর দাদার সাধারণ নিয়ম?

লক্ষ্মীর সজল চোখে হাসি ফুটে উঠল। জয়া তেমনি হালকা সুরে বলল, আমরা সব সময়ে বলি, ছঠাৎ রোগের মাথায় কোনো কাজ করতে নেই। মাঝে মধ্যে তাতে কিন্তু বেশ ভালো ফল দেয়। কি বলিস?

ইঙ্গিতটা লক্ষ্মী বুঝল। মৃদুকণ্ঠে বলল, আমি রাগ করতে যাবো কার উপর।

—আচ্ছা সে বিষয়টা পরে হবে। এদিকে আর তো কোনো গোলমাল নেই?

লক্ষ্মী মাথা নাড়ল। জয়া বলল, সেটা অবশ্যি তোমার জন্যে হয়নি। যে খুব মারাত্মক তোমার পেটের মধ্যে গেছে

বেরোবার জন্য ছটফট করছেন, সব ক্রেডিট তাঁর। বাহাদুর ছেলে।

এই জাতীয় উদ্ভট উপমা জয়ার মুখে অনেক শুনেছে লক্ষ্মী। তবুও হাসি চাপতে পারল না। বলল, তুমি কি এই করতে এসেছ? আর কোনো কথা নেই?

—আছে বৈ কি? আসল কথাটাই তো এখনো শোনা হয় নি। কী ব্যাপার বল দিকিন?

—কিসের কী ব্যাপার?

—না, সত্যি; শুনে অবধি মনটা কী রকম করছে বুঝতে পারছিস না?

সুটকেসের ভিতর থেকে একটা মোটা খাম বের করে এনে ওর হাতে দিল। জয়া বলল, কী এটা?

—পড়।

—ও, বাবা, এ যে এক মহাভারত! খাম থেকে চিঠিখানা বের করে

চমকে উঠল জয়া।

—"আশাপোড়া সবটাই পড়তে হবে। তা না হলে কিছুই বুঝবে না।"...বলে উঠে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে হারিকেনটা এনে বসিয়ে দিল তক্তপোষের উপর। সিতেটাও যথাসাধ্য সজাগ উৎকর্ণ হল।

জয়া প্রথমটা মনে করেছিল, লক্ষ্মী যখন অমন করে ধরেছে, তাকে খুশী করার জন্যে এখানে ওখানে খানিকটা চোখ বুলিয়ে দেবে। কিন্তু শুরু করতেই চিঠির কথাগুলো যেন ওর চোখ দুটোকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। তারপরেও ওকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে লক্ষ্মী বলল, এবার বুঝতে পারছ?

জয়া সে প্রশ্নের ঠিক সোজা উত্তর দিল না। বলল, পাগল! বুঝলি না? একেবারে পাগল। শুধু এ নয়, এদের গোটা জাত—যারা ছবি আঁকে, কবিতা লেখে, রাত জেগে জেগে গল্প বানায়, ঘর সংসার ছেড়ে সিনেমা-থিয়েটারে অভিনয় করতে ছোটে। তাদের আমরা এক কথায় বলি—আর্টিস্ট। শুধু এদের নিয়ে আমাদের ঘর করতে হয়। এদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। তা না হলে এরা যায় কোথায়?

শেষের দিকের কথাগুলো কেমন যেন করুণ শোনাল! একটুখানি বিরতির পর আবার বলল জয়া, মাঝে মাঝে এরা এত নীচ, এত নিষ্ঠুর হতে পারে। দেখলে মনে হবে, এদের হৃদয় বলে কিছু নেই। তা কিন্তু ঠিক নয়। আসলটার প্রাণ আছে। আর সেইটাই এদের আসল পরিচয়।...নে, ওঠ, ওঘরে চল। তোর দাদার সঙ্গে তো কথাই হল না। কী মনে করছেন উনি।

শ্রীনাথের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করল জয়া। তার সঙ্গে টুনির মার হাতের চা এবং ফুচো নিমকি। শুভ্রও তো পুরো এক প্লেট সাবাড় করে দিল। বলল, এ জিনিস কখনো খাই নি।

শ্রীনাথের আর এক দফা হাসি। বোম্বাইয়ের ঠিক আগেটায় জয়া লক্ষ্মীকে চুপি চুপি বলে এসেছিল, দাদাগিরই পাঠিয়ে দেবো। দুচারদিন বেড়ি হলে খারাপ লাগে। ওদিকের অবস্থাটা একটু ভালো করে বুঝে নিই।

কিন্তু জানবার কোনো চেষ্টা হবার আগেই কৃষ্ণনের কাছ পড়ল অমৃতসর। হৃদ্রোগে আক্রান্ত। দীর্ঘ টেলিগ্রাম। মেলোরে তার যে বোনটির বিয়ে হয়েছিল, তার স্বামীর খুব শক্তির অসুখ। হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে সে রীতিমত বিপন্ন। দেখবার কেউ নেই। বড় গাড়ীটা তখনই পাঠাল।

একটি জায়গায় অবশ্য আছে, কিন্তু না থাকলে ভালো। অনেকদিন থেকেই দেখা-শুনো যাতায়াত বন্ধ! কৃষ্ণন গিয়ে না পড়লে, হাসপাতালে যে পড়ে আছে সে তো যাবেই, সরকারী কোয়ার্টারে যারা রয়েছে তাদেরও হয়ত সংসার। একটা মেয়েমানুষ কদিক সামলাবে?

কৃষ্ণন আবার ছুটল জয়ার কাছে। তা সব শুনে বলল, তুমি খুবে এসো। এদিকের জন্যে কোন ভাবনা নেই। আমরা তো রইলাম।

লক্ষ্মীর নামে একটা চিঠিতে এই নতুন বিপদের খবরটা সংক্ষেপে জানিয়ে, জয়াকে সেটা পৌঁছে দেবার ভার দিয়ে সে সেই দিনই মাদ্রাজ মেল-এ রওনা হয়ে গেল।

ওখানে গিয়ে দেখল, টেলিগ্রামে যতটা জানানো হয়েছে, প্রকৃত অবস্থা তার চেয়েও জটিল। বোন নিজেও অসুস্থ, বাচ্চাগুলোর মধ্যে দুটি একেবারে অপগণ্ড। তখন দুদিক নিয়ে পড়তে হল কৃষ্ণনকে। রোজ হাসপাতালে যাওয়া, সেখানকার তার সামলানো, অর্থাৎ ওষুধ, ইনজেকশান কিনে দেওয়া, স্পেশাল নার্সে-এর বন্দোবস্ত করা, ডাক্তারদের কাছে ছোটা ইত্যাদি, আর বাড়িতে বোন এবং তার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কারেলা। বোনোটাই ছাড়বার উপায় নেই।

ওখানে পৌঁছবার কদিন পরেই জয়া টেলিগ্রাম করে জানিয়েছে, লক্ষ্মীর একটি ফুট ফুটে ছেলে হয়েছে এবং ওরা দুজনেই ভালো আছে। পরে যে চিঠি এসেছে, তাতেও আশ্বাস দিয়েছে জয়া, এদিকের জন্য ভেবো না! ওখানকার খবর কী? কবে ফিরছ?

ভট্টাপতি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাসায় ফিরলেন। তখনও বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। দীর্ঘ ছুটি চলছে আরো দীর্ঘদিন চলবে, সরকারি বাড়ি কতদিন

আটকে রাখা চলে না। অতএব একটি বাড়ি চাই, এবং আপাততঃ সেটা কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে। এবার তার সন্ধানে বেরোতে হল কৃষ্ণনকে। সেও কম সমস্যা নয়। যেন সময় গেল।

প্রায় মাস তিনেক কেটে যাওয়ার পর ছুটি মিলল। একবার মনে করেছিল, যেরোবার আগে অন্নাকে একটা চিঠি লিখে যেবে। শেষ পর্যন্ত আর হয়ে উঠল না।

এতদিন চলেছিল ঝড়ের বেগে। থামবার অবকাশ ছিল না। আজ যখন নিজের ঘরে চিরদিনের অভ্যস্ত জীবনের মধ্যে এসে দাঁড়াল, কৃষ্ণন এই প্রথম অনুভব করল, কত বড় ক্লান্তির বোঝা কতদিন ধরে শুধু মনের জোরে টেনে নিয়ে এসেছে। ছুটো পুরো দিন বিছানায় পড়ে রইল। মেথনহাসিকে একবার অন্নার কাছে পাঠানো দরকার। মুখে বলতে হবে, দু'লাইনের একটা চিঠি লিখতে হবে—সেটুকু জোরও যেন খুঁজতে হচ্ছিল।

সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল। মেথনহাসি বড় রাস্তার মোড় থেকে আনতে গেছে। অন্নার বরফ খোলা ছিল। কৃষ্ণন খবারীতি শটান হয়ে পড়েছিল বিছানায়। হঠাৎ খুট করে একটু শব্দ হতেই বলে উঠল—কে! তারপরেই লাফ দিয়ে উঠে দুচোখ ভরা অন্তহীন বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল। শুধু বিস্ময় নয়, তার মধ্যে থেকে বিচ্ছুরিত এক অদ্ভুত আনন্দ—কোন আশ্চর্য উপলব্ধি কিংবা কোন মহৎ আবিষ্কার যে আনন্দ জাগিয়ে তোলে মানুষের মনে, ফুটিয়ে তোলে তার চোখের তারায়।

কৃষ্ণনকে ঐভাবে চেয়ে থাকতে দেখে লক্ষ্মীও অবাক হয়ে গেল—

—"কী দেখছ অমন করে! চিনতে পারছনা! ইস্ কত রোগা হয়ে গেছ! অসুখ করেছে, একটা খবর পর্যন্ত নেই। মেথনহাসি দিয়ে বলল, সাহেব এসে অবধি শুয়ে আছে। শুনেই ছুটতে ছুটতে আসছি।

কৃষ্ণনের কানে একটা কথাও গেল না। সে তখন অন্য জগতে চলে গেছে। বলল, লক্ষ্মী, তুমি একটু ওপরে যাবে?

—কেন?

এমনি খোকাকে কোলে করে দাঁড়াবে, আমি তোমার এই ছবিটা ধরে রাখবো।

—এখনি!

—হ্যাঁ; তা না হলে আমার এই দুষ্টু চঞ্চলো এর পরে আর থাকবে না। তোমার এইরূপ তো কখনো দেখিনি। কত রোগা, কত দুর্বল হয়ে গেছ তুমি। কিন্তু কী সুন্দর!

লক্ষ্মীর দু'কান ভরে কে যেন সুখের স্রোত ঢেলে দিল! কৃষ্ণন তখনো বলে চলেছে—আমার কি মনে হচ্ছে জান লক্ষ্মী...এতদিন তোমাকে কত ভাবে, কত ভঙ্গিতে দেখেছি, কত পোজ, আজ তার কিছু নেই। তবু আজকের এই রূপের কোনো তুলনা নেই। এর কাছে কোথায় লাগে চণ্ডীদাসের রাধা, কিংবা রবীন্দ্রনাথের বিজয়িনী!...একবারটি চল।

লক্ষ্মীর চলবার মত অবস্থা নয়, কোথাও বসে পড়তে পারলে বাঁচে। কিন্তু কোত্থেকে যেন অনেক জোর এসে তার পায়ে। কিসের টানে যেন এগিয়ে চলল।

"তোমার কষ্ট হচ্ছে? আচ্ছা খোকাকে আমার কাছে দাও।"

লক্ষ্মী হাত বাড়িয়ে ঘুমন্ত শিশুকে স্বামীর হাতে তুলে দিল। এবং তাকে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

চরিত্র

বিমল কর

আমি সম্প্রতি স্থির করেছি, কারো চরিত্র সম্পর্কে কখনো আর সুপারিশ করব না। আগেও যে ঘন ঘন চেনা অচেনা বহুজনের চরিত্র সুপারিশ করে লিখে দিয়েছি তা নয়, তবু কখনো সখনো অনুরোধে এ কাজ আমায় করতে হয়েছে। আগে কখনো এমন কথা মনে হয় নি সুপারিশ লিখে দেবার দায় দায়িত্ব আছে; কিংবা বিড়ম্বনা। কিন্তু সম্প্রতি এমন একটা ঘটনা ঘটল যে আমি মনে মনে ঠিক করে ফেললাম এই কাজটি আর কখনোই করব না।

মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে যে আমার অভিজ্ঞতা আছে এ দাবি আমি কখনই করি না। মাস তিনেক আগে এই পাড়ারই কাছাকাছি কোন গলি থেকে যখন একটি কমলা রোগা নম্র মেয়ে এসে বলল, 'আমার যদি একটা ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দেন খুব উপকৃত হই—' তখন আমি তাকে সরাসরি না বলিনি। এমন ক্ষেত্রে স্বভাবতই যেটুকু বিনয় জানাতে হয় সেটুকু জানিয়েছি এবং শেষ পর্যন্ত একটা ক্যারেকটার সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছি। কল্পনাও করিনি সেই সার্টিফিকেটের জের ধরে আজ অনুশোচনা করার মতন কোন ঘটনা ঘটতে পারে।

সেদিন এক বন্ধুর পারিবারিক নিমন্ত্রণে চুঁচুড়া যেতে হয়েছিল। ফেরার পথে খুব আচমকাই কমলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বছর পাঁচেকের ওপর তার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ ছিল না। প্রথমটায় চিনতে পারিনি, চোখে চোখ পড়তে মনে হয়েছে চেনাচেনা, পরে চকিতে বিস্মৃতটুকু কেটে গেলে তাকে চিনতে পেরে গেলাম। "আরে, কমলা! তুমি?"

কমলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমায় দেখছিল। কাঁধে চামড়ার ট্র্যাপ দেওয়া ব্যাগ, হাতে প্লাস্টিকের থলি আর ছাতা। বলল, "হ্যাঁ, আমি। তুমি এদিকে?"

"নেমন্তন্ন রাখতে এসেছিলাম।" হেসে বললাম। "কিন্তু তুমি এদিকে কোথায়?"

"আমি এদিকেই থাকি।"

"চুঁচুড়ায়?"

"না, এই কাছেই।"

কমলাকে আগের তুলনায় অনেক মোটাসোটা দেখাচ্ছিল। চোখে চশমা, হয়ত কয়েক দফা পাল্টেছে এবং শেষবারি যে ফ্রেমটা নিয়েছে তাতে ওর মুখ অনেক বয়স্ক ও গম্ভীর মনে হচ্ছিল। কমলার এই মুখ আমার চেনার কথা নয় তবু তার পুরোনো মুখ আমার খুব বেশি করেই চেনা ছিল বলেই এই দুয়ের মধ্যে যেটুকু ইতিহাস থাকতে পারে তা অনুমান করে নিলাম। বললাম, "তুমি এখানে কোথাও পড়াচ্ছ বুঝি?"

"হ্যাঁ।" কমলা মাথা নাড়ল।

"স্কুল?"

"কলেজ কোথায় পাবো।"

গাড়ি আসার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, বললাম, "চলো ওদিকে যাই। কতদূর যাবে?"

"কলকাতা।"

"কলকাতায় সব কি সেখানেই আছে?"

"দাদা বউদি আছে। অমলা দুর্গাপুরে, বিয়ে আসানসোলে।"

"সবাই ভাল আছে তো?"

"মোটামুটি।"

আমরা প্লাটফর্মের একটু ফাঁকা প্রান্তে এসে দাঁড়ালাম। গাড়ি আসছিল। কমলা বলল, "অনেকদিন পরে আজ যাচ্ছি, কাল বিকেলে ফিরব।"

"অনেকদিন পরে কেন?"

"সময় হয়ে ওঠে না। একে স্কুল তার ওপর স্কুল হোস্টেল।"

"তাহলে তো খুব কাজের মানুষ হয়ে গেছ। তুমি কি হেড মিট্রেস?"

"না, হেড নই তবে হেডেক; স্কুলের, হোস্টেলের মেয়েদেরও।" কমলা একটু হাসল।

গাড়ি আসছিল। আমরা গাড়ির অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকলাম।

গাড়িতে ভিড় ছিল না। ফাঁকা মত একটা কামরায় উঠে বসলাম। জানলা ঘেঁষে মুখোমুখি দুজনে বসে। গাড়ি ছাড়ল। সিগারেট ধরিয়ে বললাম, "আমার কথা তো জিজ্ঞেস করলে না?"

কমলা বলল, "কিছু জানি। বাড়ি বলেছে, ঠিকানাও বলতে পারি।"

অবাক হয়ে বললাম, "কি করে জানলে?"

কমলা হেসে বলল, "তোমার ছাপা লেখার প্যাড দেখে।"

"সে কি! আমার লেখার প্যাড তোমার চোখের সামনে মেলে ধরবে এমন কাউকে তো মনে পড়ছেনা।"

একটু চুপ করে থেকে কমলা বলল, "কেন, রমা সেন, মনে পড়ছে না?"

"রমা! কই না, কে রমা?"

কমলা আমার চোখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। ওর এই দৃষ্টি আমার খুব চেনা। আমি জানি, রমার সম্বন্ধে বাতিক তাকে মাঝে মাঝে প্রায় নিষ্ঠুর করে তোলে। আমার কথা সে যে বিশ্বাস করছে না, বুঝতে আমার কষ্ট হলো না। বললাম, "এই রমা কি করে, কোথায় থাকে?"

কমলা বলল, "সে কি!" বলে তার চোখে নকলের ধারের মতন বিদ্রূপ তুলল; বলল, "তুমি রমা সেনকে চেনো না?"

"না।"

"না জেনে না চিনে তুমি কি পাতা ভরতি করে তার চরিত্রের গুণগান গেয়েছ?"

প্রথমটায় না বুঝলেও এতক্ষণে আমার মনে একটা সন্দেহ এলো। বললাম, "কি ধরণের গুণগান?"

কমলা হঠাৎ একটু হাসল; বলল, "আমরা তাকে সার্টিফিকেট বলি, ক্যারেকটার সার্টিফিকেট; কিন্তু তুমি যা দিয়েছ তাকে প্রশস্তি বললেই ঠিক বলা হয়।"

অন্ধকারে যেন আলো দেখতে পেয়ে হাঁপ ছাড়লাম। বাইরেও আস্তে আস্তে অন্ধকার নামছে। শেষ বর্ষার পড়ন্ত বিকেলের আভা পানের বরজ, আম, ধুঁধুলের মাচার ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে নারকেল গাছের মাথায় গিয়ে উঠছে। দুপাশে খানা ডোবা বাঁশবন, প্যাওড়ার জঙ্গল। কয়েক মুহূর্ত বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার খুব ফিরিয়ে কমলার মুখের দিকে তাকালাম। বললাম, "সেই প্রশস্তি তুমি কি কুড়িয়ে পেয়েছ?" কথাটা আমি ঠাট্টা করেই বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু কেন জানি না বলার মধ্যে কেমন করে একটা খোঁচা লেগে গেল।

কমলা বলল, "তোমার প্রশস্তি কি পথের ধুলোয় লুটোয়?"

"জানি না। তবে অনেকেই আমার সম্বন্ধে এ ধারণা অনেক আগেই করে নিয়েছে।"

কমলা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "তাহলে তুমি রমা সেনকে চেন না?"

"না।...কোথায় থাকে কেমন দেখতে কি করে বললে হয়তো মনে করতে পারি।"

কমলা রমা সেনের বিবরণ ও বৃত্তান্ত দিয়ে বলল, "আমি ভাবলাম তুমি যার চরিত্র এত খুঁটিয়ে জান, তাকে আবার স্কুলে অন্তত চরিত্রের নকেল হিসেবে চাকরি দিতে হয়। না, আমি বোধ হয় ঠিক বোঝাতে পারলাম না; বরং এমন চরিত্র স্কুলে মেয়েদের সামনে থাকলে বেশ হবে —এরকম কিছু একটা ভেবেছিলাম। থাকগে, তুমি রমা সেনকে চিনলে?"

ততক্ষণে অনুমান করতে পেরেছি। বললাম, "চেনা-চিনির কি আছে; চাকরির জন্যে এসেছিল, সার্টিফিকেট দিয়েছি?"

কমলা বলল, "না জেনে না চিনে?"

"হ্যাঁ।"

কমলা চোখ সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল। ইতিমধ্যে আমাদের গাড়ি পথের মাঝে স্টেশনে থেমেছে, ছেড়েছে আবার থেমেছে। বাইরেটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। কামরার আলো আস্তে আস্তে ফুটে উঠেছে। বাইরে থেকে কামরার মধ্যে চোখ ফিরিয়ে এনে কমলা বলল, "এমন জানলে তোমার কাছে; আমি একটা ক্যারেকটার সার্টিফিকেট নিতাম।"

আমি বললাম, "কিন্তু তুমি তো আমার অজানা অচেনা নও।"

কথাটার মধ্যে যেটুকু গোপন অর্থ ছিল কমলা তা বুঝে নিয়েছে অথচ তা প্রকাশ করল না। বরং হঠাৎ কেমন হালকা হয়ে গিয়ে বলল, "তোমার একটা কথা বলি, যাকে চেনো না তার সম্পর্কে কথা বাড়াবাড়ি করে আর কখনো কিছু লিখো না। রমা মেয়েটা কোন দিক থেকেই তোমার দেওয়া সার্টিফিকেটের মান রাখে নি। মেয়েটা আমাদের স্কুল, মেয়েদের হোস্টেল এমন ভাবে জ্বালিয়েছে যে ওকে আমরা শেষ পর্যন্ত না তাড়িয়ে পারিনি।"

"সে কি? ওর চাকরি কেড়ে নিয়েছো?"

কমলা বলল, "না কাড়লে আমাদের স্কুলের বদনাম রটত।"

আমি খানিকটা কৌতূহল বোধ করলাম, বললাম, "যতদূর মনে পড়ছে আমাদের পাড়ার কাছাকাছি কোথাও মেয়েটি থাকত। আমার তো তাকে খুব সাধারণ আর নিরীহ বলে মনে হয়েছিল। তার চরিত্রের

দোষটা কোথায় ?"

"দোষ কি এক—অনেক।"

"শুনি।"

কমলা বলল, "তুমি যা লিখেছিলে সবই তার উল্টো। মিথ্যুক, ফাঁকিবাজ, ঝগড়ুটে, বাঁদর, তাছাড়া তার চালচলন খুবই নোংরা।"

আমি বললাম, "কি জানি, আমি তো তাকে চিনতাম না, হতে পারে।"

তারপর অনেকক্ষণ আমাদের মধ্যে আর বেশী কথা হলো না। মনে মনে বোধ হয় উভয়ই কিছু ভাবছিল, এমন ভাবনা—যা খুব স্পষ্ট নয়, সুশৃঙ্খল নয়। খানিকক্ষণ পরে কমলা বলল, "আমি শুনেছিলাম রমার সঙ্গে তোমাদের খুব যোগাযোগ আছে।"

আমি অবাক হয়ে মাথা নাড়লাম, বললাম, "না।"

কমলা বলল, "রমা বলত। বলত, তোমার বাড়িতে তার নিত্য আসা-যাওয়া আছে। খুব ঘনিষ্ঠতা। তুমি নাকি বললেই ওর সেক্রেটারিয়েটে চাকরি হয়ে যেত। কিন্তু বল নি, কারণ মেয়েরা কেরাণীগিরি করলে শরীর ভেঙে যায়।" বলতে বলতে কমলা একটু হাসল।

আমি হেসে বললাম, "তাই নাকি! এসব তো জানতুম না।"

কমলা হেসে বলল, "তুমি দেখছি অনেক কিছুই জানতে না। মাঝে মাঝে ও মেয়ে তোমার ডাকে কলকাতায় ছুটত ঘুষে কামাই করত, হোস্টেলে ফিরত না এসবও নিশ্চয়ই জানতে না।"

আমি বললাম, "সর্বনাশ। আমি কোত্থেকে জানব ?"

কমলা বলল, "তুমি কি জানতে ও কত বড় চোর ছিল।"

আমি বিস্ময় বোধ করে বললাম, "চোর!"

কমলা বলল, "এরকম নচ্ছার মেয়ে আমি আমার জীবনে দেখি নি। ও যতদিন থেকেছে আমি জলে পুড়ে মরেছি। মেয়েটার এত দেমাক যে যাবার সময় আমাকে শাসিয়ে গেছে।"

কমলার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার কোথাও যেন সন্দেহ হচ্ছিল। বললাম, "আমায় একটা কথা বলবে কমলা ?"

কমলা সাড়া দিল না।

আমি এবার স্পষ্ট করেই জিজ্ঞেস করলাম, "রমা কি চুরি করেছিল ?"

কমলা আমার এই প্রশ্নে বিরক্ত বোধ করল। বলল, "করেছিল।"

"কি ?"

কোন জবাব দিল না কমলা।

সামান্য অপেক্ষা করে আমি বললাম, "রমাকে তোমার পছন্দ হয় নি বলেই আমার মনে হচ্ছে। কিন্তু তুমি তাকে কেন যে চাকরি দিয়েছিলে তা আমি বুঝছি না।"

কমলা বলল, "তোমার খাতিরে।"

আমি হেসে বললাম, "আমার খাতিরে তুমি চাকরি দেবার মেয়ে নও।"

কমলা মুখ তুলল। বিশেষ প্রসন্ন নয়। বলল, "তবে দেব কেন, আমার কি স্বার্থ ?"

আমি বললাম, "না তোমার আর কি স্বার্থ।" মনে মনে এখন আমার সন্দেহ হলো কমলা বোধ হয় রমাকে খতিয়ে দেখতে চেয়েছিল। কেন চেয়েছিল, তাও অনুমান করতে পারছি। কমলা এইরকমই, এই তার স্বভাব। সে অনেকদিন আগেই আপাত দৃষ্টিতে যা থেকে মুক্ত হয়ে গেছে মনে মনে এখনও তার আলায় যা বাধায় বাঁধা পড়ে আছে। আমার সার্টিফিকেট যাচাই করার আন্তরিক উৎসাহ কমলার হয়ত আজীবনই থেকে যাবে।

হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে প্লাটফর্ম পেরিয়ে আসার সময় কমলা কোন কথা বলল না। প্লাটফর্ম পেরিয়ে এসে যখন আমরা বিদায় নিচ্ছি তখন কমলা হেসে বলল, "আচ্ছা চলি।···দরকার পড়লে তোমার কাছে একটা ক্যারেকটার সার্টিফিকেট চেয়ে পাঠাব।"

জবাবে আমি হেসে বললাম, "আমার সার্টিফিকেটে তোমার যদি চলে নিশ্চয়ই লিখে দেব।"

কমলা মুখ তুলে শুধলো, "কি লিখবে ?"

আমি বললাম, "মাত্র দু তিনটি কথা।"

কমলা বলল, "কি ?"

সে কথার আমি কোন জবাব দিলাম না। হেসে বললাম, "আচ্ছা চলি।"

চিঠি

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

বাড়ির মুখোমুখি এগিয়ে এসে হাত নেড়ে অমলকে বিদায় জানাল কৃষ্ণা। অমল রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়েছিল, রুমাল তুলে প্রতিদান দিল। এতদূর না এলেও হত ওর। মেসোরা থেকে বেরুবার পর কৃষ্ণাই ওকে বলেছিল, তোমার দেরি হয়ে যাবে অমল, আমি আজ একাই ট্রামে উঠি। কাল আবার কলেজ ছুটির পর ঠিক দেখা করব।

কৃষ্ণার ব্যাপারে অমল সব সময়ই একটু ভীরু প্রকৃতির। বলল, আমার মত ছেলেদের মেসি করেই দেরা অভ্যেস, তা ছাড়া এত তাড়াতাড়ি এই সন্ধ্যেবেলা যদি কিরি মা আমার কপালে হাত দিয়ে দেখতে চাইবেন সত্যি সত্যি আমি অসুস্থ কিনা। ফলে যতক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকা যায়, থাকি না আর একটু।

বড্ড ছেলেমানুষ তুমি! কৃষ্ণা ওকে বোঝাতে চাইল, আমাদের পাড়ার দিকে এখনো যে তোমার যাওয়াটা উচিত নয় এ কথা তুমি বুঝতেই চাও না। একদিন দেখবে ছোড়দা তার দলবল নিয়ে তোমার উপর হামলা করছে, তখন মজাটা বুঝতে পারবে। তা ছাড়া তোমাকে তুমি বলে ফেলেছি, বৌদির কাছে আজই সব খুলে বলব। যা হয় একটা কিছু আজই করে ফেলব।

যদি রাজী না হতে চান বৌদি? অমল সন্দেহ প্রকাশ করে।

কৃষ্ণা হেসে বলল, বৌদিও প্রেম করে বিয়ে করেছিল, বুঝলে! দরকার হয় বৌদির গলা জড়িয়ে ধরে থেকেও করে রাখবো।

অমল এরপর আর কথা বলে নি। ব্যাপারটা যত সহজে হয়ে যাবে বলে ভাবছে কৃষ্ণা আসলে তত সহজে হবার নয়। অমল কৃষ্ণাদের বাড়ির কিছু কিছু খাঁচ ধরতে পারে। ওর বড়দা লোকটা সাতপাঁচ কোন ব্যাপারেই নেই, কিন্তু ছোড়দাটি একটি গোঁয়ার গোবিন্দ। তা ছাড়া মায়ের মনে যে কি আছে ভগবান জানেন। মা যদি তেমন প্রাচীন পন্থী হন তা হলে ইস্টার কাস্টে আবার রাজী হবেন কিনা বলা যায় না। অমল কৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রামে উঠল। তারপর জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

কৃষ্ণাদের বাড়ির কাছাকাছি এসে এক স্টপ আগেই ওরা নেমে পড়ল। কৃষ্ণা বলল, লক্ষ্মীটি অমল, আর এগিয়ো না আজ। ছোড়দা তোমাকে দেখতে পেলে ভীষণ চটাচটি করবে। এবার তুমি ফিরে যাও।

অমল বলল, আর একটু, ঐ লাইট পোস্টটা অবধি গিয়েই আমি উল্টো ট্রামে উঠে পড়ব। কিন্তু কাল আবার যতক্ষণ না তোমায় দেখা পাচ্ছি ততক্ষণ আমার কিছু ভাল লাগবে না।

কৃষ্ণা ম্লানভাবে রাস্তা পার হয়ে নিজের বাড়ির দিকে এগোল তারপর দরজার কাছে এসে হাত নেড়ে অমলকে বিদায় জানাল।

সিঁড়ির অন্ধকার জায়গাটুকু পেরুবার সময় ওর মনে হল, বাড়িটা আজ বড্ড বেশি নির্জন হয়ে আছে যেন। এ সময় দাদারা প্রায়শই বাড়ি থাকে না। বৌদি হয়তবা রান্না ঘরে, মা হয়ত বুলবুলকে নিয়ে পাশের ফ্ল্যাটে। বৌদিকে যদি একা পাওয়া যায় এখনই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথাটা বলতে হবে। ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। ঢুকে দেখতে পেল বুলবুলকে নিয়ে মা বসে আছে। বুলবুল ছবির বইয়ে হুমড়ি খেয়ে আছে। মা কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলল বোঝা গেল না, কৃষ্ণা সটান নিজের ঘরে ঢুকে শাড়ি পালটাতে শুরু করল।

খানিকক্ষণ পর বেরিয়ে এলো চিরুণী হাতে। শোভাদি এক কাপ চা কর না ভাই। শোভা এবাড়ির ঝি; বহুকালের ঝি, বাড়ির পরিবারের সঙ্গে যেন মিশে গেছে। বৌদি কোথায় শোভাদি?

শোভা বলল, সিনেমা গেছেন বড়দার সঙ্গে।

সিনেমা! কৃষ্ণা খানিকটা হতাশ হল। সন্ধ্যার শোতে সিনেমা মানে রাত নটার আগে নিশ্চয়ই ফেরার কোন আশা নেই। সহজ ভাবে ভঙ্গি করে শুধাল, কি সিনেমা?

কি জানি বাপু! শোভা কেটলিতে জল বসাল।

মা শুধাল, এই রাত অবধি তোর কলেজ হচ্ছে বুঝি আজকাল। অত ধিঙ্গি ধিঙ্গি করে রাস্তায় ঘুরে বেড়ান ভাল নয় মেয়ে, কোন দিন একটা বিপদ টিপদ বাধিয়ে বসবি।

কৃষ্ণা বলল, সব ব্যাপারে অমন খিট খিট করো না দেখি। কাজ ছিল বলেই দেরি হল। কি কাজ শুনি? দাঁত চেপে নিষ্ঠুরভাবে প্রশ্ন করল মা।

কৃষ্ণার একবার ইচ্ছে হল অমলের কথাটা এই মুহূর্তে বলে দেয় মাকে। বলে, অমলের সঙ্গে বেড়াচ্ছিলাম, রেস্তোরাঁয় বসে গল্প করছিলাম, অমলকে তোমাদের কেমন লাগবে জানি না, কিন্তু অমল ছাড়া কাউকে আমি বিয়ে করব না। কিন্তু প্রস্তুতি না নিয়েই এ সব কথা বলা যায় না, কৃষ্ণা তাই বলল না।

কি! চুপ করে রইলি কেন? মা তেমনি ভাবে গোগ্রাসে যেন কৃষ্ণাকে গিলছিল।

কৃষ্ণা বলল, কলেজে কোচিং ক্লাস ছিল।

দুটোর সময় কলেজ থেকে বাইরে গিয়েছিলি কোচিং ক্লাস করতে? আমরা আর কিছু খবর পাই না বুঝি, না? খুব চালাক হয়ে গেছ তুমি!

কৃষ্ণার বুকটা ধড়াস করে উঠল। জানল কি করে! হ্যাঁ দুটোর সময় অমল এসে কলেজ গেটে দাঁড়িয়েছিল, আর সত্যি সত্যি সে সময়ই সে অমলের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ সব ব্যাপারে বুঝল কি করে বাড়ির লোক। যাই বুঝে থাক, ভরাডুবি থেকে বাঁচবার জন্য কৃষ্ণা প্রতিবাদ করতে করতে শোভার কাছাকাছি এল।

শোভা ফিস ফিস করে বলল, বৌদিদি এসেছিল দিদিমণি। সেই বলেছে।

কৃষ্ণার চোখ-কান করমচার মত লাল হয়ে উঠেছিল, বলল চাটা আমার ঘরে দিয়ে যেও শোভাদি, ভীষণ মাথা ধরেছে আজ। কৃষ্ণা চিরুণীটা চুলের মধ্যে গুঁজে রেখে নিজের ঘরে চলে গেল।

বৌদির উপর ভীষণ রাগ হল। জেনেশুনে উপযাচক হয়ে বৌদি কেন যে বলতে এসেছিল কৃষ্ণা ঠিক ধরতে পারল না। কাল কলেজে ওকে ধরতে হবে। মনে মনে আপাতত ক্রোধটাকে হজম করার চেষ্টা করল কৃষ্ণা। তারপর মনে হল নাহ্, মস্তবড় ভুলই করে ফেলল ও। মাকে এই সুযোগে কথার পিঠে কথা দিয়ে অমলের ব্যাপারটা বলে ফেলা যেত। অমল এ বাড়ির অচেনা নয়, প্রথম প্রথম ঘন ঘন যাতায়াত করত। কিন্তু ছোড়দা ওকে বরাবরই সন্দেহ করেছে। বেশ অপমানও করেছিল

ছোড়দা। সেই থেকে আরো কিছু ঘটবার ভয়ে কৃষ্ণাই ওকে এ বাড়ি আসতে বারণ করে। তা ছাড়া দেখা তো রোজই হচ্ছে। অনর্থক কেন দশ রকম কথা শুনবে ছোড়দার। তুমি আর এসো না অমল।

অমল বলল, একদিন তো যেতেই হবে। তখন!

কৃষ্ণা বলল, তখন বাড়ির লোকই তোমাকে আদর করে নিয়ে গিয়ে বসাবে।

অবশ্য এ সব কিছু ভাবতে বা স্বপ্ন দেখতে যত সহজ মনে হয় কাজের ক্ষেত্রে কতটা সহজ কে জানে। আজ মাস তিন চার ধরে কত পরিকল্পনা করল ওরা, কত ফন্দি আঁটল, অমল বলেছিল রেজিস্ট্রি করে ফেললেই দেখবে সব সহজ হয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণা বলেছিল, আর কয়েকটা দিন দেখ না বাপু, বাড়ি থেকে তো আর এমন কথা বলছে না যে তোমাদের এ বিয়েতে মত নেই আমাদের। বাড়িতে একটু জানিয়ে নেই আগে, তারপর যা হয় করা যাবে।

তুমি যা ভীতু! অমল বিরক্ত হয়ে কৃষ্ণাকে বলল। ধর বাড়ি থেকে মত দিল না, তখন?

কৃষ্ণা খানখনে মুখে তাকিয়ে রইল।

তখন যা বলব তাই করতে পারবে?

কি?

ধর যদি বলি বাড়ি ছেড়ে চলে আসার কথা, পারবে?

কৃষ্ণা ঘোলাটে চোখে একবার অমলের মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, পারব। তুমি দেখ, নিশ্চয়ই পারব।

অমলের তবু কেমন যেন একটা সন্দেহ থেকে যায়। কৃষ্ণার হাত দুটো চেপে ধরে বলল, লক্ষ্মীটি কৃষ্ণা, বাড়িতে একবার বলেই দেখ না। এভাবে আর কতদিন থাকা যায়! এমনও তো হতে পারে সত্যি সত্যি বাড়ি থেকে কোন আপত্তি হবে না।

কৃষ্ণা বলল, বলব।

এই বলব বলব করেই বেশ কয়েকটা দিন কেটে গিয়েছিল! কৃষ্ণার কেমন যেন আড়ষ্ট লাগে নিজেকে। বলবার জন্য গুছিয়ে কথা সাজিয়ে নিয়ে গিয়েও অন্য কথা বলতে হয়। অথচ একবার বলে ফেলতে পারলেই হল। আজ যে ভাবেই হোক বৌদিকেই প্রথমে কথাটা বলে ফেলব। যাকে এসব কথা নিজের মুখে বলতে কেমন যেন খারাপ লাগে। বড্ড বেশি বেহায়াপনা হয়ে যায়! বৌদির মুখ দিয়েই কথাটা বাড়ির আনাচে কানাচে ছড়িয়ে যাক। কিন্তু কি কপাল দেখ, বৌদিটা আজ সিনেমায় গিয়ে বসে রইল। কিন্তু বেশ একটা বলার মত যেন মুখে ছিল কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে টেবিলে বসল। সামনে পড়িকের বইটা খুলে রাখল। মা এখনো বিড় বিড় করে ওর পাশে কি সব যেন বলছে। বলুক গে, কৃষ্ণা অন্য কথা ভাবতে লাগল। ধরা যাক বাড়ির লোক ঘোর আপত্তি তুলে বলেছে, ওদের সঙ্গে কি করে আমাদের কাজ হতে পারে, ওরা যেন আর আমরা চক্রবর্তী। এক জাত হলে না হয় কথা ছিল। যাকে, আজকাল তো আকছার অমন হচ্ছে। কৃষ্ণা যেন নিজের মনকে যুক্তি বোঝাতে লাগল। আজকাল কেউ কাস্ট মানে না। আসলে তোমাদের দেখা উচিত ছেলেকে। ছেলে হিসেবে অমল যদি খারাপ হত, অশিক্ষিত হত, চাকরি না করত, দেখতে কুৎসিৎ হত তা হলে না হয় একটা কথা ছিল। তোমরা বড় সেকেলে রয়ে গেছ। নইলে কলেজে তো এত মেয়ে দেখছি, জাত বিচারের কথা ভাবতেই পারে না কেউ। আর দশ জন কি করে না করে আমাদের তা দেখার কথা নয়, আমরা চাই না অমলের সঙ্গে তুমি আর বেলাল্লেপনা কর। ইস, তারী বয়ে গেছে তোমাদের আদেশ মানতে। অমল ছাড়া আমি আর কাউকেই মানতে পারব না। দরকার হলে এক কাপড়েই আমি বেরিয়ে পড়ব। অমলের সঙ্গে মায়ের কাছে গিয়ে দু'জনে এক সঙ্গে প্রণাম করব। ঠিক যেমনভাবে সিনেমার পর্দায় বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর নায়ক নায়িকা তাদের গুরুজনদের প্রণাম করে ঠিক সেইরকম ভাবে প্রণাম করব। বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করল কৃষ্ণা।

এ ভাবে ডেসপারেট হয়ে যাওয়ার পিছনে এক ধরণের উত্তেজনা থাকে। জীবনের সব কাজই যদি বিনা বাধায় ঘটে যায় তা হলে তার আনন্দ কোথায়। দরকার হয়

বেরিয়েই পড়ব। তারপর নানা দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে প্রথম দিকে দিনগুলো কাটাতে থাকব। দুঃখটাকে যদি দু'জনেই সমান ভাবে ভাগ করে নিতে পারি তা হলে আর দুঃখই থাকবে না।

হঠাৎ চেতনা ফিরল কৃষ্ণার। বুলবুল এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। কি রে বুলবুল?

বুলবুল আধো আধো গলায় আবৃত্তি করল, কি রে বুলবুল।

ভারী মিষ্টি লাগল বুলবুলের গলার স্বর। কৃষ্ণা ওকে কোলে তুলে নিল। তারপর ওর গলার কাছে ঠোঁট ঘষল। বুকের ওপর চেপে ধরল, ভারী দুষ্টু হয়েছ তুমি!

বুলবুল তেমনিভাবে আবার আবৃত্তি করল, ভারী দুষ্টু হয়েছ তুমি। পরে খিলখিল করে হেসে উঠল।

শোভাদি চা নিয়ে এল। কৃষ্ণা চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর রেখে শোভাকে বলল, বুলবুলকে একটা টফি এনে দাও না শোভাদি।

টফির কথায় বুলবুল হাত পা ছুঁড়ে নিচে নেমে এল। শোভার কাছে এগিয়ে গেল। শোভা বলল, এসো দিচ্ছি।

ঘর থেকে ওরা বেরিয়ে যেতে কৃষ্ণা চায়ের কাপে চুমুক দিল। লজিকের বইটা সরিয়ে রাখল এপাশে। নাহ্, কিছু ভাল লাগছে না, ভাল লাগছে না, ভাল লাগছে না। অমলের চোখ দুটো চোখের সামনে ভাসছে। অমলের টেরিলিনের সার্টটা আজ বেশ মানিয়েছিল; পাতা বাহার মার্কা জামাটা পরলে আরো স্মার্ট লাগে ওকে। অমল বড্ড বেশি সিগারেট খায়। অত সিগারেট খেলে ক্যানসার হতে আর কতক্ষণ! সিগারেট খেতে বেশ করে বারণ করে দেবে ওকে। সমস্ত দিন শুনে শুনে পাঁচটা সিগারেট, তার বেশি ওকে কিছুতেই খেতে দেব না। অমল যখন হাসে তখন ওর চোখের নিচে সরু সরু চুলের মত রেখা পড়ে। রেখাগুলো কাঁপে, বেশ দেখতে লাগে সে সময়। ইচ্ছে হয় মজার মজার কথা বলে সমস্তক্ষণ ওকে হাসাই।

কৃষ্ণা অমলকে নিয়ে মনে মনে নানান রকম খেলা খেলতে সুরু করে দিল। যতক্ষণ না বৌদি আসে ততক্ষণ এই ভাবে আবোল তাবোল ভেবে ভেবেই সময় কাটিয়ে যেতে হবে। বৌদিটা যে কি, এই তো সেদিন কি একটা যেন হিন্দি বই দেখে এল। অমলের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ছিল বলে কৃষ্ণা যেতে পারেনি সেদিন। আবার আজই সিনেমা। সিনেমা দেখার পর নিশ্চয়ই বৌদির মন আজ খুব ভাল থাকবে। আজ খাওয়া দাওয়ার পর বৌদিকে নিয়ে ছাদে উঠে যাব, চল না বৌদি, একটু ঠাণ্ডায় ঘুরে আসি। সিনেমার গল্পটাই না হয় বলবে। তোমরা তো মজা করে দেখে এলে। বৌদিকে নিয়ে একবার ছাদে উঠতে পারলে এক সময় চট করে বলব, বৌদি একটা কথা বলব? বৌদি বলবে, কি রে ঠাকুরঝি? বৌদি যখন খুশি মেজাজে থাকে তখন ঠাকুরঝি তাকে অদ্ভুত রকম গলায় স্বর করে। তখন কৃষ্ণা বলবে, তুমি কিছু মনে করবে না তো? ভীষণ দরকারী কথা।

কি কথা বল না বাপু! ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

তা তো পাবেই, আসলে দাদার পাশে শোবার জন্য মন ছটফট করছে তোমার, আমি বুঝতে পারি। কিন্তু জানো, আমি না, রাত্রে এতটুকুও ঘুমোতে পারি না।

কেন রে! রাতকানার ঘুম হয় না কেন রে, রাজকুমারের সন্ধান করব নাকি?

কৃষ্ণা বলবে, তোমাদের আর কষ্ট করে রাজ্য ঘুরে বেড়াতে হবে না রাজকুমারের জন্য। যদি বলি রাজকুমার আমার হাতেই আছে, কেবল তোমরা একটু কথা দিলেই হয়ে যায়।

বৌদি নিশ্চয়ই এবার গম্ভীর হয়ে বড় বড় চোখ মেলে তাকাবে, কে? কার কথা বলছিস!

কৃষ্ণা বলবে, অমল। বলে ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে কাটাবে।

বৌদি হয়ত চমকে উঠবে, আবার প্রশ্ন করবে, কে? কে বললি?

কৃষ্ণা আবার বলবে, অমল। আমাদের প্রায় সব কিছু পাকা হয়ে গেছে, কেবল তোমরা কথা দিলেই হয়ে যায়।

বৌদি এবার কি করবে। কথা রেখে কি রেখে না, বুঝতে পারল না কৃষ্ণা। তখন বৌদিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে হবে, বল না বৌদি, বল না, বল না···অমল কি এমন খারাপ ছেলে, তোমরা শুধু মিছিমিছি ওকে দেখতে পার না।

বৌদি যদি এর পরও রাজী না হন, তখন? তখন কি করবে কৃষ্ণা!

ধুৎ, কৃষ্ণা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কিছু ভাল লাগছে না, ভাল লাগছে না। এমন সময়ে ওর চায়ের কাপের দিকে নজর পড়ল। ইস্ চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে একেবারে জল হয়ে গেছে। যাক গে! বৌদির সঙ্গে ব্যাপারটা না মিটিয়ে ফেলা অবধি কিছু ভাল লাগবে না ওর। মা বোধহয় এতক্ষণে পুজোর ঘরে গিয়ে বসেছেন। পাক্কা একটি ঘণ্টা ওখানে কাটবে। বুলবুল কি তবে ঘুমিয়ে পড়ল। কৃষ্ণা ডাকল, শোভাদি!

যাই দিদিমণি। শোভা রান্নাঘর থেকে উত্তর করল।

কৃষ্ণা টেবিল ল্যাম্পের সুইচের উপর হাত রাখল। একবার নেভাল একবার জ্বালাল। তারপর হাত সরিয়ে নিল।

শোভা ঘরে ঢুকলে শুধাল কৃষ্ণা, বুলবুল কোথায় শোভাদি?

বুলবুল তার ঠাকুমার কোলে। ঘুমিয়ে পড়েছে।

কৃষ্ণা বলল, তা হলে এই চা-টা একটু গরম করে দাও না শোভাদি। জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে।

সে কি! কি ভুলো মন গো! ও চা বুঝি গরম করলে খাওয়া যায়! রোস আর এক কাপ করে দিচ্ছি।

কৃষ্ণা বলল, না একটা কথা ভাবছিলাম, তাই কেমন যেন চায়ের কথাটা একদম—

শোভা সন্দেহের চোখে তাকাল, কার কথা ভাবছিলে দিদিমণি? কার কথা গো?

কৃষ্ণা খানিকটা সামলে নেবার চেষ্টা করল নিজেকে, তারপর খুব ঘনিষ্ঠ জনের মত শোভাকে আরো কাছে ডাকল।

শোভা কাছে আসতে বলল, আচ্ছা একটা কথা বলব, তুমি তো সেই অমলবাবুকে দেখেছ?

শোভা সোৎসাহে বলল, হুঁ, সেই ছোড়দাবাবুর সঙ্গে যার খুব কথা কাটাকাটি হয়েছিল, সে তো?

কৃষ্ণা বলল, হুঁ সে! সে দিন কি এমন দোষ করেছিল অমল, তুমিই বল না শোভাদি। বেচারাকে কি বিশ্রী ভাষায় কথা বলেছিল ছোড়দা।

শোভার চোখ চিক চিক করছিল। কিছু যেন একটা আঁচ করতে চাইছিল শোভা।

কৃষ্ণা বলল, সেই অমলবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, খুব দুঃখ করছিল, তাই কেমন যেন মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

শোভা কি বলবে ভেবে পেল না। মাস খানেক যাবৎ অমলবাবু আর এ বাড়িতে আসে না। আজ মাস খানেক পরে হঠাৎ অমলবাবুর কথা কেন! তবে কি অন্য কিছু গোপনে গোপনে ঘটে গিয়েছিল নাকি! শোভা একটু সাহস নিয়ে শুধাল, অমলবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয় নাকিগো দিদিমণি?

কৃষ্ণা ঘুরে বসল। কেন বলতো?

না এমনিই শুধালাম, অমলবাবুকে কিন্তু তোমার সঙ্গে বেশ মানাত।

কৃষ্ণার চোখ ছলছল করে উঠল। কিন্তু খুঁজে পেল না ও শোভাকে বলবার মত।

শোভা বলল, না-মণিকে তা হলে বলছ না কেন দিদিমণি?

মাকে? কৃষ্ণা চমকে উঠল। মেয়ের আধুনিকতা মা এতটুকু পছন্দ করে না। তারপর যদি অমলের কথা ওঠে ঘুলঘুলু বেধে যাবে। কৃষ্ণা নিথর হয়ে বসে রইল।

শোভা বলল, যাই আমি, চা-টা করে আনি। চলে গেল।

কৃষ্ণা ভাবল, এ যাত্রায় একমাত্র বৌদিই ওকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু কি ভাবে বলা যায় বৌদিকে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ খানিকটা উৎসাহ বোধ করল কৃষ্ণা। আচ্ছা একটা চিরকুটে সমস্ত ব্যাপারটা লিখে বৌদির হাতে গুঁজে দিলে হয় না? কাগজটা বৌদির হাতে তুলে দেবার সময়

বলে দেব, একান্ত গোপনীয়। যদি তোমার অসুবিধা হয় লিখেও জবাব দিতে পার বৌদি। মুখে মুখে জবাব দিলেও আপত্তি নেই, তবে বেন সইতে পারি। কৃষ্ণা মনে মনে খুব উৎসাহ বোধ করল লিখে জানানোর এই পদ্ধতিটাতে। চট করে কাগজ কলম নিয়ে বসে গেল। কিন্তু কি লিখব! চিঠি যে ভাবে লেখা হয় সেই ভাবে কি! এই যেমন—শ্রীচরণ কমলেষু—দূর, বৌদিকে আবার শ্রীচরণ কমলেষু কি। তার চে বরং শুধু প্রিয় বৌদি, ব্যস নয়। কৃষ্ণা কাগজের উপর লিখল, প্রিয় বৌদি, ব্যাস লেখা বেন ফুরিয়ে গেল। কলমটাকে আলতো ভাবে ঠোঁটে ছুঁইয়ে রেখে ভাবতে লাগল কৃষ্ণা কি ভাবে এর পরে আসল কথাটা লেখা যায়। লিখতে শুরু করল, অমলকে আমি ভালবাসি। অমলকে আমি বিয়ে— হাত উঠিয়ে নিল কৃষ্ণা, মাগো 'বিয়ে' কথাটা কি বিশ্রী কাঁচা কাঁচা শোনায়। কাগজটার দিকে তাকাল, তারপর তুলে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলল খচ খচ করে।

নাহ্ এভাবে হবে না! বরং অমলকে যদি আমি প্রেম পত্র লিখতাম তা হলে কি ভাবে লিখতাম! কৃষ্ণা একটা প্রেম পত্র লিখতে শুরু করে দিল, প্রিয় অমল, আশা করি সুখলে আছ। আমি কেমন আছি শুধিয়ো না, রাতে ঘুম হয় না, মুখে রুচি নেই। তোমার কথা ভেবে ভেবে এমন এক এক সময় অস্থির লাগে যে মনে হয়, আর বাঁচব না আমি। কিইবা হবে বেঁচে থেকে। তোমাকে যদি কাছে, একান্ত কাছে না পাই বেঁচে থেকে লাভ কি আমার। লক্ষীটি তুমি আমাকে এই নরকযন্ত্রণা থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাও একদিন। আমি বন্দিনী। আমার বুকের কান্না কি তুমি শুনতে পাচ্ছ না? অথচ তুমি যদি আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে না পার, একদিন দেখবে সত্যি সত্যি আমি আত্মহত্যা করেছি।

কৃষ্ণা কলম থামাল। একবার গড়গড় করে লেখাটা পড়ল। তারপর চিঠির ভাষা পড়ে নিজেরই কেমন রোমাঞ্চ লাগল। কিন্তু এ চিঠি লিখে লাভ কি ওর। অমল ওকে পাগল ভাববে, মেয়েরা কেবল নাটক করতেই ভালবাসে। এও এক ধরণের নাটক ছাড়া কিছুই নয়।

কৃষ্ণা আবার নতুন করে অমলের কথা ভাবতে শুরু করল। অমলের আর কি! ওর তো আর মেয়েদের মত হাজার রকম চিন্তা করতে হয় না। ঠিক করল কৃষ্ণাকেই চাই, ব্যাস ফুরিয়ে গেল। এদিকে কৃষ্ণার অবস্থাটা যদি একবার বুঝত। কি করে যে অমলের কথাটা বাড়ির লোকের কাছে বলা যায় ভেবেই পাচ্ছিল না কৃষ্ণা। অথচ একবার মুখ ফুটে বলে ফেলতে পারলেই হল। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। কৃষ্ণা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

এমন সময় শোভাদি চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। শোভাদির পায়ের শব্দে প্রায় চমকে উঠেছিল ও। চিঠিটাকে চটপট লুকোতে গিয়ে শোভার মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলে-মানুষের মত হেসে উঠল। বাববা, কি খাবড়েই না গিয়েছিলাম! শোভাদি না হয়ে যদি বৌদি ঢুকত ওভাবে, একদিক থেকে ভালই হত। বৌদি শুধোত, ওকি ঠাকুরঝি, কি লুকোচ্ছ দেখি?

কৃষ্ণা বলত, ও কিছু নয় একটা চিঠি।

চিঠি, কার চিঠি! কৃষ্ণার হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিত বৌদি, তারপর খমথমে মুখে বলত, যা লিখেছ সত্যি নাকি কৃষ্ণা? অমলের সঙ্গে কতদিন ধরে চলছে এ-সব? কৃষ্ণা চোখ নামিয়ে বলত, অমল আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। আমার জন্য জীবন অবধি দিতে পারে। বিশ্বাস না হয় একদিন ওকে শুধিয়ো না।

শোভাদি বলল, তোমার যা অবস্থা দেখছি দিদিমণি আবার না চা ঠাণ্ডা হয়।

কৃষ্ণা হাসল। না, আমি ভাবছিলাম, বৌদি বুঝি সিনেমা থেকে ফিরেছে।

ফিরলেই বা, অত ভয়ের কি আছে দিদিমণি। বৌদির সঙ্গে তো গলায় গলায়, ওকে বলতে পার না?

কৃষ্ণা গোল গোল চোখে তাকিয়ে রইল।

শোভা বলল, বলতো আমিই তোমাদের ব্যাপারটা বৌদির কানে তুলে দেই।

কৃষ্ণা কি যেন ভাবল। তারপর বলল, না থাক, আমিই বলব। সইয়ে সইয়ে বলতে হবে তো।

সোজা খানিকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর চলে গেল।

কৃষ্ণা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ভাবতে লাগল, বড্ড ভীতু আমি। কলেজে সুমিত্রার মত যদি বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া টগড়া করে বেরিয়ে যাওয়া যেত! বাড়িতে বেশ উচিত মত শিক্ষা দিয়েছিল সুমিত্রা। কৃষ্ণা মনে মনে খানিকটা উত্তেজনা বোধ করল। তারপর লুকানো চিঠি আবার আলোর নিচে খুলে ধরল। প্রথম থেকে শেষ অবধি পড়ল। তারপর ঝোঁকের মাথায় আরো খানিক লিখল, লিখল, তুমি সব সময় সাবধানে থেক অমল। আর রাতদিন অত করে একটার পর একটা সিগারেট খেওনা। সিগারেট বেশি খেলে ক্যানসার হয়। লক্ষ্মীটি অমল, কথা দাও অত সিগারেট খাবে না আর! কথা দাও। তোমার জন্ত সব সময় চিন্তা হয় আমার। তোমায় চিঠি না পেলে পাগল হয়ে যাব আমি। চিঠি দিও। অনেক রাত হয়ে গেছে আজ। লক্ষ্মীটি এবার বিদায় নিচ্ছি। তুমি আমার বুক ভরা ভালবাসা নিও। ইতি—একান্ত, একমাত্র তোমারই বুকের মণিহার কৃষ্ণা।

বুকের মণিহার লিখতে গিয়ে সারা দেহ যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বেশ কথাটা! চিঠিটাকে আগাগোড়া তন্নতন্ন করে আর একবার পড়ল। তারপর হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। আচ্ছা 'প্রিয় অমলের' জায়গায় কেটে 'প্রিয় বৌদি' করে দিলে কেমন হয়! যেন বৌদিকেই প্রেমপত্র লিখছি।

বৌদি চিঠিটা পড়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাববে। কি হয়েছে তোমার বলত ঠাকুরঝি? শেষ পর্যন্ত যে আমাকেই প্রেম নিবেদন করলে? আসলে কার নাম লিখতে গিয়ে আমার নামে লিখেছ বল তো?

কৃষ্ণা বলবে, এই যাহ্, ভুল হয়ে গেছে। আসলে এটা অমলের চিঠি। অমলের সঙ্গে আমার—ব্যাস কাজ হাসিল হয়ে যাবে তখন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কৃষ্ণা। তারপর 'প্রিয় অমলের' জায়গায় কেটে 'প্রিয় বৌদি' বসিয়ে দিল।

পরে অবশ্য চিঠিটার পুরোটা পড়তে গিয়ে কেমন যেন কৌতুক বোধ করল ও। বৌদি প্রথমটা সত্যি সত্যি বেশ হকচকিয়ে যাবে। ভাববে এ কিরে বাবা। হয়ত ভাববে মেয়েটা কি খেকে গেছে দেখ। চিঠিটা যদি দাদাকে দেখায় দাদার কথা মনে আসতেই কৃষ্ণা খানিকটা সঙ্কুচিত হয়ে চিঠিটা ভাঁজ করল। তারপর একটা খামে ভরে উপরে লিখল, একান্ত গোপনীয়। তারপর আর কিছু করার নেই দেখে কৃষ্ণা উঠে রান্না ঘরে এগোল।

আর ঠিক এমন সময়ই বৌদির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল সিঁড়িতে। ঘড়িতে তাকাল কৃষ্ণা, রাত এখন সাড়ে ন'টা। ছোড়দার ফিরতে ফিরতে দশটা, কি তারও পরে। কৃষ্ণা ছুটে এসে পড়ার টেবিলে বসল। তারপর চিঠিটার উপর হাত রেখে বসে বসে ঘামতে লাগল।

পরদিন সকালে কৃষ্ণা চোরের মত মুখ লুকিয়ে কাটাল। রাতেই বৌদির হাতে চিঠিটা গুঁজে দিয়েছে ও। বৌদি কি এতক্ষণও পড়েনি নাকি! কি নিষ্ঠুর মেয়ে বাবা! অথচ নিজেরাতো প্রেম করেই বিয়ে করেছিল। কৃষ্ণার জন্ত এতটুকু মায়া নেই বৌদির। ভীষণ ক্ষোভ হচ্ছিল ওর। একবারও কি আলাদা করে ডেকে ওকে জিজ্ঞেস করতে পারল না, ব্যাপারটা কি!

দশটা বেজে যাওয়ার পর বাথরুম থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণা বুকল দাদারা একে একে অফিসের দিকে বেরিয়ে গেছে। বৌদি বুলবুলকে স্নান করাবার জন্ত গায়ে পিঠে তেল মাখছিল। বৌদির মুখোমুখি পড়ে গেল কৃষ্ণা। বৌদি হাসল, তোমার প্রেম পত্রখানা পড়লাম ঠাকুরঝি, বেশ হাত পাকিয়েছ কিন্তু। পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল সত্যি সত্যি বুঝি তুমি আবার প্রেমে পড়ে গেছ।

কৃষ্ণার বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করে হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল। এর পরই হয়ত বৌদি শুধোবেন কিন্তু কাকে উদ্দেশ্ত লেখা বলত ঠাকুরঝি? ভাগ্যবানটি কে? এমন ধারা একটা প্রশ্নের জন্ত অপেক্ষা করে রইল কৃষ্ণা। কিন্তু বৌদি বলল, ভয় নেই, একান্ত গোপনীয় বলে তোমার দাদাকেও আমি বলিনি। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কৃষ্ণা। পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে যেতে লাগল।

বৌদি বলল, তুমি এখনো ছেলেমানুষ ঠাকুরঝি! কলেজে পড়লে কি হয়, একেবারে ছেলে মানুষ। নইলে কেউ কি ওসব কথা অমন ভাবে লিখে ফেলে রাখে। ধর চিঠিটা তোমার মায়ের হাতে পড়ল, তখন?

কৃষ্ণা ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, পড়লে কি হত? ফাঁসি হত?

বৌদি কৌতুকে তাকাল, তোমার পাকামীর জন্য ফাঁসিই দিতেন না। আমার একটা উপদেশ শুনবে ঠাকুরঝি, মনে যা আসে সব তার কাগজে কলমে লিখতে নেই। বিপদ হতে পারে।

হোক বিপদ! কৃষ্ণা খানিকটা বিরক্ত ভাবে বলল।

আর কিছু না, ধর চিঠিটা শোভার হাতেই পড়ল। শোভা ওটাকে নিয়ে বাইরের কারো হাতে তুলে দিল, তখন?

কৃষ্ণা বলল, মিথ্যে তো আর লিখিনি, যা সত্যি তাই লিখেছি।

বৌদি হাসল। তাই বুঝি। তা হলে ভালই করেছ। বুলবুলকে কোলে তুলে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল বৌদি। যেন বিশ্বাসই করতে পারল না কৃষ্ণা কারো সঙ্গে প্রেম করতে পারে। কাউকে বুক উজার করে ভালবাসতে পারে।

কৃষ্ণার ভীষণ কান্না পেল এ সময়। নাহ্, অত করে ভেবে চিন্তে লিখেও কাজটা হাসিল করা গেল না। একবার কি বৌদি ভুলেও চিঠি লেখার কারণ জানতে চাইতে পারে না? মাঝখান থেকে ওকে ছেলেমানুষ ভেবে একগাদা উপদেশই দিয়ে দিল। কৃষ্ণা ভিজে কাপড় গায়েই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। নড়তে পারছিল না যেন। অথচ এসব ক্ষেত্রে কি ভাবে যে এগোতে হয় ওর জানা ছিল না। কলেজ থেকে বেরিয়ে আজ আবার অমলের সঙ্গে দেখা হবে ওর, কি উত্তর দেবে তখন?

কি উত্তর দেব! কৃষ্ণা ভাবতে লাগল। একটা মিথ্যে কথা সাজিয়ে সাজিয়ে বলে ফেলব। নাহ্, অমলের কাছে মিথ্যে বলব না। কৃষ্ণা ধীরে ধীরে শক্ত হতে লাগল। সব কথাই খুলে বলব। তারপর অমল যা বলে সেই ভাবেই এগোব। অমল যদি বলে, কৃষ্ণা অত ভয় ভয় করলে কোন কাজ হবে না। বরং তোমার মায়ের কাছে আমাকে একবার যেতে দাও, দেবে?

কৃষ্ণা বাধা দেবে না। বরং বলবে, তাই চল অমল। তুমি সঙ্গে থাকলে দেখ ঠিক আমি বলতে পারব।

কৃষ্ণার মনে হল, অমল থাকলে ও সব পারে, সব পারবে কৃষ্ণা। কোন বাধাই ওদের আলাদা করে আর রাখতে পারবে না। তাই ভাল, অমলকেই এ সব কথা বলব আজ।

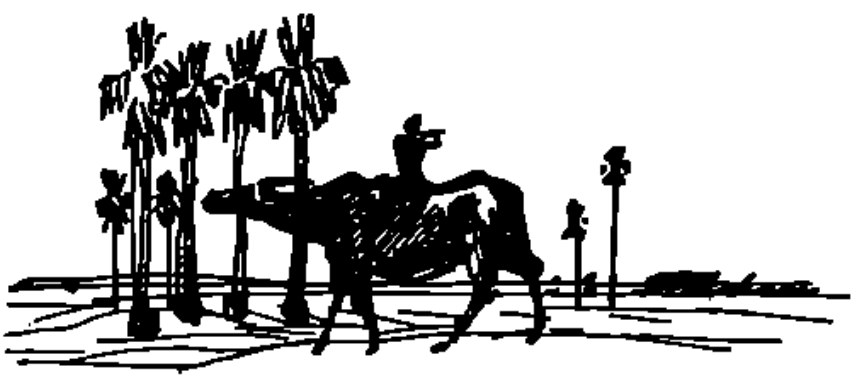

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে সোহাগী সবে একেবারে কার্নিশের নীচে এসে দাঁড়াল। এক চিলতে কার্নিশ। বৃষ্টি আটকায় না। শুধু মাথাটা বড় জোর বাঁচে। সেটাও কম নয়। এই বৃষ্টিতে ভিজলে সোহাগী নির্ঘাৎ বিছানা নেবে। সর্দি কাশি, গলায় ব্যথা থেকে জ্বর। দিন সাতেক শুয়ে থাকতে হলেই সর্বনাশ। বাড়ীউলি মাসী বিছানাপত্র, ঘিনিস পত্র টানে বেচে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে। সেই সঙ্গে সোহাগীকেও।

এ পাড়ায় যৌবনই জীবন। এই জীবিকায় এই বস্তুর। চোখের সামনে সোহাগী দেখেছে, যৌবন অপসৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে কত মেয়ে পাকা বাড়ী থেকে খোলার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। আগে যাদের দরজায় মোটর বাঁধা থাকত, ছত্র যৌবন হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে লোক আসে বিস্তার চড়ে।

সোহাগী চিরদিনই খোলার ঘরের বাসিন্দা। পাকা বাড়ীতে আর প্রমোশন পেল না। কোনদিন পাবে এ ভরসাও নেই।

এই পথে, এই জীবিকায় যখন এসে পৌঁছল তখনই তার হাড় সর্বস্ব চেহারা ডিঙি কাটলেও একটি মাংস ওঠে না।

প্রথম দর্শনেই বাড়ীউলি মাসী ঘৃণা প্রকাশ করেছিল।

অবেলা, এ চুলোয় মরতে এলে কেন? একেবারে কাশী মিত্তিরের ঘাটে গেলেই তো পারতে।

সোহাগী কোন উত্তর দেয় নি। এ প্রশ্নের উত্তর তার জানা ছিল না। শুধু বড় বড় দুটি চোখ দিয়ে বাড়ীউলি মাসীর আপাদমস্তক দেখেছিল।

কেন এল এখানে? কাশী মিত্তিরের ঘাটে না যেতে পারে, তার পাশেই তো ছিল গঙ্গা। কলুষনাশিনী, সন্তাপহারিণী। রাত্রির অন্ধকারে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লে এতদিনের কলঙ্কিত ক্লেদ আর গ্লানি হয়তো মুছত না, কিন্তু নিজেকে তো মুছে ফেলতে পারতো নিশ্চিন্ত করে।

নিজে সম্পূর্ণ মুছে গেলে তারপর কে তার গ্লানি ঘরে ফেরের কি হিসাব করছে সেটা জানবার অবকাশই হতো না।

কিন্তু সোহাগী পারে নি। জীবনের প্রতি মায়া, না মরার প্রতি ভয়, কোনটা আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল বলতে

দর্পণ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

পারবে না। কিন্তু লোকটা এই গলির মোড়ে তাকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিল, সেই নির্দেশ সোহাগী ঠিক মেনেছিল। হেঁটে হেঁটে গলির মাঝ বরাবর চলে এসেছিল।

তখন এ গলিতে সন্ধ্যা নেমেছে। দেহকে পসরা করে সার সার মেয়েরা বাড়ীর দরজায় দরজায় দাঁড়িয়েছে। এই কানা গলির আত্মা।

এই গলির স্বরূপ চিনতে সোহাগীর একটুও দেরী হয় নি। স্বরূপ চিনেও সে ফিরে যায় নি, কারণ ফিরে যাবার জন্য এ গলিতে তাকে ঢোকানো হয় নি।

কিছুটা এগোবার পরই মেয়েদের মধ্যে আলোড়ন শুরু হয়েছিল। হাসাহাসি, বাঁকা বাঁকা কথা।

ওরই মধ্যে কে একজন গিয়ে বাড়ীউলি মাসীকে খবর দিয়ে এসেছিল।

মাসী মেজাজ আর রাখতে হীতিমত বিপন্ন। চট করে চলাফেরা করার মতন অবস্থা নয়। তবু নতুন চিড়িয়া পায়ে হেঁটে এ পাড়ায় এসেছে শুনে সব কষ্ট ভুলে দরজায় এসে দাঁড়াল।

তখন সোহাগী একটা দীপস্তম্ভে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। উল্টোদিকে মুখ করে। কাজেই তার মুখটা এদিক থেকে দেখবার উপায় নেই।

মাসী চৌকাঠের ওপর উবু হয়ে বসে কাংস্যকণ্ঠে বলল, বলি, অ বাছা, এদিকে ঘোরাঘুরি করছ কেন? কি চাই?

কথাগুলো সোহাগীর কানে গেল, কিন্তু সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। একভাবে।

অ বিনি, একবার জিজ্ঞাসা করে আয় তো কি চায়? কথা কানে গেল না, কালা নাকি?

বীণা তৈরী ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দাওয়া থেকে লাফিয়ে রাস্তায় নেবে সোহাগীর কাছে এসে দাঁড়াল।

কিগো শুনতে পাচ্ছ না, মাসী অত করে ডাকছে?

সেদিন মাসী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোন জ্ঞান সোহাগীর ছিল না। এ গলিতে মাসীর শক্তি আর প্রতিপত্তির কথা তার অজানা ছিল।

মুখ ফিরিয়ে শঙ্কিত কণ্ঠে বলেছিল, মাসী!

উত্তর দেবার আগে বীণা একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল। না, ভয় পাবার কিছু নেই। ঈশ্বর ঢেউ তোলার মতন সৌন্দর্য নিয়ে মেয়েটি এ গলিতে ঢোকে নি। তাদের জীবন যাপনের মতন রূপের অধিকারিণী নয়।

সারা মুখ বসন্তের দাগে ভর্তি। রুক্ষ, হাড়-সর্বস্ব চেহারা। নিষ্প্রভ দুটি চোখ, এ চোখে বিলোল কটাক্ষ ফোটানো নিতান্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শরীরের কোথাও তরঙ্গের আমেজ নেই।

হ্যাঁ, ওই যে চৌকাঠে চেপে বসে আছে। এলো না।

বীণার পিছনে পিছনে সোহাগী গিয়েছিল।

আশ পাশে দাঁড়ানো মেয়েরা হুড়মুড় করে মাসীকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল।

এ গলিতে ঘোরাঘুরি করছ, কি দরকার বাছা?

উত্তর দেবার আগে সোহাগী একবার মেয়েদের দিকে দেখল। সকলের চোখেই যে কৌতুকের ছিটে, অধরপ্রান্তে বিদ্রূপের হাসি, এমন নয়, দু একজন গম্ভীর মুখেও ওকে দেখেছে।

অবসন্ন কণ্ঠে সোহাগী বলেছিল, একটু আশ্রয় চাই। কথাটা মাসীর দিকে চেয়েই বলেছিল।

আশ্রয়? তোমায় চিনি না, জানি না, তুমি চোর না জোচ্চর কিছু খবর নেই, হট করে তোমায় ঘরে ঢোকাই কি বলে?

সমর্থনের আশায় মাসী এধারে ওধারে তীক্ষ্ণ করে দাঁড়ানো মেয়েদের দিকে দেখল।

মেয়েরা কেউ ঘাড় নাড়ল, কেউ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

সোহাগী জানত তার ফেরার পথ নেই। এ গলিতে যে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে, বাহু নির্দেশে, সে সোহাগীর ভবিষ্যত সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ইঙ্গিতই করে গেছে। এ পথই সোহাগীর জীবনের পথ, এমন একটা ইঙ্গিত।

আমাকে আপনি বিশ্বাস করুন, আমি সে ধরণের মেয়ে নই। বড় বিপদে পড়ে এখানে এসেছি। আপনার কাছে।

সোহাগীর কাতরোক্তিতে মাসী যে খুব বিচলিত

হয়েছিল, এমন মনে হয় নি। অনেকক্ষণ পা মুড়ে বসে বোধ হয় পা দুটো টনটন করছিল। একটা পা সোজা করে দিয়ে, টিপতে টিপতে বলল, সপথে আমাকে আর কে করে মনে রাখে বাছা। বিপদের সময়ই এসে দাঁড়ায়।

মেয়েদের দলও সরে সরে গেল? এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তাদের পেট ভরবে না। রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে। মাসের প্রথম সপ্তাহটা ভাল যাবার কথা। কাপ্তেনদের হাতে এই সময়েই যা কিছু টাকা থাকে।

মেয়েদের ভীড় পাতলা হতে মাসী সুর নামাল।

শোন বাছা, আমার কাছে স্পষ্ট কথা। খোলার ঘরের ভাড়া দশ টাকা, মাসের দু তারিখের মধ্যে আমায় দিতে হবে। তক্তাপোষ, বিছানা, থালা বাসন সব ভাড়া পাওয়া যায়। সে ব্যবস্থা আমি করব। মাসকাবারী ব্যবস্থা। তবে একটা কথা।

বলুন?

তোমার কোন রোগ-টোগ নেই তো? কাশ রোগীর মতন শুকনো চেহারা।

সোহাগী একবার চমকে উঠেছিল, তারপর ভিজে গলায় বলেছিল, নায়ের গন্না হয়েছিল তাতেই একটু কাহিল হয়ে পড়েছি। ভাল করে সারবার সময় পেলাম না। বিপদ হয়ে গেল। পথে এসে দাঁড়াতে হ'ল। আপনি ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করাতে পারেন, আমার কাশ-রোগ নেই।

মাসী আড়চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সোহাগীর আপাদ-মস্তক একবার জরিপ করল। লাল পাড় শাড়ী, দু' হাতে ক্ষয়ে যাওয়া দু'গাছা সোনার চুড়ি। সিঁথের সিঁদুর আছে কিনা, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

তা হ'লে বিপদটা কি হ'ল? স্বামী বিয়োগ তো নয়। তবে?

মাসী কথাটা সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে ফেলল।

তোমার স্বামী বেঁচে আছে?

মাটির দিকে চোখ নামিয়ে সোহাগী আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছিল।

বিস্মিত মাসী আবার প্রশ্ন করেছিল, কবে গেছে?

বছর দুয়েক।

এতদিন ছিলে কোথায়? স্বামীর ভিটেয়?

সোহাগী বুঝতে পেরেছিল মিথ্যা বলে লাভ নেই। বিশেষ করে এইখানে। তার পোশাকই তার বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে। একটা মিথ্যাকে দাঁড় করাতে একশ মিথ্যা বলতে হবে। তাতেও সব ঠিক রক্ষা হবে কিনা সন্দেহ। আর সে সব সোহাগী পারবেও না।

তাই সে বলেছিল, স্বামীর এক বন্ধুর কাছে ছিলাম।

এবার মাসীর কণ্ঠ যেন একটু রুক্ষ হয়ে উঠেছিল।

সে আস্তানা উঠল কেন?

তিনি হঠাৎ বয় নিয়ে সংসার ছেড়ে গেছেন, হরিদ্বারে গুরুর কাছে।

মাসীর দুটো চোখ জ্বলে উঠেছিল। অনেক কষ্টে দাঁতের কোণ ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ভ্রূ দুটো কুঁচকে তিক্তকণ্ঠে বলেছিল, কাঁটা মারো পুরুষগুলোর মুখে। ভেতরে পাপের ভাঁড়ার, বাইরে ভক্তির ঢেউ তুলেছেন। খোঁজ করে দেখ, গুরুর আশ্রমে যুবতী ছুড়ি কেউ জুটেছে।

সোহাগী কোন কথা বলে নি। আর নূতন কিছু বানিয়ে বলার সাধ্যও তার ছিল না। মাসী হয়তো খোঁচা দিয়ে আসল কথা ঠিক টেনে বের করবে।

মাসী হেলে দুলে এগিয়ে যেতে যেতে পিছন ফিরে একবার সোহাগীকে ইসারা করল, অনুসরণ করার জন্য।

পাকা বাড়ির পিছনে সার সার খোলার বস্তি। সব কটা ঘরই অন্ধকার, এখন বোধ হয় বাসিন্দারা সবাই পথে, শিকারের খোঁজে।

মাসী কোমরে বাঁধা চেন থেকে চাবির গোছা বের করে একটা বন্ধ ঘরের দরজা খুলে ফেলেছিল। তারপর উঠানের অন্ধকারের দিকে চেয়ে হাক পেড়েছিল, পাপকেষ্ট, ও পাহু, হাত বাতিটা নিয়ে একবার এ দিকে আয় তো।

অন্ধকার ফুঁড়েই একটা মূর্তি এগিয়ে এসেছিল। হাতে টর্চ।

সেই আলোয় সোহাগী দেখেছিল, স্বল্পপরিসর একটি কামরা। একটা তক্তাপোষ, একটা আলনা। বাতি

টাঙাবার লোহার একটা বাঁকানো দিক সিলিং থেকে ঝুলছে।

আজকের রাতটা নোনাডিহিতেই চালাও বাছা, কাল একটা পুরোনো হ্যারিকেনের ব্যবস্থা করে দেব।

সেই থেকে লোহাগী এই গলিতে কাজের হ'ল। পাকাপাকি ভাবে বসবাস শুরু।

এ জীবিকার পিছন ফিরে দেখা পাপ। তবু লোহাগী পুরোনো দিনের কথা ভাবে। তার মনে পড়ে যায়।

বাসন্তেরেই স্বামীকে দেখে সে মুখ ফিরিয়েছিল। লোহাগী এমন কিছু রূপবতী নারী কোন দিনই ছিল না, কিন্তু তার বয়স ছিল। এমন একটা সময় আসে মেয়েদের জীবনে যখন বয়সই সম্পদ, বয়সই সৌন্দর্য।

বিয়ের কথাবার্তার সময়েই লোহাগী শুনেছিল যে বরের বয়স একটু বেশী, কিন্তু সেটা যে এত বেশী, তা সে ধারণাও করতে পারে নি। নিঃস্বিত্ত বাপের পরিমিত সামর্থের গণ্ডি দিয়ে জোয়ান বর বাঁধা সম্ভব হয় নি। তা ছাড়া লোহাগীর আগে আরো তিন বোন ছিল। তারা বিয়ের সময় বাপকে প্রায় রক্তশূন্য করে দিয়েছিল। লোহাগীর বেলায় অবশিষ্ট ছিল শুধু কঙ্কালটুকু। তাতেও হাড়ের জেল্লি দেখানো সম্ভব হয় নি।

স্বামী দিগম্বরও এ কথা শুনেছিল। নিঃসন্তান, তাও জানা ছিল। লোহাগী ভেবেছিল হয়তো ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ, বেটা তার আটাশ বছরের কাছে ঘেঁষতে চাইবে না। কিন্তু এখন, এত কাছ থেকে দেখে মনে হ'ল বয়স পঞ্চাশও পার হয়েছে। মাথায় ইতস্তত ছাপোলী ছিটে। চোখের দুটো পাশে মাংসের কুঞ্চন। সারা মুখে, গালে সময়ের দিগ্বিদিগ্ স্বাক্ষর।

আঁচলে মুখ ঢেকে লোহাগী চুপচাপ শুয়ে রইল।

ছোট একটা একতলা বাড়ী ছিল ভদ্রলোকের। পৈত্রিকসূত্রে পাওয়া। স্যাঁতসেঁতে, হাজার ফাটল কলঙ্কিত। তবু কলকাতার ওপর নিজস্ব বাড়ী। তার বড়াইই স্বতন্ত্র।

সে কথা ভদ্রলোক শহরতলীর টিনের চালাঘর থেকে আসা লোহাগীকে কথায় কথায় শোনাত। পরে অবশ্য লোহাগী জানতে পেরেছিল যে তহাসনটুকুও মহাজনের কাছে বাঁধা।

বিয়ের মাস চারেকের মধ্যে স্বামী শয্যাগত হ'ল। অফিস থেকে বাড়ী ফেরার মুখে বৃষ্টিতে একেবারে স্নান করে এল। ঠক ঠক করে কাঁপুনী। লোহাগী দু' হাত দিয়ে আঁকড়েও কাঁপুনী থামাতে পারল না। তার ওপর কাশি। বুকে রোগা জমে অদ্ভুত ধরণের বাঁশির শব্দ সারা রাত।

পরিচিত এক কবিরাজ এসে চিকিৎসা শুরু করল। শুধু বাটতে বাটতে লোহাগীর হাত ব্যথা হয়ে গেল, কিন্তু রোগের উপশম হ'ল না।

ঠিক ছদিন পর লোকটি এল।

মোটরের শব্দ শুনে লোহাগী জানলা দিয়ে উঁকি দিল। একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে। এ বাড়ীর সামনে ট্যাক্সি দাঁড়ানোও একটা ঘটনা।

ট্যাক্সি থেকে ছিমছাম চেহারার সুবেশ একটি প্রৌঢ় এসে দরজার কাছে দাঁড়াতেই লোহাগী ছুটে স্বামীর বিছানায় ফিরে গেল।

ওগো, কে এক ভদ্রলোক ট্যাক্সি করে এসেছেন।

ততক্ষণে লোকটির গলা শোনা গেল।

লোহাগীর স্বামীর নাম ধরে কড়া নাড়ছে।

রোগী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, সর্বনাশ, আমাদের ছোট সাহেব যে? দরজা খুলে দাও।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘোমটা টেনে কম্পিত হৃদয়ে লোহাগী দরজা খুলে দিয়ে সরে এল।

চৌকাঠ পার হয়ে ছোট সাহেব চেঁচিয়ে উঠল, কি ব্যাপার তোমার হে বন্ধুমশায়। অফিসে একটা খবর পর্যন্ত নেই। তোমার টেবিলে একেবারে ফাইলের পাহাড় হয়ে আছে।

রোগী মাথা তোলবার চেষ্টা করল, সক্ষম হল না, শুয়ে শুয়েই বলল, চেয়ার, চেয়ারটা এগিয়ে দাও।

লোহাগী দরজা খুলে সে ঘর থেকে চলে গিয়েছিল, কিন্তু বেশী দূরে যায় নি। পর্দার আড়ালেই দাঁড়িয়েছিল। পর্দা মানে পুরানো শাড়ীর ছিন্নাংশ।

স্বামীর কথা শোনামাত্র তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে কোণে রাখা চেয়ারটা টেনে বিছানার কাছে রেখে দিল।

কিন্তু ঘর থেকে বের হতে পারল না।

ছোট সায়েব সোজাসুজি প্রশ্ন করল সোহাগীকে, মজুমদারকে আর কষ্ট দেব না, কি ব্যাপার বলুন তো? এ রকম কতদিন হয়েছে?

সোহাগীর মনে হ'ল তার সর্বশরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে। কথা বলার চেষ্টা করলে একটা বিকৃত আর্তনাদ ছাড়া কণ্ঠ থেকে কিছুই বের হবে না।

কিন্তু সোহাগী নিরুপায়। কথা তাকে বলতে হ'ল। ছোট সায়েব একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রয়েছে উত্তরের আশায়। নিরুত্তর থাকা মানে অপমান করা।

থেমে, থেমে, ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে সোহাগী রোগের কারণ, বিবরণ সব বলল।

কে দেখছে?

কবিরাজের নাম সোহাগীর জানা ছিল না। তাই সে বলল, কবিরাজ।

ছোট সায়েব ভ্রূ কুঞ্চিত করল, কবিরাজ? কেন, ভাল ডাক্তার নেই এ পাড়ায়?

এর উত্তর সোহাগীর জানা ছিল না। সে স্বামীর দিকে চোখ ফেরাল।

অর্ধস্ফুট কণ্ঠে রোগী বলল, কবিরাজটি ভাল। এর সম্বন্ধে আমার খুব জানা আছে।

ছোট সায়েব ধমক দিয়ে উঠল, থাম তো মজুমদার। তোমার তো জানা! যেবার আগের শনিবার বলেছিলে কাইজার নিশ্চয় বাজী জিতবে। দু পকেট উপুড় করে কাইজারের পায়ে ঢেলে একেবারে ফতুর হলাম।

তখন এ কথাগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ সোহাগী বুঝতে পারে নি। পরে পেরেছে। অনেক পরে।

ঘোড়দৌড়ের রহস্য জলবৎ তরল হয়ে গেছে। ছোট সায়েব আর মজুমদারের হৃদ্যতার কারণই ওই মাঠ আর অশ্বিনীসন্তানেরা। তাদের ঠাকুরমা, কুলমা, বংশপরিচয় দু'জনেরই কণ্ঠস্থ। কিন্তু তাতেও কারো পকেটের বিশেষ সুরাহা হয় নি।

সে যাত্রা স্বামী ভাল হয়ে উঠেছিল। ছোট সায়েবের আনা ডাক্তারের কল্যাণে, না সোহাগীর শাখা সিঁদুরের জোরে বলা কঠিন।

কিন্তু এই আসা-যাওয়ার সূত্রে ছোট সায়েব বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। শুক্রবার বিকালে অফিসফেরত একেবারে নিয়মিত হানা দিত। ছোট সাইজের একটা বই সামনে রেখে অশ্বের পদক্ষেপের মাত্রা নিয়ে গবেষণা। টোট, ওবল টোট, উইন, প্লেস, জকিদের কলাকৌশল, ঘুষ খেয়ে ঘোড়া হেরে যাবার কাহিনী, একটু একটু করে সোহাগীও সব জেনে গেল। চিনে গেল।

অবশ্য ঘোড়ার রহস্য তত না চিনল, ছোট সায়েবকে চিনল তার চেয়েও অনেক বেশী।

চায়ের কাপ নেবার ছুতোয় হাত ছোঁয়া, সোহাগী রান্নাঘরে যখন বেআব্রু অবস্থায় থাকত, তখন হাঠাৎ গিয়ে হাজির হওয়া, চা কমানোর ছুতোয়, চোখে চোখ রেখে কুৎসিত হাসি।

সোহাগী প্রথম দিকে ভেবেছিল কথাটা তার স্বামীকে বলে দেবে, কিন্তু বলবে বলবে করেও আর বলে নি।

বলে নি দুটো কারণে।

প্রথম, ছোট সায়েবকে চটিয়ে অফিস করা মানেই কুমিরকে অসন্তুষ্ট করে জলে বাস করার সামিল। সেটা করতে স্বামীও চাইবে না, সোহাগীও নয়। ভাল একটা খুব হয়তো ছোট সায়েব করতে পারবে না। কিন্তু খারাপ করার শক্তি তার আছে।

দ্বিতীয় কারণ, এই কারণটাই মারাত্মক। এই হাতে হাতে ছোঁয়া, অর্থপূর্ণ চোখের দৃষ্টি, এসব সোহাগীর ভাল লাগত। ছোট সায়েবের বয়স হয়তো তার স্বামীর বয়সেরই কাছাকাছি, কিন্তু স্বামীর তুলনায় ছোট সায়েব অনেক শক্ত সবল, অনেক লোভনীয়। দুর্বল, পঙ্গু, অক্ষিসার স্বামীর পটভূমিতে ছোট সায়েবকে সোহাগীর ভাল লেগে গিয়েছিল।

এই ভাল লাগা হয়তো অন্যায়। এর পিছনে সমাজের সমর্থন থাকবে না, পড়শীদের চোখে বিসদৃশ ঠেকবে, কিন্তু সোহাগী মনে মনে ভেবেছে, সমাজ, প্রতিবেশী, এরা

নিজের ছকের চেয়ে বড় নয়। বুদ্বুদ একটা দেহ নিয়ে এর চেয়ে বেশী আর কিছু সোহাগী ভাবতে পারে নি, ভাবতে তার ভাল লাগে নি।

যতদিন স্বামী বেঁচেছিল, ততদিন সোহাগী প্রশ্রয় দেয় নি লোকটাকে। প্রশ্রয় যেমন দেয় নি, তেমনই আপত্তিও করে নি।

শুনেছে ছোট সাহেব চিরকুমার। চিরকুমার, তবে ব্রহ্মচারী নয়। এ বিষয়ে নাকি ছোট সাহেবের জাত বিচার, কুল বিচার নেই। কিছু কিছু কথা ওদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু অধস্তন কর্মচারীরা তা নিয়ে বিবাদ আলোচনা করার সাহস করে নি। বলেছে, বড়লোকের খেয়াল।

সোহাগীর স্বামী মারা গেল একেবারে আচমকা। লোকটা বার মাসই রোগে ভুগত, কিন্তু গেল যখন, তখন শরীর মোটামুটি ভালই ছিল।

সকাল থেকেই বুকে ব্যথা বলছিল, চা নিয়ে এসে সোহাগী দেখল বিছানার ওপর শুয়ে আছে। শোবার ধরণটা সোহাগীর ভাল ঠেকল না। গায়ে হাত দিয়েই চেঁচিয়ে উঠেছিল।

সব চুকে গেলে সোহাগী হাতে পেল হাজার দুয়েক টাকা। অফিস থেকে এর বেশী পাওয়া গেল না। স্বামীর ধার দেনা বিস্তর। সবই গেছে ঘোড়দৌড়ে মাঠে। এই কটা টাকা, আর মাথার ওপর অনিশ্চিত আচ্ছাদন, সোহাগীর সারা জীবনের সম্বল এইটুকুই।

ছোট সাহেব কিন্তু আর একটা সম্বলের কথা মনে করিয়ে দিল। সোহাগীর দুর্বার যৌবন।

এ যৌবন যেমন সম্পদ, তেমনি আবার বিপদও। বয়সটা বেশী হলে এই টাকা কটা সম্বল করে সোহাগী কোন তীর্থস্থানে চলে যেতে পারত। পুজো, অর্চনা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, কথকতা শোনা ঠাসবুনোন কাজের মধ্যে নিজের প্রৌঢ়-জীবন ভরাট করে রাখতে পারত। ইহকালকে মুছে ফেলে পরকালের চিন্তা। কিন্তু এ দেহ নিয়ে তা সম্ভব নয়। কামনা, বাসনার এত সহজে অপমৃত্যু হবে এটা মনে হয় না। সোহাগীর মনেও নিষ্কল পাপ ছিল।

সেইজন্যই ছোট সাহেবের সামান্য ইঙ্গিতেই সোহাগী তার পিছন পিছন বেরিয়ে পড়েছিল। নিজের বাড়ীতে নয়, একটু দূরে ছোট একটা ফ্ল্যাটে সোহাগী নতুন সংসার সাজিয়ে ছিল। সংসার আর কি, সে আর একটি প্রৌঢ়া কি। সপ্তাহে বার তিনেক ছোট সাহেব আসত।

আসবাবপত্রও একেবারে পরিমিত। যে কটা নিতান্ত প্রয়োজন, তার বেশী কিছু নয়।

কিন্তু সোহাগী অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই বিগত যৌবন মানুষটার মধ্যে ভালবাসার এই অমিত শক্তি এল কোথা থেকে। সোহাগীর দেহটা যেন বীণা, ওস্তাদ শিল্পী যেমন অপূর্ব দক্ষতায় তারে তারে ঝঙ্কার তোলে, নীড়, গমক, মূর্ছনা, তেমনি সোহাগীর দেহের কোষে কোষে রক্তের সমুদ্রে কল্লোল তুলেছিল। সেইজন্যই স্বামীর জন্য একটু শোক করার অবকাশও হয় নি সোহাগীর। বুঝি প্রয়োজনও নয়।

একটা বছর সোহাগীর নিজেকে নবেচার নতুন মনে হয়েছিল। যে সুখ, যে তৃপ্তি তার যৌবন উন্মেষের সময়ের কল্পনা ছিল, সেই সুখ আর তৃপ্তির সরোবরে সে অবগাহন করতে লাগল।

কিন্তু ওই একটা বছর।

চারদিকে মহামারী বসন্ত রোগ শুরু হল। প্রথমে শরীরে অল্প ব্যথা, অল্প জ্বর, তারপর একটু একটু করে সোহাগীর সারা শরীরে ক্ষত ফুটে উঠল। জল বসন্ত নয়, একেবারে আসল।

চৌকাঠে পা দিয়েই ছোট সাহেব চমকে উঠল।

মাস দুয়েক পর পথ্য পেয়ে সোহাগী যখন উঠে বসল, তখন বিছের কাছে প্রথমেই খোঁজ করেছিল।

এর মধ্যে ছোট সাহেব আসে নি। পরে খোঁজ নিয়েছে লোক মারফত। ডাক্তার পাঠিয়েছে। পথ্যের খরচ।

ছোটসাহেব যেদিন এল, সেদিনের কথা সোহাগীর বেশ মনে আছে।

চুল বেঁধে, প্রসাধন সেরে সোহাগী বারান্দার কাছে বসে ছিল, ছোটসাহেবের ঘরে কেই চেঁচিয়ে উঠল।

কেন চেঁচিয়ে উঠল, বুঝতে লোহাগীর একটুও অসুবিধা হয় নি। নিজের চেহারার প্রতিচ্ছায়া সে বার বার দর্পণে দেখছে। এই করাল রোগ তার সমস্ত দেহ যেন ভেঙে গড়েছে।. চোখ মুখের বাহার তার কোনদিনই ছিল না, কিন্তু সব অভাব পূরণ করেছিল অঢেল যৌবন। কিন্তু সেই যৌবনেও ধস নেমেছে। এই কাল ব্যাধি তার দেহটা নিংড়ে ছিবড়ে করে দিয়েছে।

সেদিন ছোটসাহেব মিনিট পনেরোর বেশী থাকে নি যতটুকু ছিল, কেবল লোহাগীর এই অকস্মাৎ দৈহিক পরিবর্তনের কথা বলেছে। ছোটসাহেব চিরকালই দেহ সর্বস্ব। তাকে বাঁধবার আকৃষ্ট করবার একমাত্র অবলম্বন ছিল লোহাগীর এই দেহ, কিন্তু সে যৌবনটুকুও নিঃশেষিত।

বিপর্যয় একটা আসবে ছোটসাহেবের চোখ মুখের ভঙ্গী দেখেই লোহাগী বুঝতে পেরেছিল।

এলও তাই। দিন পাঁচেক পরেই ছোটসাহেব এল। সঙ্গে একটি লোক।

লোকটা লোহাগীর অচেনা নয়। তার অসুখের সময় দেখাশোনা করতে সেই আসত।

ছোট সাহেব এসেই কাজের কথা পেড়েছিল।

শোন, অফিসে গোলমাল চলছে, আর এক বছর আমার চাকরি আছে, কিন্তু ভাবছি আগেই ছেড়ে দেব। এসব ঠাট বাজায় রাখা আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। তোমার ব্যবস্থা তোমায় করে নিতে হবে।

আমি কোথায় যাব ?

লোহাগীর কণ্ঠে একটা করুণ আর্তি ছিল, বেদনার রেশ। উত্তর দিতে ছোটসাহেবের একটু দেরী হয়েছিল।

কিন্তু একটু পরেই ছোটসাহেব বলেছিল। বলতে পেরেছিল।

সেটা নিশ্চয় আমার বলবার কথা নয়। যতদিন সাধ্য ছিল, তোমায় পুষেছি। আর আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

অন্য সময় হ'লে ছোটসাহেবকে পাশের ঘরে ডেকে লোহাগী তাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরত। যৌবনের স্পর্শে উদ্দীপিত করে তুলত, এ কিন্তু দেহ নিয়ে তা সম্ভব নয়। বরং ছোটসাহেব আরো বিরক্তই হবে। ঘৃণায় মুখ ফেরাবে।

কিছু বলল না লোহাগী। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। দেহ দিয়ে যা সম্ভব হবে না, দুটি চোখে কাতর মিনতি ফুটিয়ে সেটা সম্ভব করার চেষ্টা করল।

ততক্ষণে ছোটসাহেবের পাশের লোকটাকে কাছে ডেকে ফিস ফিস করে কি পরামর্শ করতে শুরু করেছে।

এক সময়ে লোহাগীর দিকে ফিরে বলল, তোমার কাপড় জামা যা আছে গুছিয়ে নাও। পরাশর তোমায় ভাল আস্তানায় পৌঁছে দেবে। বাকি জীবনটা যাতে নিশ্চিন্তে কাটাতে পার।

তখনও লোহাগীর ধারণা ছিল ছোটসাহেবের লোক হয়তো তাকে কোন আশ্রমেই দিয়ে আসবে। হৃত যৌবন, সম্বল হীন নারীর একমাত্র আশ্রয়।

ভিক্ষা থেকে পরাশর আর মানে নি। লোহাগীকে নামিয়ে দিয়েছিল।

কাপড়ের পুঁটলিটা হাতে করে একবার শুধু লোহাগী জিজ্ঞাসা করেছিল—।

কোথায় যাব ? এখানে তো আমি কাউকে চিনি না।

পরাশর হেসে উঠেছিল, যত্র তিরিয়ের লেনে কাউকে চিনতে হয় না, সবাই চিনে নেয়। সোজা চলে যাও, আস্তানা জুটে যাবে।

ভিক্ষা চলে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে লোহাগী চলতে শুরু করেছিল অদৃষ্টকে পাথেয় করে।

রং মেখে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ফেলে আসা সমস্ত জীবনটা লোহাগীর মনে পড়ে। ফের, পাপে ভরা জীবন। জীবনের সেই পরিণতিই এই জীবিকা, কিন্তু এ পথে আসার সাধ কোনদিনই লোহাগীর ছিল না। কোন মেয়েরই বুঝি থাকে না।

এমন হয়েছে রাতের পর রাত লোহাগী দাঁড়িয়ে থেকেছে, কেউ আসে নি। দু একজন এসে একটা দুটো দেশলাইয়ের কাঠি জেলে লোহাগীর ক্ষতকলঙ্কিত মুখের চেহারা দেখে সরে গেছে। নিশ্বাস বুকে চেপে ভোরের দিকে লোহাগী বিছানায় ফিরে এসেছে।

একটু একটু করে অবস্থা ফিরল। ফিরল মানে, যা হোক্‌সার হ'তে লাগল, তাতে কোন রকমে চলে যায়। বাসীর গালমন্দ শুনতে হয় না।

তেলকলের মজুর, লোহার কারখানার মিস্ত্রী, বস্তুরী পাড়ার আধবুড়ো দস্তুরী, যাদের সাধ আছে, সাধ্য নেই, তারাই এদিক ওদিক না চেয়ে সোহাগীর ঘরে ঢুকে পড়ত। বাছাবাছি করার পথ সোহাগীরও ছিল না। এ তো মনকে উপবাসী রেখে শুধু দেহের ক্ষুধা মেটানো। পুরুষ দেখত না সোহাগী শুধু ভাবত, একটা লোক আসা মানে, নগদ পাঁচটা টাকা। লোকের দিকে ফিরেও দেখত না, কেবল হারিকেনের আলোয় নোটগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখত। টাকাগুলো অনেকবারে করে বাহিয়ে নিত।

এ পাড়ায় অচল চালাবার চেষ্টা অবিরত চলে।

সাড়ে আটটা নাগাদ হৈ চৈ শুরু হ'ল।

এ এলাকায় হৈ চৈ লেগেই আছে। সপ্তাহে একবার করে পুলিশ আসে, ছ মাসে একটা খুন হয়।

কদিন শরীরটা ম্যাজ-ম্যাজ করছিল সোহাগীর, তবুও ঘাবে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এ ছাড়া উপায় নেই। গত দু'দিন একটি খদ্দেরের মুখ দেখে নি।

হৈ চৈ শুনে চোখ তুলে দেখল।

সুধীর বাড়ির সামনে গোলমাল চলছে। আশ পাশ থেকে অনেকগুলো মেয়ে ভীড় করেছে। সামনের চায়ের দোকানের ইসমাইলও আছে। এ গলিতে বিপদ আপদে সেই সহায়।

গোলমাল হওয়া মানে সাধারণ খদ্দের চট করে এ তল্লাটে আসতে চায় না। মোড় থেকেই অন্য দিকে সরে পড়ে।

গোলমাল ছাপিয়ে সুধীর তীক্ষ্ণ, কাঁকোলো কণ্ঠ সোহাগীর কানে এল।

বিনা পয়সায় কাস্তের বজা লুটতে এসেছে। বের না, হাতে দুটো টাকা গুঁজিয়ে দিয়ে বুড়ো বলছে, বিশ্বাস কর এই আছে। একদিন অনেক ছিল, আজ কিছু নেই।

হঠাৎ সোহাগী চমকে উঠল। সারা শরীর শিউরে উঠল। মনে হ'ল অন্ধকার একটা ছায়া চোখের সামনে দুলছে। ঘাব আঁকড়ে ধরে সে টাল সামলাল।

স্খলিত কণ্ঠ, কিন্তু অতি পরিচিত স্বর।

একটি কথা মিথ্যা বলি নি। আজই কারায় পড়ে গেছি, না হলে একদিন দু হাতে খরচ করেছি। এই পেটি পাড়ায় ঢুকেছি কোন দিন?

লোকটার শেষের কথা আর্তনাদে পরিণত হ'ল। ইসমাইলের হাসির শব্দ শোনা গেল।

সোহাগী অস্ফুট একটা চীৎকার করেই ছুটে এগিয়ে গেল। সামনে দাঁড়ানো মেয়েদের ঠেলে সুধীর দরজার কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ছোট সায়েব বেরালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। ঠোঁট কেটে দরদর ধারে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কি চেহারা হয়েছে ছোট সায়েবের। কণ্ঠস্বর ছাড়া পুরোনো দিনের আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

মাথা জোড়া টাক। কানের পাশে কিছু পাকাচুলের গোছা। কোটরগত চোখ। শীর্ণ মুখ। প্রৌঢ় বয়সেও যে চেহারা একটু হ্যান্ডসাম হয় নি, বেকবত দুমড়ে সে চেহারা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কয় বৃদ্ধের কঙ্কালসার কাঠামো।

ইসমাইল ছোটসায়েবের কলার চেপে আর একবার ঘুষি তুলতে গিয়েই বাধা পেল।

এই ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।

ইসমাইলকে সোহাগী ঠেলে সরিয়ে দিল, তারপর পিছনের মেয়েদের সম্মিলিত বিদ্রূপের হাসি আর টিটকারি উপেক্ষা করে ছোট সায়েবকে সোহাগী নিজের কামরায় নিয়ে এল।

রক্ত ধুইয়ে বিছানায় শুইয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। সোহাগী জানে এতেই ছোট সায়েবের ঘুম আসে। আগে আসত।

ছোট সায়েবের নিমীলিত দু'টি চোখের দিকে চেয়ে সোহাগী ভাবতে লাগল, চোখ খুলে, নেশা কেটে গেলে সোহাগীকে দেখতে পেলেও ভয় পাবার মতন সোহাগীর আর কিছু নেই।

সোহাগীর চেহারা দেখে আর ছোট সায়েব শিউরে উঠবে না, সোহাগীর কণ্ঠ, স্নিগ্ধ মুখে নিজের মুখেরই প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাবে। বয়স, রোগ আর অত্যাচার দু'টি মুখকে অদৃশ্য মিতালীসূত্রে এক করে দিয়েছে।

● ● ●

॥ ১ ॥

বাড়িটা ছিমছাম, সুন্দর করে সাজানো। কিন্তু নার্সিংহোম বলেই হয়তো বড় বেশি চুপচাপ। এই মুহূর্তে বসবার ঘরে যে সিস্টার ঢুকলেন তাঁর জুতোর আওয়াজ যেন হকচকিয়ে দেবার মতো। অন্তত সুবীরের কাছে তো বটেই। একটা ছবিওয়ালা পুরনো ইংরেজি কাগজ নাড়াচাড়া করছিল সুবীর, সিস্টার এসে দাঁড়াতেই মুখ তুলে সোজা হ'য়ে বসল।

না, তাকে নয়। পাশের এক অবাঙালি ভদ্রমহিলাকে ডেকে কী যেন বললেন, তারপর খটখট করে বেরিয়ে গেলেন সিস্টার। ইলা কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'আর কতক্ষণ ?'

বিরক্তি সুবীরেরও বোধকরি হয়েছিল। তাই এ

প্রশ্নে তার মুখ দিয়ে 'আমি কী জানি' ধরণের কথাই হয়তো বেরোতে চাইছিল। কিন্তু ইলার দিকে চেয়ে তার সেজাজ নরম হল। বরং চাপা ব্যস্ততার সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করল, 'শরীর খারাপ লাগছে?'

ইলা মাথা নাড়ল।

কী চেহারা হ'য়েছে ইলার, সুবীর মনে মনে বলল, এবার চুকে-বুকে গেলে ওকে বেশ সাবধানে রাখতে হবে।

পকেট থেকে সিগারেট বার করল সুবীর, কিন্তু ধরাবার আগেই ঘরে ঢুকলেন সিস্টার। বললেন, 'মিস্টার সুবীর বসুমদার?'

পাশে রাখা ছোট সুটকেসটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সুবীর। সঙ্গে সঙ্গে ইলাও।

—'আসুন, ঘর দেখবেন।'

দোতলায় একটা করিডরের নাকামাঝি জায়গায় একখানা ঘর। পুব দিকটায় একটা জানালা আছে। তা দিয়ে অন্য বাড়ির ফাঁকে রাস্তার কিছুটা চোখে পড়ে। ঘরে খাট, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি। পাশেই বাথরুম। খাটের সঙ্গে কলিং বেল আর বেড লাইটের সুইচ্। চারদিক দেখে শুনে বেশ পছন্দ-ধরে-গেল ইলার।

'কিন্তু একটু চাপা নয়?'

'কেন, পুব-দিকটা তো খোলা। তাছাড়া রাস্তা দেখা যাচ্ছে, আবার গোলমালও নেই। বেশ ঘর।' ইলা খাটে হাত দিয়ে গদি টিপে বলল, 'ভালোপিলো!'

সিস্টার এতক্ষণ অভ্যন্তরের ভান করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবার কাছে এসে বললেন, 'পছন্দ হ'য়েছে তো?'

ইলা ঘাড় নেড়ে জানালো, 'হ্যাঁ'।

ইলাকে সেখানে বসিয়ে টাকা জমা দিতে গেল সুবীর। এবং তখনি সে কেন ভূত দেখে চমকে উঠলো।

ডাক্তার বাগচি দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন মেট্রনের সঙ্গে। এগিয়ে এসে বললেন, 'মিস্টার বসুমদার না?'

হাসতেই হল সুবীরকে, বলল, 'হ্যাঁ।'

'তারপর? অনেক দিন পর দেখা। এখানে?'

এক লেকেণ্ড বোধকরি থমকে গিয়েছিল সুবীর, ঠিক সেই মুহূর্তে মেট্রন আপ্যায়ন করে উত্তর দিলেন, 'ওঁর স্ত্রীর লেবার কেস।'

'ও! শুনে খুশি হলাম। বিয়েতে খবর দিলেন না কেন?'

এ প্রশ্নের সত্যিকার কোনো সদুত্তর নেই। কিংবা যা আছে তা বলা যায় না। তাই বোকার মতো আবার হাসতে হল সুবীরকে।

'সব কথারই কি হেসে উত্তর সারবেন?'

ডাক্তার বাগচি বেশ রসিকতার সুরে বললেন, 'বেশ লাজুক হয়ে পড়েছেন দেখছি!'

মেট্রন প্রৌঢ়া, বোধকরি ডাক্তার বাগচির সঙ্গে যথেষ্টই জানাশোনা। রসিকতায় সায় দিয়ে বললেন, 'নতুন বাবা হ'তে চলেছেন বলেই হয়তো—!'

'নতুন বাবা!' ডাক্তারবাবু চোখে চোখ রাখলেন সুবীরের, হাসলেন। তারপর বললেন, 'বেশ, বেশ। পরে দেখা হবে। আসি মাঝে মাঝে এ দিকে।'

ডাক্তার বাগচি বেরিয়ে গেলেন।

মেট্রন খাতা খুলে বললেন, 'আসুন মিস্টার বসুমদার।'

সুবীর হঠাৎ পকেটে হাত দিল। তারপর ব্যস্তভাবে বলল, 'আসছি।' বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

কেবিনে ঢুকতেই তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল ইলা। বলল, 'হয়ে গেছে?'

উত্তেজনা চেপে সুবীর বলল, 'না। তাখো ইলু, আমি ভেবে দেখলাম, এ জায়গাটা ভালো না।'

'কেন?' ইলা অবাক হল।

'বড্ড চাপা না ঘরখানা?' যে প্রশ্ন আগে মাথায় এসেছিল সেইটেই এবার জোর দিয়ে বলল সুবীর, 'গরম হবে বেজায়।'

'গরম কেন হবে? পাখা তো চলবে। তাছাড়া', সুবীরের যুক্তিকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে ইলা বলল, 'ওপরে নিচে এপাশে ওপাশে ঘর আছে। দুপুরে বরং ঐ ঘর-খানাতেই গরম হবে কম।'

সুবীর তবু নড়ে না। দাঁড়িয়ে থাকে।

ইলা এবার তাগাদা দিয়ে বলল, 'যাও, আর দেরি

করো না। রাত হয়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ যাই।' অগত্যা সুবীরকে ফিরতেই হ'ল। এবং হিসেব মতো টাকাও জমা দিল। কিন্তু তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, মনে মনে ব্যবস্থাটা সে ঠিক মেনে নিতে পারে নি।

ইলার কাছে ফিরে এলে সে বলল, 'ভাবছ কী বল তো?'

'ভাবছি? কই না তো।' সুবীর হঠাৎ সচেতন হয়ে অস্বীকার করল ইলার প্রশ্ন। তারপর ফিকেভাবে একটু হেসে ঝুড়ে দিল আবার, 'ভাবছি বই কি। ভাবব না? কতোদিন তুমি বাড়ি থাকবে না!'

'আহা, সবতাতেই তোমার বেশি-বেশি।' রীতিমত খুশী পরিতৃপ্ত গলায় উচ্চারণ করল ইলা।—'সবাই তো আসে এখন!'

'তা বটে।' সুবীর তখনকার মতো চুপ করে গেল।

কিন্তু ড্রেসিং টেবিলে ইলা জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলে সে আবার ওজর তুলল, 'আচ্ছা, তোমার যার কাছে পাটনায় যাবে? আমি না হয় প্লেনে করে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব!'

'কী কাণ্ড! টাকা জমা দিয়ে আবার এই কথা ভাবছ?' ইলা হাসি মুখে তার দিকে চেয়ে বলল, 'এই না বলছিলে দূরে থাকলে কষ্ট হবে?'

'বাঃ তা হবে না? কিন্তু ইয়ে—, তোমার দিকটাও দেখতে হবে তো?' সুবীর তার নতুন যুক্তিটা প্রয়োগ করল এবার, 'এ সময়ে মা-বাসিরাই নাকি সব থেকে কাজে লাগেন।'

'বেশ তো, মাকেই না হয় লিখে দিচ্ছি, ক'দিন এখানে এসে থাকবেন। তাহলেই তো দু'দিক রক্ষা হয়। কী বল?'

'তা অবশ্য ঠিক।' নিষ্প্রভ গলায় উত্তর দিল সুবীর। তার মনে হ'ল, ক্রমেই যেন সে জটিলতার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছে।

কিন্তু সমাধান করল ইলা নিজেই। বলল, 'ঠিক না হাই! মার হাতে ছেড়ে দিয়ে তুমি বেশ গায়ে বাতাস লাগাতে পারো, তাই না? ওসব দরকার নেই, যেমন আছি তেমনি বেশ।'

সুবীর নিশ্চিন্ততার ভান করে বলল, 'যথা আজ্ঞা মহারানি।'

ইলা তার কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আচ্ছা, আমি যদি আর এখানে থেকে না ফিরি?'

হঠাৎ যেন কেমন কেঁপে উঠল সুবীর। চাপা গলায় অনুনয় করে বলল, 'ছি ইলু, এ কথা কখনো ভাবতে নেই।'

সুবীরের কাঁধের পাশে মাথা ঠেকিয়ে ইলা চোখ বুজল। বলল, 'ভাবছিও না। এমনি মনে হল।' একটু পরে আবার বলল, 'আমার মতো সুখী কে?'

সুবীর তার মাথার চুলে নাক ঘষল। বলল, 'রানি আমার—।'

'মহেশকে আমি বলে দিয়েছি, ঠিক সময়ে তোমায় খাবার-দাবার দেবে। তুমি কিন্তু রাত জেগো না। ডার্করুমে ঢুকলে তোমার আর সময় জ্ঞান থাকে না!'

'কাজ থাকে যে!'

'থাকুক কাজ। আগে শরীর। যাও বাড়ি যাও। আমারও ঘুম পাচ্ছে।' একটা উদ্গত হাইকে হাত দিয়ে চাপা দেবার চেষ্টা করল ইলা। হাই-বিকৃত গলাতেই বলবার চেষ্টা করল, 'কী ঘুমই পায় আজকাল—।' এবং নিজের জড়ানো গলা শুনে নিজেই হেসে ফেলল।

হাসল সুবীরও। বলল, 'কাল সকালে আসছি।'

করিডরের শেষ পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে গেল ইলা।

॥ ২ ॥

বাড়ি ফিরে খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিল সুবীর। হাতে ক'টা খুচরো কাজ ছিল, মিটিয়ে ফেলল। তারপর শোবার ঘরে ঢুকতেই একরাশ শূন্যতা যেন বাঁধভাঙা বানের জলের মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল।

বারান্দায় বেরিয়ে এল সুবীর। সিগারেট ধরিয়ে ডেক-চেয়ারে বসল।

নাঃ, ইলুটা না থাকলে বাড়িতেই ঢোকা যায় না।—

মনে মনে বলল সুবীর, ইলু বড় ভালো মেয়ে, ওর মনে কোনো খোঁচ নেই। তাই ওকে দেখো না, যখন-তখন কেমন হাসতে পারে। ওর হাসিতে শব্দ কম, আভা বেশি। ও থাকলে দশদিক যেন জ্যান্ত হ'য়ে ওঠে।

নরেশ শোবার ঘরে আলো জ্বালাল। এক গ্লাস খাবার জল ঢেকে রাখল খাটের পাশে। তারপর আলো নিভিয়ে চলে গেল।

ইলা সবই বলে গেছে সত্যি, ভাবল সুবীর।—জলটা রোজ ইলাই এনে রাখত। ইলা আরো অনেক কিছু করত। শুধু এটা-ওটা ঘরের কাজ নয়, তার ফোটোগ্রাফী ব্যবসারও অনেক কিছু। বিল টাইপ করে দিত, ছবি তোলার কোণ বেছে দিত। ও'বে আর্টিস্ট কি না, তাই চোখ আছে। না, ইলু শুধু আমার বউ নয়, বন্ধু। আমার সত্যিকারের সহধর্মিণী।

ইলুর যদি কিছু হয়—! বুকের মধ্যে আবার তোল-পাড় করে উঠল সুবীরের। এ কথাটা সে ভাবতেই পারে না। তবু এই চিন্তাটাই যে কেন ঘুরে ঘুরে আসে! ইলা না থাকলে সে বাঁচতেই পারবে না।—নড়ে চড়ে বসল সুবীর। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে তা থেকে আরেকটা সিগারেট ধরালো।—অথচ কী কাণ্ড, ইলুর ওখানেই আজ আবার ডাক্তার বাগচি!

ধরানো সিগারেট ফেলে দিলো সুবীর। চেয়ার থেকে উঠে পায়চারি করল বারান্দায়। রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল একটু। তারপর ফিরে এসে বসল আবার ডেক-চেয়ারে। ব্লিডিং ফুল একটা—মনে মনে নিজেকেই গাল দিল সুবীর। ইলু বলল বলেই তুমি রাজী হলে কেন? ইলু তোমার কতোটুকু জানে?

জানে না।—নিশ্বাস ফেলে ভাবল সুবীর, জানাবো যাবেও না।

জানলে ইলা আর তাকে ক্ষমা করতে পারবে না। তাকে বিশ্বাসও করবে না সে কোনোদিন। কিন্তু বিশ্বাস ছাড়া সুবীর বাঁচবে কী করে?

তাও আবার, নতুন জীবনে এইভাবে বেঁচে ওঠবার পর!

কম তো জ্বালায়নি তাকে রঞ্জিতা। সে তো প্রায় খতমই হ'য়ে গিয়েছিল তিনচার বছরের ঐ ধড়ি-টানাটানি খেলায়। খতম আর কেউলে। মুখ থুবড়ে পড়তেই বা বেরি ছিল কতটুকু!

অথচ রঞ্জিতাও তাকে ভালোবেসেছিল বৈকি। তার অনেকদিনের গলায় আওয়াজ, চোখের দৃষ্টি, কথা বলা এবং কথা না-বলার আর কোনো ব্যাখ্যা হয় না। কিন্তু তবু কেন রঞ্জিতা তাকে অবন ভাবে নিঃশেষ করে দিল? কেন তার মনের পেছনে লেলিয়ে দিল এমন একটা ভয়।

ভয় বৈকি! রঞ্জিতার গোটা অস্তিত্বই এখন তার কাছে বিরাট একটা আতঙ্ক।

সেই আতঙ্কের জায়গাটাই যেন বিকিয়ে উঠল আজ ঐ বাগচি ডাক্তারের হাসিতে।

কাল আবার আসবে না তো লোকটা?

সিগারেট ধরালো সুবীর বার দুয়েক ঘন ঘন টান দিয়ে পা এলিয়ে বসল। তারপর রঞ্জিতার কথা ভেবে মনে মনে বলল, বাজে মেয়ে!

উহুঁ, ওটা ঠিক হল না হে সুবীরচন্দ্র। ব্যাপার ঠিক অতো সোজা নয়।—নিজেকেই শাসন করে মনে মনে আবার সে বলল, খারাপ মেয়ে তুমি কম দ্যাখোনি। রঞ্জিতাকে ঠিক তাদের সঙ্গে এক র‍্যাকেটে ফেলা যায় না। তোমার সেই জলকন্যের কথাই মনে করে দ্যাখো না। দুর্ভিবাজ সুখের পায়রা সোহের মেয়ে হলে যায় পড়েছিল তার তোমার কাছে আসতে। আর কি শুধু আসা! সামনে বসে গল্প করত দিনের পর দিন, খাবার তৈরি করে দিত। একদিন তো স্পঞ্জও করে দিয়েছিল নিজের হাতে। অথচ রঞ্জিতা সেদিন মেয়ে, তার রূপের গর্ব ছিল। রোগটা ছোঁয়াচে, রূপে ছাপ পড়বার আশঙ্কা ছিল। কই, তা নিয়ে মাথা ঘামায় নি তো সে?

না সুবীর, অতো সহজে রেহাই পাওয়া যাবে না সব-কিছু থেকে।

মনে পড়ল তার সেই প্রথম দিনটির কথা। কোন এক সিনেমা-স্টুডিওর দোরে দাঁড়িয়ে ছিল সুবীর ট্রিল ফোটো

তোলার জন্যে। সেট-এর ওপর উজ্জ্বল আলো, মনিটর চলছে একটা শট-এর। আলোর বৃত্তের বাইরে ডিরেকটার ক্যামেরাম্যান ছাড়াও আরো কিছু কৌতূহলী লোক ছিল আধা অন্ধকারে। তাদের পেছনে কয়েকখানি চেয়ার। তাতে বসে আছেন জনতিনেক মহিলা। শোনা গিয়েছিল তাঁরা ডিরেকটারের অতিথি। ওদের মধ্যে অল্পবয়সী চুড়ো করে চুল বাঁধা মেয়েটি যে ডিরেকটারের বাগদত্তা প্রদর্শিনী এমন একটা কথাও কানে এসেছিল একটু আগে সুবীরের। মনিটার শেষ হয়নি তখনো, সুবীর বুঝি অজান্তে একটু সরে এসেছিল চেয়ারগুলোর কাছাকাছি। হঠাৎ শুনতে পেল, মেয়েটি অনুচ্চ গলায় বলছে তাকে, 'বসুন না!'

সঙ্কোচে একটু যেন সরেই দাঁড়াতে চেয়েছিল সুবীর। 'না না ঠিক আছে' ধরণের কী হয়তো উচ্চারণও করেছিল মুখে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত এই আহ্বানে সে যে বেশ একটু অবাক হ'য়ে গেছে, সে ভাবটা হয়তো চাপা থাকে নি।

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল তখুনি। কাছে সরে এসে বলল, 'চলুন ফ্লোরের বাইরে যাই। কাজ নেই তো এখন?'

ছিল বৈকি কাজ, কিন্তু তা আর বলা হল না। মেয়েটি তখন চলতে শুরু করেছে। ভাবখানা এই রকম যে, কাজ থাক আর নাই থাক সুবীর যে তার সঙ্গে যাবে তা সে ভালোই জানে। এবং তার ঐ জানাটা ছিল পুরোপুরি নির্ভুল। কেননা, সত্যিই সুবীর পায়ে পায়ে বেরিয়ে এসেছিল ফ্লোর থেকে তারই পিছনে।

বাইরে এসে মেয়েটি বলল, 'উঃ ভেতরটা যেন অন্ধকূপ হত্যা। কী সুখে যে লোকে শুটিং দেখতে আসে!'

সুবীর হাসল, চট করে কোনো জবাব দিতে পারল না।

—'আপনার নাম কী?'

'অ্যাঁ', হকচকিয়ে গেল সুবীর, এমনভাবে কেউ আবার জিগ্যেস করে নাকি! যাই হোক, নিজেকে সামলে নিয়ে তখুনি বলল, 'শ্রীসুবীর মজুমদার।'

মেয়েটি বেশ তরল দুলে হেসে ফেলল এ কথা শুনে। বলল, 'শ্রীসুবীর মজুমদার? আপনি এখনো শ্রী ব্যবহার করেন নাকি?'

সুবীর ঘাড় নেড়ে 'না' জানাল।

'তবে?'

'হঠাৎ বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।' বলে সুবীর আত্মসমর্থনের হাসি টানল।

হাসল এবার মেয়েটিও হাল্কা ভঙ্গিতে নয়, সহ-অপরাধীর মতো। বলল, 'আমারও ওরকম হ'তো। ছেলেবেলায় একটা কিং কাছ থেকে মাইরি বলা শিখেছিলুম। মা'র কাছে বকুনি খেতুম, তবু যে কতোবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত।' ব'লে একটু থেমে আবার বলে উঠল, 'ওহো, আমার নামটাই তো আপনাকে বলা হল না। আমার নাম রুচিতা সেন। আপনি বেশ ছবি তুলতে পারেন, না?'

সুবীর হাসল।

'তুলবেন আমার একটা ছবি?'

'বললেই তুলব।' হাসি টেনেই বলল আবার সুবীর।

'তুলুন না।' বলে হাতব্যাগ খুলে রুমাল বার করে মুখের এখানে ওখানে ঘাম শুষতে লাগল রঞ্জিতা।

'এখনই তুলব?' একটু যেন প্রমাদ গুণল সুবীর। নতুন আলাপ, তায় আবার খোদ ডিরেকটারের বাকদত্তা। হঠাৎ তার ফোটো তোলা? তাছাড়া এই স্টুডিও অঞ্চলে তিল পড়লেও তালের শব্দ ওঠে। লেটের বাইরে এসে অন্য এক অচেনা তরুণীর ছবি তোলা ঠিক যুক্তিসঙ্গতও বলা চলে না।

'আরে, ভাবছেন কী? তুলুন না।' রীতিমতো হুকুমের সুরে বলল এবার রঞ্জিতা, 'কেন, আমার ফোটো আপনাদের ঐ হিরোইনের চেয়ে খারাপ উঠবে মনে হয়?'

'না, তা কেন হবে।' এতক্ষণে কথা খুঁজে পেল যেন সুবীর, বলল, 'লাইট না হলে তো ভালো ছবি উঠবে না। আপনি বরং আমার স্টুডিওতে আসবেন একদিন।

'কোথায় আপনার স্টুডিও?'

'ডিরেকটার মশাই জানেন।'

'কে ডিরেকটার? ও, বিভাস? কিন্তু ওর সঙ্গে যাব কেন, আমার কি পা নেই?'

ওয়ালেট হাতড়ে একটা কার্ড বার করে দিল সুবীর। তখন অন্য বাড়িতে থাকত একা। বলল, 'সকালের দিকে আসবেন।'

'কেন?'

'অন্য সময় গেলে হয়তো বাড়িতে পাবেন না।'

'সাতে? নাকি তখনো বাড়ি থাকেন না?' দুষ্টুমির হাসি টেনে জিগ্যেস করল রঞ্জিতা।

'তাও না পেতে পারেন,' দুষ্টুমি করেই সুবীরও জবাব দেবার চেষ্টা করল এবার, 'নাইট শুটিংও তো থাকে মাঝে মাঝে?'

'ও, শুটিং—!' রঞ্জিতা যেন রীতিমত হতাশ হল এ উত্তর শুনে, 'আমি ভাবলাম, সত্যিকার ইনটারেস্টিং ব্যাপার কিছু! ঠিক আছে, আপনার আদেশ মতো সকালেই না হয় যাওয়া যাবে একদিন। চলুন, ওদিকে

হয়তো আপনাকে খুঁজছে ওরা।'

আশ্চর্য, মনেই ছিল না এ কথা এতক্ষণ। রীতিমত ছটফট করে উঠল সুবীর কর্তব্যহানির আশঙ্কায়। এবং রঞ্জিতাকে একরকম একা দাঁড় করিয়ে রেখেই লম্বা পা ফেলে ঢুকে গেল ফ্লোরে।

ক'দিন পরেই রঞ্জিতা এল তার স্টুডিওতে। সকালে নয়, সকাল গড়িয়ে প্রায় দুপুরে।

এসে বলল, 'বাব্বা বেরিয়ে যাননি তাহলে। ঘুম থেকে উঠতে দেরি হ'য়ে গেল।' ব'লে একটু থেমে আবার বলল, 'রাতে মাঝে মাঝে ঘুম হয় না কিনা। আচ্ছা, মুখের চেহারা আজ বিচ্ছিরি লাগছে না তো?'

ব'লে সে হঠাৎ মুখের ভাব বদল ক'রে সুবীরের দিকে তাকাল।

'না তো,' সুবীর উৎসাহ দিয়ে বলল, 'সেদিনকার মতোই তো লাগছে!'

'সেদিন কেমন লেগেছিল তা কি মনে করে রেখেছেন নাকি!' বলে একটু আগের আক্ষেপ ভুলে রঞ্জিতা চোখ নাচিয়ে হাসল।

সুবীরও হাসল, কিন্তু কোনো উত্তর দিতে পারল না। মেয়েটি বেশ খোলামেলা তা সে টের পাচ্ছিল। কিন্তু অন্তের ব্যাপারটা, কীভাবে উত্তর দিলে শোভন হয়, কথার পিঠে কথা বলেই বা কতোদূর যাওয়া চলে, তা সে আন্দাজ করতে পারছিল না।

ক্যামেরা আর লাইট ঠিক করে সুবীর বলল, 'পুরো ফিগার না পোর্ট্রেট তুলব?'

—'সে আপনি জানেন।'

—'দু' রকমই হতে পারে।'

—'তবে দু'রকমই তুলুন।'

সুবীর লাইটের ফোকাস ঠিক করতে লাগল।

রঞ্জিতা আড় চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, 'আমার ও' দু'রকম তো বটেই, আরো অনেক রকমের ছবি আছে। আমি তো আর নিজের জন্তে ফোটো তোলাতে আসিনি!

'কার জন্তে?' প্রশ্নটা মুখ দিয়ে যেন হঠাৎই বেরিয়ে গেল সুবীরের।

—'আপনার জন্তে।'

—'আমার—?'

'নয় কেন?' রঞ্জিতা কোচের ওপর সোজা হ'য়ে বসে বলল, 'আপনি ঠিক করে বলুন তো, খুশি হন নি?' ব'লে বাড়ির ভেতরের দিকে ইশারা করে গলা নামিয়ে ছুড়ে দিল, 'অবিশ্যি মিসেস বসুমদার যদি আড়ি পেতে থাকেন, সে কথা আলাদা।'

—'মিসেস বসুমদার বলে কেউ নেই এ বাড়িতে।'

'নেই? সিংগল্? তবে আর আপনি সকালে না সন্ধ্যায় আসবো তা নিয়ে এত ভাবছিলেন কেন?'

'যদি বলি ইয়ে,' জবাবও কোনোরকম হ'য়ে সুবীর উত্তর দেবার চেষ্টা করল এবার, 'মানে, একা থাকি বলেই ভয় পাচ্ছিলাম?'

'আপনার পক্ষে যা ভয়, আমার পক্ষে সেটা চরমও তো হতে পারে!' বলে একটু থেমে চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে রঞ্জিতা এবার প্রশ্ন করল, 'জিগ্যেস করি, মিসেস বসুমদার না হয় গোকুলে বাড়ছেন, কিন্তু আর কেউ নেই তো? সন্ধ্যায় এসে হয়তো তাঁরি সঙ্গে স্ল্যাশ হবার ভয়ে আমাকে সকালে টেনে আনলেন?'

—'বেশ তো, যে কোনো দিন সন্ধ্যায় এসে নিজেই তা দেখে যাবেন!'

—'কিন্তু আপনি যে একা থাকেন—'

—'তাতে কী হল—।'

—'তা আমি কী করে বলব? আপনিই তো একটু আগে ভয় দেখাচ্ছিলেন!'

ফাঁদে পড়ে কী বলবে ভেবে পেল না সুবীর। শেষে আত্মরক্ষার সুরে বলল, 'না তা নয়। মানে, বিভাসবাবু যদি কিছু মনে করেন, এইজন্তেই—।'

'কে বিভাস?' চট করে সোজা হ'য়ে বসল রঞ্জিতা, কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ঢেলে বলল, 'ও, আপনাদের সেই ডিরেক্টার? সে মনে করল তো আমার কী হল?'

—'আমি শুনেছিলাম, আপনারা এন্‌গেজড্।'

—'আমি ঠিক অতোটা শুনিনি। কিন্তু তাই যদি হয়, তাতেই বা কী?'

—'ওঁর হয়তো মন খারাপ হবে শুনলে!'

—'তারপর?'

—'সেটা কি উচিত হবে ?'

'দেখুন, আপনার কাছে ছবি তুলতেই এসেছি, উপদেশ শুনতে আসি নি।' রঞ্জিতার গলা রীতিমতো কঠিন শোনাল এবার, 'আর, উপদেশ আমার উপর বর্ষণ না করে নিজে একটু ভদ্রভাবে কাজ করাই কি বেশি উচিত নয় আপনার ?'

কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল সুবীরের। অপমান চেপে তবু সে বলবার চেষ্টা করল, 'অভদ্রতা করেছি, আমি ?'

'করেন নি ?' ধারা গলায় জবাব দিল রঞ্জিতা, 'এই যে আমার সঙ্গে বসালাপ চালাচ্ছিলেন এটা কি ঠিক ভদ্রতার পর্যায়ে পড়ে ? যাক, ফোটো যদি তুলতে হয় তুলুন, আমার অনেক কাজ আছে।'

তুলবে না বলেই ভেবেছিল সুবীর। কিন্তু তাতে ব্যাপারটা ঝগড়ার মতো দেখায়। তাই রাগ চেপে ফোটো তুলল সে। এবং বিনা বাক্য ব্যয়ে ক্যামেরা গুছিয়ে নিল।

রঞ্জিতা হাত-ব্যাগ খুলে প্রশ্ন করল, 'কতো ?'

'চল্লিশ।' ইচ্ছে করেই বেশি বলল সুবীর।

চারটি দশটাকার নোট সেন্টার টেবিলে রেখে রঞ্জিতা পর্দা সরিয়ে বাইরে চলে গেল।

॥ ৩ ॥

আজ অস্বীকার করে লাভ নেই, সে দিনটা কেটেছিল যেন করাতের ওপর।

হুণ্ডার ব্রাদার্সের দুটো মেশিন পার্টসের ফোটো তোলার কথা ছিল। যাওয়া হল না। সন্ধ্যায় একটা বিয়ে বাড়ির ছবি তোলার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। ফোন করে খারিজ করে দিল। ডার্করুমে গেল না। বিল টাইপ করল না। চুপচাপ পড়ে রইল খাটের ওপর।

ঠিক হ'য়েছে, নিজের মনকে বারবার করে ধিক্কার দিচ্ছিল সেদিন, যেমন হ্যাংলার মতো মিশতে গিয়েছিলে। তুমি মফস্বলের ছেলে। ভিন স্কুলে কেউ নেই। বলতে গেলে আঠার বছর বি. এ. পাশ করেছ। এখন এই একটু ফটোগ্রাফীর কাজ করেই ভেবে বসলে, শিং গজিয়েছে তোমার !

কিন্তু, আমি তো নিজে থেকে মিশতে যাইনি !—নিজের পক্ষে যুক্তি খাড়া করল সুবীর—কথা বলতে এলে তো আর হাকিয়ে দেওয়া যায় না ?

না, তা যায় না, পাল্টা প্রশ্ন জাগল মনে—কিন্তু সত্যি করে বলতো, খুশি হও নি ? সায় দাওনি ?

তা হয়তো দিয়েছি, সাধাই জোগাড় হয় আবার—সুন্দরী তরুণী, আধুনিকা। কথা বলতে খারাপ লাগছিল না ঠিকই। কিন্তু তাই বলে ফুলের মধ্যে বিছে বসে আছে তা কে জানত ?

সত্যি, কেন যে এমন ক্ষেপে উঠল, কে জানে ? অত্যন্ত অভদ্রতা করেছে। যা খুশি তাই বলেছে। আর কী সাহস আপো না, তার বাড়িতে বসে তাকেই চোখ রাঙানো ! পুরুষ কেউ হলে গলা-ধাক্কা দিত। জন্তু একটা !

সারাদিন মনের সঙ্গে তর্ক চালিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ সুবীর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল কোনো রকমে। ভাবল, এবার এলে সত্যিই বুঝিয়ে দেবে মজা। ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দ্যাখে নি। ছোটোলোকীতে সুবীর মজুমদারও কম যায় না। তা জানে রামকিবেন ফুলঝুনওয়ালা। আর এ তো একটা মেয়ে।

সিনেমায় যাবার জন্যে তৈরি হল সুবীর। ফোন করে সীট রিজার্ভ করে রাখল। তারপর পাঞ্জাবীটা সবে গায়ে চড়িয়েছে, দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল।

না, আজ আর কোনো ছবি তোলা নয়। যেই হোক, নমস্কার করেই বিদেয়।—ভাবতে ভাবতে গিয়ে সুবীর দরজা খুলে দিল।

এবং সামনে স্বয়ং রঞ্জিতা।

বোধকরি একমুহূর্তকাল নীরবে চোখাচোখি হল দু'জনের। সুবীর স্বাস্থুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে ভেবে পেল না। তার পাশে জায়গা ছিল। তা দিয়ে ভেতরে ঢোকা যেতো। কিন্তু রঞ্জিতাও সেদিকে

পা বাড়ালো না। চুপ করে চেয়ে রইল তার চোখের দিকে। যেন অনন্তকাল পরিব্যাপ্ত সেই এক মুহূর্ত। তারপর রক্তিতাই কথা বলল প্রথমে। ঠোঁট কামড়ে একটু হেসে মাথা নেড়ে জিগ্যেস করল, 'ভেতরে ঢুকতে দেবেন না?'

দেবে না বলেই ভেবেছিল সুবীর। সারাদিন নিজের সঙ্গে যুদ্ধারতি করে এই সিদ্ধান্তেই তো এসেছিল একটু আগে। কিন্তু কী যে মনে হল তার, হঠাৎ সে পাশ ছেড়ে দাঁড়াল। এবং সেই ফাঁক দিয়ে বিদ্যুতিনীর মতো ঘরে ঢুকল রক্তিতা।

দরজা বন্ধ করার পর এক পা এগিয়ে রক্তিতা দাঁড়াল। তারপর হাত ব্যাগ খুলে একটা সিগারেটের টিন বার করে তার দিকে এগিয়ে ধরল।

সুবীর বোকার মতো তাকিয়ে রইল তার দিকে।

'নিন!'

'আমার আছে।' এইরকম কথা বলল সুবীর।

'ছাড়ুন দিদি। আমি কি তা জানিনে? আমি তো দিচ্ছি ভাব করার জন্যে। নিন না।'

'ঝগড়া আর ভাব, কোনোটাতেই আমার উৎসাহ নেই।'

'জানি মশায়, আপনি খুব ভালোমানুষ, আমিই ঝগড়ুটে। হলো তো। নিন এবার।' সুবীর তবু নিরুৎসাহ রয়েছে দেখে তক্ষুনি আবার বলে উঠল, 'না নিলে কিন্তু রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেব।'

সুবীর শান্তভাবে টিনটি নিয়ে টিপয়ে রাখল। তারপর বলল, 'কী বলছেন বলুন, আমি একটু বেরোচ্ছিলাম।'

'নিশ্চয়ই বেরোচ্ছিলেন। আপনার গায়ের ঐ গিলে করা পাঞ্জাবীতেই তার প্রমাণ। আমার সঙ্গে গাড়ি রয়েছে, আমি চট করে আপনাকে পৌঁছে দিতে পারব। যেখানেই, তার আগে এক কাপ চা দিতে বলুন। মাথাটা বড্ড টিপটিপ করছে।'

কার্তিক বলে এক ছোকরা কাজ করত তখন। তাকে ডেকে চা দিতে বলল সুবীর। তারপর রক্তিতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলুন।'

'তাহলে ভাব বলুন!' মুখে হাসি টেনে রক্তিতা হঠাৎ করে সুবীরের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, 'আরে দুপুর কী করেই যে পেরিয়েছি।'

তার এই স্পর্শ আর কণ্ঠের স্বীকৃতি যেন সুবীরের মনের জ্বালা অনেকখানি কমিয়ে দিল। সে তাকাল রক্তিতার মুখের দিকে। এবং সত্যিই যে সেখানে সারা দুপুর কষ্ট পাওয়ার অনেক চিহ্ন রেখে গেল। বলল, 'বলুন না। চা'র সঙ্গে আর কি খাবেন?'

রক্তিতা বলল। বলল, 'যদি বলি খাব, তাহলেই কি প্রমাদ গুণবেন?'

'না, তা কেন?'

'দেরি হ'য়ে যাবে না আপনার? বেরোচ্ছিলেন তো।'

'সে এমন, জরুরি কিছু নয়।' সুবীর নিজেও একটা সোফায় বসে বলল, 'কী খাবেন বলুন?'

'কিছু না। কিন্তু সেই সমস্যাটুকু আপনি ছটফট না করে চুপ করে আমার সঙ্গে বসে কথা বলুন।'

'বেশ তো, বলুন না কী বলবেন।'

'আমি আবার কী বলব, আপনি বলুন।' রঞ্জিতা যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'বাঃ আপনিই তো কথা বলবেন বলে এলেন।'

'সে আমার যা জানার তা জেনে নিয়েছি।' বলে রঞ্জিতা রহস্যময়ভাবে হাসতে লাগল। এবং তার ঐ হাসিটা সুবীরের খুব পছন্দ হল না। এর মধ্যে এমন একটা অন্তরঙ্গতার রেশ আছে, যা রঞ্জিতার ক্ষেত্রে অন্যত্র, বিপদের পূর্বাভাস বলেই মনে হচ্ছিল তার। এই মেয়েটি প্রথম থেকেই কথায় কথায় তাকে কোণঠাসা করেছে, নানা ফাঁদে কাছে টেনেছে, কিন্তু হঠাৎ যে তার কী হ'য়েছে, এক মুহূর্তেই দূরে সরিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। বিশেষ করে, ওখানে যা হল তা তো অবশ্যনীয়। এমন ভাবে ওর মেজাজ খিঁচড়ে যাবার কী কারণ ঘটেছে তা এখনো ভেবে পায় না সুবীর। রঞ্জিতার কথার জবাবে তাই প্রসঙ্গ বদলে সে বলে উঠল, আপনার ছবিগুলো কিন্তু এখনো ক'রে উঠতে পারি নি।'

রঞ্জিতা এতক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে ছিল, এবার কপালে হাত বুলাতে করতে বলল, 'হা ঈশ্বর, আমি ছবির তাগাদা দিতে এসেছি এই কি আপনার ধারণা হল?'

'না তা ঠিক নয়,' সুবীর বেকায়দায় পড়ে বলল, 'এমনি মনে হল।'

কার্তিক চায়ের সরঞ্জাম দিয়ে গেল। রঞ্জিতা চা ঢালতে ঢালতে বলল, 'আর কি মনে হচ্ছে? মনের কথাই যখন তুললেন তখন সবটাই বলুন না!'

আবার তার ঠোঁটের চারপাশে সেই রহস্যময় হাসি বিলিক দিয়ে উঠল।

সুবীর ধরা-পড়া মানুষের মতো বলে উঠল, 'আর কিছু বলার নেই।'

'সত্য?' রঞ্জিতা ঘাড় বাঁকিয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনি কিন্তু সত্যি কথা বলছেন না।'

কথা বলতে গিয়ে সুবীর লক্ষ্য করল তার জিভ যেন বেজায় রকম শুকিয়ে উঠেছে। সে তাড়াতাড়ি টিপয় থেকে সিগারেটের টিন নিয়ে খুলতে শুরু করল।

রঞ্জিতা উঠে এসে এক কাপ চা সুবীরের সামনে টিপয়ের ওপর রাখল। তারপর তার সোফার একপাশে আড় হ'য়ে বসে বলল, 'আপনি এত ভয় পান কীসের বলুন তো?'

'ভয়? কই, না তো!'

'নিশ্চয়ই ভয় পাচ্ছেন। আপনার মুখচোখ হাকিমের আসামীর মতো শুকিয়ে উঠেছে। বলুন না, কী এত ভাবছেন?'

সুবীর তার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, 'আপনার চা কিন্তু ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।'

'থাক গে।' রঞ্জিতা একটু সরে এসে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাড়িতে চা জুটছিল না বলেই যে আপনার এখানে এসেছি তাও তো ঠিক নয়। আমার সত্যিই কিছু বলার আছে। আপনাকে আমি বন্ধু হিসেবে পেতে চাই। আপত্তি করবেন না দয়া করে।'

সুবীর চুপ করে রইল, চট করে সায় দিতে পারল না যেন।

তার দিকে বেশ একটু ঝুঁকে প'ড়ে কণ্ঠস্বরে অনুনয় ঢেলে রঞ্জিতা টেনে টেনে উচ্চারণ করল এবার, 'প্লি—জ!'

কার্তিক চায়ের বাসন সরিয়ে নেবার জন্যে উঁকি দিল ঘরে। সুবীর তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে।'

উঠে দাঁড়াল রঞ্জিতাও। বলল, 'চলুন, কোথায় যাচ্ছিলেন, পৌঁছে দিচ্ছি।'

'যাচ্ছিলাম সিনেমায়। কাজেই আজ আর হল না।' প্রসঙ্গান্তরে যেতে পেরে সুবীর কিছুটা হালকা গলায় বলল এবার।

'ইস্, বড্ড দেরী করিয়ে দিলাম, না!' রঞ্জিতা এক

ছিটেও দুঃখিত না হ'য়ে খুব একটা আপশোষের ভান করল। তারপর বলল, 'চলুন, সিনেমা না হোক, এমনি একটু ঘুরে আসি বরং।'

'থাক না। তাতেই বা দরকার কী?'

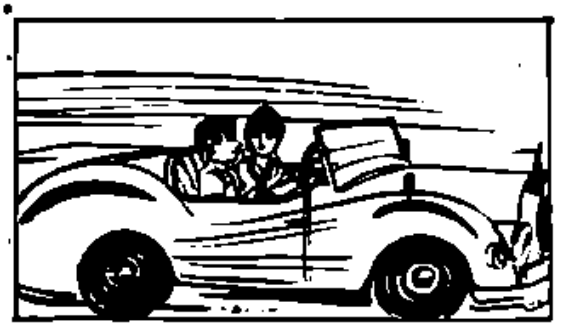

'আপনার না থাকে, আমার আছে।' ব'লে সুবীরকে যেন প্রায় গ্রেপ্তার করেই গাড়িতে তুলল রঞ্জিতা।

॥ ৪ ॥

এবং সেই যে শুরু হ'ল, রঞ্জিতার আসা-যাওয়ার যেন আর বিরাম রইল না। যখন-তখন আসত, কখনো বেশী হতো, কখনো হতো না। আবার এমনো হ'য়েছে, সুবীরের কাছে কাজের লোক রয়েছে, রঞ্জিতা এল, শোবার ঘরে ব'সে ব'সে রেকর্ড-প্লেয়ারে বাজনা শুনল, কফি খেল, তারপর চলে গেল—সুবীরের সঙ্গে একটাও কথা হ'ল না। ভালো লাগত এটা সুবীরের, রীতিমতো ভালো লাগত। তার মনে হতো, জীবন যেন একটা অন্য মানে পাচ্ছে, কেমন যেন হ'য়ে উঠছে, গভীর হ'য়ে উঠছে। রঞ্জিতার প্রতি সে কৃতজ্ঞ বোধ করত।

একদিন ঝম ঝম বৃষ্টি পড়ছে, রঞ্জিতা এসে হাজির হল। হাতে তার একটা কাগজের প্যাকেট। বলল, 'কাস্টমার নেই তো!'

'না, বিকেল থেকেই একা বসে রয়েছি। ব্যাপার কী?' ঔৎসুক্য দেখালো সুবীর।

'আছে, আছে। যাও তো, গাড়িটার কাচগুলো তুলে বন্ধ করে দিয়ে এসো। আজ ড্রাইভার নেই।'

এতক্ষণে খেয়াল হল সুবীরের, রঞ্জিতা গাড়ি থেকে নেমে এইটুকু আসতেই ভিজে গেছে বেশ। তাই বলল, 'তুমি বরং ততোক্ষণে মাথাটা মুছে নাও।'

'ওতে আমার কিছু হবে না। ওর অভ্যেস আছে। তুমি যাও।' রঞ্জিতার ঠোঁটে আবার সেই পরিচিত রহস্যময় হাসিটা ফুটে উঠল।

কথা না বাড়িয়ে সুবীর ছাতা নিয়ে গাড়ি বন্ধ করতে গেল।

ফিরে এসে দেখে, রঞ্জিতা আরাম করে শোবার ঘরে বসেছে, তার পাশে একটা টিপয়ের ওপর আস্ত একটি হুইস্কির বোতল।

না, সুবীরের মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেজে উঠল প্রতিবাদ।—এবং চলতে পারে না।

জীবনে যে সে মদ কখনো ছোঁয়নি তা হয়তো নয়, কিন্তু মদ সে পছন্দ করে না। মদের বিষয়ে তার বিরূপতা আছে। বলল, 'রঞ্জিতা, কিছু মনে করো না, এসব আমি ঠিক পছন্দ করি না।'

'প্রভু ঈশুদূত, তুমি তো আমাকেও পছন্দ করতে না।' রঞ্জিতা হাতজোড় করে বলল, 'আজকের দিনটির জন্যে অন্তত তোমার লেকচার থামাও। এমন মনোরম সন্ধ্যা ঠিক যাজকবত-চর্চার জন্যে সৃষ্টি হয় নি।'

'না তা কেন, মন ভালোর জন্যে তৈরি হ'য়েছে।'

'ছি সুবীর, মন-মন বলছ কেন? তুমি না আর্টিস্ট! বল ড্রিংকস, বল সোমরস!' ব'লে রঞ্জিতা কায়দা করে বোতল খুলে ফেলল। এবং খোলা বোতল নাকের কাছে নিয়ে তার গন্ধ নিল।

'দেখে মনে হচ্ছে, অনেকদিনই তোমার এসবে বেশ অভ্যাস আছে?'

'আছেই তো।' বোতল রেখে রঞ্জিতা উদ্ধত ভাবে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই তার জন্যে তুমি কৈফিয়ৎ তলব করছ না?'

তার এই হঠাৎ রাগটা এড়িয়ে চলে সুবীর। নিজেকে সংযোজন করে বলবার চেষ্টা করল, 'কৈফিয়ৎ কীসের, আমি তো আর কারো গার্জেন নই।'

'নও, কিন্তু হবার বড় সাধ। আর শুধু তুমি নও, সব পুরুষেরই ঐ এক রা। শোনো—।'

কিন্তু তার আগেই গোটা দুয়েক সোডার বোতল আর গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকল কার্তিক। কখন তাকে পাঠানো হয়েছিল সুবীর টের পায় নি। কিন্তু তাকে দেখে সুবীর রীতিমত লজ্জিত বোধ করল। কার্তিকের চোখে সে যে কোথায় নেমে গেল, তা যেন সে স্পষ্ট দেখতে পেল। কার্তিক চলে যাবার পর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি বরং এসব পাট শেষ করে নাও, আমি একটু ঘুরে আসছি।'

—'কোথায়?'

—'এই একটু ভবানীপুর থেকে।'

—'আগে তা বলনি?'

—'পরে বললেই বা দোষ কী?'

রঞ্জিতা কয়েক সেকেণ্ড স্থিরভাবে তাকিয়ে রইল সুবীরের চোখের দিকে। তারপর চোখ ফিরিয়ে হুইস্কির বোতলটি হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুবীরের বুকের মধ্যে জোরে একটা ধাক্কা লাগল। মনে হ'ল যেন, চোখের সামনে আলো নিভে গেছে। রঞ্জিতাকে ডাকবার ইচ্ছে হ'ল, কিন্তু ভেতর থেকে কোনো জোর পেল না। কেননা, সে যেন স্পষ্ট বুঝতে পারল, ডেকে কোনো লাভ নেই। তবু, খানিকটা যন্ত্রচালিতের মতোই যেন, পায়ে পায়ে সে বেরিয়ে এল রঞ্জিতার পিছু-পিছু। দেখল, সে সদর দরজার দিকে গেল না, গেল খাবার টেবিলের ওদিকে বেসিনের কাছে। আর তারপর ছিপিটি খুলে পুরো বোতলটি উপুড় করে ধরলো বেসিনের উপর।

তার এই অপরিসীম আত্মনিগ্রহ যেন চাবুক লাগালো সুবীরের মুখে, কিন্তু সে কোনো প্রতিবাদ করতে পারল না। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। তারপর চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে রঞ্জিতা শোবার ঘরে ফিরে এলে, সেও ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসল।

বাইরে তখনো বৃষ্টির কোনো বিরাম নেই। রাস্তায় জল জমছে, জল বাড়ছে।

সময় কাটছে।

দু'জনের মধ্যে কোনো কথা নেই।

'বাবু, খাবার দিচ্ছি?' এক সময়ে কার্তিকের গলা শোনা গেল।

সুবীর রঞ্জিতার দিকে তাকালো। রঞ্জিতা তার দিকে চোখ ফেরালো না, সাড়া দিল না।

'তুই খেয়ে নে গে যা।' ঘোষণা করল সুবীর।

এবং তখনি উঠে দাঁড়ালো রঞ্জিতা। বলল, 'এবার আমি যাব।'

'হ্যাঁ,' সুবীরও উঠে দাঁড়িয়ে সাড়া দিল। তারপর জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কিন্তু যাবে কী করে? রাস্তায় যে এক কোমর জল!'

'ও!' ব'লে তার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত রঞ্জিতা। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে চুপ করে খাটের ওপর শুয়ে পাশ ফিরল।

সুবীর বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে বসবার ঘরের সোফাটির ওপর নিজের শোবার আয়োজন করল।

ঘুম ভাঙলো অনেক রাত্তিরে, বোধকরি বেকায়দায় শোবার জন্যেই। জেগেই সুবীরের মনে হ'ল, অন্ত কোথায় যেন সে আছে। তারপর ভালো করে চোখ মেলতেই মনে পড়ল তার সব কথা। রঞ্জিতার জন্যে মনটা তার রীতিমতো খারাপ লাগতে লাগল। ও কী করছে, ঘুমুচ্ছে না জেগে আছে, দেখবার জন্যে একটা অদম্য তৃষ্ণা জাগল তার মনে। অবশ্য সিগারেটের অভাবও যথেষ্টই অনুভব করছিল সুবীর। সেইটেতেই ওজুহাত

হিসেবে আঁকড়ে ধরে নিজের বাড়িতে সে বহির্গতের মতো গিয়ে শোবার ঘরে উঁকি দিল।

আলো জ্বলছিল তখনো। রঞ্জিতা ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু মাথা তার বালিশে নেই। বেঁকিয়ে, ঝুলে পড়েছে একদিকে।

পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল সুবীর। টেবিল থেকে সিগারেট দেশলাই নিল। তারপর বড় আলো নিভিয়ে নীল আলো জ্বালল। এবং বিছানার দিকে আসতে আসতে শেষবারের মতো একবার রঞ্জিতার দিকে ফিরে তাকালো।

না, মাথাটা যেন বড্ডই বেঁকিয়ে রয়েছে। ঘাড়ে ব্যথা হবে হয়তো। সুবীর থমকে দাঁড়ালো, তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল খাটের কাছে।

একটু বেঁকিয়ে শোবার ভঙ্গিটা পর্যন্ত যেন পরম এক বিস্ময়ের মতো তাকে আকর্ষণ করতে লাগল।

বাইরে তখনো ঝড়ে-জলে রাত যেন উন্মাদিনী।

প্রাণপণে তবু নিজেকে সংযত করল সুবীর। রঞ্জিতার শীত করছে মনে করে একটা হালকা চাদর তার গায়ে ঢাকা দিল। এবং তাতেই ঘোরার ছুঁতো ধড়মড় করে উঠে বসল রঞ্জিতা।

'উঃ, কী রকম চমকে উঠেছিলাম।' সুবীরকে দেখে সে বলল। তারপর সুবীরের একটি হাত ধরে শুয়ে পড়ে সে ঘুম জড়ানো গলায় বলল, 'শোনো!'

হাতে কি সেইসঙ্গে টান দিয়েছিল রঞ্জিতা? মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, রঞ্জিতার নরম শরীরের ওপর

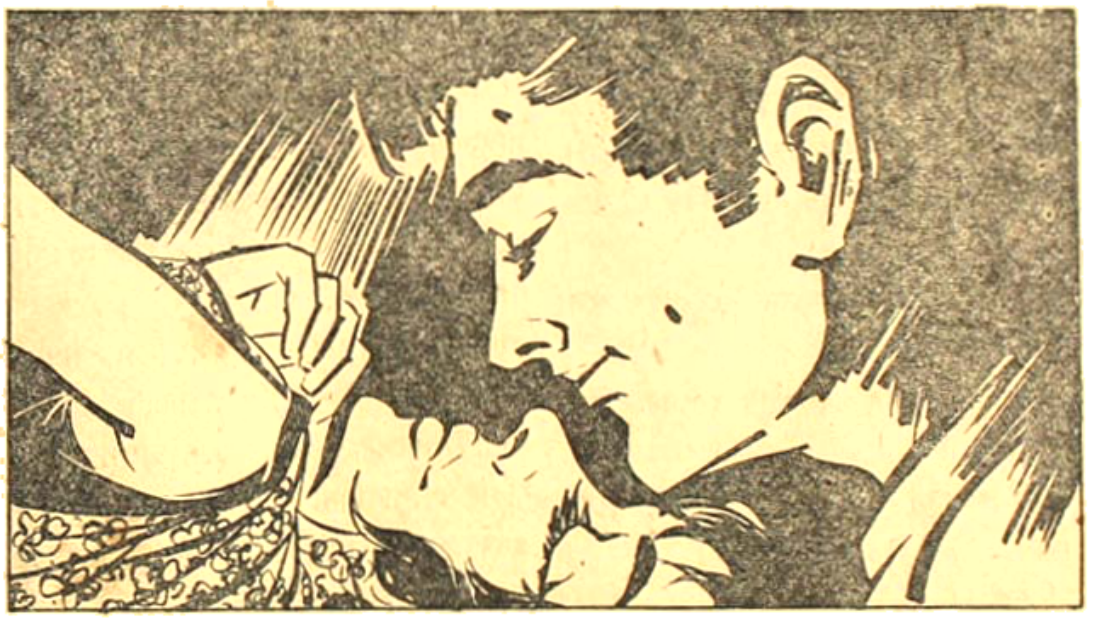

আস্তে, অতি আস্তে গালের পাশে হাত দিয়ে মাথাটা সরিয়ে আনতে চাইল সুবীর। রঞ্জিতা চোখ মেলল না, টেরও পেল না। মাথাটা সরিয়ে এনে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো সুবীর। মৃদু নীলাভ আলোয় তাকালো সে ঘুমন্ত রঞ্জিতার দিকে। তার ঈষৎ চাপা নাক, স্ফুরিত ঠোঁট, মাঝখানে টোল-খাওয়া চিবুক, আর মুক্তোর মালা জড়ানো গলা, নিশ্বাসের তালে-তালে ওঠা-নামা-করা নিটোল দু'টি বুক, এমনকি শান্তিত তরবারির মতো অনাবৃত হাতটি পর্যন্ত—সে হামড়ি খেয়ে পড়েছিল। এবং রঞ্জিতা তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে ঠোঁটে কপালে গালে বেহিসেবী চুমোয় ভরিয়ে তুলেছিল। তার দেহের স্পর্শে সুবীরের অপরিচিত এবং অপ্রতিরোধ্য এক উন্মাদনা জাগল কয়েক মুহূর্তেই। কিন্তু তবু একবার সে চুম্বন-বিধ্বস্ত মুখে বলবার চেষ্টা করল, 'দরজা খোলা আছে—।'

'বন্ধ করে এসো!'

সুবীরের ক্ষমতা ছিল না, সে হুকুম অমান্য করে।

দিন কয়েক পর শুটিংয়ের এক ফাঁকে ডিরেকটার বিভাস গুহ সুবীরের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'মিষ্টার বসুমদার, আপনার সঙ্গে কথা আছে, চলে যাবেন না যেন!'

সুবীরের বুকের মধ্যে ধুকপুক করে উঠল। এই লোকটির কথা ইতিমধ্যে প্রায় একেবারে ভুলেই বসেছিল। সত্যিই বড় হঠকারিতা হ'য়ে গেছে।—সুবীরের মনের আবছা-কালিত নীতিবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এবং এটাকে সে কিছুতেই যেন হেলেফেলে বলে পাশ কাটাতে পারে না।

লাঞ্চের বিরামে বিভাস গুহ সুবীরকে ডেকে নিজের কামরায় ঢুকলেন। তারপর ভালো করে পর্দা টেনে দিয়ে বেয়ারাকে জানিয়ে রাখলেন, কাউকে যেন সে ঢুকতে না দেয়।

ছোটো টেবিলে মুখোমুখি দু'টি চেয়ারে বসে ডিরেকটার প্রথমে সিগারেট বার করে সুবীরকে দিলেন। তারপর নিজে ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন। কিন্তু চট করে কোনো কথা বললেন না।

ঘরের মধ্যে অদ্ভুত এক নীরবতা যেন ওৎ পেতে বসে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বিভাস গুহ হঠাৎ বললেন, 'কিছু খাবেন?'

'না।' সুবীরের গলা তার নিজের কাছেই শুকনো শোনালো।

আবার নিস্তব্ধতা।

শেষে এদিকে চোখ না ফিরিয়েই বিভাস গুহ বলতে লাগলেন, 'মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। নয়তো এতদিনে বিয়েই তো হ'য়ে যেত আমাদের। আমি জানি, রুনু আপনার সঙ্গে খুবই মেলামেশা করছে। কিন্তু আপনি কি জানেন না যে আমাদের বিয়ের কথা পাকা হ'য়ে গেছে।'

'শুনেছিলাম।' কোনোরকমে উচ্চারণ করল সুবীর।

'তবে?'

'কিন্তু ও তো শুধু আমার বন্ধু—।' রক্তিমার বিষোদ্গিত ইঙ্গিতটাই ব্যক্ত করল যেন সুবীর।

'থাট্ আপ।' ঝট করে এদিকে মুখ ফিরিয়ে চাপা গলায় হিসিয়ে উঠলেন ডিরেকটার, 'বন্ধু! ক'দিন আগে হোল নাইট কাটিয়ে আসে নি আপনার কাছে?'

আচমকা আক্রমণে আর অপমানে কেমন যেন দিশেহারা হ'য়ে গেল সুবীর। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এ প্রশ্ন তাকেই করবেন। আমি নিশ্চয়ই জোর করে তাকে নিয়ে আসি নি?' বলে সে বেরিয়ে আসবার জন্যে পা বাড়ালো।

বিভাস গুহও উঠে দাঁড়ালেন তাড়াতাড়ি। তারপর দু'হাত দিয়ে সুবীরের একখানি হাত ধরে বিষণ্ণ গলায় অনুনয় করে বললেন, 'না না যাবেন না, দোষটা আমার। আ'ম সরি, এক্সট্রিমলি সরি।'

তাঁর চোখমুখের ভাব রীতিমতো বিপন্ন ও করুণ দেখাল। সুবীর বসল।

বিভাস গুহও বসলেন। তারপর অনুচ্চ গলায় বলতে লাগলেন, 'আমি জানি দোষ কার। কিন্তু ওকে আমি কী যে ভালোবাসি, বুঝেও মন বোঝে না। আমি লুকোব না যে, আমিও ছিলাম ওদেরই মতো। ড্রিংকস পার্টি পিকনিক, আরো ড্রিংকস, হাইকিং, আর অনিদ্রা। ওরই মতো আমারো ছিলো এ সব নিত্য সঙ্গী। আই হ্যাড উইনেন টুউ। কিন্তু শান্তি পাইনি।' বলে একটু থেমে আবার বললেন, 'তারপর ওকে ভালোবাসলাম। হ্যাঁ, সত্যিই ভালোবাসলাম। কিন্তু ও তা হেসেই এড়িয়ে যেত। ও বিশ্বাস করে না। মিস্টার বসুমদার, দয়া করে আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন।'

'আমি?' চমকে উঠল যেন সুবীর।

'হ্যাঁ আপনি। দোষটা আপনার', ব'লে বিভাস গুহ হাত ধরলেন আবার সুবীরের; বললেন, 'ওকে আপনি ফিরিয়ে দিন। আমি ওকে চাইছি।' শেষের দিকে গলা তাঁর ধরে এল, চোখের কোণ চিক চিক করে উঠল।

সংক্রামিত হল যেন সুবীরও। কোনো রকমে উচ্চারণ করল সে, 'বেশ তাই হবে।'

'আমি জানতাম আপনি মহৎ—আপনি গ্রেট,' মুখ চোখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল বিভাস গুহের। তিনি

এবার উঠে দাঁড়িয়ে রীতিমত ছাওশেক ক'রে বললেন, 'বিয়েতে কিন্তু আপনাকে আসতেই হবে।'

পর পর দু'দিন প্রায় আত্মগোপন ক'রে কাটাল সুবীর। বাড়ি ফিরত মাঝ রাতে আর বেরিয়ে যেত ভোর না হতেই। কার্তিক খবর দিয়েছে, দু'দিনই রঞ্জিতা তাকে খুঁজে গেছে। সুবীরের নিজের মনও যে রঞ্জিতার সঙ্গে দেখা করার জন্যে কম ব্যাকুল হ'য়েছিল তা নয়। কিন্তু প্রাণপন চেষ্টায় নিজেকে শাসন করে রাখছিল সে।

ধরা পড়ল পুরনো এক কাস্টমারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে। সেখানে যে মাঝে মাঝে সুবীর যেত, তা জানা ছিল রঞ্জিতার। ওদের আফিস থেকে বেরিয়েই ছাখে, গাড়ি নিয়ে রঞ্জিতা অপেক্ষা করছে।

কোনো কথা না বলে দরজা খুলে দিল সে। সুবীরও নীরবে গাড়িতে উঠল। তারপর তাকে ওর বাড়িতে নিয়ে এসে দাঁতে-দাঁত চেপে প্রশ্ন করল, 'এর মানেটা কী জানতে চাই!'

'কীসের মানে?' সুবীর যেন চাপা দিতে চাইল।

'ন্যাকামো করো না।' জ্বলে উঠল রঞ্জিতা।—'আমি জানি, এ সবই ঐ বিভাস ইডিয়টের কীর্তি। আমার কাছেও এসেছিল প্যানপ্যান করতে। তা, কী বলল শুনি?'

—'তোমাকে ভালোবাসেন, তাই।'

'আহা-হা!' রঞ্জিতা জিভ আর তালু দিয়ে দুঃখ-সূচক শব্দ করল, বলল, 'তারপর?'

—'তোমাদের বিয়ে ঠিক হয়েছে—।'

'তাই নাকি?' রঞ্জিতা ঠাট্টার সুরে বলল, 'তুমি বুঝি বরকর্তা?'

তার এ খোঁচা গায়ে না মেখে সুবীর বলল, 'কিন্তু বিয়ে তো সত্যিই তোমাদের ঠিক ছিল?'

—'সত্যিই ঠিক ছিল না। তবে বিভাস গুহের সেন্ট পারসেন্ট ইচ্ছে ছিল। এবং এখনো আছে। আর, তার কারণ ঠিক আমি নই, আমার বাবার কয়লাখনি আর ব্যাঙ্কের টাকা।'

'তাই কী?' সুবীর যেন প্রতিবাদ করতে চাইল। তারপর বেশ জোর দিয়েই বলল, 'তা বোধ হয় ঠিক নয়। আমি নিজেই তো দেখলাম, তোমার কথা বলতে বলতে কেমন জল এসে গেল ওর চোখে।'

'হা ঈশ্বর,' রঞ্জিতা কপালে করাঘাত করে বলল, 'তুমিও ঐ ডিরেকটারী মেলোড্রামায় আটকা পড়লে! সুবীর, ও আমি অনেক দেখেছি। সত্যি বলতে কি ভুগেওছি কিছুকাল। কিন্তু আর নয়। বেশ আছি।'

সুবীর তবু জেদ করে বলল, 'সে তুমি যাই করো, কিন্তু ভালো উনি তোমাকে বাসেন, তা অস্বীকার করতে পারবে না।'

'বেশ তো, ভালোই না হয় বাসেন,' রঞ্জিতা এবার শক্ত গলায় বলল, 'আট-দশ বছর মেয়ে খেঁটে খেঁটে অরুচি হলে অমন ভালোবাসার গল্প অনেকেই ফাঁদে বটে। কিন্তু আমি তাতে ভুলব কেন? আ'ম ইয়াং, আই মাস্ট এনজয় মাই লাইফ। তাছাড়া ওসব আমি বিশ্বাসও করিনে।'

'বিশ্বাস কর না?'

'না না না,' প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠল রঞ্জিতা, আর সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল, 'যাক, বাজে তর্কে আমার রুচি নেই। আমি চললাম।' বলে সে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ ৫ ॥

সেই যাওয়াই যে শেষ যাওয়া নয় এ বোধ সুবীরের ছিল হয়তো, কিন্তু একটা গোটা সপ্তাহ যখন রঞ্জিতা আর এ-মুখো হল না তখন মনটা তার হাঁপিয়ে উঠতে লাগল

দৈবি। এমন কি, এ কথাও তার মনে হতে লাগল—রঞ্জিতা আর সত্যিই যদি না আসে! সে সর্বগ্রাসী শূন্যতা সুধীর সইবে কি করে?

অথচ তাই তো সে চেয়েছিল। অন্তত, তার আয়োজন তো ছিল সেই দিকেই।

না হলে বিভাসের হ'য়ে ওকালতি করার আর অর্থ কী?

রঞ্জিতা যদি সত্যি এবার বিভাসের কাছেই ফিরে যায়, তাহলে তো তার খুশি হওয়াই উচিত!

কিন্তু কিছুতেই সে যেন ঠিক খুশিও হতে পারে না। বরং মনটা যেন তার হাহাকার করতে থাকে।

নিজের কাছে নিজে ধরা পড়ে সুধীর যেন অসহায় কোণঠাসা জন্তুর মতো নিজের ভেতরেই ছটফট করতে লাগল। না পারল রঞ্জিতাকে ডেকে আনতে, না পারল তাকে ভুলে যেতে।

মনের যখন এমন অবস্থা, তখনই আবার হ'ল তার জ্বর বসন্ত। সে যে কতো একা, কতো অপ্রয়োজনীয়, সেইটেই যেন শুয়ে শুয়ে ভালো করে পরখ করল সুধীর। তারপর নিজের অস্তিত্ব যখন আগাছার চেয়েও মূল্যহীন বলে স্থির বুঝতে পারল, তখনই, ঘরের ঘোরে প্রায় সারাদিন বেহুঁশ থাকবার পর হঠাৎ একদিন চোখ মেলে তাকে—মাথার কাছে রঞ্জিতা!

রঞ্জিতার হাত ধরে সে যেন প্রায় কেঁদে ফেলল।

রঞ্জিতা কিন্তু সাড়া দিল না এতে। ব'লে উঠল, 'থাক, আর সোহাগ জানাতে হবে না। আগে খবর দাওনি কেন? না এলে তো জানতেও পারতাম না!' তার কথা বলার ধরন দেখে মনে হল সে যেন বয়স্কা কোনো অভিভাবিকা, রীতিমতো শাসন করছে তাকে।

পরম নিশ্চিন্ততায় চোখ বুজল সুধীর। রঞ্জিতা যে তার কতোখানি তা যেন সে স্পষ্ট বুঝতে পারল।

রঞ্জিতারই তিল-তিল ক'রে সেরে উঠল সুধীর। এবং তাকে যেন শিকড়-মেলা গাছের মতো নিজের সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে আঁকড়ে ধরল।

একদিন রঞ্জিতা বলল, 'তোমাকে বলতে সাহস হয় না, কিন্তু শরীরের যা হাল হ'য়েছে, একটু করে ব্র্যাণ্ডি খেলে উপকার হত।'

'শুধু ব্র্যাণ্ডি কেন,' সুধীর রঞ্জিতার দু'গালের পাশে দু'হাত দিয়ে ধরে বলল, 'তুমি বললে আমি হুইস্কিও খেতে পারি।'

—'কেন?'

'কারণ তোমার আর আমার মধ্যে একটুও ফাঁক নেই ব'লে।'—সুধীর তার কপালের মাঝখানে একটি চুমু রাখল।

রঞ্জিতা বাধা দিল না, কিন্তু নিজেকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'ফাঁক কিন্তু থাকা উচিত। কোনো দু'জন মানুষই এক হ'য়ে যেতে পারে না, যাওয়া ঠিকও নয়।'

তার এ কথার সত্যিকারের অর্থ কী, তা সুধীর ঠিক যেন অনুধাবন করতে পারল না। এমন আরো অনেক কথা রঞ্জিতা মাঝে মাঝে বলত, তার অনেক ব্যবহারও ছিল দুর্বোধ্য। এ সব তখন সুধীর নারীসুলভ হেঁয়ালি বলেই উড়িয়ে দিতে চাইত। বিশেষ করে, নতুন জেগে-ওঠা ভালোবাসায় তার নিজের মনটা কানায় কানায় ভরা, তারই বেগে সব কিছু যেন সে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইত।

পরদিনই তাই রঞ্জিতা আসবার পর সে তাকে চমকে দিয়ে একটি হুইস্কির বোতল বার করল।

রঞ্জিতা প্রথমে না না করল, শেষে বোঝাবুঝি সুধীরকে নিরস্ত করার জন্যেই এক পেগ নিতে রাজি হল। কিন্তু সুধীর যখন সত্যিই বেশ ভালো লাগার মতো ক'রে পান করছে দেখল, তখন তারও মনে আর কোনো দ্বিধা রইল না।

দিন কয়েকের মধ্যেই তাদের সন্ধে বেলার প্রথম আকর্ষণই হয়ে দাঁড়াল, ড্রিঙ্ক্স্। একদিন বার দিলে রাতে সুধীরের ঘুম হতো না। সারাটা দিন সে যেন সন্ধের জন্যে সতৃষ্ণ মনে সময় কাটাতো।

জীবনে এত আনন্দ, এত উৎসাহ সুধীর যেন কোনো-দিনই অনুভব করে নি।

হঠাৎ একদিন এর মধ্যে রঞ্জিতা এল না।

সে দিনটা যেন মনে হল ছন্দোপতনের মতো।

পরদিন মলিন বিবর্ণ মুখে রঞ্জিতা এসে বলল, 'ডাক্তারের কাছে চলো।'

'কেন?' বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল সুবীরের, 'কী হ'য়েছে?'

'যা হবার তাই হয়েছে।' নিস্পৃহভাবে একটু হাসল রঞ্জিতা, বলল, 'আগের মাসেই সন্দেহ হ'য়েছিল। কাল থেকে রীতিমতো গা গুলোচ্ছে।'

'না?' সুবীর যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'কেন? ব্যাপারটা কি এতই অসম্ভব? দিনের পর দিন যা করেছ আমাকে নিয়ে!'

তা বটে।—মনে মনে স্বীকার করল সুবীর। চট করে জবাব দিতে পারল না। মনের মধ্যে নানা বিচিত্র অনুভূতি যেন একই সঙ্গে তোলপাড় শুরু করে দিল।

রঞ্জিতা বলল, 'হাঁ করে ভাবছ কী? ডাক্তারের কাছে চল। চেনা নেই কোনো ডাক্তার? চট করে আমি এ আপদ থেকে রেহাই পেতে চাই।'

'না না!' আবার যেন সুবীর বিশ্বাস করতে পারল না রঞ্জিতার কথা।

'মানে?' রঞ্জিতার গলায় বিদ্রূপের খোঁচা লাগল, 'এই নিয়ে আমি বসে থাকব? তোমাদের সমাজে, তাহলে বাইরে বেরোনো যাবে?'

'তা কেন!' সুবীর এবার একটা রাস্তা দেখতে পেয়ে বলে উঠল, 'বিয়ে করব!'

'হাউ সিলি। সেই যে আমার সেই মাইমি বুলি শেখানো কি-টা যে বলত, 'টকের জ্বালায় পালিয়ে শেষে জেঠুল তলায় বাস', সেই দশা। ও সব চিন্তা মাথা থেকে বিদেয় করো,' রঞ্জিতা যেন শেষ রায় দিয়ে দিল, 'ডাক্তারের খোঁজ নাও। আর দেরি করা যাবে না। এমনিতেই হয়তো দেরি হ'য়ে গেছে!'

'কিন্তু রঞ্জু,' সুবীর ভয় আপিল করার মতো করে বলল, 'বিয়ে করাই কি সব থেকে ভালো সমাধান নয়?'

'কীসের শুনি?' উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করে উঠল রঞ্জিতা।

কারণগুলো সব যেন জানা আছে, অথচ কিছুতেই মনে পড়ছে না, এইভাবে কয়েক মুহূর্ত রীতিমতো ধাঁধা খেতে লাগল সুবীর। তারপর মরিয়া হ'য়ে পাল্টা প্রশ্ন করে বসল, 'বিয়ে যদি ভালোই না হবে তো এত লোকে বিয়ে করে কেন?'

—'এর উত্তর তো আমার দেবার কথা নয়, যারা বিয়ে করে তাদের জিগ্যেস করো। আমার কাছে বিয়ে একটি ঘোচ্ছ্রি···।'

—'ঘোচ্ছ্রি!'

'ইয়েস স্যার, ওটা একটা সেক-বিলিফ, একটা ধাপ্পা!' কেটে কেটে জবাব দিল রঞ্জিতা।

—'ভালোবাসা, প্রেম, এগুলো কি তুমি—?'

'প্লি-জ সুবীর,' তাকে থামিয়ে দিয়ে রঞ্জিতা বলে উঠল, 'তুমি আর ঐ বস্তা-পচা যুক্তিগুলো আওড়িয়ো না। ও আমি অনেক শুনেছি। কেজ্-আপ্।'

'রঞ্জু, তাহলে সংসারটা চলছে কী করে?' সুবীর যেন ভয়ঙ্কর একটা গহ্বরের ধারে এসে পড়েছে, এমনিভাবে ভয়-ধরা গলায় উচ্চারণ করল।

'কোথায় চলছে? চলছেই তো না!' সুবীরের ব্যাকুলতাকে এক ছিটেও আমল না দিয়ে রঞ্জিতা বলল, 'কিম্বা বলতে পারো, চলছে শুধু প্রতারণা আর আত্ম-প্রতারণা।'

'না না, কখনোই তা নয়।' সুবীর যেন চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠল, 'এই যে তুমি এতদিন আমার সঙ্গে মিশলে, একি প্রতারণা? একি ভালোবাসা নয়?'

একটু যেন চমকে উঠল রঞ্জিতা। চোখ তুলে তার মুখের দিকে তাকালো। তারপর আগের চেয়ে মৃদু গলায় উচ্চারণ করল, 'হয়তো ভালোবাসা! সে নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাইনি। ভালো লেগেছিল আমার অস্বীকার করব না। কিন্তু তার পায়ে শিকলি পরাতে চাও কেন? তাকে চিরকালের পোষা-পাখি বানিয়ে রাখতে চাও কেন? সেইটেই তো প্রতারণা!'

সুবীর উঠে এসে রঞ্জিতার পাশে বসল, এক হাত দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরে ভেঙে-পড়া গলায় বলল, 'রঞ্জু, আমার সোনা! আমি ভাবতেই পারি নে, তুমি আমার কেউ নও।'

রঞ্জিতা ম্লানভাবে একটু হেসে বলল, 'তা তো আমি বলি নি!'

'তবে?' সুবীর যেন আবার আলো দেখতে পেলো।

'কী তবে?' রঞ্জিতা এবার স্পষ্ট গলায় তার জবাব দিল, 'আমি যা, আমি তাই। কিন্তু তাতে তো তুমি খুশি নও। তুমি তো চাইছ তাকে খুন করতে, তার ওপর তান্ত্রিকের মতো শব-সাধনা করতে!'

'কী বলছ তুমি রঞ্জিতা,' কোমর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বিপন্ন গলায় বলে উঠল সুবীর, 'তুমি কি আমাকে এতটুকুও বিশ্বাস করো না?'

'বিশ্বাস?' রঞ্জিতার দু'চোখ যেন ধক করে জ্বলে উঠল, 'কীসের বিশ্বাস? কাকে বিশ্বাস! তুমি আমার মাকে দেখেছ? বাবাকে দেখেছ? বাবার সঙ্গিনী হল তাঁর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্টেনোগ্রাফার, আর মার সঙ্গী যোগেশ মামা। অথচ বাবা-মা একসঙ্গে বাস করছেন। উনি ওঁকে শাড়ি কিনে দিচ্ছেন, ইনি ওঁকে চা ঢেলে দিচ্ছেন। হাউ নাইস! আর আমার জন্যেও রেখেছেন কয়েক লাখ টাকার সম্পত্তি। অথচ জ্ঞান হওয়া অবধি দেখছি, আমি বিষের কাছে!' উত্তেজনায় তার নাকের পাটা কাঁপতে লাগল।

'রঞ্জু,' গভীর আবেগের সঙ্গে বলতে চাইল সুবীর, 'আমি কিন্তু তোমাকে সত্যিই খুব—'

'উঃ!' তাকে মাঝ পথেই থামিয়ে দিয়ে রঞ্জিতা বলে উঠল, 'তুমিও দেখছি বিড়ালের মতো মেলোড্রামা শুরু করলে! তুমি কি আমাকে তাড়াতে চাইছ?'

চুপ করে গেল সুবীর। আর কোনো কথা তুলতে সাহস পেল না।

একটু পরে রঞ্জিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'উঠছি আমি। তুমিও ওঠো। ভালো একজন ডাক্তারের খোঁজ কর। বিকেলে আবার আসছি।'

রঞ্জিতা বেরিয়ে গেল।

সোফার গায়ে হেলান দিয়ে ব'সে সিগারেট ধরালো সুবীর। ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু ভেবে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। রঞ্জিতার প্রস্তাব যে কিছুতেই মেনে নেওয়া যেতে পারে না, এ বিষয়ে প্রথম থেকেই সে ছিলো নিঃসন্দেহ। এখন চেষ্টা করতে লাগল, কীভাবে তার স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করা যায়। কিন্তু সিগারেটের পর সিগারেট শুধু পুড়তে লাগল, নতুন কিছু বুদ্ধি মাথায় এল না। সে স্পষ্টই বুঝতে পারল, যে তর্কই সে তুলুক, রঞ্জিতা তার মত বদলাবে না। এবং রঞ্জিতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে গেলে তাকেও তাতে সায় দিতে হবে। অথচ তাই বা কী করে সম্ভব? রঞ্জিতা চাইছে বলেই তো আর সুবীর তার আজন্মের সংস্কার আর বিশ্বাসকে পায়ের নিচে পিষে ফেলতে পারে না। কিন্তু রঞ্জিতাকে যে তাহলে ছাড়তে হবে?

এক অন্তহীন গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল সুবীর। যত ভাবতে লাগল ততোই যেন দু'চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল।

পরিশেষে ফ্রিজ থেকে বেরোল একটি বিয়ারের বোতল।

এবং বিকেলে যখন রঞ্জিতা এল তখন চারটি বোতল নিঃশেষিত, আর সুবীরের অবস্থাও প্রায় তুরীয়লোকে পৌঁছেছে।

রঞ্জিতা তার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই বলে উঠল, 'কী ধার্মিকজন! তুমি আবার করো ভালোবাসায় বড়াই। এক নম্বরের সেল্‌ফিশ একটা।'

—'কেন?'

—'সেই থেকেই তো মনে হচ্ছে এই সব করছ। ডাক্তারের খোঁজ নিয়েছ?'

সুবীর বোকার মতো তাকিয়ে রইল।

—'তোমার মতলবটা কী বল তো? আমাকে বিপদে ফেলতে চাইছ?'

সুবীর মাথা নাড়ল।

—'তবে?'

সুবীর নিরুত্তর।

রঞ্জিতা তখন তার পাশে বসে অন্তরঙ্গ গলায় বলল, 'শোনো, আমি একজনের খোঁজ পেয়েছি। এই তার ঠিকানা, যাও ওঁর কাছে।' বলে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিল।

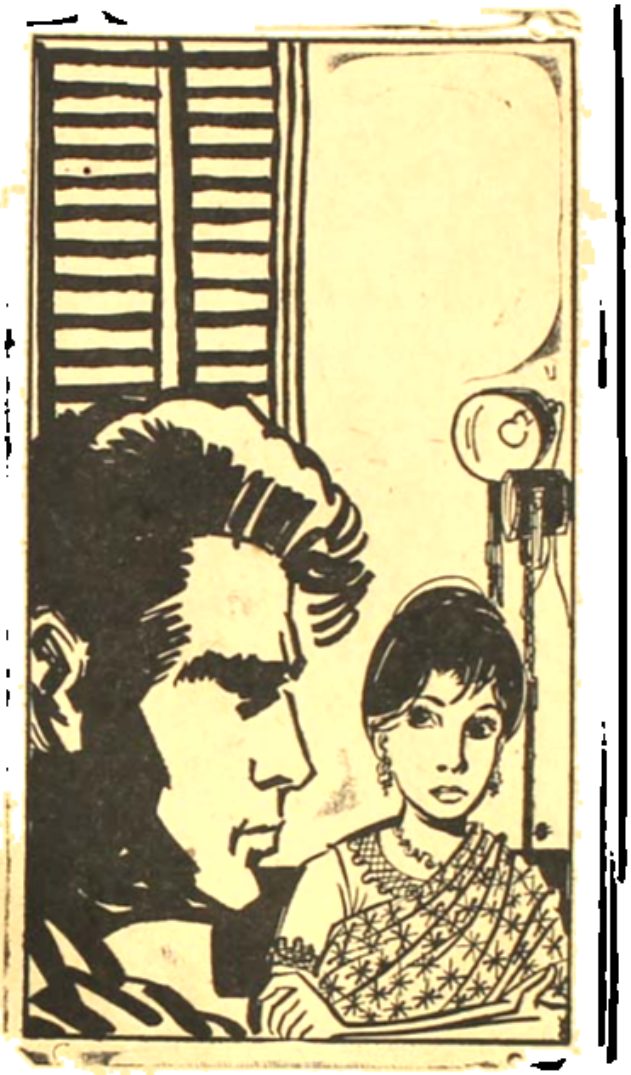

'কে খোঁজ দিল?' এতক্ষণে একটু সম্বাগ হল সুবীর।

—'আমার বন্ধু বেবী। ও-ও এইরকম ফেঁসেছিল কিনা।'

কথাটা সুবীরের কানে আটকে গেল, সে মুখ তুলে বলল, 'তুমি তো ঠিক ফাঁসোনি, বরং আমাকেই ফাঁসাতে চাইছ।'

'কী রকম?' ভুরু কুঁচকে উঠল রঞ্জিতার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলে উঠল, 'আচ্ছা থাক থাক, ওসব তর্ক পরে করা যাবে। তুমি এখন যাও এই ডাক্তারের কাছে। বরং চল, আমিও যাচ্ছি। বাইরে কোথাও না হয় অপেক্ষা করব।' ব'লে সুবীরের হাত ধরে সে উঠে পড়ল।

এবং চিরদিনের মতো সেদিনও এ টানে সুবীর বাধা দিতে পারল না। রঞ্জিতার সঙ্গে গিয়ে গাড়িতে উঠল।

ঠিকানা খুঁজে বের করল ওরা। তারপর সুবীরকে নামিয়ে দিয়ে একটু এগিয়ে গাড়ি থামালো রঞ্জিতা। তার দিকে একবার তাকিয়ে, যেন তারই চোখের খোঁচায় তাড়িত হ'য়ে চেম্বারে ঢুকল সুবীর।

'ক' মাস?' ডাক্তার বাগচি প্রথমেই প্রশ্ন করে বসলেন সুবীরকে।

এ কথাটা একবারও ভেবে রাখেনি সুবীর। রঞ্জিতাও জানায় নি। সে উত্তর দিতে পারল না।

—'কে হন?'

'ওয়াইফ।' এবার চটপট উত্তর দিয়ে ফেলল সুবীর।

'তাহলে ক'মাস জানেন না কেন?' ডাক্তার বাগচি এবার ঠোঁটের কোনায় হাসি নাচিয়ে বলে উঠলেন, 'নতুন বাবা হচ্ছেন বুঝি?'

তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে ঘাড় নাড়ল সুবীর। কিন্তু মনে মনে সে এই রকম একটা উদ্ভট সমস্যায় ফেলে দেবার জন্য রঞ্জিতার ওপর চটে যেতে লাগল।

ডাক্তার বাগচি এবার চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বললেন, 'ফার্স্ট চাইল্ড-কে এভাবে নষ্ট করতে চাইছেন কেন?'

নষ্ট করা কথাটা যেন কানের ওপর ঘুসি চালালো সুবীরের। বুকের মধ্যে তার তোলপাড় করে উঠল। কিন্তু এখন আর ফেরবার পথ নেই। তাই আত্ম-সমর্পণের ভঙ্গিতে সে চোখ নামিয়ে বলতে লাগল, 'এখনো বিয়ে হয়নি আমাদের।'

—'বেশ তো এখন করে ফেলুন!'

'না ইয়ে,' সুবীর প্রায় না ভেবে-চিন্তেই এবার বানিয়ে বানিয়ে বলতে লাগল, 'মানে, লেকেলে পরিবার তো, এভাবে বিয়ে করলে কথা উঠবে। তাছাড়া ওর বাবাও মারা গেছেন লাস্ট মাসে। কাজেই অপেক্ষা আমাদের এমনিতেও একটু করতে হবে।'

'তবে তো দেখছি হ'য়ে যাচ্ছেন। আগে সাবধান

হ'তে পারেন নি!' ডাক্তার বাগচি সোজা হ'য়ে বসে এবার বললেন, 'আচ্ছা, নিয়ে আসবেন আপনার পেশেন্টকে। কাল সন্ধে সাতটা নাগাদ।'

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে হাঁফ ছাড়ল সুবীর। তারপর রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে রঞ্জিতাকে গিয়ে সব কথার বিবরণ জানালো।

রঞ্জিতা সব শুনে বলল, 'ওয়াইফ বলতে গেলে কেন? আর ডাক্তারেরই বা অতো ওস্তাদীর দরকার কী?'

'হ্যাঁ বড্ড জেরা করে লোকটা,' সুবীর সুযোগ বুঝে শেষ চেষ্টা করল, 'তার চেয়ে বরং—!'

'তুমি থামো তো।' এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিল রঞ্জিতা, 'তখন থেকে কেবল এক কথা প্যানপ্যান করে যাচ্ছে। যতোই তুমি বাধা দাও, আমি যা ঠিক করেছি তা হবেই।'

॥ ৬ ॥

এবং হলও তাই।

শুধু, সেই হাওয়াটা যে কতদূর গড়াতে পারে, তা বুঝতেই বা কয়েকমাস বাকি থেকে হয়েছিল সুবীরকে!

ওসব চুকে বুকে যাবার দিন দু'য়েক পর, রঞ্জিতা তখনো নার্সিং হোমেই ছিল, ডাক্তার বাগচি বললেন, 'আপনি ইচ্ছে করলে বাড়িও যেতে পারেন আরতি দেবী, কিন্তু এবার থেকে একটু সাবধান—।'

আরতি নামটাই রঞ্জিতা চালু করেছিল নার্সিং হোমে, সে ম্লানভাবে একটু হাসল।

ডাক্তার বললেন, 'তবে হ্যাঁ, বেশি ঘুরে বেড়াবেন মিস্টার মজুমদার আবার অন্যদিকেও ঝুঁকতে পারেন বটে!' ব'লে সুবীরের দিকে তাকিয়ে বেশ অন্তরঙ্গভাবে ব'লে উঠলেন, 'বাঘ একবার রক্তের স্বাদ পেয়েছে তো!'

কথাটা এমন বিশ্রী শোনাল, আর সেই সঙ্গে রঞ্জিতা এমন অর্থপূর্ণভাবে তাকাল যে সুবীর হঠাৎ সীরিয়াস গলায় বলে উঠল, 'তা আর এ জীবনে সম্ভব নয়।'

'বেশ বেশ, শুনে খুব খুশি হলাম। তবে বেখেয়ালিও তো অনেক। কিছু মনে করবেন না, একালে ধাক্কা দিয়ে সর্বনাশ করাও কম দেখিনি।' বলে উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্তার বাগচি বললেন, 'বেশির ভাগই কেটে পড়ে। আপনার কথাটা শুনে সেই জন্যেই আরো ভালো লাগল।'

ডাক্তার বাগচি বেরিয়ে যেতেই রঞ্জিতা বলল, 'বয়ছিস তো ইয়ে, আবার বুকনি ঝাড়ো না!'

সুবীরও অবশ্য ডাক্তারের কথায় খুশি হয় নি। তবু এ'কদিন সব প্রসঙ্গকেই সে ব্যবহার করছিল তার একটি মাত্র মূল লক্ষ্যের দিকে, এবং সেইটেই হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল তার অভ্যাস। তাই সে রঞ্জিতার বিরক্তি গায়ে না মেখে বলল, 'কথাগুলো কিন্তু সত্যি! তবে আমার কপাল গুণে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে, কেটে পড়ছি ঠিক আমি নই, আমাকে কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।'

রঞ্জিতা কোনো উত্তর দিল না। ওদিকে মুখ ফিরিয়ে শুল।

আর তার এই নীরব ঔদাসীন্যে সুবীর নিজেকে অপমানিত বোধ করল। ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠল, 'এটা কি স্বার্থপরতা হচ্ছে না?'

রঞ্জিতা এ কথারও কোনো জবাব দিল না।

'অসহ্য।' সশব্দে চেয়ার ঠেলে সুবীর বাইরে চলে এল।

কিন্তু যেতে হল আবার তাকে পরদিন সকালেই। গিয়ে খরচপত্র মেটাতে হল, ট্যাক্সি ডেকে রঞ্জিতাকে রওনা করার ব্যবস্থা করতে হল। এবং এসব করতে পেরে সত্যিই তার খুব ভালো লাগতে লাগল। বিশেষ করে রঞ্জিতা যে তাকে কোনো বাধা দিল না, বরং

রীতিমতো মেনে নিল, এতে সে যেন বর্তে গেল। এক সময় সে জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার ফাঁকে রঞ্জিতার কাছে সরে এসে তার কপালে হাত রাখল। রঞ্জিতা তার দিকে তাকাল। সে চোখে বিরক্তি ছিল না, ছিল না কোনো শাসন। সুবীর তার ঠোঁটের ওপর আলতো করে ঠোঁট রাখল। এবং কী যে শান্তি তার মনে এল তা ভাষায় বলা যায় না।

রঞ্জিতা বাধা দিল না, বরং সুবীরের মাথার পেছনে হাত তুলে চুলের মধ্যে অল্প একটু বিলি কেটে দিল।

তৃপ্ত মনে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে সুবীর বলল, 'দুর্বল লাগছে না তো? পারবে তো যেতে এতটা?'

'খুব পারব।' রঞ্জিতা উঠে বসে বলল, 'কালই তো বারান্দায় ঘুরে বেরিয়েছি।'

—'সাবধানে থেকো কিন্তু।'

রঞ্জিতা স্মিতমুখে তার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল।

—'আর, একটু সেরে উঠলেই আমার ওখানে এসো।'

—'আসব বৈকি!'

কিন্তু রঞ্জিতা আর এল না। দু' তিন সপ্তাহ কেটে গেল, রঞ্জিতার কোনো খোঁজ নেই। কী যে অবর্ণনীয় সে কষ্ট তা যে সয়েছে সেই শুধু বাঁচ করতে পারবে, অন্যের পক্ষে অভাবিতব্য। সকাল থেকে আসবে আসবে করে দুপুর, তারপর দুপুরের পর থেকে এই এল এই এল করে সন্ধ্যা, এবং সন্ধ্যা থেকে যদি আসে যদি আসে করে রাত দশটা—যেন এক অন্তহীন প্রতিক্ষার অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে কেটে গেল কুড়ি বাইশ দিন। রঞ্জিতা এল না। রাতের ঘুম গেল, দিনের কাজ নষ্ট হতে লাগল, শুধু বেড়ে যেতে লাগল মনের মাত্রা। ভেতরে-বাইরে এক অপরিসীম শূন্যতা যেন তাকে পিষে মারতে লাগল।

মনের যখন এই রকম অবস্থা, তখন হঠাৎ একদিন পেল সে রঞ্জিতার টেলিফোন। কোন্নগরের এক বাগানবাড়িতে পিকনিক। সে যেন নিশ্চয়ই যায়। আর সঙ্গে যেন তার ক্যামেরা নিতেও ভোলে না।

টেলিফোন পেয়ে মনটা তার যেন যযাতির মতো নূতন যৌবন ফিরে পেল।

যথাসময়ে ঠিকানা অনুসারে হাজির হল সে। গিয়ে দ্যাখে, রঞ্জিতারা আগেই এসে গেছে। তাকে দেখতে পেয়ে হাত-কাটা ব্লাউজ পরা কাঁসাড়ী একটি মেয়েকে কাছে টেনে রঞ্জিতা আলাপ করিয়ে দিল. 'এই হল বেবী, আমার বন্ধু।'

মেয়েটি রঞ্জিতার গায়ে ঠেলা দিয়ে ফিক্ করে হেসে বলল, 'থাক হ'য়েছে, এ রকম ভেজিটেবল বন্ধুতে কী আর তোমার মন ওঠে?'

'যাহ্ বকিস নে,' রঞ্জিতা বাচ্চা মেয়ের মতো কুঁদুলে গলায় বলে উঠল, 'সকলেই তোর মতো ম্যান ইটার অব্ কুমায়ুন নয়।'

বেবীও ছাড়বার পাত্রী নয়, সে খিল খিল করে হেসে উঠে বলল, 'তা হবে কেন, তুমি হলে একটি কুমির। তুমি শুধু খাওই না, ডুবিয়েও মারো। কী বলেন মশায়!'

হঠাৎ এভাবে সাক্ষী মানায় অপ্রস্তুত হল সুবীর, কিন্তু একটু খুশিও হল, রঞ্জিতাকে বেবী এইভাবে কোণঠাসা করতে পারছে দেখে। সে কী জবাব দিত বলা যায় না। রঞ্জিতা ধমক দিয়ে ব'লে উঠল, 'তুই থাম তো। হ্যাঁ, সুবীর, অনেক ছবি তুলতে হবে কিন্তু। ফিল্ম এনেছ তো?'

—'হ্যাঁ এনেছি।'

ব'লে সুবীর কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা তুলে চট ক'রে ওদের দু'জনের একটি স্ন্যাপ নিয়ে নিল।

তা দেখে আরো দু'টি মেয়ে এবং তাদের পেছনে কয়েকটি যুবক ছুটে এসে হৈ হৈ জুড়ে দিল, 'এবি, একি! এ যে রীতিমতো পার্শিয়ালিটি হ'চ্ছে।' তারপর পরস্পরের মধ্যে হাসাহাসি আর কথা কাটাকাটির মধ্যে সুবীরও ওদের সঙ্গে একজন হ'য়ে মিশে গেল।

চা এবং মুড়ি-তেলেভাজার পর সুবীর পুকুরের ওদিকটায় ঘুরছিল, বেবী এসে বলল, 'কী মশায়, তখন অমন আচমকা ছবি তুলে নিলেন, উঠবে তো?'

—'মনে তো হয়।'

'আরেকটা তোলো না তার চেয়ে।' রঞ্জিতা কাছে

এগিয়ে এসে বলল। তারপর হাত দিয়ে বেবীর গলা জড়িয়ে ধরে ছুড়ে দিল, 'আমার এই আজন্ম বন্ধুর সঙ্গে, এইভাবে!'

'আহা আমি তোর কতো বন্ধু তা আমি জানি।' বেবী ছদ্ম কোপের সঙ্গে বলল, 'আসল লোক তো ঐখানে। ডাকি?' বলেই চিৎকার শুরু করল, 'প্রণব, এই প্রণব!'

বছর বাইশ-তেইশের একটি যুবক অদূরে পেয়ারা গাছের নিচু ডালে বসেছিল, সে লাফ দিয়ে নেমে ছুটে এল এদিকে।

রঞ্জিতা স্পষ্টতই লাল হ'য়ে উঠল একেবারে। এবং তার সমস্ত হাবভাবে এমন একটা ত্রীড়ার আবেশ ফুটে উঠল যা সুবীরের কাছে অন্তত অভাবিত। বুকের মধ্যে যেন খচ্ করে একটি কাঁটা ফুটল তার। সমস্ত পরিবেশ তার কাছে বিস্বাদ হ'য়ে উঠল।

প্রথমে অবশ্য চাহি হ'ল না রঞ্জিতা। দেখে, ওদের তিন জনের একটি গ্রুপ ওঠার পর নেহাৎ যেন বেবীর পীড়াপীড়িতেই দাঁড়াল সে প্রণবের পাশাপাশি। এবং সে ফোটোও সুবীরকে তুলতে হল।

তারপর বেবী এগিয়ে এসে সুবীরকে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেল আরেক দিকে, বলল, 'চলুন মশাই, ওরা এখন আমাদের বিব-ভবরে রেখেছে। চলুন আমরা পালাই।'

'এই বেবী, কী হচ্ছে?' ব'লে রঞ্জিতা মুখে প্রতিবাদ করল বটে, কিন্তু স'রে এল না। বরং কোতুক কয়েক পরে প্রণবের সঙ্গেই এগিয়ে গেল পুকুরঘাটের দিকে।

চরম আত্ম-অবমাননায় দু' কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল সুবীরের। কিন্তু সে পিকনিক ছেড়ে চলেও আসতে পারল না। আহত পশুর মতো এক কোণে বসে নিজের মনের ক্ষতস্থানকে লেহন করতে লাগল।

বিকেল লাগাদ শুনতে পেল, পরীর ঘরোপ লাগছিল ব'লে রঞ্জিতা একটু আগে প্রণবের গাড়ি করে কলকাতায় ফিরে গেছে।

সুবীরের মুখে কে যেন জুতো ছুঁড়ে মারল।

সেইদিনই শেষ। আর দেখা হয়নি রঞ্জিতার সঙ্গে। কিন্তু রঞ্জিতার ঢেউ যেন তবু মিটতে চায়নি সহজে। আঠি-রূপে যে রঞ্জিতা হয়েছিল এসে প্রেমের আসনে, সেই-রূপে সে-রঞ্জিতা যেন দেখা দিল এবার ডাকিনীর বেশে। তার উন্মুক্ত রূপাণে খিণ্ডিত হ'তে লাগল সেখানে যা কিছু ভালো লাগার চেতনা, এক পাতালস্পর্শী না-থাকার গহ্বরে যেন ডুবে যেতে লাগল সুবীর দিনের পর দিন। কাজ করত সে ঘরের মতো, কথা বলত কম, এবং মেয়েদের বেবলে সে স্পষ্ট অভদ্রতা করে সরে আসত।

তাদের সে বিশ্বাস করত না, ভয় করত, ঘৃণা করত।

এবং এই খাসরোধ-করা না-এর চাপকে তুলে থাকবার জন্যে মদ গিলত।

অথচ, নিজেকে ভেঙেচুরে ছড়িয়ে দেবার পরও, সেই ধ্বংসস্তূপের ওপারে তখনো সে শুনতে পেত, কবেকার এক মফঃস্বল শহরে শুনতে পাওয়া এক কিশোরের কণ্ঠস্বর—কতদূর থেকে সে যেন তাকে ডাকত, বারে বারেই ডাকত।

তার গলায় আওয়াজে ছিল জলের শব্দ, পাখির ডাক, হঠাৎ ঝিকিয়ে-ওঠা সবুজ পাতার ঘুণি।

তার চারপাশে ছিল মানুষের পদশব্দ, বুকের মধ্যে বিশ্বাস।

সে জীবন যেন বহুদূরে—সুরভিত্রমনীয় কোনো অন্ধকারের প্রত্যন্তদেশে অজিত্র কোনো আলোরেখার মতো।

সেখানে কোনো দিনই আর পৌঁছনো যাবে না, কিন্তু চিরদিনই যেন তা বিলীয়মান এক স্বর্গের মতো বুকের ভেতর থেকে শয়তানের যন্ত্রণা খুঁচিয়ে তুলবে।

আর তার দিন-রাত ছারখার হ'য়ে যাবে সেই হাহাকারের অগ্নিজ্বালায়।

—

হলও সেরকমই তাই-ই। সময়ে কাজ পায় না বলে, পার্টিগুলো একে একে খ'সে পড়তে লাগল। বাজারে ধার জমল। ক্যানেরাগুলো বিক্রি হ'তে লাগল। অথচ যেমন করে হোক, মদ চাই। রেফ্রিজেরেটার বাঁধা পড়ল। রেডিওগ্রাম জলের দরে হাতছাড়া হল। শেষে মনেও যখন আর তার রাতে ঘুম হতো না, তখন শুরু হল সিপিং পিল। সুবীর যেন যতো বেশী হারতে লাগল ততো বেশী ডবল-ডবল বাজি ধরতে লাগল। এবং ক্রমেই যেন একেবারে শেষ হ'য়ে যেতে লাগল।

পাঁচ-ছ'মাস কেটে গেল ব্যাথার অতীত এই নরক-যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে। শেষে ধর্মতলার এক ফোটোগ্রাফীর দোকানের বন্ধু অনিল এসে তাকে খবর দিল, একজন আর্টিস্ট তার ছবিগুলোর ফোটো তোলাবে, যদি চায় তো সুবীর পেতে পারে কাজটা। অনিলের দোকানে কিছু দেনা ছিল সুবীরের, কাজেই তার উপদেশকে সে অন্য দশজনের কথার মতো ছুঁড়ে ফেলতে পারল না। বলল, 'আচ্ছা দেখব।'

'দেখব নয়, কালই যাবেন। অনেক লোক ঘুরছে কাজটার জন্যে।' অনিল চাপ দিয়ে বলল।

—'যাব।'

নাম-ঠিকানার কার্ড দিল অনিল।

'যাব না।' তৎক্ষণাৎ কার্ডটা ফিরিয়ে দিল সুবীর, 'মেয়েদের কাজ আমি করি নে।'

'মেয়েদের কাজ মানে?' অনিল অবাক হল, 'ফোটো তুলবেন ছবির, তার মধ্যে এর কথা উঠছে কোত্থেকে! তাছাড়া,' অনিল গলা নামিয়ে বলল, 'বাজারে যতো ধার জমেছে সে কথাটাও খেয়াল রাখবেন। বাছবিচার করলে লোকে শুনবে কেন?'

সুবীর একটু থতমত খেয়ে গেল যেন। তারপর বলল 'আচ্ছা যাব।'

গিয়ে জানে, আর্টিস্ট যেমন-তেমন, বড়লোকের আদুরে মেয়ে। তবে ভদ্র, পেমেন্টের রেটও ভালো। রাজি হ'য়ে গেল সুবীর।

পরদিন সকালে মেয়েটির স্টুডিওতে গিয়ে দেখল, কী যেন নাম মেয়েটির, হ্যাঁ ভাস্বতী, ঠিক তার পাশেই বসে আছে আরেকটি মেয়ে। তার চেয়ে বয়সে একটু বেশী, কিন্তু অনেক বেশী তন্বী, আর সুশ্রী।

সেই মেয়েটিই ইলা।

ভাস্বতী আলাপ করিয়ে দিল—তার শিল্প-শিক্ষিকা, তারপর মন্তব্য ছুঁড়ে দিল, 'মানে, ইলাদিই আসলে এঁকেছেন ছবিগুলো, আমি দাগ বুলিয়েছি।'

'না, তা হবে কেন? তুমিও তো এঁকেছ।' ইলা চাপা দিতে চাইল এ প্রসঙ্গ।

ভাস্বতী বলল, 'ইলাদিই আপনাকে বেছে দেবেন, কোন কোন ছবির ফোটো তুলতে হবে। আপনি কি সকালের দিকেই আসবেন?'

—'যখন বলেন তখনই আসতে পারি। আমার কাছে আলো আছে।'

'তাহলে বিকেলের দিকেই আসুন। সকালে ইলাদির ইস্কুল থাকে। আর আমিও ও সময়টায় ঘুম থেকে রোজ উঠতে পারি নে।' ভাস্বতী কৈফিয়তের মতো করে একটু হাসল।

'বেশ, বিকেল বেলাতেই আসব।' ব'লে দু'একটি ছবির ফোটো তুলে সেদিনের মতো চলে এল সুবীর। এবং বাড়িতে এসে ভেবে দেখল ভাস্বতী বা ইলা কারো প্রতিই মেয়ে বলে তার মনে কোনো অনীহা জাগে নি। আগ্রহও অবশ্য দেখা দেয় নি তাই বলে। মোটামুটি একটা ভারসাম্যের অবস্থা বলা যায়। কিন্তু কয়েক মাসের একটানা টাল-মাটালের পর কাল পর্যন্তও এ পরিস্থিতি ছিল তার কাছে অভাবিতপূর্ব।

অনেকদিন পর সে যেন নিজের মনের মধ্যে একটা অন্ত-সংবরণের চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারল।

পরদিন থেকে কাজ শুরু হল পুরোদমে।

তবে কাজ বলতে ঠিক সে রকম ঘুখে-রক্ত-তোলা ব্যাপার নয়। ছবি বাছা হ'ত, তার রঙ তার রঙের বৈচিত্র্য সাদা-কালো রঙে ফোটো তোলার পক্ষে কতোখানি উপযোগী তা ভেবে দেখা হত, আবার শিল্পীর অঙ্কনরীতির দিক দিয়ে তা গুরুত্বপূর্ণ কিনা তাও বিচার করে দেখা হত, তারপর তোলা হত ছবি। মোটকথা বেশ ধীরে সুস্থে ফিরিয়ে ফিরিয়ে কাজ করার মতো পরিস্থিতি। স্বভাবতই এতে কাজের সংখ্যার চেয়ে গুণগত উৎকর্ষের দিকে নজর দেওয়া হত বেশি। কোনো কোনো ছবি তুলে তাই ডেভালপ প্রিন্ট করার পর নতুন ক'রেও মাঝে মাঝে ফোটো তুলতে হত। কাজে রীতিমত মন বসে গেল সুবীরের।

তার একটা প্রধান কারণ এই যে, ভাস্বতী প্রায় দিনই দেখা যেত গরহাজির। সিমেনা বা তার অন্য কোনো বন্ধুর ছবির এ্যাডিবিশান প্রায় লেগেই থাকত। আর ইলা যদিও উপস্থিত থাকত সারাক্ষণই, কিন্তু দরকার না হলে প্রায় কথাই বলত না।

অথচ সে উদ্ধত নয়, দাম্ভিক নয়, অমিশুকেও নয়।

যেটুকু কথা সে বলত, তার মধ্যে বুদ্ধি থাকত, স্নিগ্ধতাও থাকত। কিন্তু সীমাবোধ ছিল যেন তার মজ্জাগত। গায়ে পড়ে একটা কথাও সে নিজে থেকে বলত না। অথচ তার ঠোঁটের চারধারে প্রায়-দেখা-যায়-না এমন একটি হাসি যেন সব সময়েই লেগে থাকত।

একদিন কাজ করতে করতে একটা ছবি দেখে সুবীর বলল, 'এ ছবি নিশ্চয়ই ভাস্বতী দেবীর নয়? এ নিশ্চয়ই আপনার!'

—'কী করে বুঝলেন?'

—'ছবির এক কোণে একটা গাছ দাঁড় করিয়ে এমন-ভাবে ব্যালান্স করা হ'য়েছে ছবিটিকে যে এটা বড় শিল্পীর কাজ না হ'য়ে পারেই না।—অবিশ্যি ছবির আমি প্রায় কিছুই বুঝি নে তা স্বীকার করছি।'

'আপনি ফুলকিদে ফেললেন দেখছি। ছবি আপনি ভালোই তোলেন, কিন্তু সে কথা স্বীকার করলে আপনার বড় শিল্পী ব'লে ঐ প্রশংসাটাও মেনে নেওয়া হয়।' ইলা বলল, 'কারণ আপনি ঠিকই ধরেছেন, ছবিটা আমারই আঁকা।'

একটু পরে সুবীর আবার বলল, 'আচ্ছা, আপনার কোনো এগজিবিশান হয় না কেন?'

—'হয়েছে তো।'

—'কবে?'

—'পাঁচ ছ'বছর আগে।'

—'এখন করেন না কেন!'

'কী হবে করে!' ইলা তাড়াতাড়ি আবার জুড়ে দিল, 'তাছাড়া আঁকিও না তো বেশি এখন।'

'কেন?' সুবীর ক্যানেরার ফোকাস ঠিক করতে করতে বলল, 'অধিকাংশ এসব অত্যন্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন হ'য়ে যাচ্ছে হয়তো।'

'না তা কেন?' ইলা সঙ্কোচ না করে বলল, 'প্রথমত আঁকার জিনিসের যা দাম। তারপর ইস্কুলে কাজ করি, তাছাড়া আঁকা শেখানোর টিউশানিও তো রয়েছে। হ'য়ে ওঠে না, আর কি!'

বোঝা গেল দারিদ্র্য আছে ইলার। কিন্তু তা নিয়ে কোনো সঙ্কোচ নেই। আবার তাকে ফলাও করে কাঁদুনি গাইবারও ইচ্ছে নেই। সুবীর সাহস পেয়ে বলল, 'এগজিবিশান করলে ছবি বিক্রী হয় না?'

—'হয় কখনো সখনো। তবে কম।'

—'কেন? সে ভারি অন্যায়।'

ইলা জবাব না দিয়ে হাসল।

আর, হঠাৎ এভাবে আবেগ প্রকাশ করে ফেলে সুবীর নিজেও একটু লজ্জা পেল। তাড়াতাড়ি কাজে মন দিল।

সেদিন কাজকর্ম শেষ হবার পর সুবীর বলল, 'একদিন আপনার স্টুডিওতে ছবি দেখতে যাব।'

—'স্টুডিও তো নেই আমার।'

—'তা হোক, ছবি তো আছে!'

—'তা আছে।'

সুবীর একটু অপেক্ষা করল। কিন্তু ইলা তবু স্পষ্ট করে তাকে আমন্ত্রণ জানালো না। সে নিজে থেকে যাবে বলা সত্ত্বেও নয়।

সুবীর আহত হল।

এর পর দিন দুয়েক সুবীর প্রায় মুখ বুজেই কাজ করে গেল। গায়ে পড়ে আর আলাপ জমাতে গেল না। নিজে যা পছন্দ করে না, সেইভাবেই সে সে ইলার সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করতে গিয়েছিল সেটা ইতিমধ্যে তার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। নিজের বিষয়ে এবার থেকে সতর্ক হবার চেষ্টা করল।

এবং চেষ্টা জিনিসটার স্বভাবই এই যে, চেষ্টা করে কিছু ঠেকাতে গেলেই সারাটা মন যেন সেই দিকেই ঝুঁকে পড়তে চায়। নিরাকরণ এক অস্বস্তির মধ্যে দিয়েই তার সময় কাটতে লাগল।

'সুবীরবাবু কি আজ ফ্রী আছেন?' তৃতীয় দিনে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল ইলা।

'অ্যাঁ?' নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না সুবীর, 'কিছু বলছিলেন?'

—'বলছিলাম, এখান থেকে বেরিয়ে আর কোনো কাজ নেই তো আপনার?'

'কেন বলুন তো?' তার হুইস্কি কেনার দরকার ছিল, সে কথা চেপে সুবীর পাল্টা প্রশ্ন করল।

—'তাহলে আজ আপনি আমার ছবি দেখতে পারেন?'

—'আজ? কাল হলে অসুবিধে আছে?'

—'বেশ, কালই আসবেন।'

—'অসুবিধে হবে না তো?'

'তা একটু হবে বৈকি।' ইলা শান্ত গলায় বলল, 'দু'খানা তো মাত্র ঘর। বাবা যা রয়েছেন। ছবিগুলো তাই প্যাক করা থাকে। আজ বার করে সাজিয়েছিলাম একটু। তা ঠিক আছে, সরিয়ে রাখব একপাশে।'

সুবীরের মনের মধ্যে তখন হুইস্কি আর ছবিতে রীতিমত যুদ্ধ চলছে। সে বলল, 'না চলুন আজই

যাই। এক ঝলক দেখে আসি, পরে না হয় ভালো করে দেখব।'

সেদিন গিয়ে ছবি দেখল সুবীর। এক ঝলক নয়, রীতিমত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারিফ করল, সমালোচনা করল। ক'খানা ছবির ফোটোও তুলল। তারপর এক সময়ে আবিষ্কার করল, রাত হয়ে গেছে—হুইস্কির দোকানে অনেক আগেই তালা পড়েছে।

তা থাক, মনকে প্রবোধ দিয়ে সে বলল, অনেক দিন পর তবু ক'টা ভালো জিনিস দেখা গেল!

ছবি দেখার পর এক পেয়ালা কফি দিল ইলা। বলল, 'এত রাতে আর কিছুদিয়ে খিদে নষ্ট করলাম না। আরেক দিন সত্যিই যদি আসেন তখন দেখা যাবে।'

গিয়েছিল তারপর আরো কদিন। এই বাসেই কতো ছবি এঁকেছে ইলা, তা দেখে সুবীর অবাক হল, মুগ্ধ হল। শেষে ক্ষোভ প্রকাশ করে একদিন বলল, 'কিছু মনে করবেন না, এমন যার হাত, তার পক্ষে না আঁকা অমার্জনীয় অপরাধ।'

ইলা হাসল একটু, উত্তর দিল না।

'হাসছেন যে!' সুবীর হঠাৎ অধৈর্য হ'য়ে বলে উঠল, 'দারিদ্র্যের কথা যদি বলেন তো বলব, বাড়িতে এই ক'টি লোক, আর আপনার বাবাও কাজ করেন, এমন কিছু অভাব আপনার হবার কথা নয়!'

'আমার এক ভাই আছে, সে পাগল। এক প্রাইভেট অ্যাসাইলামে থাকে। অনেক টাকা তার জন্যে দিতে হয়।' মৃদু গলায় জবাব দিল ইলা।

'ও! জানতাম না।' মরমে মরে গেল যেন সুবীর, বলল, 'আমায় মাপ করবেন।'

ইলা স্নিগ্ধভাবে হাসল। তারপর বলল, 'বাবা রবিবার হ'য়ে যাচ্ছেন পাটনায়! তখন কিছু ভাবনা পাব। ভালো করে গুছিয়ে ব'সে ছবি আঁকব।'

তাড়াতাড়ি বিদেয় নিয়ে সুবীর যেন এক রকম পালিয়ে এল সেদিন।

দিন কয়েক পরে সুবীর এক রবিবারে সকালেই গিয়ে হাজির হল ইলার বাড়িতে। ইলা স্নান করে এলোচুলে বসে ছবি আঁকারই চেষ্টা করছিল বোধ হয়। তাকে দেখে তাড়াতাড়ি ইজেলটাকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে দাঁড়ালো।

সুবীর বলল, 'ছবি দেখতে আসি নি, একজন কিনবে তারই ব্যবস্থা করতে এসেছি।'

—'কিনবে! মানে, কে কিনবে?'

—'আমার এক বন্ধু।'

—'কিন্তু আমি তো বিক্রি করব না।'

'কেন?' সুবীর রীতিমত অবাক হল।

'কারণ আপনার সেই বন্ধুটিকে আমি চিনি।' ইলা ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তিনি দয়া করতে চাইছেন।'

'মোটেই তা নয়—।' সুবীর প্রতিবাদ করতে চাইল।

'হ্যাঁ, তাই।' ইলা এবার গলার স্বর বদলে অন্তরঙ্গ-ভাবে বলল, 'আপনি যে আমার উপকার করতে চান তা, আমি বুঝতে পারি। কিন্তু নেবারও তো একটা অধিকার চাই?'

'কেন হবে,' সুবীর কোণঠাসা হ'য়ে বলে উঠল, 'আপনি কি আমাকে বন্ধু মনে করতে পারেন না?'

'আপনি বসুন সুবীরবাবু, আপনার সঙ্গে কটা কথা বলে নিই।' ইলা শান্ত গলায় বলল, 'দেখুন, আমি ছবি আঁকি বটে, কিন্তু ঠিক আধুনিকা নই। অন্তত ততোখানি আধুনিক নই যাতে যে কোনো অল্প চেনা মানুষকেই বন্ধু বলে ঘোষণা করতে পারি। আমি দেখেছি তাদের, কিন্তু মিশতে পারি নি। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'কিন্তু,' একটু থেমে সুবীর তবু বলল, 'আপনি জানলেন কী ক'রে যে আমি তাদেরই দলের একজন?'

'না?' অল্প একটু হাসল ইলা, বলল, 'একটু আগে আপনি আমার বন্ধু হতে চেয়েছিলেন, বেশ তো সেই সুবাদেই জিগ্যেস করছি, সত্যি করে বলুন তো, এ পর্যন্ত ক'জন মেয়েকে আপনি বন্ধু বলে ঘোষণা করেছেন?'

'একজনও নয়।' মরীয়া হ'য়ে বলে ফেলল সুবীর।

'সত্যি!' ইলার যেন এবার সত্যিই অবাক হল।

'তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি।' ঝাঁ করে ইলার একখানি হাত ধরে বলে উঠল সুবীর।

ইলা কি একটু কেঁপে উঠল? মুখ চোখ কি তার একটু আরক্ত হ'য়ে উঠল? যদি তা হয়েও থাকে তো সে বড় অল্প সময়ের জন্যে। চট করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে অনুচ্চ গলায় বলল, 'বাবা যা আছেন!'

সুবীর সে বিষয়ে আর কোনো কথা বলল না। কিন্তু লজ্জিতও সে হল না। যাবার আগে একখানা অর্ধাধানো ছবি তুলে নিয়ে বলল, 'বেশ, দাম দিয়ে যখন পাবো না, তখন অপহরণ করাই যুক্তিসঙ্গত।'

—'কিন্তু ছবিখানা কি সত্যিই অতো বেশি দরকার।'

'বুক চিরে দেখাতে হবে নাকি?' জোর দিয়ে বলে উঠল সুবীর।

ইলা নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল ঠেকিয়ে বলল, 'আস্তে।'

সুবীর নীরবে কাননলা নাকমলা খেল। তারপর হাসতে হাসতে ছবিশুদ্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দিন দুয়েকের মধ্যেই আপ্রাণ খোঁজ করে বাড়ি বদলে ফেলল সুবীর। কার্ডিককেও এক ছুঁতোয় কিছু টাকা বেশি গুঁজে দিয়ে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিল।

পুরোনো সব কিছু থেকে সংযোগ ছিন্ন করে উঠে এল সে এখনকার এই বাড়িতে। কাজ শুরু করল মহেন। একেবারে নতুন পরিবেশে নতুন ভাবে বেঁচে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল। সুবীর। বহুদিন পাতা-ঝরা শুকনো চেহারায় থাকবার পর হঠাৎ যেন তার জীবন-বৃক্ষে নব বসন্তের ছোঁওয়ায় ডালে ডালে নতুন পাতায় কুঁড়ি গজালো। নিজেকে সে যেন আবার ফিরে পেতে লাগল ধীরে ধীরে।

তখন তার কানে আবার চড়ুইয়ের অযথা কিচির-মিচির মধুর লাগল, রাস্তার পাশে নধর কোনো কুকুরছানা দেখে মন বল উঠল, আহা! সংসারের যাবতীয় তুচ্ছ অকেজো জিনিসকেও তার মনে হতে লাগল অর্থপূর্ণ। এবং সব থেকে বেশি অর্থময় মনে হতে লাগল তার নিজের অস্তিত্ব। বেঁচে থাকায় যে এত আনন্দ তা যেন এমন ক'রে এর আগে কোনোদিন টেরই পায়নি।

একদিন ইলাকেও নিয়ে এল সুবীর নতুন বাড়িতে। তার আগে অ্যালবাম থেকে রঞ্জিতার যেখানে যা ছবি ছিল সব বিদেয় করল, এমন কি নেগেটিভগুলো পর্যন্ত কাগজে জড়িয়ে ছুড়ে ফেলল ডাস্টবিনে।

ইলা এসে ঘরবোর দেখে ভারি খুশি হল। বলল, 'চমৎকার সাজিয়েছ তো!

'আর্টিস্ট কিনা!' সুবীর গর্ব করার ভান ক'রে সার্টের কলার দু'হাত দিয়ে টান করে তুলল।

'অনেক আর্টিস্টকেই অগোছালো ভাবে থাকতে দেখেছি।' ইলা তার গৌরব করাকে আমল না দিয়ে বলল। তারপর একটু থেমে আবার জুড়ে দিল, 'আসলে ঘর হল মনের আয়না। পরিষ্কার ঘর মানেই মনটাও তোমার পরিষ্কার। নাকি কিছু লুকিয়ে রেখে আমাকে বোকা বানাচ্ছ?' হঠাৎ সে চোখের ওপর চোখ তুলে হাসি টেনে প্রশ্ন করল।

বুকের মধ্যে ধক ক'রে একটা ধাক্কা লাগল সুবীরের। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'কী যে বল! তোমার কাছে কিছুই আমার লুকোবার নেই।' বলে সে ইলার বাহুমূলে আঙুল ছুঁইয়ে উচ্চারণ করল, 'সত্যিই বলছি।'

'থাক, অমন ক'রে বলতে হবে না। তুমি বলছ, এই আমার যথেষ্ট।' ইলা গলা নামিয়ে গভীর স্বরে বলল, 'কাউকে বিশ্বাস না করলে বাঁচব কী করে? দেখছি তো বন্ধুবান্ধবদের, নিজের সঙ্গেই যেন সারাদিন কানামাছি খেলছে ওরা। সে জন্য আমি ভাবতেও পারি নে।'

'আমিও।' সাগ্রহে জবাব দিল সুবীর। তার মনে পড়ল, রঞ্জিতার সঙ্গে মেলামেশা করার অভ্যাসটি। কী জ্বালাতেই না জ্বলেছে একটি মানুষ-খুন-করা আলেয়ার পেছনে ছুটে। কিন্তু সে কথা তা আর কবুল করা যায় না। সুবীর তাই চটপট জুড়ে দিল, 'আমিও ঐ ভয়ে মেয়েদের থেকে দূরে থেকেছি।

'সত্যি বলছ তো? না না, আর গা ছুঁয়ে বলতে হবে না, আমি বিশ্বাস করছি।' একটু থেমে ইলা আবার

বলল, 'আসলে কী জানো, বিশ্বাসই আমি করতে চাই, সেইটেই আমার মনের স্বভাব। কিন্তু পাছে অপাত্রে বিশ্বাস রাখি, পাছে আমাদের শেষ পর্যন্ত অমিল ফুটে ওঠে, এই ভয়েই আমি পিছিয়ে যাই।'

—'এখনও আবার পিছোবে না তো?'

'মনে তো হয় না। অন্তত তোমার কাছ থেকে কোনো আঘাত না আসা পর্যন্ত তো নয়ই।' ইলা অল্প একটু হেসে বলল, 'আমি কিন্তু ভয়ানক সেন্টিমেন্টাল সেটা মনে রেখো। আর কারো দিকে তাকালে কিন্তু আমি তা সইতে পারব না!'

'পেয়ো না,' সুবীর উঠে এসে তার কপালে ঠোঁট ছুইয়ে বলল, 'তুমিও তাকিয়ো না।'

ইলা মাথা নেড়ে হাসল। তারপর পরম নির্ভয়ে তার বুকের পাশে মাথা রাখল।

সুবীর এবার তার চিবুকের নিচে হাত দিয়ে মুখটি তুলে ধরে চুমো এঁকে দিল।

গভীর আবেগে চোখ বুজে ইলা হাওয়ার শব্দে উচ্চারণ করল, 'আমার রাজা!'

॥ ৭ ॥

মাসখানেকের মধ্যেই বিয়ে হ'য়ে গেল ওদের।

নতুন সংসারে এসে ইলা যেন একেবারে রাণির মতো সবকিছু আলো করে বসল। এবং সে আলোর ছটায় কেবল বাইরের ঘর-দোরই নয়, সুবীরের মনটাও যেন উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

সব কাজেই ইলাকে সে পেতে লাগল তার পাশে। ইলা যেন তার আশ্রয়, তার উৎসাহ।

এবং বছর খানেকের মধ্যেই তার মনে এমন অবস্থা তৈরি হল যেন ইলার জন্যেই সে এতকাল বেঁচে ছিল।

ইলা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, কবেকার সেই বকুল শহরে হারিয়ে যাওয়া কিশোরের মন। তার চারপাশে এখন মানুষের পরশ, বুকের মধ্যে বিশ্বাস। যে জীবনে সে কোনোদিনই যেতে পারবে না বলে ধরে নিয়েছিল, আর যেখানে না যেতে পেরে তার বুকের ভেতর থেকে আর্তনাদ করে উঠেছিল শয়তানের হাহাকার, সে জীবন এখন যেন তার হাতের মুঠোয়। এক অপরূপ শান্তিতে ভরে উঠছিল তার মন কানায় কানায়। নিজেকে তার মনে হচ্ছিল যেন, ভাগ্যবান!

হঠাৎ এরই মধ্যে একি দুর্ঘটনা!

দুর্ঘটনা ছাড়া একে আর কী বলা যেতে পারে? যখন সে এই সুখের সংসারে এক অনাগত শিশুর অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত, যখন তার জীবন পেতে যাচ্ছে সত্যিকার একটি পূর্ণতা, তখন, ঠিক তখনই কেন উদয় হলেন ঐ ডাক্তার বাগচি!

সে দিন নার্সিং হোম থেকে ফিরে নিঃসঙ্গ বারান্দার ডেক-চেয়ারে বসে সারারাত ধরে ক্ষতবিক্ষত হল সুবীর এই প্রশ্নে। শেষে রাত যখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, রাহু যখন তার চরম বিপর্যয়ের মুখে, তখন, আজ অনেক দিন পর, বার করল সে হুইস্কির বোতল।

ইলা বারণ করে নি কোনো দিন। কিন্তু সুবীরের ঠিক যেন ইচ্ছে হতো না।

অথচ আজ তার এমন নিরাশ্রয় লাগছিল যে মদ ছাড়া সে আর নিজের মনের চাপ কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারছিল না।

সুবীর স্পষ্টই বুঝতে পারছিল যে, ইলার সঙ্গে ডাক্তার বাগচির দেখা হলেই ঘটে যাবে চরম বিপর্যয়। ডাক্তার তো ধরেই নিয়েছেন, সুবীর আরতি অর্থাৎ কিনা রঞ্জিতাকেই বিয়ে করেছে। তাই তো উনি আজ সন্ধ্যায় নার্সের কাছে নতুন বাবা হওয়ার কথা শুনে এমন করে হাসলেন। যদি ডাক্তার বাগচি ইলাকেই মনে করে

বসেন রঞ্জিতা, এবং সেই ভাবেই তার সঙ্গে কথা বলে বসেন? কিম্বা উনি যদি ইলাকে আগে মেরে বলেই বুঝতে পারেন, এবং সেই জানার বুক-কাঁপানো কৌতূহলটা টের পেয়ে যায় ইলাও?

শিশুর খেলা-করা বুদ্বুদের মতোই এক ঝটকায় তবে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে তার সাজানো সংসার।

এবং এক নিমেষেই তাকে লুকে নেবে পুরণো দিনের সেই অশান্তির ভাইনিটা। আর দিনের পর দিন এক বিশ্বাসহীনতার শুকনো নিশ্বাস তাকে ঘোমাই-ধরা মাটির মতো ঝাঁজরা করে ফেলবে।

তুমি একটি ইডিয়ট, আরও একবার গর্জন করে উঠল সে নিজের প্রতি, ইলা তোর ক'বল বলেই তুমি রাজি হলে কেন?

এখন এ বিপদ তুমি সামলাবে কী করে?

তোর নাগাদ হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল ঝনঝন করে।

রীতিমত চমকে উঠল সুবীর। নিজের মধ্যে সে এমন ভাবেই তলিয়ে গিয়েছিল টের পায়নি।

'কী? নার্সিং হোম থেকে?' সুবীরের গলা স্পষ্টই কেঁপে উঠল এবার, বলল, 'হ্যাঁ মজুমদারই বলছি। কেন? ও, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আসছি। এক্ষুনি আসছি!'

ইলাকে রাত দুটোয় নেবার কথা নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে। কেসটা মনে হচ্ছে একটু জটিল। ডাক্তার সোম এসে গেছেন। ভয়ের অবশ্য কিছু নেই।

তা থাকবে কেন, ঠাট্টা করার জন্যে টেলিফোন করেছে এই ভোর পাঁচটায়। মনে মনে খিঁচিয়ে উঠল সে মেট্রনের ওপর। —আমি কটি খোকা কিনা, বুঝিনে কিছু। যতো সব—!

তাড়াতাড়ি জামা গায়ে গলিয়ে, মহেশকে ডেকে তুলে দিল সুবীর। তারপর চটি ফটফট করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে বলতে গেলে একরকম প্রায় দৌড়েই নেমে গেল সে।

'এই যে, মিষ্টার মজুমদার এসে গেছেন।' সুবীরকে দেখতে পেয়ে ডাক্তার সোম বললেন, 'একটু কমপ্লিকেটেড কেস মনে হ'চ্ছে। মনে হচ্ছে সিজারিয়ান করতে হবে। আপনার মত আছে তো?'

'মত?' সুবীর থাবি খেয়ে বলে উঠল, 'থাকবে তো?'

'আশা তো করি।' ডাক্তার মাথা ঝাঁকালেন, 'তবে অপারেশানটা ঠিক এখনই নয়, আরো ঘণ্টাখানেক দেখে করা যেতে পারে।'

সুবীর বোকার মতো ঘাড় নাড়ল।

যেন তার মতের ওপরই সবকিছু নির্ভর করছে!

সুবীর হাত দিয়ে মাথা টিপে গতকালের সেই ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসে পড়ল।

তার স্পষ্ট মনে হতে লাগল, তার অপরাধেই ঘটতে যাচ্ছে মস্ত বড় একটা অঘটন। সে সত্য চাপা দিতে চেয়েছে। সে নিধার মুখকে তুলিয়ে তাবে ফেলেছে একটি অসহায় মেয়েকে।

সে অন্যায় করেছে।

তাই তো তার ওপর নেমে আসছে শাস্তির খড়্গ।

সিগারেট ধরাতে গিয়ে সিগারেট ধরাতে পারল না সুবীর। হাত কাঁপতে লাগল। আঙুলের ডগা কেমন যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে উঠল। অস্থির ভাবে উঠে সে পায়চারি করতে চাইল ঘরের মধ্যে। কিন্তু কপালে তার ঘাম জমে উঠল। অবসন্নের মতো বসে পড়ল আবার সোফার ওপর।

—'মিস্টার মজুমদার!'

ভয়ানক ভাবে চমকে উঠল সুবীর।

দরজায় দাঁড়িয়ে মেট্রন।

—'ডক্টর সোম একবার ডক্টর বাগচির সঙ্গে কনসাল্ট করতে চাইছেন।'

—'ডক্টর বাগচি?'

'উনি এ ব্যাপারে একজন বড় স্পেশালিষ্ট।' মেট্রন জোর দিয়ে বোঝাতে চাইলেন।

'ও।' সুবীর আর কিছু বলতে পারল না।

মেট্রন এটাকে সম্মতি মনে করে দ্রুত পায়ে চলে গেলেন।

সুবীর, আর তোমার কোনো উপায় নেই। তুমি গেলে।—মনে মনে উচ্চারণ করল সুবীর। তুমি কাপুরুষ, তুমি প্রবঞ্চক, তুমি বিশ্বাসঘাতক। এবার স্বীকার করিলে ভোগো তুমি, কেউ আর তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

সিগারেটের প্যাকেট বার করল সে আবার পকেট থেকে। কিন্তু ধরাতে পারল না। হাতের মুঠিতে পুরে মোচড়াতে লাগল প্যাকেটটা।

আমি কি পালিয়ে যাব? মনে মনে আবার প্রশ্ন করল সে নিজেকে।

কিন্তু কতোদূরে?

ইলার মৃত্যু কিম্বা অভিশাপের নিশ্বাস কতোদূরে যায়, পালিয়ে গিয়ে কি তাকে সে সারা জীবনও ছাড়াতে পারবে?

তবে কি আমি গিয়ে বলব সব ইলাকে? —অন্য কেউ বলার আগে? নিজে গিয়ে?

হ্যাঁ তাই-ই ভালো। বলব, ইলু, আমার ইলুরাণি, তুমি জানো না আমি কতো বড় একটি নরাধম। আমি মিথ্যা দিয়ে ভুলিয়েছি, আমি বিশ্বাস নষ্ট করেছি। তুমি আমাকে শাস্তি দাও। আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু তার আগে শোনো, কী বিষম আমি বঞ্চিত। আমি সুখ পাই নি, শান্তি পাই নি, আপন করে কাউকে পাইনি। আমি বিশ্বাস পাইনি। আমার বুক ঢালা ভালোবাসাকে একজন দুয়ারের নিচে পিষেছে। আমি পিষ্ট, নিষ্পেষিত, প্রবঞ্চিত। তুমি আমাকে বাঁচাও।

আমি অন্যায় করেছি, ইলা, আমার চেয়ে তা কে বেশি জানে? কিন্তু আমার যে কেউই ছিল না, কিছুই ছিল না, সে কথা তো তুমি বুঝবে! আমি যে মানুষের সংসারে জন্তুর মতো বাস করছিলাম, আমার সেই গ্লানি আর প্রতিমুহূর্তের আর্তনাদ তুমি মন দিয়ে একবার অনুভব করো ইলু। আর, তারপর বল, আমি কি অন্যায় করেছি?

বিশ্বাস ছাড়া আমি কী করে বাঁচতাম বল তো? কেউ কি বাঁচে।

তুমিও তো দেখেছ এমন বিশ্বাসহারা ভুতুড়ে মানুষ, বল, সে বাঁচা কি বাঁচা? নাকি নিজের সঙ্গেই নিজের এক দিন-রাতের জুয়ো-খেলা! সেই আততায়ী জীবনের অমানুষিকতার দিকেই কি তুমি আমাকে ঠেলে ফেলে দিতে চাও? তুমি কি আমাকে টেনে তুলবে না, বাঁচাবে না? আমাকে তুমি বাঁচাও ইলা, আমি শরণাগত।

সত্যি, এই কথা বলবার জন্যেই যেন বাইরে পা বাড়াল সুবীর। আর তখনই তার দেখা হ'য়ে গেল মেট্রনের সঙ্গে। তিনিও প্রায় ছুটে আসছিলেন এইদিকেই। সুবীরকে দেখে বলে উঠলেন, 'গুড নিউজ। এমনিতেই ডেলিভারি হ'য়ে গেছে। ছেলে হ'য়েছে। ডক্টর বাগচিকে বারণ করে দিয়েছি।' বলেই মেট্রন আবার উল্টো দিকে চলে গেলেন।

'ওঃ!' প্রায় যন্ত্রণার মতোই দারুণ এক স্বস্তির অভিব্যক্তি বেরিয়ে এল সুবীরের মুখ দিয়ে।

ওয়েটিং রুমে ফিরে এসে সে বালির বস্তার মতো ধ'সে পড়ল সোফার ওপর। মনে মনে বলল, ভাগ্যি ইলাকে ও-সব বলিনি! বললে কি আর ওকে ফিরে পেতাম! নাকি ফিরে পেতাম এই বিশ্বাস দিয়ে গড়া বেঁচে থাকার মতো জীবন!

কোণের ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট থেকে দোমড়ানো সিগারেটের প্যাকেটটাই আবার সযত্নে তুলে নিল সুবীর।

॥ রম্য রচনা ॥

যদি বলতে পারতেম, 'আমার কথাটি ফুরলো, নটে গাছটি মুড়লো।' তা হলেই হত ভালো। যেটা শেষ সেইটেই শুরু। অতএব এক লাইনেই শেষ করে দিতে পারলে, আমি শান্তি পেতাম। সেই একদিন যে বুকের ছটফটানি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, নাকি বলতে পারা যায়, এই আমাকে লোভ দেখিয়ে ঘর থেকে বার করে নিয়ে গিয়েছিল যৌবনের সেই আমি, যৌবনের সেই আমি আর নেই, এখন এই আমি অনেকখানি শুদ্ধ, অসীম থেকে ফিরে এসেছি সীমানার মাঝে।

অথবা যদি বলতে পারতেম, ক্ষমা করো প্রভু, আর পারি নে, আমার সেই শেষ গানটি দিয়ে তোমার চরণে ও শেষ নিবেদন রেখে এসেছিলেম,—'দিলে সাজা, সবার রাজা—এবার আমায় নাও।' সেইখানেই ত আমার কোলে মাথা রেখে রাধা আমার ম'ল। তোমার সব খেলা বুঝি নে প্রভু, তাই শুধু দেখতে পেয়েছিলেম, রাধার চোখ দুটো বুজে আসতে। আর অনুভব করেছিলেম, আমার দু চোখ জলে ভরে গিয়েছে। তারপরেই তা টপটপ করে ঝরে পড়ল।

সেই চিরকালের বিবাগী মন আমার, আবার ঘরছাড়া হল। হল দিশেহারাও। আবার নীল আকাশের নীচে মুক্ত বায়ুর প্রাঙ্গনে নেমে এলাম। পথ বললে, এসো। তাই আবার আমি চলতে শুরু করলাম।

বুঝতে পেরেছিলাম, শেষ কথাটির বুঝি কোন শেষ নেই, তাই সেই ঘাটের অন্তিমুক্তের মধ্যে রাধাকে শুইয়ে রেখেছিলাম, সেই ঘাটের অনেক দিন রাত্রির নিভৃতে বসে থেকেও রাধার যে আর কোনদিন দেখা পাইনি, সেই না পাওয়ার বেদনায় জীবনটা যেন মধুর হয়ে উঠল। তাই রাধা আমার শুয়ে রইল, আমি চললুম পথের পানে।

আর কোনদিন আমার চোখে জল আসেনি রাধার জন্য। আমার বুকের সেই জ্বালা সয়ে নিতে পেরেছিলাম। হে ত্রিভুবনেশ্বর সবই তোমার ইচ্ছে।

তবু একদিন আবার নিজেই বুঝলাম, এ মায়ামর সংসার ত সহজে ছাড়ে না। যাকে নিয়ে যা' তা' করিয়েই নেই।

গহনপুরের মেলায় সবে মাত্র গান শেষ করে দাঁড়িয়েছি, তাকিয়েছিলাম আকাশের দিকে, ততক্ষণে মন আমার চলে পড়েছিল বিশ্ব প্রকৃতির চরণে। হঠাৎ চমকে উঠলাম। কে যেন বলছে,—'বাবা গো, বাবা, তোমাকেই খুঁজছিলাম।' মনে হল যেন আমাকেই ডাকছে কেউ। চেয়ে দেখলাম হ্যাঁ, ডাকছে আমাকেই। ডাকছে ইস্টিশানের মা। ওর-মুখখানার দিকে আরো ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, তেমন ছোটটি আর নেই মেয়েটা। আরো অনেক বড় হয়েছে এখন। যুবের নাগাল পেয়েছে, তেমনটাই মনে হল।

বললাম,—'তুই বেটি আবার ঘুরছিস মেলায়, যা ঘরে যা, আর বেরুস নি।'

—'তোমাকে খুঁজতে এসেছিলাম বাবা, তোমাকেই খুঁজছি, জানতাম গহনপুরের মেলায় তুমি আসবে।'

আসব ত ঠিকই। কিন্তু আবার আমাকে কেন?

আমি কি হারিয়ে যেতে পারব না এই ব্রহ্মাণ্ডের মুক্ত এলাকার মাঝে! কেবলি ডাকে। কে ডাকে?

বললাম,—'ইস্টিশান তোমার কত বড় হয়েছে গো?'

—'তা বাবা, দেখবে চলো।'

আবার ডাকে! কোথায় যাব? গৃহস্থের ঘরে। সংসারী মানুষের আড্ডায়! সুখের আশায়? শান্তির প্রলোভনে? না, যাব না। মনটা ভিতরে ভিতরে চীৎকার করে উঠল। কেন, আর আমাকেই বা কেন? সংসারে কি আর মানুষ নেই?

বললাম,—'তোমার সোনার চাঁদকে দেখতে বড় সাধ লাগে, কিন্তু যাবার যে উপায় নেই গো।'

—'বাবা, ভেবেছিলাম যে, তোমাকে সেবা করব দুদিন।'

মেয়েটা মুখ নিচু করে ছিল। মনে হল বুঝি বা কাঁদছে। এ আবার কি? বললাম,—'চল তবে যাই তোমার ওখানে।'

চললাম। আবার সেই যাওয়া। বুঝলাম, নিজের কাছে নিজে একদিন বড় বেশী কঠিন প্রস্তাব রেখেছিলাম। বলেছিলাম,—এই উদার আকাশের নিচে মুক্ত বায়ুর ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে চলব। ভেবেছিলাম, এই বিশ্ব সংসারের যাবতীয় মানুষ আমার আপনজন। শুধু ঘরের দিকে বিমুখ থাকব। পথই আমার আপন হবে। আমি যখন গাইতে পারব না, তখন গাছের নিচে বসে পাখিদের গান শুনব। সেই গান থেকে মনে মনে রচে নেব নিজের জন্য নূতন গান। কিন্তু হল না। তাই চললাম।

মনে পড়ল সেই ইস্টিশানের কথা। ইস্টিশানের নামটা আজ ভুলে গেছি। অনেক মাঠ বন ঘাট ছুটে পেরিয়ে এসেও শেষ রাতের শেষ গাড়িটা ধরতে পারলাম না। যাব চৈতের বেলায়। শেষ গাড়িটা ধরতে পারলে ভোরের মুখেমুখে গিয়ে পৌঁছতে পারতাম। কিন্তু হল না। পিছে যাবারও তাগাড় নেই। যাব কোথায়? যেখানে রাত সেখানেই যে কাত। অতএব, কাঁধের পোটলা-পুটলি রেখে বললাম। আবার গাড়ি আসবে সেই ভোরে। এ ছাড়া আর গতি নেই।

আমি যাব পশ্চিমে। তাই আমাকে বসে থাকতে হল। পুবে যারা যাবে, তাদের গাড়ি ছিল। বোধহয় সে গাড়ির অপেক্ষাতেই দু-চারজন তখনো সেখানে ছিল। এক সময় পুবের গাড়িটা এলো এবং চলে গেল।

আমি তখন আবার পোটলা-পুটলি জড়িয়ে কাত হয়ে ছিলেম। ঘুম আসছিল না। আসবার কথাও নয়। মনটা দমে গিয়েছিল কি না! এলাম ছুটে। কিন্তু এসে থেমে গেলাম। কার লীলায় যে এমন হয়!

মফস্বলের ইস্টিশান। পুবের গাড়িটা যেতে যেতেই চারিদিকে বাতিগুলি গেল নিভে। মনে হয়েছিল সেই অন্ধকারে একাকী যেন যার লীলায় এত হল, সেই লীলাময়ের কোলে আশ্রয় পেলাম। অদূরে শিয়াল দুকুরের সম্মিলিত সুর সেই রাত্রির অন্ধকারকে ক্রমাগত বিদীর্ণ করছিল। আশে-পাশে কোথায় যেন মানুষেরও সাড়াশব্দ পাচ্ছিলাম।

ভোরের আগে ত আর কোন গাড়ি নেই। তাই ঘুম নেমেছিল চোখে। হঠাৎ কোথায় যেন মানুষের গোঙানীর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঝিঁঝি পোকার একটানা রব। শিয়ালের কণ্ঠে প্রহর ঘোষণার বিচিত্র রব। সব মিলিয়ে আমি যেন কেমন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। সেই গোঙানীর শব্দ যেন কেবলি বাড়ছিল। কান পেতে শুনতে লাগলাম তা। সত্যি, তাই। মানুষই বটে। মনে মনে ভাবলাম, হায় ভগবান, এই নির্বিঘ্ন নিঝুম অন্ধকার, যেখানে তুমি ছাড়া আর সব কিছু অনুভবের বাইরে, সেখানেও মানুষ।

আবার শুনলাম সেই আর্তকান্না। বুঝলাম, মানুষ বুঝি মৃত্যুর আগেই শুধু এমনি করে কাঁদে! উঠতে হল। কাছাকাছি আলো বলতে জোনাকীদের খেলা চলছিল। সেত আর আলো নয়, আলেয়া। সেই আর্তকণ্ঠস্বর অনুসরণ করে করে এগিয়ে চললাম। গিয়ে দেখি, সত্যি মানুষ। তা-ও আবার মেয়েমানুষ। পুরুষমানুষও রয়েছে একজন। সে শুধু মানুষই, আর কিছু নয়। মনে হল সেই পুরুষমানুষটা বুঝি ভয়ে বিস্ময়ে অসহায় হয়ে পড়েছে। বললাম, 'কী হয়েছে, কী হয়েছে বল?'

মেয়েমানুষটার গোঙানী চলছিল তেমনি। কিন্তু পুরুষ-মানুষটাকে মনে হল, সে যেন, একবার কেঁপে উঠে থেমে গিয়ে বলল—'কে বাবা আপনি?'

শোন কথা! নিজের দুঃখের শেষ নেই, আবার আরেকজনের পরিচয় শুধাচ্ছে। বললাম,—'আরে, কি হয়েছে তোমাদের?'

এবারে মেয়েমানুষটা বলল,—'পেটের শত্রু বার হবার যাতনা দিচ্ছে গো, আর যে পারি না।' সে তেমনি আর্ত-কান্নায় জড়ানো কণ্ঠেই কথা শেষ করল।

এ আবার কি বিপদ। পুরুষ কণ্ঠ এবার একটু সতেজ হল। বলল,—'একটু জল কোথায় পাব বলুন দিকিনি বাবা।'

জল! ছুটলাম গাঁয়ের ভিতরে। মানুষ ঘুমে। গ্রামসুদ্ধ মানুষ সবই অচেতন। শুধু নিশাচরদের প্রয়োজন বোধে ছুটোছুটির পালা। তবু এক গৃহস্থের ঘুম ভাঙালাম। মনে মনে হয়ত সে সময় কোন বিধাতাপুরুষকেও ডেকে-ছিলাম। সেই গৃহস্থ, আহা তার বোধ হয় এ সংসারে কোন তুলনা নেই। সেদিন সেই নিঃসঙ্গ অন্ধকারে ইস্টি-শানের মাঝে সেই মহিলা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছিল।

এই সেই মহিলা। ভোরের মুখে আলো ফুটতে ফুটতে আমরা সেদিন আমাদের ঘুম দেখেছিলাম। সেই রাত্রির ভয়ঙ্কর স্মৃতি কোনদিন ভুল হবে না। মনে থাকবে। চিরকাল মনে থাকবে। জীবনের এই পথ হাঁটে মাঠ সম্বল করে চলে অনেক স্মৃতিই মাঝে মাঝে মনের কোণে উঁকি মারে, কিন্তু এমন করে জড়িয়ে ধরে না আর কোন স্মৃতি। সব স্মৃতিই মনে পড়ে, আবার সরে যায়। মনে মনে ভাবলাম, আবার কেন?

সেদিন ওদের কথা থেকে সব বুঝে নিয়ে ছিলাম। ওরা যা বলেছিল, তা এই রকম।

সঙ্গের পুরুষটির নাম কীর্তনলাল। যাচ্ছিল ওরা গহনপুরের হাটে। মেয়েমানুষটির যে হবে, তা ওদের জানাই ছিল। সময়ও যে নিকটে সে বোধও ওদের পুরোমাত্রায় ছিল। তবু ভেবেছিল হয়ত সেরে নিতে পারবে। যেটুকু সময় হাতে আছে তাতে ফুলিয়ে নিতে পারবে। ওদের এই ছিল আশা। সেদিনের সেই পুবের গাড়িতেই ওরা নেমেছিল এখানে, তারপর অন্য দিকের গাড়ি ধরে যাবে বেলায়। মনে আশা নিয়ে গিয়েছিল, গহনপুরের প্রত্যক্ষ দেবতার আস্তানায় মাথা কুটবে, একটা ছেলের জন্য। কেষ্ট ঠাকুরের মত পুত্র। সেই মানত জানাতেই ওরা যাচ্ছিল। কিন্তু গিয়ে আর পৌঁছতে পারল না। মাঝপথেই শত্রুতা সুরু করল ছেলে। ওদের আশা অপূর্ণ থাকেনি।

ভোরের দিকে যখন গাড়ি ধরবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন কীর্তনলাল প্রায় কেঁদে কেঁদে বলল,—'বাবাঠাকুর, বুঝেছি আপনিই নয়, সবই আপনার খেলা, ভগবানকে ডেকেছিলাম, তাই আপনাকে পেলাম, নইলে……।' বলতে বলতে সেদিন কেঁদেই ফেলেছিল সে।

আমার হাতে আর তখন সময় ছিল না। যেতে হবে গহনপুরের বেলায়। জানতেম, চৈত্রের দুপুরে বাতাস হয়ে উঠবে রুক্ষ, ধুলো উড়বে দিক হতে দিগন্তরে। তার আগে আর সেখানে যেয়ে নামতে পারব না। তারপর একটু থেমে আবার কীর্তনলাল বলল,—'ছেলের আমি নাম রাখব ইস্টিশান,-ফিরে বছর ঘিরে গহনপুরের মেলায় দেখা করব বাবার সঙ্গে, তখন মনে করিয়ে দেব ইস্টিশানের কথা, ভুলে যেওনি যেন।'

সেই গাড়ি ধরেছিলাম। তারপর ভুলে যেতে আর কতক্ষণ। জীবনে কোনদিন ত মনে হয়নি একটু বসি, একটু ভাবি, নিজেকে একটু সান্ত্বনা দিই। তাই ভুলে থাকতে থাকতে একদিন যেমন মনে পড়ে, আবার তেমনি মনে পড়তে পড়তেই ভুলে যাই: যাঁর কাছে মন সঁপেছি শুধু তাঁকে ভুলতে পারিনে।

আজ আবার আমার সেই অলক্ষ্য বিধাতার কার-সাজিতেই বোধ হয় দেখা হয়ে গেল সেই ইস্টিশানের মা'র সঙ্গে। বললে,—'বাবা, দুদিন আমার ঘরে থাকবে চলো, তোমার সেবা করব, আমার ইস্টিশানের মঙ্গল হবে।'

ঘরে থাকব! ঘর ত আমার জন্য নয়। অনেক করে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করেও মনটাকে ঠিক করতে পারলাম না। আমি চলব পথে পথে, সঙ্গে যাবে আকাশ

যাওয়া। যেখানে রাত হবে, সেখানে থাকা হবে, এইত আমার সাধ, এইত আমার জীবনের ভোগ। ইস্টিশানের মা বললে,—'জানতাম তোমাকে এখানেই পাব, এই বেলায়, ঠাকুরের আস্তানায়, তাইত ছুটে এসেছি।'

জানতে! হয়ত জানতে। শুধু জীবনের কিছুই জানা হল না আমার। কোথা দিয়ে যে কোথায় চলে যাচ্ছি, তারপর কোথায় যাব, আবার কোন ইস্টিশানে রাত কাটাতে হবে জানিনে।

মনটা বলল, চল, পালিয়ে চল। কিন্তু কে যেন আটকিয়ে রাখল। পা বাড়ালাম, কিন্তু এগুলো না। আবার তাগিদ দিল মন। আবার আমি বিপদ বোধ করলাম। মেয়েমানুষটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম,—ওর চোখে জল। একি! এ আবার কি বিড়ম্বনা।

বললাম,—'মাগো তোমার ছেলে বড় হবে, অনেক বড় হবে, শতেক বছর আয়ু হবে, যাও মা ঘরে ফিরে যাও, আমি একদিন যাব তোমার গাঁয়ে।'

চোখের জলে মেয়েটি বলে উঠল,—'না না বাবা আমার সঙ্গে যেতে হবে, ইস্টিশানের বাবা যে বসে আছে।' কি কঠিন মায়া। আর পারি নে। এরা কেন আমায় মনে রাখলে! কি দরকার। আমি কি! আমি ত কিছু করিনি। জানিও না। যার কাজ সে করেছে। গাড়ি যারা কেল করেছিল সে তারা সেদিন ইস্টিশানে বসে বসে ঘুমেছে। আমিও ঘুমেছি।

মেয়েটি আবার বলল,—'যেতে এখুনি সময় যে আর নেই, রাত হয়ে যাবে না?'

চললাম। যেতে হল আমাকে।

শারদীয়া সংখ্যার পর আগামী

'দীপান্বিতা'

সাধারণ সংখ্যা ১লা নভেম্বর প্রকাশিত হবে।

সবাক্ চলচ্চিত্রের আদিপর্ব

অম্লিন্ন সান্যাল

সুধানী বৈজ্ঞানিকের চোখে যেদিন আলোক প্রজ্জ্বলিত করার কৌশল ধরা পড়লো, বিজ্ঞানী যেদিন আবিষ্কার করলেন ক্যামেরা ফোটোগ্রাফির অমিত শক্তি—সেদিন সূচিত হল চলচ্চিত্র অভিযানের প্রথম অধ্যায়। রাত্রি আর দিনের অগণিত মুহূর্তগুলিকে মানুষ করল জয়, তারপর ধীরে ধীরে এ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে লঙ্ঘন করলো পৃথিবীর দূরত্বের সীমারেখা। বৈজ্ঞানিক এডিসনের এ আবিষ্কার মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে একটা অবিস্মরণীয় দান। মানুষের জীবন অমিত আত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানই যে সকল শক্তির উৎস বিশে শতাব্দীর বিজ্ঞান অক্ষরে অক্ষরে সে প্রমাণে সাক্ষ্য দান করেছে। অজানাকে জানার বাসনা, দূরকে নিকটে গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা অমিত মানুষকে তাই চঞ্চল করে তুলছে। মানুষ চলছে ছুটে প্রকৃতির দুর্গম পথে—পথের পাথেয় জ্ঞানের একটি প্রদীপ। জ্ঞানই তার অমিত শক্তি। বিজ্ঞানের এ অগ্রগতি নানাভাবে মানুষের শিল্প সংস্কৃতিকে পুষ্ট করেছে। প্রকৃষ্ট এক উদাহরণ সিনেমা বা চলচ্চিত্র। বিজ্ঞান-নির্ভর এ মাধ্যমটি সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে এক চরম হাতিয়ার। ইচ্ছা করলেই এর আশ্চর্য সহযোগিতায় আমরা শিল্পের শেষ উৎকর্ষ সাধন করে মানুষের দুর্গম মনের দরজায় পৌঁছে দিতে পারি সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বাণী। প্রত্যাহের অবরোধ থেকে যা আনবে মানুষের মুক্তির মূলধন। শিল্পের সকল ধারাকে চলচ্চিত্র করে সমন্বিত, তাই সকলের সংযোগেই এর জীবন। যৌথ শিল্প কথাটি চলচ্চিত্রে যেভাবে প্রযোজ্য, ততখানি বোধহয় আর কোনো শিল্পের ক্ষেত্রেই নয়। এদিক থেকে চলচ্চিত্রের ক্ষমতা অ—পূর্ব।

চলচ্চিত্র নিঃসন্দেহে শহরে জীবনের নির্দর্শন। বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক বড় বড় শহরে প্রেক্ষাগৃহের সামনে মানুষের লম্বা সারি সে-কথাই মনে করিয়ে দেয়। চলচ্চিত্র একটা বিশেষ ধরনের আর্ট বা শিল্প-সৃষ্টি। মানুষ সামাজিক জীব এবং চলচ্চিত্র স্রষ্টা যিনি তিনিও সামাজিক মানুষ। সুতরাং মানব সমাজের পটভূমিতে যে জীবন দাঁড়িয়ে আছে, সাহিত্যে যেমন যায় তারই নানা অভিব্যক্তির আঙ্গিকে প্রতিফলন। এই সমস্ত আঙ্গিকে প্রতিফলনের জীবন দর্শন প্রত্যক্ষ করে থাকি আমরা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। এত সমস্ত জল্পনা আর অস্থির বৈশব কাটিয়ে চলচ্চিত্র তার জন্মলগ্নের ইতিহাস প্রচলিত শিল্পকলার বয়সের তুলনায় নিতান্তই কম বলে গোড়ায় আটের কৌলিন্য পায়নি। বয়সে প্রবীণ বা নবীন যাই হোক না কেন, এর মত সর্বকালীন শিল্পরূপ পৃথিবীতে দু'টি মিলবে না। অথচ এর জন্মলগ্ন কত দিনেরই বা। তবে ইতিহাসে সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা সম্ভব না হলেও চলচ্চিত্র চিন্তায় অনুসন্ধিৎসু মানুষ এদিক ওদিকের জীর্ণ দলিল ঘেঁটে অনেক চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ উদ্ঘাটন করেছেন। ভবিষ্যতের ইতিহাস তথ্যের সত্য যাচাই করে একদিন হয়তো বা আগামী দিনের স্থায়ী ইতিহাসের এক কোণে ঘটনাগুলিকে আশ্রয় দিলেও দিতে পারে। জীবন্ত

ছবি বা মুভিং পিকচারস্-এর জন্মলগ্নের লিপিবদ্ধ ইতিহাস বিংশ শতাব্দির প্রথমভাগে—বে-সরকারীভাবে এর পূর্বেও নাকি চলচ্চিত্রের প্রতিপত্তি পৃথিবীর বুকে পরিব্যাপ্ত ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খবর—ভারতবর্ষের দক্ষিণে জাভা-দ্বীপে, চলচ্চিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে একটা প্রবাদমূলক উপাখ্যান থেকে বেশ কিছু স্মরণীয় তথ্যের হদিস মিলেছে। অন্যান্য এক শিশুকে সান্ত্বনা করার পথকে শিশুর মাতা বেছে নিয়েছিলেন রোদ্দুর লাগা দেওয়ালের আড়াল থেকে বীভৎস অঙ্গভঙ্গির ছায়া নিক্ষেপ করা। জীবন্ত ছায়া নিক্ষেপের জন্ম হোলো। জাভাদ্বীপে আর তার শাখা প্রশাখায় বিস্তার ঘটলো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। টুকরো টুকরো অনেক তথ্যই পাওয়া যাচ্ছে যার থেকে আমরা বেশ অনুভব করতে পারি যে এই চলচ্চিত্র বা মুভিং পিকচারস্-এর জন্ম পৃথিবীর মানুষ প্রচেষ্টার কোনো ঘাটতি হতে দেননি।

নীরব চলচ্চিত্র যখন সাফল্যের চরম পর্যায়ে অবস্থান করছে তখন মানুষের মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। কথা কিন্তু একটাই—"ছবির মুখে কথা চাই"। ছবিকে মুখর করবার জন্য এডিশন খুব বেশী তৎপর হয়ে উঠলেন। প্রথমে ছবি তোলার যন্ত্রের সঙ্গে গ্রামোফোন রেকর্ডের সংযোগ করতেন—মাঝে মাঝে ছবির সঙ্গে সংলাপের বেশ গরমিল হয়ে যেত। অল্প কিছুদিন পর ওয়াক্স্ বা মোমের ওপর সাউণ্ড রেকর্ডিং-এর একটি কৌশল আবিষ্কার করলেন এডিসন। এরপর ১৯০৬ সালে ফরাসীর বৈজ্ঞানিক 'ইউজিন লাউকেট' শব্দের এক নূতন ঘর উদ্ভাবন করলেন। শব্দ কম্পনকে বৈদ্যুতিক কম্পন ও পরিবেশে—আলোকের মাধ্যমে কমবেশী পরিবর্তিত আকারে জীবন্ত ছায়াছবির কথা বলার কাজ সম্পন্ন করলেন। লাউকেটের এ প্রচেষ্টা পরিপূর্ণভাবে সফল হতে না পারায় প্রথম পর্বের অভিযানে খানিকটা ভাঁটা পড়ে যায়। শব্দের প্রবরণকে কিভাবে আয়ত্তে আনা যায় তার চেষ্টা চলতে লাগল। এবার এলো বেতার ভালভ্। ডঃ ডি ফোরেস্ট হচ্ছেন বেতার ভালভের আবিষ্কর্তা। ফোরেস্ট আবিষ্কৃত কোনো ফিল্ম পৃথিবীর সর্বত্র কথা কওয়া ছবি হিসাবেই প্রথম প্রদর্শিত হয়। ১৮৮৭ সালে লণ্ডনের এক বৈজ্ঞানিক সভায় বিখ্যাত 'ক্লার্ক ম্যাকস্ওয়েল' বলেছিলেন,'এমন একদিন হয়ত আসবে যেদিন বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটারের সাহায্যে অদৃশ্য লোকের কথাবার্তা শুনতে পাওয়া যাবে'। ১৮৮৭ সালে তাঁর কথা যখন মানুষের মনে পূর্ণ আস্থার সঞ্চার ঘটিয়েছে ঠিক সেই সময় হেনরিচ্ হার্জ লেবোরেটরিতে বসে বিনা তারে বার্তা প্রেরণ করতে লাগলেন। হেনরিচের সাধনার ফলে বেতারের জন্ম হয়েছে। পরে মার্কনী এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকবৃন্দ বেতার বা রেডিওকে বহু পরীক্ষায় ও অধ্যবসায়ে উন্নতির পথে নিয়ে এসেছেন।

আবার আমরা মূল কথায় ফিরে যাচ্ছি। যখন বৈজ্ঞানিকরা শব্দের ব্যাপারে যতদিন এর রহস্যভেদ করতে অক্ষম ছিলেন ততদিন পর্যন্তই শব্দ সমস্যার কোনো মীমাংসা করে উঠতে পারেন নি। ফোরেস্ট-এর প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল অ্যামপ্লিফায়ার ভালভের অভাবে। তাঁর যন্ত্র থেকে শব্দ নির্গত হলেও সে শব্দকে বাড়াবার কোনো উপায় ছিল না। স্মরণীয় ওয়ারনার ব্রাদার্সের কোনো ফিল্ম এর পূর্বে অনেক প্রচেষ্টা ও মূলধন প্রয়োগে শব্দায়োজন (সিনক্রোনাইজড্) ছবি 'ডন জোয়ান' সৃষ্টি করেন। ছবিটির প্রথম প্রদর্শন হয়েছিল এদেরই নিজস্ব প্রোজেকশন থিয়েটার নিউইয়র্কে। ছবিটিকে ভিটোফোন মুখর বা ভিটোফোন টকী নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী পর্বে ডাঃ ফোরেস্ট-ই হলেন টকীর আবিষ্কর্তা।

১৯১৫ সালে টেলিফোনের জন্মদাতা 'গ্রাহাম বেল' বেতার টেলিফোন সৃষ্টি করেন। এ্যামপ্লিফায়ার ভালভের সাহায্যে সেই বছর সারা দুনিয়ার মানুষ বেতার টেলি-ফোনের কথা শুনে চমকে উঠেছিলেন। কোনো লোক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করবেন আর তাঁর ভাষণ ঘরে বসে বা দাঁড়িয়ে একসঙ্গে পাঁচ-দশ হাজার মানুষ শুনতে পাবেন। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষ বিস্মিত না হয়ে থাকতেই পারেন নি—লাউডস্পীকার আর এ্যামপ্লিফায়ার-এর দ্বারাই এ প্রচেষ্টার সম্ভব ঘটেছিল।

যাকে আমরা শব্দ বলি তা ইথারের কম্পন-সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু নয়। বেতার কেন্দ্রে মাইক্রোফোনের

সাহায্যে শব্দ-তরংগ উত্থিত হয়,তাকে প্রথমে বিদ্যুৎ-তরংগে এবং বিদ্যুৎ-তরংগ হতে ইথার-তরংগে পরিণত করা হয়। ইথার-তরংগে পরিণত হয়ে বিশ্বদিগন্তে বিকীর্ণ হতে থাকে। ' বেতারকেন্দ্রে যে যন্ত্র থাকে তাকে প্রেরক যন্ত্র—অন্যদিকে যাঁরা বেতার বার্তা শুনতে চান তাঁদেরও একটা যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, তার নামক গ্রাহক যন্ত্র। প্রেরক যন্ত্র থেকে উত্থিত ইথার-তরংগ গ্রাহক যন্ত্রের সংগে সংশ্লিষ্ট 'আকাশ তারে' এসে প্রতিহত হয়। সেই প্রতিহত তরংগ-ধ্বনিকে গ্রাহক যন্ত্রটি প্রথমে বিদ্যুৎ-তরংগে রূপান্তরিত করে, পরে শব্দ-তরংগে পরিণত করে। তখনই আমরা একস্থান থেকে প্রচারিত কথা, সঙ্গীত ইত্যাদি [illegible] বসে শুনতে পাই। দেখছি, বেতার বার্তা ইলেকট্রন, বিদ্যুৎ ও ইথারের খেলা মাত্র—বায়ুমণ্ডলের তরংগগুলিকে ধরে শব্দে রূপান্তরিত করার একটি সুন্দর কৌশল। প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক ম্যাকসওয়েল উনিশ শতকের শেষ দশকে বেতার তত্ত্বটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর পরিণতি দান করেন।

১৮৮৭ সাল থেকে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক একখানি ছবি বা ফটোকে বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে অন্যত্র প্রতিফলিত করবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। তাঁদের এ প্রচেষ্টার কথা শুনে অনেকেই তখন হেসেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা ১৯০৮ সালে নরওয়ের 'ফুচসেন' নামক জনৈক ভদ্রলোক এ কার্যে সফলতা লাভ করেন। এ সময় থেকেই টেলিফোটোগ্রাফির প্রচলন। এতদূর অগ্রসর হয়েও বৈজ্ঞানিকরা সবাক্ চিত্রকে সাফল্যের পথে আনতে পারলেন না। বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হলো। সবাক চিত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা মাথা ঘামাতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে কেউ বা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কেউ বা এটা নিয়ে কাটালেন জীবনের বহু মূল্যবান বছরগুলিকে। অবশেষে সত্যই এমন একদিন এসে উপস্থিত হলো যেদিন তাঁরা বুঝলেন সবাক্ চিত্র ক্যামেরায় তুলে দেখানো মোটেই অসম্ভব নয়।

বহু উপায়ে শব্দকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত করার চেষ্টা চলবার ফলে মাইক্রোফোনের জন্ম হলো। মাইকের কাজ, দূরের শব্দকে কাছে আনা। এই সঙ্গে বৈদ্যুতিক আর্ক-ল্যাম্প সংযুক্ত করে দিলে বেতার-বার্তা প্রেরণে সুবিধা হয়; কারণ অতি নিম্নগ্রামে উচ্চারিত কথাবার্তা মাইকের অপেক্ষা আলোকেই বেশী কার্যকরী। মাইকের সঙ্গে আর্ক-ল্যাম্প সংযুক্ত করেও বেতার-বার্তা প্রেরণে তেমন কোনো সুবিধা ঘটলো না, মাঝে মাঝে কার্বন দুটো থেকে এমন এক উদ্ভট শব্দ বেরোতে আরম্ভ করলো যার ফলে মাইকের যথেষ্ট অসুবিধা ঘটতে লাগলো। এ সমস্ত কারণে আধুনিক সবাক স্টুডিওতে আর্ক-ল্যাম্পের পরিবর্তে ইনক্যানডিসেন্ট ল্যাম্পের প্রচলন হয়েছে। ১৯২৫ সালে সবাক্ চিত্র তোলবার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এর পূর্বে মহাযুদ্ধের সময় বৈজ্ঞানিক হতে আরম্ভ করে সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি জড়ভরতের ন্যায় নিশ্চলভাবে বসেছিলেন। অবশেষে মিঃ জেসমার 'হুইটসন' নামক জনৈক আমেরিকান সবাক্ চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন। তোবারের পর তোবার তিনি সেলুলয়েডের ওপর শব্দ গ্রথিত করতে লাগলেন। হুইটসনের রেকর্ডিং করবার নিয়ম—একটা প্রজ্বলিত আর্কের আলো কয়েকটা লেন্সের ভিতর দিয়ে গিয়ে লম্বালম্বিভাবে কাটা সরু একটা ছিদ্র (স্লিট) ভেদ করে ফিল্মের ওপরে পড়ত। আর্ক-ল্যাম্পের মুখ থেকে বিন্দু বিন্দু জেম নির্গত হয়ে রেকর্ডিংয়ের কাজে বাধা দিতে লাগলো। কোনো হার মানবো না এই সংকল্পে অটুট হয়ে মিঃ হুইটসন সাটারের ওপর দিয়ে চালিত করে এ যন্ত্রটিকে নিয়মিতরূপে বেঁধে ফেললেন। এতদ্ভিন্ন কেমিক্যালস্ এর সাহায্যে হুইটসন এক রকম ডালডা তৈরি করেছিলেন। ডালডার কাজ বৈদ্যুতিক গতিশক্তিকে প্রয়োজনানুসারে নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু এত চেষ্টা করেও তিনি সবাক্-চিত্রকে নিখুঁতভাবে সাফল্যের পথে আনতে পারতেন কিনা সন্দেহ, যদি না তখন এ্যামপ্লিফায়ার ডালভ মুভিং কয়েল ও লাউড স্পীকারের সাহায্য পেতেন।

সাফল্য অর্জনের পর সকলের মনে তিনি বিস্ময়ের সঞ্চার করলেন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, প্রথমে কোনো চিত্রনির্মাতা সবাক্-চিত্রের কাজে হাত দিতে সাহস করলেন না। এ কাজে এগিয়ে এলেন ওয়ারনার ব্রাদার্স।

এঁরাই প্রথম যাঁরা সবাক্-চিত্র তোলবার ব্যাপারে প্রথম কাজে নামলেন। প্রায় এ সময়েই বা অল্প কিছু পূর্বে ১৯১৯ সালে জর্মনীর এক বৈজ্ঞানিক সবাক্ চিত্র তুলেছিলেন। কেউ কেউ বলেছিলেন সে ছবি নাকি 'ট্রায়োরগন' পদ্ধতিতে তোলা। আসলে ব্যবসায়ের দিক থেকে সবাক্ চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে প্রথমেই সচেষ্ট ছিলেন বৈজ্ঞানিক ফোরেস্ট। পূর্বোক্ত সমস্ত রকমের আবিষ্কারকে চাপা দিয়ে তিনি এক প্রকার এ্যামগ্রিফায়ার ডালভ প্রস্তুত করেন। তাঁর সেই ডালভ জগতের বেতার-ব্যবসায়ীদেরকে বেশ সচেতন করে তুললো।

১৯২৫ সাল থেকে সবাক্-ছবির যুগ দেখা দিল। সেই সময় নানা দেশে, বিশেষ করে জর্মনী, ডেনমার্ক ও আমেরিকায় সবাক্-ছবি দেখাবার যন্ত্র, ক্যামেরা ইত্যাদির প্রচলন শুরু হল। প্রত্যেক দেশের শক্তিমান বৈজ্ঞানিক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে জগতের চলচ্চিত্রানুরাগী ব্যক্তিবৃন্দ সবাক্-চিত্রকে সাদরে বরণ করেন।

১৯২৬ সালের ৬ই আগষ্ট সবাক্-চিত্রের ইতিহাসে এক মহাস্মরণীয় দিন! সেদিন রাত্রে ওয়ারনার ব্রাদার্স 'ডন জোয়ান' নামের একখানা সবাক্-ছবি আমেরিকার দর্শকসাধারণকে প্রথম প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আমেরিকার 'জ্যাজ সিঙ্গার', 'সিঙ্গিং ফুল' প্রভৃতি ছবিগুলি সাফল্যলাভ করতে না পারলে সবাক্-চিত্র কখনই দ্রুত পদ-সঞ্চারে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারতো না। উপরে বর্ণিত ছবিগুলি আমেরিকার ওয়েষ্টার্ণ ইলেকট্রিক কোম্পানীর 'ভিটাফোন' যন্ত্রে রেকর্ডিং করা হয়েছিল। এক একটা রেকর্ডের পরিধি ষোলো ইঞ্চি। ভিটাফোনের অনুসরণে, উইলিয়ম ফক্স্'-এর মুভিটোনের জন্ম হ'ল ১৯২৭ সালে। এবার আর রেকর্ডে নয়, মুভিটোন জন্মাবার ফলে কর্তৃপক্ষেরা ফিল্মের উপরেই শব্দ রেকর্ড করতে পারলেন। এই দুই যন্ত্রের নির্মাতা ওয়েষ্টার্ণ কোম্পানী। এঁদের রেকর্ডিং পদ্ধতির নামকরণ হয়েছিল 'ওয়েষ্টার্ণ ইলেকট্রিক সাউণ্ড সিষ্টেম'। ওয়েষ্টার্ণের পর কার্যক্ষেত্রে নামলেন—আমেরিকার রেডিও করপোরেশন। এঁদের যন্ত্রে ফিল্মের পাশেই শব্দ রেকর্ড করা হয় বটে, কিন্তু বিভিন্ন উপায়ে। এছাড়া আজকাল বহু কোম্পানী নানা রকমের ক্যামেরা-সাউণ্ড ও প্রোজেকশনের মেশিন নির্মাণ করছেন।

১৯২৭ সালে মুভিটোন ফিল্মের চাহিদা পৃথিবীর সর্বত্র অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠলো। নীরব ছবির পর এই সব ছবিকে স্বাগত জানাবার জন্য জর্জ বার্নার্ড শ—চার্লস্ চ্যাপলিন-গলসওয়ার্দি ও স্যানট্রক প্রভৃতি বিখ্যাত মানুষেরা এগিয়ে আসলেন। প্রথমদিকে অবশ্য এঁদের অনেককেই মুভিটোন ফিল্মের বিরোধিতা করতে দেখা গিয়েছিল। সবাক্-ছবির প্রবর্তনকালে চার্লি চ্যাপলিন এই নূতন প্রকরণকে চরম ধিক্কার জানিয়েছিলেন। চ্যাপলিনের মতে, দুঃসহতম দুঃখের শেষ অঙ্কেও জীবন নাটকের যবনিকা পড়ে না, তার চাইতেও অবশ্যম্ভাবী দুঃখের প্রেক্ষাপটে প্রাণ এবং প্রিয়জনের প্রতি মমতায় শূন্য-রিক্ত হৃদয় অকস্মাৎ একটা পূর্ণ মধুচক্রের মতো টলমল করে ওঠে। সবাক্-ছবির প্রবর্তনে অনেক ভয়ংকর শোষণ অনেক বীভৎস নরক অপেক্ষা করছে। যাই হোক সম্যক বোধির জন্য চ্যাপ-লিনকে কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ধীরে ধীরে দ্বিতীয় জন্মের প্রস্তুত হচ্ছিলেন চ্যাপলিন। চ্যাপলিন অনুভব করেছিলেন তাঁর আত্মহত্যার অধিকার নেই—বেদনার দিগন্ত কোথাও সমাপ্তির যুতিতে এসে পূর্ণতালাভ করেনি, দিগন্তের পরে দিগন্ত—তা অনিঃশেষ।

বিজ্ঞানীদের কিন্তু এত সব চেষ্টা সত্ত্বেও চিন্তার কারণ থেকেই গেল। ছবির একটা সুন্দর নামকরণ আবশ্যক। কিছুতেই আর যেন নাম খুঁজে বের করা যাচ্ছে না। আমেরিকার বিখ্যাত চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা 'ফোটোপ্লে' ঘোষণা করলেন—"এই মুখর ছবির উপযুক্ত নামকরণ যে ব্যক্তি করে দিতে পারবেন তাঁকে পাঁচশো ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে"। ঘোষণাটির অব্যবহিত পর প্রায় ষোলো হাজার চিঠি 'ফোটোপ্লে' অফিসের দপ্তরে এসে পৌঁছায়। শেষপর্যন্ত 'ফোনোপ্লে' নামটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল আর সেই সঙ্গে 'হাওয়ার্ড বি নাইট, ব্রুকলিন নিউইয়র্ক' এই ঠিকানার মানুষটি অর্জন করলেন ষোলো হাজার ডলার।

ছবিতে বোবাকান্না থেচার পর এল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। নির্বাক চিত্রের মুখে ফুটল বাক্, কণ্ঠে ফুটল গান, সার্থক হল এ ধারা। ছবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে পরম আহ্লাদে সেদিনের মানুষ উচ্ছল হয়ে উঠলো। পাদপ্রদীপের সম্মুখে সমবেত মুষ্টিমেয়ের সৌভাগ্য এ নয়—এ শিল্প জনতার। আনন্দে বেদনায় সুখে দুঃখে এ সংযোগ ঘটালো—মানুষের সঙ্গে মানুষের—এ সংযোগবাহী এ যুগবাণী।

১৯২৮ সালে আমেরিকার বহু চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান নির্বাক ছবির কাজ বন্ধ করে সবাক্ ছবি তোলার কাজে অবতীর্ণ হতে লাগলেন। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে সবাক্-ছবির আশাতীত উন্নতি হয়। ছবির গল্প, পরিচালনা, অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচন, আলোক বিতরণ ইত্যাদি সকল কাজই নূতন পদ্ধতিতে শুরু হোলো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রথমে ফোনোগ্রাফ—পরে টেলিফোন ও বেতার থেকে শব্দ এসে স্থান অধিকার করলো নীরব ছবির সেলুলয়েডের পাশে। কাজেই একে বৈজ্ঞানিক-জগতে অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার কে না বলবেন?

সবাক্-চিত্র বিজ্ঞানের অভাবনীয় সৃষ্টি। প্রথম যেদিন পর্দার গায়ে সবাক্-চিত্র প্রদর্শিত হতে দেখা যায়, অনেকে সেদিন বলেছিলেন,—'ইহার পরমায়ু খুব বেশী দিনের নয়! অচিরে আবার নির্বাক ছবির যুগ প্রত্যাবর্তন করবে!' কিন্তু সে কথার বাস্তব রূপায়ণ ঘটেনি। নির্মম মাইক্রোফোন নির্বাক যুগের বহু প্রসিদ্ধ অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছে সর্বনাশের প্রকরণ হলেও আনয়া রুথ চ্যাটারটন, এনা সটেন, ক্যাথেরিন হেপবার্ন ও ফ্রেডারিক মার্চের মত শিল্পীদের লাভ করতে পেরেছি। এছাড়া নির্বাকযুগের এমন কতকজন শিল্পী আছেন যারা এই সবাক্ যুগেও নিজেদের পূর্ব খ্যাতি অটুট রাখতে পেরেছিলেন। গ্রেটা গার্বো, জোয়ান ক্রফোর্ড, নর্মা শিয়ারার, জেনেট গেনার ওয়ালেস বেরী, লাওনেল ব্যারীমুর ও চার্লস ফ্যারেলের মত শিল্পীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন—ফ্রাঙ্ক বোজের্জস, আর্নষ্ট লুবিশ, ভন ষ্টারন বার্গ, রুবেন ম্যামোলিয়ন, মারডিন লিরয়, ফ্রাঙ্ক কাপরা প্রভৃতি।

নির্বাক যুগের অন্তে ক্যামেরার গতিকে যখন নিয়মে বেঁধে দেওয়া হ'ল—অভিনেতা অভিনেত্রীর চলাফেরায়, বসা, দাঁড়ানোর সীমা নির্দ্ধারিত হ'ল। সে একদিন গেছে যেদিন আমেরিকায় সর্বপ্রথম নীরব ছবি 'দি গ্রেট ট্রেন রবারী' প্রদর্শিত হয়েছিল। তারপর আজ পর্যন্ত নানা দিক দিয়ে চলচ্চিত্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিকদের প্রাণপণ প্রচেষ্টায় নির্বাক-চিত্র সবাক্ হয়েছে। যদি কেউ বুঝে থাকেন যে রেডিও হর্ণ আর গ্রামোফোনের সাহায্যে সবাক্-চিত্র প্রদর্শিত হয়, তা হলে তিনি ভুল করবেন! রেডিও হর্ণ ও গ্রামোফোন ব্যতীত আরো এমন কতকগুলি দ্রব্যের প্রয়োজন ঘটে যেগুলি না পেলে সবাক্-চিত্র আবিষ্কৃত হ'ত কি না সন্দেহ। বৈজ্ঞানিক এডিসন 'ইন ক্যানডি সেট ল্যাম্প' সৃষ্টি করে আধুনিক চিত্রজগতকে মহা সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

চলচ্চিত্র, বিশ্ব সভায় প্রমাণ করেছে—সে মানুষের জীবন সংগ্রামের সার্থক শরীক। আনবিক হাতিয়ার তার নেই, আছে সেই মন্ত্র যা মানুষকে ধ্বংস করে না—বিপন্ন করে না, পরন্তু তুলে ধরে যুগের বিজয় পতাকা। সার্থকতার পূর্ণ প্রতীক এই চলচ্চিত্র—বিজ্ঞানের দুর্বার গতি ও মানুষের সৃষ্টি প্রয়োগে সমুজ্জ্বল হয়ে বিচরণ করবে অনন্তকাল ধরে। শুভমস্তু।

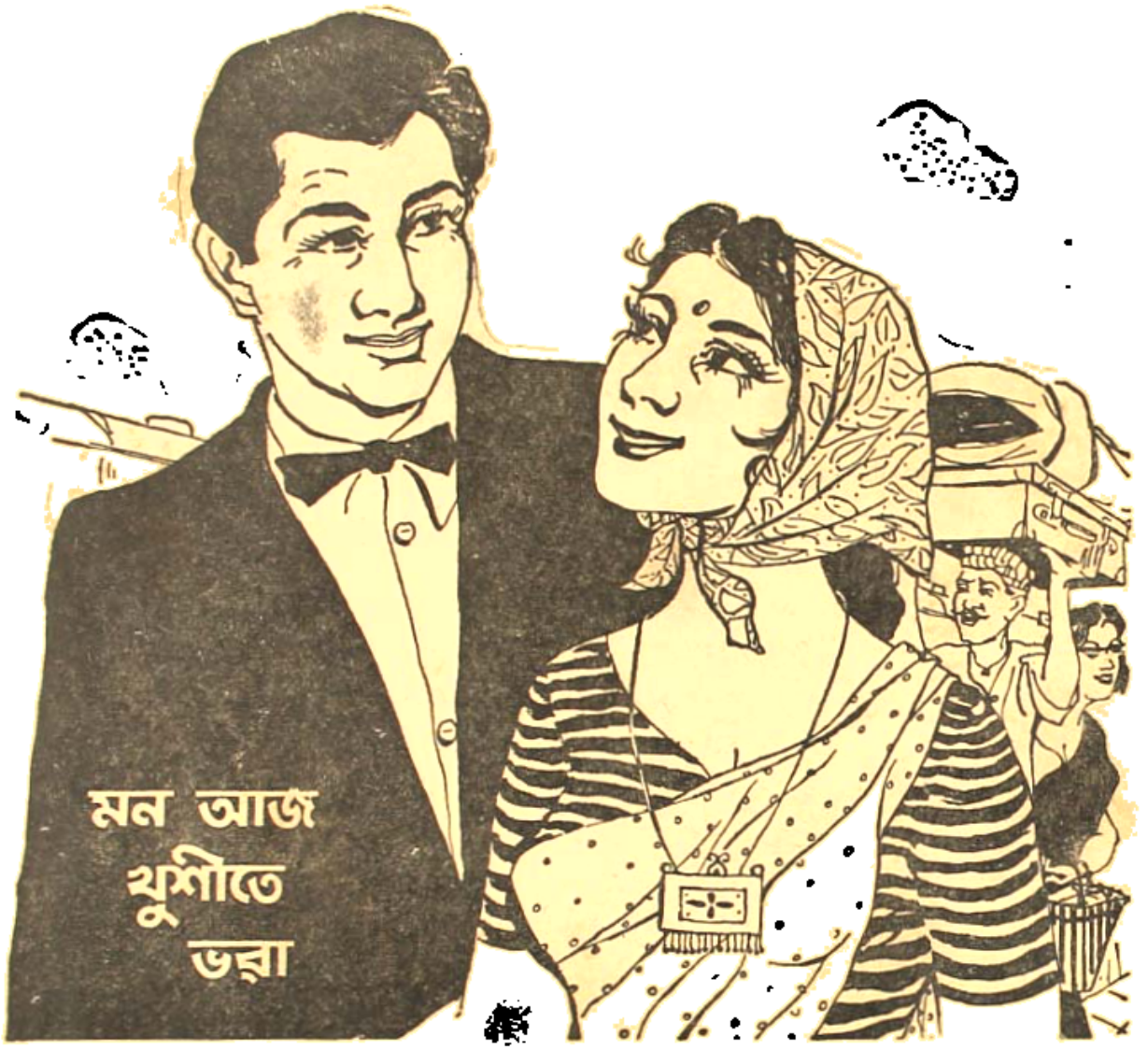

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্য মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর দুইবার করে দু'চামচ মুক্তসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে, খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি থেকে রেহাই পাবেন।

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ্.সি.এস, (লণ্ডন), এম.সি.এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেন চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য।

সাধনা ঔষধালয়ের ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা থিয়েটার

সোমনাথ চক্রবর্তী

গোড়া থেকেই শুরু করছি। ১৮৭৮ সালের কথা। তখনও বাংলা দেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় নি; বাঙলার নাট্যসাহিত্য সবে জন্মেছে। বাঙালীর মহা সৌভাগ্য যে সেই লগ্নে তৎকালীন বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রতিভা মধুসূদন দত্ত বাঙলা থিয়েটার নিয়ে ভেবেছিলেন। যে সব নমুনা ছিল সে-তুলনায় অনেক গুণে ভালো নাটক লিখবেন বলে কলম ধরেছিলেন। আমরা জানি, সফল মতো কাজ করেছিলেন তিনি।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' নাটকটির কথাও আমার মনে পড়ছে; এই নাটক একটি মহৎ দৃষ্টান্ত যে জীবন্ত জাতির জীবন্ত সমস্যা কিভাবে রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটকে প্রতিফলিত হতে পারে। সত্য বলতে কি, রঙ্গালয় একমাত্র এই বাহিরে পালন করেই নিজের টিকে থাকাকে সমর্থন করতে পারে। কিন্তু আমার এ-প্রবন্ধে আলোচ্য নয় বহু রঙ্গালয় ও সমসাময়িক সমস্য।

মধুসূদনকে বাঙলা থিয়েটার যেভাবে সক্রিয়ভাবে প্রেরিত করেছিল সেই বাহ্যিক যোগাযোগ ঘটেনি পরবর্তীকালের অন্য মহান সাহিত্যরথী বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বেলায়।

বিশেষ করে গিরিশ ঘোষের কলম ধরার আগে এবং তার পরেও মোটামুটি দ্বিজেন্দ্রলালের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গের সাধারণ রঙ্গালয় বহিরের একটির পর একটি

"প্রতিদান" ছবিতে কালী ব্যানার্জী ও অনুভা দেবী। এ ছবির পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী।

জ্যোৎস্না বিশ্বাসকে শুক্ল বাগ্‌চীর আগামী ছবি "তীর ভূমিতে" একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে।

উপন্যাসের নাট্যরূপ দান করেছে। থিয়েটারে বঙ্কিমের অরুচি ছিল না। কিন্তু সেই সব্যসাচী প্রতিভা যা সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস, ব্যক্তিগত রচনা ও গুরু প্রবন্ধ, এবং সাংবাদিকতা প্রতিটি ক্ষেত্রে সোনা ফলিয়েছে তা নাটক রচনায় একটি বারের জন্যও নিযুক্ত হলো না।

ভাবলে বোঝা যায় বঙ্কিম-প্রতিভা উক্ত কর্মের কি অনুকূল ছিল। তাঁর ব্যালান্স ও বৈদগ্ধ্য, কল্পনার বিশালতা ও নাটকীয়তা, চরিত্র সৃষ্টি ও সংলাপ রচনায় দক্ষতা, যুগ-সচেতনতা ও ঐতিহাসিক জ্ঞান এ সকলই তাঁকে দিয়ে ভালো নাটক লেখাতে পারতো।

রবীন্দ্রনাথের কথায় পরে আসছি। উনি আমাদের প্রধান আলোচ্য। শরৎচন্দ্রের কথা আগে বলে নিই। থিয়েটার এবং তার পরিবেশের প্রতি তাঁরও অরুচি ছিল না। শিশিরকুমার ছিলেন তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন। নাট্যরূপ যিনিই দিয়ে থাকুন, 'ষোড়শী' এবং 'বিজয়া' এ-দুটি নাটক অন্তত খুবই ভাল। এ সব দেখে-শুনেও শরৎচন্দ্র একটিও নাটক, অন্তত মৌলিক নাটক, লেখা দূরে থাকুক থিয়েটারের জন্য বিশেষভাবে কোন গল্পও কখনও ভাবেন নি। তেমনভাবে হয়তো অনুরোধ আসেনি, স্বভাবে কুঁড়েমি ছিল, এবং শিশিরকুমারের সঙ্গে যখন আলাপ হলো তখন ওঁর প্রতিভা ম্লান হয়ে আসছে এ সকলই হয়তো কারণ।

(২)

রবীন্দ্রনাথের গ্রাম্য পারিবারিক প্রতিবেশে সাধারণ রঙ্গালয় সম্বন্ধে ঘৃণা ছিল। যদিও স্বদেশীর যে ওঁর জ্যোতি-দাদার নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল। যাই হোক, সাধারণ রঙ্গালয় ছিল রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণের অনুপযুক্ত।

যে সব নট-নটী অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে দায়িত্ব-

জ্ঞানহীন ও রিপুর দাস তাহাই মঞ্চে ভাঁড়ামো সহযোগে ভক্তি পরিবেশন করে সরল লোকেদের ভোলাতো। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, বীর রসের স্থায়ীভাব ক্রোধ নয়, উৎসাহ। খুব বড় বীরের উদাহরণ তাঁর কাছে ছিলেন গান্ধীজী। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ঐতিহাসিক নাটকে তথাকথিত বীরদের অসি-আস্ফালন কি-করে তাঁর হাস্যোদ্রেক না করে পারে?

'নষ্টনীড়' ও 'চোখের বালি'তে যিনি বাংলা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের জন্ম দিলেন তাঁর কাছে বাঙলা সামাজিক নাটকের শস্তা মেলোড্রামা তো বারাপ লাগবেই। প্রথম যৌবনে যিনি 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' লিখেছিলেন বাঙলার স্বদেশী যুগে হঠাৎ প্রতাপাদিত্য ও সিরাজকে পেট্রিয়ট বানানো তো তাঁর কাছে তথাবিকৃতি মনে হবেই।

কয়েকটি তথাকথিত মক সরল নাটক সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মন্তব্যের আমরা খবর রাখি। প্রসন্নত অমলের চাটুজ্জের 'ঐতিহ্যের নাটক'-এর নাটকীয়তা ও যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা'র ছন্দোবিভ্রান্তি নিয়ে তাঁর মন্তব্য আমরা স্মরণ করতে পারি।

সাহিত্যের সর্ব শাখায় আত্মপ্রকাশের তাগিদ ছিল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক স্বভাবে। নাটক তিনি লিখতেনই। কিন্তু নাটক তো অভিনয়ের জন্য। রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্যক্রমে তাঁর প্রথম জীবনে জোড়াসাঁকোর এবং পরবর্তী জীবনে শান্তিনিকেতনের দল ছিল অভিনয়ের। এ যোগাযোগ না ঘটলে তাঁকে হয়তো সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই নাটক লিখতে হতো! অবশ্য উপোদিবে কিছু ক্ষতি হয়নি তা নয়। আমি বলতে চাইছি যে তাঁর অনেক নাটকে এমন ব্যবহারে তিনি নিরস্ত হতেন যদি সাধারণ রঙ্গালয়ের মুখাপেক্ষী হতেন তিনি। উদাহরণ—'বিসর্জন' নাটকে জয়সিংহ ও অপর্ণার কৈশোর-ক্রীড়া সাবালক প্রেমে পরিণাম পায় না, 'রাজা' নাটকের গঠন এত দুর্বল, এবং 'তপতী'-তে দীর্ঘ বক্তৃতা আছে।

শিশিরকুমার 'বিসর্জন', 'তপতী', 'যোগাযোগ' (উপন্যাসের নাট্যরূপ কে দিয়েছিলেন? পাণ্ডুলিপিটি কি এখনও আছে?) এগুলি মঞ্চস্থ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমারের প্রতিভার অনুকূল ভূমিকা-সম্বলিত নাটক রবীন্দ্রনাথ লিখে দেন নি।

রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার-সভা', 'শোধবোধ' এবং 'গৃহপ্রবেশ' এই নাটকগুলি বিশেষভাবে সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য লিখিত। হয়তো কয়নারেশ রচনা বলেই তিনটি রচনাই রক্তহীন। তিনটিই পূর্ব রচনার সংশোধিত রূপ বা কাহিনীর নাট্যরূপ।

মাধবী মুখার্জী ও সোমেন চক্রবর্তীকে "অজানা শপথ" ছবিতে দুই বিশিষ্ট চরিত্রে দেখা যাবে। সলিল সেনের 'সন্ন্যাসী' নাটকের চিত্ররূপ "অজানা শপথ"।

বিশ্বজিৎ প্রযোজিত ও অভিনীত "ছোট্ট জিজ্ঞাসা" ছবির আউটডোরে, বালী ব্রীজের ওপর মাধবী মুখার্জী ও বিশ্বজিৎ ডনয় প্রসেনজিৎ।

এই পরিচ্ছেদ শেষ করি এই বলে যে সাধারণ রঙ্গালয় তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অবহেলার শোধ নিতে ছাড়ে নি। শতবার্ষিকীর বছরে কলকাতার এতগুলি ব্যবসায়িক মঞ্চের একটিতেও রবীন্দ্র-নাটকের নিয়মিত অভিনয় হলো না। ফাউ হিসাবে 'কাবুলিওয়ালা' কিংবা 'মুক্তির উপায়'-এর পরিবেশন আরও কৃত্রী। মিনার্ভা-মঞ্চে সেক্সপীয়রের চারি-শত জন্মতরঙ্গী অনেক বেশী ঘটা করে হয়েছে। প্রমাণ হয় যে কলকাতার ব্যবসায়িক মঞ্চ লৌকিক ভুলেছিল এবং তার ইন্‌টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি হীন।

(৩)

রবীন্দ্রনাথ তো শুধু নাট্যকার ছিলেন না। কিংবদন্তী বলে, তিনি সুদক্ষ অভিনেতাও ছিলেন। দ্বিতীয়ত, নাটক মঞ্চস্থ করার রীতি ও পদ্ধতি নিয়েও যথেষ্ট মৌলিক চিন্তা করেছিলেন। শান্তিনিকেতন-দলের প্রযোজনাগুলিতে তাঁর চিন্তা ব্যবহারিক রূপ পেয়েছিল। এ-সম্বন্ধে যথাযথ ও বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। অথচ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের একটি স্বতন্ত্র পুস্তক ছাড়া আর কোন্ স্বতন্ত্র পুস্তকে নট ও প্রযোজক রবীন্দ্রনাথের উপর

"অচিত্তা" ছবির মহরৎ অনুষ্ঠান। মহরতে নায়ক সত্যেন, লিলি চক্রবর্তী ও পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়। ছবিটির প্রযোজক অরুণ রায়চৌধুরী।

আলোকপাত করা হয়েছে মনে পড়ছে না। 'সাতভাই'-গ্রন্থের ভূমিকায় ইন্দ্রমিত্র যেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি কিছু লিখবেন বলে।

সম্প্রতি যেভাবে সংগীত-চিন্তা ও ছন্দোবিচার নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনার সংকলন বেরিয়েছে সেভাবে তাঁর নাট্যচিন্তা নিয়ে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত যাবতীয় রচনা, চিঠিপত্র ইত্যাদির সংকলন যদি হয় কেমন হয় সেকথা আমি বিশ্বভারতী-প্রকাশনালয়ের কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখতে বলি।

রবীন্দ্রনাথের সকল নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনী (শান্তিনিকেতনে এবং কলকাতার পেশাদার মঞ্চে)-এর তারিখ এবং সম্পূর্ণ ভূমিকালিপি সংশ্লিষ্ট নাটকগুলির সঙ্গে মুদ্রিত করা অবশ্য কর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির আলোচনা করে অনেক অধ্যাপকই মোটা মোটা বই লিখেছেন। পরীক্ষা পাসের জন্য সেগুলির কয়েকটি আমাকে নেড়েচেড়ে দেখতে হয়েছে। সেগুলিতে নাটকগুলির অভিনয়-সম্ভাবনা নিয়ে অবিশ্বাস্যরূপে কম আলোচনা প্রাপ্তব্য। 'রক্তকরবী' এবং আরও দুই-একটি নাটক নিয়ে স্বতন্ত্র পুস্তক বাজারে আছে। কোনোটিতে পাবেন না মঞ্চ-পরিকল্পনা এবং প্রধান চরিত্রগুলির সম্ভাব্য চেহারা ও বেশ নিয়ে কোনো আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথের মঞ্চ-প্রযোজনায় যাঁরা দর্শক, নেপথ্য-কুশলী অথবা সহ-অভিনেতা (এবং-অভিনেত্রী) ছিলেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা আজও বেঁচে তাঁদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। তথাপি যে-মহিলাটি (তখন বালিকা ছিলেন) রবীন্দ্রনাথের অন্ধসিংহের বিপরীতে অপর্ণা করেছিলেন তিনি এবং যে-মহিলাটি একবার তাঁর বিজনের বিপরীতে নমিয়া করেছিলেন সম্প্রতি তিনিও বেঁচে আছেন। গুরুদেব প্রেমের দৃশ্যে কেমন অভিনয় করতেন সেকথা জানবার জন্য আমার মতো আরো অনেকেরই আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।

শেষে একটি প্রশ্ন। রবীন্দ্রসংগীতে গায়কের স্বাধীনতা কম। সেটা ভাল কি মন্দ সে-প্রশ্ন এখানে অবান্তর। বিশেষে নাটকের অভিনয়ের জন্য নাট্যকারের অনুমতি অনেক পরিমাণে মানতে হয়। রবীন্দ্র-নাটকের প্রযোজনায় কিন্তু দেখছি অনেকেই ইচ্ছে মতো স্বাধীনতা নিচ্ছেন। ফল কি হচ্ছে?

'রক্ত-করবী' ও 'অচলায়তন'-এর শেষে রক্তপ্রক্ষা-ধারীদের আন্দোলনের আভাস দেওয়া হয়তো অনুচিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের কল্পিত চরিত্রকে যখন বিকৃত করা হচ্ছে?

এক পরিশে বৈশাখ 'তপতী'র অভিনয় দেখেছিলুম। যিনি বিক্রম করেছিলেন শেক্সপীয়রের প্রচণ্ড নায়কের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের খ্যাতি আছে। বিক্রমকে নিছক ফিউডাল প্রভু রূপে তিনি খুব ফোটালেন। কিন্তু হায়, বিক্রম যে প্রেমিকও ছিল।

আর একজন নাট্যকার-অভিনেতা-পরিচালকের কথা বলি। তমসা (এবং তামসিকতা?)-র প্রতি তাঁর আকর্ষণ সমধিক। তাই বোধহয় তাঁর অভিনয়ে 'বিসর্জন'-এর জয়সিংহ যেন অন্ধকারের জীব। আর সরল, প্রকৃতি-প্রেমিক, গোবিন্দ-মাণিক্যের ভক্ত এবং অপর্ণার খেলার সাথী বিল্বের জয়সিংহ অদৃশ্য।

অধিক সমালোচনা করার বিপদ আছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপি পাই। কিন্তু রবীন্দ্র-নাটকের কোন্ চরিত্র মোটামুটি কিভাবে করলে রাখীস্ত্রিক হবে বা হবে না তা কোন্ প্রমাণে বলবো?

'চিড়িয়াখানা'
ছবির পর সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী প্রয়াস

সুনজরে সত্যজিৎ রায়ের দিকে তাকালে, শুধু তাঁর প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য, বিস্তার বিরামহীন প্রবাহ—শুধু তাঁর আয়তনের বিষয়ে চিন্তা করলে সম্ভাব্য সমালোচকের মনের প্রায় সেই দশা হতে পারে—যদিও ভিন্ন অর্থে যে দশা হয়েছিলো অর্জুনের, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের রণধ্বনিকা যখন উঠেছিলো। কাতারে-কাতারে কীর্তিবাহিনী দেখতে পেয়ে, এমনও হতে পারে যে বেশ কড়াপাকের সমালোচকও বিহ্বল হবেন, বলবার কোনো কথাই প্রথমে খুঁজে পাবেন না। অবশ্যই যদি তিনি বাঙালি হন। অথচ সত্যজিৎ রায় ঠিক জাতের স্রষ্টা, বিশ্বের মহত্তমদের অন্যতম, এ নিয়ে বাংলাদেশে ও সারা বিশ্বে আজকের দিনে আর তর্ক নেই। বিচ্ছিন্ন পংক্তিতে এঁকে পাওয়া যাবে না—যে কোনো একটি গ্রন্থের তুলনায় অনেক বড় হচ্ছে এঁর সমগ্র সৃষ্টির রচনা শুধু আয়তনে নয়, অর্থবহতায়। এখন ভার পড়েছে সৃষ্টির ফসল ঘরে তোলার। বাছতে হবে, গোছাতে হবে, সাজাতে হবে গোলঘরে ঘরে-ঘরে। ডেকে বলতে হবে সকলকে—এসো, এখানে এসো, এখানে তোমার পুষ্টি, স্বাস্থ্য, কল্যাণ। এখানে তোমার উত্তরপুরুষের আনন্দের সঞ্চয়।

মনোজগতের বিচিত্র পরিক্রমায় সত্যজিৎ রায় প্রথম শ্রেণীর চলচ্চিত্র সৃষ্টির মহত্তর মহিমায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। শুধু নৈতিকতায় নয়, বস্তুবৈচিত্র্যে নয়, জীবন দর্শনের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে নয়—প্রয়োগরীতির দিক থেকেও এরা আদর্শরূপে নির্ধারিত হওয়ার যোগ্য।

পথের পাঁচালী থেকে—চিড়িয়াখানা—প্রত্যেক গল্পেই রয়েছে চলচ্চিত্র স্রষ্টার অপূর্ব রচনা শৈলী আর বিকাশ। উচ্চতর সমাজ সম্পর্কে তাঁর মনোগত ক্ষোভ এবং বিদ্রূপভঙ্গি যেমন একদিকে চরম তিক্ততার স্বাক্ষর এঁকে রেখেছে অন্যদিকে আর একটি ক্ষেত্রে সুস্থ সবল ও প্রাণবন্ত মপাসাঁর মতোই আমরা ঐরায়কে দেখতে পাই।

'দেবী' সর্বাঙ্গীন ভাবেই প্রভাতকুমারের শ্রেষ্ঠ গল্প। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন—এ গল্পের পরিকল্পনা তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে পেয়েছিলেন। এই স্বীকারোক্তি নিরর্থক নয়। একটু অনুধাবন করলেই দেখা যাবে এর কল্পনায় এমন একটা তির্যক বৈচিত্র্য আছে যাকে প্রভাতকুমারের সরল মনস্তত্ত্বের সঙ্গে যোগ করা যায় না। প্রভাতকুমার সহজ পথের যাত্রী—তাঁর কল্পনা বস্তু নির্ভর। গল্পটি কবি মননজাত ঊর্ধ্বগামী কল্পনাকে আশ্রয় করে রয়েছে। কাহিনীর প্রথমে দয়াময়ীর মানবীরূপে বাঁচবার চেষ্টা সে করুণ রসের সূচনা করেছিলো তা ভরাবহ ট্র্যাজেডিতে পরিণত হল—যখন দয়াময়ী ঘটনাচক্রে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলো যে সে সত্যি-সত্যিই দেবী। এ ছবিতে সত্যজিৎ রায়ের শিল্প প্রতিভা নিজের শান্ত সরল ও সজল-কল্পনার সীমা অতিক্রম করে—মনোময় রূপ পরিগ্রহ করতে পেরেছিলো। অন্ধ ধর্ম-সংস্কারের বেদীমূলে জীবনের করুণ অপচয় রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই সহ্য করতে পারেন নি—ধর্মের সঙ্গে ধর্মতন্ত্রের বিরোধে তিনি বার বার প্রাণের বন্দনা শুনিয়েছেন। দেবী'তে সেই প্রাণ ও প্রেমের পরাভব এমন গভীর ও পরিব্যাপ্ত ট্র্যাজেডির বার্তা এনে দিয়েছে—যা একমাত্র প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্পেই সম্ভব। গল্পের মূল আখ্যানাংশ রবীন্দ্রনাথ এর ঋণ কম বা নাই হোক—এখানে অর্থাৎ ছবিতে প্রভাতকুমারের চেয়েও সত্যজিৎ রায়ের শিল্প প্রতিভা নিজের শান্ত, সরল ও সজল কল্পনার সীমা অতিক্রম করে উচ্চাঙ্গের কাব্যিক প্রাপ্য সম্মান ও বিষয়বস্তুর মূল সুরকে অক্ষুণ্ণ রেখে যিনি চিত্রনাট্যের উপাদানে কিছু রদবদল করতে সক্ষম তিনিই হলেন

সার্থক চলচ্চিত্র স্রষ্টা। সম্ভবত এসব কারণেই সত্যজিৎ রায় বহুদিন পূর্বেই বলেছেন :—

"চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ সাফল্য একমাত্র সাহিত্য নিরপেক্ষ-ভাবেই সম্ভব এ আমি মনে করি না। সাহিত্যের আনুগত্য যদি সাহিত্যের দাসত্বে পর্যবসিত হয় তবে সেটা চলচ্চিত্রের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু এক শিল্পে আর এক শিল্পের গুণ বা লক্ষণ থাকবে না—বা এক শিল্প আরেক শিল্প থেকে রসদ সংগ্রহ করবে না, একথা বলা ভুল। কাহিনী বর্ণনা যে ছবির উদ্দেশ্য, চরিত্র বা পরিবেশ সৃষ্টিতে উপন্যাসের সঙ্গে তার মিল থাকা স্বাভাবিক। ঘটনার পারম্পর্যেও মিল থাকতে পারে। ইয়েজ-ধর্মী কাব্য, কাব্যধর্মী সাহিত্য, সাহিত্যধর্মী চলচ্চিত্র, এর কোনোটাই শিল্প হিসাবে অগ্রাহ্য নয়। তবে সত্যিকারের চলচ্চিত্র সাহিত্য থেকে উদ্ভূত হলেও, তার ভাষায় সাহিত্যের কোনো চিহ্ন থাকে না। সাহিত্যের যেটুকু চলচ্চিত্রের ভাষায় রূপান্তরিত হতে পারে সেটুকুই চিত্রচরিত্রের গ্রহণ করা উচিত।"

চলচ্চিত্রের অর্থনৈতিক দিককে বাঁচানোর উদ্দেশ্যই জনপ্রিয় চিত্রনির্মাণে সব সময়েই সব প্রযোজকেরই লক্ষ্য। একাধারে জনপ্রিয়তা ও শিল্পধর্মীতার নিদর্শন যখন অতীতে রয়েছে তখন ভবিষ্যতে এর সম্ভাবনা নেই একথা বলা চলে না। তবে, কোন্ কোন্ গুণের ফলে ছবি জনপ্রিয়তা অর্জন করে, অনেক গবেষণা সত্ত্বেও তার কোনো হদিস মেলেনি। তাই এ প্রচেষ্টার ফলাফল সম্বন্ধে চিরকালই একটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। এই অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও যদি প্রযোজকের উদ্যম ও পরিচালকের শিল্পাকাংক্ষা অটুট থাকে, তবে যেমন অতীতে তেমনি ভবিষ্যতে ক্বচিৎ কদাচিৎ শিল্পধর্ম জনপ্রিয় ছবির সাক্ষাৎ মিলবে।

'চিড়িয়াখানা' মুক্তিলাভের অব্যবহিত পরে সত্যজিৎবাবু কোন্ ছবিতে হাত দিচ্ছেন কথাটা জানবার জন্য চলচ্চিত্র প্রিয় মানুষের মনে আলোচনা গবেষণার বিরাম নেই।

'নায়ক'-এর পর দীর্ঘদিন কেটে গেছে—ওর কোনো ছবিই মুক্তি পায়নি কাজেই দর্শকের দল তো অধির হবেন-ই।

চিড়িয়াখানার পর ঠিক ছিলো বিভূতিভূষণের অশনি-সংকেত। এ গল্পটার প্রতি বহুদিনের ঝোঁক। হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যিনি হার প্রোডাকসন্স-এর অন্যতম অংশীদার তিনিই হলেন অশনি সংকেত-এর প্রযোজক। নায়িকা নির্বাচনের ব্যাপারেই আপাততঃ এ পরিকল্পনা স্থগিত রয়েছে। সৌমিত্র চ্যাটার্জীর সঙ্গে অভিনয় করানোর জন্য একজন দক্ষ অভিনেত্রী আবশ্যক এবং সম্পূর্ণ নূতন। এত স্বল্প সময়ে সেটা ঘটিয়ে তোলা অসম্ভব। ১৯৬৮ সালের 'মে' মাস থেকে এ ছবির শুরু। অশনি সংকেতের পর শুরু হবে 'দি এলিফেন্ট'। এলিফেন্টের প্রাথমিক প্রস্তুতি অর্থাৎ চিত্রনাট্য সমাপ্ত। এখন শুরু হবে সংগঠনের কাজ। যাই হোক না কেন চিড়িয়াখানার পর সম্ভবত গুপী গাইন বাঘা বাইন-এর কাজ শুরু হচ্ছে। শ্রীরায়ের পিতামহ উপেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী বিরচিত গুপী গাইন বাঘা বাইন-এর আবেদন ৭ বছরের মানুষ থেকে ৭০ বছর অবধি। সম্ভবত সত্যজিৎবাবু নিজেই এ ছবির প্রযোজনা করবেন। প্রচুর গান থাকবে ছবিটায়। ইতিমধ্যে ৮'খানা গান রেকর্ড করাও হয়ে গেছে—সব কটিরই কথা ও সুর শ্রীরায়ের।

এলিফেন্টে অভিনয় করছেন প্রখ্যাত অভিনেতা পিটার সেলার্স। ইংরাজী অভিনয় জগতে পিটার সেলার্সের সর্বজনবিদিত সুনাম সারা বিশ্বে ধ্বনিত। ভারতবর্ষ সম্পর্কে সেলার্স খুবই আগ্রহী। সত্যজিৎবাবুর এলিফেন্টের ভারতীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন সেলার্স—মাড়ওয়াড়ী ব্যবসায়ীর ভাগ্যোদ্বিগ্ন। ছবির ভাষা বাইলিঙ্গুয়াল। কাহিনীর উপাদান সম্পর্কে খুঁটিয়ে কোনো খবর পাওয়া এখনো সম্ভব হয়নি তবে যতটুকু জানা গেছে তাতে এই তথ্যই দেওয়া যেতে পারে যে এটি একটি সায়েন্স্ ফিকশন চলচ্চিত্র। নবগ্রহ থেকে একটা স্পেস্‌শিপ যখন পড়ে—স্থান পেয়েছে বীরভূমের কোনো একটা পল্লী বিলে। গ্রামবাসীরা ব্যাপার দেখে চমকে যাবেন—এর পর এই স্পেস্‌শিপকে ঘিরেই কাহিনীর অবস্থিতি। শুরু থেকে শেষ পরিণতি কি তা জানি না তবে কল্পনার চোখে আমাদের মত ক্ষুদ্র মানুষের মনে হয় সত্যজিৎবাবু তাঁর কল্পনার চাতুর্যে এ ছবিকে করে তুলবেন বিশ্বের এক অমূল্য সম্পদ। গল্পটি লিখেছেন শ্রীরায় নিজেই। এ ছবির ক্যামেরাম্যান শ্রীসুব্রত মিত্র আর শিল্প নির্দেশক শ্রীবংশী চন্দ্রগুপ্ত। এডিটর সম্পাদক শ্রীদুলাল দত্ত ও ইউনিটের সমস্ত সদস্যবৃন্দই এ মহান প্রচেষ্টার সাথী হয়ে থাকছেন। ছবিটি ১০ মিলি-মিটার এবং টেকনিকালারে উঠবে। অসংখ্য ট্রিক ফোটো-গ্রাফী ও অপটিক্যাল প্রিন্টিং ইত্যাদির জন্য রোমে যেতে হবে ক্যামেরাম্যান আর্ট ডিরেকটর ও এডিটরকে। ১৯৬৮ সালের অকটোবর মাস থেকে এ ছবির নিয়মিত শুটিং শুরু। সিলোনের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রবিদ স্টীন ভাইভার বাইকেল উইলসন হলেন এ ছবির অন্যতম কর্ণধার। ইন-ডাস্ ফিল্ম এই নামে এলিফেন্টের কর্ম সংগঠন গড়ে উঠবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে চিড়িয়াখানার পর শ্রীরায় প্রথমে তুলছেন গুপী গাইন ও বাঘা বাইন—তারপর অশনি সংকেত—তারপর দি এলিফেন্ট এবং তারপর ফস্টারের এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া।

'হাটে বাজারে'
ছবির পর তপন সিংহের পরবর্তী প্রয়াস

হাটে বাজারের পর তপনবাবু কি করবেন সেটা জানবার জন্য ওঁর কর্মকেন্দ্র নিউ থিয়েটার্স ডু নম্বর স্টুডিওর কক্ষটিতে উপস্থিত হয়েছিলাম। পূজা সংখ্যার জন্য সম্পাদকীয় নির্দেশ মত তাড়াতাড়ি লম্বর লেখালিখি সমাপ্ত করতে হবে। যেভাবেই হোক না কেন তপনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে—ভাগ্য সহায় ছিলো। হাটে বাজারের মোড়ে অজয় গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা, উনি বল্লেন—আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো, ঠিক বেলা চারটে নাগাদ আসবেন। নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় মিনিট দশেক পূর্বেই অজয়বাবু আর আমার পূর্ব পরিকল্পিত মিলন সমাবেশ ঘটলো। ছিপ আর সংগে নিয়ে মিনিট কয়েক অপেক্ষা করার পর অজয় এসে বল্লেন 'আসুন তপনদা ভিতরে রয়েছেন, আপনার বক্তব্য স্বচ্ছন্দেই রাখতে পারেন'। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। তপনবাবু তাঁর এই কর্মকেন্দ্রে বসে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার রূপায়ণে ব্যস্ত ছিলেন অর্থাৎ চিত্রনাট্যের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি নিয়ে সহকারী পরিচালকদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। ওঁর সহকারীদের মধ্যে আমার বিশেষ পরিচিত দুজনকেই দেখলাম পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় আর বিবেক বক্সীকে। পলাশবাবু হলেন কথাশিল্পী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র আর বিবেকবাবু একজন সুপরিচিত টেকনিশিয়ান, ইনি বেনারসের অধিবাসী। আবার ফিরে আসছি তপনবাবুর কথায়। এল. টি. নাম্বার টু স্টুডিওর মেকআপ রুম সংলগ্ন ঘরের পাশেই তপনবাবুর কর্মকেন্দ্র। এই ঘরটার ঠিক উপরেই আবার ওঁর নিয়মিত সম্পাদক সুবোধ রায়ের এডিটিং রুম। তপনবাবু আপন মনে এই এডিটিং রুমে ওঁর যাবতীয় কাজ—ছবির সমাপনান্তে করে থাকেন। এখানকার মুভিওলাটি কিন্তু আধুনিক কালের নয়—আমার মনে হয় একটা আধুনিক মুভিওলা তপনবাবুর কাজের যথেষ্ট সহায়ক হবে।

প্রাথমিক পরিচয় আর নমস্কার বিনিময়ের পর তপনবাবু আর আমি মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসলাম। তার পর আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন কি ব্যাপারে আমাকে প্রয়োজন জানতে পারি কি? হেসে বললাম আমি প্রশ্ন করে বিরক্ত করতে আসিনি, এসেছি প্রখ্যাত পরিচালকদের কাছ থেকে তাঁদের পরবর্তী প্রয়াস সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য জানতে। সামনেই পূজো, সংখ্যার কাজ জোর কদমে চলছে, বুঝতেই তো পারছেন লে-আউট—কম্পোজ সব মিলিয়েই সময় আর নেই তাই একরকম না জানিয়ে বিনা, বিজ্ঞপ্তিতেই হাজির হয়েছি। সেজন্য লজ্জিত। হেসে বল্লেন তপনবাবু, ফরমালিটির দরকার নেই—কাজের কোনো ব্যাঘাত হয়নি নিশ্চিন্তে আপনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করুন।

স্লিপ্টের খাতাটা বন্ধ করে তপনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডোনট মাইনড্, কাগজের নামটা জানতে পারি—বললাম নিশ্চয়ই। "মিঃ সিন্‌হা"। আমাদের প্রকাশনার দুটো কাগজ। দীপান্বিতা আর রূপম। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ যেমন উপন্যাস—ছোটগল্প—রম্য রচনা—পুস্তক সমালোচনা—শহর কলকাতার বিভিন্ন সমস্যার কথা—বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সঙ্গে এক নিমেষের পরিচয়—খেলাধূলো ও চিত্রজগৎ সংবাদ সব কিছুর সমাবেশে মাসের প্রথম তারিখেই দীপান্বিতা প্রকাশিত হয়। দীপান্বিতার পাঠক সাধারণত একটু সিরিয়স ধরণেরই কেননা সাহিত্যের বেশ কিছুটাই এর অঙ্গীভূত। রূপম হচ্ছে

সম্পূর্ণভাবেই স্বতীন এবং দিনেমার কাগজ। মাসের গোড়ায় ও শেষে দুবার পাক্ষিক আকারে এর প্রকাশনা হয়ে আসছে। এ ধরণের ম্যাগাজিন বাংলায় প্রথম। হ্যাঁ—মাঝে মাঝে আপনাদের কাগজটা চোখে যে পড়ে না তা নয়। বেশ পরিচ্ছন্ন আপনাদের দুটি কাগজ। আই উইস্ ইউ এভরি সাকসেস্। তপনবাবুকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এমন সুন্দর উত্তর পেয়েছি যাতে মন প্রাণ ভরে গেছে। তপনবাবুর মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবি বনফুলের লেখা হাটে বাজারে। গল্পের উপাখ্যানটি তপনবাবুকে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছিলো এবং কয়েকবার পড়বার পর ওঁর ধারণা এর থেকে বেশ একটা সুন্দর ছবি করা যায়। সোশিওলজিকাল অ্যানলিসিস্। সামাজিক বিশ্লেষণ। চরিত্রের সমাবেশেই সমাজ, সুতরাং বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে ভিড় করে আছেন এমন মানুষের সংখ্যা সমাজে নিতান্ত কম নয়। মনোবিশ্লেষণি মন নিয়ে বনফুল হাটে বাজারে এমন সব চরিত্রের উপস্থাপনা ঘটিয়েছেন যা সকলেই শিল্পী-মনকে নাড়া দেয়। জীবনের নিছুর বাস্তবনিষ্ঠায় আমাদের (মানুষের) চিত্তকে কত বিকৃত করে যার সঙ্গে আমাদের শিরাস্নায়ুও প্রতীকমান হয়ে ওঠে। কথাশিল্প কী, তার উদ্দেশ্য কী, মহৎ শিল্পীর সংজ্ঞা কী, দেশকালের প্রতি শিল্পীর দায়িত্ব কতখানি—এই নানাবিধ প্রশ্ন-পরিক্রমা শেষ হলে তারপরেই হয়তো বনফুলের এইসব গল্পের মূল্য অনেকখানি নির্ণীত হবে। অথবা এ-ও আপাবাদীর কথা হল। ব্যক্তিগত রুচি ও মনোভঙ্গি তর্কের মধ্যে নিয়ে বদল হবার নয়। অতএব ওঁকেও অন্যান্য সমস্ত শ্রেষ্ঠ পথারী স্রষ্টাদের মতো প্রতীক্ষা করতে হবে সেই মোহমুক্ত নিরাসক্ত-দৃষ্টি চরম বিচারের জন্যে: যার নাম POSTERITY। সেখানে অনুকূল-প্রতিকূল কোনো গোষ্ঠীরই সমর্থন বা বিরুদ্ধতার কোনো দাম থাকবে না—তাঁর সাহিত্য কালজয়িতায় নিরবিত হবে।

মানুষের প্রতি মানুষ আজ আস্থা হারিয়েছে। মানুষের এই আস্থাকে পুনরায় ফিরে পেতে হবে। সমগ্র মানুষের প্রতি প্রীতিবোধের উদ্বোধন ঘটলে মৈত্রীর আশা দুরাশা মাত্র; আর বিনা মৈত্রীতে নিশ্চিত সর্বনাশ। এই বিরাট দায়িত্ব এ যুগের চলচ্চিত্রের সম্মুখে: জীবনের ক্রমমূল্যের উদ্বোধনে ছিন্ন সেখানে সহায়তা করতে পারে। তপনবাবুর পরবর্তী প্রয়াস যুবক সম্প্রদায়ের আশা আকাঙ্খার কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে। হাতে বাজারে শেষ করতে ওঁর সময় লেগেছে ৬ মাস আর ছবির খরচ প্রায় ৭ লাখ টাকা বজন। এমন একটা একটা কমার্শিয়াল ছবি হিসেবেই হয়তো সংজ্ঞা নিয়ে চলেছে। কিন্তু ছবিটি রূপায়ণের বাসনা থেকে শেষ পর্যন্ত পরিচালকের মনে কিন্তু কথাটা ঠাঁই পায় নি। যাই হোক এ ছবির পর অল্প দিনের ব্যবধানেই তপনবাবু নিজের লেখা সমসাময়িক-কালের বিশেষ করে গত তিন বছর-ধরে আমাদের দেশে যুবক সম্প্রদায়কে নিয়ে যেভাবে টানা হেঁচড়া করছে সেই সমাজ ব্যবস্থার তারই একটা বলিষ্ঠ ইঙ্গিত স্পষ্টই ধ্বনিত হবে এই নতুন প্রয়াসে। উনি বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন সাহিত্য এবং ছিন্ন এই দুই ব্যাপারের কেউই এ সব যুবকদের কথা নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছি তা আমি জানি না। অবশ্য আমি কাউকে দোষারোপ করছি না—কথাটা আছে, আলোচনা প্রসঙ্গেই বলে গেল। ধরুন, ছেলের বল পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে পরীক্ষা পেছিয়ে গেলো কিংবা প্রশ্ন-পত্র কঠিন হওয়ায় পার্সেন্টেজ কমবার, ছেলের ডিপ্রিসন্ড হচ্ছে, এ সব কেন হচ্ছে? সবাই তো যুবক সম্প্রদায়কে ওপ্রা বরনাইস্ আখ্যা দিয়েই খালাস—কেন এই আচরণ কোথায় এদের বাথা সেই Purity ফেরার জন্য কেউ তো এগিয়ে আসেন না। আমার মনে হয় এইটেই হচ্ছে High time ওদের ঈর্ষা বলার জন্য। আমি কারও এগিয়ে যেতেছি আর মোটামুটি কারিটাও মনের মধ্যে ঘুরছে তবে ফাইনালি এখনো অ্যানাউন্সমেন্ট দিতে সময় লাগবে।

সেই অনাগত ছবিটি কবে আসবে জানি না তবে এতখা জেনে জীবন আনন্দিত হয়েছি যে নিত্যকালের সত্য যে মানুষ, জীবন আর জীবনকে যিনি ভালোবাসেন, তাঁর সৃষ্টিতে মানব-কল্যাণের পুণ্য মন্ত্র আছে—তাঁকে নিশ্চয়ই মানুষ সহজে ভুলতে পারে না। সমালোচকের বহুবাদা তিনি যদি না-ই পান মানুষের প্রীতি তাঁর জন্যে সুচির সঞ্চিত হয়ে রইল। পাবলো নেরুদার ভাষায় বলি:

"I feel no loneliness at night
In the obscurity of earth.
I am people, the innumerable people."

মৃণাল সেনের পরবর্তী প্রয়াস প্রসঙ্গে

একটুক্ষণ অপেক্ষার পর মৃণালবাবু তাঁর কর্মস্থল থেকে ফিরে এসে বললেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। আমার অভিলাষ ব্যক্ত করার পর বললেন '—খুব শক্ত প্রশ্ন করবেন না যেন, ঘাবড়ে যাব'। অবশ্য ঘাবড়ে যাবার মতো প্রকৃতি মৃণালবাবুর মোটেই নয়। উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ। হেসে বললাম 'মৃণালবাবু! আমি প্রশ্ন করতে আসিনি, আলাপ করতে এসেছি। তবু আপনি একটু ঘাবড়ে গেলেই আমার সুবিধা হয়।'

মৃণালবাবু হাসলেন, 'তাই নাকি! কেন বলুন তো?' বললাম, 'নেতারা আর পরিচালকেরা ঘাবড়ে না গেলে সত্যি কথা বলেন না।' মৃণালবাবু এবার সশব্দে হেসে উঠলেন। তারপর সিগারেটের প্যাকেটটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে গম্ভীর মুখে বললেন, 'তাহলে আপনি নিজেই এতক্ষণ মিথ্যে কথা বলছিলেন। আপনি আলাপ করতেও আসেন নি গল্প করতেও আসেন নি। এসেছেন তথ্য সংগ্রহ করতে। বেশ বের করুন আপনার নোট বুক লিখুন আমার নাম শ্রীমৃণাল সেন···হাউ ইউ স্পেলিং?'

মৃণালবাবুর কৌতুক প্রবণতার ঝোঁক আছে, কথাটা অনেক কাল ধরে আমি শুনেই আসছি এবার তার চাক্ষুষ পরিচয় পেলাম।

মৃণালবাবু আমার দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বললেন, 'ওকি আপনি এখনো নোটবুক বের করেননি যে?'

বললাম, 'আমার সব ক্ষেত্রে নোট বুকের দরকার হয় না, তবে বের করছি।'

মৃণালবাবু বললেন, 'বলেন কি! সব কণ্ঠস্থ করে নেবেন? কিন্তু ভুল যদি হয়?'

বললাম, 'হয়তো হল। খাঁটি তথ্যের ওপর আপনার তো অধিকার নেই।'

মৃণালবাবু বললেন, 'সর্বনাশ। তাই বলে সেই বিশ্বাসটা কি আমার নিজের ওপরই চালাতে বলেন নাকি আপনি। ধরুন আমি উঁচু ৫ ফুট ৭-৮ ইঞ্চি আর ওজন ১ মন ২৬-২৭ সের, মনের ভুলে আপনি ফিসারে এমন গোলমাল করে দিলেন যে যাঁরা আমার ছবি দেখেননি তাঁরা আমাকে বেঁটে মোটা গণেশ বলে ভেবে বসলেন। প্রডিউসার যদি তাই ভাবেন তাহলেই হয়েছে আর কি।'

হেসে বললাম 'তবেই দেখুন। তথ্যকে যতখানি অকিঞ্চিৎকর বলে ভেবেছিলেন আসলে তা কিন্তু ততখানি নয়। পান থেকে চুন খসলে কোনো কোনো সময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই খসে পরে। সংসারে রিপোর্টার আর কলমনিষ্টদেরও প্রয়োজন আছে, তার নোট বুকটাকেও অ-দরকারী বলে ফেলে দিতে পারেন না।' মৃণালবাবু হেসে আপত্তি করলেন—'কে ফেলতে বলছে আপনাকে?' আপনি সুবোধ বালকের মতো লিখুন আমি বলে যাই।' ···দেখুন তাতে ঠিক আমার কাজ হবে না। তাছাড়া রিপোর্টার আর কলমনিষ্টদের পক্ষে যতই ওকালতি করি না কেন, তাতে আমি রিপোর্টার ঠিক নই। তার চেয়ে আপনি বরং মাটীর মানুষের পর কি করছেন বলুন।

মৃণালবাবু নিজের হাতে ছোট্ট করে কয়েকটা ইংরাজী লাইন লিখে দিয়েছেন তার ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর ব্যাপারে :—

With the remarkable record I have acquired at the Box office all these years (you feel crushed really!), I cannot afford to indulge in any future plans. All I can say. I am in the midst of such and such production. Thats is all. I am at the moment nearing completion of production —a large Documentary in Eastman Colour

on 5000 year's history of India. The future to me is uncertain.

বাংলা ছবিতে আজ যাঁরা 'new wave movement'-এর অগ্রণী মৃণাল সেন তাঁদের অন্যতম। Tempo এবং cinematic movement নাকি সব সময় তাঁর ছবিতে পাওয়া যায় না—কথাটা আমার নয়—কেউ কেউ বলেন। চলা ও বলার আজকের দর্শকের কাছে অনেক বক্তব্যই হয়তো ভীড় করছে কিন্তু তাই বলে Tempo আর Cinematic movement সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্যকে শ্রদ্ধা জানাতে পারলাম না। চলচ্চিত্র জগতে মৃণাল সেনের আবির্ভাব বেশী দিনের নয়। সংক্ষেপিত আবির্ভাবেই দর্শক তাঁকে চেনেন। ওঁর পরিচালিত ছবিগুলি হচ্ছে রাত ভোর, নীল আকাশের নীচে, বাইশে শ্রাবণ, পুনশ্চ, অবশেষে, প্রতিনিধি, আকাশ কুসুম, মাটীর মানুষ ও রিপাবলিক অফ ইণ্ডিয়া। মৃনাল সেনের পরবর্তী ছবির প্রসঙ্গে যখন কথা তুললাম তখন উনি যা বললেন সেটা কিন্তু খুব একটা আশা ব্যঞ্জক নয় বরং ভাবনারই কথা। উনি বলেছেন ভবিষ্যতের কথা জানি না—ভবিষ্যৎ আমার কাছে অনিশ্চিত। কোন দুঃখের কথা মৃণাল সেনের জীবনে কতখানি ঘটেছে জানি না তবে এ কথা তো ঠিক যে ভালো ছবি করেও উনি কোনো দিনই বক্স অফিসের আনুকূল্য অর্জন করতে পারেননি। নীল আকাশের নীচে ছবিটাই বোধ হয় একমাত্র যা বক্স অফিস সমাদরে ধন্য। সর্বশেষ (এখন পর্যন্ত) বাংলা ছবি আকাশ কুসুমকে নিয়ে বহু বিতর্কের অবতারণা ঘটেছিলো যার কথা বাংলা দেশের দর্শক মাত্রই জানেন। ছবিটি সমকালীন কাহিনী ভিত্তিক হয়েও দর্শক মনোরঞ্জনে অসমর্থ। কারণ বোঝানো যায়। গোলমাল কিছু হয়তো আছে তবে বলিষ্ঠ প্রয়াস সন্দেহ নেই।

আকাশ কুসুমের পর মৃণালবাবু একেবারে চলে এলেন ওড়িশা ভাষায় ছবি করতে। মাটীর মানুষ—ছবি হিসাবে আমার কাছে এটি মৃণাল সেনের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে। ওড়িশায় ছবিটি বিতর্কিত এবং কমপ্লিটলি ফ্লপ্। তবে শান্তি চৌধুরীর (লিটল সিনেমা করপোরেশন) প্রচেষ্টায় এবারকার ভেনিস্ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে হয়তো মাটীর মানুষ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। ভেনিস উৎসব অনুষ্ঠানে বহু পূর্বেই মৃণাল সেনের সঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ। অতএব মাটীর মানুষ সম্পর্কিত যদি কোন সাম্প্রতিক খবর ঘটে যায় তবে সেটা আমার লেখার পরেই হয়েছে যার জন্য সে বিবরণ এখানে স্থান পায় নি। মাটীর মানুষ ছবিটি পরিচালনা করে মৃণালবাবু বেশ খুশি হয়েছেন তবে ওঁর প্রযোজক হয়েছেন কিনা জানি না। এত ভালো সমবেত অভিনয় বোধ হয় বাংলা ছবিতেও বিরল। অন্তত আমি তো দেখিনি। ভাষা বুঝি বা নাই বুঝি মাটীর মানুষের অভিনয় দেখে চমকে গিয়েছিলাম। ওড়িশা সম্পর্কে ধারণা বদলে যায়।

মৃণালবাবুর বর্তমান ছবি ভারতীয় ফিল্ম ডিভিসনের পক্ষে ইন্দিরা কালার ডকুমেন্টারী রিপাবলিক অফ ইণ্ডিয়া। ছবিটি সমাপ্ত এবং সরকারের মাতব্বরেরাও পাশ করে দিয়েছেন। ৫০০০ হাজার বছরের ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাস এই ডকুমেন্টারী ছবিতে সংযোজিত করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই ছবিটি জনসাধারণের কাছে মুক্তি পাবে।

পরিশেষে মৃণাল সেন সিনেমার কথায় কিছু আলোচনা করলেন—"পিছিয়ে পড়ার দল, যাঁরা সমাজকে পেছনের থেকে টানছেন যাঁরা তাঁদের অক্ষমতা, অজ্ঞানতা ও সংস্কারাচ্ছন্ন মন নিয়ে সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পেরে চরম বিরোধিতা করছেন সমাজ সচেতন মুষ্টিমেয় শিল্পী আর স্রষ্টাদের সঙ্গে। এঁদের বিরোধ সামাজিক চেতনার সঙ্গে সমাজের নতুনতর ধ্যানের সঙ্গে। এঁরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের মহান আন্দোলনের ধার ধারেন না এবং অতি সহজেই এঁরা যুদ্ধোত্তর যুগের মহত্তর অবদান গভীর জীবনবোধ অনুপ্রাণিত 'নিও রিয়্যালিজম্'-কে নাকচ করে দিতে চাইছেন। এই তো সেদিনও কলকাতার এক দৈনিকে পড়েছি, আমাদেরই দেশের একজন চলচ্চিত্রকার বলেছেন, নিওরিয়্যালিজম নাকি যুদ্ধোত্তর যুগের প্রচণ্ড হতাশার প্রতিফলন। কথাটা নিঃসন্দেহে ভদ্রলোকের অসামান্য অজ্ঞতারই পরিচায়ক। এবং সর্বোপরি এঁরা ধোঁয়াই পাড়ছেন ব্যবসার। ধোঁয়াই পেড়ে আসাধ্য ক্রিইকে টমাস মান্ এর ওপর তুলে ধরার চেষ্টা যেমন হাস্যকরভাবে করুণ ঠিক তেমনি সিনেমার ক্ষেত্রেও এঁদের এই ধোঁয়াই নিতান্তই দুর্বল ও ব্যর্থ। সাময়িকভাবে হোঁচট খাবেন হয়তো, তবু এই সচেতন দলটি কিছুতেই বাতিল হয়ে যাবে না কারণ সামাজিক চেতনা এঁদের এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে, অপ্রতিহত শক্তি ও গতি!

এবং সভ্যতার ইতিহাস বলছে, চৈতন্যের জয় অনিবার্যভাবেই সত্য।"

চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে মৃণালবাবু আর এর বেশী কিছু বলতে উন্মুখ নন। তবে মাটীর মানুষের পর সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের 'ইচ্ছাপূরণ' কাহিনীর চিত্ররূপই হবে তাঁর পরবর্তী প্রয়াস। প্রীতি বিনিময়ের পালা সাঙ্গ করে বিদায় নিলাম প্রায় ঘণ্টা খানেকের আলোচনা করে।

'বালিকা বধূ'
ছবির পর তরুণ মজুমদারের পরবর্তী প্রয়াস

পরিচালক তরুণ মজুমদার এই নামটি আজ আর সারা বাংলার কাছে অজানা নয়। নিজের নামে তরুণবাবুর প্রথম পরিচালিত ছবি আলোর পিপাসা—তারপর একটুকু বাসা ও বালিকা বধূ। অবশ্য এর পূর্বে যাত্রিক গোষ্ঠীর পক্ষে ফ্রোর কনডাক্টর বা পরিচালনার অংশ গ্রহণ উনিই করতেন। যাত্রিক গোষ্ঠীর আমলে তরুণবাবু, পরিচালক শচীন মুখার্জী এবং প্রযোজক-অভিনেতা দিলীপ মুখার্জী এঁদের সমবেত প্রচেষ্টাতেই চাওয়া পাওয়া, স্মৃতিটুকু থাক, কাঁচের স্বর্গ ও পলাতক এই ছবি কটি নির্মিত হয়েছিলো।

পলাতক-এর পর যাত্রিক গোষ্ঠী ভেঙ্গে গেছে—এখন যে যার স্বাধীন একক প্রচেষ্টায় রত। যাত্রিক-এর তিন জনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুনাম বোধহয় পেয়েছেন তরুণবাবু। এই অসাধারণ সাফল্যের মূলে আছে তরুণবাবুর ব্যক্তিত্ব আর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তরুণবাবুর সহপাঠী বন্ধুরা তাঁর কথা উঠলে বলেন, লেখাপড়ায় তিনি চিরকালই ভোম্বা ছিলেন, গ্রুপকীট না হয়েও সসম্মানে পরীক্ষা পাশ করতে তাঁর কোনো কালে বেগ পেতে হয়নি। লেখা-পড়ার বাইরেও নানা ব্যাপারে তিনি বরাবরই চটপটে ও উৎসাহী ছিলেন। কেননা—তরুণবাবু যখনই যাতে হাত দিয়েছেন প্রায় সব সময়েই তা ভালোভাবে করতে পেরেছেন।

কর্মজীবনের প্রথমে তরুণবাবু সিনেমার পাবলিসিটি করতেন। কাজকর্ম দেখে সবাই বুঝেছিলেন যে চলচ্চিত্রের বৃহত্তর ক্ষেত্র অদূর ভবিষ্যতে ওঁর জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। কথাটা অত্যন্ত খাঁটী সত্য। অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীমতী পিকচার্সের পক্ষ থেকে আহ্বান এলো। সহকারী পরিচালক হিসাবে গ্রহণ করলেন পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য। শ্রীমতী পিকচার্সের এই ইউনিটেই তরুণবাবু, দিলীপবাবু ও শচীনবাবু একই সঙ্গে কাজ করতেন। ১৯৫৮ সালে এই তিনজন তরুণ যুবক শ্রীমতী পিকচার্স থেকে বেরিয়ে টাইম বিল্ডস্-এর ব্যানারে যাত্রিক নামের আড়ালে ছবি পরিচালনা শুরু করলেন। সংক্ষেপিত ভাবে এই হোলো তরুণবাবুর চলচ্চিত্র জীবনের পরিচয়।

তরুণ মজুমদার জনসাধারণের খুবই প্রিয়। বালিকা বধূ দেখে সাধারণ মানুষ সে কথা প্রমাণ করে দিয়েছেন। জনতার অভিনন্দন কুড়িয়ে এরকম বক্স অফিস সাফল্য ইদানীং কোনো বাংলা ছবিতে ঘটেছে কি না মনে তো পড়ে না। পলাতক যদিও নিজের নামে নয় তবু আমরা জানি এর পরিচালন দায়িত্ব ওঁর স্কন্ধেই ছিলো। পলাতক থেকেই তরুণবাবুর জীবনের মোড় ঘুরে গেছে। ধীরে ধীরে এর পর থেকেই স্বীয় সিদ্ধান্তগুলিতে অটল থেকে তরুণবাবু এগিয়ে চলেছেন তাঁর চলচ্চিত্র পরিক্রমায়।

তরুণ মজুমদারের নিজস্ব একটা রীতি বা ষ্টাইল আছে। লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় সহজ সরল উপাদানে জনতাকে উনি সন্তুষ্ট করতে চান। অহেতুক মিতব্যয়ের সঙ্গে রঙের কোমল সৌন্দর্যবিস্তার রচনা বোধহয় করতে চান না।

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে সমাজ সচেতন জটিল অথচ নিখুঁত বুননকে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় তরুণবাবু প্রকাশ করে থাকেন। ষ্টাইলের কারু নৈপুণ্যের গভীরে ভেতরে আদিক তরুণ মজুমদারের কর্মকুশলী প্রয়োগের চমৎকার নিদর্শন তাঁর সাম্প্রতিক কালের ছবিগুলি।

বালিকা বধূর অভাবনীয় সাফল্যের পর তরুণবাবুর পরবর্তী ছবি কিন্তু বাংলা ভাষায় হচ্ছে না। হচ্ছে হিন্দীতে

আর নাম হ'ল পলাতক। বিমল রায়ের অন্যতম সহকারী এবং বোম্বাইয়ের উদীয়মান হিন্দী পরিচালক—সমালোচক এবং গল্প লেখক গুলজার পলাতকের হিন্দী সংলাপ রচনা করছেন। হিন্দী ফলমের গল্পকার—কবিগুরু রেণুকেও বেশ কিছুদিন তরুণবাবুর সাথে দেখা যাচ্ছে তবে এখানে ওঁর কি ভূমিকা তা জানি না। যাই হোক গুলজারজী এলগাগাড়ে তরুণবাবুর সঙ্গে তাঁর এম. টি. স্টুডিও নম্বর ওয়ানের অফিস ঘরে বসে সংলাপের পর্ব শেষ করে ফেলেছেন। পুরো কাস্টিং কি হবে পলাতকের—সে আভাষ পরিপূর্ণভাবে তরুণবাবুর কাছ থেকে না পাওয়া গেলেও—কথার ইঙ্গিতে বুঝেছি যে বেশ কিছু নামকরা বোম্বাইয়ের চিত্রতারকা থাকছেন। তবে প্রধান ভূমিকায় যথারীতি অনুপকুমারই থাকছেন। তরুণবাবুর নির্দেশে অনুপবাবুর হিন্দী অনুশীলন বেশ ভালোভাবেই এগোচ্ছে। প্রসিদ্ধ সঙ্গীত পরিচালক হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় হিন্দী ভাষার পলাতক ছবিটির প্রযোজক এবং সুরকার। ব্যবস্থা সমস্তই পাকাপাকি—চুক্তিপত্রে বোম্বেতে স্বাক্ষরিত করা হয়ে গেছে তরুণবাবুর।

বালিকা বধূ'র পর কি করছেন তরুণবাবু? হঠাৎ এ প্রশ্নটা ওঁকে করলাম। উত্তর দিলেন, 'হিন্দী ভাষায় পলাতক'। উনি আরো বললেন যে বাংলার মেয়াদকে অক্ষুণ্ণ রেখেই ওঁর এই প্রয়াস। তবে প্রয়োজনের খাতিরে বোম্বাইয়ের কিছু কিছু বড় অফিস তারকা স্বাভাবিক-ভাবেই এসে পড়ছেন। বোধহয় ইটখোলা কালাপেই হচ্ছে ছবিটা।

নিজের লেখা গল্পের চিত্ররূপ আপাততঃ স্থগিত রয়েছে, কারণ পলাতক সমাপ্ত না হলে অন্য কোনো প্রকল্পের কথা ভাবাই যাবে না। এছাড়া নিজের গল্প আর পরের গল্পের মধ্যে ব্যবধানটা কম। পরের গল্পকেও অনেক সময় (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই) নিজের করে নিতে হয় অবশ্যই লেখককে তাঁর প্রাপ্য সম্মান অর্পণ করে। বালিকা বধূ ছবিটা প্রধানত কি কারণে অনুপ্রাণিত হয়ে করেছিলেন তার সম্বন্ধে শ্রীমধুদারের অভিমত, "একটা NOS-TALGIC FEELING. মানে অতীতে ফিরে যাওয়া। সেকালের বিয়ে, ছোল-দুর্গোৎসব : পরিবেশ আর সব মিলিয়ে বেশ একটা উনবিংশ শতাব্দীর মেজাজ।

সব সময়েই যে কেবল ধরা বাঁধা গল্প নিতে হবে তা তো নয়—তাইতারপান থাকাটা অন্যায় নয়—I mean it."

তরুণ মধুদারের ছবিগুলির গঠনকাঠ সম্পর্কে একটি বক্তব্য সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। চলচ্চিত্রকাররূপে আবির্ভূত হতে গিয়ে যে দোড় অনুভব করেছিলেন যে হতাশা তাঁকে মর্মবেদনা দিয়েছিল, হয়তো নিজের অজ্ঞাতেই তাঁর ছবিগুলির মধ্যে তিনি সেই চিত্রকার সত্তাকে সঞ্চারিত করেছেন। তাই তারা নাটকীয়তা-ক্রান্ত extreme character সৃষ্টির অন্তে কখনো অতি নাটকীয় মনে হতে পারে। যেমন বালিকা বধূ'র মাষ্টার মশাই আর পলাতক বা অন্য কোনো ছবির দু'একটা চরিত্র। জীবনের কোনো কোনো এ ধরণের চরিত্র নিশ্চয়ই তাঁর দেখা আছে নইলে ক্যামেরার চোখে দেখালেন কি করে? জীবনের কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা ভাবকে ত্রিযক-রীতিতে ইঙ্গিতধর্মী পরিস্থিতিতে বিন্যস্ত করাই হচ্ছে শিল্পীর কাজ। তরুণবাবু মুখ্যত জনসাধারণের পরিচালক। এই জনসাধারণ আবার নব শ্রেণীর মধ্যে 'নন্দিত'। অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্গ যাঁরা তাঁরাও মানবিকতার দিক থেকে এদেরই আত্মজন। আঙ্গিকিতা সত্ত্বেও তরুণবাবুর ছবিতে যে জনগণের সন্ধান মেলে—দেশের যে বৃহত্তর সত্তার সংবাদ তাঁর সৃষ্টিতে পাওয়া যায়, এর পূর্বে এমনটি আমরা আর কারো কাছ থেকে পাইনি সে কথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

শিল্পী হিসাবে তরুণবাবু বুদ্ধিদীপ্ত এবং রিয়ালিষ্টি। কিন্তু তা হলেও ওঁর এক ধরণের ছবি তোলার মোহ আছে। ওঁর প্রতিটি ছবিতেই রোমান্টিক আবেগ এবং নাটকীয়তার পরিবেশন উপভোগ্য হিসাবেই উপস্থিত। আমার নিজের মনে হয় এখন ওঁর পক্ষে একটা নূতন এক্স-পেরিমেন্টাল ছবি তৈরি করা একান্তই প্রয়োজন—সহজেই ওঁর পক্ষে সম্ভব।

নিজের কোন্ ছবিটি সবচেয়ে ভালো লেগেছে বা লাগে একথার কোনো উত্তর শ্রীমধুদার দিতে পারেন নি। ওঁর মনে হয় প্রশ্নটা রিলেটিভ কাজেই উত্তরটা নেগেটিভ হওয়া ভাল। হেসে বলেছিলেন—But as negative relative 'But me no But's'। তরুণবাবুর ধারণা দর্শকেরাই একথার জবাব দিতে পারেন—কি ভালো কি মন্দ আমার বলার কিছু নেই।

চলচ্চিত্রে সাহিত্যের প্রভাব

আশাপূর্ণা মুখোপাধ্যায়

শিল্পকলার প্রাচীনতম শাখা হল সাহিত্য। সাহিত্যের এই মূল শাখা থেকে কালক্রমে সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্র, নাট্য এবং চলচ্চিত্রের জন্ম। সুতরাং চলচ্চিত্রে যে সাহিত্যের প্রভাব থাকবে তাতে আর সন্দেহ কি। তবে আজকের চলচ্চিত্র স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম হিসেবে স্বকীয়তার দাবী করতে পারে। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, চলচ্চিত্র স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম হলেও সাহিত্যের সঙ্গে তার একটা নাড়ির সম্পর্ক রয়ে গেছে। কারণ এই দু'য়েরই জন্ম চারুকলাকুলে। সুতরাং শিল্পকলার এই বিভিন্ন বংশধরেরা সাহিত্যেরই এক পরিবারভুক্ত। তবে এক পরিবারে জন্ম হলেও এদের চিন্তা-ভাবনা এবং প্রকাশ-ভঙ্গির তফাৎ আছে। সবাই যদি এক হত তাহলে একের পর আর এক আসত না। রূপান্তর ঘটত না।

অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলা চলচ্চিত্র অনেক বেশি সাহিত্য-নির্ভর। কারণ নাটক-অন্ত-প্রাণ বাংলা দেশ। কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় উপাদান না থাকলে বাঙালীর মন আকৃষ্ট হয় না। সুতরাং চলচ্চিত্রনির্মাতারা অযুত-নিযুত দর্শকদের খুশি করার জন্য সাহিত্যের জনপ্রিয় গল্প-উপন্যাসের চিত্ররূপ দিতে বেশি অনুরাগী। বেশি আগ্রহী।

চলচ্চিত্র-কাহিনীর জন্য সাহিত্যকে অবলম্বন করার ঝোঁক বাংলা চলচ্চিত্রের আদিকাল থেকেই চলে আসছে। তখনকার চিত্রনির্মাতাদের উদ্দেশ্য ছিল জনপ্রিয় গল্প-উপন্যাসকে চিত্রায়িত করে জনসাধারণকে চলচ্চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট করা। তাই নির্বাক যুগ থেকেই চলচ্চিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের লেখা কাহিনী স্থান পেতে শুরু করেছে।

জানেশ মুখার্জী পরিচালিত "তিন ভুবন" ছবিতে মাধবী মুখার্জী ও শেফালী ব্যানার্জী।

তখনকার দিনের চিত্রনির্মাতারা জনপ্রিয় সাহিত্যের চিত্ররূপ দিয়ে নিজেদের মর্যাদা বাড়ানোর কথাটাও ভাবতেন। কারণ সিনেমা তখন স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যমের কৌলিন্য পায়নি। সবাই এ শিল্পীকে নীচু চোখে দেখত। সুতরাং সাধারণ লোকের এই হেয়ভাবকে দূর করার জন্য চিত্রনির্মাতারা বিখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনাকে চলচ্চিত্রে তুলে ধরতে চেষ্টা করলেন। ফলে সাধারণ দর্শকেরা যে সব সাহিত্যিকদের নাম শুনে এসেছেন বা যাঁদের লেখা পড়েছেন সেইসব কাহিনী জীবন্তরূপে পর্দায় দেখতে পাওয়া যাবে ভেবে চলচ্চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগল। এবং ক্রমশ চলচ্চিত্রে সাহিত্যের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল।

মহৎ চলচ্চিত্র সৃষ্টিতে মহৎ সাহিত্যই যে প্রেরণার উৎস এ সত্যটি আজ প্রমাণিত। কারণ বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসের প্রথম পর্বে চলচ্চিত্রকে মহিমান্বিত করেছেন প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁর 'দেবদাস' ছবিতে। এই সফল চিত্রটির প্রেরণার উৎস শরৎ-কাহিনীর রসপুষ্ট সাহিত্য থেকে। তারপর এই যুগান্তকারি সৃষ্টির দুই দশকের পর বাংলা চলচ্চিত্রে তথা বিশ্বে সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালী' ছবিতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তারও প্রেরণার মূলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' একটি বৃহৎ সাহিত্য। বিশ্ব বন্দিত পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রও সাহিত্যের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। একবার 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' এবং 'নায়ক' ছবি দুটি ছাড়া প্রায় সবই ব্যতিক্রম নয়। সমাজ জীবনের দর্পণ বলতে সাহিত্যকেই বোঝায়। সমাজের যা কিছু ভাল মন্দ তা আগে সাহিত্যেই ধরা পড়ে। তারপর চলচ্চিত্রে পরিচালক সে ছবি আঁকেন।

বাংলা চলচ্চিত্রের শুরু থেকে আজও সাহিত্যকে চলচ্চিত্র আশ্রয় করে আছে। চলচ্চিত্রে সেই যে বঙ্কিমচন্দ্র-কাহিনীর চিত্ররূপ দেওয়া শুরু হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের যুগেও শেষ হয়নি। আজও

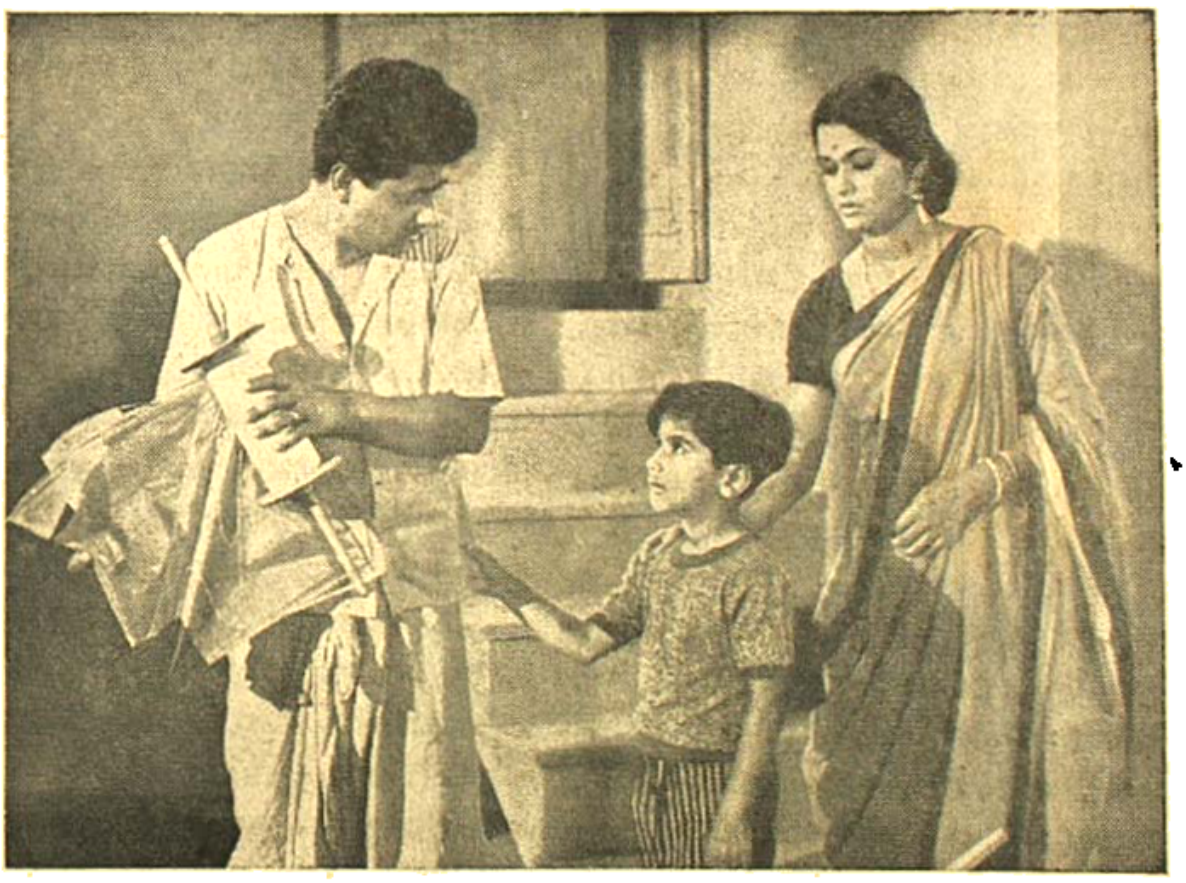

পিনাকী মুখার্জী পরিচালিত বি, কে, প্রোডাকসন্সএর ছবি "মহাশ্বেতা" ছবির শিল্পীবৃন্দ হলেন সুখেন দাস, শ্রীমান মলয় ও অঞ্জনা ভৌমিক।

বর্তমানের জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ কাহিনীর চিত্ররূপ চলচ্চিত্রে স্থান পাচ্ছে। নির্বাক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যে সব সাহিত্য-রচনাকে চলচ্চিত্রায়িত করা হয়েছে তার একটা ধারাবাহিক তালিকা পাঠকদের সুবিধার্থে এখানে তুলে ধরতে চাইছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী নির্বাক ও সবাক যুগে

বিষবৃক্ষ (১৯২২, ৩৬, ৫২), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৯২৭, ৩২, ৫২), দুর্গেশনন্দিনী (১৯২৭, ৫১), ইন্দিরা (১৯২৯, ৩১), কপালকুণ্ডলা (১৯২৯, ৩২, ৫২), রজনী (১৯২৯, ৩৬), রাধারানী (১৯৩৮), রাজসিংহ (১৯৩৩), মৃণালিনী (১৯৩৩), দেবীচৌধুরানী (১৯৩১, ৪৮), চন্দ্রশেখর (১৯৪৭), আনন্দমঠ (১৯৫১) প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের কাহিনী নির্বাক ও সবাক যুগে

মানভঞ্জন (১৯২৩), বিচারক (১৯২৯), গিরিবালা (১৯৩০), ছালিয়া (১৯৩০), নষ্টীর পূজা (১৯৩২), চিরকুমার সভা (১৯৩১, ৫২), গোরা, (১৯৩৮), চোখের বালি (১৯৩৮), নৌকাডুবি (১৯৪৭), নষ্টনীড় (১৯৫১), চারুলতা (৬৭), বৌঠাকুরানীর হাট (১৯৫২), চিত্রাঙ্গদা (১৯৫৫), কাবুলিওয়ালা (১৯৫৭), যোগাযোগ (১৯৫৮), তিনকন্যা—মণিহারা, পোস্টমাষ্টার ও সমাপ্তি (১৯৬১), শাস্তি (১৯৬২), খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন (১৯৬৩), দুরিতপাষাণ (১৯৬৩), নিশীথে (১৯৬৩), শুভা ও দেবতার গ্রাস (১৯৬৩), অতিথি (১৯৬৫) প্রভৃতি।

শরৎচন্দ্রের কাহিনী নির্বাক ও সবাক যুগে

আঁধারে আলো (১৯২২, ৫৭), চন্দ্রনাথ (১৯২২, ৫৭), দেবদাস (১৯২৯, ৩৫), শ্রীকান্ত (১৯৩০), চরিত্রহীন (১৯৩১), স্বামী (১৯৩১, ৪৯), বেনা পাওনা (১৯৩১), পল্লীসমাজ (১৯৩২, ৫২), গৃহদাহ (১৯৩৬, ৬৭), বিজয়া (১৯৩৬), পণ্ডিতমশাই (১৯৩৬, ৫১), বড়দিদি (১৯৩৯, ৫৭), কাশীনাথ (১৯৪০), বিরাজ বৌ (১৯৪৬), পথের দাবী (১৯৪৭), রামের সুমতি (১৯৪৭), মেজদিদি (১৯৫০), দত্তা (১৯৫১), বিন্দুর ছেলে (১৯৫২), শুভদা (১৯৫২), নিষ্কৃতি (১৯৫৫), সতী (১৯৫৪), বোড়শী (১৯৫৪), নিষ্কৃতি কল (১৯৫৫), পরেশ (১৯৫৫), বামুনের কল (১৯৫৫), রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত (১৯৫৮), ছবি (৭৯৫৯), ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি (১৯৬২), অন্না (৭৯৬৪), অভয়া ও শ্রীকান্ত (১৯৬৫) প্রভৃতি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী

কবি (১৯৩৮), সন্ধীপন পাঠশালা (১৯৪৮), চাঁপাডাঙার বউ (১৯৫৪), হাইকমল (১৯৫৫), কালিন্দী (১৯৫৫), নাগিনী কন্যার কাহিনী (১৯৫৮), জলসাঘর (১৯৫৮), বিচারক (১৯৫৯), হসপিটাল (১৯৬৩), সপ্তপদী (১৯৬১), কাল্না (১৯৬২), হাসুলি বাঁকের উপকথা (১৯৬২), উত্তরায়ণ (১৯৬৩), আরোগ্য নিকেতন (১৯৬৭) প্রভৃতি।

এছাড়া শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জ্যোতির্ময় রায়, অনুরূপা দেবী, প্রবোধকুমার সান্যাল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, জরাসন্ধ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, প্রমথনাথ বিশী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গজেন মিত্র, সমরেশ বসু, বিমল কর, আশাপূর্ণা দেবী প্রভৃতি জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের রচনা নিয়েও শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এবং হচ্ছে।

আজকের চলচ্চিত্র স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও, তার কলা কৌশলে কৌলিন্য ঘটলেও বাংলা চলচ্চিত্রে সাহিত্যকে চলচ্চিত্রায়িত করার ঐতিহ্য এখনও বর্তমান এবং অম্লান। সাহিত্যের প্রভাব থেকে চলচ্চিত্র এখনও মুক্তি পায়নি। অদূর ভবিষ্যতে মুক্তি ঘটবে কিনা বলতে পারি না, কারণ সাহিত্য আর চলচ্চিত্রের জন্ম একই চারুকলাকুলে।

● ● ●

চিত্র জগৎ

চিত্র জগৎ

চিত্র জগৎ

॥ কৌশিক ॥

বাঙালীর সমাজ-জীবনে যে একদিন উচ্ছল প্রাণধারা প্রবাহিত হয় তার জীবন্ত প্রমাণ শারদোৎসব। শারদোৎসবের মূল সুর সামাজিক মানুষের গভীর একাত্মবোধ আর পারস্পরিক মিলনের আকর্ষণ। মমতা, সহানুভূতি ও একপ্রাণতার দিব্য-দ্যুতি দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। একদিন বাঙালীর বিত্ত ছিল, অর্থ ছিল, সামর্থ ছিল সেই দিনের বাঙালী কিন্তু শুধু আপন ভোগসুখ ও স্বার্থপরতার সংকীর্ণ গণ্ডীর মাঝে সীমাবদ্ধ করে রাখেনি তারা সমাজের সর্বস্তরে অর্থ, বিত্ত ও প্রাণ-প্রাচুর্যকে বিকীর্ণ করে দিয়েছে। উৎসবগুলির মধ্যে আমাদের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য নানাভাবে ফুটেছে। প্রকৃষ্ট এক আধুনিক উদাহরণ শারদোৎসবের প্রাক পর্বে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যাগুলি। আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্য আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মাঝখানে দাঁড়িয়েও বাঙালী বিস্মৃত হয়নি তার এই শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন থেকে। প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পূর্বে তাহেরপুরের হিন্দু রাজা কংসনারায়ণ বাংলাদেশে এই মহাপূজার প্রবর্তন করে গেছেন। এই শারদোৎসবের প্রাণোদ্বোধনকারী আকর্ষণ এখনো রয়ে গেছে বাংলা ও বাঙালীর অন্তরে। পুরাকালের ইতিহাসের পাতা থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে এটাই জানা যায় যে আধুনিক যুগের মত শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত না হলেও সাহিত্যরসের বা আলোচনা চক্রের আসর বসতো। সুতরাং এক্ষিনিসটা ট্রাডিশনাল সূত্রেই বাঙালী অর্জন করেছেন।

পুজো এসে গেছে সেই সঙ্গে সম্পাদকদলাইও আমাদের মত লেখকদের ঘেরাও করে ঘনঘোতি প্রেসে পৌঁছে দেবার বাণী কানের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েই খালাস। তারপর! তারপরের ভাবনা তো আমাদের, কারণ আপনাদের সন্তুষ্টিবিধানের সামান্যতম কাজে যদি আসতে পারি তাহলেই কৃতার্থ। কি লিখবো মানে কি ভাবে শুরু করবো চিন্তা করছি এমন সময় আমার টেলিফোনটা কনকন করে বেজে উঠলো—হ্যালো!'

মুক্তি প্রতীক্ষিত "বিবাহ বিভ্রাট" ছবির একটি দৃশ্যে অরুণ গাঙ্গুলী, অনুপকুমার ও লিলি চক্রবর্তী।

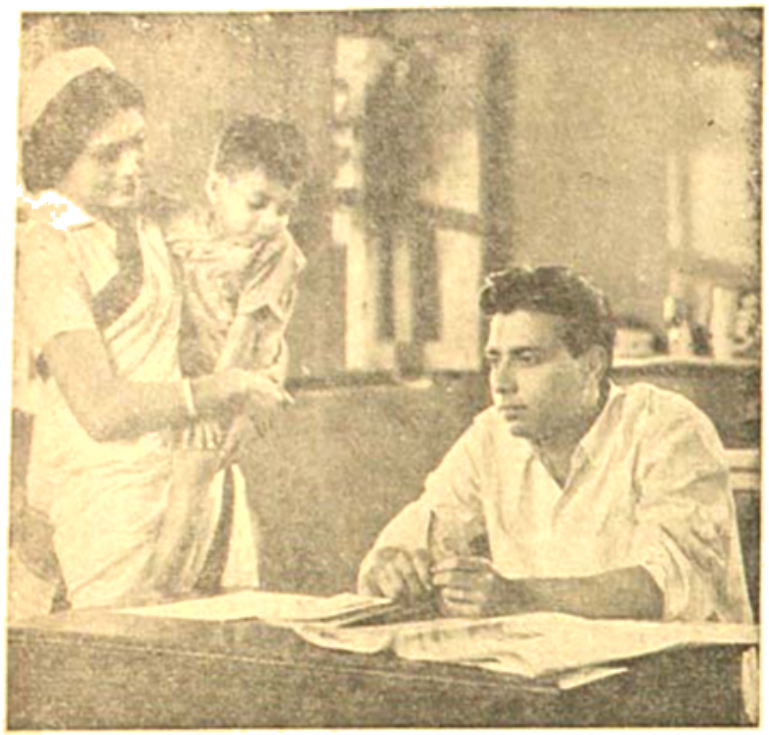

বিজয় বসু পরিচালিত "আরোগ্য নিকেতন" ছবিতে দিলীপ রায়, জহর গুহঠাকুরতা ও একজন শিশু শিল্পী।

কি! সব রেডি হয়েছে তো?'

আমতা, আমতা করে বললাম, রেডি তবে, টাইম তো পেয়োরনি।

শুনুন। কাভারেজগুলো যেন এমনি হয় যার সঙ্গে অন্য কোনো কাজের সাদৃশ্য না ধরা পড়ে।

আরে না মশাই অত কাঁচা ছেলে পান নি বুঝেছেন, আমাদের কাগজের একটা মর্যাদা আছে সেটা সব সময়েই বজায় রেখে চলি সুতরাং ডোন্ট···চিন্তা।

পুজো কি রকম হবে এবার সে চিন্তাতেই সারা দেশ মশগুল কিন্তু জহর রায় কি বলেন জানেন?

অসুবিধের সম্ভাবনা যদি না ঘেটে তাহলে মালদহকে ঘেরাও করে রেখে দেবো। তবে আটচল্লিশ ঘন্টা কন্টা নয় একেবারে যাবজ্জীবন বুঝলেন! জহর রায়ের প্রস্তাবটা খুব আনন্দজনক কারণ বাঙালীর ঘরে এখন লক্ষ্মী দেবীর কৃপাটা কিঞ্চিৎ কমে গেছে। শারদীয়ালয়ের প্রাক্কালে সবাই কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে প্রস্তুতি সবে নেতে রয়েছেন। লেখকদের চলেছে বিনিদ্র রজনীর সন্তান আপনাদের হাতে যাঁরা তুলে দিচ্ছেন সেই সমস্ত কর্মীর অক্লান্ত প্রয়াস অর্থাৎ যাঁরা ছাপাখানায় কাজ করেন। এছাড়া ব্লক ডিপার্টমেন্ট বাইণ্ডার প্যাকেট আর সারকুলেশন এত সব বিভাগ মিলিয়ে কার যার তুলনাটা কেবলমাত্র ফিল্মের সঙ্গেই তুলনীয় মানে ফিল্ম জগতেই কর্মপরিবেশের।

স্টুডিও পাড়ার মুখরোচক খবর পরিবেশন করার পূর্বে আপনাদের কাছে এবার নেপথ্যকর্মীদের কথা আর সেই সঙ্গে আরো কিছু বলার একটা অনুমতি নিয়েই আরম্ভ করলাম। সিনেমাটা এখন সমাজ জীবনে নিত্যকার অতি প্রয়োজনীয় অংশ। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর ছবি যে কোন স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম, তা কিন্তু তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত। অবশ্য ছবি দেখলে তার ভেতর থেকে খুন, বদমায়েস অথবা দুরাত্মার প্রভাব অপরিণত মনে যে প্রভাব বিস্তার করে সে দৃষ্টান্ত দুর্লভ না হলেও ছবি তার একমাত্র কারণ নয়। তবে অপরিণত বয়স্কদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়বার পিছনে নানা পারিপার্শ্বিক পরিবেশেই দায়ী, এর জন্য যাঁরা সিনেমাকে দায়ী করেন

সেটা কিন্তু ব্রাহ্ম।' এই সব নানান কথা আজকের দুনিয়ায় চলছে। তবে বাংলা ছবির সীমিত বাজারেই কিন্তু এই শিল্পের প্রধান অন্তরায়। নিজের দেশেও সব সময় ছবি করে যে রিলিজ হবে এমন কথা জোর দিয়ে কোনো প্রযোজক পরিচালক বলতে পারেন না। বাংলা ছবি নাকি যথেষ্ট প্রমোদ উপকরণে সমৃদ্ধ নয় সেজন্যই নাকি বেশী চলে না। কথাগুলো কাদের জানি না তবে সত্য নয়। বাংলাদেশের প্রতিটি প্রেক্ষাগৃহকে এমনভাবে আইনের আওতায় আনানো প্রয়োজন যার দ্বারা রিলিজের ব্যাপারে কোন প্রযোজক পরিবেশকদের দুর্ভাবনায় পড়তে হবে না—কাজটা সরকারের তরফ থেকেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা বারেবারেই কথাগুলি বলে আসছি আর সেই সঙ্গে আশা করছি এই বুঝি দুর্যোগের মেঘ কেটে গেলো। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা—এ ক্ষেত্রে একটা শতাব্দির অচলায়তন যেন মাটী পেড়ে বসে আছে—বিন্দুতেই নড়ছে না। দেখা যাক কতদিন চলে এমন অবস্থা!

বাংলা দেশে এক সময় চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন যেরোতো তার সঙ্গে আজকের দিনের অনেকখানি তফাৎ আছে। ২২শে আষাঢ় ১৩৪৭ তারিখের যুগান্তর প্রত্রিকায় প্রকাশিত: "মিলনের মধুরতায় চুম্বনের মাদকতায় আলিঙ্গনের তীব্রতায় যে প্রেম সার্থক হয়ে আছে বাস্তবের অনুভূতির মাঝে, আজ রূপালি পর্দার বুকে তাদেরই মিলন ও অভিসারের হু-বহু প্রতিচ্ছবি—নবতর বাধুর্যে অভিব্যক্ত।" "বাঙলা সেনসরের কাঁচির স্পর্শমুক্ত প্রথম আদিরসান্বিত চিত্র নাটক অনুষ্ঠান নৃত্যগীতাদি সম্ভারে পরিবেশিত অনন্য সাধারণ কৌতুক চিত্র।" সেকালের ধারা ছাড়িয়ে এখনকার দিনেই বোম্বাই ছবির বিজ্ঞাপনের বহুখানা অনুভব করুন। আজ আর বিজ্ঞাপনে এ সব কথা লেখা থাকে, না ছবির প্রতিলিপি ব্লকের মাধ্যমে সেক্ষেত্রে পরিস্ফুটিত। কথাটা যিনি বলেছিলেন আজ আর তাঁকে ইহজগতে পাওয়া যাবে না তবে তাঁর সেই কথার অনেক সমর্থকদেরই দেখলাম সেদিন ঐতিহ্য পড়ার সিঁড়ির প্রান্তে।

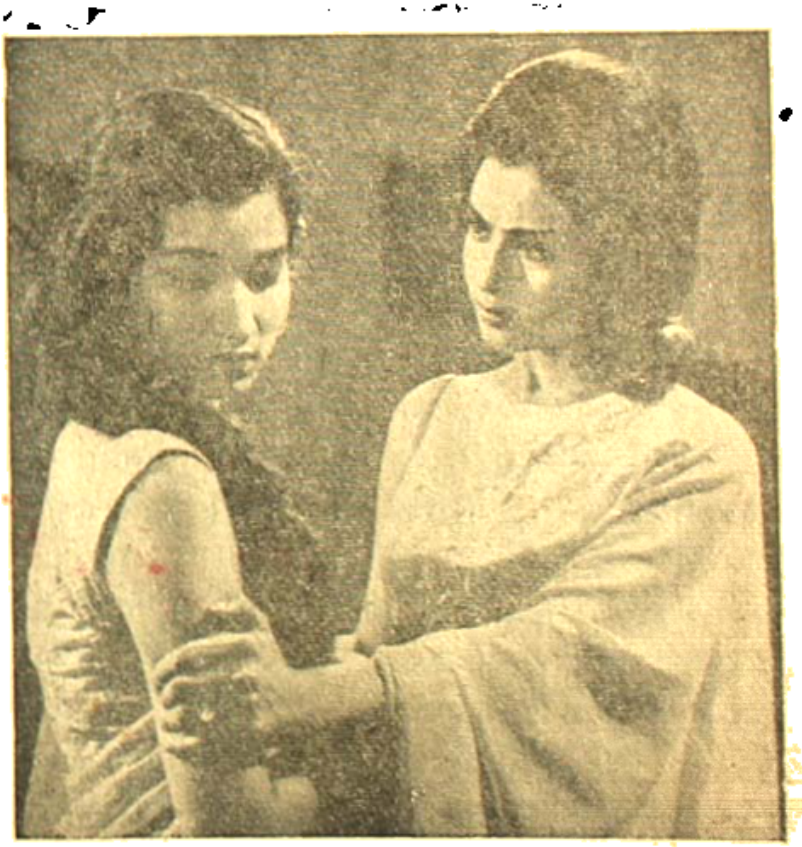

মঙ্গল চক্রবর্তীর পরিচালনায় "তিন অধ্যায়" ছবিটি এখন তোরে। এ ছবির দুই মুখ্য শিল্পী সুপ্রিয়া দেবী ও বিশ্বা রাও।

"সুরোধনীর সাথে" ছবির একটি দৃশ্যে দুই মুখ্য শিল্পী সুমিতা সান্যাল ও বিকাশ রায়।

কথাটা বলেছিলেন প্রযোজক অপূর্বকুমার চন্দ মহাশয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলচ্চিত্র আন্দোলনের তিনি ছিলেন একজন সার্থক সৃষ্টি। বাংলা ছবির বর্তমান সমস্যাকে ঘিরে অনেক কথা-বার্তাই চলছিলো এবং কিছুকাল ধরে চলবেও। কোনো কোনো প্রযোজক ভাবছেন বাংলা ছবির দুটো সংস্করণ হয়ে চলুক যথা বাংলা আর হিন্দী নতুবা বোম্বাই চঙের কিছুটা রঙরস কথা ট্রাউজার, ম্যাকস্, বিকিনি, বিছানার প্রণয় দৃশ্য, ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিয়ে প্রণয় নিবেদন ইত্যাদি ইত্যাদি। কথাগুলো কে বা কারা বলছেন বা ভাবছেন জানি না তবে স্পষ্টই বোঝা যায় একদল গোপন অর্থলোভী মানুষের একটা গুপ্ত চক্রান্ত এর পিছনে কাজ করে যাচ্ছে। এ সব মানুষ বাংলা বাঙালী বাদ দিয়েই বলছে কারো মিত্র নয়, এরা নিজেদের নিয়েই একটা বিশেষ শ্রেণী অর্থাৎ ক্লাশ বাই দেমসেলভস্।

বাংলা চলচ্চিত্রে নিয়োজিত বিভিন্ন কলাকুশলীদের স্থায়ী কোনো চাকরী নেই অর্থাৎ একটানা এক বছর ধরে বাইনে পাচ্ছেন এমন কোনো কুশলীকে চট্ করে দেখাতে পারবেন না। যদি কোনো গহিকে বড় বড় আরটিষ্টদের ছেটে ফলকে যাবার কল্যাণে প্রোডাকশনের নির্দ্ধারিত সময় বেড়ে চলে যায় তাহলেই এঁদের অতিরিক্ত মাইনে প্রাপ্তির আশা নতুবা যে ভিমিরে সেই ভিমিরেই এঁদের জীবন বয়ে চলে। পাঠকেরা ভাবছেন হঠাৎ এসব প্রশ্ন কেন? একটা কনসিসটেন্সি বা সমতা রক্ষার প্রয়োজনেই আমার এ বক্তব্য। নতুন প্রযোজক যাঁরা আসছেন বা পুরোনো সব প্রযোজক যাঁরা আছেন তাঁরাই জানেন যে আর্টিষ্টদের টাকা কমানোর কথা বলা মানে অপরাধ আর তত কম ওই টেকনিসিয়ানদের বেলায়।

ন মাস দশ মাস রক্ত জল করে খাটিয়ে ছ মাসের মাইনে দিয়েছেন টেকনিসিয়ানদের এবং কনট্রাকটে লিখিয়ে রেখেছেন ছ'মাসের পর আর মাইনে পাবেন না এমন প্রতিষ্ঠানও বছর দুই আগেও দেখা গেছে। কলকাতায় তারা নামকরা এবং দিনের উজ্জ্বল আলোতেই তাদের আনাগোনা। যাই হোক না কেন আর যেখান থেকেই হোক না কেন অন্তত প্রচেষ্টাগুলোকে বাদ দিয়ে ইনডাস্ট্রির সার্বিক উন্নতির কথা ভাবলে সবাই বাঁচবে। এ সব কথা আবার জানা বা সংগ্রহ বাংলা দেশের টেকনিসিয়ানদের কাছ থেকে কারণ চিত্র জগতের পাতায় স্বভাবেই ওঁরা চান ওঁদের ব্যথার কথা পরিবেশন হোক। ভুলে যাক দর্শক-জনতা পাঠক আর অগণিত মানুষ যে বাংলা দেশের

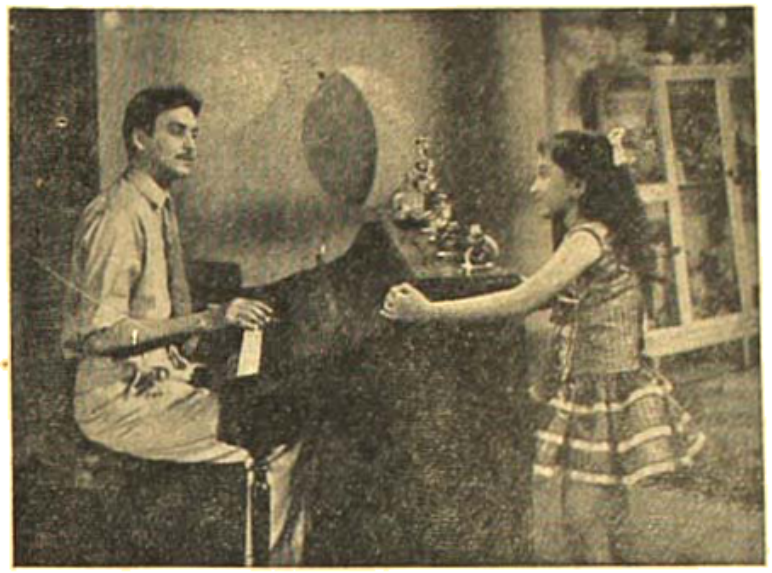

সলিল সেন পরিচালিত "অজানা শত্রু" ছবির একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চ্যাটার্জী ও একজন বিদেশিনী।

টেকনিশিয়ানরা লাখ-লাখ টাকার মালিক। আর্টিষ্ট আর টেকনিশিয়ানদের প্রাপ্যতে আকাশ পাতাল ব্যবধান। লাখ আর শ'য়ে অতএব এই বৈষম্য দূর করে সুস্থমনোভাব জাগ্রত না করলে শিল্প জগৎ হাওয়া হয়ে যাবে। ছবি রিলিজের সমস্যা দূর করে নতুন ছবির পথকে সুগম করে প্রযোজক ও পরিবেশকরা বাঁচুন নইলে বাংলার চিত্র জগৎ অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। অজিত চৌধুরীর ভাষায় বলি বাংলার ছবি—বাংলার ছায়া ছবি দেখুন।

এবারে চলুন স্টুডিও পাড়ায় সমাচারে যাওয়া যাক। অভিনেতা পরিচালক মধু বসু কোম্পানীর ব্যাপারে খুবই উৎসাহী মহিলা। সম্প্রতি প্রযোজক ব্যানার্জীর সঙ্গে কথা প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই উনি তার চিত্রনাট্য ক্রয় করে চিত্রনাট্য তৈরী করে শুটিং আরম্ভ করে দিয়েছেন। অমিয় গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা এবার আলোক-চিত্র পরিচালনা করছেন। ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওর মহরতের পর বেশ কয়েকটা দিন শুটিং করেছেন হিরেন্ বসু।

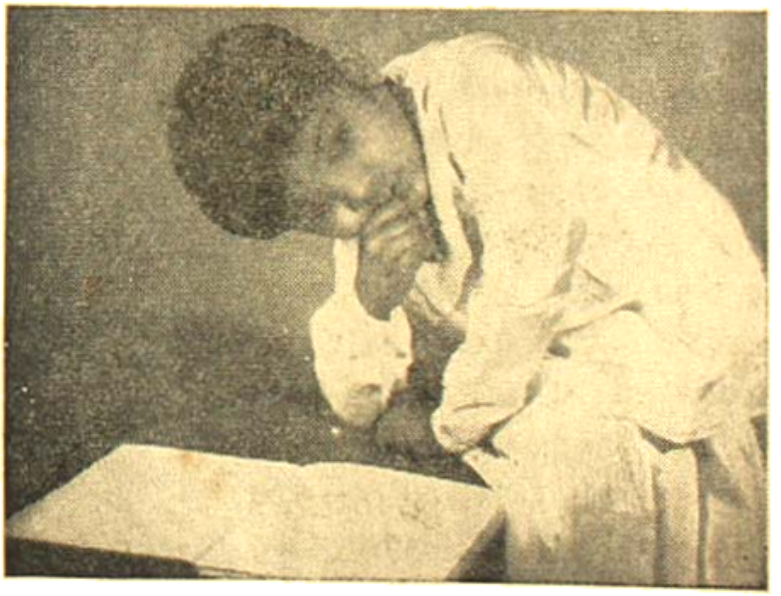

"ছোট্ট জিজ্ঞাসা" ছবিতে ছোট্ট প্রসেনজিৎ।

"মহাশ্বেতা" ছবিতে হই টেকিংএর আগে পরিচালক পিনাকী মুখার্জী অঞ্জনা ভৌমিককে শেষ নির্দেশ দিচ্ছেন।

ছবির ভার অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছেন তিনি। মহাশ্বেতা এ কাহিনীর নায়ক আর নায়িকা যথাক্রমে সোমেন চক্রবর্তী আর বাসবী নন্দী। 'ঋত্বিক' নামে শৈলেন মুখার্জী প্রতিষ্ঠিত নাট্য সংস্থায় এই তরুণ যুবকটিকে আমি দেখেছি এবং শৈলেনবাবুর মাধ্যমেই ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ। অদূর ভবিষ্যতে ছবিতে যে কেউ না কেউ ওঁকে অভিনয় করাবেন এ কথাটা কিন্তু আমার মনে হয়েছিল। কথাটার সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছেন সোমেনবাবু। আবার আসা যাক মূল প্রসঙ্গে। সলাকার কাঁচায় ক্লাপ দিয়ে শুভ মহরৎ শুরু করেন প্রখ্যাত অভিনেত্রী কানন দেবী। অসুস্থতার পর জন সমক্ষে এইটেই ছিল কানন দেবীর প্রথম আত্ম প্রকাশ। স্টুডিওতে সমকালীন অবস্থানে সবাই ওঁর পারীরিক সুস্থতার কথা জিজ্ঞেস করতে করতে ওঁকে ভীষণ ব্যস্ত করে তুলেছিলেন। সলাকার কাঁটা বন্ধ দেখে তৃতীয় পরিচালনার ছবি।

গুরুকে দেখবো—গুরুর কথা শুনবো। কথাগুলি কোত্থেকে এসেছে বলতে পারেন! চট্ করে পারবেন না। তবে শুধুন জনপ্রিয় উত্তমকুমারকে তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা বলু গুরু নামে সম্বোধন করে থাকেন বুঝলেন। অতীতকালের বহু দিকপাল অভিনেতা অভিনেত্রীদের জনপ্রিয়তার কথা আজকের দিনে দু একজন প্রবীণের মুখে শুনেছি—তাঁদের

"প্রতিদান" ছবির নায়ক অনিল চ্যাটার্জী।

"লালবাঈ" ছবির মহরৎ অনুষ্ঠান। ক্লেপার হাতে প্রযোজক সাংবাদিক সাগরময় ঘোষ, মহরৎ শিল্পী সাবিত্রী চ্যাটার্জী পাশে পরিচালক চিত্ত বসু ও কাহিনী-কার হরাপদ চৌধুরী।

সেই শোনা আর আমার দেখা মুছে নিলে মনে হয়—উত্তম-কুমারের মত এতখানি জনপ্রিয়তা বোধহয় আর কারো ভাগ্যেই জোটে নি। উত্তমকুমারের হঠাৎ অসুস্থ হবার খবরে সারা দেশের মানুষ যেভাবে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন তার দ্বারা আবার প্রমাণ হলো উত্তমকুমার জনতার প্রাণের মানুষ। সে প্রমাণ আবার পাওয়া গেল ২১শে জুলাই এন. টি. নাম্বার টুএ ফ্লোরে, প্রায় তিন মাস পর উত্তমকুমার যখন চিড়িয়াখানা ছবির শুটিংয়ে উপস্থিত হলেন। স্মরণ থাকতে পারে এই চিড়িয়াখানা ছবির শুটিংয়ের দিনই ২৬শে এপ্রিল উত্তমকুমার এন. টি. নম্বর ওয়ানে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ২৬শে এপ্রিল, সেদিন প্রথম ওঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন সুদর্শন অভিনেতা শুভেন্দু চ্যাটার্জী। ঐ চ্যাটার্জী একজন এম. বি. বি. এস চিকিৎসক। এন. টি. টুতে উত্তমকুমারকে সবাই স্বাগত

পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী পরিচালিত "ভাই সোরেন্দা অফ এ্যাসিস্টেন্ট" ছবির নায়ক-নায়িকা শুভেন্দু ও লিলি চক্রবর্তী।

"তীরভূমি" ছবিতে দেখতে পাবেন জ্যোৎস্না বিশ্বাসকে।

অভিনন্দন জানালেন। পরিচালক সত্যজিৎ রায় সেদিন অবশ্য খুব সামান্য কাজই রেখেছিলেন। সেদিনের শুটিংয়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেদিনের অভিনেতা ছিলেন উত্তমকুমার, সৈলেন মুখার্জী ও নীলোৎপল দে। নীলোৎপল দে—সম্পর্কে একটা কথা না বললে হয়তো বা কথা অসমাপ্ত থেকে যায়। শ্রীযুক্ত বসু অভিনয়ের ভূমিকা হলো চিড়িয়াখানা-এর আগে শ্রী রায়ের চারুলতাতে: উনি একটা কণ্ঠ সঙ্গীতে মুখ দেখে ছিলেন। শ্রী দে একজন প্রখ্যাত নাট্যকার এবং পরিচালক—অনামী-নাবক-সংস্থার এর পরিচালিত বহু নাটকেই বাংলাদেশের মানুষ অভিনন্দন জানিয়েছেন। এ বছরের নতুন অভিনেতার আগমন সত্যই [illegible]সার দাবী রাখে। শ্রী রায় নতুন মানুষের আবির্ভাব ঘটানোর ব্যাপারে পটিয়ুং।

ছবির গোয়েন্দা হলেন উত্তমকুমার আর তাঁর সহচর সৈলেন মুখার্জী। ছবির কাহিনীকে ঘিরে খুন রহস্য আর ব্ল্যাক মেলের জাল বোনা হয়েছে যার প্রতিটি জটিল প্যাচ উদ্ধার করার দায়িত্ব ব্যোমকেশ বকসীর। ব্যোমকেশ বকসীকে ছদ্মবেশ ধরতে হয়েছে জাপানী আর ফ্রাবুলী-ওয়ালার।

"ইভনিং ইন্ প্যারিস" ছবির স্যুটিং-এর ফাঁকে নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর, নায়ক শাম্মী কাপুর ও পরিচালক শক্তি সামন্ত।

তাঁর প্রোডাকসন্স্ প্রযোজিত এবং হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নিবেদিত এ ছবির শুভমুক্তি ঘটছে শারদীয় লগ্নের শুরুতেই। ছবিটি বিশ্বপরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন রঙ্গলিকা পিকচার্স।

কবিগানের প্রচলন সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে, কিন্তু এর সর্বাধিক প্রসার লাভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। কবিগানের কাহিনী সাধারণতঃ পৌরাণিক। পরবর্তীকালে সামাজিক কাহিনী ও সাধারণ মানুষের দাম্পত্য-জীবনও কবিগানের বিষয়বস্তু হয়েছে। কবিয়ালগণ তাল ও সুরের সঙ্গে চরিত্র-সৃজনে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। অধুনাতনকালে বিখ্যাত কবিয়াল হরঠাকুর, রাম বসু, নিতাই বৈরাগী, এন্টনী ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা, গোকুলা গোঁসাই প্রভৃতি

"বাঙালি দিদি" ছবিতে ধর্মেন্দ্র ও মীনাকুমারী।

সমগ্র বাংলা দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। গোজলা গোঁসাই কবিগানের প্রথা বলে পরিচিত। কবিগানে প্রশ্ন ও উত্তর দেওয়া প্রথা বা কবির লড়াই নামে পরিচিত। প্রবর্তন করেন রাম বসু।

কবিগানের নমুনা :

সাহেব, মিথ্যে তুই কুকপদে বাধা মুড়ালি।
ও (তোর) তোর পাদ্রী সাহেব শুনতে পেলে
গালে দেবে চুনকালি।
—রাম বসুর প্রশ্ন।

মুণ্ডে আর মুণ্ডে কিছু ভিন্ন নাইরে ভাই—
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই।
—এন্টনীর উত্তর।

তোলানাথ রায় প্রযোজিত এন্টনী ফিরিঙ্গি ও শারদীয় উপহার। ফিরিঙ্গি কবিয়ালের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার। এতদ্ভিন্ন তরুণকা, অনিল-বরণ ও আরও অনেক অভিনয় শিল্পীর অভিনয়গুণে এ ছবি সমৃদ্ধ। সুরকার অনিল বাগচী বহুদিন পর তাঁর অতুলনীয় সুর সম্ভারে মুখরিত গানগুলি দর্শক মনতাকে উপহার দিচ্ছেন এ ছবির মাধ্যমে।

কর্মব্যস্ততার মধ্যেও নিভৃতে কিছুদিন কাটানো যায় কিনা এই মন নিয়ে চলে গিয়েছিলাম বসিরহাট অঞ্চলে। ভাবলাম প্রকৃতির সঙ্গে নিজের মন ও খেয়াল মিশিয়ে দিয়ে যদি কিছু লেখা বেরোয়।

বসেছিলাম ইছামতীর পাড়ে। নদীর জল দুই ছেলের

একটি বিশেষ ভঙ্গিমায়—
সাবিত্রী চ্যাটার্জী।

কল্যাণী ঘোষের আগামী ছবি
"ভানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিস্টাণ্ট।"

মত এখানে ওখানে ছুটোছুটি করছে, আহ্লাদে যেন আছড়ে পড়ছে। আমার মন ও গল্পের প্লটের জন্য অপাঙ্গ ঢেউয়ের মত দাপাদাপি করতে থাকে। হঠাৎ আমার চিন্তাসূত্র ভেঙে চৌচির হয়ে গেল এক গগনভেদী চীৎকারে —'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'—তাকিয়ে দেখি পতাকা হাতে একটি যুবক এগিয়ে যাচ্ছে বসিরহাট কোর্টের দিকে, সঙ্গে হাজারো জনতা তার প্রতিধ্বনি দিচ্ছে। পুলিশ আগে থেকেই খবর পেয়ে কর্ডন করে দাঁড়িয়ে আছে। শোভাযাত্রা ধ্বনি দিতে দিতে আরও এগিয়ে যেতেই পুলিশ অফিসার ততোধিক জোরে চীৎকার করে ওঠে, 'চার্জ'। সঙ্গে সঙ্গে অতর্কিত পুলিশরা ঝাঁপিয়ে পড়ে জনতার ওপর। নির্বিচারে লাঠি চালাতে আরম্ভ করে। এতক্ষণ ভাবছিলাম হয়তো বা অন্য কিছু আন্দোলন কান্দোলন হচ্ছে ঘটনাটা হয়তো বা কতকটা সেই সেই ধরণের তাই কোনো কিছু নড়াচড়া ছিলনা পরক্ষণ পালাবার ফন্দি আঁটছিলাম। কিন্তু আর স্থির থাকতে পারলাম না দৌড়ে গেলাম জনতার মাঝখানে। যে যুবকটির হাতে পতাকা ছিল দেখলাম তার মাথায় পুলিশের একটা লাঠি পড়েছে। চীৎকার করে তাকে বাঁচানোর জন্যে ভীড় ঠেলে এগোতে যাবো এমন সময় হঠাৎ শুনলাম কাট্—হতভম্বের মত হয়ে যাই। যে যুবকটিকে বাঁচানোর জন্য আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম আস্তে আস্তে তার মুখের দিকে তাকাই। একি! আরে এযে আমাদের জনপ্রিয় অভিনেতা অনিল চ্যাটার্জী! অবাক

ছবে ভাবছি কি ব্যাপার। সৌরবর্ণের আরেকজন মানুষ এগিয়ে এলেন অনিলবাবুর কাছে। "কি! লাগেনি তো"? ...."পানুদা আপনি!" উনিও সঙ্গে সঙ্গে "তুই!" ভালোই হলো। পানুদা হলেন সর্বজনপ্রিয় পরিচালক পিনাকী মুখার্জী।

অতীতের বহু খ্যাতনামা বাংলা ছবির পরিচালক হলেন পিনাকী মুখার্জী। বুঝতে পারলাম পরিচালক মশাই ভরাসন্ত বিরচিত এবং বি. কে. প্রোডাকসন্স্ নিবেদিত 'মহাশ্বেতা' ছবির শুটিং করতে এসেছেন। যাক বাঁচলাম বাব্বা! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো আমি একজন চিত্র-সাংবাদিক। এই তো লেখার যোগাড় জুটে গেলো।

পরিচালকমশাই বললেন, এসো ভাই। খবরাখবরের জন্য প্রশ্ন করলাম—উনি তাঁর প্রধান সহকারী এবং আমার বন্ধু অমল সরকারের কাছে সমস্ত কিছু জেনে নিতে বললেন।

বোম্বাই চিত্রজগতের অন্যতম শিল্পী
বৈজা বোস।

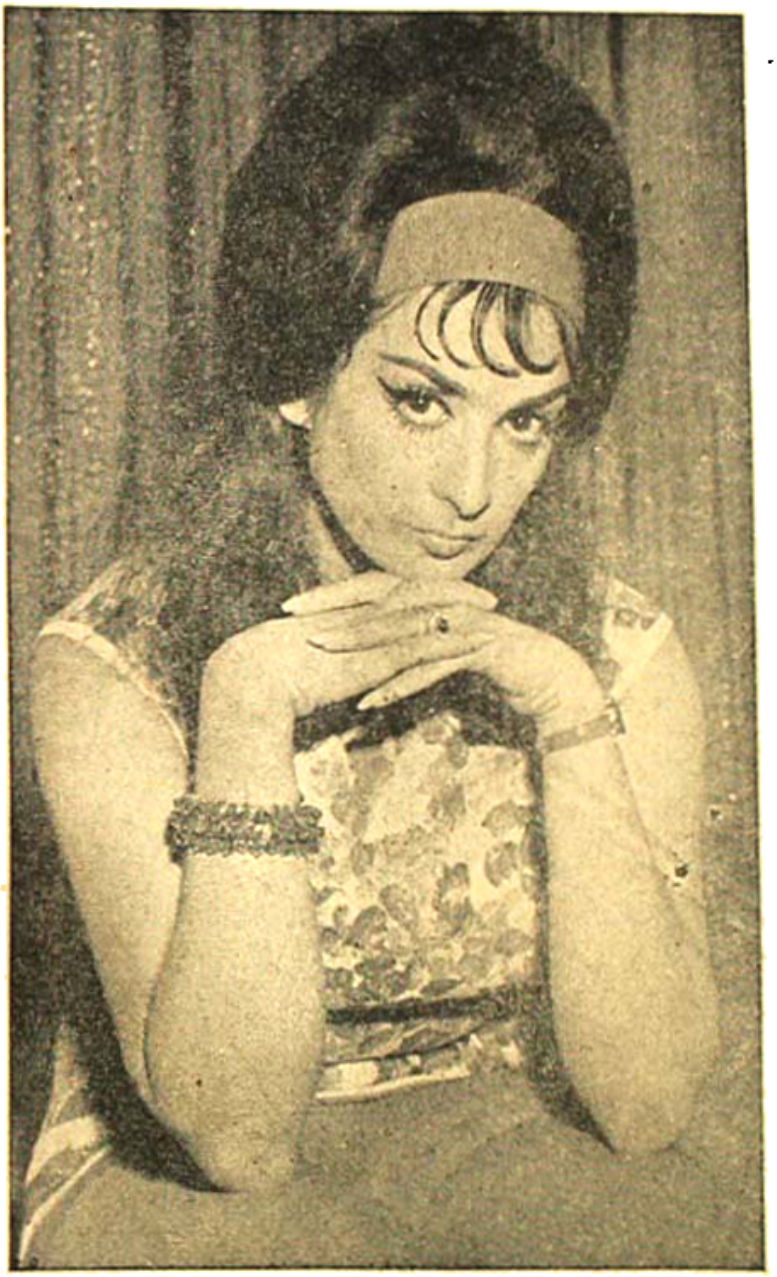

কালিদাস প্রযোজিত 'সাড়ি'
ছবির নায়িকা মেহেমুদ্দী সায়রাবানু।

'মহাশ্বেতা'-র কাহিনী লিখেছেন স্বনামধন্য লেখক অচিন্ত্য। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীগৌরীপ্রসাদ বসু ও পরিচালক শ্রীপিনাকী মুখার্জী মুখোপাধ্যায়। সুরসৃষ্টি করেছেন রাজেন সরকার। আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন বিমল ঘোষ। শিল্প নির্দেশক হিসাবে রয়েছেন এবছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বি. এফ. জে. এ পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী কার্তিক বসু। রূপায়ণায় রয়েছেন অতীত দিনের খ্যাতকীর্তি মুখপাত্র রবীন মজুমদার। বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন আপনাদের স্নেহধন্যা অভিনেত্রী অরুনা ভৌমিক, সৌমিত্র চ্যাটার্জী, অনিল চ্যাটার্জী, অনুপ মুখার্জী, তরুণ রায়, মাঃ সৌমিত্র, মাঃ বলাই, ছায়া দেবী, মলিনা দেবী, শর্মিলা বিশ্বাস, গীতা দে, সীমা রায়চৌধুরী, ও আরো অনেকে।

বিশ্বনাথ নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বহুপঠিত

ঐতিহাসিক নাটকটির ভিত্তিতে একটি চিত্র প্রতিষ্ঠান ছবিটি নির্মাণের আয়োজন করেছেন। মণি বর্মার চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিখানি পরিচালনা করছেন মাধু সেন।

এস্, এস্, প্রোডাকসন্স্-এর প্রথম প্রয়াস 'অনন্ত বাসর'-এর শুভ সূচনা টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন দুর্গেশ শর্মাচার্য। ইন্দ্রজিৎ—এই চলচ্চিত্রের আড়ালে একজন অভিজ্ঞ চিত্র পরিচালক ছবিটির পরিচালনার রয়েছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম চরিত্র অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক মাষ্টারদা সূর্য সেনের জীবনী অবলম্বনে

নবাগতা শর্মিলা

"হামসায়া" ছবির নায়ক জয় মুখার্জী।

বি, এম, চ্যাটার্জী প্রযোজিত ও আর্ট প্রডিউসার্স নিবেদিত 'মাষ্টারদা' ছবির শুভ মহরৎ সম্পন্ন হয়েছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মধুসংলাপী বিনায়ক ভট্টাচার্য।

সাহা চিত্রপীঠের প্রথম প্রয়াস সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফলকল আধুনিক নাটক 'শেষ থেকে শুরু' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে। মহরৎ-এর দিন নিউ থিয়েটার্স ২ নম্বর ষ্টুডিওতে ছ্যাপষ্টীক সেন প্রখ্যাত অভিনেতা উত্তমকুমার।

"আনন্দ সংবাদ" ছবির অন্তর্গত মূক ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য চুক্তিপত্রে সাক্ষরত উত্তমকুমার, পাশে প্রযোজক অমীন বসু।

ছবিটি পরিচালনা করছেন চিত্রদাশী গোষ্ঠী। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যসংস্থা ইঙ্গিত-এর সঙ্গে এবং এঁনাটকে যাঁরা যুক্ত তাঁরা সবাই ছবিতে অভিনয় করছেন। প্রখ্যাত অভিনেতা সবিতাব্রত দত্তকে একটি বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যাবে। এ ছাড়া তাপু বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করছেন। বহরু-এর বিন প্রখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়ও উপস্থিত ছিলেন। আলোক-চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার দায়িত্বে রয়েছেন রামানন্দ সেনগুপ্ত এবং অর্দেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের মুক্তি যজ্ঞে চারণ কবি মুকুন্দ দাসের যে একটা বিরাট ভূমিকা ছিল সে কথার সাক্ষ্য দেবে ইতিহাসের পাতায় লেখা লাইনগুলি। জীবনচিত্র চলচ্চিত্রায়ণের একটা প্রয়াস ইদানীংকালে বেশ প্রবল হয়ে দেখা যাচ্ছে। প্রয়াসগুলিকে নিশ্চয়ই সাধুবাদ জানানো উচিত। মুক্তিযজ্ঞে, সারা দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়াসে দেশ থেকে দেশান্তরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চারণকবি তাঁর স্বদেশী যাত্রাগানের ডালি নিয়ে সফর করে বেড়িয়েছেন। বিপ্লবী মানুষদের মত তাঁকেও সহ্য করতে হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের লাঞ্ছনা গঞ্জনা। অবিভক্ত

মোহময়ী কল্পনা চৌধিক।

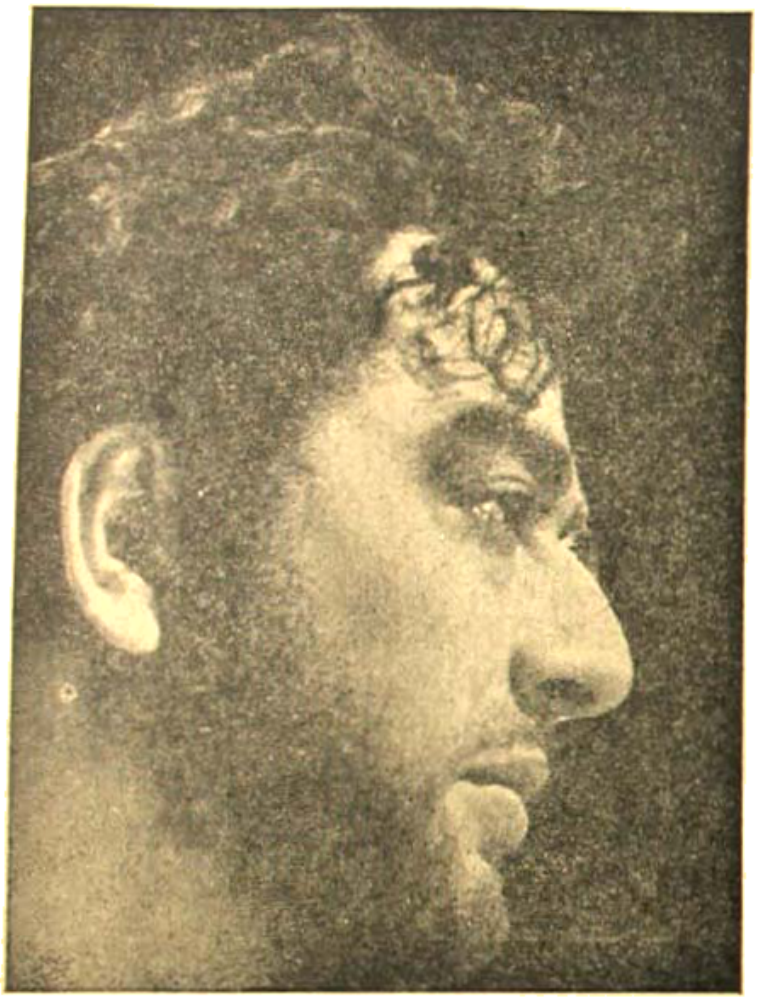

"জীবন প্রভাত" চিত্রে প্রদীপকুমার।

বাংলার ঢাকা শহরে একবার মুকুন্দদাসকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডেকে পাঠিয়ে বলেন যে এভাবে গান গেয়ে লোক ক্ষেপানো চলবে না তুমি যথা সত্বর এ দেশ ছেড়ে চলে যাও। নির্ভীকচেতা মুকুন্দদাস তার উত্তরে বলেছিলেন তা কেমন করে সম্ভব আমি চলে যাব আর আমার দলের লোকেরা পড়ে থাকবে! মুকুন্দ দাসের এই বাংলা কথার মোভাষী হয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটকে ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ জানিয়ে ছিলেন। এ দ্বারাই বোঝা যায় দৃপ্ত ভঙ্গীমায় সব সময়েই উনি অন্যায়ের সঙ্গে প্রতিবাদ করে এসেছেন। কিন্তু ক্ল্যাসিকস্ এর পক্ষ থেকে চারণকবি মুকুন্দ দাসের ঘটনাবহুল জীবন-চিত্রের রূপায়ণ করছেন পরিচালক নির্মল চৌধুরী। নির্মলবাবু আবার বহুদিন পরে সক্রিয়ভাবে ছবি

"মোহর টুন্ বোম্বে" ছবিতে আই এস জোহর।

পরিচালনার কাজে নামলেন। নিঃসন্দেহে শ্রীচৌধুরীকে এই বলিষ্ঠতম প্রয়াসের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। নিউ

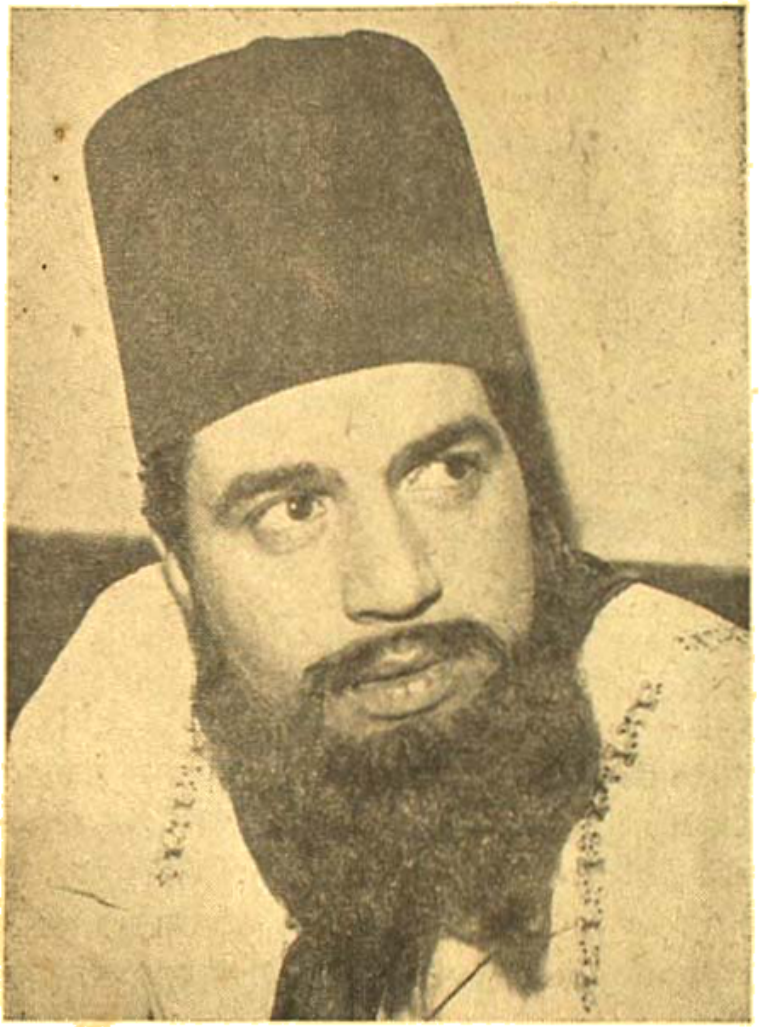

ছদ্মবেশী ধর্মেন্দ্র, "যব ইয়াদ কিসিকি আতি হ্যায়"। ছবিটি সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে।

থিয়েটার এক নম্বর স্টুডিওতে দুটো ফ্লোর মিলিয়ে একনাগাড়ে বেশ কটি কনেছেন। মুকুন্দ দাস ছবিতে একএকদিন শত শত অতিরিক্ত শিল্পীদের নিয়ে যাত্রাগানের আসরে অভিনয় করতে দেখা গেছে।

জমিদার বাড়ির উঠোনে বিরাট যাত্রাগানের আসর বসেছে—প্রতিবেশী পুরুষ আর মহিলারা বেশ ভিড়ে বসেছেন। ভারতমাতার ছবিতে মালা দেওয়া আর তার পাশের চেয়ারে ননীবৌ অশ্বিনীকুমার দত্ত বসে রয়েছেন। বেশ বড় প্যানডেল বানানো হয়েছে—লাল নীল কাগজ দিয়ে বানানো শিকল ফুল আর ১৯০৫ সালের জাতীয় পতাকা। মুকুন্দ দাস গান গাইতে এসেছেন অতএব পুলিশ-

জনপ্রিয় নায়ক রাজেন্দ্রকুমার।

একটি বিশেষ মেকআপে জনপ্রিয় বিশ্বজিৎ।

দের সজাগ হয়ে থাকতে হবে তারাও এসেছেন গানের আসরে। ছাতাকের আলো জ্বলছে—ক্যামেরাম্যান রামানন্দ সেনগুপ্ত সমস্ত আলো ঠিক করে মনিটর নেবার জন্য প্রস্তুত এমন সময় এম. টি. ওয়ানের আলোক নিয়ন্ত্রক ভূপতিবাবু নজর রামবাবুকে আলোর ব্যাপারেই কি তাদি একটা কথা বললো এবং তারপর চিৎকার করে বললো,: 'মামা ৬ নম্বর দাও।" রামবাবুর সহকারী মিঠু দাশগুপ্তকে দেখলাম। ক্যামেরার চোখ দিয়ে বলতে লাগলো, 'দাদা আপনি সবিতাবাবুকে গার্ড করবেন না মিস একটু সরে যান।' রামবাবু বলে উঠলেন, "পিন্ট সব ঠিক আছে তো?"

"উপকার" ছবির পরিচালক ও নায়ক মনোজকুমার।

"ইভনিং ইন প্যারিস" ছিত্রে যাদবেশ্বরনাথ ও সবিতা।

"হ্যাঁ রামদা ও কে.।"

নির্মলবাবু বলে উঠলেন, "ব্যাম আউটো অব এ বাসিস! স্টার্ট গ্রে-ব্যাক।"

সহকারী সম্পাদক হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়কে (সবাই প্রিয় হাকরা) দেখলাম পান্চু নিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গ্রে-ব্যাক শুরু হয়ে গেল—

"এত সব যাদের ঘরে—তারাও ঘরে উপোস করে
মোদের কথা ভাবলে পর কষ্ট দিয়ে আসে জল।"

সঙ্গীত পরিচালক সবিতা চট্টোপাধ্যায় গানের লিপ ঠিক মিলছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি রেখে বসে আছেন। এ ছবিতে সবিতাব্রতর দত্ত মুকুল বালের ভূমিকায় অভিনয় করছেন এবং তাঁর গানগুলির ওরই কণ্ঠে ধ্বনিত। সবিতাব্রত দত্তের পরিচয় আজ কারো অজানা নয়, নতুন করে দিচ্ছি না তবে উনি সত্যিই গুণী ও বিনয়ী শিল্পী একথা না বলে পারছি না—আমার লেখা পড়ে উনি যেন রাগ না করেন—উনি নিজের প্রশংসা শুনতে চাননা।

অশ্বিনী দত্তের ভূমিকায় অভিনয় করছেন বলিষ্ঠদেহী রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। অমলেশের অভিনয় ও মেকআপে সত্যিই অশ্বিনী দত্তের একটা প্রতিচ্ছবি এসেছে। আরেকটি ছোট্ট চরিত্রে দেখলাম নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের শেষ জীবনের অন্যতম কৃতিত্বের অভিনয় শিল্পী গাঙ্গুলীকে। সবীরবাবুর চরিত্রটি মুকুল বালার বাইরের একাকার।

"বোম্বাই রাই নাইট" ছবির দৃশ্য গ্রহণের পূর্বমুহূর্তে একত্রিত হয়েছেন প্রযোজক উপেন্দ্র, সুজাতা, পরিচালক এ, সানসির ও মোহনচোটি।

নির্মলবাবুর দূরদর্শীতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি কারণ সমীর লাহিড়ী সত্যিই সু-অভিনেতা। সুযোগ পেলে এই ধরণের অভিনেতারা নিশ্চয়ই তাঁদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারবেন, অন্তত অভিনয় দেখে তো আমার তাই ধারণা। সমীরবাবু ইতিপূর্বে সত্যজিৎ রায়ের মহানগর ছবিতে ছোট্ট একটি চরিত্রে দর্শকদের কাছে বেশ একটা সুন্দর ছাপ রাখতে পেরেছিলেন।

মুকুন্দ দাসের বিষের কড়চাগুলি চরিত্রে দেখা যাবে তৃপ্তি মিত্র, ছায়া দেবী বিনু ভাণ্ডারী, সুখেন দাস—এছাড়া প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় পি. কে. ব্যানার্জীর ভ্রাতা প্রণব ব্যানার্জীকেও একটা ছোট চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে।

পরিচালক তপন সিন্‌হারায় আগামী ছবি 'আপন-জন' বেশ একটা কাব্যিক নাম। আলোয়ার শা রোডের ২ নম্বর নিউথিয়েটার্স স্টুডিওতে ওঁর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তপনবাবুর কাছ থেকে যা শুনলাম তাতে কাহিনীর উপজীব্য বেশ মৌলিকত্বের দাবী রাখে। এ ছবিতে বহুদিন পর নির্মলকুমারকে দেখা যাবে। এ ছাড়া

"মেরা নাম জোকার" চিত্রের প্রযোজক, পরিচালক ও নায়ক রাজকাপুর।

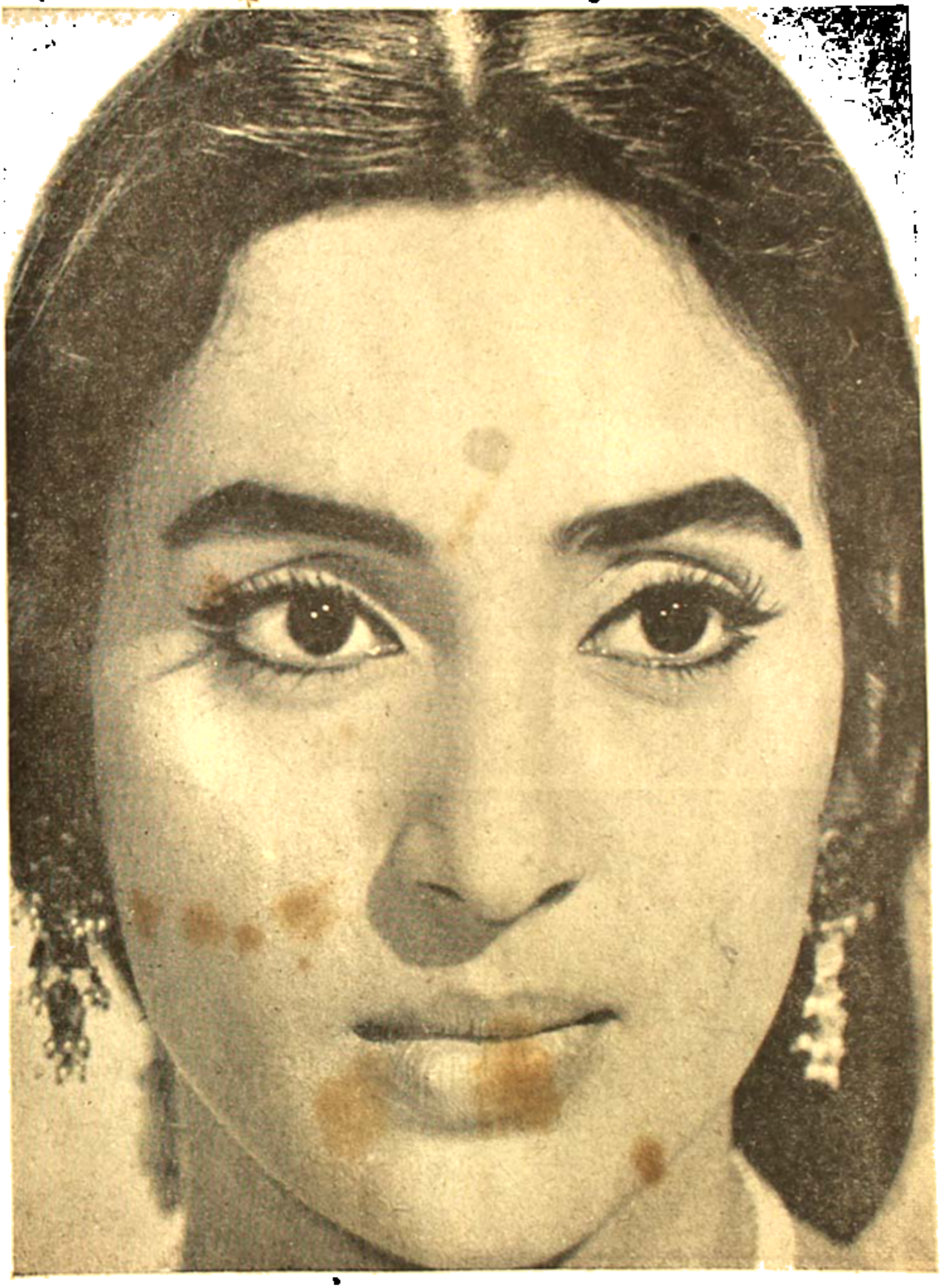

মুক্তা

মুখার্জি নায়ক ফিরোজ খান।

চিত্রর রায়, পার্থ মুখার্জী ও মৃণাল মুখার্জী এঁরাও কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন। ছবির কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হচ্ছে।

বনফুল রচিত 'মৃগয়া'র চলচ্চিত্ররূপ দিতে মনস্থ করেছে অরুন্ধতী দেবী। ছবির পার-পাত্রীর নাম এখনো জানতে পারিনি তবে সম্ভবত অরুন্ধতী দেবী নিজে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে হয়তো বা অবতীর্ণ হতে পারেন।

বাংলা ছবিতে ডেইজি ইরানীকে হয়তো বা অভিনয় করতে দেখা যেতে পারে। অবিভীয়া ছবির প্রযোজক অরুণ রায়চৌধুরী বোম্বাই গিয়ে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে এসেছেন।

"মাইলস্টোন" ছবির পরিচালক সুখদেব, লক্ষ্মীকান্তকে একটি দৃশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ক্যামেরাম্যান রামেশ্বরনাথ তাহাই অনুকরণে ব্যস্ত।

জ্যোতির এই হল প্রথম বাংলা ছবিতে অভিনয়। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি ছবি কলকাতায় মুক্তি লাভের আশায় হলে দেখা পাওয়া যাবে।

ত্রিধা নিজস্ব এক ধরনের ছবি 'আলো-আঁধার'। প্রযোজনা করছেন। উত্তমকুমার ও সাবিত্রীদেবী এক সঙ্গে এ ছবিতে অভিনয় করছেন।

পরিচালক নলিন মজুমদার নতুন ছবি সম্পর্কে বলেন কাহিনী অসাধারণ। উত্তমকুমার, সৌমিত্র চ্যাটার্জী অপর্ণা সেন, সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায় ও আরো অনেকের প্রায় মুক্তিপ্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।

ইন্দ্রপুরী-এর পরিচালনার ভার এস্ এস্ প্রোডাকসন্স-এর ছবি আলো বাংলার ছবি কবে পরিচালনা করবেন। অভিনয়ে—নিশি মুখোপাধ্যায়, অনিলকুমার, সন্ধ্যা দেবী ও বীরেন চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করছেন। সঙ্গীত পরিচালনায় কি. বালসারা।

বিমলি-এর নিজের প্রোডাকসন্স-এর ছবি 'আই ডিভোর্স' সম্পূর্ণ হয়ে মুক্তির দিন গুণছে। এ ছবির ছবি

বাংলাদেশের 'ছদ্ম বধূ' ও প্রোডাকসন্সের 'বিবাদ' ছবির নায়িকা অপর্ণা সেন।

নায়িকা কবিতা

পরিচালক হরীকেশ মুখার্জীর তত্ত্বধানেই সম্পন্ন হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সলিলকুমার চৌধুরী। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বিশ্বজিৎ, মাধবী, অরুন্ধতী দেবী, হরিধন, জ্ঞানেশ মুখার্জী, বীরা দে, পরিমল বিশ্বাস ও বিশ্বজিৎ-এর পুত্র প্রসেনজিৎ।

তারাশংকরের বিখ্যাত উপন্যাস আরোগ্য নিকেতনের ছবি আরোগ্য প্রযোজনায় সমাপ্ত হয়ে মুক্তির দিন গুনছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বিকাশ রায়, অনুপকুমার চ্যাটার্জী, রবি ঘোষ, সন্ধ্যা রায়, উষা মুখোপাধ্যায়, অহর গাঙ্গুলী, ছায়া দেবী, কানু সরকার ও কবিতা ঘোষ। ছবিটি পরিচালনা করেছেন হাষিকেশ ও মিঃ বেরিয়া খাস্তগীর পরিচালক বিভাগে ছিলেন।

প্রযোজক শ্রীমতী প্রমিলা ভট্টাচার্যের পরবর্তী প্রচেষ্টা 'মী বিনোদিনী'-তে অভিনয়ের জন্য রাজেশকুমার চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করেছেন। মী বিনোদিনী হলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র প্রযোজক ও অভিনেত্রী। বিনোদিনীর আত্মকথা নামে এই প্রতিষ্ঠানটির তরফে সম্প্রতি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিশিষ্ট আরও সম্পাদিত ঐতিহাসিক

জনপ্রিয় নায়িকা মালা সিনহা

বিশেষ ভঙ্গিমায় মালিকা

সাহিত্যপত্র 'এক্ষণ'এ প্রকাশিত হয়েছিল। রাজেন্দ্রকুমারের জীবনে এই হল প্রথম বাংলা ছবিতে অভিনয়।

বাণীব্রত আবার বিয়ে করবে যাকে—যত সব বাজে কথা। এটাই ছিলো বাণীব্রতের ঘনিষ্ঠ মহলের ধারণা। কিন্তু মানুষ ভাবে এক—হয় আরেক—বাণীব্রতকে বাধ্য হয়েই বিয়ে করতে হ'ল তারই অফিসের একান্ত সহচরিণী শেলী মিত্রকে। পাকচক্রেই বাণীব্রতকে বিয়ে করতে হয়েছে। বিয়ে হবার কথা ছিল অন্যের সঙ্গে। বিচিত্র মোহময়ী মেয়ে এই শেলী মিত্র। সমাজের ওপর তলার—হাই সার্কল। দেহীপদ বল্লভ—দেহ দিয়ে সবাইকে বশ করতে চায় শেলী। শেলীর ঠিক বিপরীত স্বভাবের মেয়ে মল্লিকা। নানান ঘটনার সমাবেশে বেশ নাটকীয় উত্তর মিলবে 'তিন অধ্যায়'এ। মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন বাণীব্রত—উত্তমকুমার, শেলী মিত্র—সুপ্রিয়া দেবী, জয়ন্ত—অভয় গাঙ্গুলী ও সোমনাথ—অনুপকুমার।

এছাড়া অন্য চরিত্রে রয়েছেন বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, বংকিম ঘোষ, সুপর্ণা সেন, বিনিতা চৌধুরী, মিতা দত্ত ও অনেকে। ছবিটি পরিচালনা করছেন তরুণ চক্রবর্তী।

গীতাঞ্জলী-চিত্রশীলের হিন্দী ছবি 'পলাশ' ইস্টম্যান কালারে তোলা হচ্ছে—পরিচালনা করছেন তরুণ মজুমদার। সঙ্গীত পরিচালনা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। হেমন্তবাবু ও তরুণবাবু যুগ্মভাবে ছবির প্রযোজক। সম্প্রতি ছবির গান বোম্বাই থেকে রেকর্ড করে এনেছেন তরুণ মজুমদার।

প্রদীপকুমার—হেমেন—অরুণ রায়—সাবিত্রী—কালি চক্রবর্তী এবং আরো অনেক তারকার সমাবেশ ঘটছে এছবিতে। পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখনো আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি—পরবর্তী সংখ্যায় জানানোর ইচ্ছা রইলো।

তনুজা এখন থেকে কলকাতায় এসে যখনই কোনো না কোনো বাংলা ছবিতে অভিনয় করবেন তখন আর উনি কোনো বড় হোটেলে উঠবেন না—কেন জানেন? তখন তাহলে—তনুজা যে কোথাও-এ একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন। সম্প্রতি এসেছিলেন কলকাতায় তিন ঘুঘুর পায়ে ছবির শুটিংয়ে। তনুজার বিপরীতে অভিনয় করছেন বাংলা চলচ্চিত্রের খ্যাতনামা নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

বাড়ির প্রসঙ্গে জানাচ্ছি সৌমিত্রবাবু সম্প্রতি পূর্ণদাস রোড থেকে চলে এসেছেন সাদার্ণ এভিনিউতে। তিন ঘুঘুর পায়ে পরিচালনা করছেন আশুতোষ ব্যানার্জী। তনুজার সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশ কিছুদিন আগেই হয়েছিল—আশ্চর্য স্মরণশক্তি মহিলার ঠিক মনে রেখেছেন আমাদের রূপম পত্রিকার কথা। তাই বাংলায় বললেন, 'আই লাইক ইট'। পুজো সংখ্যা একটা দিতে হবে—প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়ে নিয়েছেন। শুটিং-এর ব্যাপারে ভীষণ নিয়ম মেনে চলেন—ইনভ্যালুয়েবল আই লাইক বেঙ্গল ফিল্ম ইনডাস্ট্রী। প্রায় আঠারশো টাকা খরচ করে দুটো সুন্দর বিলিতি কুকুর কিনেছেন এই তো কদিন আগে। ছায়া-ঘেরা লোকের রচনা—রতন ব্যানার্জীর বাড়ীতেই তনুজার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। তনুজার মুক্তিপ্রতীক্ষিত বাংলা ছবিটি হচ্ছে একটি কিরিচি।

অগ্রগামী সোভিয়ত কর্মীর পরিচালক সরোজ দে, অরুণ

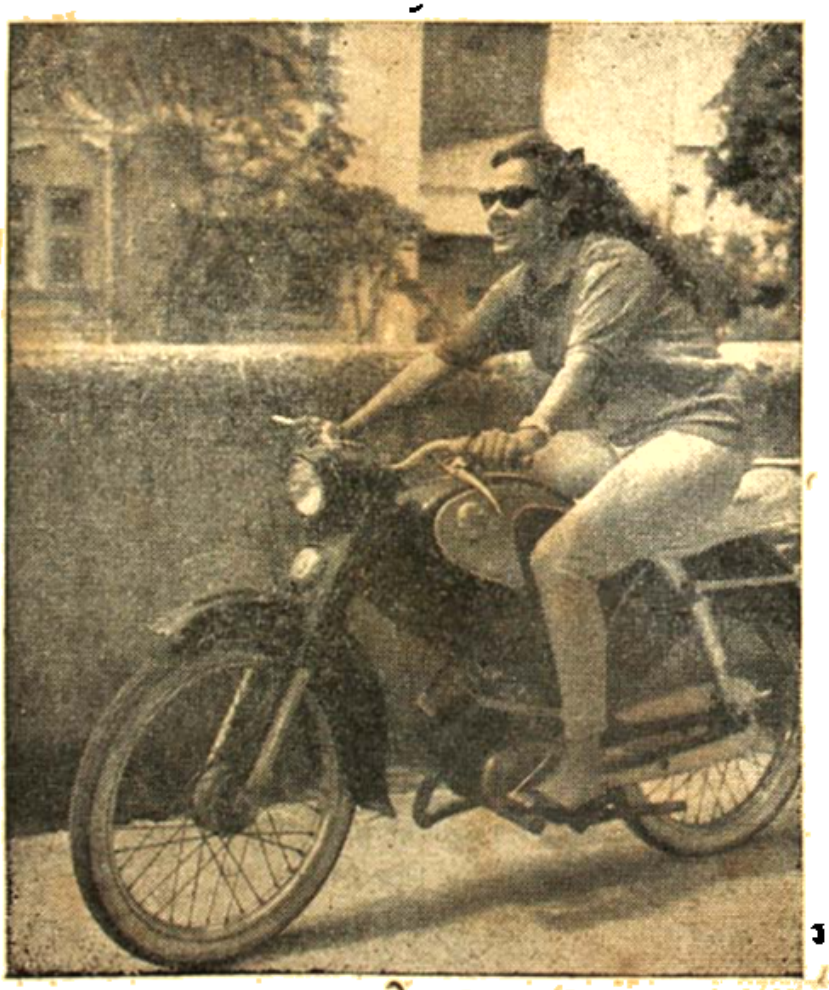

তনুজা ভঙ্গিমায় পদ্মা

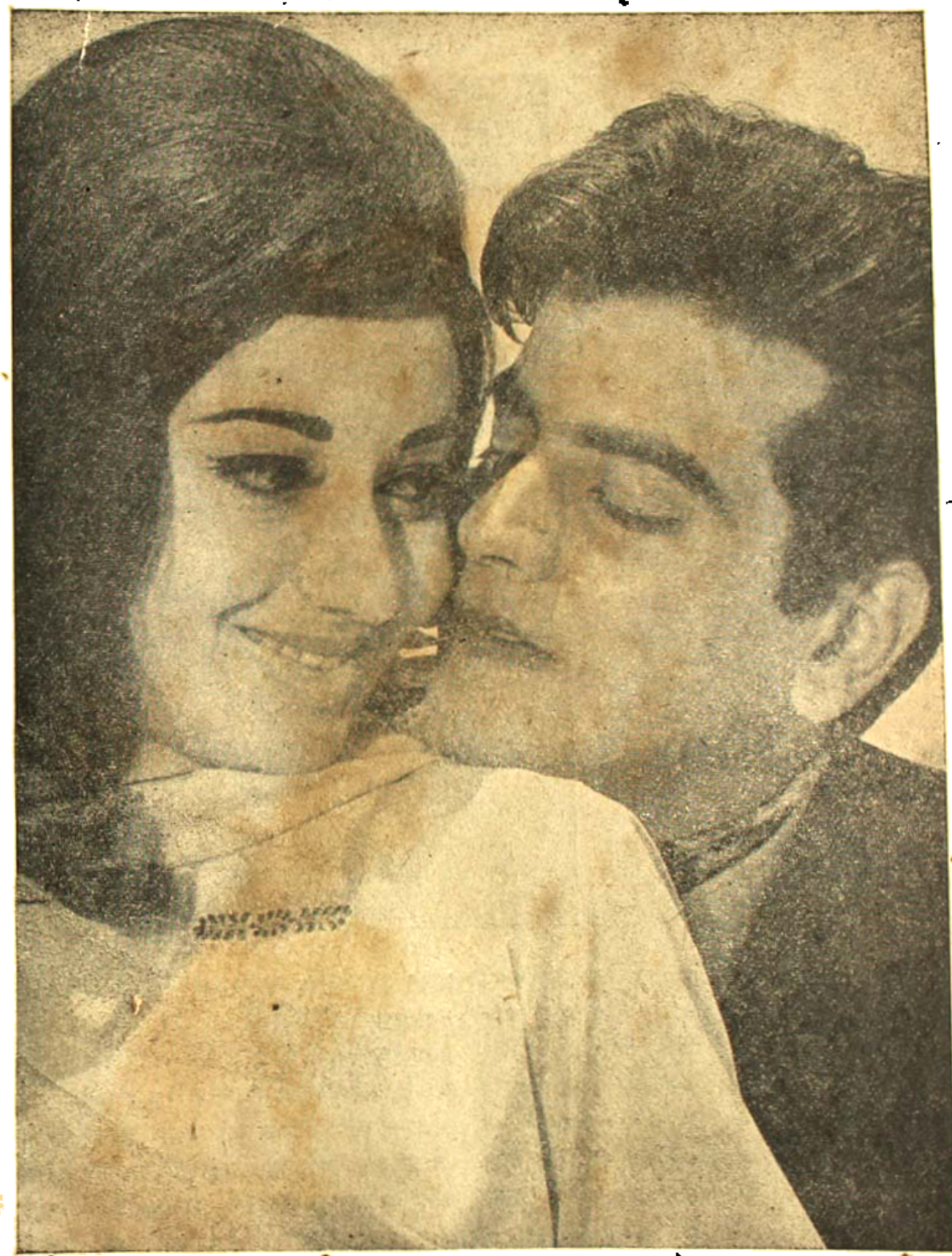

'শেষ থেকে শুরু' চিত্রের শুভ মহরতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার

বিরচিত বিখ্যাত উপন্যাস চৌরঙ্গীর চিত্রগ্রহণে ব্যস্ত। গ্র্যাণ্ড হোটেলের পরিবেশেই বোধহয় ছবির অনেক কাজ গ্রহণ করা হবে। সাদার্ণ এভিনিউ-এর মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি চার নম্বর বাসের জন্য এমন সময় প্রখ্যাত ক্যামেরাম্যান বীরেন গুপ্ত তাঁর গাড়ি থামিয়ে বললেন স্টুডিও যাবেন তো—চলে আসুন আমার সঙ্গে বাসে ঝুলে যেতে হবে না। কথা প্রসঙ্গে জানলাম উনি চলেছেন চৌরঙ্গীর কয়েকটা মেকআপ টেষ্ট নিতে। উত্তমকুমার—শ্যামল ঘোষাল—শুভেন্দু চ্যাটার্জী—নবাগতা মুখার্জী এই সমস্ত খ্যাতনামা তারকার দল এছবির অভিনয় আসর জমিয়ে তুলবেন। শ্যামল ঘোষাল গোয়েন্দার চরিত্রে অভিনয় করছেন। এরকম সুন্দর ফিগ্ অ্যাকটিং জানা অভিনেতা আমি যেখেছি তবে সংখ্যায় কম। পরিমিত এবং বুদ্ধির সংমিশ্রণে শ্যামলবাবুর প্রায় সব ছবির চরিত্র গুলিই প্রাণবন্ত হয়ে দর্শকের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম। ভাটা ঘোষ-এর চরিত্রে অভিনয় করছেন জনপ্রিয় উত্তমকুমার।

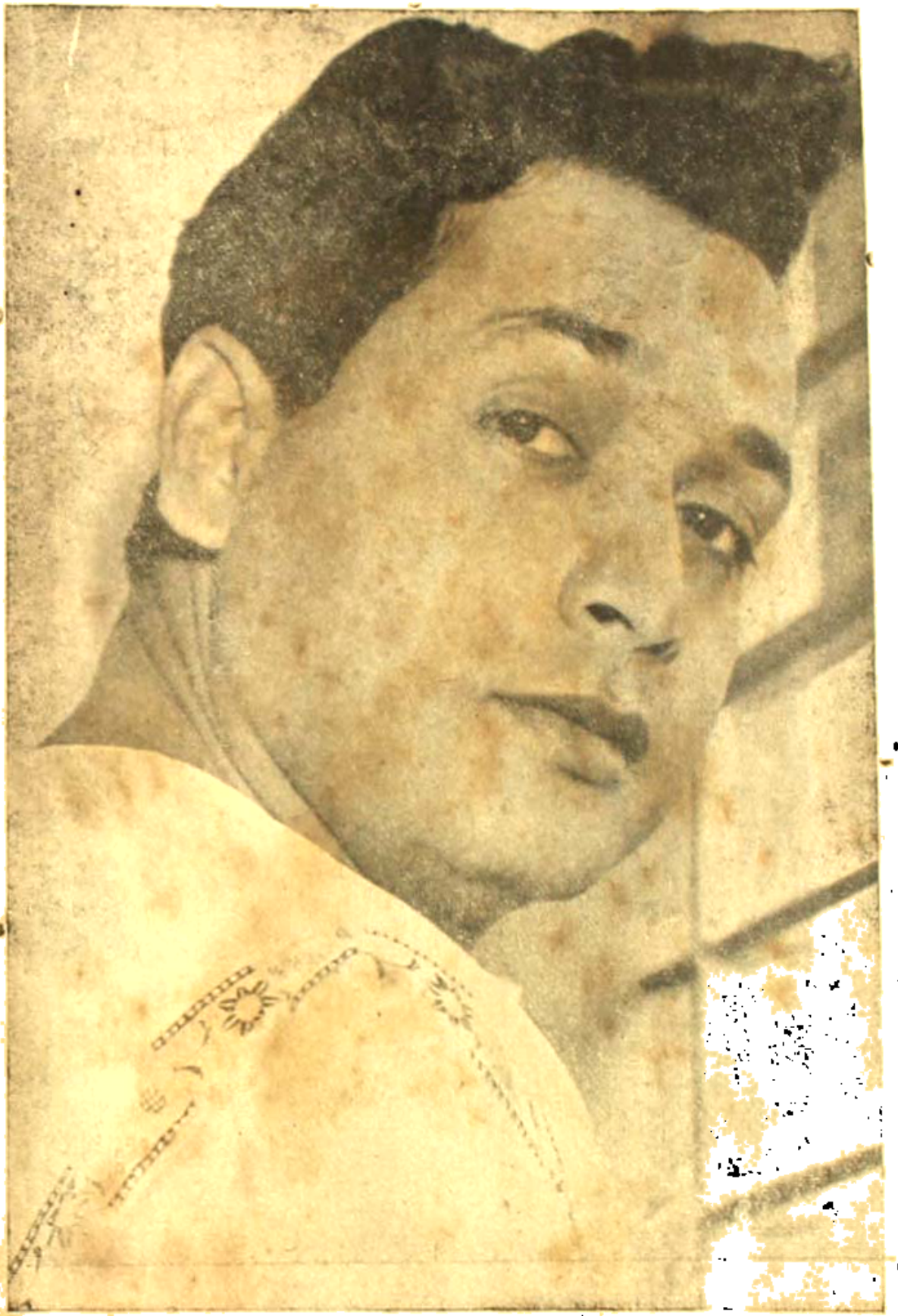

নিউ থেটার্স-এর ভক্তিমূলক ছবি 'গৌরী মা' প্রায় সমাপ্ত। এ ছবির প্রযোজক ও পরিচালক হচ্ছেন রবি বসু। কাহিনীকার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। বিভিন্ন অভিনয়ে রয়েছেন মলিনা, ভরদ্বাজ, নিতা চ্যাটার্জী, পদ্মা দেবী, গীতা দে ও ছবিরাণী দে। সুর সংযোজক করছেন অপরেশ লাহিড়ী।

সম্প্রতি অভিনেতা জ্ঞানেশ মুখার্জী চলচ্চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অবতরণ করেছেন। ছবির নাম 'তিন-ভরফ'। পুরো কাস্টিং এখনো আমার হাতে এসে পৌঁছয়নি তবে নায়িকা হচ্ছেন মাধবী মুখার্জী। এ ছবির ক্যামেরাম্যান হলেন অসিত সিন্‌হা—এ নামে ভেটই চিনতে পারবে না যদি না মিঠু সিন্‌হা বলি। তরুণ ক্যামেরাম্যান হিসাবে এর প্রতিশ্রুতির তারিফ বিশেষ কিছু হয়নি কারণ পূর্বাশার ছবির আলোয় এদের কেরামতি পাওয়া যায়নি বলে। কাজ করতে ভালোই জানে এবং কাজ করতে পারলে নামও করবেন তবে খানিকটা ভাগ্য সহায়ক হওয়া চাই। উনি নিজে জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করেন অথচ নিজের ব্যাপারে কিছুই বলতে চাননা। প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন এ ধরণের তরুণ ক্যামেরাম্যান চলচ্চিত্র শিল্পে যত বেশী আসবেন ততই হবে শিল্পের মঙ্গল। কিন্তু লোসাইটি আলোচনের সঙ্গে উনি খুব ব্যাপকভাবে যুক্ত আছেন।

বোম্বাই সমাচার

বাঙ্গালী চিত্র জগতের উদীয়মান তরুণী অভিনেত্রী অপর্ণা দেবী (দাশগুপ্তা) এবার একখানি হিন্দী ছবিতে অভিনয় করছেন—ছবিখানির নাম 'বিশ্বাস'। বিশ্বা মুভিটোনের প্রথম

"রুক গয়া আশমান" চিত্রে সায়রা বানু ও রাজেন্দ্রকুমার।

বোম্বাইয়ের সবচেয়ে আধুনিক নায়িকা সবিতা।

ছবি বিশ্বাসের নায়ক হচ্ছেন জীতেন্দ্র। চিত্র সাংবাদিক কেবল পি কাপুর ছবিখানি পরিচালনা করছেন। রূপতারা স্টুডিওতে ছবির স্যুটিং চলছে।

অনুপমা'র পর পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জী যে ছবিটির কাজে হাত দিয়েছেন সেটি হলো কে. বি. পিকচার্সের 'মাঝলি দিদি'। শরৎচন্দ্রের অনন্য কাহিনী মেজদিদির এই হিন্দী রূপটির মুখ্য দুই ভূমিকায় অভিনয় করছেন মীনা-কুমারী ও ধর্মেন্দ্র। বোম্বাইয়ের মোহন স্টুডিওয় নির্মীয়মাণ বাঙালি দিদির চিত্রনাট্য লিখেছেন নবেন্দু ঘোষ। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সঙ্গীত পরিচালক।

সুবোধ মুখার্জী প্রে ডাকেনস্ এর সাসপিরিয়া এর একটা বড় রকমের স্যুটিং ইনডোরে হয়ে গেল। ছবিটির পরিচালক সত্যেন বসু। সুরারোপের ভারটি নিয়েছেন লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল। তরু মুখার্জী ও সাধনারায় এই ইংরেজি কালার চিত্রের নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য বিদেশ চরিত্রে

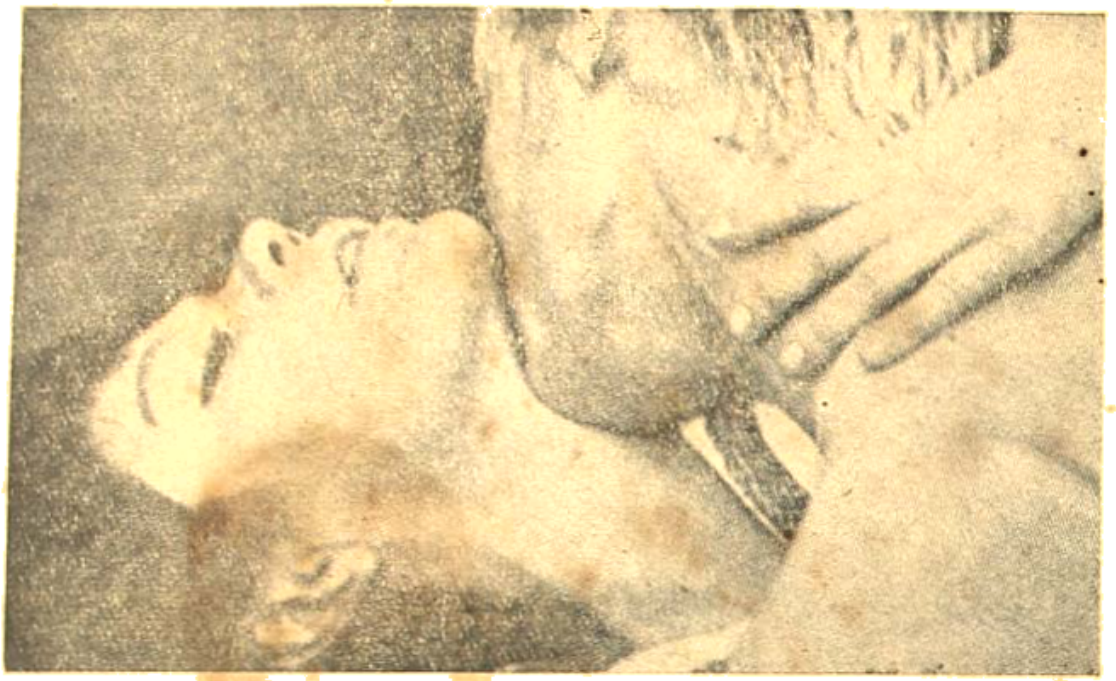

সুইডেনের 'লাইফ ইজ ওয়ান্ডারফুল' ছবিতে ইংগ্রিড বার্গম্যান ও মেলেনডর্ফ।

আছেন আই. এস. জোহার, অসিত সেন, অচলা সচদেব, নবনীবালা প্রভৃতি।

অভিনেত্রী সাধনা তাঁর পালি হিলস্-এর বাড়িতে এক ঘরোয়া বৈঠকে বলেছেন, "ইসক্ প্যার ছোর নেহী" ছবিতে এল. ভি. রমন সুরসংযোজিত দিল তো দিওয়ানা গানটি অত্যন্ত মধুর হয়েছে। ছবিটির প্রযোজক পরিচালক হলেন রমেশ সাইগল। সাধনা তাঁর রেকর্ডরেয়ারে যখন গানটা বাজালেন তখন সবাই একবাক্যেই ওঁর কথায় সায় দিয়ে উঠলেন। এ গানটাকে একমাত্র উনি 'গাইড্'-এর 'আজ ফির্ জীনে কী তমন্না হ্যায়'-এর সঙ্গেই তুলনা করতে পারেন। চিত্রনাট্যের ভূয়সী প্রশংসা করে সাধনা বলেছেন, রমেশ সাইগল ছবির জন্য খুবই সুন্দর প্রেমের গল্প নির্বাচন করেছেন। ধর্মজিৎ বিনোদের প্রযোজনায় সাধনার আরেকটি ছবি অসিত সেনের নির্দেশনায় শুরু সমাপ্তির পথে।

কোথাকার নাটক কোথায় দাঁড়ায় একমাত্র ঈশ্বরই তার সাক্ষী। বেশ কিছুদিন ধরে সারা বোম্বাই শহরে ধর্মেন্দ্র আর মীনাকুমারীকে নিয়ে গুজব রটে গেল যে ওঁদের নাকি বিয়ে হচ্ছে খুব শীগ্‌গির। কিছুদিন পূর্বে বৈজয়ন্তী আর দিলীপকুমারকে নিয়েও অবশ্য এ ধরণের গুজব ছড়ায়নি যে এখন কথা কি করে বলবো বলুন! বৈজয়ন্তী এখন ডাঃ বালির ভাবী স্ত্রী হয়ে রয়েছেন। এর পর শর্মিলা-মনসুর আর সোহার্ব-অঞ্জুমহেন্দ্রু। অবশ্য সম্বন্ধে অবশ্য বোম্বাইয়ের কোনো মানুষই খুব একটা পাত্তা দেন না কারণ ওঁদের নতে ও কল্ গার্ল ছাড়া কিছুই নয়—কথাটা আমার মশাই একেবারে বোম্বাইয়ের কলাকুশলী আর স্টুডিও মহল থেকেই শোনা—সত্যি মিথ্যে ঈশ্বর জানেন আমি জানি না। জোনাকের বেষ্ট রোমান্সগুলি এখন যে কোনদিকে গড়াবে বোঝা দায়। ওয়াহিদা রহমান আর বিশ্বজিৎ আনন্দ এঁদেরও নাকি বেশ প্রণয় নিবেদন চলেছে। কমল আমরোহীকে ছাড়বার পর আই মিন ডিভোর্স করবার পর মীনাকুমারী ধর্মেন্দ্রর ধর্মপত্নী হবেন কিনা সেটাই হল আজকের সবচেয়ে বড় প্রত্যাশিত খবর। ভাট্ ওয়াচ্ আণ্ড সী।

ভারতবর্ষের সাড়া জাগানো নায়ক অশোককুমার

ইতালির 'এল ডিচিদিও আল মালো' ছবিতে উগো তোগা নন্দি ও ক্লাডিয়া বেরোজা।

তাঁর দীর্ঘ ৩২ বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আত্মজীবনী লেখার কাজে হাত দিয়েছেন। এই স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের বহু ঘটনার কথা জানতে পারা যাবে।

বিদেশী ছবির খবর

পরলোকে অভিনয় শিল্পী ভিভিয়েন লে

বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী ভিভিয়েন লে ৫৩ বছর বয়সে তাঁর ফ্ল্যাটে সম্প্রতি মারা গেছেন। যক্ষ্মা রোগে কিছুদিন ধরে ভুগছিলেন। ১৯১৩ সনে দার্জিলিঙে ভিভিয়েনের জন্ম। ভারতবর্ষেই কেটেছে তাঁর বাল্যকাল। রঙ্গমঞ্চ আর চলচ্চিত্র জগৎ এই দুটি মাধ্যমকেই তিনি সমান ভালো বেসেছিলেন। ১৯৪০ সালে তাঁর সঙ্গে অলিভিয়েরের সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়েছিল। ১৯৬০ সালে এ বিয়ের পরিসমাপ্তি। ভিভিয়েন লে তাঁর অভিনয় জীবনে মোট দু'বার অস্কার পুরস্কার অর্জনের সম্মান পেয়েছেন। চলচ্চিত্রে ওঁর শেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় ষ্ট্যানলি কেনার পরিচালিত "শিপ অভ ফুলস্"।

জাপানের চিত্রগৃহ :

বছর শেষে হিসাবের সূত্র থেকে জানা গেছে জাপানে মোট সর্বসমেত ৪২৮০টি সিনেমা হাউস আছে। এর মধ্যে ২৬২১টি হাউসে দেখানো হয় জাপানী ছবি, আর ১৪৩টি প্রদর্শিত হয় সব রকম ভাষার ছবি। কিন্তু জাপানে চিত্রগৃহের সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। পূর্ববর্তী তিন বছরের মধ্যে ১৯৬৩ সালে এখানে চিত্রগৃহের সংখ্যা ছিল ৪৩২৭, ১৯৬৪ সালে—৪৩৬৯ আর ১৯৬৬তে ৪২৮০।

চিত্রাভিনেতা জেন ম্যানস্‌ফিল্ড দুর্ঘটনায় মারা গেছেন :

নিউ অরলিন্সে ভারতীয় সময় রাত সাড়ে দশটার সময়

ক্রুনাথের দেবদিকে একটি টি. ডি প্রোগ্রামে যোগদানের উদ্দেশ্যে শ্রীমতী মানস্‌ফিল্ড প্রত্যহ মধ্যরাত্রে নিসিসিপি রাজ্যের বিলোক্সি শহর থেকে যাত্রা করেন। পুলিশ জানায় যে দুর্ঘটনার ফলে শ্রীমতী মানস্‌ফিল্ডের মুখ বিকৃত হয়ে যায়। পিছনে সীটে উপবিষ্ট আহত তিনটি সন্তানকে হাসপাতালে পরীক্ষণের জন্য রাখা হয়েছে। ট্রাক ড্রাইভার বিচারে বলেছে যে হঠাৎ গাড়িটি পিছন থেকে এগিয়ে আসে ও তার ট্রাকের ট্রেলারের নীচে চলে যায়। এইভাবে একটি জীবনের হঠাৎ পরিসমাপ্তি ঘটে গেল। কেনের পিতা পালমেরির ও নাকি মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটেছিল। এক্ষেত্রে এদের জীবনে ভাগ্যের ট্রাজিডিনটাই বোধহয় পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে দিয়ে গেল। কেন মোট তিনবার বিয়ে করেছিলেন। এর মধ্যে মিঃ ইউডিভার্ড যে ভদ্রলোকটি মিসিসিপিতে উনি বিয়ের সময় বলেছিলেন,—

"আই লাভ্ কেন্ অ্যাজ এ পার্সন, নট এ সুপিরিয়র।"

এ টাইম ফর বি হিরোজ :

ইতালির সাড়া জাগানো অভিনেত্রী ক্লডিয়া কার্ডিনেল সম্প্রতি স্টানলি ডেন্ এর প্রযোজনায় এ টাইম ফর হিরোজ এবং টেলরের বিপরীতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সিবারেটেড ইউরোপের পটভূমিতে কাহিনীর উপজীব্য গড়ে উঠেছে।

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতের সম্মান প্রাপ্তি :

এ বছর বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারত বর্ষের তথা চিত্র 'খুদা আইক অফ এ পেন্টার' পুরস্কার অর্জন করে এনেছে। চিত্রকর হলেন ছবিটির পরিচালক।

পূর্বপ্রেমের ছবি হিসাবে বেলজিয়ামের দি স্টারট সর্বোচ্চতম পুরস্কার অর্জন করতে পেরেছে। ছবিটির পরিচালক একজন পোলিশ অধিবাসী। নাম হ'ল জেরজি হোলিমাওস্কি। এবারের বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল নাকি খুব একটা জমে উঠেনি। প্রতিনিধিদের মধ্যে খুব একটা

ইমাইলের 'দি_ ডেভ এণ্ড এ চাইল্ড' ছবিতে প্রধান অভিনেতা মিঃ কোটনায় ও জুলি সোলে।

বিতর্কিত ছবি তাদিনের 'বি গেম ইজ ওভার' ছবির নায়িকা তাদিস-পত্নী জেইন ফণ্ডা।

উৎসাহ বা আশা আকাঙ্ক্ষার ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল না। শুধু ভারতের পূর্ণাঙ্গ চিত্র ছিল না বলেই নয়, এবার উৎসবে প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছবিগুলি সম্পর্কেও এখানকার রসিকজনের তেমন কোন আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। উৎসব কর্তৃপক্ষের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও যুগোশ্লাভিয়া ভিন্ন আর কোন কমিউনিস্ট দেশই এবার এখানে কোনো ছবি পাঠান নি। না পাঠাবার কারণও যথেষ্ট রয়েছে। আর্ট ফিল্মের ক্ষেত্রে পোল্যাণ্ডের একটা বিশেষ জায়গা আছে। যুগোশ্লাভিয়ার ছবিটি নাকি অনেকের মতে প্রচারধর্মী।

ডেনমার্কের "স্টোরি অভ বারবারা" অ্যাকটেদের কাহিনী। ইতালির "স্ট্রেঞ্জ নাইট"—পরিচালক আল-ফ্রেডো আনজেলি বিষয়বস্তু ধ'রে একটি অদ্ভুত পুলিসের সন্ধানের। এই প্রয়াসে তিনি যে বিপর্যয় ও সমস্যার সম্মুখীন তাই নিয়েই ছবির কাহিনী। ইউ. এস্. এ-র ছবি

আঁদ্রে তাকুয়ার 'কিলিং গেম' ছবির নায়িকা রুবিন ওগার।

"ও অ্যাট পুরুর অ্যাড, মামা হ্যাজ হ্যাড ইট ইন দা প্রজেক্ট, অ্যাণ্ড আই অ্যাম কিলিং সো ব্যাড"।

নামটা বিশ্রী রকমের বড় ছবিটা নাকি করুণ রসের।

মৌসুমী ভট্টাচার্য

ইসমাইল মার্চেন্ট প্রযোজিত এবং জেমস আইভরী পরিচালিত 'শেকস্‌পীয়ারওয়ালা' চিত্রে শশীকাপুর ও ফেলিসিটি কেনডাল।

ক্যামুর আগামী ছবি 'প্যারিস লাইট'-এর নায়িকা অ্যানি জ্যাঁদ্রি।

তরুণকুমার আজও প্রতিটি অভিনীত চরিত্র নিয়ে ভাবেন। তাই তো তাঁর চরিত্রগুলো এত প্রাণময় হয়ে দর্শকদের কাছে ধরা দেয়। তরুণ-কুমারের এই ভাবনার মুহূর্তটি আগামী কোন ছবিতে দেখতে পাবেন।

সংক্ষিপ্ত সমাচার

প্রখ্যাত অভিনেতা পলমুনি পরলোক গমন করেছেন। বিদেশিনী অভিনেত্রী ভিভিয়েন লে ও জেন ম্যান্সফিল্ডও মারা গেছেন, তবে একজন রোগে আরেকজন দুর্ঘটনায়। জনপ্রিয় স্পেনসার ট্রেসিও সম্প্রতি ইহলোকের মায়া কাটিয়েছেন।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত প্রচারবিদ সুধীরেন্দ্র সান্যাল সম্প্রতি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন। বাংলা চলচ্চিত্রের প্রচারশিল্পে শ্রীসান্যালের অসামান্য দানের কথা চলচ্চিত্র অনুরাগী মাত্রেই স্বীকার করে থাকেন।

ওমর শরীফের আসল নাম

জনপ্রিয় অভিনেতা ওমর শরীফের আসল নাম মাইকেল শালহাউব। উনি বলেছেন ছেলেবেলা থেকেই অভিনেতা হবার বাসনা ওঁর মনে প্রবলভাবেই বাসা বেঁধে ছিল। আমেরিকান ছবি দেখতেন আর অভিনেতা অভিনেত্রীদের নকল করতেন। বেটি ডেভিস, এরোল ফ্লিন ছাড়াও বোগার্ট প্রভৃতি স্বনামধন্য অভিনয় শিল্পীরা ওঁর মনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতেন। বর্তমানে শরীফ বারবারা ষ্ট্রেসান্ডের বিপরীতে 'ফানি গার্ল' ছবিতে অভিনয় করছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর বিদেশী কবিয়াল উত্তমকুমারের অভিনয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে 'একটী বিদেশী' চিত্রে।

হলিউড-এ রবিশংকর

হলিউড বোলস্-এ ইণ্ডিয়া নাইট খুব সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। বিসমিল্লাহ্ খানাই, আলি আকবর, আশীষ খাঁর সরোদ আর রবিশংকরের সেতার এই ছিল অনুষ্ঠানের সূচী। প্রায় ১০০০ হাজার লোক এই প্রোগ্রাম শুনেছেন। ইণ্ডিয়ার অ্যাকটিং কনসাল জেনারেল সোমনাথ ধর এ সময় স্যান্ফ্রানসিস্কোতে ছিলেন। রবিশংকর নামে নাকি একটা যাদু আছে। প্রত্যেকের মুখেই এক কথা "উই ওয়াণ্ট টু লিশেন রবিশংকর"।

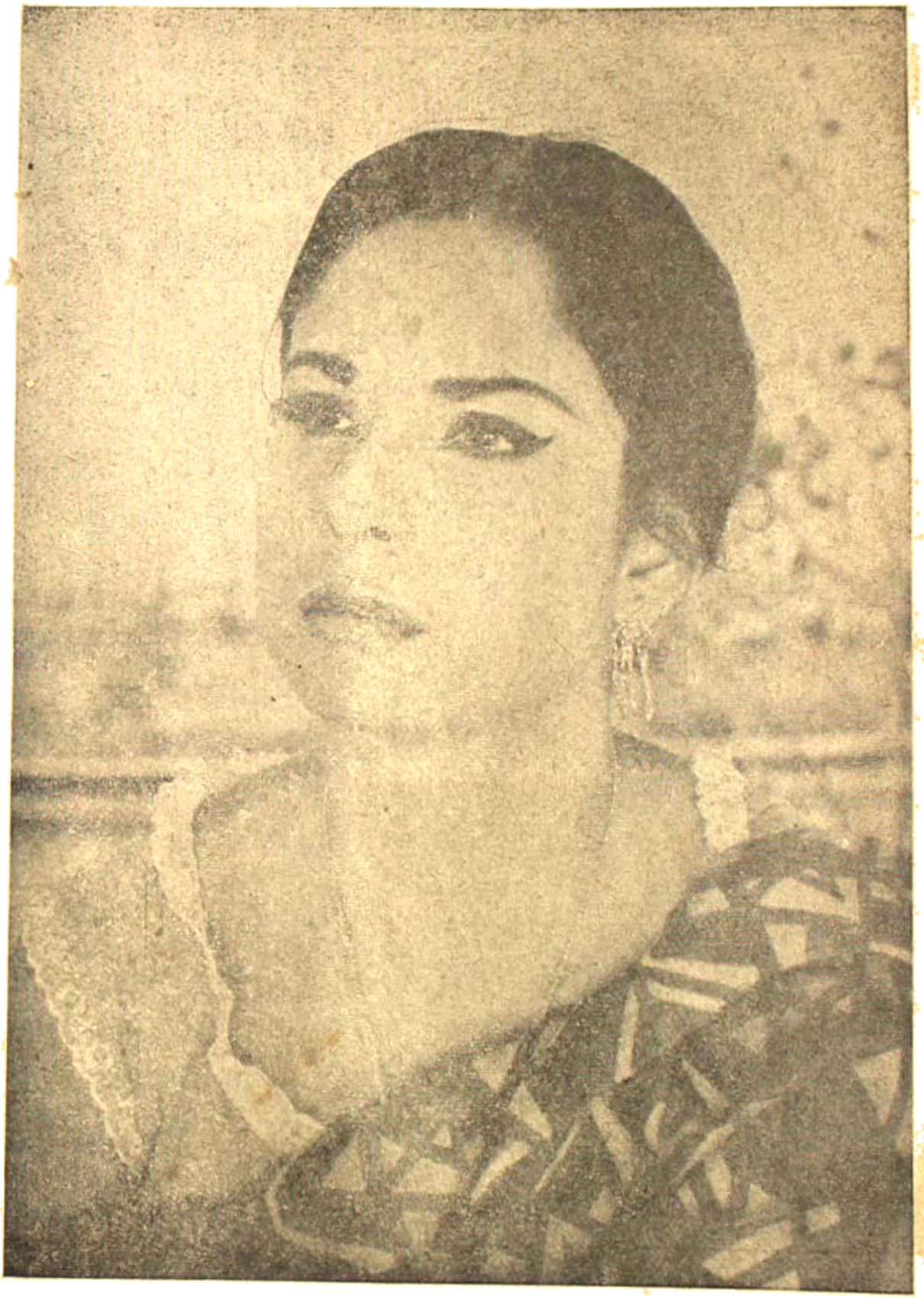

মাধবী মুখোপাধ্যায়

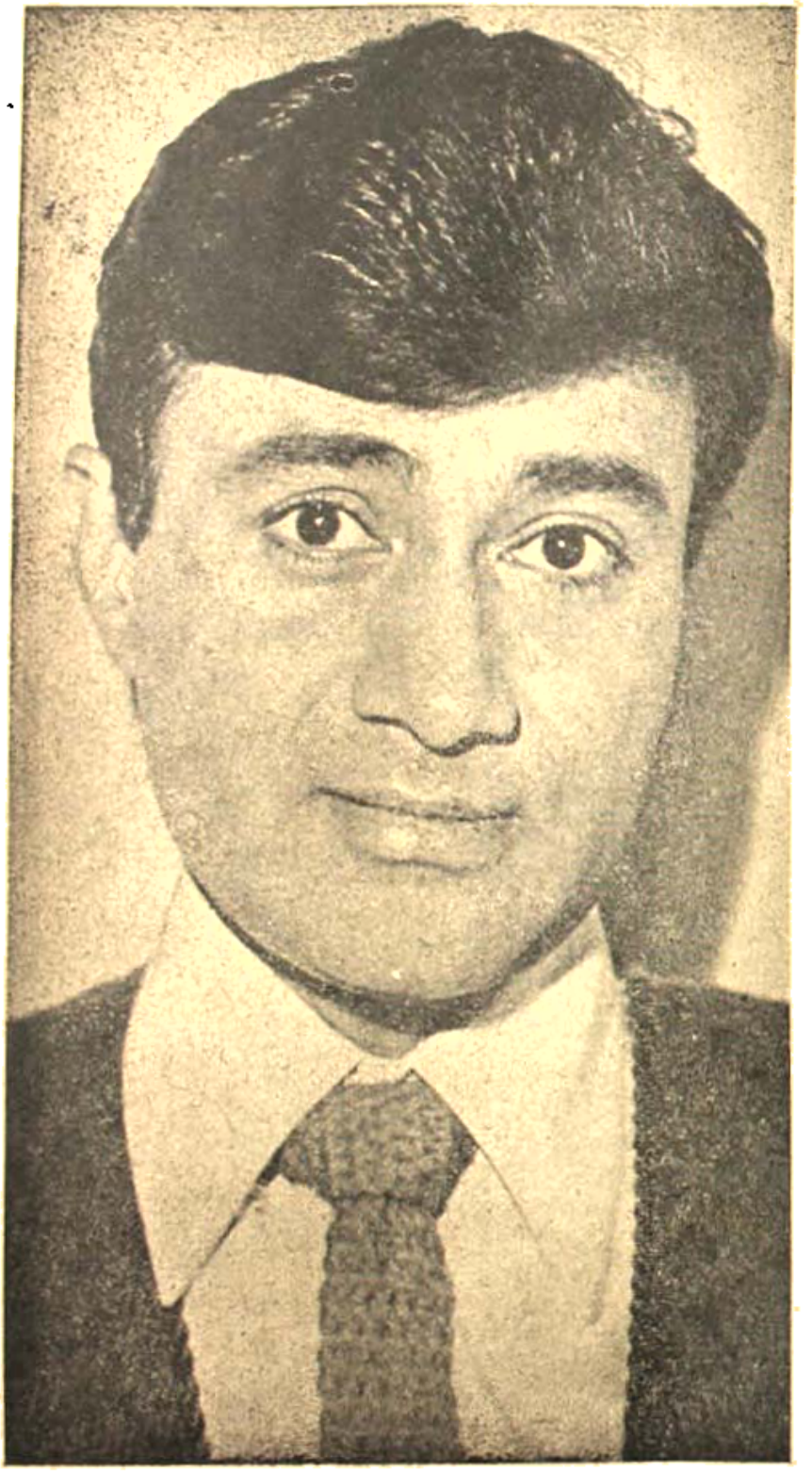

'জুয়েল থিফ' চিত্রের নায়ক দেব আনন্দ এ্যারেষ্ট হলেন ক্যামেরায় লেন্সে।

সেদিনের কুঁড়ি, আজকের ফুল। উদ্ভিন্ন যৌবনা ডেইজী ইরাণী বুঝি ভাবছে ফটোগ্রাফারকে কোন পোজটা দিই পূজা সংখ্যার জন্য। আর সেই চিন্তার মুহূর্তটাকেই ধরে রাখল রণজিৎ রায়।

জনপ্রিয় অভিনেতা শশী কাপুর সম্প্রতি সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এসে রোজ দু সিফটে শুটিং করছেন কারণ তা নইলে অন্যান্য ছবির নির্ধারিত কর্মসূচী অসমাপ্ত থেকে যাবে। বোম্বাইতে এই ধরণের বাস্ত শিল্পী ইদানীং কালে খুবই কম দেখা যায়। কলকাতায় এবং বোম্বাইতে বহুবার মেলামেশা করেছি। পরিচয়ের সূত্র ধরেই সে দিনের এক ছোট্ট সাংবাদিক সম্মেলনে ওঁর সঙ্গে পুনরায় দেখা করেছি। শশীজী বাংলা ছবিতে বিশেষ করে সত্যজিৎ রায়ের কাছে অভিনয় করার জন্য পাগল। শশী কাপুর আমাকে বললেন বহুদিন দেশের পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না—সেটাকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। কথা শেষ করেই বললেন, "হাউ ইজ ইওর রূপম রানিং—আই হ্যাভ সীন দা ম্যাগাজিন—ইটস্ এ নাইস্ জার্নাল"।

॥ জেনে রাখার মত ॥

'পথের পাঁচালি' খ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র জগতে আসার পূর্বে কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট রূপে ডি. জে. কীনার এণ্ড কোং (অধুনা ক্যামিওল) সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বম্বের প্রযোজক পরিচালক জ্ঞান মুখার্জী একজন প্রথম শ্রেণীর এম্ এ-বি। তিনি চিত্র জগতে আসেন স্ক্রীন রাইটার হিসেবে।

কলকাতা সাহানী চিত্রজগতে আসবার আগে শান্তি-নিকেতনের লেবরেটরীর ও বি. বি. সি'র বেতার ছিলেন।

কে. এল. সিং প্রথমে দেবকীকুমার বসু পরিচালিত 'সোনার সংসার' চিত্রে অভিনয় করেন। তারপরে তিনি ১৯৩৮ সনে বোম্বে গিয়ে যোগদান করেন।

রাজকাপুর প্রথমে অ্যাপ্রেনটিস্ হিসেবে বম্বে টকীজে কাজ করতেন, পরে স্বাধীন বক্তা হিসেবে চিত্রজগতে

ব্যস্ত অভিনেতাকে মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত জীবনেও অভিনয় করতে হয়। সেদিন সকালে উঠেই শাম্মী পরিচালককে একটা টেলিফোন ঠুকে দিলেন। "শরীরটা ভীষণ খারাপ, আজ আর সুটিং নয়।" কিন্তু চিরাচরিত অভ্যেস বশে মিথ্যা বলেই দিন কাটাতে হয়।

এমন মিষ্টি হাসিটি বহুদিন দেখা যায়নি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখে। পুজোর আনন্দে মনটা তাই এত উৎফুল্ল। যাক্ পুজোর কটা দিন তো হেসে-খেলে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

প্রবেশ। নিউ থিয়েটার্সের চণ্ডীদাস ছবিতে একটি ছোট্ট ভূমিকায় রাজকাপুর অভিনয় করেছিলেন।

প্রখ্যাত নাট্যকার অভিনেতা তুলসী লাহিড়ী এক সময় এইচ. এম. ভি সংস্থার সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। সেন্সর বিভাগের পূর্বে তিনি রংপুর কোর্টে ওকালতি করতেন।

নৃত্যাভিনেত্রী সিতারার জন্মস্থান কলকাতায়।

রাজকুমারকে খুব কম ছবিতেই অভিনয় করতে দেখা যায় বলেই তাঁর এত চাহিদা। এমন বলিষ্ঠ অভিনয় খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। 'মেরে হুজুর' ছবিতে এঁকে দেখতে পাবেন।

প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত দেবদাস চিত্রে বিমল রায় সহকারী আলোক চিত্র শিল্পী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সুলোচনা চ্যাটার্জী বাঙালী হলেও তিনি ৫।৬টি ভাষায় বেশ ভালোভাবে কথা বলতে পারেন। যথাক্রমে হিন্দী, ইংরাজী, মারাঠি, পাঞ্জাবী, কাচ্ছি, গুজরাটি প্রভৃতি।

জনপ্রিয় নায়ক উত্তমকুমারের আসল নাম অরুণ

চট্টোপাধ্যায়। দিনেমায় আত্মপ্রকাশ করার পূর্বে উত্তমকুমার কলিকাতা পোর্টকমিশনার্সের একজন সামান্য কেরানী ছিলেন।

ওরা নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চলচ্চিত্র জগতে আসার পূর্বে কলকাতা বেতারের কেন্দ্রে ঘোষকের কাজ করতেন। অ্যালবার্ট হল কমি হাউসে তাঁর প্রাত্যহিক আসা যাওয়া একদিকে খুবই দেখা যেত সত্যজিৎ রায় এইখানে থেকেই তাঁকে পেয়েছিলেন অপুর সংসার ছবিতে।

রাধা ফিল্মস্-এর রঙ-বঙ্গ প্রথমবারের হয় ফাউন টকী হাউসে ১৩ই অক্টোবর ১৯৩৯ সাল।

প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত মুহূরাহ ছবির উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় ছিলেন,

অভিনয়ে :—অচলা—যমুনা

মৃণাল—মলিনা

সুরেন—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী (নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির ভ্রাতা)

কেদারবাবু—অমর মল্লিক। কৃষ্ণচন্দ্র দে। দিতারা। অনুপম ঘটক। টিনু মুখার্জী। গোপে। পৃথ্বীরাজ। হরিমতি। যোগেন চট্টোপাধ্যায়। অহি সান্যাল। ক্যাপ্টেন মোহন—বিমল রায়। শঙ্খ-ধ্বনী—মুকুল বসু (পরিচালক নীতিন বসুর ভ্রাতা)। সঙ্গীত পরিচালক—রাইচাঁদ বড়াল। পঙ্কজ মল্লিক (সহকারী)

সঙ্গীত হরিতা:—অমর ভট্টাচার্য।

আর. সি. এ. পুরোকথাটার অর্থ হচ্ছে রেডিও করপোরেশন অফ আমেরিকা।

বাংলার চিত্রজগতের প্রথম সবাক ছবি—"জামাই ষষ্ঠী"। পরিচালনা করেন—শ্রীঅমর চৌধুরী। প্রখ্যাত গল্প লেখক—পরিচালক ও অভিনেতা শ্রীঅমর চৌধুরী। অমর চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র।

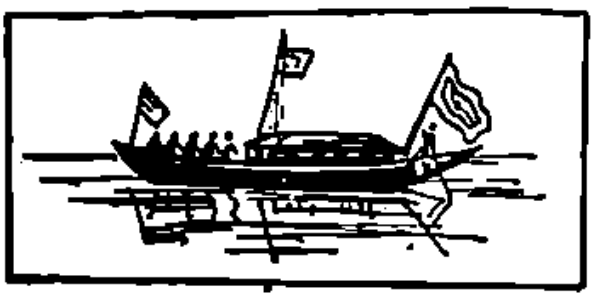

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও ছায়াছবি

—অর্ধেন্দুশেখর সেনগুপ্ত

মহৎ জীবনকে ছবিতে তুলে ধরার প্রচেষ্টা সব দেশেই আছে। অন্যান্য দেশে জীবন চিত্রের সংখ্যাধিক্য থাকলেও আমাদের দেশে তার সংখ্যা নগণ্য। যে জীবনে নাটকীয় উপাদান প্রচুর আছে সেই জীবনই চিত্রায়িত করার পক্ষে সুবিধাজনক। সে দিক থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন অবলম্বনে ছবি করার সুবিধা অনেক। বিরাট ব্যক্তিত্ব, শৌর্য, বীর্যে গড়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র সারা ভারতবর্ষের সবকালের শ্রেষ্ঠ নেতাদের অন্যতম। ঘটনাবহুল তাঁর জীবন কথাকে ছবিতে তুলে ধরার প্রচেষ্টা হয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলনের পর। পরাধীন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কীয় কাহিনী চিত্র মূলে থাক তথ্য বা সংবাদ চিত্র করাও এক প্রকার নিষিদ্ধ ছিল। ফলে অসাধারণ জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রের তথ্য চিত্র সীমিত। সত্যজিৎ রায়ের "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" তথ্য চিত্রে মহাত্মাজি সহনের উদ্বোধন দিবসে বিশ্বকবির সংগে সুভাষচন্দ্রকে ক্ষণিকক্ষণের জন্যে দেখার সুযোগ এখনও আমরা পাই। সুভাষচন্দ্রের বিভিন্ন সংবাদ চিত্র থেকে সঙ্কলন করে অযোধ্যা "নেতাজী সুভাষ" নামে একটা ছোট ছবি করেছিলেন বিভিন্ন সংবাদ চিত্র থেকে সঙ্কলন করে এখনও ছবি করা চলে। নেতাজী সম্পর্কীয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্যনির্ভর ছবি "নেতাজী সুভাষ"। ছবিটি প্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। আই. এন. পি. পি-এর সহযোগিতায় এটি প্রযোজনা করেছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। এই প্রামাণ্য চিত্রে নেতাজীর বিভিন্ন কালীন ছবি আমরা দেখি, নেতাজী বিষয়ক সংবাদ চিত্রের মধ্যে ২৩শে জানুয়ারীর উৎসব এবং স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রী কর্তৃক কলকাতাতে নেতাজীর প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচনের দৃশ্য বিশেষভাবে মনে রাখবার মতো।

নেতাজীর সবচেয়ে বড়ো কীর্তি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন। আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্য-কলাপ সমস্ত ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাদের শৌর্য, বীর্য একদা সকলের আলোচনার বস্তু। এই ফৌজের কার্যাবলীকে কেন্দ্র করে যে সব ছায়াছবি তৈরী হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ করার মতো সুশীল মজুমদার পরিচালিত হিন্দী ছবি "সিপাহী কা সপনা" ও বিমল রায়ের হিন্দী ছবি "পহেলা আদমী।" পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ভারতীয় মুক্তি ফৌজের সংগ্রাম যথোচিত নিষ্ঠা ও প্রামাণ্য নজির সহ গৃহীত হয়েছিল এই দুই ছবিতে। অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা এখানে বলা দরকার যে আজকের দিনের বিখ্যাত চরিত্রাভিনেতা নাজীর হোসেনকে পহেলা আদমী ছবিতে প্রথম দেখা যায় যিনি একদা ছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজে এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশও নিয়েছিলেন। ভারতের মুক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সময় যাঁরা ছবি করতেন তাঁরা পরম শ্রদ্ধা সহকারে বিভিন্ন দৃশ্যে নেতাজীর উল্লেখ করতেন। নেতাজীকে ছবিতে আনা হয়েছে বার কয়েক। দীর্ঘ দিন আগে ফিল্মিস্তানের "সমাধি" নামে একটি হিন্দী ছবি প্রদর্শিত হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গৃহীত এই ছবির একটি দৃশ্যে ছিল একটি বিরুদ্ধ পক্ষের লোক নেতাজীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। তিনি কৌশলে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। তাঁর উক্তি "সুভাষকে মারবার মতো গুলি এখনও তৈরী হয় নি।" ঘটনার যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করে কোন লাভ নেই। তবে সামান্য অংশ হলেও ছবিটিতে নেতাজীর কোন অমর্যাদা করা হয় নি। নেতাজী চরিত্রে রূপ দিয়েছেন বোম্বের চিত্র সাংবাদিক কমল পাল।

বাংলা ছবি "দাদা ঠাকুর" বোধ হয় আপনাদের স্মরণ আছে। এই ছবির একটি দৃশ্যে ছিল দাদা ঠাকুর (পণ্ডিত) ও সুভাষচন্দ্রের কথোপকথন। সুভাষচন্দ্র যখন কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিশেষ কোন কারণে দাদা ঠাকুরের সংগে তাঁর কথা-বার্তা হয়। সেই ঘটনার দৃশ্য এই ছবির এই অংশীয় অংশ। সুভাষচন্দ্রের ভূমিকায় ছিলেন সাংবাদিক সুনীল বসু যাঁর সংগে নেতাজীর অবয়বের সাদৃশ্য আছে।

নেতাজীর জীবন কাহিনী না হলেও তাঁর কার্যাবলীর প্রতিফলন দেখা গেছে আগেকার দিনের কিছু ছবিতে। একটি বাংলা ছবিতে দেখেছি নির্দিষ্ট নায়ককে স্থানীয় জনসাধারণ নেতাজী বলে ভুল করেছে। নায়ক অবশ্য লজ্জা ও দুঃখের সংগে সে ভুল ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছে। ছবিটির নাম সম্ভবতঃ "ঝড়ের পরে"। আর একটি ছবিতে শেষ দৃশ্যে একজনের অন্তর্ধান নেতাজীর ভারত ত্যাগের ঘটনার সংগে বহুলাংশে মিলে যায়। বহু ছবিতে নেতাজীর উক্তি এবং চিত্র অবিকৃতভাবে প্রদর্শিত হয়েছে—যা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। সুলভ হাততালি পাবার জন্যে বয়স্কদের নাম ভাঙিয়ে কাঁচা হাসির রসবার জন্য একদল সদাই সচেষ্ট থাকেন। নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ভাবে নেতাজীর উক্তি বা চিত্রকে ছবিতে মেখিতে তাঁরা সুরুচির পরিচয় দেন নি। একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার কথা এখানে উল্লেখ করছি। কিছুদিন আগে বিখ্যাত পরিচালক ভি, শান্তারামের "লড়কী সহিয়াত্রীকী" ছবিতে প্রদর্শিত হয়। একটি বিশেষ দৃশ্যে নেতাজীর জীবন কথা একটি রাডিওর মাধ্যমে বিপুলতার সংগে গৃহীত হয়েছে। কষ্ট কল্পিত নয় নিতান্ত স্বাভাবিক দৃশ্য। এই অংশটিকে ছবির একটি উজ্জ্বলতম অংশ বলে গ্রহণ করলে অযৌক্তিক হয় না।

নেতাজীর জীবনকে অবলম্বন করে চিত্র নির্মাণের প্রচেষ্টা অনেক দিনের। নেতাজীর নাটকীয়ভাবে দেশত্যাগ আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন এবং সব শেষে রহস্যজনক পরিসমাপ্তি নিয়ে অনেকেই ছবি করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তবে জীবন অবলম্বনে চিত্র করার পক্ষে অসুবিধা অনেক। তথ্যাদি প্রামাণ্য না হলে নানা বাদ-প্রতিবাদের কারণ হয়। এ জন্যে ইচ্ছে থাকলেও সাহসে ভর করে অনেকে এগুতে পারেন নি। নেতাজীর জীবন অবলম্বনে ছবি করার পরিকল্পনা যখন একজন পরিচালক ঠিক করেছিলেন তখন নানা বিষয়ে প্রচণ্ড মতভেদের সৃষ্টি হয়। অবশ্য মহৎ ছাড়া সে ছবির কাজ আরম্ভ হতে পারে নি। সম্ভবতঃ সে ছবিতে নেতাজীরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন হিন্দী চিত্রাভিনেতা প্রেমনাথ। সে প্রচেষ্টা কার্যকরী না হলেও নেতাজীর জীবন অবলম্বনে দুটি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। হিন্দী ছবিটির নাম "নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস"। বোম্বের আদর্শ পিকচার্সের পক্ষ থেকে পরিচালনা করেছিলেন হেমেন গুপ্ত যিনি একদা নেতাজীর সেক্রেটারী রূপে কাজ করেছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে ওটেনের সংগে সংঘর্ষ থেকে শুরু করে তাঁর ভারত ত্যাগ এবং অন্যান্য কার্যকলাপ এই ছবিতে দেখা গেছে। নেতাজীর চরিত্রে রূপ দিয়েছেন অজিত চট্টোপাধ্যায়। ছবিতে নেতাজীর ব্যক্তিত্ব যথাযথভাবে দেখাবার জন্যে সবচেয়ে চেষ্টা করেছেন এই শিল্পী। বাংলা ছবির নাম "সুভাষচন্দ্র"। এ. বে. বি. ফিল্মসের পক্ষ থেকে এ ছবি পরিচালনা করেছেন পীযূষ বসু। অচিন্ত্য সেনগুপ্তের রচনার ওপর ভিত্তি করে এই চিত্রনাট্য লিখতে হয়েছে। জন্মের শুভ লগ্ন থেকে রাজরোষে প্রথম কারাবরণ পর্যন্ত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ছবিতে স্থান পেয়েছে—প্রতিটি ঘটনা অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে তুলে ধরা হয়েছে। তিন জন শিল্পী দেশ গৌরবের চরিত্রে রূপ দিয়েছেন। কিশোর—আশীষ ঘোষ। তরুণ—সমরকুমার। যুবক—অনয় ভট্ট। শেষোক্ত শিল্পী নেতাজীর নিকট আত্মীয়।

নেতাজীর জীবনে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে যা এই দুই ছবিতে স্থান পায় নি। সে সব ঘটনাকে একত্রিত করে নেতাজী সম্পর্কীয় আরো জীবনী-চিত্র তোলার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই প্রচেষ্টা যাঁরা করবেন তাঁরা সকলের ধন্যবাদের পাত্র হবেন।

॥ ক্রীড়াবিদ্ ॥

জার্নেল সিং

তিনি আসছেন।

স্পোর্টস্ রিপোর্টার আর ক্যামেরাম্যানদের ছেকে নিউজ এডিটর বলে দিলেন। তিনি আসছেন যে, রোডার্স জয় করে তিনি আসছেন। আসছেন বাঘা ফুটবলার জার্নেল সিং। ট্রেন কখন আসবে কিছু ঠিক নেই—যত্নেতাকারকে নিয়ে যেতে ভুল না হয় যেন।

কবে?

কবে মানে কি আজই। দুপুর বারোটায় আসতে পারেন—খুব বেশী হলে একটায়। একটু দেখবেন এ ডিউটিটা আপনার।

শত চেষ্টা করেও সেদিন আর সিংজীকে পাইনি কারণ উনি কোলকাতায় ফিরে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। ভালভাবেই জানতেন যে এই অবসরটায় প্রিয়জনদের সঙ্গে মিশতে না পারলে আর যাওয়াই হয়ে উঠবে না। ফিরে আসবার জন্য পরেই আবার চলে গেলেন এশিয়ান অলস্টার দলের সঙ্গে খেলতে। ফুটবল খেয়ার কতকটা বলেই মনে, একবার এদিক আরেকবার ওদিক এভাবেই ওঁদের খেলোয়াড়ী জীবন।

জার্নেল সিং কোলকাতায় প্রথম খেলতে আসেন রাজস্থান দলে—তখন সেন্টার হাফ প্রথায় খেলার রেওয়াজ, এখনকার মতন তৃতীয় ব্যাক চতুর্থ ব্যাক প্রথা নয়। রাজস্থান থেকে সরাসরি মোহনবাগানে এবনো পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। ইদার জার্নেল সিং ধীরে ধীরে কোলকাতার মাঠে এক সাড়া জাগানো নাম হয়ে দাঁড়ালো। গোড় পালের খেলা দেখিনি, শুনেছি ওঁর রক্ষণদুর্গকে বলা হোতো চাইনীজ ওয়াল। জার্নেলের ডিফেন্সিভ অক্টেন্স্ খেলা বোধ হয় কতকটা তখনকার কালে ঐ ধরনের বলে আমার মনে হয়। যাই হোক না কেন পাকাবীরা ভালো ফুটবল খেলতে পারেন না এ অপবাদটা কোলকাতার মাঠ থেকে জার্নেল সিং ধুয়ে মুছে নিয়েছেন। পাগড়ী খুলে মাথার ওপর ঝুঁটিতে রুমাল বেঁধে সারা মাঠ দাপাল ছেলের মতন বিপক্ষ দলকে নাস্তানাবুদ করে তুলতে ওঁর মত পটু এখন আর কে আছেন? অবশ্য এশিয়ান গেমসের স্বর্গত রহিম সাহেব জার্নেলকে সেন্টার ফরওয়ার্ডও খেলিয়েছেন এবং তাতে ফলও ফলেছিলো। রহিম সাহেবের স্মৃতি আজও জার্নেলের মনে অম্লান প্রদীপ শিখার মত জ্বলছে। ফুটবল টীমকে কখন কোন্ পরিস্থিতিতে কেলে সাজাতে হবে—এই দূরদর্শিতা রহিম সাহেব ছাড়া অন্য কেউ আজো বুঝতে পারেন না।

রহিম সাহেব মারা যাবার পর হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি বিশেষ করে হাল আমলের ভারতীয়দলের ক্রীড়াশৈলি দর্শন করে। "এখনকার আমলে যারা আমাদের খেলা দেখছেন ওঁরা নিশ্চয়ই বলবেন রহিমদাও শুধু বি অ্যাট দিস্ আওয়ার্স", কথাগুলি বলতে বলতে জার্নেল সিংয়ের সমস্ত মুখমণ্ডলে একটা দুঃখ আর বেদনার অভিব্যক্তি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়ে উঠলো! জার্নেলের আদি ও অন্তের কথা "কোচিং শুধু বি স্পনটেনিয়াসলি।"

গত বছর মোহনবাগানে লীগ জয় করবে এ বিশ্বাস পরিপূর্ণভাবেই জার্নেলের ছিলো কিন্তু কেন যে হোলো না তা তিনি জানেন না। তিনি এবং সতীর্থেরা যথেষ্টই চেষ্টা করেছিলেন। এ বছরও ওঁর মনে দুঃখ রয়েছে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালের দর্শকদের ব্যবহারে। দর্শকদের তিনি আনন্দ দিতে চান একথা কেন তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন জানি না। দর্শক যেমন প্রিয় দলের জয়লাভে আনন্দিত, অনুরূপ আনন্দ খেলোয়াড়দেরও হয়ে থাকে। মোহনবাগান-ইষ্টার্ন রেলের মধ্যে প্রথম খেলায় দর্শক যেভাবে আহত হয়েছিলেন তাতে যে কোন মুহূর্তেই ওঁর চোখটা চলে যেতে পারতো। তাগ্য অতীব সহায় থাকার কারণে সেটি হয় নি। এ সমস্ত ঘটনায় জার্নেল এ বছর কিঞ্চিৎ মনক্ষুণ্ণ।

এশিয়ান দলে স্থান পেলেও মন পড়ে আছে ভারতীয় ফুটবল দলের অন্যান্য খেলোয়াড়দের মাঝে। ভারতীয় ফুটবল দলের জন্য সামান্য কিছু করতে পারলে অত্যন্ত আনন্দিত হতে পারতাম কিন্তু……। চেষ্টার তো কোনো ত্রুটি করছি না, দেখা যাক কি আছে কপালে? অনুষ্ঠান দলের হয়ে যখন খেলছি তখন মনে পড়েছিলো কোলকাতার মাঠে। অগণিত দর্শকের মাঝে খেলে দর্শক ও ক্রীড়ামোদির আনন্দ দিতে পারলে কি যে আনন্দ হয় তা আর কি বলবো; মনে হয় সার্থক হোলো খেলোয়াড়ী জীবন। মন তাই উন্মুখ করছিলো কবে কোলকাতায় যাবো, কবে কোলকাতার মাঠে খেলবো। অগণিত দর্শকের আনন্দোচ্ছ্বাস এর কথা, অগণিত ক্রীড়ামোদিদের উত্তেজনাপূর্ণ চিৎকার এখান থেকে যেন শুনছি। মনে হচ্ছে ওরা বলছে "জার্নেল কাম্ অ্যাট ওয়ানস্ আণ্ড প্লে ফুটবল অ্যাট ইওর বেস্ট"। কোলকাতাই হচ্ছে ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান। জার্নেলের মতে এবারের খেলা ওয়ানডে ক্রিকেটের মতো ছাড়া আর কিছুই না। "দুরন্তলালাবপুরে আগেও খেলেছি এখনো খেলছি পেনাং-এ। সুন্দর মাঠ লাইটে আমরা খেলেছি এবং মানিয়ে নিতেও পেরেছি। বড় খেলায় রেফারিং-এর মান খুব সন্তোষজনক। তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে, এশিয়ার দেশগুলির খেলার মান উঠতে হচ্ছে—সে তুলনায় আমরা এগোতেই পারছি না। ফিজিক্যাল ফিটনেসটাই বেশী করে মনে পড়ছে। শারীরিক পটুতা যে কতখানি দরকার বিদেশের মাঠে নামলে সেটা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারা যায়। তবু আমরা সামগ্রিকভাবে এই পটুতার সার্থক হতে পারিনি এবং পারছি না। কয়েকটার খেলা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে।

থাইল্যাণ্ড বার্মা কয়েকটা বছরের মধ্যে ভীষণ উন্নতি করেছে। লক্ষ লক্ষ কোরিয়ার খেলাও বেশ ভালো লেগেছে। শারীরিক সামর্থের বুনিয়াদে তুলনামূলকভাবে অন্যদেশ আমাদের থেকে এগিয়ে চলেছে।

আমি বলবো, আমাদের খেলোয়াড়রা এশিয়ার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা কুড়িয়েছেন। শুধু ক্রীড়াকলার জন্য নয়, মাঠে এবং মাঠের বাইরের আচরণবিধির মূল্য পেয়েছি আমরা। এশিয়ার দেশের ভালোবাসা পেয়েছি, শ্রদ্ধাও পেয়েছি।

অলটার চীনের বিশ্বয়ের কারণ নির্ণয় করে জার্নেল বলেছেন, "আণ্ডারস্ট্যানডিং আর সাবমিসিভেন্ট প্র্যাকটিস না হলে ওয়ার্ল্ডের বেষ্ট এলেভেন খেলোয়াড় আনলেও ঐ একই অবস্থা হবে। উই নীড সেট টুপেন্স আমার ওয়াইফ হাউ……। হাসি খুব আসছে—আরেকদিন মিট কোরবো। গুড বাই।

পিটার থঙ্গরাজ

মাতভেকোর থঙ্গরাজের অভাবনীয় ক্রীড়ানৈপুণ্য দর্শনে মুগ্ধ হয়ে ওয়ার্ল্ড সকার পত্রিকায় একটা দারুণ সুন্দর ইংরাজী লাইন বেরিয়েছিল, "Throughout the tournament India's defence with veteran goalkeeper Thangaraj outstanding was among the strongest." এর থেকেই বোঝা যায় কেমন খেলেছিলেন থঙ্গরাজ, তাই না? খেলাটাকে থঙ্গরাজ

ভীষণ ভালোবাসেন কারণ উনি জানেন এর মাধ্যমেই ওঁর জনপ্রিয়তার মাপকাঠি। থিয়েটার, সিনেমা আর যাত্রা শিল্পের পাত্র পাত্রীদের মতই খেলোয়াড়দের জীবন ক্ষণস্থায়ী। কথাটা ধনরাজ খুব ভালোই জানেন এবং বোঝেন। হাসতে হাসতে বললেন—'এটাই বোধহয় ইতিহাসের শিক্ষা'? এক যায় এক আসে ঠিক নদীর স্রোতের মত, অতএব দুঃখের কোনো কারণ নেই। ধনরাজ প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ওঁর কাছ থেকে অনেক কিছুই জেনেছি আর সেই সঙ্গে আপনাদের কাছেও জানাই উনি সব বিষয়েই খুব সিরিয়াস অর্থাৎ আমাকেও কোনো রকম হেলা ফেলা করেন নি পরন্তু সময়টা বেশীই দিয়েছিলেন।

এ বছরের গোড়ার দিকটায় ধনরাজ ইষ্টবেঙ্গলের পক্ষে মাঠে খেলতে নামেন নি কারণ এ সময়টাতে এশিয়ান অলষ্টার টীমের পক্ষে সফর করছিলেন। কলকাতা মাঠের সব চেয়ে লম্বা চওড়া এখনকার কালের গোলরক্ষকের মধ্যে অবশ্য বেশ কিছুকাল পূর্বে মহামেডান আর ভবানীপুরের গোলরক্ষক ইসমাইল আর মোহনবাগান দলের এস্ চ্যাটার্জী (গোলরক্ষক) ধনরাজের মতই লম্বা চওড়া দেখতে ছিলেন।

ধনরাজ প্রথমে যখন লাইম লাইটে এলেন তখন উনি মাদ্রাজ রেজিমেন্টাল সেন্টারে। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সাল এই দীর্ঘ কয়েক বছরে ওঁর জীবন একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আবর্তিত ছিলো, পরবর্তী অর্দ্ধে তার প্রভাব পরিপূর্ণ। ১৯৬১ সালে মিলিটারী সার্ভিসে ইস্তফা দিয়ে ধনরাজ এলেন কলকাতায় এবং খেলতে শুরু করলেন মহমেডান দলের পক্ষে। এরপর মোহনবাগান। আর তারপর ইষ্টবেঙ্গল। ধনরাজ চট্ করে অবসর নেবেন না, যত দিন পারবেন সুষ্ঠুভাবে খেলবার চেষ্টা করবেন। প্রয়োজন ফুরোলেই ধনরাজ তাঁর গোলরক্ষার দায়িত্বটি নিশ্চয়ই কোনো না কোনো তরুণের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিক ধনরাজকে তাঁর গোলকীপিং করার একটা বিশেষ উপাদান উপহার দিয়েছে। এই অলিম্পিকেই গোলকীপার ইয়াসিন-এর খেলা দেখে অ্যাক্রোব্যাটিসিং আর থ্রোইং দুটো জিনিসই উনি শিখে এসেছেন।

প্রদীপ ব্যানার্জী আর ধনরাজ হলেন এশিয়ান কোয়াড্রাঙ্গুলার দলের সবচেয়ে পুরাতন সতীর্থ কারণ একই সালে দুজন একসঙ্গে স্থান পান। প্রদীপ অবসর নেবার পর ধনরাজই হলেন সবচেয়ে সিনিয়র খেলোয়াড়।

ধনরাজ রোজ ভোর ৪-৩০টায় ঘুম থেকে ওঠেন তারপর স্নান আর প্রার্থনা সেরে নিয়ে সোজা চলে আসেন মাঠে। এ অভ্যাস বহুদিনের এবং আজও অব্যাহত রয়েছে। ধনরাজরা ৬ ভাই আর ৩ বোন। সম্প্রতি বিয়ে করেছেন। দুটি কন্যা আর এক পুত্রের জনক হলেন ধনরাজ। এখন পর্যন্ত ধনরাজের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির তালিকায় রয়েছে—মেলবোর্ন রোম অলিম্পিক এশিয়ান কোয়াড্রাঙ্গুলার—টোকিও অলিম্পিকের বাছাই পর্ব আর এশিয়ান অলষ্টার প্রতিযোগিতা। ১৯৬২তে জাকার্তা এশিয়ান গেমসে ব্রিঞ্জারীর পদক আছে। ১৯৬৮ সার্ভিসেস্ আর '৬৯তে রেলওয়ে, দুবার দুটি আলাদা দলের অধিনায়ক হয়ে তিনি এক অভূতপূর্ব রেকর্ড অর্জনের অধিকারী।

"লম্বা হবার অনেক বিপদ!" হাসতে হাসতে বললেন ধনরাজ। ওঁর পায়ের মাপ মতন কোনো জুতোই নাকি দোকানে পাওয়া যায় না। কলকাতা পুলিশ ক্লাবের তাঁবুর দক্ষিণ প্রান্তে সাধারণত ধনরাজকে শীতের সময় প্র্যাকটিশ করতে দেখেছি। এ প্রান্তে তখন পুলিশ দলের খেলোয়াড়রা বাসকেট বল অনুশীলনে রত। সার্জেন্ট শামল ঘোষাল (ফিল্ম জগতের সুঅভিনেতা) এর মাধ্যমেই ধনরাজের সঙ্গে আবার আলাপ আর সেই সূত্র ধরেই আজকের এই বিবরণ পেয়েছি।

এশিয়ান অলষ্টার টীম সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেন নি—মনে হয় অবস্থা বিপর্যয়ের কথাটা তাঁকে পীড়া দেয়। তবে একটা কথা বারে বার মনে হয়েছে ইঙ্গপায়ারিং ক্যাপটেন-সি আর ইঙ্গপায়ারিং গেমস্ দুটো জিনিসই তাঁর কাছে সব চেয়ে বড়। মডার্ণ টেকনিক অফ ফুটবল বিশেষভাবে সমস্ত করাই হলো ওঁর একমাত্র লক্ষ্য।

ফ্লাড লাইট ফুটবল চালু করা উচিত আর উচিত

পেশাদারী প্রথার সরকারী প্রবর্তন। ভারতীয় ফুটবলের সার্বিক উন্নতি কিসে কখন কি ভাবে হবে এ চিন্তাই হোলো খেলোয়াড়ের কাছে একমাত্র অবলম্বন। বাংলাদেশের দর্শক তাঁর কাছে প্রিয় তবে বর্তমান বছরের হালচালটা কোন দিকে প্রবাহিত এটা উনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। প্রত্যেক খেলোয়াড়ই তাঁর দলকে জেতানোর জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে থাকেন। দর্শকদিনই যে ক্রিতত্বো এমন দ্বিরতা কেউই দিতে পারেন না। স্পোর্টসম্যান স্পিরিটই যদি চলে গেলো তাহলে রইলোটা কি। "থ্যাংক ইউ—মোর হোপেন উই মীট" করমর্দন করে বিদায় নিলেন পিটার রায়বাবী খঙ্গপুর।

আলতাফ আমেদ

বাংলার মতন বহীশূরেরও ভারতীয় ফুটবলে অসামান্য দান আছে। অতীতে এই মহীশূর রাজ্য ভারতীয় ফুটবলে বহু কীর্তিমান খেলোয়াড় উপহার দিয়েছে যাঁদের কথা আজও অবিস্মরণীয়। আলতাফ আমেদ বহীশূরের দান। জন্ম বাঙ্গালোরে। আলতাফের বাবা খুব ছোটবেলা থেকেই ওঁর ছেলেকে ফুটবল খেলায় উৎসাহ দিয়ে এসেছেন যার জন্য উত্তরকালে ওঁর এই স্বীকৃতি লাভ ঘটেছে। সংসারের আবর্তে ঘটনাচক্রে আলতাফের বাবা বিশেষ ভাবে জড়িয়ে পড়ার জন্য ফুটবল খেলাটাকে ধরতে পারেন নি। ছেলেকে মানুষ করার জন্য তাই এত পরিশ্রম করেছেন। ছেলের জন্য বাপের শ্রম সার্থক হয়েছে। আমি অবশ্য ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দীতেই কাজ চালাচ্ছিলাম আর মধ্যে মধ্যে ইংরাজী। যাই হোক খন্দরধারী মানুষ আলতাফ ওঁর বাবার সম্বন্ধে বললেন, 'ফুটবলকে নিয়ে মেরা জো স্বপ্ন হৈ হুকে—ইসকা পিছে সমূচা টাইম মেরা পিতাজী নে দে"। হিন্দীটা যা শুনেছি তাই লিখেছি, তবে যদি ভুল হয়ে থাকে সেটা হয়েছে ছাপতো বা পোনবার জন্যে। ওই ছোট্ট কথাটার পিছনে আলতাফ আমেদের বাবা ওঁর ছেলের উন্নতির মূলে কি না করেছিলেন বোধ করি কারো বুঝতে অসুবিধা হবে না। 'মৈকানিকালে এঞ্জীনিয়ারিং ডিপ্লোমা পেয়েছেন আলতাফ। এই এঞ্জীনিয়ারিং পড়বার সময়ই স্কুল আর কলেজ দলে নিয়মিত খেলতে থাকেন। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত একটানা বাঙ্গালোর মুসলিম দলে খেলেছেন। ১৯৬৩ সালেই মহীশূরের পক্ষে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রথম আত্মপ্রকাশ। প্রথম আবির্ভাবেই কোলকাতার ক্রীড়ামোদি মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেন। মহমেডান দলের থেকে এ বছর এসেছেন মোহনবাগানে। খেলার কোনো ছের ফের ঘটেনি। আলতাফ "ফিল গোয়িং টু"। এবছর এশিয়ান অলষ্টার দলের অন্যতম খেলোয়াড় হিসাবে বিদেশে খেলে এসেছেন। আর্নেল সিংহের মতন আলতাফ ও বলেছেন আমাদের বিপর্যয়ের কারণই হলো অপর্যাপ্ত অনুশীলন। পর্যাপ্ত অনুশীলন আর বোঝাপড়ার ভাবটা আরো সহজ হলে নিশ্চয়ই এ বিপর্যয় রোধ করা যেতো অন্তত আলতাফ আমেদ তো সে কথাই সোচ্চারে বলেছেন।

ভারতীয় দলের হয়ে সর্ব প্রথম সুযোগ পান ১৯৬৩ সালে। ঐ বছর সারগনে অনুষ্ঠিত এশীয় যুব কাপে তিনি ভারতীয় দলে মনোনীত হয়েছিলেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ঐ আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারত যতবার গেছেন ততবারই আলতাফকে খেলতে দেখা গেছে।

১৯৬৩ সালে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা রাজ্য দলের পক্ষে আলতাফ যে অসাধারণ ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা অসংখ্য অভিনন্দনে ধন্য। এ বছরে মোহনবাগান দলে যোগদান উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। মোহনবাগান দলে ব্যাকে খেলছেন।

বেশ কিছুক্ষণ আলাপ করার পর আলতাফ যা বললেন তার মর্মার্থটা হলো, তিনি এখনো মনে প্রাণে শিক্ষার্থী। বড় বড় খেলা দেখে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী ক্রীড়াধারার যেটুকু ভালো সেইটুকু গ্রহণ করতে কোনো সময়েই দ্বিধা-গ্রস্ত নয়। সংস্কৃতে একটা প্রবাদ বচন আছে, "সারম্ গৃহ্যা প্রাহ্যবপাস্য ফল্গু হংসৈ যথা ক্ষিরম্ ইবম্ অম্বুমধ্যাৎ"। হাঁস যেমন দুধের মধ্যে থেকে সার অংশটি গ্রহণ করে আসার

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY 1975

কলিকাতার প্রকাশনা—শারদীয়া বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদক বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, কলিকাতা-১৩।